রাহুল সাংকৃত্যায়ন

আমার জীবন-যাত্রা

চতুর্থ খণ্ড

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

আমার জীবন-যাত্রা

চতুর্থ খণ্ড

সম্পাদনা

সতীশ মিশ্র
সৈকত রক্ষিত

অনুবাদ

ইনা সেনগুপ্ত



রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্মশতবর্ষ কমিটি

Amar Jiban-Yatra, Bengali Translation of
Rahul Sankrityayana's *Meri Jiban-Yatra*

প্রচ্ছদ
স্বপন রুদ্র

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল, ১৯৫৮

ফটোটাইপসেটিং
আই· ই· আর· ই
২০৯এ, বিধান সরণি
কলকাতা ৭০০ ০০৬

দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশনা
ভুবন ভট্টাচার্য
রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্মশতবর্ষ কমিটি
৬বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুখবন্ধ

প্রথম তিনটি খণ্ডের মতো চতুর্থ খণ্ডেও পর্বে পর্বে উন্মোচন ও বিস্তারই 'আমার জীবন-যাত্রা'র প্রধান বৈশিষ্ট্য। সময়ের প্রবাহ, মানুষের প্রবাহ, বিবিধ ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে প্রাণবন্ত চিন্তা-চেতনার ধারা মিলেমিশে জীবন-যাত্রার প্রবাহ পথটিকে ক্রমশ প্রশস্ত ও বহমান করে তুলেছে।

১৯৪৭-এর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ১৯৫০ মোটামুটি এই তিন বছরের ঘটনাক্রম গ্রন্থিত হয়েছে এই খণ্ডে, যার রচনাকাল ১৯৫৬ সাল, অর্থাৎ মৃত্যুর বছর সাতেক আগে। লোলা ও পুত্র ইগরকে রাহুল লেলিনগ্রাদে রেখে এসেছিলেন। লোলার কাছ থেকে ফিরে যাওয়ার তাগিদ আসছিল। ১৯৪৩-র আগস্ট থেকেই রাহুল পাসপোর্ট-ভিসার জন্য চেষ্টা-চরিত্র শুরু করেছিলেন। বহু সময় লেগে গেল। অবশেষে রাহুলকে রাশিয়া যেতে হয় ইরান হয়ে। ১৯৪৫-এর জুনমাসে রাহুল পৌঁছলেন লেনিনগ্রাদে, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতির অধ্যাপকরূপে। ২৫ মাসের মতো রাশিয়ায় বাস করে ১৯৪৭-এর ১৭ আগস্ট লন্ডন হয়ে তিনি স্বাধীন ভারতে ফেরেন। চোখের সামনে ভারতীয় তটভূমি দৃশ্যমান হতেই বিদেশী শাসনমুক্তির আনন্দের আবেগে তাঁর মনে পড়ে যায় জননী, জন্মভূমির গরিমা। শুধু তাই নয়, তিনি মনে পড়িয়ে দেন তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাপন ও কর্মপ্রচেষ্টায় কিভাবে বিদেশী শাসন আপাদমস্তক শৃঙ্খল রচনা করেছিল। আর সব রকমের শৃঙ্খল মোচনেই তাঁর অবিরত প্রয়াস। জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্বে আমরা দেখি, স্বাধীন ভারতবর্ষে হিন্দিভাষাকে রাষ্ট্রভাষা ও নাগরীকে রাষ্ট্রলিপি করবার জন্য রাহুলের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও তার জন্য পারিভাষিক শব্দনির্মাণ, ঘুমক্কড় রাহুলের গৃহীজীবন বরণ করে নেওয়া ও ক্রমাগত নিজেকে গ্রন্থরচনার কাজে ব্যাপৃত রাখা।

১৯৪৭-এর ডিসেম্বরে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি রাহুল। তাঁর মুদ্রিত ভাষণের বক্তব্যের সাথে অর্থাৎ হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা ও নাগরীকে রাষ্ট্রলিপি করার প্রস্তাবে কমিউনিস্ট পার্টি একমত হয় নি। মুসলমানদের রাহুল আহ্বান করেন ভারতীয় সংস্কৃতির মূলপ্রবাহে মিশে যেতে। পার্টি রাহুলকে তাঁর ভাষণের এই অংশ বাদ দিতে বলেন। কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। সেই কারণেই রাহুল পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। অনেক পরে অজয় ঘোষের সময়ে রাহুলের একান্ত অনুরোধে আবার তাঁকে সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

রাহুলের সুচিন্তিত অভিমত ছিল ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের যোগসূত্র-ভাষা হবে সংস্কৃতনিষ্ঠ হিন্দি। কারণ এই ভাষার সঙ্গেই দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পরিচিত এবং হিন্দির শব্দভাণ্ডারে বিভিন্ন রাজ্যের ভাষার বহুশব্দ আহৃত হবে। এর সঙ্গে যে-কোনো বিশেষ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের শিক্ষার ও প্রশাসনের মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। অর্থাৎ বাংলায় শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলাভাষা, উড়িষ্যাতে উড়িয়া, অন্ধ্রে তেলুগু ইত্যাদি। কিন্তু হিন্দি ভাষাভাষী এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে উর্দুভাষাভাষী

মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ। রাহুলের মতে উর্দুর সমর্থকদের সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত কাজ হবে নাগরীলিপিকে গ্রহণ করা। যার ফলে বেশির ভাগ লোকের পক্ষে এই ভাষা পড়তে পারা সহজ হয়। স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য বিচ্ছিন্নতা নয়, সমন্বয়। বলা বাহুল্য, রাহুলের স্পষ্ট মতকে খণ্ডন করা হয়েছিল যতটা কুৎসার আবরণে, ততটা যুক্তির আশ্রয়ে নয়।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, রাহুল হিন্দির প্রতি সমর্পিত প্রাণ ছিলেন। হিন্দিভাষাকে, সাহিত্যকে অজস্র লেখার ধারাবর্ষণে তিনি পুষ্ট করেছিলেন এই আশা নিয়ে যে, হিন্দির বিকাশ যদি আশানুরূপ হয়, তাহলে বিশ্বের কোনো ভাষা থেকে হিন্দি পিছিয়ে থাকবে না। এর মাধ্যমে রাহুলের উপাস্য ছিল দেশের ঐক্য। তিনি চেয়েছিলেন দেশের সব ভাষা ও উপভাষার স্রোত থেকে শব্দ, ধ্বনি ও প্রয়োগের শক্তিকে আত্মসাৎ করে স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দিকে গড়ে তুলতে। ধর্মপ্রচারকের মতো উৎসাহ নিয়ে রাহুল হিন্দিভাষা ও নাগরীলিপির বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি সর্বদাই বলতেন, 'আমি আহার, বস্ত্র এবং ধর্মকেও কয়েকবার বদলেছি, কিন্তু আমার মধ্যে যদি এমন কিছু বস্তু থাকে যা পরিবর্তনশীল নয়, তা হলো রাষ্ট্রভাষার প্রতি আমার সুদৃঢ় আস্থা।' রাহুল চেয়েছিলেন পারিভাষিক শব্দনির্মাণ করে এই ভাষাকে স্বাবলম্বী করতে। শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন এই কাজেরই ভার দেন রাহুলকে। কিন্তু ট্যান্ডন ছিলেন অত্যন্ত ঢিলেঢালা ব্যক্তি। তিনি তৎপর হলে অল্পকালের মধ্যেই রাহুল চার-পাঁচ লাখ শব্দ সংগ্রহ করে ফেলতে পারতেন। ১৯৪৮-এর মে মাসে রাহুল 'শাসন শব্দকোষ' সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন। এরপরে বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ তৈরির জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয়। পারিভাষিক শব্দ-নির্মাণের কাজে রাহুল প্রায় সারা ভারত চষে বেড়িয়েছেন। কলকাতায় দীর্ঘ আলোচনা করেন ড· সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে। ইতিমধ্যে ভারতীয় সংবিধানের হিন্দি অনুবাদের জন্য রাষ্ট্রপতি যে-কমিটি গঠন করেছিলেন, রাহুল তারও সদস্য মনোনীত হন। রাহুলকে ঘনঘন দিল্লী ছুটতে হয়। শান্তমনে শীতল পরিবেশে পরিভাষার কাজ করার জন্য রাহুল তাঁর প্রিয় শৈলশহর কালিম্পঙে আস্তানা গাড়েন। এই কাজে সহায়তা করার জন্য কিছু লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে নিযুক্ত হয়। এদের মধ্যে ছিল কমলা পরিয়ার নামে একটি স্থানীয় মেয়ে। ক্রমে দুজনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। পরিভাষার কাজে সরকারি হস্তক্ষেপে ছেদ পড়ে। এবারে সাহিত্য সম্পর্কিত কাজকর্মের জন্য একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী ও নিরুপদ্রব সৃজনকর্মের জন্য একটি স্থায়ী নীড়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন চিরদিনের ঘুমক্কড় রাহুল স্বয়ং। এই সময়েই রাহুল লিখছিলেন 'ঘুমক্কড় শাস্ত্র' কমলার সাহায্য নিয়ে। এই বই যখন তিনি লিখছিলেন, তখন কি তাঁর কোনো পূর্ববোধ ছিল? বেশি বয়সে প্রেমের ভবিতব্যতা নিয়ে তাঁর মনে কি কোনো শঙ্কা জাগে নি? তিনি ঘুমক্কড় শাস্ত্রে লিখছেন, 'সময় চলে যাওয়ার পর, শক্তি শিথিল হয়ে যাওয়ার পর কাঁধে ভার এসে পড়লে তা অধিকতর দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় প্রেম করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না এবং ঘুমক্কড়ী থেকে কখনও পেনসন নেওয়া উচিত নয়।' এতদ্‌সত্ত্বেও রাহুল কমলাকে নিয়ে নীড় বাঁধলেন। তাকে

বিবাহ করলেন, বয়সের অনেক ব্যবধান সত্ত্বেও। নিয়ত পরিবর্তনশীল রাহুলের সত্তার চমৎকারিত্ব এখানেই যে, এই 'সঙ্গী' এবং এই 'নীড়' রাহুলকে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই সংসারী করে তুলল এবং এটা ঘটেছে বলেই মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নকে আমাদের রক্তমাংসের মানুষ বলেই মনে হয়। তিনি শুধু দুর্গম ভূখণ্ডে সত্য ও জ্ঞানের সন্ধানে সঞ্চরমান পরিব্রাজক নন, ব্যক্তি রাহুলের স্বতন্ত্র সত্য ও নিজস্ব বোধ কখনও তাঁকে জীবনবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নি। তাই যে-কিশোর পন্দ্‌হা গ্রামের অগণিত আত্মীয়, পরিচিত মানুষজন, গলিঘুঁজি-তালগাছ পুকুরপাড় সবকিছু ছেড়ে গৃহত্যাগী হয়েছিল, আজ সেই ঘর পালানো কিশোরই প্রৌঢ়ত্বে এসে যখন নিজস্ব নীড় রচনা করেন, তখন তাঁর এই গৃহাভিমুখে ফিরে আসা প্রকৃত অর্থে জীবনের দিকে আসা। সেভাবে দেখলে রাহুলের জীবনে এ এক অতি উল্লেখযোগ্য পরিক্রমা।

এতকাল পরে উড্ডীন পাখীর ডানা কাটা গেল। মুসৌরীতে হর্নক্লিফ নামে বাংলো কিনে নিলেন রাহুল। কমলাকে নিয়ে চলে এলেন সেখানে। নুন-তেল-লকড়ি কি এবারে জীবনের প্রাথমিক স্তরে উঠে এল? কমলা কি দেবে তাঁকে—যা লোলা তাঁকে দিয়েছিল তার চেয়ে বেশি কিছু? তিনি লোলাকে ছেড়ে এসেছিলেন কারণ লোলার কাছে থাকলে তাঁকে সাহিত্যচর্চা ও ঘুমক্কড়ী দুই-ই ছেড়ে দিতে হতো। কিন্তু কমলাকে রাহুল তাঁর সাহিত্যকর্মের সঙ্গিনী হিসেবে সযত্নে তৈরি করেছেন। রাহুল লিখেছেন, কমলা তপস্বিনী নয়, ঘুমক্কড়ও নয়। অতএব ঘুমক্কড়ীর অবসান হলো। অনেক কাজ বাকি আছে। এবারে কমলার আন্তরিক সাহচর্যে নিরলস সাহিত্যচর্চা। যদিও কঠিন রোগ বাসা বেঁধেছে শরীরে।

কিন্তু কোনো বাধাই রাহুলকে নিরস্ত করতে পারে না। তাঁর শুধুই এগিয়ে যাওয়া। তার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের বিরামহীন উদ্যোগ। তাই কখনই তিনি হতোদ্যম হন না। এই দু-হাজার পৃষ্ঠা পর্যন্ত আমরা কোথাও তেমন হতাশা, ক্লান্তি, জীবন সম্পর্কে বিরক্তি বা বিমুখতার চিহ্নমাত্র দেখি না। কষ্ট হয়, যখন বার্ধক্য ও মধুমেহ রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ক্লেশ অনুভব করেন। তিনি স্বয়ং তাকে অগ্রাহ্য করে একের পর এক গ্রন্থরচনা ও গ্রন্থের পবিকল্পনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। ১৯৫০-এর শেষে 'গাঢ়োয়াল' লেখা হয়। এই বছরেই 'মধুর স্বপ্ন' ও 'দার্জিলিং পরিচয়' প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সামনে এখনও অনেক কাজ। সবচেয়ে বড় কাজ 'মধ্য-এশিয়া কা ইতিহাস' রচনা।

১৯৫০-এর ডিসেম্বরে 'জীবন-যাত্রা'র চতুর্থ পর্বের সমাপ্তি। ২৪ ডিসেম্বর কমলা দেরাদুন চলে গেলেন। সেখান থেকে তিনি কালিম্পং হয়ে একমাস পরে ফিরবেন। ২৪ ডিসেম্বর রাত্রে খুব বৃষ্টি হলো। বড়দিনের সকালে বরফ পড়তে লাগল। রাহুল মুসৌরীর বাড়ির জানালা দিয়ে দেখছিলেন বাগান ও রাস্তা বরফের চাদরে ঢেকে গেছে। গাছের ডাল, পাতা বরফে ঢাকা। তাঁর বাড়ির ছাদ ও অন্যান্য সব বাড়ির ছাদে বরফ। কীট-পতঙ্গ, পশুপাখির কোনো শব্দ নেই। চারিদিকে অখণ্ড নীরবতা। হয়তো পুরনো দিনের কথা তাঁর মনে পড়ে যায়।

'ঘোড়াগুলো দশ পা গিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য থামছিল। আমরা বরফের ফরাসের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম। চাঁদনী রাতের ঝকমকে বরফ। পাতলা হওয়ার জন্য নিঃশ্বাস

নেওয়া আর পা ওঠানোর মধ্যে কারো কথা বলার ফুরসত ছিল না। মনে হচ্ছিল, ধীরে ধীরে পা মেপে মেপে যুগ যুগ ধরে আমরা রাস্তা পার হচ্ছিলাম! পনের হাজার, ষোল হাজার, সতের হাজার, আঠার হাজার ফুট পর্যন্ত পৌছন, বলতে সোজা মনে হয় কিন্তু এই প্রত্যেক হাজার ফুট মানুষ ও পশুর ফুসফুস, পা ও পিঠের ওপর কি অসহ্য ভার চাপিয়ে দেয়,কি-রকম পীড়া এনে দেয়, ভাষায় তার আভাস দেওয়াও কঠিন' (মেরী জীবন-যাত্রা, প্রথম খণ্ড)। রাহুল এই পথে লদাখে খদৌঙ্ হয়ে নুব্রা গিয়েছিলেন ১৯২৬-এর জুলাই বা আগস্টে। ২৪ বছর পর ১৯৫০-এর ২৫ ডিসেম্বর গৃহবন্দী রাহুল তাঁর ঘরে খাটিয়ায় বসে বরফে ঢাকা মুসৌরীকে দেখছিলেন আর লিখে চলেছিলেন, তখন তিনি একেবারে একা।

'মেরী জীবন-যাত্রা'র এই খণ্ডে কোনো পর্বের বিভাজন নেই। ১৯৪৭-৫০ এই তিন বছরের ঘটনাক্রমকে রাহুলের জীবনের অখণ্ড একটি পর্ব হিসাবে ধরা যেতে পারে। যেহেতু 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও পরিভাষা রচনা' এই পর্বের মুখ্য অংশ জুড়ে রয়েছে, তাই সম্পাদক মণ্ডলী পর্বটিকে উক্ত অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। লেখক অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত শব্দের ইংরেজি রূপকে বর্জন করে তার জায়গায় হিন্দি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। আমরাও লেখকের এই ধরনটিকে যথাসম্ভব অনুসরণ করেছি। ইংরেজি পারিভাষিক শব্দকে পরিহার করে লেখক যেখানে হিন্দি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, আমরা সেখানে তার বাংলা পরিভাষাটিকে ব্যবহার করেছি। তার জন্য পাঠক যদি কোথাও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, তবে তার কারণ হয়তো বাংলা পরিভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের অভাব। আমরা আশা করব. নিকট ভবিষ্যতে পাঠক ক্রমশ এই পরিভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠবেন। তার ফলশ্রুতি হিসেবে, শাসনের সূত্রে যে ভাষা-শৃঙ্খল আমাদের ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, ধীরে ধীরে আমরা তার ভারমুক্ত হতে পারবো।

তুষারকান্তি তালুকদার
সভাপতি
রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্মশতবর্ষ কমিটি

বিষয়-সূচি

অষ্টম পর্ব

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও পরিভাষা রচনা

অষ্টম পর্ব

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন
ও
পরিভাষা রচনা

১৯৪৭-১৯৫০

'পার হওয়ার জন্য ভেলার মতো আমি ভাবনাগুলিকে গ্রহণ করেছি,
মাথায় বয়ে বয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্য নয়।'

রাশিয়া থেকে ফিরে

বোম্বাই—১৭ আগস্ট, ১৯৪৭-এ আমি ‘স্ট্রেথমোর’ জাহাজে বোম্বাই পৌঁছলাম। দু সপ্তাহের বেশি বোম্বাইতেই ছিলাম। ১৫ আগস্ট ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে গেল। সেদিন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো বোম্বাইতেও স্বাধীনতা উৎসব পালিত হয়েছিল। সেই পুণ্য উৎসবের দুদিন পরে বোম্বাই পৌঁছেছিলাম বলে আমার আফশোশ হচ্ছিল। শুধু গত আড়াই বছরের পরিবর্তনই আমি দেখতে চাইনি, বরং ইংরেজ শাসনের কালরাত্রির অবসানে দেশ জুড়ে যে পরিবর্তন হয়েছিল, তাও দেখতে চেয়েছিলাম। বোম্বাই-এর পার্টি-কেন্দ্রে সারা দেশের সংবাদপত্র আসত। হিন্দি পত্র-পত্রিকার যেন বন্যা এসেছিল। তবে সবগুলিই বেরোচ্ছিল শুধুমাত্র প্রাণধারণের জন্য। ভাগ্যের ভরসায় বসে থাকলে কি করে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়? জেনে দুঃখ হলো যে, যে বামপন্থীদের ওপর দেশেব ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, তারাই নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিরিভাবে ঝগড়াঝাটি করছে। কম্যুনিস্টরা চাইছিল সবার মধ্যে একতা স্থাপিত হোক, কিন্তু সোস্যালিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক, বিপ্লবী সমাজবাদী পার্টিগুলো তা চাইছিল না।

সব থেকে বেশি মনকে নাড়া দেবার ঘটনা হলো এই যে, ১৫ আগস্টের মহোৎসবের সঙ্গে সঙ্গে বিভক্ত ভারতে আগুন জ্বলে উঠল। পাঞ্জাবে মানুষ মানুষকে ঘাস-মুলোর মতো কাটছিল—বাচ্চা, বুড়ো, মহিলা কারুরই জীবন নিরাপদ ছিল না। সীমান্ত-কমিশন পূর্ব এবং পশ্চিমের সীমানা সম্বন্ধে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিল। জাহাজে আমার সহযাত্রী শিখভাই গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিল, ‘লাহোর নিশ্চিত ভারতের ভাগে পড়বে, না হলে রক্তের নদী বয়ে যাবে।’ লাহোর যখন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপের মতো, তখন তা কিভাবে ভারতের পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল? হ্যাঁ, রক্তের নদীই বইছে এখন। সীমা-নির্ধারণের আগেই যদি দুদিকের অনিচ্ছুক অধিবাসীদের অদল-বদলের ব্যবস্থা করা হতো, তাহলে হয়তো এই দিনগুলোকে দেখতে হতো না। রাজনীতিজ্ঞদের একথা আগেই ভেবে নেওয়া উচিত ছিল যে, দেশ ভাগাভাগির সময় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া অবশ্যই সম্ভব। বোম্বাইতে বসে বসে এইসব খবর শুনে আমি কেবল চুপচাপ মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করে যেতাম।

আগস্ট মাসটা বর্ষারই মাস। একটানা বৃষ্টি হচ্ছিল। এবছর বৃষ্টি দেরিতে শুরু হয়েছিল। বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ঘামে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। রাস্তা আর গলিগুলো ছিল কাদায় ভর্তি।

তবুও যেখানে-সেখানে বক্তৃতা দিতে যেতে হতো। ২১ আগস্ট মহাদেব ভাই (সাহা) এলেন, ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকার জন্য। একা একা তপস্যাই করা যায়, অন্য কাজে দুজন থাকলে মন বসে।

২৩ আগস্ট আমাকে 'বহুজন বিহার'-এ যেতে হলো। আচার্য ধর্মানন্দ কোসম্বীর তৈরি এই বিহার অত্যন্ত পবিত্র। কতবার আমি তাঁর সঙ্গে এখানে দেখা করেছি। সাদা দাড়িতে ঢাকা তাঁর সৌম্যমুখ কখনো ভোলা যায় না। কারো সঙ্গেই তাঁর বনত না। কেন, তা আমি বুঝতে পারতাম না। সারল্যের সাকার মূর্তি ছিলেন তিনি। তাঁর ব্যবহার ছিল অতি মধুর। কখনো তাঁর কাছে গেলে তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে চা বানিয়ে খাওয়াতে চাইতেন, আর তা না খাওয়া পর্যন্ত মুক্তি ছিল না। যে ভালোবাসা নিয়ে তা বানানো হতো তাতে তা শতগুণ মধুর হয়ে উঠত। লঙ্কা গিয়ে আমি গুজরাটী ভাষায় তাঁর জীবন-যাত্রা পড়েছিলাম। মারাঠী এবং গুজরাটীতে বৌদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি নিয়ে তিনি অনেক কাজ করেছেন। পালিভাষায় তাঁর গভীর জ্ঞান তাঁর লেখাতে প্রকাশ পায়। তিনি বিদ্বান এবং সেইসঙ্গে ভবঘুরেও ছিলেন। সম্ভবত এই ভবঘুরে-প্রবৃত্তিই তাঁকে স্থান এবং ব্যক্তির প্রতি রুষ্ট করে তুলতো। তিনি অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন এবং সামান্যও অনিয়ম দেখলে নিজেকে সামলাতে পারতেন না। এই কারণেই তিনি কোথাও টিকতে পারতেন না। কিন্তু এই একটা দোষের জন্যই কি তাঁর অসংখ্য গুণ ভুলে যাওয়া যায়? আমি ভাবতেও পারিনি যে আমার প্রবাসকালে তিনি চিরদিনের জন্য চলে যাবেন, আর তাও স্বেচ্ছায়। শরীর ব্যাধিতে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল, তা দেখে তাঁর মন অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়েছিল। নিজের জীবনকে তিনি বোঝা ভাবতে শুরু করেছিলেন। চাইতেন না সেই বোঝা বহন করার জন্য আর কেউ বাধ্য হোক। তিনি অনশন শুরু করলেন, জীবন দিয়ে যার শেষ হলো। এটা আত্মহত্যা ছিল। আচার্য কোসম্বী বৌদ্ধ ছিলেন এবং তিনি জানতেন যে বুদ্ধ আত্মহত্যাকে খারাপ বলছেন্। সেইদিন সেইস্থানে বলতে গিয়ে আচার্যকে মনে পড়া অনিবার্য ছিল। হৃদয় বিচলিত হয়ে উঠল, গলা ধরে গেল এবং বক্তৃতা শেষ করতে হলো। কিন্তু প্রিয় হোক বা অপ্রিয় হোক, সবাইকে একদিন মহাপ্রস্থানে যেতেই হয়।

২৫ আগস্ট আমি চেক ভাঙানোর জন্য টমাস কুকের অফিসে যাচ্ছিলাম। ভিণ্ডিবাজারে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। খুব ভিড় ছিল না, তবে যতটা ভিড় থাকলে পকেটমারের সুবিধে হয় ততটা অবশ্যই ছিল। চুপি চুপি সে আমার পকেট থেকে একটা জিনিস বার করে নিল। সে ভেবেছিল, যে চামড়ার থলিটা সে বার করে নিচ্ছে তাতে টাকা ভর্তি থাকবে। কিন্তু থলির মধ্যে টাকার জায়গায় যখন পাসপোর্ট পেলো তখন নিশ্চয়ই সে খুব নিরাশ হয়েছিল। পাসপোর্ট হারিয়ে যাবার খবর আমি পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। ভালোমানুষ পকেটমার পাসপোর্টটা কোনোরকমে পুলিশের কাছে পৌঁছে দিতে অবশ্যই সাহায্য করে থাকবে, তাই কিছুদিন বাদে সেটা আমার কাছে ফিরে এসেছিল। চোরের হাতে যাওয়া পাসপোর্ট ফিরে আসতে পারে, কিন্তু পাসপোর্টের আর একরকম চোর হয়, যাদের হাতে পড়লে তা আর ফিরে আসে না। আমি জানতাম না যে পাসপোর্ট চুরি করাটা গোয়েন্দা পুলিশের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। গোয়েন্দা পুলিশের

একটি চর লড়াই-এর সময় এমন কাজই করেছিল। পকেটমারের কাছ থেকে ফিরে আসা এই পাসপোর্ট একদিন কালিম্পঙে গায়েব হয়েছিল। পাসপোর্ট না থাকায় কুকের ট্রাভেলার্স চেক ভাঙাতে অসুবিধে হতে পারত, কিন্তু সেখানকার মানুষটি ভাল হওয়ায় তিনি আমাকে বিশ্বাস করে টাকা দিয়ে দিলেন।

রোজই কোথাও না কোথাও বক্তৃতা দিতে হতো। কখনো এক-আধবার দাদারে মারাঠীভাষীদের সামনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে অসুবিধে বোধ করেছি। কিন্তু আমি জানতাম যে এমন সময় যদি সংস্কৃতবহুল হিন্দিভাষার প্রয়োগ করা যায় তবে শ্রোতাদের বুঝতে সুবিধে হবে। বাংলা অঞ্চলেও এই পরীক্ষা সফল হতে দেখেছি। আসল কথাটা হলো এই যে, উর্দু ছাড়া আমাদের দেশের সমস্ত সাহিত্যের ভাষাতেই একই ধরনের সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়, যে কারণে আমরা পরস্পরের ভাষা অনেকটা বুঝে নিতে পারি।

ইংরেজদের শাসনকালেই ভারতীয় ক্রোড়পতিরা সংবাদপত্রগুলোকে নিজেদের হাতে নেওয়ার কাজ শুরু করেছিল। এই কাজ করে তারা বিপদের ঝুঁকি নিতে চায়নি, কারণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে কলমের লড়াই করা তাদের কাজ ছিল না। খুব বেশি হলে, কখনো-সখনো নিচুগলায় জাতীয় আন্দোলনকে সামান্য সমর্থন করত। ইংরেজরা যখন তাদের সংবাদপত্রগুলো বেচতে শুরু করল তখন ভারতীয় পুঁজিপতিরা সেগুলোর ভার নেবার জন্য এগিয়ে এলো। বিড়লা, ডালমিয়া, গোয়েঙ্কা এখন সংবাদপত্রের রাজা হয়ে উঠল। এইটুকুই রক্ষা যে, পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে তারা প্রকাশ্যে নামেনি, নাহলে লেখকদেরও তারা খুব সহজে কিনতে পারত। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যই এসব হচ্ছিল—এমন কথা নিতান্ত সাদাসিধে লোকেরাই ভাবতে পারে। মুদ্রণব্যবস্থার ওপর আধিপত্য অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশেও আছে, যাকে গণতন্ত্র নাম দিয়ে ঢাক পিটানো হয়।

২৯ আগস্ট আমাকে দাদারের বনমালী হলে 'বুদ্ধ এবং মার্কস'-এর ওপর বক্তৃতা দিতে বলা হলো। আমার পছন্দমত বিষয়। আর্যসমাজের স্বাধীন ভাবধারা লাভ করার পর আমি বুদ্ধের সান্নিধ্যে যাই এবং তাঁর অনীশ্বরবাদ, চিন্তার স্বাধীনতা, আর্থিক সাম্য দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত হই। এরপর মার্কস্-এর যুক্তিগুলোকে আমার খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হলো। বুদ্ধের দর্শন এ ব্যাপারে আরো সহায়ক বলে প্রমাণিত হলো। বিশ্বের সকল বস্তুকে বুদ্ধ অনিত্য মনে করেন। প্রতিটি জিনিস প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে, উপরন্তু একথা বলা উচিত, যে জিনিস প্রতিমুহূর্তে বদলাচ্ছে না তা এই দুনিয়াতেই নেই। তা শুধু কল্পনামাত্র, মিথ্যাভ্রম। অনাত্মবাদ, অনীশ্বরবাদ, গ্রন্থ অপ্রামাণ্যবাদ এই সবকিছুই মানুষের মানসিক বন্ধনকে মুক্ত করে। এ সব সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম বা দর্শন সে কাজ করতে পারে না যা মার্কস্-এর শিক্ষা করতে পারে। মার্কস্ শুধু পৃথিবী এবং তার বস্তুগুলোর ব্যাখ্যাই করতে চাননি, সেইসঙ্গে তাদের বদলাতে চেয়েছিলেন। পরিবর্তন অথবা ক্ষণিকবাদকে বৌদ্ধরাও মানেন, তবে মানুষ মার্কস-এর নির্ধারিত পথেই স্বেচ্ছায় বস্তুস্থিতিকে নিজের অনুকূলে পরিবর্তিত করতে পেরেছে। অনেক পয়গম্বরই নিজেকে শেষ পয়গম্বর বলে দাবি করেছেন। মার্কস্ নিজেকে পয়গম্বরও বলেননি, শেষ পয়গম্বর হবার দাবিও করেননি। 'পয়গম্বর'-এর সাধারণ অর্থ 'বার্তাবাহক'। এখানে বার্তার মানে হলো ভগবানের বার্তা। বুদ্ধ এবং মার্কস্ ঈশ্বর মানতেন

না, তাই তাঁরা ভগবানের বার্তাবাহক হতে পারেন না। কিন্তু পৃথিবীকে যে তাঁরা মহান বার্তা শুনিয়েছেন একথা কে অস্বীকার করতে পারে? বুদ্ধ তাঁর শান্তিময় উপদেশ দিয়ে মানবতার একটি বিরাট অংশকে সহস্রাব্দ পর্যন্ত সমৃদ্ধ করেছেন। আর মার্কস্ তো এখন তাঁর অসম্পূর্ণ যাত্রাতেই নিজের চিন্তার সুফল দিয়ে মানবতার এত বড় অংশকে সমৃদ্ধ করেছেন যা কখনো কোনো মহাপুরুষ করতে পারেননি।

বোম্বাই অথবা যে কোনো মহানগরই সংঘর্ষ, অশান্তি, দৌড়ঝাঁপ এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে পালানোর জায়গা। বেশি পরিচিত মানুষ থাকায় সেখানে অধিকাংশ সময় কথাবার্তা আর শিষ্টাচার প্রদর্শনে কেটে যায়। এমন জায়গায় থেকে লেখাপড়ার মত কোনো কাজ করা সম্ভব নয়, তবে এখন তো আমি তেমন কোনো কাজও করতে যাচ্ছিলাম না। সবার আগে দেশের প্রচুর জায়গা ঘুরে দেখা আর নতুন পরিস্থিতিকে বোঝা দরকার। ১ সেপ্টেম্বর বোম্বাই ত্যাগ করে এই কাজ করলাম। সেসময় রেলের অবস্থা খুব অনিশ্চিত ছিল, টিকিট পাওয়া সোজা ছিল না। তার ওপর রাশিয়া থেকে বিশেষ করে আমার বই লিখবার জন্য আনা সাড়ে তিন মণ বইও আমার সঙ্গে যাত্রা করছিল। সেদিন রাত সাড়ে আটটার সময় আমি প্রয়াগের উদ্দেশে রওনা হলাম। রাত কাটল। সকাল হতে দেখলাম চারদিকের মাটি শ্যামলিমায় ঢাকা। বোম্বাই নগরীতে মুক্ত প্রকৃতি দেখা সম্ভব ছিল না। এখানে তা বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছিল। খাবার জিনিস দুর্লভ এবং তা চারগুণ দামে বিক্রি হচ্ছিল। দুপুরের খাবার জনপ্রতি দেড়টাকায় পাওয়া গেল। সন্ধেবেলা রেস্তরাঁ-কারে ইউরোপীয় ভোজন করতে গেলাম। চার্জ তিনটাকা দু-আনা। কিন্তু সব জিনিস কেমন নীরস আর ছাড়া-ছাড়া লাগল। বেয়ারাদের না ছিল পরিবেশন করার ইচ্ছে আর না পরিষ্কার থাকার ইচ্ছে। তারা ভারত থেকে চলে যাওয়া ইংরেজদেরই বড় মানুষ মনে করত, কালো মানুষদের প্রতি তাদের মনোভাব আগে যেমন ছিল এখনও তাই।

প্রয়াগ—২ সেপ্টেম্বর দশটার সময় আমরা প্রয়াগ পৌঁছলাম। অনেক বন্ধু স্টেশনে এসেছিলেন। ড. বদরীনাথ প্রসাদের সঙ্গে আমি তাঁর বাংলোতে গেলাম। পাটনার ড. কাশীপ্রসাদ জয়সওয়ালের সঙ্গে একসময় আমার যেমন সম্পর্ক ছিল তেমনই প্রয়াগে ড. বদরীনাথ প্রসাদের সঙ্গে ছিল। তাঁদের সঙ্গে তাঁদের বাড়িতে আমি পুরোপুরি অকৃত্রিম আত্মীয়তা অনুভব করতাম। অনেক সময় ধরে ঘরের এবং বাইরের লোকের সঙ্গেও রাশিয়া যাত্রার বিষয়ে কথাবার্তা হতো। সম্ভবত ঠাণ্ডাদেশ থেকে ফিরে ছিলাম বলে জ্যাবজ্যাবে ঘাম কষ্ট দিচ্ছিল, পাখাই এর নিবারণ করতে পারত কিন্তু সেটা তো আর সঙ্গে নিয়ে ঘোরা যেত না।

প্রয়াগে প্রগতিশীল লেখকসংঘের আসন্ন সম্মেলনে আমাকে সভাপতি করা হয়েছিল। সম্মেলন ৬ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলল। ড. অমরনাথ ঝা উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। ভাষা এবং সাহিত্যের বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা অত্যন্ত স্বচ্ছ ছিল। মাতৃভাষার গুরুত্ব তিনি বুঝতেন। তাঁর মাতৃভাষা মৈথিলী প্রায় উপেক্ষিত ছিল বলে তাঁর মনে দুঃখ ছিল, সেই কারণেই অবধী, ব্রজ ইত্যাদি মাতৃভাষগুলির অবস্থা সম্পর্কেও তিনি ঠিকভাবে চিন্তা

করতে পারতেন। হিন্দি-উর্দুর প্রশ্নও উঠল। বস্তুত প্রশ্ন ছিল যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবকে নিয়ে। আমার মনে হয়েছিল যে হিন্দিলিপিতে উর্দু লেখা হলে এই সমস্যার অনেকটাই সমাধান হতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে, উর্দু আরবী লিপিতে প্রকাশিত না হোক। তবে হ্যাঁ, আরবী লিপিতে তাকে সীমিত রেখে বহুসংখ্যক পাঠককে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

এদিকে সম্মেলন হচ্ছিল, ওদিকে পাঞ্জাবের মারদাঙ্গার প্রভাব প্রয়াগের ওপরও পড়তে শুরু করল। ৫ সেপ্টেম্বর ছোরার আঘাতে একজন লোকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল। পরের দিন রাতের কার্ফিউ জারি হলো—বিনাপাসে মানুষের রাত্রিবেলা চলাচল নিষিদ্ধ হয়ে গেল। প্রথম রাতে আমাকে বাড়িতে পৌঁছনোর জন্য শ্রী শ্রীনিবাসজী তাঁর গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। কার্ফিউর সময়। ভাগ্যক্রমে জায়গাটা আমার বাসস্থান থেকে দূরে ছিল না।

পরের দিন পাঞ্জাবে সাধারণ জনতার মৃত্যুর খবর খুব বেশি করে শোনা যেতে লাগল। রেলযাত্রা নিরাপদ ছিল না। শান্তি বজায় রাখার কাজে সৈন্যদের সমানে স্থানান্তরে পাঠানো হচ্ছিল, তাই সহজে ট্রেনে জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না।

৮ সেপ্টেম্বর কবি সম্মেলনে সুমন এবং সর্দার জাফরির কবিতা সবার খুব পছন্দ হলো। পরের দিন গণ কবি-সম্মেলন হলো। রামকের এবং বংশীধর শুক্লর সরল অথচ হুল ফোঁটানো কবিতাগুলো সবার বেশ ভাল লাগল। গণ- কবিতার জনপ্রিয়তা দেখে অনেকেই তার নকল করছিল কিন্তু এইসব নকল অধিকাংশই ছিল খুব বাজে। যারা হৃদয়বান তাদের এইসব মিশ্রিত কবিতা শুনে বিরক্তি আসত। শিক্ষিত কবিদের পক্ষে গণকবি হওয়া আরো কঠিন কাজ ছিল কারণ অহংকারের জন্য তারা নিরক্ষর গণকবির পায়ের কাছে বসতে রাজি হতো না।

বেনারস—প্রয়াগ থেকে বেনারস যাবার জন্য বড় এবং ছোট দুরকম লাইনই ছিল। দিল্লীতে এইসময় ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল, সে-কারণে বড় লাইনে যাত্রা করা বিপজ্জনক ছিল। আমি ১১ সেপ্টেম্বর ছোট লাইনে রওনা হলাম। মহাদেব ভাই এবং শ্রীনাগার্জুন সঙ্গে ছিলেন। বেনারসে শ্রীঅমৃতরায়ের বাসায় গেলাম। এর আগে পিতরকুণ্ডায় থাকতে তাঁকে দেখেছি। এখন তিনি গোধুলিয়ায় একটি বাড়িতে উঠে এসেছেন। এখানে প্রেসও ছিল। উনি এখন এখানেই থাকবেন। কিন্তু ব্যবসা স্বয়ং তার স্থান ঠিক করে, তাই পরে অমৃত রায় প্রয়াগে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর মা শিবরানী দেবী কাশীবাস করার জন্য গোধুলিয়ায় থেকে গেছেন।

বেনারসে চারদিন থাকার কথা। এর মধ্যে ১২ সেপ্টেম্বর সারনাথ ঘুরে এলাম। বন্যা হয়ে রাস্তার এক জায়গায় বরুণার জল উঠে এসেছিল। বেনারস থেকে সারনাথের রাস্তা এত খারাপ আগে কখনো দেখিনি। ঠিকেদারদের হাতে রাস্তা তৈরির কাজ কেমন হয় সে অভিজ্ঞতা আমার আগে হয়েছিল। বিহারে জেলাবোর্ড যখন বেসরকারি হলো তখন ঠিকেদারির কাজ নিজের নিজের লোকদের দেওয়া হতে লাগল, যারা বেশিরভাগ টাকা নিজেদের পকেটেই রাখতে চাইত। কাঁচা ইটের মতো অকেজো জিনিস দিয়ে রাস্তা পাকা

করত, যা ছ'মাসের বেশি টিকত না। ঠিকেদারদের লুঠ আরো বাড়ছে। ঘুষের বাজার গরম, লুঠের ভাগ কিছু দিলেই ইঞ্জিনিয়ার-ওভারসিয়াররা কাজ পাশ করে দেয়। কার দায় পড়েছে মজবুত কাজ করার!

সারনাথে সাত-আটজন ভিক্ষুর সঙ্গে দেখা হলো। বর্মী ধর্মশালায় কিত্তিমা বাবাকে অসুস্থ দেখে দুঃখ হলো। এখন তিনি আর যুবক নেই, বৃদ্ধ হয়েছেন। বর্মার পরিস্থিতি এখন অনিশ্চিত ছিল, তাই জন্য অর্থকষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। মহাবোধি হাইস্কুলে সাড়ে তিনশো ছাত্র পড়াশোনা করে। ছাত্রদের সামনে ভাষণ দিয়ে বিকেল চারটের সময় বেনারস ফিরে এলাম।

বিসরাম আর এই দুনিয়ায় নেই—১৩ সেপ্টেম্বর এই খবর শুনে ভীষণ মানসিক আঘাত পেলাম। বিসরাম আজমগড়ের এক তরুণ বিরহী কবি। এমন কবি খুব কমই জন্মায়। মাতৃভাষা ভোজপুরীতে তিনি কবিতা রচনা করতেন, কবি হবার জন্য নয়। 'স্বান্তঃসুখায়'ও তিনি কবিতা রচনা করতেন না, কারণ তাঁর কবিতা সুখের জন্য নয়, দুঃখের জন্য রচিত হতো। তারুণ্যে পত্নীবিয়োগ হওয়ায় বিরহ তাঁকে পাগল করে তুলেছিল। পৃথিবীর যে কোনো জিনিস দেখলেই তাঁর প্রিয়তমাকে মনে পড়তো। সরল, সাধারণ বিরহা[১] রচনা করে নিজের মনে গুনগুন করতেন। কাগজে লেখার জন্য তিনি এইসব বিরহা রচনা করেনি, তাঁর ইষ্টদেবীকে পুজো করার জন্য শব্দ দিয়ে মালা রচনা করেছিলেন। একান-ওকান হতে হতে তাঁর বিরহা জনসমক্ষে আসে এবং লোকেরা এইসব অমূল্য রত্নগুলি পরখ করে দেখে। বিসরাম তাঁর সমস্ত গীত মনে রাখতে পারতেন না, যা মনে ছিল সেগুলোকেও লিপিবদ্ধ করার পুরো চেষ্টা করা হয়নি। সময়ে সময়ে লিখে রাখা গোটা কুড়ি বিরহা একত্রিত করা সম্ভব হয়েছিল। বিসরামের রচনা হিসেবে শুধু সেগুলিই আছে এবং তার কৃতিত্ব শ্রীপরমেশ্বরী লাল গুপ্তকে দেওয়া উচিত। আমরা যারা বিসরামের আর কোনো বিরহা একত্রিত করতে পারিনি তারা সকলেই অপরাধী। কিন্তু কে জানত যে এই বিরহী কবি মাত্র ২৫-২৬ বছর বয়সে মারা যাবেন? তাঁর বিরহাগুলিই বলে দিত যে, যে বাড়বাগ্নি তার হৃদয়ে ধূ ধূ করে জ্বলছে তা তাঁকে বেশিদিন আর বাঁচতে দেবে না।

ড. মঙ্গলদেব শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা না করলে বেনারস আসা সম্পূর্ণ হতো না। তিনি আমার অনেক দিনের পুরনো সহৃদয় বন্ধু। বছরখানেক পরেই তাঁর পেনশন নেবার কথা। সরকারি সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষরূপে তিনি বহু কাজ করেছেন। গোঁড়াদের দুর্গকে তিনি মুক্ত হয়ে নিঃশ্বাস নেবার যোগ্য করে তুলেছিলেন। একথা ঠিক যে গঙ্গার প্রবাহকে উল্টোদিকে বওয়ানো যায় না। যে কোনো সংস্থারও সময়ের প্রবাহের সঙ্গেই সামনে এগিয়ে যেতে হয়। কয়েকজন সাধু বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমাদের ভবিষ্যৎ কী?'

আমি জানিয়েছিলাম, 'আপনাদের এবং সংস্কৃতের গভীর পাণ্ডিত্যের ভাগ্য একই

[১] বিহার ও উত্তর-প্রদেশের এক ধবনেব জনপ্রিয় লোকগীত।—স.ম.

সঙ্গে বাঁধা। স্বাধীন ভারতে আজকের আর্থিক পরিস্থিতি এবং ভাষার সহজবোধ্যতার কারণে এইসব ছাত্ররা সংস্কৃত পড়া ছেড়ে দেবে—যারা অন্য কোনো শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়ে এতদিন সত্রের রুটি খেয়ে সংস্কৃত পড়ছিল। পড়ুয়ারাও তিরিশ বছর ধরে সংস্কৃত সাধনা করবে না। অন্যদের মত তারাও বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে পড়া শেষ করে কোনো কাজ হাতে নেবে। তবে নিরাশ হবার প্রয়োজন নেই। সাধু ব্যক্তি পঁচিশ-তিরিশ নয়, তাঁর সারা জীবনই বিদ্যা অধ্যয়নের কাজে ব্যয় করতে পারেন। তাঁরাই গভীর পাণ্ডিত্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন। সংস্কৃত বিদ্যা এখন 'বৈ সাধুং আজগম গোপায় মাঁ শেবধিষ্টেংহমস্মি' বলতে বলতে আপনাদের কাছে আসবে। আর এই সম্পদ রক্ষা করতে আপনাদের প্রয়োজনকেও লোকে স্বীকার করবে।'

ছাপরা—বেনারস থেকে তিনদিনের জন্য আমি ছাপরা গেলাম। ১৪ তারিখ রাতের ট্রেনে রওনা হয়ে ১৫ তারিখ সকালে বালিয়া পৌঁছলাম। বালিয়া চোখে পড়তেই হ্যায়লেট-এর অত্যাচারের কথা মনে পড়ে গেল। ১৯৪২-এ ইংরেজরা বালিয়া জেলার ওপর তেমনি অত্যাচার করেছিল যেমন তারা মার্শাল-ল-এর দিনগুলোতে পাঞ্জাবের ওপর করেছিল। বালিয়াবাসীরা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে সেই অত্যাচারের মোকাবিলা করেছিল, তাদের স্বাধীনতার ভাবনাকে তারা চাপা পড়তে দেয়নি। বালিয়ার সাহসী বক্তা চিত্তু পাণ্ডেকে মনে পড়ছিল। ভোজপুরীতে এমন বক্তা সম্ভবত আর কখনো জন্মাননি। ৪২-এর আন্দোলনে তিনি একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। যখন আন্দোলন চাপা পড়ল এবং ধরপাকড় শুরু হলো, তখন চিত্তু পাণ্ডে মোষের ব্যাপারী সেজে অন্য জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, যেখান থেকে পুলিশ তাঁকে ধরে আনে।

সামনে সুরেমানপুরের আগে এক জায়গায় বৃষ্টির জন্য রেলপথ বসে গিয়েছিল। ট্রেন সেখানেই থেমে গেল। এক ফার্লং হেঁটে যেতে হলো। যদিও মেরামতের কাজ দু-এক ঘণ্টাতেই করা যেত, তবু এমন কাজ করে কি করে রেলের লোকেরা তাদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে? বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে অন্য একটা ট্রেনে চড়ে আমরা দুটোর সময় ছাপরা পৌঁছলাম। বালিয়ায় বন্যায় আর ছাপরায় কম বৃষ্টির জন্য ফসলের ক্ষতি হয়েছিল। ছাপরায় সর্বদা আমার থাকার জায়গা ছিল পণ্ডিত গোরখনাথ ত্রিবেদীর বাড়িতে। অসহযোগের সময় থেকে আন্দোলনে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। পরে তিনি উকিল হয়ে ওকালতি শুরু করেন। তখন থেকেই আমি সব সময় তাঁর বাড়িতে থেকেছি। শ্রীত্রিবেদী এমনিতে খুবই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কিন্তু কোনো কাজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নিয়ে থাকেন। শহরের ভেতর যখন সস্তায় জমি পাওয়া যাচ্ছিল তখন তিনি আজ নয় কাল করে কাটিয়ে দিলেন। জমি যখন নিলেন তখন শহরের বাইরে একটা বাগানের মধ্যে নিলেন যেখানে চোরেরা চুরি করবার জন্য সবসময় তাঁর বাড়িটাকে হাতে পেত। একাধিকবার সেখানে চুরি হয়ে গিয়েছিল। সেই বাগানবাড়িতে আমরা উঠলাম। পাঞ্জাবের দাঙ্গার খবর সংবাদপত্রের মাধ্যমে এখানেও এসে পৌঁছেছিল, যে কারণে চারদিকে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। সেইসময় তো মনে হচ্ছিল

সেবা করেছেন তা অদ্বিতীয়। গণজাগরণ এবং অনেক প্রাণের বলিদানের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। গণজাগরণে সব থেকে বড় ভূমিকা গান্ধীজীর। একথাও মানতে আপত্তি নেই যে গান্ধীজীর মতো প্রভাবশালী মহাপুরুষ যদি আর্থিক স্বাধীনতার লক্ষ্যে লেগে পড়েন তাহলে অনেক কাজ হতে পারে। কিন্তু তাতে বাধা অনেক। শিল্প-ব্যবসা এবং কারিগরি দুইই একে অপরের পরিপূরক হতে পারে। সোভিয়েত দেশেও হাতের কাজকে উপেক্ষা করা হয় না। তাকে অনেকগুণ বাড়ানো হয়েছে। হ্যাঁ, কলকারখানার সঙ্গে হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা করতে যায় না। শিল্পকলার জিনিস উৎপাদন করে। এছাড়া দেশের আর্থিক স্বাধীনতায় নানান স্বার্থ অত্যন্ত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যাদের দমন করতে না পারলে আমরা উন্নতি করতে পারবো না। গান্ধীজী যে এত বড় পরিবর্তন আরো দ্রুত আনার জন্য প্রস্তুত হবেন তাতে সন্দেহ আছে।'

রোজ তিন-চারটে করে সর্বজনীন বক্তৃতা দিতে হতো। এর থেকে মাঝে মাঝে সময় বার করে আমি বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। সোস্যালিস্ট পার্টির লোকেরা এখানেও আমাকে বয়কট করে রেখেছিল, কিন্তু আমার পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা না করে কি করে পাটনা ছাড়ি? সোস্যালিস্ট পার্টির অফিসে গেলাম, সেখানে সব মুখই নতুন দেখলাম। তারপর খোঁজ করে আমার বন্ধু গঙ্গাশরণের বাড়ি গেলাম। তার সঙ্গে অনেকক্ষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষয়ে কথা বললাম। তিনি বলছিলেন, 'হিন্দুরা স্ত্রীদের ওপরও ভয়ানক অত্যাচার করছে।' আমার ইচ্ছে ছিল, রাজনৈতিক বিষয়ে, বিশেষ করে কমিউনিস্ট আর সোস্যালিস্টদের কাছাকাছি আনার বিষয়ে কিছু বলি, কিন্তু তার সুযোগ পেলাম না। নেতারা তার প্রয়োজন বোধ করছিলেন না। ২০ তারিখ ইউনিভার্সিটি আর মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের দুটো সভায় বক্তৃতা দিতে হলো। সেই রাতেই পৌনে দুটোর সময় আমি আর মহাদেবজী কলকাতার উদ্দেশে রওনা হলাম।

দেশ পরিক্রমা

২১ সেপ্টেম্বর সওয়া বারোটার সময় আমাদের ট্রেন হাওড়া পৌঁছল। সেই ট্রেনে বেরিলির এক ইমাম সাহেব সপরিবারে যাত্রা করছিলেন। ভারতের ভেতরে এবং বাইরে যে মারামারি-কাটাকাটি চলছিল তার জন্য ভীত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। শেষমেশ এইসব দাঙ্গার সময় আমাদের সমাজের অবস্থা যেন ভূমিকম্প চলাকালীন মাধ্যাকর্ষণের মত হয়ে যায়। মানুষের প্রাণের কোনো মূল্য থাকে না। ধর্মের নামে কত যে হত্যা হয়! সাক্ষী-সাবুদ পাওয়া যায় না বলে ইচ্ছে থাকলেও আদালতের পক্ষে ন্যায় বিচার করা সম্ভব হয় না। পুলিশেরও একতরফা সহানুভূতি থাকে, অথবা তারা কিছু করতে অসমর্থ হয়। কলকাতায়

আলিপুরে আমরা ব্যারিস্টার স্নেহাংশু কুমার আচার্যের অতিথি হলাম। শহর থেকে দূরে হলেও লোক দেখাসাক্ষাৎ করতে আসতেন।

২২ তারিখ ডঃ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করলাম। সেদিনই গণনাট্য সংঘ তাদের কিছু গান, অভিনয়, নানাধরনের লোকগীত এবং লোকনৃত্য পরিবেশন করল। 'লাওনি' এতদিন পর্যন্ত মহারাষ্ট্র এবং হিন্দিভাষী লোকেদের নিজস্ব জিনিস বলে ধরা হতো কিন্তু এখানে বাংলাদেশে তাকে এমন সুন্দরভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল যে, দেখে মনে হচ্ছিল আমাদের গণশিল্প খুব ভালভাবেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গৃহীত হতে পারে।

মির্জা মেহমুদ আমার ইরানের অকৃত্রিম বন্ধু। তেহরানে আমার সাতমাসের অবস্থানে তিনি আমাকে যে সাহায্য করেছিলেন তার জন্য আমি চিরদিন ঋণী থাকব। সেখানে খালিহাতে পৌঁছে আমি চারদিকে শুধু অন্ধকারই দেখছিলাম, তাঁর জন্যই তেহরান আমার নিজের বাড়ির মত হয়ে গিয়েছিল। মির্জা মেহমুদ কলকাতারই বাসিন্দা ছিলেন। পাকিস্তান হয়ে যাওয়ায় সন্দেহ হয়েছিল, তাঁর ইস্পাহানী বন্ধুদের মত হয়তো তিনিও সেখানে চলে গিয়েছেন। তবু তাঁর যে ঠিকানা আমার জানা ছিল সে ঠিকানায় তাঁকে খোঁজবার চেষ্টা করলাম। ভবঘুরে ব্যক্তি তার ভ্রমণকালে পদে পদে অন্য সহৃদয় ব্যক্তিদের সাহায্য পায়। এইসব উপকারের জন্য যে কোনোভাবে হোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে তার ইচ্ছে হয়, কিন্তু মুশকিল হলো এই যে, এইসব দয়ালু ব্যক্তি একবার কাছছাড়া হলে আর তাদের দেখা পাওয়া যায় না। আমার এই বন্ধুটির সঙ্গে দেখা করার বড়ই ইচ্ছে ছিল। অনেক দৌড়ঝাঁপ করে জানতে পারলাম তিনি আবার ইরানে ফিরে গেছেন। তারপরেও আমি সমানে চেষ্টা চালিয়ে গেছি—চিঠিপত্রে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হোক, কিন্তু তা হতে পারেনি।

২৩ সেপ্টেম্বর আমি পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। প্রাচীন স্নেহের প্রতিমূর্তি সরল সংস্কৃত-পণ্ডিতকুলের তিনি ছিলেন এক জীবন্ত প্রতিনিধি, যাঁর কাছে বিদ্যার সম্বন্ধই সবচেয়ে বড় সম্বন্ধ। তাঁর আচারজ্ঞান দেখে তাঁকে প্রাচীন বলে মনে হলেও চিন্তায় তিনি সম্পূর্ণ আধুনিক ছিলেন। কৌতূহল, অনুসন্ধান আর সত্য্ এই ছিল তাঁর কাছে সর্বাধিক মান্য। মহামহোপাধ্যায় সেই অকৃত্রিম বাৎসল্য নিয়ে দেখা করলেন, যেমন সর্বদা তিনি করতেন। অসঙ্গ-এর মহান গ্রন্থ 'যোগচর্যাভূমি' আমি তিব্বতে পেয়েছিলাম। মহামহোপাধ্যায় তার সম্পাদনার কাজ করছিলেন। তাঁর শরীর অত্যন্ত জীর্ণ হয়ে পড়েছিল, এদিকে প্রেস ভীষণই ধীরগতিতে কাজ করছিল। নিরাশ হয়ে তিনি বললেন, 'এ কাজ তো আমি শেষ করে যেতে পারব না, আপনার জন্য রেখে যাব।' একথা ভেবে আমার আনন্দ হয় যে ৪৭ সালে তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে আমার যে আশঙ্কা হয়েছিল, তেমন ঘটেনি। ১৯৫৬তেও তিনি আমাদের মধ্যে আছেন। 'যোগচর্যাভূমি'র কাজ তিনি এখনও করে যাচ্ছেন, যদিও তাঁর শরীরে এখন হাড় আর চামড়াটুকুই অবশিষ্ট আছে। সৌহার্দ্র প্রদর্শন করার জন্য তিনি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেন, আমার খুব কষ্ট হতো। বিদ্বান এবং গবেষকদের কাছে মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর

ভট্টাচার্য এক আদর্শ পুরুষ। তাঁর জ্ঞান এবং শক্তিকে আমাদের দেশ পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারল না এটা ভাবলে দুঃখ হয়।

২৪ সেপ্টেম্বর আমি পার্টির গড়া হাসপাতাল দেখতে গেলাম। কলকাতার শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ বামপন্থী চিন্তাধারার প্রতি সহানুভূতিশীল। পার্টির প্রভাবে এসে ওখানকার তরুণ ডাক্তাররা হাসপাতাল করতে সাহায্য করেছেন। মাত্র তিন-চার বছর হলো হাসপাতাল তৈরি হয়েছে কিন্তু এরমধ্যেই প্রভূত উন্নতি করেছে। চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার ভাল ব্যবস্থা এখানে আছে। পার্টি-মেম্বারদের চিকিৎসা তো হয়ই, বাইরের রোগীদের দেখাশোনারও ভাল ব্যবস্থা আছে। আজকাল যেখানে টাকা রোজগারের লোভে ডাক্তার এবং হাসপাতালের কর্মচারীদের হৃদয়হীন ব্যবহার দেখা যায়, সেখানে এই হাসপাতালটি একটি আদর্শ সংস্থা রূপে বিদ্যমান। সেদিনই দুপুরে আমি বাংলার মহাকবি নজরুল ইসলামকে দেখতে গেলাম। কবির বয়স এখন ৪৯ বছর। ৬ বছর আগে তাঁর মস্তিষ্ক নির্জীব হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে তিনি জীবন্মৃত অবস্থায় আছেন। যে মস্তিষ্ক একদিন অগ্নিবীণা বাজিয়েছিল আজ তা অকর্মণ্য হয়ে গেছে। নির্জীব হয়ে যাওয়ায় তিনি কি আর সুখ-দুঃখ অনুভব করতে পারেন? আজকের সমাজের পক্ষে এটা কি গৌরবের কথা যে, তাঁর বই বিক্রি করে লোকে লাভ করছে কিন্তু কবি আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন? তাঁর স্ত্রী প্রমীলাদেবীও দু-এক বছর আগে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছেন। দুইপুত্র লেনিন এবং সান-ইয়াত্-সেন পিতামাতার এই দুঃসহ জীবনের অংশীদার। সেইঘর সুখী এবং প্রাণবন্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেখানে চারদিকে দেখা যাচ্ছিল দুঃখ এবং অসহায়তা।

কটক—কলকাতার ব্যস্ত প্রোগ্রাম শেষ করে ২৫ সেপ্টেম্বর আমরা মাদ্রাজ মেলে কটক রওনা হলাম। ছটা নাগাদ কটক পৌঁছলাম। শ্রীশরদ পট্টনায়ক এবং অন্যান্য সঙ্গীরা স্টেশনে ছিলেন। কটক স্টেশন দিয়ে আগেও অনেকবারই গিয়েছি কিন্তু কটকে থাকার সুযোগ এই প্রথম পেলাম। সেখানের উকিল শ্রীহরিহর মহাপাত্রের আতিথ্য পাওয়া গেল। কটককে একটুও শহর বলে মনে হয় না। এটা একটা বড় গ্রাম। বেশির ভাগ বাড়ির ছাতই খড়ের। আঁকাবাঁকা পথগুলিকে গ্রামের পথ বলে মনে হয়। এই গ্রামীণ পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে স্থানীয় মানুষের স্বভাবেও গ্রামীণ স্নেহ এবং সারল্য দেখা যায়। এই শহরটি একটি রাজ্যের রাজধানী যেখানে রাজ্য সরকারের পদস্থ অফিসাররা থাকেন কিন্তু এই গ্রাম্য পরিবেশে জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের তেমন পার্থক্য বোঝা যায় না, যেমন অন্য রাজ্যের রাজধানীতে দেখা যায়। অবশ্য আমি এটা ওপর ওপর দেখেই বলছি। ভুবনেশ্বরে উড়িষ্যার নতুন রাজধানী তৈরি হচ্ছে। শিং এবং রুপোর শিল্পদ্রব্যের জন্য কটক বিখ্যাত। এইসব জিনিসের প্রচুর চাহিদা হতে পারত কিন্তু আমাদের জনসাধারণ আজ যে আর্থিক স্তরে রয়েছে তাতে শিল্পীরা কোনোরকমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারলেই যথেষ্ট। রুপোর শিল্পীরা আমাকে একটি সিগারেট রাখার বাক্স আর একটি লাল ঝাণ্ডা উপহার দিল। তখনও আমার সিগারেট ছাড়তে কয়েক মাস দেরি ছিল, নাহলে হয়তো সিগারেটের

জায়গায় অন্য কোনো জিনিস পেতাম। সেই বাক্সটিতে জালির সূক্ষ্ম কাজ দেখে মুগ্ধ হলাম।

উড়িষ্যার শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর শ্রীত্রিপাঠীজীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হতে থাকল। রাশিয়ার শিক্ষা-প্রণালী শ্রেষ্ঠ কিন্তু আমাদের পরিস্থিতিতে তাকে কিভাবে গ্রহণ করা যায়? ভিখারিবাবু হস্তশিল্পের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু যেসব কারণে তার সম্যক উন্নতি হওয়া সম্ভব তা আমাদের দেশে নেই। র‍্যাভেনশ কলেজ উড়িষ্যার সবথেকে বড় এবং পুরনো কলেজ। ১৪০০ ছাত্রছাত্রী সেখানে পড়াশোনা করে। সেখানেও বলতে হলো। সাহিত্য-সমাজে উৎকল বিদ্বানদের সামনে সোভিয়েত দেশ সম্বন্ধে ভাষণ দিলাম। আমি হিন্দিতে ভাষণ দিচ্ছিলাম, কিন্তু শ্রোতাদের তাতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল না। বস্তুত, সুদূর দক্ষিণের চারটি ভাষা বাদ দিলে অন্য সমস্ত ভাষাই হিন্দির এত কাছাকাছি যে সংস্কৃতবহুল হিন্দি বুঝতে কারোর অসুবিধে হয় না। রাত আটটায় শ্রীকালীচরণ পট্টনায়কের নাট্যমন্দিরে 'রক্তমাটি' নাটক দেখতে গেলাম। ভাষা বুঝতে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি। যদিও সেটাই লেখাতে পড়তে হলে বোধহয় এত সহজ হতো না। উড়িয়া অক্ষরের সঙ্গে দেবনাগরীব মিল থাকলেও অর্ধেক জায়গা জুড়ে থাকা উপরের অর্ধবৃত্ত মাত্রা বড় বিভ্রম জাগায়। নাটক দেখতে দেখতে আমি চিন্তা করছিলাম যে, কটক তো যতই হোক একটা বড়সড় গ্রামই। তবু এখানে এই নাট্যমঞ্চ স্বাবলম্বী হয়ে বছরের পর বছর চলছে। এর কৃতিত্ব কালীচরণবাবুরই পাওয়া উচিত। রঙ্গমঞ্চের কাজে তিনি তাঁর সমস্ত পরিবারকে অর্পণ করেছেন। নাট্যশালার জন্য কোনো বড় পাকাবাড়ি ছিল না। দর্শকদের বসবার জন্য খড় দিয়ে ছাওয়া মণ্ডপ ছিল আর রঙ্গমঞ্চও ছিল একইরকম খড়ে ছাওয়া। সাজসজ্জা এবং অন্যান্য সামগ্রীও অল্পব্যয়সাধ্য ছিল। এই নাট্যশালাটি দেখার পর বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম যে হিন্দি নাট্যশালার জন্য 'ন মণ তেল'-এর শর্ত লাগানো কাজের কথা নয়। পাটনা, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, কানপুর অথবা দিল্লীতে হিন্দি রঙ্গমঞ্চ বানানোর কথা ভাবলে প্রথমে লাখ লাখ টাকার বাড়ি বানানোর প্রকল্প নেওয়া হয়। যদি সে কাজে আমরা সফলও হই, শুধু তাতেই কি রঙ্গমঞ্চ অমর হতে পারে? আসলে সত্যিকারের শিল্পী যদি নিজের সর্বস্ব সমর্পণ করে দিতে প্রস্তুত থাকে তবে লাখটাকার বাড়ি এবং সাজসজ্জা ছাড়াই রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হতে পারে। উড়িষ্যার রঙ্গমঞ্চ দেখার পর আমার এমন বিশ্বাস হলো। পুরুষদের অভিনয় করা কঠিন কাজ নয় কিন্তু নাটক-পাগল মানুষটি তাঁর পরিবারের মেয়েদেরও অভিনয়ের জন্য তৈরি করেছিলেন। এ বড় সাহসের কাজ। আমি কখনো অভিনয়, সংলাপ এবং সঙ্গীতের কৌশল, সৌন্দর্য আর মাধুর্য দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম, আবার কখনো বা উড়িয়া ভাষায় নানান প্রাচীন ক্রিয়ারূপের ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম। যেমন 'লিখন্তি' শব্দের প্রয়োগ। উড়িয়া সঙ্গীতের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। মুসলমান আমলের আগে উত্তর এবং দক্ষিণের সঙ্গীতে অবশ্যই প্রভেদ থেকে থাকবে। দক্ষিণী সঙ্গীত আজও অনেকাংশে তার শুদ্ধরূপে উপস্থিত রয়েছে, যেখানে উত্তরের সঙ্গীত মুসলমান আমলে বিদেশী প্রভাবে নিজেকে সুন্দরভাবে বিকশিত করেছে। উড়িষ্যা কয়েক শতাব্দী পরে মুসলমান শাসনে এসেছিল,

তাই সেখানের শিল্প ও সঙ্গীত মুসলমান প্রভাবে কম প্রভাবিত হয়েছে। এখানের সঙ্গীত উত্তরের সঙ্গীত।

কটকে একটি নয়, দু-দুটি নাট্যশালা চলত এবং দুটিই স্বাবলম্বী ছিল। দ্বিতীয় নাট্যশালাটি কালীচরণবাবুর সহকারীরা স্থাপন করেছেন।

সেসময় উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব এবং অপর প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো। তাঁদের সঙ্গেও কথা হলো। দেশের আর্থিক সমস্যা এবং উড়িষ্যার আদিবাসীদের ব্যাপার নিয়ে বিশেষভাবে আলাপ-আলোচনা হলো। আদিবাসীদের শিক্ষার জন্য একশো পাঠশালা খোলার পরিকল্পনা ছিল কিন্তু তখন পর্যন্ত দশটি খোলা হয়েছিল। আমি সোভিয়েতের উদাহরণ দিয়ে বললাম যে, লিপি তৈরি করে ওদের নিজের ভাষাকেই যদি শিক্ষার মাধ্যম করে তোলা যায় তবেই তার স্থায়ী প্রভাব পড়বে। এমনিতে আমাদের গোটা দেশটাই অভাব এবং দারিদ্রের শিকার, তার মধ্যে উড়িষ্যার অবস্থা সব থেকে করুণ। স্থানীয় নেতাদের সেদিকে দৃষ্টি পড়েছে, তবে সাফল্যের মুখ দেখা যাচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, 'ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আমরা পঞ্চায়েতি চাষও আরম্ভ করিয়েছি। কিন্তু সেই কাজ চালানোর জন্য যেসব অফিসার এবং অন্যান্য লোক রাখা হলো তারা সব পয়সা উড়িয়ে বসে পড়ল। এখন ভাবছি সরকারি চাকরদের হাতে না দিয়ে গণ-নির্বাচিত লোকেদের হাতেই এ কাজ দেওয়া ভাল। যদি তারা খায়ও তবুও তো তারা জনতারই লোক।' মহতাব যে সামান্য একটা কথাও ঠিকভাবে চিন্তা করতে পারেন না তা এর থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে বিনেবার 'ভূদান'-এর ব্যর্থতাকে খোলাখুলি ঘোষণা করে দিলেন। ২৭ সেপ্টেম্বর টাউন হলে অধ্যাপকদের সভা হলো। সেখানে আমি সোভিয়েত শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে বললাম।

শ্রীআর্তবল্লভ মহান্তি উড়িষ্যার এক বৃদ্ধ মহাপণ্ডিত। সংস্কৃত এবং উৎকল দুই সাহিত্যেরই তিনি বিদ্বান এবং অনুরাগী। অনেক তালপাতার পুঁথি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। মুসলমানদের সঙ্গে কাগজ আসার আগে আমাদের দেশে স্থায়ী নথিপত্র, পুস্তক তালপাতার ওপর লেখা হতো, আর টুকরো-টাকরা লেখা হতো ভূর্জপত্রে। উত্তরের লোকেরা তালপাতার ওপর কালি দিয়ে লিখত আর দক্ষিণের লোকেরা তামার সাহায্যে তালপাতার ওপর অক্ষর খোদাই করে তাতে কাজল ঢেলে দিত। উত্তর-দক্ষিণের সীমারেখা এবং উত্তর-দক্ষিণের ভাষার সীমারেখা এক নয়। ভাষার দিক দিয়ে উড়িষ্যা যদিও উত্তরের অঙ্গ তবু এখানে তালপাতার ওপর তামা দিয়ে লেখা হয়। তামা দিয়ে তালপাতায় লেখার প্রথা আজও দক্ষিণে এবং উড়িষ্যাতে প্রচলিত রয়েছে, যদিও মুদ্রণের কারণে এখন তা কমে গেছে। উড়িয়া ভাষা যদিও উত্তরের ভাষা তবুও কিছু কিছু উচ্চারণ দক্ষিণী ভাষার সঙ্গে মেলে। এর কারণও আছে। মারাঠী এবং উড়িয়াভাষীরা সবার পরে দ্রাবিড়ভাষী থেকে উত্তর-ভাষাভাষী হয়েছিল।

কটক ছোট শহর হলেও সভা-সমিতি প্রচুর। সেদিনই ব্রাহ্মসমাজে প্রাতঃস্মরণীয় রামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বলতে হলো। এছাড়া টাউন হলে শ্রীমহতাবের

—১৯৪৭—

সভাপতিত্বে বড় একটি সভায় বলতে হলো রাশিয়ার বিষয়ে।

বালাসোর—সেদিন রাতেই মহাদেবভাই-এর সঙ্গে বালাসোরের উদ্দেশে রওনা হলাম, পরের দিন সকাল ছটায় সেখানে পৌঁছোলাম। এখানেও ডিগ্রি কলেজ আছে। কলেজে ছাত্রছাত্রীদের সামনে দশটার সময় ভাষণ দিতে হলো। বালাসোরের সঙ্গে বিপ্লবের সময়ের বহু সুন্দর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এখানেই কয়েকজন বীর-বিপ্লবী ইংরেজ শক্তির সামনে রুখে দাঁড়িয়েছিল, এবং মরণাপন্ন আহত বিপ্লবী পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, 'আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।' সে শান্তিতে মৃত্যুবরণ করেছিল। আরো কত বীর তাদের তরুণ জীবন উৎসর্গ করেছে। কিন্তু এইসব আত্মদান কি বিফলে গেল? আজ যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তার মূলেই তো ছিল এইসব নিবেদিত প্রাণ।

সমুদ্রতট থেকে সাত মাইল দূরে একটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর জায়গায় বালাসোর অবস্থিত। সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি চারদিক সবুজ হয়ে ছিল। ৬ ঘণ্টার মধ্যে আমরা কিছু জায়গা ঘুরে দেখলাম, তারপর বারোটার ট্রেন ধরে খড়্গপুর পৌঁছলাম।

ওয়ার্ধা—খড়্গপুর থেকে মহাদেবভাই কলকাতা রওনা হলো আর আমি ওয়ার্ধা যাবার জন্য বম্বে মেল ধরলাম। ভিড় এতো বেশি ছিল যে সেকেন্ড ক্লাশে, যা এখনকার ফার্স্ট ক্লাশ, জায়গা পাওয়া গেল না। রাতের যাত্রা, ঘুমোনোও দরকার ছিল, তাই সওয়া পঁচিশ টাকা আরো খরচ করে রাতটুকুর জন্য ফার্স্টক্লাশে আশ্রয় নিলাম। দিনের বেলা বিলাসপুর পৌঁছতেই আবার সেকেন্ড ক্লাশে জায়গা পেয়ে গেলাম।

২৯ তারিখে আমি ছত্রিশগড়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। বর্ষার শেষ, তাই সেই সময়ের নয়নাভিরাম শ্যামলিমা দেখে প্রকৃতির সঠিক চেহারা আন্দাজ করা সম্ভব ছিল না। তবে সবুজ জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়গুলোই বলে দিচ্ছিল—এখনকার জমি উর্বর। এখানে-সেখানে সবুজ ধানের খেতে ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। আমাদের ট্রেন নাগপুর পৌঁছল। স্টেশনে ছিল হাজার হাজার মুসলমান নরনারীর ভিড়। নিজেদের নিরাপত্তাহীন মনে করে তারা হায়দ্রাবাদ যাবে বলে এখানে এসেছিল। হায়দ্রাবাদ এখন নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করছিল। ইংরেজ যাবার সময় তাকে সে-রকমই করে দিয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের উদরে কতদিন এই স্থিতি সম্ভব? গুজরাটের সৌরাষ্ট্রে জুনাগড়ের নবাব পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল, পাকিস্তানও তা স্বীকার করে নিয়ে ভারতকে যুদ্ধের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। দেশের এই অবস্থা খুবই বিপজ্জনক ছিল। ইংরেজদের চলে যাওয়া মাত্র দেড়মাস হয়েছে, আমাদের লোকেরা শাসন এবং সেনা কোনোটাই ঠিকমত পরিচালনা করতে পারছে না। চারদিকে এসময় আগুন লেগে গিয়েছিল। ইংরেজ সৈনিক-অফিসাররা এখনও বড় বড় পদে নিযুক্ত ছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা ইংরেজ শাসনকে ভারত-ছাড়া করেছে, তাই ইংরেজদের সহানুভূতি পাকিস্তানের দিকে থাকলে আশ্চর্যের কি? তখন এবং এখন[১] (ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬)-এর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

[১] 'এখন' অর্থে লেখক আলোচ্য বিষয়ের রচনা কালের কথা উল্লেখ করেছেন।—স·ম·

সেসময়ের ভয়ঙ্কর তুফান ভালভাবে পেরিয়ে ভারত আজ যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশের কর্ণধার এখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অবিশ্বাস করতে রাজি নন, যদিও ভারত সম্পর্কিত প্রতিটি আন্তর্জাতিক সমস্যার ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজদের বিরোধীপক্ষে দেখতে পান। আমি অথবা অন্য কোনো ভারতীয় লেখক যদি আমাদের উত্তর সীমান্তের নকশা দেখতে চান, তাহলে সৈনিক এবং রাজনৈতিক কারণ দেখিয়ে সার্ভে ডিপার্টমেন্ট তা দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু কোনো ইংরেজ অফিসার বিনা বাধায় তা পেয়ে যায়।

সন্ধে ছটার সময় আমি ওয়ার্ধা রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতিতে উপস্থিত হলাম। আনন্দজীর তদারকিতে সমিতি তার কাজে অনেক উন্নতি করেছে। ওয়ার্ধা থেকে বাইরে পাঁচ একর জমির ওপর প্রায় এক লাখ টাকার বাড়ি বানানো হয়েছে। আমাদের স্বাধীন দেশের হিন্দির খুবই প্রয়োজন রয়েছে, আর প্রয়োজনীয় কাজের জন্য চেষ্টা করলে তা দ্বিগুণ ফল দেয়। সেকারণেই মাত্র কয়েক বছর আগে সাধারণ এক ভাড়া ঘরে যে সমিতি শুরু হয়েছিল আজ তা এত উন্নতি করেছে।

ওয়ার্ধাতে আমার মাত্র দুদিন থাকার কথা ছিল। প্রথমদিন তো সমিতিতেই আমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গেলাম। পরের দিন (৩০ সেপ্টেম্বর) দর্শনীয় স্থানগুলো দেখতে গেলাম। মগনবাড়ি গান্ধীবাদী শিল্প-বাণিজ্যের একটা বড় কেন্দ্র। হাতে তৈরি জিনিসের একটা নিজস্ব শৈল্পিক গুরুত্ব আছে এবং শিক্ষা ও সমৃদ্ধি অনুসারে তার অনেক উন্নতির অবকাশ রয়েছে। কিন্তু গান্ধীবাদ চায় তা আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের স্থান গ্রহণ করুক। এটা কি প্রস্তরযুগের সঙ্গে বিদ্যুৎযুগের প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়ায় না? এখানে সংগ্রহশালায় অনেক পুরনো ধরনের চরকা রাখা আছে। মাদ্রাজের প্রকাশম্-মিনিস্ট্রি একটা অ্যালুমিনিয়মের চরকা বানিয়ে পাঠিয়েছিল। পুরনো দিনের চরকাগুলোব সঙ্গে সেটাকে মানাচ্ছিল না। মিলের বাজে কাগজ দিয়ে তৈরি হাতে বানানো কাগজ দেখে অদ্ভুত লাগল। গুড়, তেল, চাল, আটাপেষার কল, উদূখল আর চাকিও ছিল সেখানে। মগনবাড়ি আগে শেঠ যমুনালাল বাজাজের বাড়ি ছিল। তিনি সেটা গান্ধী শিল্পশালা বানানোর জন্য দান করেছিলেন। শেঠ খদ্দর এবং হস্তশিল্পের ভক্ত হলে খারাপ কিছু ছিল না। কিন্তু চিনি এবং কাপড়ের মিলমালিকদের এই প্রেম দেখে একটু অদ্ভুতই লাগছিল।

দুপুরের পর সেবাগ্রাম গেলাম। ওয়ার্ধায় এক্কা নেই, টাঙ্গা আছে। তবে সমস্ত ঘোড়াই ভীষণ রোগা। সেদিন যে টাঙ্গাটি আমাদের জুটেছিল তার ঘোড়াটি পুরস্কার পাবার যোগ্য। অনেক বছর আগে ছাপরায় রাজাপুরের মোহান্তর গরুর গাড়ি আর হাতির পাল্লায় পড়েছিলাম। সেগুলোকে আমার সময় মারবার মেশিন মনে হয়েছিল। এই টাঙ্গাটাও ঠিক তেমনি। তিন-চার মাইল দূরে অবস্থিত গান্ধীজীর আশ্রমে পৌঁছতে কত সময় যে লাগিয়ে দিল তার ঠিক নেই। কতদিন হয়ে গেছে গান্ধীজী এই আশ্রম ছেড়ে গেছেন। আশ্রমের সর্বত্র বিষণ্ণতা চোখে পড়ছিল। শিক্ষা-সংঘ আর চরকা-সংঘ না থাকলে অবস্থা আরোই খারাপ হতো। গোশালার অবস্থাই সবথেকে ভাল দেখলাম। আশ্রমে এখনও কিছু মানুষ থাকছিল তবু প্রতিটি ইট কাঠ থেকে দুঃখ ঝরে পড়ছিল। ফেরার সময় সামনে

হনুমান-টেকরিতে সাধুর আখড়া দেখলাম। আমার মুখ থেকে অনায়াসে বেরিয়ে এলো—এই হলো রেজিস্ট্রি করা আর না-করা মার্গের মধ্যে পার্থক্য। একদিকে রামানন্দপন্থী হাজার হাজার পর্ণকুটিরের মধ্যে এই একটি শত শত বৎসর ধরে মহানন্দে ঝাণ্ডা উড়িয়ে চলেছে, আরেক দিকে প্রতিষ্ঠাতার জীবনকালেই সেবাগ্রামের আশ্রম নষ্ট হতে বসেছে।

এখানে বেসিক শিক্ষারও কেন্দ্র ছিল। ১৪-১৫ জন ছাত্র সেখানে লেখাপড়া করত। প্রাদেশিক সরকারের ছাত্রবৃত্তি পাওযা যেত, যার জন্য বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এই তরুণরা এখানে পড়তে এসেছিল। পরের দিন রাজ্যপালের কেন্দ্রের উদ্ঘাটন করার কথা ছিল। পূর্ব বাংলা থেকে আসা এক তরুণ জানালো, 'আমি দুমাস হলো এসেছি, আমাকে এখন ভোজনালয়ের সুপারিনটেনডেন্ট করে দেওয়া হয়েছে।' বেসিক ট্রেনিং-এর প্রয়োগের জন্য আশপাশের গ্রামগুলিতে ছেলেমেয়েদের বেসিক বিদ্যালয় আছে। বেসিক বিদ্যালয় কেবলমাত্র একটা ভণ্ডামির ব্যাপার হলেও কিছু যায় আসে না কিন্তু স্বাবলম্বী শিক্ষার নামে এটা তো একটা খুব খরচসাপেক্ষ শিক্ষাপ্রণালী! কাজের সঙ্গে সঙ্গে পড়াতে গেলে খরচ কত বেশি পড়ে যায়? কিছুদিন পরে পরেই ছেলেমেয়েদের নিজেদের বাড়ি থেকে কাপড়, খাবার জিনিস এনে দিতে হয়। মা-বাবা স্বীকার করে যে যদি ফী দিয়ে অ-বেসিক স্কুলে পড়াতে হতো তাহলেও সস্তায় হতো। প্রত্যেক মাসেই দেড়টাকা করে খরচ প্রত্যেক মা-বাবাই বরদাস্ত করতে পারে না। গান্ধীজীর মুখ থেকে যে কথা বেরিয়ে গেল তা চোখবুঁজে পালন করতে গেলে এই পরিণামই হয়। গান্ধীজীর শিষ্যদের মধ্যে কুমারাপ্পার মত অর্থশাস্ত্রী, বিনোবার মত ভক্ত এবং মশরুবালার মত দার্শনিক ছিলেন। এঁরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে নতুন প্রয়োগ করছিলেন এবং সকলেই এখন আশ্রমের বাইরে ছিলেন। আশ্রমবাসীদের দেখে অকর্মণ্য পশুশালার ল্যাংড়া-নুলো গরুর কথা মনে পড়ছিল। পিপাসা পেয়েছিল। আমি কুঁয়োর জল খেতে চাইলাম কিন্তু আশ্রমবাসীরা সেই জল খেতে না দিয়ে ক্লোরিন মেশানো জল এনে দিল। অন্তত স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আশ্রম অবশ্যই আধুনিক যুগের নিয়ম মেনে চলছিল।

সেদিন দুটি ভাষণ দিতে হলো। যার মধ্যে একটি সোস্যালিস্ট পার্টির তরফ থেকে নেহরু ময়দানে দিতে হয়েছিল। সোস্যালিস্ট পার্টির এই সভা প্রোফেসর রঞ্জনের কর্তৃত্বে হয়েছিল। তরুণ রঞ্জনের কর্মক্ষমতা দেখে আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর প্রতিভা-রত্ন প্রদর্শনের জন্য বৃহৎ ক্ষেত্রে এসে পড়েছিলেন। অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর লেখনী চালিত হচ্ছিল। তাঁর শিক্ষাকৌশল এখন দেশের কাজে লাগছিল। তখন কি জানা ছিল যে রঞ্জন আর বেশিদিন তাঁর প্রতিভা দিয়ে দেশের সেবা করতে পারবেন না, অকালেই সব ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হবে?

১ অক্টোবর সকালে হিন্দিনগরেই ওয়ার্ধা থেকে একশোর বেশি শিক্ষিত ব্যক্তি এসেছিলেন। দুঘণ্টা ধরে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো। একটার সময় সাকসেরিয়া ব্যবসায়ী কার্যালয়ে ভাষণ দিতে হলো, আর সেদিনই ৩টে ৪০ মিনিটে ট্রেন ধরলাম। ইটারসি হয়েও জব্বলপুর যাওয়া যেত, কিন্তু আমরা গোঁদিয়ার লাইন ধরলাম। গোঁদিয়া

থেকে ছোট লাইন পেলাম। সমস্ত পথটাই ছিল জঙ্গল আর পাহাড়ের মধ্য দিয়ে। গাড়িতে খুব দুলুনি লাগছিল। আনন্দজীও সঙ্গে ছিলেন।

বুন্দেলখণ্ড—জব্বলপুরে আমাদের ট্রেন সময়ের আগেই পৌঁছে গিয়েছিল, সেজন্য স্টেশনে কাউকে পেলাম না। ঠিকেদার মালহোত্রার সঙ্গে নতুন পরিচয় হলো, তাঁর সঙ্গে নেপিয়র টাউনে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। ২ তারিখের বাকি সময়টুকু সেখানেই কাটালাম। ৩ তারিখ মহাকোশল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে বলতে হলো। ১১০ বছর আগে ইংরেজরা এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিল। জনসভায় ভাষণ দেবার কথা ছিল কিন্তু বৃষ্টির জন্য তা সম্ভব হলো না।

৪ তারিখ নর্মদা দেখার জন্য রওনা হলাম। সঙ্গে সস্ত্রীক কমরেড নক্‌বী, শ্রীকৃষ্ণদাস এবং আনন্দজীও ছিলেন। নর্মদার পারে ভেড়াঘাটে গিয়ে শ্বেতপাথর দেখার ইচ্ছে ছিল, বর্ষাশেষে নৌকা সে জায়গায় যেতে পারবে না বলে সে চিন্তা ছাড়তে হলো। ঘাট পাবার আগে পুলের সামনেই নৌকো ছেড়ে দিতে হলো। পাথরের ওপর দিয়ে নর্মদা বয়ে চলেছিল। ভারতের সমস্ত নদীই বিবাহিতা, একমাত্র নর্মদাই কুমারী। একটি জায়গা দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণদাস বলতে লাগলেন, 'এখানে ৪০০ ফুট উঁচু পাথর লুকিয়ে আছে। ভেড়াঘাটে কাঁচা শ্বেতপাথরের নানারকম খেলনা পাওয়া যায়। এখানকার জঙ্গলে প্রচুর বাঁদর আর আতা গাছ আছে। আতা পাকার সময় মিষ্টি আতা বিনে পয়সায় খেতে পাওয়া যায়।' কাছেই 'চৌষট্টিযোগিনীর মন্দির' দেখতে গেলাম। চারিদিকে গোল পাঁচিল টানা, যেখানে কলচুরি যুগের ভাঙাচোরা মূর্তি রাখা আছে। ভোজ-কাল এবং তারও আগের মূর্তিগুলির থেকে কলচুরি মূর্তি বেশি সুন্দর। মন্দিরে নন্দীর পিঠে বসা হরগৌরী মূর্তি আছে। কলচুরিরা পাশুপতধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। সেইসময় উত্তরাখণ্ডেও শৈবধর্ম তার আসল রূপে জীবিত ছিল। আজকের মত ছাই মেখে আর রুদ্রাক্ষ ধারণ করেই তা শেষ হয়ে যেত না। একটি শিবলিঙ্গ দেখে শ্রীমতী নক্‌বী তার সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। এই দেশে জন্মেও আমরা একে অপরের সংস্কৃতির সঙ্গে কতটা অপরিচিত, এ তারই উদাহরণ। হয়তো তিনি শিবের নামই শোনেননি। হরগৌরী মন্দিরের ডানদিকে হাঁটু পর্যন্ত বুট পরা দ্বিভুজ সূর্যের মূর্তি আছে। কালই আমি আমার ভাষণে বলেছিলাম যে ভারতবর্ষে শকরাই মূর্তির প্রচার করেছিল। এরকম বুট আজও শীতের সময় রাশিয়ার লোকেরা পরে। বস্তুত রুশরা সেই শকদেরই সন্তান, যাদের পূর্বদিকের শাখা শত্রুদের দ্বারা বাধ্য হয়ে মধ্য-এশিয়া ছেড়ে ভারতের দিকে চলে আসে। ফেরার সময় পথে তেওর গ্রাম পেলাম। প্রতাপশালী কর্ণ কলচুরির রাজধানী ত্রিপুরী এখানেই ছিল।

সন্ধেবেলা জব্বলপুরে একটি জনসভা ও একটি কংগ্রেসী সভায় ভাষণ দিতে হলো।

ট্রেনের সময়ের একঘণ্টা আগে তৈরি হয়ে নেওয়াটা আমি উচিত বলে মনে করি। দিনের আলো অল্প থাকতেই সওয়া পাঁচটার সময় শ্রীমালহোত্রার সঙ্গে স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। গাড়ি দেরিতে এলো এবং দেরিতে ছাড়ল। এবার আমার গন্তব্যস্থান কোঁচ (জেলা জালৌন)। সেকেন্ড ক্লাশের টিকিটের জন্য ২৫ টাকার কিছু বেশি লাগল। কাটনি এবং

বীনাতে আমাদের দুবার গাড়ি বদলাতে হলো। কাটনিতে যে গাড়ি ধরলাম সেটা প্রত্যেক স্টেশনে দাঁড়ায়। পাঞ্জাবে কাটাকাটির খবর শুনে মুসলমানদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। হিন্দু মহাসভা এবং সংঘের লোকেরা শুধু যে তার প্রচারই করেছে তাই নয়, নিরস্ত্র লোকের ওপর বীরত্ব দেখাতেও ছাড়েনি। কমিউনিস্টরা জব্বলপুরে এর বিরোধিতা করেছিল বলে সংঘের লোকেরা অনেককে মারধোর করেছিল। পাঞ্জাবের খবর শোনার পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবরকম কথা শুনতে হিন্দুরা প্রস্তুত ছিল। কংগ্রেসীরা এই সময় মৌন ছিল। তাই সেদিন নাগপুরে চার হাজার মুসলমান শরণার্থীদের হায়দ্রাবাদগামী ট্রেনের প্রতীক্ষায় থাকতে দেখলাম। জব্বলপুর থেকেও বহু মুসলমান জিনিসপত্র জলের দরে বেচে পালিয়ে যাচ্ছিল। দহা দমোহ এবং সাগর স্টেশনে বাচ্চাকাচ্চাসহ কয়েকশো মুসলমান নরনারী আমাদের ট্রেনে এসে উঠল। মনে হলো এই শহরগুলির দুই-তৃতীয়াংশ মুসলমান পালিয়েছে। সংঘের লোকেরা গুজব ছড়াচ্ছিল, ভূপালের অমুক গ্রামে মুসলমানরা দুশো হিন্দু মেরেছে। লোকেরা বিশ্বাস করার জন্য তৈরি ছিল। ৫ অক্টোবরের সেইদিন সাগরে ৮-৯ জন মুসলমান মারা গিয়েছিল। মালগুজার-জমিদার নিজের নিজের গ্রামের মুসলমান কৃষকদের বার করে দিয়ে ধর্মবীরত্বের পরিচয় দিচ্ছিল। মধ্যপ্রদেশ সরকার যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছিল। এবার তার ঘুম একটু একটু করে ভাঙতে থাকায় শান্তিস্থাপনের চেষ্টা শুরু করেছিল।

আমাদের সাড়ে তিনঘণ্টা লেট ট্রেন সন্ধে সাড়ে পাঁচটায় বীনা পৌঁছল। অন্য গাড়ি রাত দশটায় পেলাম। ঝাঁসীতে পরের গাড়ি প্রস্তুত ছিল। সেকেন্ড ক্লাশের কামরা ভেতর থেকে একদম বন্ধ ছিল। অনেক চেষ্টায় খোলানো গেল। জানতে পারলাম, ট্রেনের ভেতরে আজকাল ভীষণ ছোরাবাজি চলছে, ধর্মবীরেরা মানুষ মেরে অথবা এমনি-এমনিই চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দিচ্ছে।

বুন্দেলখণ্ডের একটি বড় অংশের প্রাচীন নাম দর্শাণ। কালিদাসের কালেও তা বিখ্যাত ছিল এবং বিস্তৃত ছিল জব্বলপুর থেকে কালপি পর্যন্ত। যমুনা ও নর্মদা নদী এখান দিয়েই প্রবাহিত হতো। দর্শাণের নাম এখনও সেখানের যসান নদীতে পাওয়া যায়। কৃষি এবং খনিজ দুরকম পদার্থেই প্রাচীন দর্শাণের ভূমি সমৃদ্ধ। নতুন মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে বুন্দেলখণ্ডের অনেক অংশ মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবে এখনও বাঁদা, হামীরপুর, জালৌন, ঝাঁসি প্রভৃতি জেলা উত্তরপ্রদেশেই রয়ে গেছে। এখনও এই চারটি জেলাকে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করে দর্শাণকে একতাবদ্ধ করা যেত কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃতি এবং ভাষার এখন আর কে খোঁজ রাখে? যমল মানব-দর্শাণে মালব তার কালোমাটি ও শস্যের জন্য প্রসিদ্ধ। বহুযুগ ধরে বলা হয়ে থাকে, মালবে কখনও আকাল হয় না। মেবার এবং বুন্দেলখণ্ডের মানুষ আকাল হলে মালবের রাস্তা ধরত, কিন্তু কলিযুগে কোনো কিছুরই ঠিক নেই, মালবেও যদি আকাল হয় তো আশ্চর্য হবার কি আছে?

ঝাঁসি থেকে এরচ হয়ে আমাদের ট্রেন এট পৌঁছল। বুদ্ধের সময়েই এরচ এরকচ্ছ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। আজও তার মাটিতে প্রাচীন সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন লুকিয়ে আছে। যখন আমি বুন্দেলখণ্ডে ছিলাম তখন এখানে এসেছিলাম। ছটার সময় এট-এ পৌঁছে দু ঘণ্টা

অপেক্ষা করার পর কোঁচের গাড়ি ছাড়ল। এই ট্রেনে কোনো ক্লাশ বা শ্রেণীভেদ নেই। পুরনো জীবনের স্মৃতি জেগে উঠছিল। এই ট্রেনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এক যাত্রায় কোনো এক ইংরেজ অফিসারের চাপরাসী আমাকে জায়গা ছেড়ে দিতে বলেছিল বলে আমার তরুণ উষ্ণ রক্ত ফুটতে শুরু করেছিল। আজ আর সেই ইংরেজ নেই। কোঁচে পৌঁছে আমার পুরনো বন্ধু শ্রীপান্নালাল আর শ্যামলালের বাড়িতে গেলাম। ভবঘুরে জীবনে নিজের ঘর ছাড়লেও, স্থানে স্থানে বহু আপন ঘর এবং পরিবার পেয়েছিলাম, যার মধ্যে ছিল পান্নালালের পরিবারও। বস্তুত, সেইসব পুরনো স্মৃতি জাগিয়ে তোলার জন্যই আমার এখানে আসা। পান্নালালের বাবা স্বামী ব্রহ্মানন্দর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল। এখন তাঁর বয়স ৮৫ বছর হয়ে গিয়েছিল।

কোঁচ—পরের দিন (৭ অক্টোবর) স্কুলে ভাষণ দিলাম, তারপর সাড়ে পাঁচটার সময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে জলখাবারের নিমন্ত্রণে শামিল হলাম। আটটা পর্যন্ত সভা চলল। স্বামী ব্রহ্মানন্দর গ্রাম মহেশপুরা এখান থেকে দশ মাইল দূরে। গ্রামে অসুবিধে হয় দেখে তাঁর দু ছেলে কোঁচ শহরে চলে এসেছে। কিন্তু স্বামী ব্রহ্মানন্দকে মহেশপুরা ছাড়ে নি। তিনি সেখানেই থাকতেন। তাঁর শরীরে এখন হাড়-পাঁজরাটুকুই অবশিষ্ট ছিল, চলাফেরা করতেও কষ্ট হতো। মহেশপুরায় তাঁর নিজের ছোট্ট কুটির ছিল, সেখানে থেকে নিজের রান্না নিজেই করে নিতেন। তিনি তাঁর দাদুকে দেখেছেন, এখন প্রপৌত্রদের দেখছেন। অর্থাৎ তাঁর সামনে ছয় প্রজন্ম পার হয়ে গেছে। তাঁর দু ছেলের পরিবারে এখন দশজন সদস্য। গহোই বৈশ্য অগ্রবালদের মত বংশপরম্পরায় নিরামিষভোজী হলেও সময় এখন সবকিছু বদলে দিয়েছে। তাঁর পৌত্র মেঘাতিথি এখন আমিষাহারী ছিলেন। শ্রীরামদীন পাহাড়িয়া, স্বামী ব্রহ্মানন্দ হওয়ার আগে, অল্পস্বল্প হিন্দি জানতেন। মহেশপুরায় শান্তিতে কাপড় এবং লেনদেনের ব্যবসা করতেন। এত কম শিক্ষিত এবং শহর থেকে এত দূরে হওয়া সত্ত্বেও আর্যসমাজী চিন্তাধারা সেখানে পৌঁছেছিল। রামদীন পাহাড়িয়া আর্যসমাজে যোগ দিলেন এবং আর্যসমাজের শিক্ষায় নিজের জীবন চালাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। দোকানে বাঁধা দাম রাখার নিয়ম তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করতেন। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হলেও পরে সবাই সেটা বুঝে গিয়েছিল। জীবন সুখে কেটে যাচ্ছিল। স্ত্রী এবং পুত্রবধূকেও তিনি পৈতে ধারণ করিয়েছিলেন, এবং ঘরে মেয়েরাও নিয়মপূর্বক হোম ও সন্ধ্যা করতে শুরু করেছিলেন। রামদীন পাহাড়িয়া সেকালের বিপ্লবী ছিলেন। কিন্তু কখনও জাতপাতের সীমার বাইরে যাননি। ছুত-অচ্ছুত মানতেন না। তিনি এবং তাঁর ছেলেরা আর্যসমাজের জন্য হাজার হাজার টাকা দান করেছেন।

১৯১৬ সালে আমি যখন মহেশপুরা যাই তখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। সন্ন্যাসী হলেও ভ্রমণের ইচ্ছে না থাকায় তিনি মহেশপুরা ছেড়ে কোথাও যেতেন না। আজ নিজের চতুর্থ প্রজন্মের মধ্যে তিনি কতটা পরিবর্তন্ দেখছিলেন? পুত্র-পৌত্রদের ডিম খেতে দেখলে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতেন, কিন্তু কোন দাদু তার নাতিকে বশে রাখতে পারে? স্বামী ব্রহ্মানন্দ চা পানকে ক্ষতিকারক বলে মনে করতেন। স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে তো বটেই

আবার খরচের কথা চিন্তা করেও। নাতিরা চায়ের সরঞ্জাম রাখত আর দিনে দুবার চা না খেলে তাদের চলত না। খরচ নিয়ে অনুযোগ করায় এক নাতি বলেছিল, 'যদি আমরা বেশি খরচ করি তবে রোজগারও তো বেশি করি। আপনাদের সময়ে স্ত্রীর কাছে গোটা দুই মোটা শাড়ি থাকলেই যথেষ্ট মনে করা হতো। আমাদের বউদের দেখুন, প্রত্যেকের ট্রাঙ্কেই একডজন ভাল ভাল শাড়ি রয়েছে।' পুরনো প্রজন্মের কাছে একথার আর কি উত্তর ছিল? আমি স্বামীজীকে বলেছিলাম, 'রাগ করে কি করবেন? প্রত্যেক প্রজন্মেরই নিজের দায়িত্ব নেওয়া উচিত। নতুন নতুন প্রজন্ম চিরকাল এইভাবেই পরিবর্তন করে এসেছে।' চার প্রজন্মকে চোখের সামনে দেখতে হলে রাগ হতেই পারে, কিন্তু সেটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

৮ অক্টোবর কোঁচের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল। কোঁচের মত আমাদের দেশে আরো শত শত শহর একসময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু আজ আর তাদের ইতিহাসের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। কোঁচের নামই বলে দেয় যে তা মুসলমান যুগের নয়। সংস্কৃতে এর নাম ক্রৌঞ্চনগর থেকে থাকবে, কিন্তু কোঁচপক্ষীর নামে কোনো শহর থাকার খবর শোনা যায় না। জিজ্ঞাসাবাদ করে বারহখম্বা নামে একটি জায়গার খবর পেলাম। ৮ অক্টোবর একটা বড়সড় দল আমার সঙ্গে সেখানে পৌঁছল। বারহখম্বার কাছে মায়ের মন্দির আছে। সেখানে গুপ্তযুগের অথবা তার ঈষৎ পরবর্তী সময় ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীর প্রস্তর মূর্তি আছে। সুন্দর বক্ষ এবং বাহুমূল গুপ্তযুগ অথবা গুপ্তযুগের পরবর্তী সময়ের বৈশিষ্ট্য। এখানকার প্রতিহারী মূর্তির মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলাম। একটি ছোট বরাহমূর্তিও সেই সময়ের সাক্ষী দিচ্ছিল। খণ্ডিত হরগৌরীর মূর্তি বলে দিচ্ছিল যে এখানে শৈবদের মন্দির ছিল। সম্ভবত, একাদশ শতাব্দীর কোনো প্রাচীন মন্দিরের থামগুলি তুলে এনে বারহখম্বা বানানো হয়েছিল। পার্শ্ববর্তী পুকুরটি মন্দিরেরই হবে। গ্রামে মায়ের কাছের মূর্তিগুলির মধ্যে একটি জৈনমূর্তি ছিল। কোনো বুদ্ধমূর্তি দেখতে পেলাম না। গত একশো বছর ধরে যে হারে মূর্তি চুরি চলেছে তাতে কে জানে এখান থেকে কত মূর্তি সরে গেছে! হয়তো গুপ্তযুগে কোঁচনগর অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। এখানে মুক্তিপতি রাজ্যপাল, নয়তো বিষয়পতি (জেলাধিপতি, কুমারামাত্য) অবশ্যই থাকত। দক্ষিণাপথগামী বণিকদের পথ সম্ভবত এখান দিয়েই গেছে। হয়তো সেই কারণে এই শহরটি ধনধান্যসম্পন্ন হয়েছিল।

আজ কোঁচের জনসংখ্যা ছিল ২০ হাজার। পুরসভা ছিল, যার রোজগার ছিল বছরে এক লাখ টাকা। গত তিনবছর ধরে প্রাইমারি শিক্ষা অবৈতনিক ছিল, এখন তা বাধ্যতামূলকও করা হয়েছিল। পুরসভার সচিব বলছিলেন, 'আর্থিক অসুবিধের কারণে আমরা নগর-সংস্কারের বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা হাতে নিতে পারছি না।' তিনি জানতে চাওয়ায় আমি রাশিয়ার পুরসভাগুলির বর্ণনা দিলাম। আমার কথাগুলি তাঁর স্বপ্নের মত মনে হলো। হ্যাঁ, ২০ হাজার জনসংখ্যার সোভিয়েত দেশের কোনো শহরের অবস্থা কোনোমতেই এমন হতে পারে না। করের বিষয় জানতে চাইলে আমি বললাম, সেখানে যে কোনো শহরের সমস্ত বাড়ি হলো পুরসভার সম্পত্তি। আমাদের দেশেও যদি সমস্ত

বাড়ির মালিকানা পুরসভার থাকে, তবে তা কত ধনী হয়ে উঠতে পারে?

কোঁচ এবং সেখানের চৌমাথায় আমি কতবার ভাষণ দিয়েছি, কিন্তু যাদের সামনে ভাষণ দিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে খুব কম লোকই এখন জীবিত ছিলেন। নতুন প্রজন্মের মধ্যে যাদের বই-এর সখ একমাত্র তারাই রাহুলকে জানত। প্রতিটি প্রজন্মের সঙ্গেই নতুন করে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

৯ অক্টোবর কোঁচ থেকে বিদায় নিলাম। বিদায় দিতে গিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ কেঁদে ফেললেন। এখন, আবার দেখা হবে এমন আশা কিভাবে করা যেত— 'যে ছেড়ে যায়, সে ছেড়েই যায়।' আমাদের দুজনের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল! একই চিন্তা মাথায় নিয়ে মাসের পর মাস আমরা একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম, একসঙ্গে স্বপ্ন দেখতাম—ঘরে ঘরে আর্যসমাজের প্রচার করতে হবে, দেশে-বিদেশে তার খবর পৌছে দিতে হবে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আজও আর্যসমাজী ছিলেন। এখনও বেদ, ঈশ্বর এবং ঋষি দয়ানন্দর শিক্ষায় তাঁর নিষ্ঠা ছিল। এই ৩১ বছরে কোথা থেকে কোথায় পৌছে গেছেন! আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে অনেক প্রভেদ ছিল, কিন্তু ভালোবাসা এখনও একই রকম ছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দব কাছে বিদায় নিতে গিয়ে আমার মনও বিষণ্ণ হয়ে উঠল। জালৌন জেলা অনেক বছর ধরে আমার কর্মক্ষেত্র ছিল—'ইহাঁ নাথ মম পগ-পগ জোহা।' এই পায়ে পায়ে দেখা জায়গা দেখার জন্য তীব্র ইচ্ছে হয়, কিন্তু সময় কোথায়? এখন উদারহস্তে সময় খরচ সম্ভব নয়।

শ্রীবেণীমাধব তেওয়ারীর সঙ্গে সেইসময় আমার পরিচয় হয়েছিল। একসময় তিনি স্বরাজী আল্‌হা তৈরি করেছিলেন। ছোট পুস্তিকার আকারে তা ছাপা হযেছিল। এরপর তিনি কংগ্রেসের হয়ে কাজ করেন, জেলে যান। কিন্তু এসব যখন হয় তখন জালৌন জেলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তাঁরই সঙ্গে আমি মোটরে উরই গেলাম। ১৯ মাইল পথ আমরা একঘণ্টায় পৌছে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার থাকার সময় মোটরের প্রচলন ছিল না। পাকা ফসলে ভরা খেত দেখে হৃদয় উল্লসিত হয়ে যেত আর খালি খেত দেখে অবসন্ন। আজকালকার দিনে শস্য দুর্লভ, তাই এরকম হবারই কথা।

উরই এখন ১০ হাজার জনসংখ্যা থেকে বেড়ে ১৮ হাজার জনসংখ্যার শহর হয়ে গিয়েছিল। জলের কল বসেছিল। কিন্তু সমস্ত বাড়িতে কল বসানো তখনই সম্ভব হবে যখন কোনো নাগরিক আর দরিদ্র থাকবে না। ওখানে দুটি হাইস্কুলের একটিতে ইন্টার পর্যন্ত পড়ানো হতো। জালৌনের লোকেরা যখন জানতে পারলো তখন তারাও আমাকে নিতে এলো। তাদের নিরাশ করায় আমার খুব দুঃখ হলো। সত্যি সত্যি তাদের থেকেও আমার নিজেরই বেশি যাবার ইচ্ছে ছিল। সন্ধেবেলা সর্বজনীন সভা হলো। ঘটনাচক্রে পণ্ডিত অলগুরায় শাস্ত্রী উরই এসে পৌছেছিলেন। তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের উপপ্রধান এবং প্রদেশের একজন বড় কংগ্রেসী নেতা ছিলেন। আজমগড় জেলাব মানুষ ছিলেন বলে তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ আত্মীয়তা থাকাটা স্বাভাবিক ছিল। আগে তাঁকে আমি রোগা দেখেছিলাম, এখন মোটা হয়ে গিয়েছিলেন। আমি কমিউনিস্ট ছিলাম আর তিনি ছিলেন কংগ্রেসী। দুজনের মতবাদ সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কে তার কোনো প্রভাব পড়ত না। এমন মধুর সম্বন্ধ মানুষের হারানো উচিত নয়।

কলমপেশা

১০ অক্টোবর সকাল পৌনে ছটার গাড়ি ঘণ্টাখানেক দেরি করে এলো। যে কম্পার্টমেন্টে আমি ছিলাম, তাতে গোরখপুরনিবাসী একজন মুসলমান সৈনিক-অফিসারও ছিলেন। নিট্‌শের দর্শন দ্বারা তিনি খুবই প্রভাবিত হয়েছিলেন। আজকের পরিস্থিতিতে অন্য মুসলমানদের মত তিনিও অত্যন্ত দুঃখিত এবং নিরাশ ছিলেন। বলছিলেন, 'মনুষ্যত্ব কোথায় আছে?' কিন্তু কবেই বা তা ছিল? তিনি বলছিলেন, 'ভারত আবার পরাধীন হবে, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে হবে, দুই-এর মধ্যে একটি দেশকে পরাজিত এবং অধীন হয়ে থাকতে হবে।' সেই সময়ের অবস্থা দেখে এমন কথা তিনি ভাবতেই পারেন। বলছিলেন, 'যুক্তপ্রদেশের সরকার মুসলমানদের চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিচ্ছে, বয়কটের জন্য মুসলমানরা ব্যবসাও করতে পারছে না।' তাঁর এও বক্তব্য ছিল যে, হিন্দু-মুসলমানের বেশভূষা ছেড়ে দিয়ে আমাদের ইউরোপীয় পোশাক গ্রহণ করা উচিত। বেশভূষা পাল্টে দিলে হিন্দু-মুসলমানের বাইরের ভেদাভেদ দূর হবে। একথাও ঠিক। আমি বললাম, 'এতে খরচ বেশি হবে। বরং একইরকম ভারতীয় পোশাক তো দুজনরাই গ্রহণ করতে পারে?' সেই পরিবেশে একে অপরকে কিভাবে বিশ্বাস কবতে পারত? চলন্ত ট্রেনের মধ্যে ছোরা মেরে নিরীহ যাত্রীকে বাইরে ফেলে দেওয়া হতো। একমাসের এই যাত্রায় আমি এই ভীষণ সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি দেখেছি। বেনারস, ছাপরা এবং পাটনাতে হিন্দু-মুসলমানদের মৃদু উত্তেজনা ছিল, যদিও সংঘ এবং হিন্দুসভার লোকেরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখছিল না। কলকাতায় উত্তেজনা আরোই কম ছিল। কটক, বালাসোর একদম শান্ত ছিল। ওয়ার্ধাতে অল্প অল্প এবং জব্বলপুরে প্রচণ্ড উত্তেজনা দেখেছিলাম। দমোহ এবং সাগরে যেন ঝড় উঠেছিল আর কোঁচ ও উরইতে মৃদু উত্তেজনা ছিল।

ফী বাড়ানোর জন্য ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। আমাদের অধিকাংশ ছাত্রের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ যে তাদের ক্ষুধার্ত থেকে অতিকষ্টে পড়াশোনা করতে হয়। এমন অবস্থায় আবার ফী বাড়ানো হলে তারা উত্তেজিত হবে না কেন? এই সময় তারা স্থানে স্থানে হরতাল করছিল আর বক্তব্য রাখছিল। তারা শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসম্পূর্ণানন্দর বাড়ির জানালা ভেঙে দিয়েছিল। গ্রেপ্তার করা শুরু হলো। শুধু তাই নয়, তাদের ওপর লাঠিবৃষ্টি হলো, ছাত্রদের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেওয়া হলো। এই সবই ছিল ইংরেজ সরকারের অনুকরণ। একটি ছেলে মারা গেল, অনেকে আহত হলো। জেলে বন্দী ছাত্রদের সঙ্গে সেই নিষ্ঠুর আচরণ করা হলো যা ইংরেজদের সামনে করা হতো। সেই সময় সমস্ত প্রদেশ জুড়ে ছাত্র-আন্দোলন পুরোদমে ছড়িয়ে পড়েছিল।

প্রয়াগ—কানপুরে ট্রেন বদল করে রাত আটটার সময় প্রয়াগ পৌঁছলাম। কার্ফিউ ছিল না, নয় তো ড· বদরীনাথপ্রসাদের বাংলোতে পৌঁছতে অসুবিধে হতো।

এখন প্রয়াগে ৪৬ দিন থেকে লেখার কাজ করবার ছিল। রাশিয়ায় থাকতে আমি মধ্য-এশিয়ার ঔপন্যাসিক সদরুদ্দিন ঐনীর কয়েকটি বই পড়েছিলাম। সেগুলি আমার ভীষণ ভাল লেগেছিল। তাতে এমনই এক সমাজের মহান পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছিল, যে-সমাজ আমাদের এখানে এখনও ছিল। সেই কারণেই আমাদের দেশের জন্য এই উপন্যাসগুলির বিশেষ উপযোগিতা ছিল। লেনিনগ্রাদে থাকতেই আমি ঐনীর দুটি বড় বড় উপন্যাস—'দাখুন্দা' এবং 'গুলামান' (যারা দাস ছিল)—অনুবাদ করে ফেলেছিলাম। তাজিক-ফারসী থেকে উর্দুতে অনুবাদ করতে গেলে বহু মূল শব্দ ব্যবহার করা যায়, সেইজন্য আমি উর্দুতে অনুবাদ করেছিলাম। এখানে এসে বুঝলাম যে উর্দুর প্রকাশক পাওয়া যাবে না। উর্দু বই আজকাল খুব কম প্রকাশিত হচ্ছে। আমার হিন্দি প্রকাশক জোর দিতে লাগলেন যে আমি যেন সেগুলির হিন্দি করে দিই, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি ছাপা হয়ে যাবে। আমি সবার আগে 'দাখুন্দা'তে লেগে পড়লাম, ১২ অক্টোবর থেকে। ২৫ অক্টোবরে সেটা শেষ করলাম। ৩১ তারিখ যখন 'দাখুন্দা'র প্রথম প্রুফ হাতে এলো তখন আরোই খুশি হলাম।

ড. বদরীনাথপ্রসাদের বাড়িতে খুবই আরামে ছিলাম, তবে এতো বেশি লোক দেখা করতে আসত যে কাজের অনেকটা সময় কথাবার্তায় চলে যেত। আমার এমন একটা জায়গার দরকার ছিল যেখানে আমি নির্বিঘ্নে লেখার কাজ করতে পারি। একথা ভেবে আমি ১৫ অক্টোবর দারাগঞ্জে রায় রামচরণের বাড়িতে চলে গেলাম। দারাগঞ্জেও আমার পরিচিত মানুষ কিছু কম ছিল না কিন্তু রায়সাহেব যে শুধু আমার খাওয়াদাওযার দিকেই বিশেষ নজর রাখতেন তাই নয়, এদিকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি থাকত যেন নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে না আসে। নিজের হাতে লেখার অভ্যাস তো চলে যায়নি, তবে দিন দিন আমার হাতের লেখা এমনই খারাপ হয়ে যাচ্ছিল যে স্বহস্তে লিখতে গিয়ে বন্ধন টের পেতাম। লেখার জন্য নাগার্জুনজী আমার কাজে নিজেকে অর্পণ করেছিলেন কিন্তু আমার মনে হতো এটা উচিত হচ্ছে না। নাগার্জুনজী এখন স্বয়ং সাহিত্য সৃজন করছিলেন এবং তাঁর কলমকে লোকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাঁকে দিয়ে লেখানোর কাজ করানো আমার উচিত মনে হতো না, তবে এখন তো নিরুপায় ছিলাম। অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়, কিন্তু পাখা ছাড়া কাজ চলত না। এইভেবে সন্তুষ্ট ছিলাম যে, শীত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে।

দারাগঞ্জে রায় রামচরণ আমার জন্য যে বাড়ি ঠিক করেছিলেন, তা সত্যি সত্যি কাজে ডুবে যাওয়ার জায়গা। অভিযোগ করার কিছু ছিল না। পায়খানাটা খুব ভাল ছিল না, তবে তার কারণটা ছিল আমার দীর্ঘকাল রাশিয়ায় অবস্থান। সারাদিনই বিদ্যুৎচালিত পাখা চলত। সন্ধে এবং সকালে তাপমাত্রা অনুকূল হয়ে যেত।

১৮ অক্টোবর রামলীলার ধূম ছিল। এদিকে বহুবছর ধরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মত বিরোধ ছিল বলে ইংরেজ সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, যে কারণে রামলীলা বন্ধ ছিল। ইংরেজরা চলে যাওয়ায় এই সুফলটা তো পাওয়া গেছে।

এখানে এসে কাশীর আচার্য পরীক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ)-র বৌদ্ধদর্শনের প্রশ্নপত্র তৈরি

করতে হয়। ব্যস্ত থাকায় আমার পক্ষে যদিও সময় বার করা মুশকিল ছিল তবু কাশীর পরীক্ষাগুলিতে বৌদ্ধদর্শন অন্তর্ভুক্ত করায় আমারও হাত ছিল বলে আপত্তিও করা যায়নি। ২০ অক্টোবর ডাক্তার উদয়নারায়ণ তেওয়ারী এবং রায় রামচরণ অগ্রবাল কারে করে বেনারস যাচ্ছিলেন, রাস্তায় কার উল্টে যায়। সৌভাগ্যবশত বেশি আঘাত লাগেনি। মানুষের জীবন আসলে সবসময় তার মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়ে চলে। কে জানে কখন ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

২১ তারিখ রামলীলার চৌকি বেরোল। গোস্বামী তুসীদাসেরও সময়ের আগে থেকে রামলীলা হয়ে আসছে কিন্তু কালবদলের জন্য কোনো জিনিসের রূপ এক থাকতে পারে না। প্রয়াগে রামলীলার শোভাযাত্রার সঙ্গে চৌকি বার করার রীতি চলে আসছে। প্রত্যেক পাড়া তাদের নিজেদের চৌকিকে সাজানোর প্রতিযোগিতায় লাগায়। চৌকিগুলোতে শুধু রামায়ণের দৃশ্যই থাকে না, আধুনিক ভাব প্রকাশ করে এমন সব মূর্তিও সাজানো থাকে। শোভাযাত্রা বড় কুঠির সামনে দিয়ে বেরোল যার ঠিক সামনেই ছিল সেই বাড়িটার সদর দুয়ার, যেখানে আমি থাকতাম। বলাবাহুল্য, সেই শোভাযাত্রা দেখার লোভও আমি সংবরণ করতে পারিনি।

আমার ছোটভাই শ্যামলালের পুত্র উদয়নারায়ণ ম্যাট্রিক পাশ করে দিল্লীতে চাকরি করছিল। ২৪ অক্টোবর সে এলো, বলল 'আমি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এসেছি। এখন পড়তে চাই। প্রফেসর হতে চাই। লেখক হতে চাই।' আমি বললাম, 'খরচের চিন্তা কোর না। পড়া শুরু করো আর সাইন্স পড়ো।' অক্টোবরের শেষে আশা ছিল না যে এইবছর সে এফ· এ·-র পরীক্ষায় বসতে পারবে, তবে তার জন্য চেষ্টা করতে বলে দিয়েছিলাম। খুশি হলাম, যখন ১ নভেম্বর তার ফী জমা পড়ে ফর্ম গৃহীত হলো। পড়া ছেড়ে না দিলে এবছর সে বি· এ· পরীক্ষায় বসত, অর্থাৎ দুবছরের ক্ষতি হয়ে গেল।

২৫ অক্টোবর 'দাখুন্দা' শেষ করার পর 'সোভিয়েত ভূমি'র দ্বিতীয় সংস্করণে হাত দেবার ছিল। প্রায় পুরো বইটা নতুন করে লিখে আগের দেড়গুণ করতে হতো। রোজ অল্পসময় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ-এর জন্য রেখেছিলাম। কিছুদিন পরে রোববারটাকে ছুটি রাখার নিয়মও করে নিয়েছিলাম। সেদিন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য বেরোতাম।

পণ্ডিত শ্রীনারায়ণ চতুর্বেদী দারাগঞ্জ মহল্লাতেই থাকতেন। ২৬ তারিখ রোববার সকালে তাঁর বাড়ি গেলাম। চতুর্বেদজী সাহিত্যিক এবং সাহিত্যানুরাগীই শুধু ছিলেন না, তাঁর বাড়িতে সাহিত্যিকদের আড্ডা বসতে দেখা যেত। সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের আলোচনাই সেখানে বেশি শুনতে পাওয়া যেত। অনেক তরুণ এবং প্রৌঢ় সাহিত্যিক শ্রীচতুর্বেদীর উৎসাহ এবং সাহায্য পেয়ে উন্নতি করেছে। অষ্টম-নবম শতাব্দীর এক চতুর্বেদী পূর্ব কম্বোজে গিয়ে প্রচুর সম্মান লাভ করেছিলেন, রাজার জামাই হয়েছিলেন। তিনি তাঁর মথুরাকে হাজার হাজার বেদঅধ্যয়নকারীর কণ্ঠস্বরে গুঞ্জরিত বলে জানিয়েছেন। এখন মথুরার চতুর্বেদীদের মধ্যে বেদঅধ্যয়নকারী খুব কমই পাওয়া যাবে। পণ্ডিত শ্রীনারায়ণের পিতা শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ চতুর্বেদী সম্ভবত বল্লভসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত চতুর্বেদীদের মধ্যে একজন, যিনি রামানুজ সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হয়ে উত্তর ভারতের

রামানুজ-শিষ্যদের নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন। পিতা সরস্বতীর পুজো করেছেন। যোগ্যপুত্রই বা তাঁর থেকে পিছিয়ে থাকে কি করে? চতুর্বেদজীর পক্ষে সাধনার জন্য সম্পূর্ণ সময় দেওয়া মুশকিল ছিল। কিন্তু তিনি তাঁর সরকারি কাজ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নির্বাহ করতেন, এবং বন্ধুদের জন্যও সময় দিতে অকৃপণ ছিলেন।

সেইদিন দুপুরের পর শ্রী মহাদেবীজীর কাছেও গেলাম। নারী বলেই যে মহাদেবীজী হিন্দি কাব্যের প্রথম সারির কবি বলে গণ্য হয়েছেন, তা নয়। নিজের যোগ্যতা দিয়ে সে স্থান তিনি অর্জন করেছেন। আমি নিঃসংকোচে বলতে পারি যে, পন্ত-প্রসাদ-নিরালা বাদে সে যুগের সর্বোচ্চ কবিদের মধ্যে মহাদেবীজীর স্থান প্রথম। সতর্কতার সঙ্গে রচনা করার কাজে তো প্রসাদের পরেই তাঁর স্থান। কথাবার্তার মধ্যে নিরালাজীর প্রসঙ্গ উঠল। কত লোক নিরালাজীকে পাগল ভাবে এবং তাঁদের মতে তাঁর রাঁচীতে যাওয়া উচিত। আমি এমন মনে করি না। আমি তাঁকে চুরাশি সিদ্ধ-এর শ্রেণীভুক্ত মনে করি, যাঁর জাগ্রত এবং স্বপ্নের ভেদ ঘুচে গেছে। নিরালা কবি হিসেবেই নয়, মানুষ হিসেবেও অতুলনীয়। এই সময় তিনি উন্নাও-তে ছিলেন তাই দেখা হলো না।

সেইদিন 'সরস্বতী'র ভূতপূর্ব সম্পাদক পণ্ডিত দেবীদত্ত শুক্লকে দেখতে গেলাম। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর থেকেই তাঁর চোখ নষ্ট হতে বসেছিল। তিনবছর ধরে তিনি একই অবস্থায় আছেন। জীবনভর সাহিত্যের সেবা করার পর আজ যে অবস্থায় তাঁকে জীবন কাটাতে হচ্ছে তা দেখে কষ্ট হচ্ছিল। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ায় তিনি আত্ম-সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেন, কিন্তু তাতে কি তাঁর কোনো সাহায্য হতে পারতো? আমাদের এখানে মৃত ব্যক্তির শ্রদ্ধা করার প্রথা আছে, বোধহয় সেইজন্য আমরা জীবিতদের শ্রদ্ধা করতে জানিনা। শুক্লজীকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি তাঁর নিজের অবস্থা নিয়ে অসন্তুষ্ট নন। যতই হোক, তিন বছর ধরে তিনি এরই অভ্যাস করছিলেন যে। দ্বিবেদীজীর পর সবথেকে দীর্ঘকাল ব্যাপী পণ্ডিত দেবীদত্ত শুক্ল 'সরস্বতী'র কর্ণধার ছিলেন। আমার তো তাঁর প্রতি বেশি করে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কারণ দেরিতে আমি যখন হিন্দি পত্রিকাগুলিতে লিখতে শুরু করি, তখন সবার আগে 'সরস্বতী'র সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। প্রথম থেকেই শুক্লজী শুধু আমার লেখাকে স্বাগত জানাননি, বরং অন্যদের জন্যও লেখা দাবি করে গেছেন। এ সব তখনকার কথা, যখন আমি প্রথমবার লংকা যাই।

রাশিয়া থেকে লন্ডন হয়ে ভারতে ফিরেছিলাম। লন্ডনেই একটা ছোট কিন্তু শক্তিশালী রেডিও কিনেছিলাম। রোজ সন্ধেবেলা আমি নিয়ম করে ভারত এবং পাকিস্তান থেকে প্রচারিত সংবাদ শুনতাম। সেই সময় কাশ্মীরকে নিয়ে পাকিস্তান রেডিও জেহাদ ঘোষণা করেছিল। জুনাগড়ের নবাব মঞ্জুর করেছিল বলে ভারতের ভেতরে জুনাগড় পাকিস্তানের অংশ। আর কাশ্মীরের রাজা হস্তাক্ষর করলে কি হবে, সেখানকার অধিকাংশ লোকই তো মুলসমান, তাই তা পাকিস্তানেরই অংশ। ২৩ অক্টোবর যখন কাশ্মীরের রাজা ভারত-সংঘে সম্মিলিত হওয়া স্থির করল তখন পাকিস্তান শুধুমাত্র রেডিওতে প্রচার করে সন্তুষ্ট না থেকে নিজেদের সৈন্য ও প্রজাকেও কাশ্মীরের দিকে লেলিয়ে দিল।

এবার ২৯ অক্টোবর শারদ পূর্ণিমা পড়ল। আমাদের দেশে শারদ পূর্ণিমাকে চিরকালই

নয়নাভিরাম মনে করা হয়। রাজা-রাজড়ারা এইসময় কৌমুদী-মহোৎসব পালন করতেন। শারদ পূর্ণিমাকে সে সময় কৌমুদী বলা হতো। কৌমুদী-মহোৎসব নিষেধ করে দেওয়া নিয়ে চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে যে সাময়িক মনোমালিন্য দেখা দিয়েছিল, তার বর্ণনা বিশাখ তাঁর 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে দিয়েছেন। অযোধ্যায় এখনও লোকে খুব ধূমধাম করে শারদ পূর্ণিমা পালন করে, তবে তা বেশিরভাগই পাথরের অথবা রক্ত-মাংসের রাম-লক্ষ্মণ সীতার ক্ষণিক-দর্শনেই সীমিত থাকে। সারা দেশ জুড়ে শারদ পূর্ণিমায় নিরভ্র আকাশ থাকবে এমন কথা নয়, তবে উত্তর-ভারতে এই শারদ পূর্ণিমা আমার যতগুলি মনে পড়ে সবগুলিতেই আকাশ নিরভ্র পেয়েছি। কৌমুদী-মহোৎসব শুধু রাজাদের নয়, জনতারও এবং তার থেকেও বেশি শিল্পীদের উৎসব। হিন্দি-ক্ষেত্রে এই দিনটির ফুলের মত ছড়িয়ে পড়া চাঁদের আলো বিফলে যেতে দেওয়া অপরাধ। কবিদের জন্য এটা স্বাভাবিক মহোৎসব, তবে এখনও তারা সেদিকে দৃষ্টি দেননি।

১ নভেম্বর দেরাদুনের এক বন্ধুর চিঠিতে জানতে পারলাম যে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি পদের জন্য আমার নামও উঠেছে। এও জানতে পারলাম যে, আমার বন্ধুরা সেজন্য আবেদন-পত্রও ছাপিযে ভোটদাতাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কয়েক বছর আগেও আমার নাম সভাপতি পদের জন্য উঠেছিল। যখন আমি সে কথা জানতে পারলাম, তখন বিহাবের সাহিত্যিকদের জানিয়ে দিলাম—আমি ওই পদের প্রার্থী হতে চাইনা। কিন্তু তখন যথেষ্ট দেরি হয়ে যাবার ফলে আমাব অভিপ্রায় শুধু বিহারেই কার্যকরী হলো। ভোটগ্রহণ হলো এবং কিছু বেশি ভোট পেয়ে শ্রীযমনালাল বাজাজ সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তাঁর পিঠে গান্ধিজীর বরদহস্ত ছিল, তবুও আমার বিহারের বন্ধুদের যদি বাধা না দিতাম তাহলে ফলাফল অন্যরকমই হতো। সেইজন্যই এবার আমার বন্ধুরা চুপচাপ আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিল, যাতে জানতে পেরে আমি বাধা না দিতে পারি। এখন আর তার সময় ছিল না। ৩ নভেম্বর আমি সভাপতি নির্বাচিত হলাম। এই বছর শেঠ গোবিন্দদাস ১৪৫টি ভোট পেলেন আর আমি পেলাম ১৮০টি ভোট। সেবারও এক শেঠের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হযেছিল আর এবাবও তাই। এখন নিজেদের সম্মেলনকেও সময় দিতে হবে—এই কঠিন কাজ সম্পন্ন করার ছিল, এদিকে লেখার যথেষ্ট বড় পরিকল্পনা করে ফেলেছিলাম। এরমধ্যেই আবার সভাপতিব ভাষণ লেখার ভারও পড়ল। আমি চেয়েছিলাম 'সোভিয়েত ভূমি'র পরে 'মধুর স্বপ্ন' উপন্যাসে হাত দেবো, কিন্তু দু-বছর পরে তার সময় হয়েছিল।

ফিল্মের প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই, কিন্তু ভাবতীয় ফিল্ম বেশির ভাগই এমন হয় যে অল্পকিছুক্ষণ দেখার পরেই ক্লান্তি আসে, কাজেই কোনো ফিল্ম সম্বন্ধে প্রচুর সুপারিশ না শুনলে খামোখা মাথাব্যথা করতে আমি রাজি হই না।

৯ নভেম্বর বন্ধুদের সঙ্গে 'মেঘদূত' দেখতে গেলাম। কালিদাসের মহৎ রচনা অবলম্বনে ছবিটি বানানো হয়েছিল। গুপ্তযুগের সমস্ত শিল্পকলা এর পটভূমিতে ছিল। ইতিহাসের তা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগও নয়। এর ওপরে কত সুন্দর ফিল্ম হতে পারত, কিন্তু দেখার পর আমাকে 'কিছুই নয়' লিখতে হলো।

এলাহাবাদে প্রত্যেক বছর এই মাসগুলোতে স্বদেশী প্রদর্শনী হতো, এখন তা স্বদেশী মেলাতে রূপান্তরিত হয়েছিল। আগের বছরগুলোর থেকে অনেক উন্নতি হয়েছিল।

'সোভিয়েত ভূমি' ছাড়াও সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ার বিষয়ে একটা ছোট বই লেখার ইচ্ছে ছিল। সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ার জনজীবনে যে মহান পরিবর্তন এসেছিল, ঐনীর উপন্যাসের মাধ্যমে তা জানা সম্ভবপর ছিল কিন্তু তাকে পুরোপুরি বুঝতে হলে সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার। এই অভাব দূর করার জন্য ১০ অক্টোবর আমি এই বইয়ে হাত দিলাম। ২২ অক্টোবর আমি বইটি লিখে শেষ করে দিলাম। প্রকাশক খুবই আশা দিয়েছিল, 'এটা আমি খুব তাড়াতাড়ি ছাপবো.' কিন্তু তাঁর তাড়াতাড়িটা সবথেকে দীর্ঘ সময় হয়ে দাঁড়াল।

আমার স্বাস্থ্য সাধারণভাবে ভালই থাকছিল তাই কাজ করায় যে, খুবই সুবিধে হয়েছিল সেকথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু কোনো দেহধারীর কি সর্বদা নিরোগ থাকা সম্ভব? ১৯২৪-২৫ সালে ডিসেন্ট্রি আমার জীবনসঙ্গী হবার উপক্রম হয়েছিল, তার হাত থেকে একচুলের জন্য বেঁচেছি। এরপর থেকে কখনও তার আসার খবর পেলে আমি সজাগ হয়ে যাই। পেটে কিছু গড়বড় হয়েছে বলে মনে হলো। কারণ খোঁজার জন্য বেশি মাথা ঘামাবার দরকার ছিল না। আমি সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত বসে বসে লেখাপড়া করার কাজ হাতে নিয়েছিলাম, আর এটা খেয়ালও করিনি যে খাবাব হজম করার জন্য শরীরটার কিছু নড়াচড়ার প্রয়োজন আছে। ১৩ অক্টোবর ডিসেন্ট্রি শুরু হয়ে গেল। কাজ ছেড়ে দুদিনের জন্য শুয়ে পড়তে হলো। বসে থাকার অর্থই ছিল বারবার শৌচের জন্য যাওয়া। ওষুধ ডিসেন্ট্রিকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত চাপা দিয়ে রাখল। এবার সভাপতির ভাষণ লেখার চিন্তা মাথার ওপর এসে পড়ল। ১৫ অক্টোবর খিচুড়ি পথ্য করে সেই কাজে হাত দিলাম। নিজের বিষয়ে আমি যতটা বেপরোয়া ছিলাম, যার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম তিনি সে ব্যাপারে ততটাই বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। খাবার সময় সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর খাদ্য পেতাম। সে জন্য হাঁটা দরকার ছিল কিন্তু তাতে আমার মনে হতো কয়েক ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়ে গেল। রায় রামচরণজী কংগ্রেসী ছিলেন, তবে তিনি বেরসিক ছিলেন না। তাঁর পরিবারটি বহু প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবার ছিল। বেশ বড় জমিদারী ছিল তাঁদের। সমস্ত প্রয়াগে বড় পাকা বাড়ির খুব সম্মান ছিল। তবে রায়সাহেব ভবিতব্যের জন্য তৈরি ছিলেন। তিনি জানতেন যে শিগ্‌গির সময় বদলাবে, তাই পিছনের দিকে তাকিয়ে না থেকে সামনের দিক তাকানো উচিত। শুধু তাঁর সাহিত্যানুরাগই নয়, তাঁর উদার চিন্তাধারাও আমাকে এখানে টেনে এনেছিল।

কৃষণ চন্দরের গল্প এবং তাই নিয়ে নির্মিত ফিল্ম 'সরায় কে বাহার'-এর অনেক প্রশংসা শুনে ১৬ অক্টোবর আমিও সেটা দেখতে গেলাম। ফিল্মটা খারাপ ছিল না, তবে সরাইখানার বাইরের ভিখারিনীর মেয়ে সমস্ত আত্মত্যাগের পরেও ন্যায় পেল না, এটা আমার ভাল লাগেনি। যাইহোক, ন্যায় পাইয়ে দেওয়াটা নিজের কাহিনীতে লেখকের অভীষ্টও ছিল না। লেখক চেয়েছিল মানুষ তার প্রতিশোধ নিক।

ডিসেন্ট্রি থেকে মুক্ত হবার পর শরীরের ব্যাপারে সাবধানতার দিকে মন দিয়েছিলাম।

১৭ তারিখ সন্ধেবেলা গঙ্গার ধার পর্যন্ত একঘণ্টা বেড়াতে গেলাম। এইবারই প্রথম আমি গঙ্গাকে দারাগঞ্জের পাশ দিয়ে বইতে দেখলাম। লোকেরা বলছিল যে কয়েকবছর ধরে মা গঙ্গা এরকম দয়া দেখাচ্ছেন। বেড়ানোর ব্যাপারেও আমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না। সন্ধেবেলা বেড়াতে যাবার সময় কেউ এসে গেল বসে পড়তে হতো। এ সপ্তাহে বেশ কয়েকজন বন্ধু দেখা করতে এলেন, যাঁদের মধ্যে শ্রী বেনীপুরী, নাট্যকার পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র, ড· বদরীনাথপ্রসাদ এবং বহু বছর পরে দেখা হওয়া বাবু মহেশ্বরপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ ছিলেন। মহেশ্বরবাবু পরসা (ছাপরা)-তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তাঁর জীবন কাটে মজঃফরপুরে। তাঁর ছোটভাই চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ নারায়ণ সিংহ ইংরেজ আমলে তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, এখন কংগ্রেস নেতাদের। এতে আশ্চর্য হবার কোনো প্রয়োজন নেই— যে প্রত্যেক উদীয়মান সূর্যের সামনে দণ্ডবৎ করার জন্য প্রস্তুত থাকে, দুনিয়া তার সঙ্গে বেইমানী করে না। অথবা এভাবে বলা যেতে পারে—ইংরেজ আমলে কংগ্রেসী নেতারা উচ্চ সম্প্রদায়ে জায়গা পেত না, এখন তারাই সম্মান ও সম্পত্তি অর্জন করে সেই সম্প্রদায়ে সম্মিলিত হয়েছে। তাই চন্দ্রশেখরবাবু এখন তাদের নিজেদের দলের লোক। তাঁর প্রতি ভাল মনোভাব রাখতে আমি যতটা অসমর্থ ছিলাম, ততটাই মহেশ্বরবাবুর প্রতি আমার সদ্ভাব ছিল। তাঁদের পিতা বাবু বৈজনাথ প্রসাদ নারায়ণ সিংহকে আমি পরসাতে দেখেছিলাম। পরসা প্রাচীন কুলীন ভূমিহার ব্রাহ্মণ জমিদারদের একটা দুর্গ। উদারহস্তে অথবা বেহিসেবি খরচের জন্য রাজা থেকে ভিখিরি হতে তাদের বেশি সময় লাগে না, কিন্তু অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ কেবল প্রাচীন ধনী বংশগুলিতে হওয়ার জন্য ভিখারির আবার রাজা হতে দেরি লাগে না। বৈজনাথ বাবুর অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বোনের বিয়ে সুরসরের বড় জমিদার পরিবারে হয়েছিল এবং তারা চন্দ্রেশ্বরপ্রসাদকে দত্তক নিয়েছিল। এইভাবেই তাঁর ভাগ্য খুলে যায়। তিনি ভাল শিক্ষার সুযোগ পান। বুদ্ধিও তাঁর ভালই ছিল। তাঁর ভাইয়েরাও ভাল শ্বশুরবাড়ি পেয়েছিল। সকলেই এইভাবে ভাল অবস্থায় ছিল। কিন্তু মহেশ্বরবাবুর মত উদার তাদের মধ্যে কেউ ছিল না। রোববার মহেশ্বরবাবু তাঁর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ছুটির দিন ছিল বলে আমি তা গ্রহণ করেছিলাম। পরসার ভদ্র পরিবারে মোগলদের থেকে কম কড়া পর্দাপ্রথা ছিল না। কিন্তু আজ দেখছিলাম বাবু বৈজনাথ প্রসাদের নাতনি এ ব্যাপারে একটুও অবহিত নয় যে কোনো একসময় তাদের বাড়িতে এত কড়া পর্দাপ্রথা ছিল। বাবু মহেশ্বরপ্রসাদের ধর্মপত্নীকেও আধুনিক মহিলা বলে মনে হলো। পরিবর্তন হবে নাই বা কেন, যেখানে সারা দেশ আর পৃথিবী জুড়ে তার ঢল নেমেছে। মহেশ্বরবাবু অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন জমিদারিকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, জীবিকানির্বাহের জন্য উপায় খুঁজতে হবে। প্রয়াগের সিভিল লাইনে কোনো ইংরেজ অফিসারের খুব বড় একটা বাংলো ছিল, সঙ্গে কয়েক একর জমি নিয়ে বাগানও ছিল। সুন্দর সুন্দর ফার্নিচার এত বেশি ছিল যে সাজিয়ে রাখার মত জায়গা ছিল না। বাংলোতে কয়েক হাজার ইংরেজি বইয়ের ভাল সংগ্রহ ছিল। ভারত ছেড়ে যাবার সময় ইংরেজরা তাদের জিনিসপত্র জলের দরে বিক্রি করে দিচ্ছিল, কিন্তু তা কেনার অবস্থা লড়াইয়ের সময় চোরবাজারে কোটি কোটি টাকা উপার্জনকারী

শেঠদেরই একমাত্র ছিল। জমিদারের কাছে অত টাকা কোথা থেকে আসবে? এই বাংলোটা মহেশ্বরবাবু কিনেছিলেন। অনেক বছর ধরে তিনি সেখানে এসে থাকতেনও। এবছর (১৯৫৬) জিজ্ঞেস করায় জানলাম যে বাংলোটা তিনি বেচে দিয়েছেন। আজকে পরিস্থিতিতে মজঃফরপুর, পাটনা, প্রয়াগ তিন-তিনটে জায়গায় বাড়ি রাখা বুদ্ধিমানের কাজ ছিল না। অনেকক্ষণ ধরে আমাদের কথাবার্তা চলল। কিশোরীভাইও সঙ্গে ছিলেন। কমরেড কিশোরীপ্রসন্ন সিংহ বিহারের সেইসব দেশভক্তদের একজন যাঁরা নিজেদের সর্বস্ব দেশের লড়াইয়ের জন্য অর্পণ করেছেন এবং কাজ ও চিন্তা এই দু ব্যাপারেই সবসময় সবার সামনের সারিতে থেকেছেন। কংগ্রেসী থেকে তিনি সমাজবাদী হয়েছিলেন। পরে কমিউনিস্ট হন। তাঁর সাহসের প্রশংসা শত্রুরাও করে। সরকারের সঙ্গে লড়াই করাটা তত কঠিন ছিলনা যতটা ছিল সমাজের সঙ্গে লড়াই করা। তিনি তাঁর স্বর্গীয়া স্ত্রীকে একজন কর্মঠ রাষ্ট্রসেবিকা বানিয়ে সে কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন। সেইদিনই ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের সামনে আমাকে বলতে হলো।

শুরু করা কাজ এবার সম্পূর্ণ হওয়ায় বেনারস পর্যন্ত একটু ঘুরে আসার চিন্তা মাথায় এলো। ২৭ অক্টোবর ছোট লাইন ধরে সারনাথ পৌঁছলাম। সেই সময় বার্ষিক উৎসব চলছিল। শীতের সময়টা বিদেশী বৌদ্ধ যাত্রীদের অনুকূল থাকে। বৌদ্ধদের সবথেকে বড় উৎসব বৈশাখী পূর্ণিমা সেই সময়টাতে হয় যখন উত্তর-ভারতে অসহ্য গরম পড়ে, লু লেগে কখনও কখনও মানুষের মৃত্যু হয়। এখানে এসে মহাস্থবির বোধানন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে খুব আনন্দ হলো। যখন প্রথম আমার মনে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা জাগে, তখন সবার আগে তিনিই আমাকে পথ দেখান। তাঁর শিষ্য প্রজ্ঞানন্দকে তখন ভিক্ষু করা হয়। সিংহলে প্রজ্ঞানন্দর জন্ম হয়। শিশুকাল থেকেই তিনি মহাস্থবিরের সঙ্গে থেকেছেন। প্রত্যেক তরুণেরই শিক্ষায় উন্নতি করা উচিত এবং অন্যদেরও সে ব্যাপারে উৎসাহিত করা উচিত। শিক্ষা এবং পরীক্ষার মধ্যে অটুট সম্বন্ধ নেই, আর পরীক্ষা শিক্ষার কষ্ঠিপাথর নয়। হতে পারে সেজন্য মানুষকে পরিশ্রম করতে বাধ্য হতে হয়। সেইজন্যও আমি তা পছন্দ করি। মহাস্থবিরের এই কথাতে তাঁর সঙ্গে আমি একমত ছিলাম না। তাঁর বক্তব্য ছিল—তরুণদের উচ্চশিক্ষা দিলে তাদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা যায় না।

সারনাথেই কোনো একসময় ভিক্ষুসংঘের স্থাপনা হয়েছিল, অথচ এদিকে কয়েক শতাব্দী ধরে সেখানে কোনো ভিক্ষু তৈরি হয়নি। শ্রামণের হওয়া সোজা, কারণ একজন ভিক্ষুও তা হতে পারে, কিন্তু ভিক্ষু হওয়ার জন্য সংঘের প্রয়োজন হয়, যার কোরম[১] মধ্যমণ্ডলে দশ। যে স্থান অথবা ঘরে ভিক্ষু-দীক্ষা-উপসম্পদা দেওয়া হয়, তার সীমাবন্ধন প্রথম থেকেই নিয়ম-অনুযায়ী ভিক্ষুসংঘ দ্বারা হওয়া উচিত। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ হলো, তারপর এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো যাতে সারনাথে উপসম্পদা দেওয়া যায়।

সেদিন দুপুরেই আমি বেনারসে অমৃতের কাছে চলে এলাম। রাতে প্রগতিশীল লেখক

---

[১] *Quorum*—সভার সিদ্ধান্তর জন্য ন্যূনপক্ষে যে-কয়জন ব্যক্তির বা সভ্যের উপস্থিতি প্রয়োজন।—স ম

সংঘের বৈঠক হলো। সুমন তার কবিতা শোনালো, কমরেড গোপাল হালদারও বললেন। রাতেই তিনটের গাড়ি ধরলাম আর ২৯ তারিখ সকাল সাতটায় আমরা প্রয়াগ পৌঁছে গেলাম। সম্মেলনের সভাপতির ভাষণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, কিন্তু গোপালগঞ্জে (ছাপরা) যে ভোজপুরী সম্মেলন হতে চলেছিল তার সভাপতি হতেও রাজি হয়েছিলাম। ভোজপুরী আমার মাতৃভাষা আর হিন্দি আমার নিজের ভাষা, তাই দুটোর প্রতিই আমার ভালবাসা একরকম।

১ ডিসেম্বর রেডিওতে শুনলাম যে, কাশ্মীরে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, তাতে ভারতীয় সেনাকে কোটলী থেকে পশ্চাদপসারণ করতে হয়েছে। জম্মুর কোটলী নামক ছোট শহরটি কতগুলি পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত। আমি তা ১৯২৬ সালে দেখেছিলাম—১৯২৬ সালের সেই সময়ও হিন্দুরা শহরের ভেতরে ছিল, আশেপাশের সমস্ত গ্রাম ছিল মুসলমানদের। আজকের পরিস্থিতিতে এটাই আশীর্বাদ ছিল যেন কোটলীর হিন্দুরা ভালয় ভালয় বেরিয়ে যেতে পারে।

৪ ডিসেম্বর জানতে পারলাম যে শত্রুরা জম্মুর দশ মাইল দূরে পৌঁছে গেছে। এইসব ঘটনা প্রয়াগ থেকে অনেক দূরে ঘটলেও আমাদের সকলেরই চিন্তা হচ্ছিল। মন এমনিতেই সর্বদা চঞ্চল সমুদ্রের মত, তা একরকম থাকতে পারে না, কখনো কখনো যথেষ্ট কারণ ছাড়াই তা অবসাদগ্রস্ত হয়। এর থেকে বাঁচবার একটাই উপায় আছে—মনকে সবসময় কাজে নিযুক্ত রাখা।

৬ ডিসেম্বর চিঠিতে জানলাম হিন্দি, ইংরেজির যে শব্দকোষ আমি লন্ডনে শ্রীমতি দীনা গোল্‌দমানকে পাঠিয়েছিলাম, তিনি তা পেয়ে গেছেন। এ নিয়ে আমি খুবই চিন্তিত ছিলাম। আমার কাছে লন্ডন পর্যন্ত জাহাজের টিকিট আর ওখানেই ভাঙানো যায় এমন চেক ছিল। কোনো বিদেশী মুদ্রা ছাড়াই আমি লেনিনগ্রাদ থেকে রওনা হচ্ছিলাম। সে সময় দীনা তাঁর কাছে পড়ে থাকা কিছু ডলার আমাকে দিয়েছিলেন, যেগুলি স্টকহোম্ ও হেলসিংকিতে আমায় খুবই সাহায্য করেছিল। তার বদলেই আমি বই পাঠিয়েছিলাম। মনে হলো, মাথার থেকে একটা বোঝা নেমে গেল। আমার দ্বিতীয় রাশিয়া যাত্রায় দীনা হিন্দি পড়ছিলেন, আর এখন তিনি লেনিনগ্রাদ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপিকা।

এই সময় মানুষের আর্থিক অবস্থা খুবই করুণ ছিল। জিনিসপত্রের দাম কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। আর তা দুর্লভও ছিল। কনট্রোলের দামে নিয়ন্ত্রণ ছিল। ওদিকে গান্ধীজী আর এক হইচই লাগিয়ে দিয়েছিলেন, কন্ট্রোল উঠিয়ে দিতে হবে। কন্ট্রোলে ২১ টাকা মণ দামে চিনি পাওয়া যাচ্ছিল। কন্ট্রোল উঠিয়ে নেওয়া মাত্র তার দাম ৩৫ টাকা মণ হয়ে গেল। মণ প্রতি ১৪ টাকা সোজা শেঠদের পকেটে চলে গেল। পুরোদমে কালোবাজারী চলছিল,যার জন্য অফিসারদের ঘুষ দেওয়া দরকার ছিল। পুরনো পরম্পরার জন্য ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে খুব সংকোচ ছিল কিন্তু এখন সে বাঁধ দ্রুত ভাঙতে শুরু করেছিল।

৮ ডিসেম্বর[১] ভোজপুরী ভাষণ লেখা শেষ করে পরের দিন 'রোমনী' ভাষার বিষয়েও

[১]মূলগ্রন্থে ভুলবশত 'অক্টোবর' মুদ্রিত হয়েছে।—স·ম·

—১৯৪৭—

একটা লেখা লিখলাম। রোমনীদের ইংরেজিতে জিপসি বলা হয়। কাবুল থেকে শুরু করে সারা ইউরোপ এবং পরে আমেরিকাতেও প্রচুর সংখ্যায় এই যাযাবর মানুষেরা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ভারত থেকেই একসময় তারা সেখানে গিয়েছিল, কিন্তু এখন তারা সেকথা ভুলে গেছে। ভাষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে এইসব তথ্য আমি জানতে পারি। ইংল্যান্ডে বসবাসকারী রোমনীরা যাযাবর জীবন ছেড়ে দিয়েছে, রাশিয়াতেও তারা এখন স্থায়ী বাসস্থান গ্রহণ করছে। তাদের ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষার কত নিকট সম্বন্ধ রয়েছে তা দেখানোর জন্য আমি এই লেখাটা লিখি।

১০ তারিখ পরিমলের সভায় গেলাম। অন্য সব কবিরা ছাড়াও পন্তজী এবং বচ্চনজী তাঁদের কবিতা শোনালেন। এইসব সভার রূপে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন এক নতুন লক্ষ্যের দিকে পা বাড়াচ্ছে। এর খুবই প্রয়োজন আছে।

সেদিন ৫০০০-এর কিছু বেশি আয়ের ওপর আমি ইনকাম ট্যাক্সের হিসেব পাঠালাম। এতদিন এর প্রয়োজন পড়েনি। আয় শুধুমাত্র বইয়ের রয়ালটির ছিল, এবং তা ইনকাম ট্যাক্সের সীমার মধ্যে পড়ত না। হিসেব দেবার সময় এও দেখা গেল যে এখন আয়ের হিসেব রাখতে হবে এবং তা ঠিক রাখার জন্য টাকা কোনো ব্যাঙ্কে রাখা দরকার। জানলাম রাশিয়ায় থাকবার সময় আমার যা আয় হয়েছে তার ওপরও ট্যাক্স দিতে হবে। নাগরিক জীবনের এটা একটা প্রয়োজনীয় বোঝা।

১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রয়াগে থেকে কলম চালিয়ে গেলাম। ১২ তারিখ পেটে আবার গণ্ডগোল শুরু হলো। সাত-আটদিন পর এখান ছেড়ে যাবার কথা ছিল তাই এই গণ্ডগোল ঠিক করা দরকার ছিল। ১৫ ডিসেম্বর পেটে মৃদু ব্যথা শুরু হলো, ঠিক তেমনি যেমন ১৯৪৩-৪৪-এ বোম্বাইতে হয়েছিল। সেখানে জলে সোডা মিশিয়ে খেলে ব্যথা কমে যেত, এখানেও আমি সেই ওষুধ ব্যবহার করতে শুরু করলাম। সেবারও এই ব্যথাটা ঠিক বুঝতে পারিনি, এবারও পারলাম না। আমি এটাকে সাধারণ পেটব্যথা ভাবতাম কিন্তু আসলে তা ডায়বেটিসের পূর্বসূচনা ছিল। অগ্ন্যাশয় পেটের ভেতর সক্রিয় থেকে খাদ্যের শর্করাকে উপযুক্ত করতে তার রস (ইন্‌সুলিন) প্রদান করে। এই গ্রন্থি কাজ করা ছেড়ে দিলে আর ইন্‌সুলিন পাওয়া যায় না এবং তখন খাদ্য শর্করা রূপে পরিণত হয়ে বাইরে যেতে বাধ্য হয়। অগ্ন্যাশয় কেন কাজ করা ছেড়ে দেয়, কেন তা নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে? শারীরিক পরিশ্রম না করা এবং অধিক পুষ্টিকারক খাদ্য গ্রহণ করাই এর কারণ। এ সমস্ত কথা তখন আমি বুঝতে পারিনি। আর বুঝতে পারলেও যে তখন আমি তা আটকাতে পারতাম, তাতে সন্দেহ আছে। অবস্থা বোধহয় এখন হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। কত সরলভাবে ১৯ ডিসেম্বর আমি লিখেছিলাম—'পেটে যখন-তখন মৃদু ব্যথা হয়, সোডা খেলে তা সেরে যায়।'

'রোমনী ভাষা'র পরে রুশ ভাষার সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত লেখা লিখব বলে ঠিক করলাম, যার ভূমিকাটুকুই শুধু আগে লেখা হলো। ১৭ ডিসেম্বর প্রগতিশীল লেখক সংঘে অভিনন্দন নিতে গেলাম। পন্ত, বচ্চন, শ্রীনাথ ঠাকুর, নির্মল প্রভৃতি প্রয়াগের সমস্ত সাহিত্যিকদের দর্শন পেলাম।

গোপালগঞ্জ—১৯ ডিসেম্বর সকাল সাতটায় ছোটলাইনের গাড়ি ধরলাম। দুপুরবেলা বেনারস পৌঁছলাম। গাড়িতে খুব ভিড় হয়েছিল। লোকেরা মনে করেছিল স্বাধীনতার অর্থ রেলে শ্রেণীভেদ না রাখা, কিন্তু টিকিটের পয়সা শ্রেণী হিসেবেই নেওয়া হতো। সাধারণ লোককে এজন্য দোষ দেওয়া যেত না। এমন সাহসের কাজ শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত সকলেই করছিল। সন্ধে সাড়ে সাতটায় আমরা ছাপরা কাছারি স্টেশনে পৌঁছলাম। কিছুক্ষণ পরে গোপালগঞ্জ যাবার গাড়ি পাওয়া গেল। সেই গাড়ি রাত দেড়টার সময় হরখুবা স্টেশনে পৌঁছল। ছাপরাতেও স্টেশনে কাউকে পাওয়া গেল না, কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি, কারণ আমাদের পরের গাড়ি ধরতে হতো। রাত দেড়টার সময় হরখুবাতে নেমে এখন কি করার ছিল? অতিথিশালায় বিছানা পেতে শুয়ে থাকা ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় ছিল না। সব থেকে অসুবিধে এটাই হলো যে, তেষ্টা মেটাবার জন্য জল পেলাম না।

২০ তারিখ সকাল হলো। খবর পাঠিয়ে নগীনাবাবু আর মহেন্দ্র শাস্ত্রীকে ডেকে আনালাম। বস্তুত এখানের লোকেদের কোনো দোষ ছিল না। তারা ভেবেছিল আমরা রাতটা ছাপরায় থেকে সকালে সেখান থেকে রওনা হব। রাতটা শুধু পিপাসার্তই থাকলাম তা নয়, পেটের মৃদু ব্যথা চাপা দেবার জন্য সোডাও খেতে পেলাম না।

একসময় গোপালগঞ্জ আমার কাছে নিজের ঘরের মত ছিল। অসহযোগের সময় কতবার যে এখানে বক্তৃতা দিয়ে সমস্ত সাব-ডিভিসন ঘুরে বেড়িয়েছি তার ঠিক নেই। সেই যুগ পার হয়ে শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ কেটে গেছে। এর মধ্যে সে সময়ের প্রজন্ম বৃদ্ধ হয়ে গেছে। তার জায়গায় নতুন প্রজন্ম এসেছে। এখানে আমার অনেক পুরনো সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা হবার সৌভাগ্য হলো। আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী একমার বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ, বাবু প্রভুনাথ সিংহ, কটিয়ার বাবু মহাদেব রায়, ছাপরার বাবু জলেশ্বরপ্রসাদ, এই গোপালগঞ্জেরই বাবু ঝুলনসিংহ আর বাবা ঝাড়ুদাস—যাঁকে আমরা মহেন্দ্রসিংহ বলে ডাকতাম—এঁদের সঙ্গে দেখা হলো। ছাপরার সর্বপ্রথম অ্যাসেম্বলি মেম্বার হরিজন নেতা বসাবনরামও ছিলেন, আর ছাপরার প্রথম হরিজন গ্রাজুয়েট ও এম· এ· চন্দ্রিকাপ্রসাদ রামও ছিলেন। ছটা থেকে সম্মেলন শুরু হলো। সভাপতির এবং আরো অন্য কিছু লোকের ভাষণ হলো। এরপর ভোজপুরী কবিতাপাঠ শুরু হলো। বাবু মুখরাম সিংহ বিসরামের বিরহা শোনালেন। শ্রোতারা চোখের জল রোধ করতে পারছিল না। খুবই উৎসাহের সঙ্গে সম্মেলন হচ্ছিল, নিজের মাতৃভাষার প্রতি প্রেম কৃত্রিম হতে পারে না। ভোজপুরী ভাষার নিজস্ব স্থান পেতে এখনও যথেষ্ট দেরি আছে তা অবশ্যই বোঝা যাচ্ছিল।

পরের দিনও সম্মেলনের অধিবেশন হলো। সেইদিনই আমার গুরুভাই পরসার বীর রাঘবদাসজী দেখা করতে এলেন। তাঁর সঙ্গে জানকীনগরের বাবু সুরতসিংহও ছিলেন। জানতে পারলাম যে মোহান্ত লক্ষ্মণদাসজী অযোধ্যাতেও একটি জায়গায় ছাউনি করেছেন, আর এখন তিনি বেশিরভাগ সময় সেখানেই থাকেন। মঠের ঋণ শোধ করার চিন্তা তাঁর কখনই ছিল না। সুরতসিংহ আমাকে জানকীনগরে যাবার জন্য বললেন। সিওয়ান থেকেও বন্ধুরা যাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছিল। বসতপুরেও এরপরে ভোজপুরী জেলা সম্মেলন

হবার ছিল, যেখানে যাবার জন্য মহেন্দ্র শাস্ত্রী খুব জোর দিচ্ছিলেন। কিন্তু এখন সময়ের অভাবের প্রতি নালিশ সবসময়েই ছিল। এই যাত্রায় নাগার্জুন সঙ্গে ছিলেন।

২১ তারিখ চন্দ্রিকারামজীর বাড়িতে ভোজ ছিল। চন্দ্রিকারামজী এখন শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ভিন্ন শ্রেণীতে উঠেছিলেন—এম· এ·, বি· এল· এবং অ্যাসেম্বলি মেম্বার ছিলেন। তাই তাঁর ভোজে উঁচু জাতির লোকেরাও মন খুলে যোগ দেবে, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? সম্ভবত আমার পছন্দের কথা চিন্তা করেই চন্দ্রিকাবাবু খুব ভাল মাছ রান্না করিয়েছিলেন।

খাবার পর আমরা স্টেশনে পৌঁছলাম, সেখান থেকে রাতে ছাপরা পৌঁছে সকাল হবার অপেক্ষায় স্টেশনের অতিথিশালায় আশ্রয় নিলাম। এখানেই আমার বন্ধু হুসেন মজহরের সঙ্গে দেখা হলো—হুসেন মজহর আমাদের মহান নেতা মজহরুল হক-এর একমাত্র জীবিত পুত্র। অমবারীর কৃষক-সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে তিনি আমার সঙ্গে জেলে গিয়েছিলেন। বাবার মত তিনিও খুব উদার চিন্তাধারার মানুষ ছিলেন। মজহরুল হককে তো আমি মানুষ না, দেবতা মনে করতাম। তাঁর মধুর স্মৃতি আমার মনে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। আমি অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, যদিও তাঁর অথবা তাঁর পরিচিত কারো কোনো ক্ষতি হয়নি, কিন্তু তিনি নিজের অবস্থার ব্যাপারে নিরাশ ছিলেন। তবুও একথা শুনে আনন্দ হলো যে, এমন নৈরাশ্যের মধ্যে থেকেও তিনি নিজের ঘর ছেড়ে যেতে রাজি হননি। সেটা কালরাত্রি ছিল। তবু একদিন তো তাকেও শেষ হতেই হতো।

২২ তারিখ সকাল ছটার সময় প্রয়াগ যাবার ট্রেন পেলাম। এমনিতে রেলযাত্রা আমাদের দেশে খুব কমই সুখকর হয় আর এখন তো তা পুরো বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধীরে ধীরে ট্রেন পশ্চিমের দিকে এগোতে থাকল। সারারাস্তা ধুলো খেতে হলো। সন্ধে সাতটার সময় আমরা দারাগঞ্জে পৌঁছলাম। আর মাত্র একদিন থেকে আমাদের বোম্বাই-এর জন্য রওনা হবার ছিল।

পরের দিন বোম্বাই-এর জন্য লেখা ভাষণও ছেপে এলো। সেদিনই ট্রেনের টিকিটও কাটলাম। দীর্ঘ যাত্রা ছিল। সেকেন্ড ক্লাশে আবার সেই বিপদে না পড়তে হয় তাই ফার্স্ট ক্লাশেরই টিকিট কাটতে হলো। তার জন্য ১০০ টাকা ৯ আনা দিতে হলো। ২৪ তারিখ সন্ধেয় আমরা বোম্বাই-এর উদ্দেশে রওনা হলাম।

বোম্বাইয়ে সম্মেলন

বোম্বাই—আমার কম্পার্টমেন্টে আমি একা ছিলাম। এখন আর তেমন পরিস্থিতি ছিল না যে কম্পার্টমেন্টে একলা সফর করাটা বিপজ্জনক। এই ট্রেনেরই অন্যান্য কামরায় প্রয়াগের

বহু সাহিত্যিক যাচ্ছিলেন। রাতে চুপচাপ শুয়ে পড়তে হলো। সকালবেলা ট্রেন জব্বলপুরে পৌঁছল। ইটারসিতে দুপুরের খাবার খেলাম। নাগার্জুন তো সঙ্গেই ছিলেন, অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গেই গল্পগুজব করতে করতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এই সময় আমি আমার গত সাড়ে তিনমাসের হিসেব করে দেখলাম প্রতিমাসে হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এত খরচ করা আমার ক্ষমতার বাইরে ছিল। রয়াল্টি থেকে বার্ষিক বারো হাজার টাকা পাবার জন্য এখনও অর্ধশতাব্দী অপেক্ষা করা প্রয়োজন। আমার মত খ্যাতিমান লেখকেরই যখন এই অবস্থা, তখন অন্যদের সম্বন্ধে কি বলা যায়? লেখকদের এই অবস্থা দূর করতে এখনও অনেক দেরি।

২৬ তারিখের সন্ধে ছটায় আমাদের ট্রেন বোম্বাই-এর ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌঁছল। আমি সম্মেলনের সভাপতি ছিলাম, তাই স্বাগত জানানোর জন্য বহু লোক এসেছিলেন। হয়তো পরের দিন শোভাযাত্রাও বার করা হতো, কিন্তু বোম্বাইতে সাম্প্রদায়িক ঝগড়া হচ্ছিল, ছোরাছুরি চলছিল। শোভাযাত্রার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাওয়ায় আমার খুব আনন্দ হলো। থাকার জন্য মালাবার হিলে শ্রীঘনশ্যামদাস পোদ্দারের বাড়ি ঠিক করা হয়েছিল। এখানে আমি ছাড়াও আরো অনেক সাহিত্যিক-অতিথি উঠেছিলেন। একই জায়গায় সকলের জিনিসপত্র, ওঠা-বসা-শোওয়া সবকিছু। বোম্বাই গেলে পোদ্দারজীর বাড়ি আমার জন্য সবসময় খোলা থেকেছে, আর আমার মনে হতো সেটা এমন একটা বাড়ি যেখানে থাকলে মানুষ গভীর আত্মীয়তা অনুভব করতে পারে। ঘনশ্যামজী অত্যন্ত সাদাসিধে মধুর স্বভাবের মানুষ। কিন্তু এত বেশি সরল হলে তাঁর কোটি কোটি টাকার ব্যবসা কি করে চালাবেন? সেইদিন আনন্দজীও এসে পড়লেন। স্বাধীনতার পর এটাই হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন, সেজন্য প্রতিনিধির সংখ্যা আগের থেকে অনেক বেশি ছিল। সভাপতির পদ যখন গ্রহণ করেছি, তখন তা হাল্কামনে পালন করতে চাইনি। লিপি-সংস্কার এবং পারিভাষিক শব্দ নির্মাণের দিকে আমার বিশেষ নজর ছিল। লিপি-সংস্কারের পরিকল্পনা আমি আগেও একবার করেছিলাম, এবারের ভাষণেও তা পেশ করলাম। পরিভাষার কাজ কঠিন তা আমি মানি কিন্তু তাকে অসম্ভব বলে মনে করি না।

২৬ ডিসেম্বর আমি পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসে গেলাম। পার্টির বন্ধুরা আমার ভাষণের কপি পড়েছিলেন। হিন্দি-উর্দু সম্বন্ধে যে মত আমি তাতে প্রকাশ করেছিলাম এবং মুসলমানদের বলেছিলাম কয়েক শতাব্দীর সাংস্কৃতিক বয়কট ত্যাগ করে সাংস্কৃতিক একতা স্থাপন করতে তারা এগিয়ে আসুক, তাতে আমার কমরেডদের মতবিরোধ ছিল। তারা চাইছিলেন আমার ভাষণ থেকে এই অংশটুকু আমি কেটে দিই। ছাপার আগে যদি তারা আমাকে এই পরামর্শ দিতেন তবে হয়তো বা আমি তা বাদ দিয়ে দিতাম। আমি ব্যক্তিগত মতের থেকে দলীয় মতকে বড় এবং অনুশাসনকে একটি বড় ও প্রয়োজনীয় গুণ বলে মনে করি। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যদিও আমার সম্পর্ক আট বছর আগে হয়েছে, তবু যেদিন থেকে আমার হৃদয়ে রাজনৈতিক চেতনার উদয় হয়েছে সেদিন থেকে আমি তাকে আমার নিজের বলে মনে করি। ১৯১৭-র নভেম্বরে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব হয়। তার দু-একমাস পরেই সে খবর আমি ভারতের সংবাদপত্রে পড়ি। তখন থেকেই আমার কাছে

সেই বিপ্লব সবথেকে বেশি শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেছে, তখন থেকেই সাম্যবাদ আমার নিজস্ববাদ হয়ে গেছে। যোগাযোগ হয়নি তাই পার্টির অন্তর্ভুক্ত হতে আমার কুড়িবছর লেগে গেছে। পার্টির অন্তর্ভুক্ত না হয়েও আমি সবসময় নিজেকে পার্টিরই মনে করেছি। সামান্য ব্যক্তিগত ভাবনার জন্য কি আমি পার্টি ত্যাগ করতে পছন্দ করতাম? সেইসময় সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি তবুও আমার হৃদয় অত্যন্ত অস্থির হয়েছিল। ভাষণের সেই অংশটুকু বাদ দেওয়া এখন সম্ভব ছিল না, আর প্রতিবাদ করাটা আরো খারাপ হতো।

বোম্বাই-এ সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি খুবই উগ্ররূপ নিয়েছিল। বহু মুসলমান তাদের জীবন অরক্ষিত মনে করে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। বোম্বাই-এর খুব কম মুসলমান শেঠই পাকিস্তানে গিয়েছিল। হ্যাঁ, গরিবরা অবশ্যই বেশি সংখ্যাই গিয়েছিল।

২৭ তারিখ স্থায়ী সমিতি (বিষয় নির্বাচনী)-র বৈঠক হলো। সম্মেলনের জন্য কিছু প্রস্তাব গৃহীত হলো। সেদিন প্যান্ডেলে সংস্কৃত সম্মেলনও হলো, যেখানে পণ্ডিতদের ভাষণ শুনে মনে হলো এখনও তাঁরা তাদের পুরনো জগতেই রয়েছেন। সাড়ে এগারোটার সময় মুদ্রা-সম্মেলন শুরু হলো, সেখানে বিশেষ করে ভরতপুরের মহারাজা তাঁর রাজ্যে পাওয়া মুদ্রাগুলি দেখাতে এনেছিলেন। মুদ্রা-সম্মেলনে অন্যান্য জায়গা থেকেও লোক এসেছিলেন। ড· অল্‌তেকর ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ভিয়েনাতে এই মুদ্রাগুলি সম্বন্ধে বলেছিলেন। গুপ্তযুগের ১৮০০টি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল, যার মধ্যে কতকগুলি মুদ্রা তো ছিল অদ্বিতীয়। কিন্তু এই মুদ্রাগুলিকে সাধারণ মুদ্রা বলে মনে করা হচ্ছিল অর্থাৎ তার মধ্যে যতটা সোনা আছে ততটাই তার মূল্য ধরা হচ্ছিল। মুদ্রাগুলি নিয়ে যথেচ্ছাচার করা হয়েছিল। প্রথমে তো গ্রামের লোকেরা সেগুলির থেকে কিছু মেরে দেয়, তারপরে রাজ্যের অফিসারেরা হাত সাফাই করল। যে কটা মুদ্রা মহারাজের কাছে এসে পৌঁছল তার মধ্যে বেশ কিছু মহারাজ তাঁর কৃপাপাত্রদের দান করলেন, তাঁরা সেগুলি দিয়ে বোতাম বানালেন। বাইরের জগতের বিদ্বানদের কাছে খবর পৌঁছতে সময় লেগেছিল। তখন তার গুরুত্ব বোঝা গেল এবং সেগুলি রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করা হলো। ভরতপুরের মহারাজা যদি একশো বছর আগেকার মহারাজা হতেন তাহলে এটা অসাধারণ ব্যাপার হতো না। কিন্তু আমাদের এখনকার মহারাজা আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত, সব ব্যাপারে তিনি ইংরেজদের পদচিহ্ন অনুসরণ করেন। তিনি হাজার বছর আগেকার এই মুদ্রাগুলির গুরুত্ব বুঝতে পারলেন না। এর থেকে বোঝা যায় যে তাঁর ওপর সংস্কৃতির প্রলেপ খুব ওপর ওপর পড়েছে।

সেদিন রাত্রের খাওয়া ক· মা·[১] মুন্সীর বাড়িতে হলো। মুন্সীজী সম্মেলনের প্রাক্তন সভাপতি এবং গুজরাটী ভাষার যশস্বী সাহিত্যিক ছিলেন।

২৮ তারিখ ৩টার সময় সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হলো। প্যান্ডেলে প্রায় আট-দশ হাজার লোক হয়েছিল। যুক্তপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্ত ৪৫ মিনিট ভাষণ দিয়ে অধিবেশনের উদ্‌ঘাটন করলেন। ভাষণে তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে হিন্দির

[১]কানহাইয়ালাল মানিকলাল মুন্সী।—স·ম

সমর্থন করেন। স্বাগতাধ্যক্ষ শ্রীখৈতান তাঁর ভাষণ পড়লেন। এরপর সেখানে উপস্থিত সম্মেলনের ভূতপূর্ব সভাপতিরা—শ্রীবিয়োগী হরি, শ্রীমাখনলাল চতুর্বেদী এবং শ্রীকানহাইয়ালাল মুন্সী—সভাপতি হিসেবে আমার নাম আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব করলেন। আমার ভাষণ দীর্ঘ ছিল, আমি তার কিছু অংশ পড়ে ৩০ মিনিটের মধ্যে তা শেষ করলাম। ভাষণের আগে কমরেড অধিকারী পার্টির তরফ থেকে আবার জোর দিয়ে লিখেছিলেন যে, আমার উর্দুসম্বন্ধীয় ভাবধারার ব্যাপারে আমি কিছু বলি এটা পার্টির মত নয়। আমি সেদিনই কমরেড অধিকারীকে লিখলাম যে, পার্টির এই নীতিকে আমি সমর্থন করি না বলে আমি নিজেকে পার্টি থাকার যোগ্য বলে মনে করছি না, কিন্তু পার্টিকে আমি সবসময় আমার সঙ্গে রাখব। এত বড় একটা সিদ্ধান্ত আমি একরকম অস্থিরচিত্ততার মধ্যে নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন সেই সিদ্ধান্ত বদলাতে বহুবছরের প্রয়োজন ছিল। সেই সময় আমি ভেবেছিলাম জাতীয়তার ব্যাপারে পার্টির লোকেরা হাল্কা মন নিয়ে চিন্তা করছে এবং সংকীর্ণ মতবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে দূরভবিষ্যতে সম্ভাব্য প্রভাব কি হতে পারে তা বুঝতে পারছে না। তবে এমন বোঝায় যদি ক্রটি ছিল তবে তা একজনের নয়, তা বহু মস্তিস্কের চিন্তার পরিণাম। যদি ভুল হচ্ছিল তবে পার্টিই তা নিজে থেকে সংশোধন করে নিত।

সেদিন সকালে বিষয় নির্বাচনী সমিতির সামনে আমি পরিভাষা নির্মাণের প্রস্তাব রাখলাম। শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডনজী বললেন, 'যদি আপনি নিজে এ কাজের দায়িত্ব নেন তবেই এ কাজ হওয়া সম্ভব।' আমি তা স্বীকার করলাম, এবং পরবর্তীকালে তার জন্য তৎপরতার সঙ্গে কাজও করেছি। অন্য বাধা উপস্থিত না হলে, এই পংক্তিগুলো লেখার আগেই চার-পাঁচ লক্ষ পরিভাষা তৈরি হয়ে যেত এবং হিন্দি ও ভারতের অন্য ভাষাগুলিও এ ব্যাপারে স্বাবলম্বী হয়ে পড়ত।

২৯ ডিসেম্বর আড়াইটের থেকে মুক্ত অধিবেশন হলো, যেখানে অনেক প্রস্তাব পাশ হলো, অনেক ভাষণ হলো। সেদিন লোকগীত সম্মেলন হলো, তবে নকল লোকগীত কখনোই তার প্রভাব ফেলতে পারে না। যোগ্য শিল্পীদের দিয়ে আসল লোকগীত পরিবেশন করাটা এখন অনেক দূরের ব্যাপার ছিল।

৩০ তারিখে শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীর সভাপতিত্বে সমাজ-বিজ্ঞান-পরিষদ গঠিত হলো। ত্রিপাঠীজী হিন্দি শুদ্ধ সাহিত্যিক ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তাদের একজন, আর সমাজবিজ্ঞান তো তাঁর নিজের বিষয়। সেইদিন অপরাহ্নে পদাধিকারীদের নির্বাচন হলো। ড· উদয়নারায়ণ তিওয়ারী মাত্র দুটো ভোট বেশি পেয়ে প্রধানসচিব নির্বাচিত হলেন। এটা শুভলক্ষণ ছিল না। অন্যান্য পদাধিকারীদের নির্বাচনেও মতবিরোধ দেখা গেল। তখন প্রয়াগবাসী এবং অ-প্রয়াগবাসীদের মধ্যে তফাৎ করা হতো। অ-প্রয়াগবাসীদের নালিশ ছিল যে অধিকাংশ পদাধিকারী প্রয়াগবাসীরা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা জানিয়ে দিল যে বাইরে থাকা পদাধিকারীরা তাদের কর্তব্যপালনের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। এ ছাড়া ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটির বাইরের লোকের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছিল। ইউনির্ভাসিটিতে না থাকা সাহিত্যিকরা এটা চাইতেন না যে সব ব্যাপারে ইউনিভার্সিটির প্রফেসররা এগিয়ে থাকুক। বীজরূপে হলেও কিছু কিছু দারাগঞ্জবাসী এবং অ-দারাগঞ্জবাসী

বিভেদও ছিল, তবে এখনও প্রকাশক এবং অ-প্রকাশকদের বিভেদ ফুটে ওঠেনি, সেটাই গিয়ে সম্মেলনের নৌকোটিকে ঘূর্ণির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।

৩১ ডিসেম্বরে ১৯৪৭ সাল শেষ হতে চলেছিল। সে দিন সকালে দর্শন-পরিষদ হলো, আর বিকেল চারটের থেকে মুক্ত অধিবেশন শুরু হয়ে আটটার পর শেষ হয়ে গেল।

শেঠ ঘনশ্যামদাস পোদ্দারের সুন্দর আতিথ্য আমরা পেয়েছিলাম, আর সেই সঙ্গে তাঁর পরিবারকে কাছের থেকে দেখার সুযোগও। এক প্রজন্মের পরে কিভাবে গুণগত পরিবর্তন ঘটে তার উদাহরণ এই পরিবারটি। ঘনশ্যামদাসকে মারোয়াড়ীর থেকে বেশি গুজরাটী বলে মনে হতো। বিশেষ বিশেষ সময়ে কেবল তিনি মারোয়াড়ী পাগড়ি পরার প্রয়োজন বোধ করতেন। শেঠানী হিন্দিতে পড়াশোনা করেছেন, এখন ঘাঘরা ছেড়ে শাড়ি ধরেছিলেন। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হচ্ছিল, এর ফলে আগামী প্রজন্ম আরো দু-পা সামনে এগিয়ে যাবে, এতে সন্দেহ নেই। যদিও এখন পর্যন্ত তিনি নিরামিষাশী, কিন্তু ছেলেদের ব্যাপারে সে আশা করা যায় না, তবে তাঁর বাড়িতে ছুঁৎমার্গ ব্যাপারটা একেবারেই ছিল না। সাহিত্যিক-অতিথিদের সেবার ব্যাপারে অধিক তৎপরতা জানিয়ে দিচ্ছিল যে, সাংস্কৃতিক কর্তব্যে তিনি কতটা এগিয়ে আছেন।

প্রয়াগে থাকতেই পেটে মৃদু মৃদু ব্যথা হচ্ছিল, সেটা এখানে এসেও হচ্ছিল। বোম্বাই-এ ব্যথা হলে আমি এভ্রুজ সল্ট খেয়েছি, তাতে কিছুক্ষণের জন্য ব্যথাটা চাপা পড়ত। এখনও এঝ্‌ৈং্‌জ সল্ট খাচ্ছিলাম, আরএই বুঝে সন্তুষ্ট ছিলাম যে এটা একটা বিশেষ ধরনের পেট ব্যথা। একদিন কেউ প্রস্রাবাগারে পিঁপড়ে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কার প্রস্রাবের সঙ্গে চিনি যাচ্ছে?' এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহও ছিল না। কিছুদিন পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, সে রোগের রোগী আমিই।

১৯৪৭ শেষ হবার সঙ্গে ডায়বেটিস আমার জীবন-সঙ্গিনী হলো। সারাবছরের হিসেব করে দেখলাম, 'সোভিয়েত ভূমি' (দ্বিতীয় সংস্করণ), 'সোভিয়েত মধ্য-এশিয়া', আর 'দাখুন্দা' এই তিনটি বই লিখেছি। এই সঙ্গে কিছু প্রবন্ধ আর লিখিত ভাষণও তৈরি হয়েছিল। শেষমেশ এটা তিন মাসেরই উপার্জন, তবু খারাপ বলা চলে না। সামনের বছর বই লেখার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে পরিভাষার কাজেও হাত লাগাতে হতো, তাই কটা বই লিখতে পারব তা কি করে ঠিক করতে পারতাম? কিন্তু রাশিয়া থেকে ভারতে ফেরার একটা বড় কারণ ছিল বই লেখার আকাঙ্ক্ষা, বিশেষ করে 'মধ্য-এশিয়া কা ইতিহাস', যেটাতে হাত দেবার কথা আমি এখনও ভাবিনি।

সাহিত্য-যাত্রা

১৯৪৮ সালের প্রথম দিন বোম্বাইতে এলাম। সম্মেলনের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। বড় অমঙ্গলের চেহারা নিয়ে নববর্ষের দিনটির শুরু হলো। ৩১ তারিখে ছাত্রসংঘ তাদের সম্মেলন করতে চেয়েছিল, সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করল। তা অমান্য করায় কাঁদানে গ্যাস ও গুলি চালানো হয়। অহিংসার সব থেকে বেশি ঢোল পেটায় যে সরকার, তার কাছেই গুলিবৃষ্টি খুব সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দু-মুসলমান মনোমালিন্যকে তাতিয়ে তোলার লোকের অভাব ছিল না। ছাত্রসংঘ এর বিরোধী ছিল। উচিত ছিল, নিজের প্রচারে তাদের উৎসাহিত করা। কংগ্রেস যদি সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দূর করতে চাইছিল, তাহলে নিজের সহায়ক-শক্তিকে দুর্বল করাটা উচিত হয়নি। নিজের ছেলেমেয়েদের ওপরেই তো গুলিবর্ষণ করা হচ্ছিল, বহু ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছিল। এ সেই সময়কার কথা যখন কাশ্মীরে যুদ্ধ চলছিল, হায়দ্রাবাদ বুকের কাঁটা হয়ে উঠেছিল, দেশের ভেতর রাজ্যগুলির প্রতিক্রিয়াশীল রাজারা এবং তাদের অনুচররা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না, আর্থিক দিক থেকে দেশ অত্যন্ত দুর্বল ছিল। দেশের সামরিক শক্তি পরীক্ষা করে দেখার এটাই ছিল সময়। কৃষক এবং মজুর অর্থাৎ জনতার সবথেকে বড় অংশ যারা, তারাই এই সময় প্রিয় হওয়া উচিত ছিলো। তাদের নেতাদের মধ্যে কোনো কংগ্রেসী নেতার থেকে কম দেশভক্তি ছিল না। ইংরেজদের চালাকি, জেল এবং গুলি দিয়ে স্বাধীন ভারতকে সবল করা সম্ভব হলো না। সরকার একদিকে সবাইকে এক হবার জন্য বলত আর অন্যদিকে এই রকম আচরণ করত।

এতদিনে পশ্চিমী-পাকিস্তান বিশেষ করে পাঞ্জাব এবং পশ্চিম-উত্তর সীমান্ত হিন্দুশূন্য হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে শুকনো পাতার মতন যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যুদ্ধের সময় ইংরেজরা সৈনিকদের জন্য বহু ক্যাম্প বানিয়ে দিয়েছিল, যেগুলি এই সময় খুব কাজে দিল। বোম্বাইতে এরকম বড় বড় তিনটে ক্যাম্পের মধ্যে দুটোতে সিন্ধী এবং একটিতে পাঞ্জাবীরা থাকত। সব শহরেই সিন্ধীরা অফিস ক্লার্ক, ছোটখাটো দোকানদারি এবং মিস্ত্রির কাজই করতে পারত। তিনটি ক্যাম্প মিলিয়ে হয়তো ১৫ হাজার নরনারী সেখানে ছিল। সাহায্যের ব্যাপারে এখনও সরকারি নীতি পরিষ্কার হয়নি। আশা করা হচ্ছিল যে, মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী সমিতি এবং অন্য ব্যবসায়ীরা এই ভার বহন করবে। তারা সাহায্য করছিলও, তবে কতদিন? খাবারের ব্যবস্থা খারাপ ছিল না, কিন্তু বহুলোকের মাথার ওপর পাকা অথবা টিনের ছাত ছিল না। যদি বৃষ্টি হয়, তখন কোথায় যাবে? শিক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক ছিল। একই রকম বিপদে আক্রান্ত নানান জায়গার মানুষ যখন চব্বিশ ঘণ্টা একই জায়গায় থাকতে বাধ্য হতো, তখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হতো। শিক্ষার জন্য অবৈতনিক শিক্ষিকাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু তাদের পক্ষে মন দিয়ে এই বেগার খাটা কতদিন সম্ভব ছিল?

কাশ্মীরে পাকিস্তান সরাসরি যুদ্ধ করছে একথা কারো কাছে গোপন ছিল না। প্রথমে পাকিস্তান তা মানতে চায়নি। ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘের কাছে নালিশ জানালো। রাষ্ট্রসংঘ তো আমেরিকা আর তার খোসামোদকারী ইংল্যান্ডের লেজুড় হয়ে গিয়েছিল। এই দু দেশ চাইছিল যে কাশ্মীর পাকিস্তানের হাতে চলে যাক, তাহলে তারা সোভিয়েত রাশিয়ার সীমানায় উরু চাপড়ানোর সুযোগ পাবে।

রায়পুর—২ তারিখের কলকাতা মেলে আমি রায়পুরের উদ্দেশে রওনা হলাম। সকাল ছটায় আনন্দজী ওয়ার্ধাতে নেমে গেলেন। তাঁর টিকিটও রায়পুর পর্যন্ত ছিল, কিন্তু সেখানে যে তিনি পৌঁছতে পারবেন এ ব্যাপারে সন্দেহ ছিল। নাগার্জুনজীর সঙ্গে আমি এগিয়ে গেলাম। সামনে গোন্দিয়া পর্যন্ত গাড়িতে খুব ভিড় ছিল না। তারপর বেশি বেশি লোক উঠতে লাগল। ছত্তিশগড় পাহাড়ী দেশ, কিন্তু সেখানে বছরে ৫০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, সেইজন্য পাহাড়গুলি সবুজ জঙ্গলে ঢাকা থাকাটা স্বাভাবিক। পাহাড়ী জঙ্গলে বাঁধ বেঁধে দিয়ে সমুদ্রের মত জলাধার বানানো সহজ। তা থেকে শুধু সেচের কাজ নয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন করাও সহজ হতে পারে। ছত্তিশগড়ে এই সুবিধে আছে,তার থেকেও বেশি এখানে খনিজ পদার্থের পূর্ণ ভাণ্ডার আছে, যে কারণে ভিলাই-এর লৌহ কারখানা তৈরি হতে চলেছিল। ছত্তিশগড়ে জেলাগুলি ছাড়া ১৪ জন পরমভট্টারক রাজাও ছিলেন, অর্থাৎ তাঁদের অধিকার ভারত সরকার নিয়ে নিয়েছিল—তাঁদের বার্ষিক পেন্সন দেওয়া হবে এবং খেতাব ও সম্মান আগের মত থাকবে। ১ জানুয়ারি থেকে এই রাজ্যগুলিকে মধ্যপ্রদেশের শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একইভাবে উড়িষ্যার রাজ্যগুলিকে উড়িষ্যার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরাইকেলা আর খরসওয়াকে উড়িষ্যার মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া নিয়ে বিহারের পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হচ্ছিল, পরে তা বিহারকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ব্যাপার নিয়ে এ বছর উড়িষ্যায় বিরোধিতার আগুন জ্বলে উঠেছে। এই দুটি রাজ্যের ভাষা যদি উড়িয়া হয় তবে তাদের উড়িষ্যাকেই দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যে কোনো প্রদেশের লোকেদের সবথেকে শক্তিশালী পারস্পরিক বন্ধন যে ভাষা, তাকে আমাদের দেশের কর্ণধার একেবারেই তুচ্ছ বলে মনে করেন। তিনি গুলিবিদ্ধ করে মানুষের রক্তে তাঁর হাত রাঙাতে রাজি, কিন্তু ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গড়তে রাজি নন। ছত্তিশগড়ের জনসংখ্যা ৪৫ লাখের ওপর। মধ্যপ্রদেশের এটা পিছিয়ে থাকা অংশ, যদিও সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী এই জায়গারই লোক। পিছিয়ে থাকা এবং উপেক্ষিত হবার জন্য লোকেদের মনে ছত্তিশগড়কে আলাদা প্রদেশ করার চিন্তা আসাটা স্বাভাবিক। ভাষা অনুসারে এখানে হিন্দিই নয়—অবধির একটা রূপকে ছত্তিশগড়ী বলা হয়। এখানকার ভাষার ওপর ভোজপুরী, বুন্দেলী, উড়িয়া এবং মারাঠীর কিছু প্রভাব থাকা স্বাভাবিক।

রায়পুরে আমাদের ছত্তিশগড়ের ছাত্র-ফেডারেশন আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। পরের দিন (৪ জানুয়ারি) শনিবার ছিল। সকাল থেকেই আলোচনা শুরু হলো, যা সন্ধেবেলা সভায় যাবার সময়ই ভাঙল। সোস্যালিস্ট ভাইদের সঙ্গে খোলাখুলি কথাবার্তা হলো, বিশেষ করে সোভিয়েত দেশ সম্বন্ধে। অনেক কৃষক-কর্মীও সভায় যোগ দিলেন। জানতে পারলাম যে

স্থানীয় সরকার এখনও জমিদার এবং মালগুজারদের সরানোর কথা চিন্তাও করেনি। রাত আটটা নাগাদ সভা শুরু হলো। বোম্বাই-এ সরকার যেভাবে ছাত্রদের সঙ্গে রক্তের হোলি খেলছিল, তাতে তাদের নেতা বর্ধন যদি কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে লড়াই করার কথা বলে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কাশ্মীর এবং হায়দ্রাবাদের ঝগড়ার কথা মনে রেখে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার খুবই প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তালি তো কখনো এক হাতে বাজে না। আমিও ভাষণ দিলাম।

রায়পুরে হিন্দির মহান কবি পদ্মাকরের ছেলেদের সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভাল লাগল। তাতে জানা গেল যে হিন্দি ভাষার নির্মাণে ছত্তিশগড়—প্রাচীন দক্ষিণ কোশল—কারো থেকে পিছিয়ে নেই।

৫ জানুয়ারি ভোর পাঁচটার সময় এবার আমরা প্রয়াগের উদ্দেশে রওনা হলাম। বিলাসপুরে গাড়ি বদলাতে হলো। এখান থেকে কাটনী পর্যন্ত অখণ্ড পাহাড় আর জঙ্গল চলে গিয়েছে। চোখে না দেখা পর্যন্ত মানুষের পক্ষে কি করে কিছু বোঝা সম্ভব? এই সমগ্র ভূ-খণ্ডটি শস্য-শ্যামলা, এবং খনিজ সম্পদেও অতি সমৃদ্ধ। এখানকার সমস্ত মানুষই পিছিয়ে আছে, তাদের মধ্যে আদিবাসীর সংখ্যা খুব বেশি। জঙ্গলের ঠিকা—যার অর্থ হলো অধিক রোজগার—অন্য জায়গার ঠিকাদারদের হাতে চলে যায়, আর লোকেদের কুলিগিরি করে পেট ভরাতে ও শরীর ঢাকতে চেষ্টা করতে হয়।

পথে কাটনীতেও বৃষ্টি হতে থাকল। তিনঘন্টা পরে এখান থেকে প্রয়াগের ট্রেন পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, রাস্তার দুধারে পাঞ্জাবী শরণার্থীরা তাদের ছোটখাটো দোকান খুলে বসেছে। কিছু ভোজনালয়ও ছিল। স্থানীয় দোকানদাররা তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছিল না, কারণ তারা চায় বেশি লাভ, যেখানে শরণার্থীরা যতটা সম্ভব কম লাভ রেখে তাদের জিনিস বিক্রি করতে রাজি। এ বছর প্রয়াগে অর্ধকুম্ভ হচ্ছে। দেশে শস্যের খুব অভাব ছিল। সরকার একটা খবর দিয়ে লোকেদের না যেতে পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু সে কথা শুনতে কে রাজি ছিল? পাণ্ডারা যাত্রীদের গরুর পালের মত নিয়ে যাচ্ছিল। ট্রেনে জায়গা পাওয়া সহজ ছিল না। রাত এগারোটার সময় এক্সপ্রেস ট্রেন পাওয়া গেল। সকাল পাঁচটায় সেটা প্রয়াগে পৌঁছল।

প্রয়াগ—৬ তারিখটা ঘরেই রইলাম। লোলা আর ইগরের চিঠি পেলাম, তাতে টাকার প্রয়োজনের কথা জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেখানে এখানকার টাকার কি মূল্য আছে? এখানে নিয়ে আসার কথা তো বলা সম্ভবই ছিল না, কারণ ইগরের লেখাপড়ার ব্যবস্থা সেখানে যত ভালভাবে হতে পারত, যত সহজে সেখানে কাজে পাওয়া যেত, এখানে এখন তার স্বপ্নও দেখা যেত না। এই সময় ভারত আর পাকিস্তানের মনকষাকষি কাশ্মিরে মারামারিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তান বিড়বিড় করে হুমকি দিচ্ছিল। প্যাটেল স্পষ্ট কথায় চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল—শুধু শুধু ভয় দেখিও না, যদি লড়তে হয় তো সামনে চলে এসো। কিন্তু পাকিস্তান যেসব মুরুব্বীদের ভরসায় লম্ফঝম্প করছিল, তারা মঞ্জুর করলে তবেই না সামনে পা ফেলতে পারত?

এখানে এসে জানতে পারলাম, নাগার্জুনের ছেলে শোভা অসুস্থ। নাগার্জুনের স্বাস্থ্যও চিরকালই দুর্বল, শোভাও তেমনটাই পেয়েছে। বেচারা কয়েক বছর ধরে অসুখে শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ৮ তারিখ নাগার্জুন বাড়ি যাবার জন্য রওনা হলেন।

লেখার অভ্যাস আস্তে আস্তে চলে গেল। এখন মুখে বলে বলে লেখানোতেই বেশ সুবিধে বোধ করতাম। নাগার্জুন লিখে দেওয়ার কাজ করতেন—এটা আমার খুবই খারাপ লাগত। আর বেশিদিন তার শ্রম এবং সময় নষ্ট করতে আমি ইচ্ছুক ছিলাম না। সেই সঙ্গে আবার আমার একজন লেখকের প্রয়োজন ছিল। ১৯৪৪ সালে শ্রীসত্যনারায়ণ এই কাজটা খুব ভালভাবে করেছিলেন, কিন্তু জানি না এখন তিনি ফাঁকা ছিলেন কিনা। তার ওপরে তাঁর ছোঁয়াছুঁয়ির বিচারের জন্য যাত্রা করা মুশকিল ছিল। সম্মেলনের সভাপতি হওয়ায় এই বছরের বেশির ভাগ সময়টা আমার ঘুরে ঘুরে কাটানোর ছিল।

৬ জানুয়ারি থেকে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রয়াগেই আটকে রইলাম। আত্ম-নিরীক্ষণ করতে গিয়ে দেখলাম যে মন কত সামান্য কথাতে বিকল হয়ে পড়ে। 'কাজীজী দুবলে শহরকে অন্দেশে'[১] অনুসারে পৃথিবীর যে কোনো জায়গাতেই সমান আদর্শ বা আদর্শবাদীদের ওপর কোনো রকম আঘাত কিংবা বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে মন চিন্তিত হয়ে ওঠে। যে কোনো অযৌক্তিক কাজ বা মনোভাব দেখলে মন উত্তেজিত হয়—সে কাজ সামাজিক চাপ হোক বা প্রথা হোক অথবা অন্য কিছু হোক না কেন।

প্রয়াগের কাছে ঝুসীতে প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী নামে একজন বড় সাধু আছেন। ধর্মীয় প্রদর্শন তাঁর আশ্রমে চরম সীমায় পৌঁছেছিল। সাধুসঙ্গ আমিও অনেক করেছি, আর দেখেছি যে ভাল সাধুরা কোমল স্বভাবের হয়ে থাকে। সেদিন তাঁর লেখা সম্ভবত 'ভাগবতী কথা' বইটি হাতে এলো। বইয়ের ২১৫৫ নম্বর পৃষ্ঠায় এই লেখা দেখে চমকে উঠলাম—

'ধর্মহীন জো কুটিল করে নিন্দা হরিহর কী।
গরম সঁড়াসী পকরি জিভ খিঁচে ওয়া নর কী।'[২]

ব্রহ্মচারীজী কেমন সুন্দরভাবে সন্ন্যাসীদের পরম্পরাকে মেনে চলছেন? বলো, নতুন পয়গম্বর প্রভুদত্তজীর জয়! সরস ভক্তি দিয়ে কাজ হচ্ছে না দেখে ব্রহ্মচারীজী গরম সাঁড়াশি ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা করেছেন। তাঁর ইষ্টদেবতা এইভাবেই পৃথিবীর ভার লাঘব করতেন। আর এখন উনি স্বয়ং সেই পথের পথিক। কিন্তু হাতে গরম সাঁড়াশি দেখে মানুষ ব্রহ্মচারীজীর পিছনে দৌড়বে না, বরং সেই অখণ্ড কীর্তন আর পুজোর ভণ্ডামি থেকে দূরে পালাবে, যা তাঁদের বেদান্তর অনুসারে একেবারেই মিথ্যে জিনিস।

পার্টি থেকে আমার এখন আলাদা হয়ে যাবার খবর পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। অনেকের খুব দুঃখ হয়েছিল, আমারও হয়েছিল, কারণ পার্টি থেকে আলাদা

---

[১] 'শহরের চিন্তায় রোগা হলো কাজী।'—স·ম·

[২] 'ধর্মহীন যে কুটিল করে নিন্দা হরিহরের।
তপ্ত সাঁড়াশি হাতে জিহ্বা টানেন তিনি সে-নরের॥'—স·ম·

হওয়া সত্ত্বেও আমি পার্টিকে ছেড়ে অন্য কারো হতে পারতাম না। আমি এও জানতাম যে, বিরোধীপক্ষ এই ব্যাপারটাকে পার্টির বিরুদ্ধে প্রচার হিসেবে ব্যবহার করবে। কেউ কেউ এটাও বলছিল যে, আমার আর রাশিয়াতে যাওয়া হবে না। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার জন্ম থেকেই আমি তার বন্ধু এবং সমর্থক ছিলাম, আর সবসময় তাই থাকব। সাম্যবাদ সর্বদা আমার আদর্শ ছিল, আর পরেও তাই থাকবে। তাই কোনো পত্রিকায় একথা ছাপা দেখে আমি আশ্চর্য হইনি বা আমার ক্ষোভও হয়নি— কে জানে রাহুলজীর পার্টি থেকে আলাদা হয়ে যাওয়াটা সত্যি না লোক-দেখানো ব্যাপার। আমার, সেটা সত্যি না হওয়া এবং লোক-দেখানো হওয়াতেই আনন্দ ছিল, কারণ পার্টি থেকে আলাদা হয়ে আমি নিজের কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে রাজি ছিলাম না।

১১ তারিখ রোববার ছিল। সেদিন রাতের খাওয়া শ্রীনিবাসজীর বন্ধু এক মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়িতে হলো। নিরামিষ ভোজনে শ্রীনিবাসজীর আপত্তি ছিল না, আমার জন্য বিশেষভাবে আমিষ রান্না তৈরি করা হয়েছিল। মধ্যবিত্ত মুসলমানরা সেই সময় আরো চিন্তিত ছিল, কতজন ভয়ে পাকিস্তান চলে গিয়েছিল। আমাদের নিমন্ত্রণকারী বন্ধুটিরও ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। জিজ্ঞেস করছিলেন, 'কিভাবে আমরা আমাদের ভারত-ভক্তির প্রমাণ দেব?' হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই একথা জানানো মুশকিল। প্রত্যেক মানুষ কি করে হনুমানজীর মত বুক চিরে তার হৃদয়ের ভক্তি দেখাতে পারে? আমি বললাম, 'অন্য লোকেদের সঙ্গে যাতে কোনো তফাৎ না চোখে পড়ে, এমন পথ নেওয়াই ভাল। যতই হোক, লাখ লাখ খ্রিস্টানও তো আমাদের দেশে আছে, তাদের তো এ নিয়ে কোনো চিন্তা নেই, কারণ তারা বেশভূষা এবং রুচিতে আমাদের অন্য দেশবাসীদের থেকে আলাদা নয়। যদিও তাদের ধর্ম এবং নিজস্ব কিছু আচার-বিচার আছে।' তিনি ঠিকই বলেছেন, 'এতে তো সময় লাগবে।' তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সময় লাগার মানে হলো এক প্রজন্ম আর আরম্ভ করার জন্য সময় লাগাটা কোনো ব্যাপার নয়। এছাড়া অন্য কোনো রাস্তাও তো নেই। একজন শিক্ষিত-ভদ্র মুসলমানের মন পুরোপুরি ভীত হয়ে পড়েছিল। তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন ভারতের জনসাধারণের থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখাটা আমাদের ভুল। ওদিকে গান্ধীজী রেডিওতে বলছিলেন—উর্দু এবং দেবনাগরী এই দুরকম লিপিই থাকুক। দুটি ভাষাই চালু থাকুক, নয়তো গণতন্ত্র শেষ হয়ে যাবে। এই ভাষা ও লিপির আলাদা হওয়াটা সেই আলাদা ভাবের বহিঃপ্রকাশ যা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায় এবং যে কারণে আজ আমাদের এই দিনের মুখ দেখতে হলো।

এই সময় আমাকে লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'নবজীবন'-এর সম্পাদক হবার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হলো, কিন্তু আমার পক্ষে কিভাবে রাজি হওয়া সম্ভব ছিল? লক্ষ্ণৌ-এ সম্পূর্ণ সময় তো নয়ই, বেশি সময় দেওয়াটাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বই লেখা, এদিক-সেদিক ঘুরতে যাওয়া ছিল। সেইসঙ্গে পরিভাষার কাজের দায়িত্বও আমি নিজের কাঁধে নিয়েছিলাম। তাছাড় 'নবজীবন'-এর সঙ্গে সংঘের লোক এবং হিন্দুসভার মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষদের সম্বন্ধ ছিল। তাদের সঙ্গে আমার কি করে বনত?

বোম্বাইতে থাকাকালীন আমার বহুমূত্রতা হয়েছিল। লোকেরা ডায়বেটিস (মধু-মেহ)-এর আশঙ্কার কথাও ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু আমি এখন পরীক্ষা করানোতে ইতস্তত করছিলাম। শেষমেশ পরীক্ষা করালেই সন্দেহর নিবৃত্তি হতে পারতো। বুঝতে পারছিলাম, স্বাস্থ্য এখন আর আগের মত থাকবে না, তবে সে অবস্থা আট বছর পার করে হয়েছিল। শারীরিক স্বাস্থ্য যেমনই থাকুক না, মানসিক স্বাস্থ্য তো সারাজীবন কাজ করলেই ঠিক থাকতে পারে। রোগটা নতুন ছিল, মনের মধ্যে নানারকম ভাবের উদয় হতো। আমি খুঁজে দেখলাম, মনের কোনো কোণেই মৃত্যুর ভয় নেই। জীবন নিয়ে চিন্তা করা উচিত। মৃত্যু হলো অভাব—এর জন্য চিন্তা করার কি দরকার?

১৩ তারিখে আরার শ্রীঅবধবিহারী সুমন এলেন। তিনি কৃষক-সভার কর্মী ছিলেন, জেলেও গেছেন, কিন্তু সবথেকে বড় কথা হলো, তিনি ভোজপুরী ভাষার মৌখিক প্রচার না করে সেই ভাষায় গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। আমি তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলি দেখেছি। ভাষা বেশ বিন্যস্ত, লোকোক্তির ব্যবহারও খুব ভালোভাবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে করা হয়েছিল। কোথাও কোথাও ভাষায় অবশ্যই খড়ীবোলী[১]-র ঈষৎ প্রভাব ছিল। দোষ যা ছিল তা হলো অনুপ্রাস আর কবিত্ব প্রদর্শনের বাহুল্য এবং চিত্রণের পর্যাপ্ত মাত্রায় অভাব। আমি তাঁর প্রচেষ্টাকে প্রশংসনীয় মনে করতাম।

আজ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য গান্ধীজী অনশন শুরু করলেন। অনশন দ্বারা ঐক্য স্থাপিত হওয়া এখন সম্ভব ছিল না, কিন্তু এর চাপ ভারত সরকারের ওপর এমনভাবে পড়ল যে ভারত সরকারকে গান্ধীজীর জীবনের পরিবর্তে পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা দিতে স্বীকার করতে হলো। 'বুড়োর গোঁ ভয়ংকর জিনিস'—একথা আমি ১৬ জানুয়ারি লিখেছিলাম, আর এও লিখেছিলাম যে, 'প্রাণের বাজি রেখে গান্ধীবাদী রাজনীতির পথেই কি দেশকে চলতে বাধ্য করা হবে? আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় রাজনীতিতে গান্ধীবাদী রাস্তা দেশের পক্ষে আত্মঘাতের রাস্তা।'

১৪ জানুয়ারি ছিল মকর সংক্রান্তির দিন। সেদিন বিশ্বম্ভরনাথ পাণ্ডে তাঁর সঙ্গে আমাকেও মেলায় নিয়ে গেলেন। তথ্য-দপ্তরের খবর ছড়িয়েছিল। মেলায় খুব ভিড় ছিল, কিন্তু সেখানে কুম্ভ ছিল না। আর ৬ বছর পরে প্রয়াগের কুম্ভর অবস্থা কি ভয়ঙ্কর হয়েছিল, তা বলার প্রয়োজন নেই। মেলায় ঘুরলাম। বৈরাগীদের জন্য নির্দিষ্ট আখড়া খুব বড় ছিল, কিন্তু তার বেশিটাই খালি পড়ে ছিল। এটা তাদের অর্থহীনতার এবং প্রভাব কম থাকার প্রমাণ ছিল। তাদের মধ্যে পঞ্চায়েতের আখড়াগুলিতে বেশ জাঁকজমক ছিল। আখড়ার জন্য পৃথক পৃথক অনেকগুলি ঘেরা জায়গা ছিল। একটি হাতির পিঠে ও লোকজনের কাঁধে চড়ে তিন জগৎগুরু যাচ্ছিলেন। সামনে-পিছনে নাগা সাধুরা ছিল। ঘোড়ার পিঠে বাজনাও বাজছিল। বৈরাগী সাধুদের দৈনিক পত্রিকা পড়তে দেখে আমার খুব ভাল লাগল।

---

[১] দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচলিত হিন্দিভাষা, যা বর্তমানে স্বীকৃত শুদ্ধ হিন্দি।—স·ম·

যাত্রা (১৫-৩১ জানুয়ারি)—নাগার্জুন ফিরতে পারেননি, বোধহয় ছেলের শরীর আরো খারাপ হয়েছে। তবে সাহিত্যাচার্য শ্রীবলভদ্র ঠাকুর সঙ্গে যাবার জন্য তৈরি। ঠাকুরমশাই একজন ভবঘুরে সাহিত্যিক, আর তাঁর অধ্যবসায় সম্বন্ধে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সংস্কৃত পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি রুশভাষা খুব মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছেন। পুশকিনের 'কাপ্তেনের কন্যা' তিনি রুশ থেকে সরাসরি হিন্দিতে অনুবাদ করেছেন। একজন প্রকাশক কিছু অগ্রিম দিয়ে সেটা নিয়ে গেছেন, কিন্তু ন বছর হয়ে গেছে এখনো সেটা প্রকাশিত হয়নি। যদি সেসময় বইটি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেত তাহলে ঠাকুরমশাই না জানি আরো কত রুশ গ্রন্থাবলীর হিন্দি করে হিন্দি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতেন। এতে হিন্দি সাহিত্যের ক্ষতি অবশ্য হয়েছে, তবে পরে তিনি বেশ কিছু রুশ উপন্যাস হিন্দি সাহিত্যকে দিয়েছেন, এই লাভটাও হয়েছে।

সেদিন রাত সাড়ে এগারোটার সময় আমরা বোম্বাই এক্সপ্রেসে রওনা হলাম। রাতের যাত্রায় শোবার জায়গা পেয়ে গেলেই অনেক। এখনও সমানে কিছু না কিছু পাকিস্তানের যাত্রী যাচ্ছিল, কারো কারো তল্লাশিও কবা হচ্ছিল। ভোর চারটের পরে ট্রেন খঁড়বা পৌছল। সন্ধে সাড়ে সাতটায় গাড়ি পাওয়া যাবে তাই প্রতীক্ষালয়ে আশ্রয় নিলাম। আমাদের কাছে এটাও নিশ্চিন্ততার ব্যাপার ছিল যে, ইন্দোর থেকে শ্রীবৈজনাথসিংহ 'মহাগণক' আমাদের নিয়ে যাবার জন্য এসেছিলেন। সন্ধেবেলা খাবার জন্য বাইরে গেলাম। স্টেশনের কাছেই দুটো সিনেমা হল ছিল, ভোজনালয়ও ছিল তবে সবকটিই নিরামিষ। একজন পাঞ্জাবী শরণার্থী চায়ের দোকানের সঙ্গে ভোজনালয়ও খুলেছিল। এই সময় আমিষ হোক অথবা নিরামিষ, শরণার্থী-ভোজনালয়ে খাওয়াই আমি ভাল মনে করতাম। যতো বেশি সংখ্যায় মানুষ পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে গৃহহীন হয়ে এসেছে, যদি বাস্তবিক অর্থে তারা পরিশ্রমী না হতো, তবে দেশের ওপর এবং তাদের ওপর কত যে বিপদ আসত তা ভাবলেও উদ্বেগ হয়। রাত দুটোর সময়েই আমরা খঁড়বা থেকে রওনা হয়ে ইন্দোর পৌছলাম।

ইন্দোর—১৭ তারিখ সকালে ছোট একটা ভাষণ দিয়ে পতাকা উত্তোলনের নিয়ম পালন করতে হলো। দুপুরে অনেক কমিউনিস্ট বন্ধু এলেন। আমি পার্টি ছেড়ে দেওয়ায় আফশোশ করতে লাগলেন। দেড়টার সময় খ্রিস্টান কলেজে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ে ভাষণ দেবার ছিল। ছাত্রছাত্রীরা ছাড়া অন্য লোকজনও ছিলেন। আমাদের সময়ের হিন্দির অদ্বিতীয় বক্তা মাখনলাল চতুর্বেদীও সঙ্গে ছিল। সেখান থেকে শ্রীবৈজনাথ তাঁর অ্যাকাউন্টেন্ট-কার্যালয় দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেখানেও কর্মীদের সামনে বলতে হলো। এখন আমাদের অফিসার এবং স্টাফদের লোকেরা অনেকটা নির্লিপ্ত হয়ে দেশের উন্নতির কাজে তাঁদের শক্তির ব্যবহার করতে চাইছিলেন, কিন্তু যেমন যেমন তাঁরা ওপর মহলের বীভৎস নমুনাগুলো দেখতে থাকলেন, অমনি সেই রঙে নিজেদের রাঙিয়ে ফেললেন।

আমি বস্তুত সাহিত্যপরিষদের অধিবেশনের জন্য এখানে এসেছিলাম। সন্ধে সাড়ে সাতটা থেকে তা শুরু হলো। আধঘণ্টা দেরি করে 'শ্রীমান' এলেন, এ আর এমন কি

দেরি। রোগা-পাতলা দুর্বল শরীর, আর মুখেও কোনো বৈশিষ্ট্যের ছাপ নেই। ইনিই ছিলেন দেশীয় রাজ্য হোলকরের আধুনিক উত্তরাধিকারী। শেঠ হুকুমচন্দ অভ্যর্থনাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি স্বাগত ভাষণ পড়লেন, তারপর মহারাজ উদ্বোধনী-ভাষণ দিলেন। এরপরে আমার সভাপতির ভাষণ হলো। রাজা যাবার সময় দেখা করার কথা বলে গেলেন। অভ্যর্থনার কাজে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বলতে আমি তাদের জানিয়ে দিলাম, 'আমার দেখা করার একটুও ইচ্ছে নেই, আর আপনারাও চিন্তা করবেন না, উনি যে একথা বলেছেন তা উনি ভুলে যাবেন।' মহারাজ আসার সময় প্রতিহারী উচ্চস্বরে তাঁর আগমন ঘোষণা করেছিল, যা আমার একেবারেই পরিহাস বলে মনে হচ্ছিল। যখন ছত্রধারীদের সূর্য ডুবতে চলেছে তখন কি এটা 'অসময়ের সানাই' ছিল না?

১৮ তারিখে সারাদিন শুধু ভাষণ আর ভাষণ হলো। সকাল নটায় সাহিত্য-পরিষদে প্রগতিবাদ সম্বন্ধে ভাষণ দিলাম, এগারোটার সময় হোলকর কলেজে ভাষণ দিলাম ভারতের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য বিষয়ে। সেখান থেকে খাবার জন্য শেঠ হুকুমচাঁদের বাড়িতে গেলাম। আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও শেঠকে খুব প্রাণবন্ত মনে হলো। তাঁর পুত্র-পৌত্ররা আধুনিকতার ছাঁচে নিজেদের ঢালাই করেছেন। ইন্দোরকে কাপড়ের মিলের কেন্দ্র বানানোতে শেঠ হুকুমচাঁদের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

নিরামিষ হলেও অত্যন্ত ভাল খাওয়া হলো। খাওয়ার জন্য জমায়েতটাও যথেষ্ট বড় হয়েছিল। রুপোর বড় বড় থালা আর বাটিতে খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল। চারদিকেই ছিল লক্ষ্মীর প্রকাশ।

চারটের পর শহরের বাইরে মহারাজার নিবাসস্থানে যেতেই হলো। পৌনে এক ঘণ্টা ধরে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হতে থাকল। ইন্দোরের অস্তিত্ব এখনও লোপ পায়নি তবে খুব চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। আধুনিকতার সঙ্গে পরিচিত এবং নবীন শিক্ষায় দীক্ষিত মহারাজা ভবিতব্য বুঝতে পারছিলেন কিন্তু সেই সঙ্গে আবার অধিকার ছাড়তেও চাইছিলেন না। যদি অন্যান্য রাজারা তাঁদের সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী পতাকা কায়েম রাখার জন্য খড়্গের ব্যবহার করত, তবে তিনিও সাহস করতেন। একা একা সে সাহস করাটা নিষ্ফল হতো। তিনি বলতে থাকলেন যে, শাসনব্যবস্থা প্রজাদলের প্রতিনিধিদের হাতে ছেড়ে দিয়ে কেবল আইনত প্রধান থাকাটা ভাল হবে। অথবা অন্য কোনো রাস্তা নেওয়া উচিত। আমি অন্যমনস্কভাবেই কথা বলছিলাম, কারণ অপরপক্ষে তেমন কোনো বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় পাচ্ছিলাম না। আমি বললাম, 'যা করতে হবে তা সময় থাকতে এবং খুশিমনে করা উচিত।' বোঝা যাচ্ছিল যে, রাজা সবসময় নেশা করে থাকেন। তাঁর স্ত্রী আমেরিকান। স্ত্রী সঙ্গে তার মাও ছিলেন।

মউ ছাউনিতেও আজই প্রোগ্রাম ছিল। ওখান থেকে ছুটতে ছুটতে গিয়ে সেখানকার সভায় বললাম। দেরি হওয়ায় লোকেরা নিরাশ হয়ে পড়েছিল। ফিরে এসে সাড়ে আটটার সময় শিক্ষা পরিষদে ভাষণ দেবার পর সওয়া নটার সময় বাসস্থানে আসার ছুটি পেলাম।

ইন্দোরও নতুন নগর নয়, কারণ ইন্দ্রপুরে 'পুর'-এর জায়গায় 'উর' (প্রাকৃত-অপভ্রংশ) প্রাক-মুসলমান যুগে হতো। তবে ইন্দ্রপুর সেই সময় নগর না হয়ে কোনো গ্রামও হয়ে

থাকতে পারে। যাই হোক, অবন্তী রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী মাহিষ্মতি (মহেশ্বর) আর উজ্জয়িনীর মত অতটা এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল না। ১৯ তারিখ রাত চারটেতেই মোটরযোগে আমরা মাহিষ্মতির উদ্দেশে রওনা হলাম। সোজা রাস্তায় গেলে কুড়ি মাইল পড়ে তবে সেই রাস্তাটা কাঁচা বলে আমরা পঞ্চাশ মাইল দূরত্বের পাকা সড়ক ধরলাম, যার অনেক দূর পর্যন্ত আগ্রা-বোম্বাইগামী সড়ক পেলাম। আশেপাশে পাহাড় আর বাঘ-চিতার জঙ্গল ছিল। দুটো ঘাটও পার হতে হলো। মাষ্মিতির দুর্গে যখন পৌঁছলাম তখনও অন্ধকার ছিল। সকাল হতেই নৌকো নিয়ে নর্মদায় বেড়াতে গেলাম। স্রোত খুব গভীর আর চওড়ায় প্রায় লেলিনগ্রাদের নেবা নদীরই মত ছিল। নীচে কিছুটা দূরে ছিল সহস্রধার, মাটিতে সমতল পাথরের ওপর পড়ে নর্মদা যেখানে হাজার ধারায় বিভক্ত হয়ে গেছে। খুবই সুন্দর দৃশ্য। কোনো এক সময়ের সমৃদ্ধশালী অবন্তীর এই রাজধানী আজ বহুদূরবিস্তৃত ধ্বংসস্তূপের চেহারাতেই চোখে পড়ছিল। একটি শিবমন্দির দেখলাম। আকবরের সময় ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে পোরওয়াড় বংশের কোনো এক শেঠ এই মন্দিরের সংস্কার করে। এক জায়গায় গুহার ভেতরে খ্রিস্টপূর্ব সময়ের অনেক ইঁট দেখতে পেলাম। মাহিষ্মতির ধ্বংসস্তূপ তার প্রাচীন ইতিহাসকে লুকিয়ে রেখে এখানে পড়ে আছে, যার উদ্‌ঘাটনকারী একদিন ঠিকই জন্ম নেবে। দুর্গের নীচে অহল্যাবাঈ-র বানানো ঘাট ও মন্দির আছে। যে শিল্পের এখন আর অস্তিত্ব নেই তা দেখার সাধ এখানে পূর্ণ হতে পারে। মহেশ্বরের জনসংখ্যা ছিল ৯ হাজার। এখনও সেখানে একটি ছোট বাজার আছে। নর্মদার পারে রয়েছে নীমাড় জেলা, বুদ্ধের সময় যা 'অল্লক' দেশ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে পুরনো আমলের পাঠানী মুদ্রা প্রচুর পাওয়া যায়। হিন্দুযুগের মুদ্রাও কিন্তু পাওয়া যেতে পারে যদি আরো গভীরে খনন করা যায়। বাজারে কিছু বক্তৃতা দিতে হলো। সেখান থেকে ফিরে বারোটার সময় ইন্দোর পৌঁছে গেলাম। খাবার পরে শিবাজীরাও স্কুল, মেডিকেল স্কুল, মিশন কলেজের চন্দ্রিকা সমিতিতে ভাষণ দিয়ে চারটের সময় উজ্জয়িনীর উদ্দেশে রওনা হলাম।

মালবদেশে সবুজ ফসলের ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। কালিদাসের এই প্রিয় দেশ দেখতে দেখতে কালিদাসের 'মেঘদূত'-এর পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে যাচ্ছিল। পথে দেবাস পেলাম। সেখানকার চমল রাজ্যও এখন বিলুপ্ত হবার মুখে ছিল।

উজ্জয়িনীতে সাড়ে পাঁচটার সময় পৌঁছলাম। মহাকালের দর্শন করলাম, যদিও ততটা ভাব-ভক্তি নিয়ে নয় যতটা বাণ-বর্ণিত মহাকালকে লোকে করত। ডক্টর নাগরের সঙ্গেও দেখা হলো। ১৯৪৩-এর গঙ্গোত্রী যাত্রার সময় কতদিন পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী তাঁর হাতের সুস্বাদু খাবার খাইয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। ডক্টর নাগরের জন্য উজ্জয়িনীতে শারীরিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল।

জনসভায় যখন দেড়ঘণ্টা ভাষণ দিতে হলো তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। সেদিনই রাত সাড়ে দশটায় ইন্দোর ফিরে এলাম আর তিনঘণ্টা পরে রেলগাড়ি ধরলাম। খুব ছোটাছুটি হলো। কোনো কিছুই ভাল করে দেখার সুযোগ পেলাম না।

২০ তারিখ অন্ধকার থাকতেই রতলাম পৌঁছলাম। ঘুমোবার জন্য আর একটু সময়

পাওয়া গেল। তারপর চকবাজার এবং হাইস্কুলে ভাষণ দিলাম। মন্দসোর তথা প্রাচীন দশপুর দেখার আমার অত্যন্ত তীব্র ইচ্ছে ছিল। কালিদাস এই নগরের মহিমাকীর্তন করেছেন, আর সত্যিমিথ্যে জানি না, সংস্কৃতির পুত্র রন্তিদেবের রাজধানীও একেই বলা হয়েছে। এই রন্তিদেবের কীর্তি হলো চম্বল (চামওয়ালী, চর্মণবতী) নদী। রন্তিদেব অত্যন্ত অতিথিবৎসল ছিলেন। অতিথিদের ভোজনের জন্য রোজ সেখানে হাজার হাজার গরু মারা হতো। তাদের তাজা চামড়া থেকে ঝরে পড়া জলের ফোঁটার থেকে এই নদীর উৎপত্তি।

মন্দসোরের লোক নিতে এসেছিলেন, কিন্তু সেখানে যাওয়া তখনই সম্ভব ছিল যদি কারে গিয়ে সেখানকার কাজ শেষ করে পরের ট্রেনে সামনে এগিয়ে যাওয়া যেত। কার পাওয়া সম্ভব হলো না। মালবার দেখবার তীব্র ইচ্ছা পূরণ হলো না, সেইজন্য প্রতিজ্ঞা করলাম,'একমাসের জন্য মালবাতে আসতে হবে আর খুব বেড়াতে হবে।' তবে, এই প্রতিজ্ঞা হয়তো কোনোদিনই পূরণ হবে না।

রতলামেই আমরা উদয়পুরে যাবার গাড়িতে উঠে বসলাম। সেই কামরাতে দুই মহিলার সঙ্গে একজন জৈন ডাক্তার কেসরিয়াজী (মেবার) দর্শন করতে যাচ্ছিলেন। মাঝরাতে আমরা চিতোর পৌঁছলাম। বহু সাহিত্যানুরাগী ফুলমালা আর গুরুকুলের লোকেরা কমলালেবু নিয়ে এসেছিলেন। নামার খুবই ইচ্ছে ছিল কিন্তু রাত বারোটার সময় কোথায় ঘুরে বেড়াতাম? গাড়িতেই শুয়ে পড়লাম।

সকালে মাউলী পৌঁছলাম। সেখানে এবং আর এক জায়গায় আরো ফুলমালা পেলাম। ২১ তারিখ পৌনে নটার সময় আমরা উদয়পুর পৌঁছে গেলাম। ড· মোহনসিংহ মেহতা, শ্রীরামগোপাল মোহতা, শ্রীজনার্দনরায় নাগর ইত্যাদি কয়েকজন অভ্যর্থনা জানালেন। থাকার ব্যবস্থা মহারানার অতিথি-নিবাস—আনন্দভবনে হয়েছিল। ১৪ বছর আগেও উদয়পুরে এসেছিলাম। সেই সময়কার স্মৃতি আবার জেগে উঠল। কোথায় সেই পুরনো ঢঙের অত্যন্ত অপরিষ্কৃত প্রাসাদ আর কোথায় এই স্বচ্ছ ইউরোপীয় ঢঙের ভবন। সকালে জলখাবার খেয়ে মোটরযোগে একলিঙ্গের উদ্দেশে রওনা হলাম। ১৩ মাইল রাস্তা কেবল পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলে গেছে, যা পার করতে দু ঘণ্টা লাগল। অনেক মন্দির ছিল, যার মধ্যে দু-একটি অধিক শিল্পমণ্ডিত ছিল, যদিও দ্বাদশ শতাব্দীতে আমাদের ভাস্কর্যের ওপরে যে মহাপাপ লেগেছিল তাতে ভাল ভাস্কর্যের সম্ভাবনা থাকার কথা নয়। একলিঙ্গের লিঙ্গে একটা মুখ, অর্থাৎ একমুখ লিঙ্গেরই এটা সংক্ষেপ। কোনো একসময় এটা শৈবদের দুর্গ ছিল, কিন্তু আজ তো শৈব সম্প্রদায় তথা সত্যিকারের শকরা উত্তর থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। তাদের রমণীয় কীর্তি খাজুরাহ এবং অন্যান্য জায়গায় বাস্তুকলা ও ভাস্কর্যে আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করছে।

এগারোটা পর্যন্ত মন্দিরের সদর দরজা খুলল না। বেশি সময় অপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফেরার সময় রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত শাশুড়ি-বউ-এর মন্দিরে গেলাম। নাগদা (নাগহ্রদ) সরোবরের কাছে। এখানে জৈন এবং বিষ্ণুর ধ্বংসপ্রায় মন্দির আছে। এই ভূমিকে মুসলমানরা অনেকবার প্রহার করেছিল, যার সাক্ষী এখানকার

ভাঙাচোরা মূর্তিগুলিও দিচ্ছিল। এই মন্দিরটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ের। সাড়ে বারোটার সময় আমরা উদয়পুরে ফিরে এলাম।

খাবার পর ঠাকুরমশায়ের সঙ্গে সিন্ধী বিদ্যালয়, হিন্দি বিদ্যাপীঠ, মহিলা-মণ্ডল এবং বালিকা বিদ্যালয় দেখতে গেলাম। হিন্দি বিদ্যাপীঠ খুব ভাল কাজ করছিল আর এখন তা বিশ্ব বিদ্যাপীঠের রূপে নিজের কাজ করছে।

সন্ধে সাতটায় স্কাউটদের আঙিনায় সর্বজনীন সভা হলো। ড· মোহন সিংহ সভাপতি ছিলেন। এটা জেনে অস্বস্তি হচ্ছিল যে, একই সংস্থার বহু বিভাগের আলাদা আলাদা অধিবেশন করে সব জায়গাতেই আমার প্রোগ্রাম রাখা হয়েছিল।

২২ তারিখ সকালে সংস্কৃতি শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলন হলো, যেখানে প্রায় তিন ঘণ্টা আমাকেই বলতে হলো। মধ্যাহ্নভোজন শ্রীমোহতাজীর বাড়িতে হলো, তারপর সাংবাদিক-সম্মেলন হলো, তারপর বিদ্যাভবনে গেলাম। ১৯৩১ সালে ড· মোহনসিংহের দ্বারা স্থাপিত এই সংস্থা এখন অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল। এর সঙ্গে শিশু বিদ্যালয়, ম্যাট্রিক পর্যন্ত হাইস্কুল আর একটি ট্রেনিং কলেজ ছিল।

ড· শর্মার বাড়িতে জলযোগ করলাম, সেখানে পঞ্চাশজনের বেশি অতিথি ছিল। সেখান থেকে মোটরে করে জংলী শুয়োরদের থাকার জায়গা দেখতে গেলাম। এইসব শুয়োরদের সন্ধের সময় খাবার খাওয়ানো হয়, এইসময় তারা বেশি সংখ্যায় এসে জড়ো হয় এবং তাদের দেখলে পোষা বলে মনে হয়।

সন্ধে সাতটার সময় স্কাউট আশ্রমে মনোরঞ্জনের জন্য প্রোগ্রাম ছিল। গান গাওয়া হলো, নাটকও হলো। পুরুষরা স্ত্রী চরিত্র সাজলে খুব বাজে দেখায়, কিন্তু এখন এ ছাড়া আর উপায় কি ছিল? রাত দশটায় ছুটি নিয়ে বিশ্রামস্থলে ফিরলাম।

২৩ তারিখ বিদ্যাপীঠের কর্মীদের সম্মেলন হলো, তাতে অংশগ্রহণ করার পর দশটার সময় আমরা জাবরের উদ্দেশে রওনা হলাম। ২৪ মাইল পাহাড়ী রাস্তা, তার শেষ কয়েক মাইল অত্যন্ত খারাপ ছিল। প্রাচীনকালে জাবর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আর এখনো তার সেইদিন ফিরে আসছিল। এখানে সীসার খনি আছে, যেখানে মোগল যুগেরও আগের থেকে কাজ হয়ে আসছে। প্রাচীনকালে পাহাড়ের ওপরে কুয়োর মত খনন করে ধাতুযুক্ত শিলাস্তরের কাছে পৌঁছনো যেত। এখন নীচের থেকে বারুদ দিয়ে ফাটিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। সীসার সঙ্গে এই পাথরগুলিতে দস্তা মিশ্রিত আছে। কোনো কোনো স্তরে তামা এবং রুপোও পাওয়া যায়। ইংরেজ ও ইটালিয়ন কর্মীরা কাজ করছিল। নলিনীরঞ্জন সরকার এবং অন্য আর এক শেঠ এর মালিক ছিল। এখান থেকে চুন প্রথমে লরিতে ও পরে রেলগাড়িতে চাপিয়ে বঙ্গদেশে পাঠানো হতো। কারখানা তৈরি হচ্ছিল তবে তা ধাতু শোধনের কাজ যে পুরোপুরি করতে পারবে এতে সন্দেহ ছিল। খনির ভেতরেও আমরা ঢুকেছিলাম। সেখান থেকে আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরে গেলাম। দুটি মন্দিরে লেখা পেলাম। যার মধ্যে একটি ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর। সেইসময় এই নগরীতে ধনবর্ষা হতো। তারপর খনির কাজ বন্ধ হয়ে গেল এবং ধনস্রোত শুকিয়ে গেল। আজ এই নগর এক নির্জন ধ্বংসস্তূপের মত। এখানকার নিকটবর্তী পাহাড়গুলি সীসা এবং দস্তায় ভর্তি। তার উপেক্ষা

আর কতকাল করা যেতে পারে?

ফিরে এসে বনবাসী বিদ্যালয় দেখে পরে মহারানা কলেজে ভাষণ দেবার ছিল। তারপর প্রগতিশীল লেখকদের সঙ্গে, এবং শেষে প্রায় ১০০ জন অতিথির সঙ্গে মোহতাজীর বাড়িতে ভোজে শামিল হলাম। উদয়পুরে কর্মব্যস্ততা চোখে পড়ত; কর্মীও অনেক ছিল, কিন্তু সকলের বিকাশ কোন পথে হবে, তার ঠিক ছিল না। উদয়পুরেরও ধ্বংস হওয়ার ছিল, কিন্তু মহারানা সর্বপ্রথম তার উন্নতি করে যশের ভাগী হয়েছিলেন।

যোধপুর—সেদিন সন্ধে সাড়ে পাঁচটায় যোধপুরের গাড়ি ধরলাম। আগের বার যখন এসেছিলাম তখন এই লাইন তৈরি হয়নি। আমি ভেবেছিলাম প্রথমে আজমীর যেতে হবে, সেখান থেকে পরের ট্রেন পাব। সকাল হয়ে গিয়েছিল, আমাদের গাড়ি এখন মারওয়াড়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। আমি ঔৎসুক্যের সঙ্গে মরুভূমির বালি দেখার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু তা এখনও অনেক দূরে ছিল।

২৪ তারিখের সকালে পৌনে নটার সময় আমরা দুজন যোধপুর পৌঁছলাম। আগে কোথাও থাকার ব্যবস্থা করতে হতো। প্রফেসর দেবরাজ উপাধ্যায়ের চিঠিও পেয়েছিলাম, কিন্তু ট্রেনের ঠিক না থাকায় আমাদেরই উপাধ্যায়জীর বাড়ি খুঁজতে বেরোতে হলো। খুঁজতে একঘণ্টা লাগল। উপাধ্যায়জী আরার লোক এবং আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিত। তাঁর প্রথমা স্ত্রী আমার জেলের সহযোগী বন্ধু শ্রীপারসনাথ ত্রিপাঠীর কন্যা ছিল এবং বর্তমান স্ত্রী স্বনামধন্য পণ্ডিত রামাবতার শর্মার কন্যা। দেবরাজজী নিজে হিন্দি সাহিত্যের বিরাট পণ্ডিত, তাঁর কলমেও ক্ষমতা আছে, কিন্তু তাঁর আলস্য খুব খারাপ লাগে। যোগ্য প্রতিভারা যখন কর্মক্ষেত্রে আসতে ইতস্তত করে, তখন অযোগ্য লোকেদের উন্নতি দেখে তাঁরা কোন যুক্তিতে নালিশ জানায়? বেশ কিছু বছর ধরে উপাধ্যায়জী কানে খুব কম শুনছেন, যে কারণে অসুবিধেও হচ্ছে।

লোকেরা আজ সন্ধেবেলা আমার আসার প্রতীক্ষা করছিল, কিন্তু আমারই তো তাড়া ছিল। পরিভাষার দায়িত্ব নিয়ে এখনও সে ব্যাপারে আমি কিছু করতে পারিনি। সমিতির বৈঠকের দেরি ছিল, তাই মাঝের এই সময়টুকু আমি এই যাত্রায় ব্যয় করতে চেয়েছিলাম। সেই কারণেই রাতের প্রথমার্ধে সাড়ে নটার সময় যোধপুর ছাড়ার ছিল।

যশোবন্তসিংহ কলেজের অধ্যাপকদের সঙ্গে কথাবার্তা হলো। তারপর স্থানীয় একটি সুন্দর সংস্থা শিশু-নিকেতন দেখতে গেলাম। নিকেতনে তিন বছর পর্যন্ত বয়সের বাচ্চারা থাকে। প্রায় দেড়শো বাচ্চার থাকাটা বলে দেয় যে লোকেরা এর প্রয়োজন বুঝতে পেরেছে। বাচ্চাদের কোনোরকম মারধোর করা হয় না। খেলাধুলোর মাধ্যমে সব শিক্ষা দেওয়া হয়। কাজ করার ক্ষমতা হওয়া মাত্র বাচ্চারা নিজেদের হাতে কাজ করতে শুরু করে। আমাকে সেখানে সোভিয়েত দেশের শিশুবিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে বলতে বলা হলো। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে বলতে হলো। শ্রোতারা এখানে অধিক সংখ্যায় উপস্থিত ছিল। এরপর এখানকার আর একটি সংস্থা কুশলালয়ে গেলাম। এখানে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্ররা পড়াশোনা করে। বেশির ভাগ ছেলেরা এখানেই থাকে। যোধপুর

একটা পুরনো রাজ্য। সেখানে এইসব নবীন সংস্থাগুলি দেখার পর ভবিষ্যতের জন্য আশা জাগাটা স্বাভাবিক। যোধপুরের যুবক মহারাজ সময়ের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে রাজি ছিলেন না, আর একরকম জোর করেই তাঁকে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে আনা হয়েছিল। তার পরেও তাঁর শিক্ষা হয়নি, আরো চাল চালানোর রাস্তা তিনি খুঁজছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রাজার এটুকু বুদ্ধিও ছিল না যে, দরবারের লোকেরা তাঁকে যেমনভাবে নাচাচ্ছিল উনি তেমনি নাচছিলেন। তবে সূর্য-চন্দ্রবংশীদের রাজত্ব আর ফিরবার নয়।

২৫ তারিখ রোববারও আমরা যথেষ্ট ব্যস্ত রইলাম। সকালে সাহিত্য পরিষদের সভায় গেলাম। কিছু তরুণ তাঁদের কবিতা শোনালেন। আজকাল যোধপুরের মত যে কোনো শহরেই পঞ্চাশ-একশোজন হিন্দি কবি থাকাটা কোনো আশ্চর্য কথা নয়, তবে তাদের মধ্যে খুব কমজনের ভেতরেই কবি হবার অঙ্কুর নিহিত থাকে। কেউ কেউ তাদের দুর্বলতাটা বুঝতে পারেন, কিন্তু এমন মানুষের সংখ্যাও যথেষ্ট যে এ কথা মেনে নিতে রাজি নয় যে, সে উচ্চশ্রেণীর কবি নয়। এমন হওয়া সত্ত্বেও কিছুসংখ্যক তরুণের কবিতা শুনে হতাশ হবার প্রয়োজন ছিল না।

যোধপুরে আর্যোপদেশক পণ্ডিত রামসহায় শর্মা থাকেন জেনে আমার দেখা করার ইচ্ছে হলো। কিন্তু এইসময় কোথাও বিয়ে দেবার ছিল তাই উনি এসে আবার চলে গিয়েছিলেন। তাঁর ধর্মপত্নী এবং পুত্র-কন্যারা বাবার হয়ে অভ্যর্থনা করল ও ভোজন করাল। সেখান থেকে উপাধ্যায়জীর বাড়িতে ফিরে এলাম। তখন থেকে দুটো পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর রূপে সভা চলতে থাকল, তারপর মিউনিসিপাল হলে ভাষণ দিলাম। চারটের সময় আর এক জায়গায় ভাষণ দেবার কথা ছিল কিন্তু তাড়াতাড়ি তৈরি হওয়া গেল না। নির্দিষ্ট সময়ের দেড় ঘণ্টা পরে গিয়ে মুশলিম স্কুলে হিন্দি ভাষার ওপর বললাম।

যোধপুরও আড়মোড়া ভাঙছিল। শিশু-নিকেতন আর কুশলাশ্রমের মতো সংস্থাগুলি বলে দিচ্ছিল যে, যোধপুর নিজেকে আধুনিক যুগের জন্য প্রস্তুত করছে। ইচ্ছুক কর্মীদের কোনো উপকরণের অভাব থাকে না। সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক কর্মীরও এখানে অভাব ছিল না। আরো একদিন থেকে যাবার জন্য জোর করা হচ্ছিল কিন্তু তেমন করলে পরের প্রোগ্রাম নষ্ট হতো। এই সময়ই মহারাজার প্রথম পুত্র জন্মাল, তার জন্য দু কোটি টাকা উড়িয়ে দেওয়া হলো। উদয়পুর অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত কিন্তু সামন্তবাদের যতখানি চিহ্ন যোধপুরে চোখে পড়লো ততটা সেখানে নেই।

আগরা—রাত নটায় যে গাড়ির আসার কথা, তা এগারোটায় এলো। ফুলেরায় ২৬ তারিখের সকাল হলো। এখানে গাড়ি বদল হলো। দুপুরের পরে বান্দীকুঈ পৌছল। সেকেন্ড ক্লাশে রিজার্ভ করে নেবার জন্য ফুলেরা পর্যন্ত শোবার জায়গা পাওয়া গিয়েছিল। এরপরে ভিড়ের কথা আর জিজ্ঞেস করারই নয়। পথে সাঁভর স্টেশন পড়ল। সাঁভর হ্রদ ভারতের একটা বড় অংশকে নুন দেয়। হ্রদটা জয়পুর এবং যোধপুরের যৌথ সম্পত্তি, কিন্তু নুন তৈরির সমস্ত ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রয়েছে। এখন সেখানে তিনশো শ্রমিক কাজ করছিল। মরশুমের সময় তা বেড়ে হাজার পর্যন্ত হয়ে যায়। একা সাঁভরের

পক্ষে কিভাবে সমস্ত দেশের নুন জোগান দেওয়া সম্ভব, সেইজন্য সমুদ্রকেও ব্যবহার করা হচ্ছে। সাঁভরের শাকম্ভরী দেবী খুব প্রসিদ্ধ। সে চৌহানদের কুলদেবী ছিল। পৃথ্বীরাজের বংশকে শাকম্ভরীর চৌহান বলা হতো। শাকম্ভরী যে পৃথ্বীরাজের থেকেও পুরনো তা এই নাম থেকে বোঝা যায়—শাকম্ভরী শকদের ভরণ করে। আফশোশ রইল, সেখানে নেমে আমার দেখা হলো না।

বান্দীকুঈতে ট্রেন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। চারটের পর পরের গাড়ি পেলাম। এর থেকে ভাল হতো যদি মারওয়াড় জংশনে এই আগ্রাগামী ট্রেন ধরতাম, তাহলে ওখান থেকে সোজা আগ্রা পৌঁছে যেতাম। আমাদের ট্রেন যখন আগ্রার কাছে পৌঁছে গেছে এমন সময় একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবার কামরায় উঠল। আগ্রায় বিয়ে উপলক্ষে তারা যাচ্ছিল। পোশাকে এবং ভাষায় ভারতীয়ত্ব তাদের এখন মোটেই পছন্দ ছিল না। কিন্তু মহিলারা যে হিন্দি বলছিল তা একেবারে শুদ্ধ। আগের আমল থাকলে এদের মেজাজ ইংরেজদের থেকেও বেশি আকাশে চড়ে থাকত, কিন্তু এখন তাদের ভাব পালটে গেছে এবং বেশি ভদ্র মনে হচ্ছে। অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের মধ্যে যাদের গায়ের রং ইংরেজদের কাছাকাছি, তারা হাজারে হাজারে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড অথবা অন্য কোনো গোরা উপনিবেশে চলে গিয়েছে। বাকিরা নিজেদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কার জন্য অসন্তুষ্ট। কিন্তু কোনো রাস্তাও তো চোখে পড়ে না।

রাত সোয়া নটার সময় আমাদের ট্রেন আগ্রা পৌঁছল। শ্রীরতনলাল মিত্তলের ওখানে উঠলাম। ধনী-মানী হওয়া সত্ত্বেও রতনলালজী সাহিত্য রুচিসম্পন্ন মানুষ। ইনি দুটি গ্রন্থাগার খুলেছেন, যার মধ্যে একটি প্রয়াত পুত্র রাজেন্দ্রর নামে। কলেজে রাজেন্দ্র দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল, জলে ডুবে তার অকালে মৃত্যু হয়। তারই নামে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির অনুবাদের মালা তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। আগ্রায় তিনদিন সময় রাখা হয়েছিল। ২৭ তারিখ সকালে গীতামন্দির দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। স্বামী আনন্দঘনকে কেউ সওয়া দেড়লাখ টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকায় নগরের বাইরে তিনি এই মন্দির স্থাপন করেছেন। গীতাপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এখানে লোকসেবার কাজও যুক্ত করা হয়েছিল। এরপর আমরা সেকেন্দ্রা গেলাম। নিজের অসম্পূর্ণ স্বপ্ন নিয়ে মহান আকবর সেখানে শুয়ে আছেন। তাঁর সমগ্র ভারতকে এক জাতি বানানোর স্বপ্ন এবার সম্পূর্ণ হবে, এতে আর সন্দেহ কি? আগ্রাতে অনেক বছর থাকার সময়েও আমার আগ্রার কৈলাশ দেখা হয়নি। নগরের বাইরে যমুনার তীরে এই স্থানটিতে হিন্দুদের অনেক মন্দির আছে। আগেও এখানে মন্দির থেকে থাকবে। খণ্ডিত মূর্তি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যমুনায় বিসর্জন দেওয়া উচিত বলে মনে করা হয়, তাহলে আর ইতিহাসের সেই অমূল্য সামগ্রীগুলি কি করে পাওয়া সম্ভব? এই শতাব্দীর শুরুতে আমি অনেক ধর্মস্থান দেখেছিলাম। সেই সময় তাতে যে প্রাণ ও ব্যস্ততা দেখেছি, এখন যেন তার অভাব চোখে পড়ছিল। যমুনার অপর পারে ইতমদুদ্দৌলাতে নূরজাহানের মা-বাবার কবর আছে। প্রাসাদ ছোট কিন্তু খুব সুন্দর।

রাতে রাঁগেয় রাঘবের বাড়িতে সাহিত্য-সভা হলো। আগ্রার অনেক সাহিত্যিক সেখানে

এলেন। জেনে আমি খুশি হলাম যে, গত পাঁচ বছরে রাঁগেজী সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেছেন—ভাল ভাল কবিতা লিখেছেন, গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। রাঁগেয়জী যদি একথা বলেন যে তিনি অহিন্দিভাষী তবে তা মোটেই উচিত হবে না। তাঁর পরিবার তামিলভাষী হলে কি হবে, তাঁর জন্ম-কর্ম সবই আগ্রাতে, আর সম্ভবত তামিলভাষাতে তাঁর ততটা দখল নেই, যতটা দখল হিন্দিতে আছে।

শ্রীরতনলালজী অতিথিসেবা করেই তাঁর কাজের ইতি বলে মনে করেননি, বরং তিনি আমার সঙ্গেই বেশি সময় থেকেছেন। পশ্চিম-উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানার শহরে গ্রামে বহু জৈন গৃহস্থ পরিবার রয়েছে। রতনলালজীও জৈন। আমার ধারণা, সমস্ত জৈন বসতিতে অনিবার্যরূপে থাকা গ্রন্থ-ভাণ্ডারগুলির হস্তলিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে হিন্দি গদ্য-পদ্যের পুরনো রচনা পাবার সম্ভাবনা আছে। অপভ্রংশেরও অজ্ঞাত গ্রন্থ তার মধ্যে থাকতে পারে। এখানকার লক্ষ্মী গ্রন্থাগারের সাড়ে চার হাজার গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশ হস্তলিখিত। সেগুলি দেখার বড় ইচ্ছে ছিল আমার। আমি দেখতে গিয়ে জানতে পারলাম যে, গ্রন্থাগারের চাবি নেই। সূচিপত্র দেখে কোনো কাজ হতো না, কারণ সূচিপত্র যারা বানিয়েছে তারা অপভ্রংশ[১]কেও প্রাকৃত[২] বলে মনে করে। খড়ীবোলীর নিজস্ব ক্ষেত্র মিরাট আর আম্বালা কমিশনারী এবং বিজনৌর জেলার জৈন বসতিগুলির গ্রন্থ-ভাণ্ডারগুলি থেকে হিন্দির প্রাচীনতম গদ্য-পদ্য পাওয়া যেতে পারে। খুব সম্ভব তা খড়ীবোলীর সাহিত্যকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত নিয়ে যাবে। বৌদ্ধ এবং জৈনরা নিজেদের ধর্মপ্রচারের কাজে লোকভাষাকে সবথেকে বড় মাধ্যম বলে মনে করত। পালি, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশে এত যে গ্রন্থ পাওয়া গেছে, তা এই প্রেমের কারণে। অপভ্রংশের পর যখন খড়ীবোলী কুরু এবং কুরুজাঁগলের জেলাগুলিতে এসে পৌঁছল, তখন তারা অবশ্যই সেই ভাষায় ধর্মগ্রন্থ লিখে থাকবে। এই কাজ আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় কিন্তু সময় কোথা থেকে পাব? এ তো কয়েক মাস নয়, বছরের পর বছর জায়গায় জায়গায় বৃথা সময় ব্যয় করার ব্যাপার।

সেইদিন (২৮ জানুয়ারি) দয়ালবাগ আর তার কাছে দ্বিতীয় তাজমহল হতে যাচ্ছে যে রাধাস্বামী মন্দির তাও দেখে এলাম। চারটের সময় আগ্রার কলেজগুলির হিন্দি ছাত্র সমিতি অভিনন্দন জানাল, সেখানে আমাকে ভাষণ দিতে হলো। এরপর 'সৈনিক' কার্যালয় অভ্যর্থনা জানাল। সেখানে পণ্ডিত শ্রীরামশর্মা, পণ্ডিত হরিশংকর শর্মা এবং আরো অনেকের দর্শন হলো। সন্ধে সাতটার সময় নাগরী প্রচারিণীর তরফ থেকে অভিনন্দনপত্র পাওয়া গেল। ভাষণের মাঝামাঝিতে দেবতাদের পছন্দ না হওয়ায় জোর বৃষ্টি শুরু হলো, সে কারণে মাঝপথেই তা বন্ধ করে দিতে হলো।

২৯ জানুয়ারি সকালে পণ্ডিত শ্রীরাম শর্মা আর ড· সত্যেন্দ্রর ওখানে চা-পান হলো। ফতেপুর সিক্রি যাবার প্রোগ্রাম ছিল, প্রথমে তো মনে হলো মোটর না হলে যাত্রা স্থগিত

---

[১] সাধুভাষা থেকে ভ্রষ্ট বা বিকৃত উচ্চারিত শব্দ—স·ম·

[২] প্রকৃত (সংস্কৃত) থেকে আগত ভাষা বা সংস্কৃতজাত কথ্যভাষা। তৎসম তদ্ভব ও দেশ্য শব্দ প্রাকৃত-এর অন্তর্গত।—স·ম·

করতে হবে, কিন্তু বারোটার সময় গাড়ি যখন এসেই গেল তখন ৪৫ মিনিটে ২৪ মাইল যাত্রা করে আমরা আকবরের পুরীতে পৌঁছে গেলাম। কমলেশজী সঙ্গে ছিলেন আর ঠাকুরমশাই তো আগাগোড়াই সঙ্গী ছিলেন। ৩ ঘণ্টা আমরা সিক্রির মহলগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। শিল্পকলার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদগুলি যাতে দৃঢ় হয় সেদিকেও নজর রাখা হয়েছে আর সেই কারণেই সাড়ে তিনশো বছর পরেও এইসব প্রাসাদ ভাল অবস্থায় আছে। আগে দেয়ালে সুন্দর চিত্র ছিল। এখন কোনো কোনো জায়গায় তার অবশেষ রয়ে গেছে। সিক্রির মহল একটা ছোট পাহাড়ের ওপর বানানো হয়েছে। পাশের নিম্নভূমিকে বাঁধ দিয়ে কোনো এক সময় বিশাল জলাশয়ে পরিণত করা হয়েছিল। বাঁধের অভাবে এখন তা আবার নিম্নভূমির খেতে পরিণত হয়েছে। ষোলো বছর পর্যন্ত আকবরের রাজধানী হবার সৌভাগ্য সিক্রির হয়েছিল। খনুয়া, যেখানে বাবর রানা সাংগাকে হারিয়েছিল, এখান থেকে সাত মাইল দূরে। এটি মীমাংসার লড়াই ছিল আর এই লড়াইয়ে জয়লাভ করে ভারতে মোঘল বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। দেওয়ান-এ-আম আর দেওয়ান-এ-খাস এখানেও আছে, যদিও আগ্রার কেল্লায় এর থেকে বড় আর তার থেকেও বড় দিল্লীর লালকেল্লাতে আছে। রানীদের অন্তঃপুর আছে, যেখানে কিছু হিন্দুরানীও ছিল আর আকবর তাদের নিজেদের ধর্মে থাকার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন।

পাশেই বিশাল জামা মসজিদ রয়েছে, যার দরজা অতি বিশাল (বুলন্দ দরওয়াজা)। ভেতরে আছে শেখ সেলিম চিস্তির সমাধি। জাহাঙ্গীর এই সমাধি শ্বেতপাথর দিয়ে বানিয়েছিলেন। নিঃসন্তান হওয়ায় আকবর সাধু-ফকিরদের খুব সেবা করতেন। অনেকেই হয়তো আশীর্বাদ দিয়ে থাকবে, কিন্তু শেখ সেলিমেরটা ফলে গেল। আকবর পুত্ররত্ন লাভ করলেন, শেখের নামে তার নাম সেলিম রাখা হলো। শেখ সেলিমের শীতল ছায়ার জন্যই আকবর দিল্লী ছেড়ে সিক্রিকে রাজধানী করেছিলেন। পরে তা অনুকূল না হওয়ায় আগ্রাকে নিজের রাজধানী করেছিলেন।

চারটের সময় আগ্রা ফিরলাম। যদি ৪ ঘণ্টা আগে গাড়ি পেতাম, তাহলে বারোটার সময়ই ফিরে আসতে পারতাম আর খাওয়া-দাওয়া সেরে মথুরার উদ্দেশে রওনা হয়ে যেতাম।

গান্ধীজীর বীরগতি—সাড়ে পাঁচটার সময় আমরা আগ্রা ছাড়লাম আর পৌনে সাতটার সময় মথুরা পৌঁছে গেলাম। সুখসঞ্চারক কোম্পানির মালিক ডা· বিশ্বপালের বাড়িতে উঠলাম। রাত নটা পর্যন্ত সেখানেই সাহিত্যসভা চলল। এখানকার সাহিত্যিকদের স্তর যথেষ্ট উঁচু দেখে খুবই আনন্দ হলো। সুখসঞ্চারক কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পণ্ডিত ক্ষেত্রলাল শর্মা, যিনি অন্যের দেখাদেখি নিজের ঔষধালয় আর এই কোম্পানি শুরু করেছিলেন। বিজ্ঞাপনের ক্ষমতাকে সেইসময় অমৃতধারার মালিকের মত সামান্য কিছু লোক জানত। অমৃতধারার সফলতায় অনেকের সন্দেহ ছিল যে, এই রাস্তা পুরনো হয়ে গেছে, এতে আর আকর্ষণ নেই, অতএব সাফল্যের আশা নেই। কিন্তু পণ্ডিত ক্ষেত্রপাল দেখিয়ে দিলেন যে, 'অতিশয় রগড় করে জো কোই/ অনল প্রকট চন্দন সে হোই।'[১]

সমস্ত যুগে, বিশেষ করে আজকাল তো বিজ্ঞাপনের মহিমা অসীম। বিজ্ঞাপনের ঢং প্রত্যেক যুগে ভিন্ন ভিন্ন হবে, এ কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। প্রাচীন সাধু-মহাত্মাদের বিজ্ঞাপন তাঁদের শিষ্য ও অনুচরেরা করত। আধুনিক সাধু-মহাত্মাদের প্রচারও তারা খুবই একাগ্রচিত্তে করে, তাছাড়া নিজস্ব গ্রন্থ-পুস্তিকার মাধ্যমেও মহাত্মারা তাঁদের প্রচারে নিযুক্ত থাকেন। ব্যবসায় সাফল্যের অর্থ হলো লক্ষ্মীর সিদ্ধি, অর্থাৎ বস্তু-প্রাপ্তি। তাছাড়া 'দ্রব্যেন সর্বে বশাঃ'—সকলেই দ্রব্যের বশ। দ্রব্যের প্রাচুর্য থেকে প্রথম প্রজন্মের না হলেও পরের প্রজন্মের শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্বন্ধী স্তর অনেক উঁচু হয়ে যায়, আবার সাধারণ অবস্থার অর্ধশিক্ষিত, অর্ধগ্রাম্য বাবা-মায়ের ঘরে জন্ম নিয়েও মানুষ উচ্চশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। শুধু সুখসঞ্চারক কোম্পানির মালিকই নয়, তাঁর শ্যালক সেকেন্দ্রাবাদের মুরারিলাল শর্মা এবং আরো অনেকের সন্তান তার উদাহরণ।

৩০ তারিখ শুক্রবারের অবিস্মরণীয় দিনটি এলো। সকালে জলযোগের পর নটার সময় মিউজিয়ামে পৌছলাম। মথুরার মিউজিয়ামের নিজস্ব বিশেষ গুরুত্ব আছে। এর প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণণের সাংস্কৃতিক প্রেমের প্রাপ্য। কুষাণযুগেই মথুরা সমৃদ্ধির চরম উৎকর্ষে পৌছেছিল। প্রায় সাড়ে তিন শতাব্দী ধরে তা কুষাণ আর তাদের মহারাজ্যপালদের রাজধানী ছিল। যদিও এর আগে তা সুরসেন জনপদের একটি সাধারণ রাজধানী ছিল কিন্তু সে সময় তার পক্ষে বেশি উন্নতি করার সুযোগ ছিল না। যদিও বাণিজ্যের চতুষ্পথে থাকায় উন্নতি করার অনেক সম্ভাবনা ছিল। আকবর যদি আগ্রার লোভ না করতেন, যে লোভের কারণ ছিল সিক্রি থেকে তার কাছাকাছি অবস্থান, তাহলে মথুরা আর একবার কুষাণদের নিজস্ব সমৃদ্ধির পুনরাবৃত্তি করত। আজ কৃষ্ণের দেশ হবার জন্যই মথুরার মহত্ব। কুষাণদের সময় নিজের বড়ত্বের জন্য তার এই মহত্বের প্রয়োজন ছিল না। কনিষ্ক আর হুবিষ্কর সাম্রাজ্য সমস্ত উত্তর-ভারত থেকে নিয়ে মধ্য-এশিয়ার অরাল সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাণিজ্য তার চরম উৎকর্ষে পৌছেছিল। কনিষ্কর অনেকগুলি রাজধানী ছিল, যার মধ্যে কপিশা—কাবুল, পুষ্পপুর, পেশোয়ার এবং মথুরা প্রধান ছিল। নিজেদের রাজধানীগুলিকে সুন্দর করে অলঙ্কৃত করাটা কুষাণদের ব্যসন ছিল। কনিষ্কর মথুরা কত ভব্য এবং সুন্দর ছিল তা কল্পনা করা যেতে পারে, তবে কল্পনার থেকে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই মিউজিয়াম। এখানে কুষাণযুগের সবথেকে বেশি এবং সুন্দর মূর্তি সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। মাটির তলায় যে এর থেকেও বেশি আছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কত মূর্তি যে আজও মথুরার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নামে পুজো পাচ্ছে। তার থেকেও বেশি সংখ্যক তো যমুনা-প্রাপ্তি হয়েছে। সত্যি সত্যি শত শত বৎসর ধরে খণ্ডিত কিন্তু অসাধারণ হাজার হাজার প্রাচীন মূর্তি যমুনা, গঙ্গা, সরযু, গণ্ডক ইত্যাদি নদীর জলে নিক্ষেপিত হয়ে আসছে। আর কখনো কি তাদের ফিরে পাবার সম্ভাবনা আছে? ফিরে পেলেও দন্ত-নখ-কেশ-এর মত অঙ্গগুলিও স্থানভ্রষ্ট হয়ে

---

[১] তুলসীদাসের রামচরিত মানস থেকে উদ্ধৃত এই পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের আক্ষরিক অর্থ—'যে কেউ অতিশয় ঘর্ষণ করলে চন্দন কাঠে আগুন জ্বলে ওঠে।—স.ম.

তাদের অনেক ঐতিহাসিক গুরুত্ব হারিয়েছে। কেদারের মুদ্রাগুলি সম্বন্ধে আমার জানার ইচ্ছে ছিল। এখানে কেদারের স্বর্ণমুদ্রা ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক কেদারকে পরের দিকের কুষাণরাজা বলে মনে করেন, আবার কেউ কেউ তাকে হেফতাল শ্বেত হুণ মনে করেন।

এরপর আমরা বৃন্দাবনে গেলাম। গোবিন্দরাজের মন্দির আকবরের সময় তৈরি হয়েছিল, আর সম্ভবত তা সর্বদা অপূর্ণ ছিল। বৃন্দাবন যমুনার সেদিকে অবস্থিত ছিল না যেদিকে মথুরা রয়েছে। কিন্তু লাঠির প্রয়োগে মানতে বাধ্য করা হয়েছে যে এখানেই বৃন্দাবন আছে। ভাগবত্ থেকে আমরা জানতে পারি যে, বৃন্দাবন যেতে বসুদেবকে যমুনা পার করতে হয়েছিল। পরিত্যক্ত এবং বিস্মৃত বৃন্দাবনকে গৌড়ী (বাংলার) বৈষ্ণবরা আবিষ্কার করেছিল। এখন সেখানে বাঙালী ভিখিরিদের ভিড় হয়েছিল, পূর্ব-বাংলা থেকে প্রচুর সংখ্যায় শরণার্থী আসাটাও এর একটা কারণ ছিল। বৃন্দাবন গুরুকুল দেখলাম, দেড়শোর কাছাকাছি ছাত্র আমার দৃষ্টিতে পর্যাপ্ত নয়। এখন তো গুরুকুলের শিক্ষা নানান ব্যাপারে ইউনিভার্সিটির শিক্ষারই মতন, কাজেই অভিভাবকদের এতে কোনো আপত্তি থাকা উচিত নয়। আজকালের যুগে মাসিক ১৬ টাকায় ছেলেদের ভরণ-পোষণ কি করে হওয়া সম্ভব? তাই ঘি-দুধের জন্য ১০ টাকা আর কাপড়ের জন্যও অল্প কিছু টাকা খুব বেশি নয়। এখানকার স্নাতকদের কয়েকটি বিষয়ে সোজাসুজি আগ্রা ইউনিভার্সিটির এম· এ·-তে বসার অধিকার আছে। কিন্তু কেবল কলার মাধ্যমে দেশোদ্ধার হওয়া সম্ভব নয়, সেজন্য সাইন্স এবং টেকনোলজির প্রয়োজন আছে। গুরুকুলকে এমন সংস্থায় পরিণত করতে গেলে অনেক টাকার প্রয়োজন হবে।

পথে বিড়লাদের গীতা-মন্দির দেখলাম। সিমেন্ট আর ইট দিয়ে অতিমাত্রায় শিল্পহীন কাঠামো খাড়া করে আমাদের শেঠরা তাদের সুরুচির পরিচয় দেন। এখানে মন্দিরটিকে চিত্র দিয়ে অলংকৃত করা হয়েছে। কিছু কিছু শ্বেতপাথরের কাজও আছে। শহর থেকে বাইরে থাকার অর্থ এই নয় যে, বিজ্ঞাপন থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা করা হয়েছে। এটা রয়েছেই মথুরা থেকে বৃন্দাবন যাবার পথের ওপর, যে পথ দিয়ে রোজ প্রতিটি যাত্রীকে যেতে হয়। বিজ্ঞাপনহীন বিজ্ঞাপনেব এটা খুব ভাল নিদর্শন। দেয়ালের চিত্রগুলি দেখলে একথা মানতেই হবে যে, পঞ্চাশ কি একশো বছর আগে থেকেই এই বিষয়ে আমাদের রুচি যথেষ্ট উন্নত। যদি দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সাহায্য নেওয়া হতো, তাহলে তা আরো সুন্দর হতো, কিন্তু আবার সেই খরচের প্রশ্ন উঠত।

মধ্যাহ্ন ভোজন করার পর আমরা আবার মথুরার টিলাগুলি খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম। এগুলির ভেতর থেকে কত জিনিস যে পাওয়া গেছে, আর এখনও প্রচুর চাপা পড়ে আছে। একটি কলেজে ভাষণ দিয়ে চা-পান করার জন্য আমরা সুখসঞ্চারক কোম্পানিতে গেলাম। চা-পান শেষ হয়ে এসেছিল। আমরা ধীরেসুস্থে হলে ভাষণ দেবার জন্য বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময় যে খবর শুনতে পেলাম তাতে কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বাজারে রেডিওর সামনে দাঁড়ালাম! এরপর আর কানকে বিশ্বাস না করে উপায় রইল না। কয়েক মিনিট পরে পরে রেডিও সমানে পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছে—কোনো হিন্দু আততায়ী

আজ দিল্লীতে গান্ধীজীকে মেরে ফেলেছে।—এ কি একটা বিশ্বাস করার মতো কথা? গান্ধীজী অজাতশত্রু ছিলেন। কারো অনিষ্ট তিনি চাননি। তাঁরও শত্রু জন্মাতে পারে? আর তাও হিন্দু সভ্যতা এবং সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করার মত মানুষদের মধ্যে? কিন্তু মহারাষ্ট্রকে কলঙ্কিত করতে আর ব্রাহ্মণদের মুখে কালি দিতে এই কাজ করেছিল নাথুরাম গডসে। বুদ্ধের পর ভারতবর্ষে আর কি এমন মহান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছে? আমাদের দেশের ঐতিহ্য চিরকাল চিন্তা-সহিষ্ণুতাকে জাগ্রত রেখেছে। বুদ্ধ অনীশ্বরবাদী ছিলেন, জাত-পাত এবং অন্যান্য আরো অনেক প্রাচীন প্রথার কঠোর শত্রু ছিলেন, স্পষ্টবক্তা ও গান্ধীর মত প্রিয়ভাষী ছিলেন। এমন আরো কত মহাপুরুষই এই মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। মানুষ মতের বিরোধ মত দিয়ে করেছে, তলোয়ার আর গুলির সাহায্য কখনও নেয়নি। অধম গডসে কে জানে কি ভেবে এমন করল। কিন্তু, গডসেকে ভাল-মন্দ কিছু বলাটা ঠিকও নয়, যখন আমরা জানি যে, ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য অধীর উঁচুজাতির বহু লোক গডসের পিছনে ছিল। তারা পুনরায় পেশোয়ারাজত্ব স্থাপন করার স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু এই স্বপ্ন কখনই সফল হবে না। ইংরেজদের থাবার থেকে বেরিয়ে এসে ভারত নিজের ভবিষ্যৎ কিছু উচ্চজাতির স্বেচ্ছাচারী শাসকদের হাতে তুলে দিতে পারে না। যদি তা সম্ভব হতো, তবে ইংরেজদের যাবার পরে ভারতে দশ-বিশটা সূর্যবংশ-চন্দ্রবংশ রাজ্য অবশ্যই স্থাপিত হয়ে যেত। ভারতীয় জনগণ যদি খোলাখুলি তাদের মনোভাব না জানাতে পারে, তার অর্থ এই নয় যে তাদের মনে কিছুই নেই, আর রাম-শ্যাম-যদু-মধু যেদিকে চাইবে সেদিকেই তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বহুজন হিত যেদিকে, সেদিকেই ভারতীয় জনগণ আর তার দেশ যাবে। নদীর স্রোত সরল রেখায় প্রবাহিত হয় না, সেইভাবেই জনতার স্রোতও সরলরেখায় তার গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না, কিন্তু তার একটা দিক থাকে, যেদিকে তাকে যেতে হয়।

যে সভায় আমার ভাষণ দেবার ছিল, এখন তা শোকসভায় পরিণত হয়েছিল। শুধু সভায় উপস্থিত মানুষ নয়, সমস্ত মথুরাবাসী স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ৭৮ বছরের জীবনকাল গান্ধীজী তাঁর মহান কাজেই ব্যয় করেছেন। দেশের স্বাধীনতা তাঁর জীবনের সর্বোপরি লক্ষ্য ছিল। মাত্র সাড়ে পাঁচ মাস আগে তিনি তা নিজের চোখে সম্পূর্ণ হতে দেখেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় সাধ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বৃদ্ধ তো হয়েইছিলেন, শরীরও রোগা-পাতলা ছিল। আততায়ী ও তার পোষকদের আর দু-চার বছর অপেক্ষা করলে কি হতো? গান্ধীজীর জীবন যশস্বী ছিল, আর মৃত্যুও। কাপুরুষ আততায়ীর কাজের বিচার করতে গিয়ে আমার সেই সময় এক হিন্দু নেতার কথা মনে পড়ল—'এমনিতে যদি না মানে, তবে আমরা জহরলালকে মারবো, মন্ত্রীদের মারবো।' হ্যাঁ, গান্ধীজীকে মারার কথা তিনি বলেননি।

সম্মেলনের কাজ

৩১ জানুয়ারি জলখাবারের পর বাসস্ট্যান্ডে গেলাম, বাস ধরে আগ্রা যাবে বলে। আগ্রা ফিরে যাব একথা ভেবেই আমরা এখানে এসেছিলাম, সেইজন্য আমাদের কিছু জিনিস সেখানেই ফেলে এসেছিলাম। কিন্তু আজ সমস্ত ভারত শোক পালন করছিল। সব জায়গায় হরতাল ছিল। বাস বন্ধ ছিল। এক্কা আর টাঙ্গাও পাওয়া সম্ভব ছিল না। আগ্রা হয়ে ফেরার চিন্তা আমরা ছেড়ে দিলাম।

ছোট লাইন ধরে হাতরাস পৌঁছলাম। সেখান থেকে বড়লাইনের গাড়ি ধরলাম। দিল্লী যাবার গাড়িতে এসময় খুব ভিড় ছিল। ছেলেদের বোঝাই করা হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, তাদের বিনা ভাড়ায় যাত্রা করতে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের সেদিকে যাবারই ছিল না। কলকাতা মেল দুঘণ্টা লেট ছিল। সেকেন্ড ক্লাশও ভর্তি ছিল। কোনোরকমে বসার জায়গা পেলাম। আজ দিল্লীতে গান্ধীজীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে, সেই উপলক্ষে ইটাবার কাছে ট্রেন দশ মিনিটের জন্য দাঁড়িয়ে গেল। সেইসময় রাজঘাটে গান্ধীজীর মরদেহ ভস্মীভূত করা হয়ে থাকবে। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর কামরায় আগুন লেগে গেল। ড্রাইভার সেটাকে টানতে টানতে ১২ মাইল দূরে ফঁফুদ নিয়ে গেল। যাত্রীরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল, তার ওপরে আবার বিপদ-শিকল কাজ করছিল না। সৌভাগ্যক্রমে আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলতে লাগল। প্রচণ্ডরূপ ধারণ করেনি। নয়তো বহু প্রাণের বলি হতো।

ফঁফুদে বৃন্দাবনপ্রবাসী শেঠ-শেঠানি এসে ট্রেনে উঠলেন। শেঠের হাত সর্বক্ষণ জপের থলির ভেতর ঢোকানো ছিল, রাধেশ্যামের ভক্ত। অবিরাম মালা জপ করে যাচ্ছিলেন, হরিকীর্তনে তাঁর বড়ই অনুরাগ ছিল। এখন কলকাতা যাচ্ছিলেন। তাঁর ভক্তিভাব নিয়ে আমার কিছু বলার নেই, কিন্তু এটা দেখে অবশ্যই খারাপ লাগল যে, মাটি দিয়ে হাত ধুয়ে ধুয়ে তিনি সমস্ত পায়খানাটা নোংরা করে দিলেন। আমাদের এখানে ব্যক্তিগত শুদ্ধতাকে সবার ওপরে ধরা হয়, তাতে অপরের যত অনিষ্টই হোক না কেন। এই মাটি দিয়েই যদি হাত ধুতে হয়, তাহলে নীচে পড়ে থাকা মাটিও ধুয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেই মাটি তো পায়খানায় পড়েছে, তা ধুলে যে মহাত্মা শেঠ অশুদ্ধ হয়ে যেতেন।

কানপুরে কিছু লোক নামল। কামরাতে কিছুটা শান্তি হলো। পৌনে এগারোটার সময় ট্রেন প্রয়াগে পৌঁছলো। আমরা ভরদ্বাজের কাছে শ্রীনিবাসজীর বাড়িতে গেলাম। পণ্ডিত বলভদ্র ঠাকুরের সঙ্গে থাকায় সমস্ত যাত্রাটা খুব আনন্দে কাটল।

প্রয়াগ—সতেরো দিনের ডাক অপেক্ষা করছিল। সব চিঠির জবাব দেবার ক্ষমতা ছিল না। তবে অনেকগুলিরই জবাব দিলাম। পরের দিন (১ ফেব্রুয়ারি) রোববার সম্মেলনের স্থায়ী সমিতির বৈঠক হবার ছিল, সেইজন্য আমাকে তাড়াতাড়ি করে প্রয়াগে আসতে হয়েছিল। স্থায়ী সমিতিতে সেদিন গান্ধীজীর নৃশংস হত্যার ব্যাপারে শুধু শোকপ্রস্তাব পাস হলো, আর ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখা হলো। 'নবজীবন'-এর সম্পাদক হবার জন্য

সমানে আগ্রহ প্রকাশ করা হচ্ছিল। আজ আমি শ্রীসীতারাম গুপ্তেকে জবাব দিয়ে দিলাম—আমি তা গ্রহণ করতে রাজি নই।

নানান জায়গা থেকে ডাক আসছিল, কিন্তু আমার সামনে প্রধান কাজ ছিল সৃজনকর্ম শুরু করা। বহুমূত্রের পরীক্ষা ও চিকিৎসা নিয়মিতভাবে শুরু করিনি, কিন্তু সারাদিনে পনেরো-ষোলবার পেচ্ছাপ করা ভয়ের ব্যাপার হয়েছিল। বন্ধুরা আরো বেশি শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এর প্রভাব দ্রুত বাড়তে দেখা গেল। ওজন কমে যাওয়াতে খুশি হয়েছিলাম, কারণ অনেক চেষ্টা করেও আমি একাজে সফল হইনি। এখন ভুঁড়ি নিজের থেকেই কমে গেল। জানতাম যে শারীরিক শ্রমের অভাবই এই রোগের কারণ। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, হাঁটাই সবথেকে ভাল ব্যায়াম। পাহাড়ে গিয়ে বেড়াতে পারলে আরো লাভ হতে পারে। যদি এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিতাম তবে তখনই বেড়ানো শুরু করে দিতাম, কিন্তু সময়ের প্রতি লোভ ছিল। বেড়ানোর চেয়ে কিছু কাজ করে নেওয়া ভাল। বস্তুত, এখন আর তাতে কিছু হবারও ছিল না। পরের অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পেরেছিলাম যে, যা হবার তা হয়েই গেছে। প্যাংক্রিঅ্যাস তার কাজ থেকে অবসর নিয়েছিল।

৪ ফেব্রুয়ারিতেও মাঘমেলা ছিল। মহাদেবভাই-এর সঙ্গে আমরাও সঙ্গমের দিকে বেড়াতে গেলাম। গোরখপুর জেলার এক বুড়ি তার সঙ্গীদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। নিজের জেলার নামও তার জানা ছিল না। প্রয়াগে তার গ্রামকে আর কে জানত? কিন্তু তার ভাষা থেকেই বোঝা যাচ্ছিল সে কোন জেলার লোক। আমি তাকে জেলার লোকেদের কাছে পৌঁছে দিলাম। এটা সৌভাগ্যই বলতে হবে, নয়তো ভারতের কোনো দূরদেশে হারিয়ে গেলে তার কি মুশকিল হতো।

সাধুদের ডেরায় এখনও ধর্ম-ধ্বনি উঠছিল। এখনও শত শত লোক পঙ্‌ক্তি ভোজনের জন্য বসছিল। এখনও শ্রদ্ধাশীল ভক্তদের অভাব ছিল না। স্বামী বিদ্বদানন্দ তাঁর সঙ্গে গঙ্গাতীরে ঝুঁসীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি একটি কবরস্থানকে আশ্রমে রূপান্তরিত করেছিলেন। দু-একটি পাকা ঘর বানিয়ে বড় বড় স্বপ্ন দেখছিলেন। কর্মঠ মানুষ। ১৯১৩-তে তিনি বেরিলি জেলার রামনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ঋণ রেখে গিয়েছিলেন, তা শোধ করতে দিল্লীতে চাকরি শুরু করেন। তারপর ঘুরতে বেরোন, সেই থেকে ঘুরেই বেড়াচ্ছেন। স্ত্রী মারা গেল আর মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন। তিনি প্রথমে আর্যসমাজী হলেন, পরে কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৯৪২-এ বেরিলির রেকর্ড-রুম জ্বালানোর কাজে যোগ দেন। রেকর্ড-রুম—যার মধ্যে আমাদেরও বহু ঐতিহাসিক রেকর্ড রাখা ছিল। ইতিহাস লেখার কাজে এগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সে সময় কার এত বিবেক ছিল? ইংরেজদের রেকর্ড-রুম, দাও তাতে আগুন লাগিয়ে! গড়মুক্তেশ্বরেও তিনি গেলেন। সেখানে হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য খড়্গ ধারণ করলেন। ঝুসীতে গঙ্গাতীরে সেই একই ব্রত পালন করলেন। মনের মধ্যে বিশ্বাস জন্মানো দরকার ব্যস তাহলে আর তিনি ক্লান্ত হতে জানেন না। তিনি অনীশ্বরবাদী হলেও আদর্শবাদী, হিংস্র, কিন্তু কোনো স্বার্থ ছাড়াই। সেবা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কিন্তু অনুশাসনের ফাঁদে বোধহয় পড়বেনই না। প্রাচীনকালে

ঝুসী একটা নগর ছিল, যার নাম ছিল প্রতিষ্ঠান। প্রয়াগ সে সময় তপস্বীদের জঙ্গল ছিল। ঝুসীর টিলাগুলির ভেতরে বহু ঐতিহাসিক সামগ্রী লুকিয়ে আছে। স্বামী বিদ্বদানন্দের কুটিরের পাশেই একটি টিলায় গুপ্তযুগের ইঁট দেখলাম। বেড়ানোর সময় শ্রীমহাদেব সাহাও সঙ্গে ছিল।

গান্ধীজীর হত্যার ব্যাপারে পরে আরো কথা জানা গেল। ষড়যন্ত্রে যোগদানকারীদের একজন বোম্বাই-এর প্রফেসর ডাক্তার জগদীশচন্দ্র জৈনের কাছে তাদের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিল। ডাক্তার জৈন অত্যন্ত ব্যগ্রতার সঙ্গে এই খবর বোম্বাই-এর মন্ত্রীদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছিলেন আর চেয়েছিলেন যেন অতিরিক্ত সাবধানতা নেওয়া হোক। কিন্তু মন্ত্রীদের সে-চিন্তা কোথায়? অথবা চিন্তা ছিল, তবু এতো তাড়াতাড়ি কি করে আলস্য ত্যাগ করত? এখন জাতীয় স্বেচ্ছা সংঘের নেতাদের গ্রেফতার করা হচ্ছিল। সংঘের শেষ দু-চারজন পেশোয়া রাজ্যের স্বপ্ন দেখছিল। জাঠ আর রাজপুতদের ঝাণ্ডা উঠিয়ে অন্য নেতারাও ময়দানে নেমেছিল। শেঠরা 'লুঠতে পারো তো লুঠে নাও' এই ধান্দায় ছিল। বিচিত্র অবস্থা ছিল। এই হত্যার ফলে নেতাদের নিশ্চয়ই চোখ খুলেছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি জওহরলালজী গান্ধীজীর অস্থি বিসর্জনের প্রস্তুতি দেখতে এসেছিলেন। আনন্দভবনের রাস্তায় ভীষণ ভিড় ছিল। চারদিকে পুলিশ পল্টনের পাহারা বসানো হয়েছিল।

৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীফণী মুখার্জির সঙ্গে দেখা হলো। দশ বছর আগে তিনি আমার সঙ্গে তিব্বত গিয়েছিলেন। সে সময়ে তিনি গোঁয়ার বেপরোয়া যুবক ছিলেন, যে কারণে আমার সঙ্গে একটু মন কষাকষিও হয়ে গিয়েছিল। এখন তিনি বিবাহিত, একটি মেয়ের বাবা। দায়িত্ব জীবনকে গম্ভীর করে তোলে। পরের দিন তাঁর বাড়িতে চা খেতে গেলাম। সেই মন কষাকষির কোনো চিহ্নই ছিল না। সময়ও খুব বড় চিকিৎসক।

৮ ফেব্রুয়ারি সাহিত্য-সম্মেলনের স্থায়ী সমিতির বৈঠক ছিল। ভিন্ন ভিন্ন সমিতির নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে জেনে আনন্দ হলো। কিছু মতভেদ অবশ্য দেখা গেছে। পরিভাষা রচনার ভার আমাকে দেওয়া হলো। দারাগঞ্জ ইন্টার কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীচৌবেজী আর ইউনিভার্সিটির ড· সত্যপ্রকাশকে নিয়ে উপ-সমিতি তৈরি হলো। নাগরী প্রচারিণী ও নাগপুরের বিশেষজ্ঞদের সম্মিলিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। ড· রঘুবীর নাগপুরে পরিভাষা রচনার কাজ করছিলেন। তাঁর রচনার ঢং এমন ছিল যার সঙ্গে একমত হওয়া ভারতের কোনো বিজ্ঞপুরুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁর ধারণা ছিল, সংস্কৃতে ২২টি উপসর্গ, ২০০০ ধাতু আর ৩০০-র কাছাকাছি প্রত্যয় আছে। এগুলিকে কমিয়ে বাড়িয়ে আমরা কয়েক শতকোটি আলাদা আলাদা শব্দ বানাতে পারি এবং তাদের এক-একটি ইংরেজি শব্দের জায়গায় ব্যবহার করে সেই বস্তুগুলির সঙ্গে এই শব্দগুলিকে লাগাতে পারি। এই পদ্ধতিকে আমাদের এখানে বা অন্য কোথাও ব্যবহার করা হয়নি। এইরকম শব্দ সবসময়ই অজানা থাকে। অজানার সাহায্যে অজানার পরিচয় করা দুষ্কর। এ সবাই জানে। ভারতে আড়াই হাজার বছর ধরে পরিভাষা তৈরি হয়ে আসছে। তার পরিণামস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের দশহাজারের বেশি পারিভাষিক শব্দ আমাদের কাছে

জমা হয়েছে। তার মধ্যে বেশিরভাগই জ্ঞাত দিয়ে অজ্ঞাতকে পরিচিত করানোর চেষ্টা হয়েছে। আর কখনো কখনো বহুপ্রচলিত বিদেশী শব্দ গ্রহণ করতে আপত্তি করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ 'কেন্দ্র'[১], একটি গ্রিক শব্দ। এই শব্দটি যে অর্থ প্রতিপাদন করে, তা 'মধ্যবিন্দু' দিয়ে প্রকাশ পেতে পারে না, সেইজন্য বিদেশী শব্দকেই আমাদের পূর্বপুরুষরা গ্রহণ করেছিলেন। কেন্দ্র, কেন্দ্রিত, কেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি রূপগুলি দেখে কে বলবে যে, এগুলি সংস্কৃত শব্দ নয়? আমার ধারণা, জ্ঞাত শব্দ দিয়ে অজ্ঞাত শব্দকে পরিচিত করার প্রক্রিয়া ধরে নতুন শব্দাবলী গড়া উচিত এবং বহুল প্রচলিত বিদেশী শব্দগুলিকেও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সংযমী হওয়া উচিত।

১০ ফেব্রুয়ারি চিত্রকর সংগলজী তাঁর চিত্রশালা দেখাতে নিয়ে গেলেন। সঙ্গীত, চিত্র আর কবিতার বিষয়ে আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি হলো এই যে, তাদের প্রকৃতির যথাসম্ভব কাছে থাকা উচিত। আকাশে পাখা মেলায় আপত্তি নেই কিন্তু বুনিয়াদ মাটিতে থাকা উচিত। সঙ্গীতের নামে ওস্তাদদের গলাবাজি আমার ভীষণ অপছন্দ। একইভাবে চিত্রের নামে রেখাবাজি আমার একটুও পছন্দ নয়, যতই এই রেখাবাজির সঙ্গে বড় বড় লোকেদের নাম জুড়ে রোয়াব দেখানোর চেষ্টা করা হোক। সংগলজীর সুন্দর ছবি আমার পছন্দ হলো, কারণ তাতে প্রকৃতির কাছে থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। গুপ্তযুগের চিত্রকলা আর ভাস্কর্য এইজন্য মহৎ যে তা কল্পনা এবং বাস্তবের সংমিশ্রণে সৃষ্ট হয়েছে। উর্দুতে মর্সিয়া (শোক-প্রকাশক) কবিতাকে বিকৃত শায়রদের রচনা বলা হয়। আমি মনে করি, যে, প্রকৃতিকে সর্বদা উল্লঙ্ঘনকারী চিত্র-মূর্তি-কবিতা-কলাও সেইরকম বিকৃত শিল্পীদের কাজ।

মেলায় যাবার জন্য আমার আগ্রহ এইজন্যও হতো যে প্রয়াগে নানান জায়গা থেকে আসা ভবঘুরেদের মধ্যে যদি আমার পুরনো পরিচিত কেউ বেরিয়ে যায়। এই কথা মনে করে ১১ ফেব্রুয়ারি খাবার পরে সংগমস্থলে গেলাম। 'জিন ঢুঁঢা তিন পাইয়াঁ'[২] কথাটা সত্যি হলো। এক যুগ পরে ভাগবতাচার্যের সঙ্গে দেখা হলো। তিরিশ বছর তো অবশ্যই কেটে গিয়েছিল। সেসময় তিনি যুবক ছিলেন, আর এখন বৃদ্ধ। কিন্তু তাঁর মধ্যে কর্মক্ষমতা এখনও সেইরকমই ছিল। প্রাণভরে দেখা-সাক্ষাৎ হলো। বহু ব্যাপারে আমরা সমধর্মী ছিলাম। যদিও আমাদের কর্মক্ষেত্র আলাদা আলাদা, আর একে অপরের থেকেও এত দূরে থাকছি যে, আজ তিরিশ বছর পরে দেখা হলো। রামানন্দপন্থী-বৈরাগী-সাধু—এদের মধ্যে ভবঘুরেমি এবং আরো অনেক গুণ ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে বিদ্যার অভাব ছিল। শাস্ত্রীয় দিক থেকে তাদের ভিত্তি দুর্বল ছিল। পণ্ডিত ভাগবতদাস এই দুর্বলতা দূর করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, আর রামানন্দকে তাঁর যোগ্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। রামানন্দ রামানুজ অথবা অন্য কোনো ধর্মসংস্কারক ও চিন্তাবিদদের থেকে কম ছিলেন না, বরং বলা যায় যে, অন্যরা প্রাচীন প্রথার অন্ধ অনুগামী ছিলেন, কিন্তু সময়ের দাবি বুঝে রামানন্দ নতুন রাস্তা বার করেছিলেন। এই প্রয়াগেরই এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম

---

[১] কেন্দ্র—GK. *Kentron* L., F. *Centrum* > E. *Centre*)।—স·ম·

[২] 'যে খুঁজলো, সে পেল।'—স·ম·

হয়েছিল। তারপর ঘুরতে ঘুরতে রামানুজ সম্প্রদায়ের প্রভাবে এসে সাধু হয়ে গেলেন। একদিকে কট্টরপন্থীদের কারণে দমবন্ধ করা পরিবেশের বাইরে বেরোতে চাইতেন, আর সেইসঙ্গে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকেও মুক্ত হাওয়ায় আনতে চাইতেন, আবার অন্যদিকে মুসলমান শাসকদের প্রভাবে যে হীন অবস্থার মধ্যে হিন্দুরা পড়েছিল, তারও চিকিৎসা করতে চাইতেন। তিনি ভেবেছিলেন—জাতপাতের বাঁধন ঢিলে করতে হবে, ছুঁৎমার্গের বাইরে বেরোতে হবে, কূপমণ্ডুকতা দূর করতে হবে এবং মুক্তির জন্য শুধু পণ্ডিত আর রাজাদেরই নয়, সেই সঙ্গে জনসাধারণ এবং তাদের ভাষারও সাহায্য নিতে হবে। তিনি তাঁর এই সমস্ত চিন্তাকে কাজে পরিণত করেছিলেন। ব্রাহ্মণ থেকে চামার পর্যন্ত সমস্ত জাতের লোকই রামানন্দের শিষ্য ছিল। কবীর তাঁর গুরুর নাম উজ্জ্বল করেছিলেন। রবিদাস জানিয়েছিলেন যে, জন্ম কোনো ব্যাপার নয়, শুদ্ধ চিন্তাসম্পন্ন মহাপুরুষ চামারের ঘরেও জন্ম নিতে পাবে। ছুঁৎমার্গকে তিনি যতদূরে সরিয়েছিলেন, পরে তা আর সেখানে থাকেনি। তবুও উঁচুজাতের সহভোজ কম কথা নয়, আর সহপঙ্‌ক্তিতে তো প্রায় সবজাতের সাধুদেরই সম্মিলিত করা হয়েছিল। কথিত আছে যে, সাধুদের পঙ্‌ক্তিতে পাতার অভাব দেখে তুলসীদাস কোনো এক সাধুর জুতো নিযে পঙ্‌ক্তিতে গিয়ে বসেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, সাধুর জুতোর থেকে পবিত্র জিনিস আর কী হতে পারে? কূপমণ্ডুকতা দূর করতে রামানন্দের শিক্ষা যে কতখানি কাজে দিয়েছিল তা এর থেকে বোঝা যায় যে, সেই থেকে হাজাব হাজার বৈরাগী দেশ এবং দেশের বাইরেও কিছু দূর পর্যন্ত সর্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর ফলস্বরূপ শুধু ভারতের প্রতিটি প্রদেশেই নয়, বরং আফগানিস্থানেও বৈরাগীদের কুটির তৈরি হয়েছে। সেখানে যাতায়াত করার সময় ভবঘুরেরা খুব ভালোভাবে নিজের বাড়ির মত চারটে দিন বিশ্রাম নিতে পারে। যদিও খাবার ব্যাপারে ছোঁয়াছুঁয়িতে বৈরাগীরা ততটা উন্নতি করতে পারেনি যতটা সন্ন্যাসী এবং নানকপন্থী সাধুরা করেছে, তবুও রামানুজী কলুর বলদ এখানে জন্ম নিতে পারেনি। জনগণের ভাষা রামানন্দ স্বয়ং গ্রহণ করে কিছু অবশ্যই লিখেছিলেন, কিন্তু তার বেশিরভাগই ছিল পদ, যার ভাষা পুরনো এবং তা অধিকতর কণ্ঠস্থ করে রাখা হয়েছিল। এই কারণেই রামানন্দের এইসব অমূল্য রচনা আমরা সম্পূর্ণরূপে পাইনি। কিন্তু তিনিই আমাদের তুলসীদাসকে দিয়েছেন। অগ্রদাস আর অন্য সাধু তাঁরই পরম্পরার ছিলেন। সত্যি সত্যিই রামানন্দের কাজ মহৎ ছিল, এতটাই মহৎ যে, মানুষ এখনও তাঁর সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেনি। পণ্ডিত ভাগবতদাস (অধুনা পণ্ডিত ভগবতাচার্য) সেই রামানন্দের পতাকা কাঁধে নিয়েছেন। সেইসময়, যখন প্রথম স্বামী ভগবতাচার্য গেরুয়াধারণ করলেন, তখন বৈরাগীদের মধ্যে হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। তারা মনে করত গেরুয়া তো সন্ন্যাসীদের জিনিস। এখনও তাদের মধ্যে গেরুয়াধারীর সংখ্যা কম নয়, তবে এখন আর এদের তাতে বিরক্তি নেই। এদের কাছে স্বামী ভগবতাচার্যের এখন খুব সম্মান।

একে অপরের থেকে দূরে থাকলেও আমরা বই এবং কখনও কখনও চিঠির মাধ্যমে পরস্পরের গতিবিধির পরিচয় রাখতাম। আমার ভাল লাগত যে আমরা দুজনেই নিজেদের কাজে তৎপর ছিলাম। পণ্ডিত ভগবতাচার্য সংস্কৃতে তিনখণ্ডে গান্ধীজীর জীবনী লিখেছেন,

এবং আরো অনেক বই লিখেছেন। সেসময় তিনি সাধুদের মণ্ডলীর মধ্যে বসেছিলেন। কালো শরীরে মোটা কষায় বস্ত্র দেখে কেউ বুঝতেও পারবে না যে তিনি এত তেজস্বী পুরুষ, যদি না তার নজর তাঁর উজ্জ্বল চোখদুটির ওপর পড়ে। তিনি স্বাগত জানিয়ে উপস্থিত সাধুদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, আর আমাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করলেন। কোনো ভবঘুরে, হাজার বছর ধরে বড় বড় ভবঘুরের জন্মদাত্রী এই মণ্ডলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে কিভাবে থাকতে পারে? সেই সময়কার কিছু কথা মনে পড়ে গেল—যখন আমি নির্দ্বিধায় তাদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতাম, প্রথম প্রথম ভবঘুরেমির পাঠ তো এদের কাছে থেকেই শিখেছি। এদের সাহচর্যই ঘন জঙ্গল আর দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতকে ভয়ের নয়, ভালবাসার জিনিস করে তুলেছিল। ঘণ্টাখানেক সেখানে কাটানোর পর আমরা গঙ্গাপারে স্বামী হংসদেবের স্থানে গেলাম। স্বামী সত্যস্বরূপজী এবং অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে বিদ্যা ও আরো অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্তা হতে থাকল। কিছু যুবক সাধুকে বিদ্বানরূপে দেখে আনন্দ হলো এই ভেবে যে, এরা সংস্কৃতের গভীর পাণ্ডিত্যকে নষ্ট হতে দেবে না। মেলায় ঘুরতে ঘুরতে ড· মঙ্গলদেব শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। চোদ্দ বছর ধরে 'প্রমাণবার্তিকভাষ্য' ছাপার প্রতীক্ষায় ছিলাম। কত পরিশ্রম করে আর ভালবাসার সঙ্গে তিব্বত থেকে আমি তা সংগ্রহ করে এনেছিলাম। কত দরজায় ঘুরেছি. আশা দেখা দিতে দিতেও তা প্রেসের মুখ দেখতে পায়নি। ড· মঙ্গলদেবজী কাশী সংস্কৃত কলেজ থেকে ছাপানোর কথা বলায় আমার খুব আনন্দ হলো, যদিও দুধে যার মুখ পুড়ে গেছে ঘোলও তাকে ফুঁ দিয়ে দিয়ে খেতে হয়, তাই আমিও সহসা একথা বিশ্বাস করতে রাজি ছিলাম না যে, 'প্রমাণবার্তিকভাষ্য'-র এই নৌকো পেরিয়ে যাবে। সত্যিসত্যিই এখনও তার আরো অনেক দরজায় ঘোরা বাকি ছিল এবং শেষে সাত বছর পরে জয়সওয়াল সংস্থা তা প্রকাশ করার পুণ্য কাজ করেছিল।

১২ ফেব্রুয়ারি ত্রিবেণীতে গান্ধীজীর অস্থিবিসর্জন হওয়ার ছিল। ত্রিবেণীতেই অস্থিবিসর্জনকে কেন এত গুরুত্ব দেওয়া হলো? না গান্ধীজীর ধর্মীয় মত এই রকম ছিল, না জওহরলালের মতন অন্য নেতাদের এমন মত হওয়া সম্ভব ছিল। দিল্লীর যমুনাতেও অস্থি-বিসর্জন হতে পারত। হয়তো দিল্লীতে এই কৃত্য সম্পাদন করলে শুধু অপূর্ণরূপে সম্মানের পুনরাবৃত্তিটুকুই হতো, আর এখানে তার জন্য একটা নতুন ক্ষেত্র পাওয়া যাচ্ছিল। গান্ধীজীর অস্থি দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ করে বিসর্জন দেওয়া হলো কিন্তু তাঁর বিসর্জনের বিশেষ সমারোহ জওহরলালের জন্মস্থান প্রয়াগেই হলো। লোকে জেনে গিয়েছিল যে, অসম্ভব ভিড় হবে। রাস্তা নির্দিষ্ট ছিল। আমরাও রিজেন্ট সিনেমার সামনে একটা বাড়িতে নটার সময়ই গিয়ে থেকে গেলাম। আরো বহু লোক অনেক আগে থেকে রাস্তার পাশে বাঁশের বেড়ার বাইরে বিছানা পেতে বসেছিল। অস্থি বিশেষ ট্রেনে দিল্লী থেকে আনা হয়েছিল। নটার সময় মিছিল বেরোনর কথা, তাতে দেড় ঘণ্টা দেরি ছিল। রাস্তায় দশহাত দূরে দূরে সেনা প্রস্তুত ছিল। রাস্তার ধারের বাড়িগুলির ছাতেও লোকের ভিড় ছিল। গান্ধীজীর শব ছিল না। তার জন্য যে আবেগের সৃষ্টি হতো, অস্থির জন্য তা হওয়া সম্ভব ছিল না। সেইজন্য মিছিলের সঙ্গে যারা চলছিল, তাদের দেখে মনে হচ্ছিল

মেলায় যাচ্ছে। বেশিরভাগ দর্শকদের মধ্যেও তা দেখা যাচ্ছিল। মিছিলে জওহরলাল পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। বল্লভভাই আর পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্তের পক্ষে পায়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আরো অনেক লোকই গাড়িতে ছিল। একটি লরির ওপরে অবিরাম গীতাপাঠ হচ্ছিল, যাতে বাবা রাঘবদাসজীও ছিলেন। পৌনে এগারোটার সময় মিছিল আমাদের সামনে দিয়ে গেল।

নজরবন্দীর দিনগুলোতে আমি সিগারেট খেতে শিখেছিলাম। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত খেয়ে গেছি। কেন খেতাম? বলতে পারি যে দেখাদেখিতেই, অথবা সময় কাটানোর জন্য। লেখার সময় তো আমি কখনও সিগারেট খেতে পারতাম না। এই লাভটা অবশ্যই ছিল, তা দিয়ে বন্ধুদের অভ্যর্থনা-সৎকার হতে পারত। আমার বন্ধুদের বক্তব্য ছিল যে, এর থেকে রস পাওয়া যায়। আমি সে রস কোনোদিনও পাইনি। অনেক ভাল ভাল সিগারেট খেয়েও একই ব্যাপার দেখেছি। কারো কারো বক্তব্য ছিল, পঞ্চাশটা সিগারেটের একটা পুরো কৌটো খাওয়ার পর কোনো একটাতে রস পাওয়া যায়। কিন্তু তা আমার ক্ষমতার বাইরে ছিল। ইরানে সমানে সিগারেট খেয়েছি, রাশিয়াতে আমার পঁচিশ মাসে তা একদম ছেড়ে দিলাম। লন্ডন থেকে আবার এই বালাই জুটল। জাহাজে সব থেকে ভাল সিগারেটও সস্তাদামে পাওয়া যাচ্ছে দেখে তা দিয়ে বন্ধুদের সৎকার করার চিন্তা মাথায় এলো। এবার আমার তাকে দিল্লীর লাড্ডু বলে মনে হচ্ছিল—যে খেয়েছে সে পস্তিয়েছে, যে খায়নি সেও। আমি তাকে ছাড়তে চাইছিলাম। আর আজ এই পুণ্যদিনে তাকে আমি ছেড়ে দিলাম।

লক্ষ্ণৌ—সেদিন রাতে লক্ষ্ণৌর উদ্দেশে রওনা হলাম। সিট আগের থেকেই রিজার্ভ করা ছিল, নাহলে প্রয়াগ ফেরৎ ভিড়ের জন্য জায়গা পাওয়া যেত না। সকাল সাড়ে সাতটায় লক্ষ্ণৌ পৌঁছে রিসালদার বাগে শ্রীবোধানন্দ মহাস্থবিরের বাড়িতে উঠলাম। অনেক দিন পরে আমি এখানে এলাম। মহাস্থবিরের শরীর এখন দুর্বল হয়ে পড়ছিল। ৭৫ বছর বয়স হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কথা বলার সময় যখন উত্তেজিত হয়ে পড়তেন তখন তাঁর তেজস্বিতা দেখার মত হতো। বিহারের জমিতে এখন বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আগের বাড়িটা থেকে ভাড়াবাবদও মাসিক কুড়ি টাকা পাওয়া যেত। মহাস্থবিরের চিন্তা ছিল যে, পরেও কিভাবে বিহারের কাজ ঠিকমত চলবে। তাঁর যেমন পড়ার শখ ছিল তেমনি ছিল সংগ্রহ করার শখ। এইভাবে বিহারে একটা বেশ বড় পুস্তক ভাণ্ডার তৈরি হয়েছিল। মহাস্থবির যখনই আমার সঙ্গে মিলিত হতেন, ভাবোদ্রেকের কারণে সজল নেত্র না হয়ে থাকতে পারতেন না।

চা-পানের পর কেসরবাগে মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। এটা উত্তরপ্রদেশের সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালা। আমার 'মধুর স্বপ্ন' উপন্যাস লেখার ছিল। উপন্যাস সেই সময়ের, যখন পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে হেফ্‌তালরা (শ্বেত হূণ) উত্তর-ভারতের অনেকাংশের এবং আফগানিস্তান ও মধ্য-এশিয়ার শাসক ছিল। আমি সে-সময়ের ইতিহাসের কিছু জট ছাড়ানোর চেষ্টায় ছিলাম। মিউজিয়ামে কেদারের মুদ্রা ছিল। কেদারকে ছোট কুষাণও বলা

হয়। আবার কিছু লোক কেদারকে হেফ্‌তালদের (শ্বেত হূণ) নেতা বলে মনে করে। হেফ্‌তালরা হূণ ছিল না, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

১৪ ফেব্রুয়ারি যশপালজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি এখন দুর্গাবৌদির বাড়িতে থাকতেন। সেখান থেকে আবার নরেন্দ্রর বাড়িতে গিয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি বাইরে বেরিয়ে গেছেন। তিন ঘণ্টা রিকশা নিয়ে মিউজিয়াম, গোমতী, কোম্পানি বাগান ইত্যাদি জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সওয়া বারোটার সময় নরেন্দ্রজীর বাড়ি পৌঁছলাম, আর দুঘণ্টা ধরে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। শাস্ত্রীয় কথাবার্তা ছাড়াও পরিভাষার বিষয়েও আমরা বিশেষভাবে মত-বিনিময় করলাম। তিনি আশা করেছিলেন যে আমি কিছুদিন থাকব, কিন্তু এখন সময় ছিল কম আর কাজ ছিল বেশি।

বেরিলি—সেদিনই বেরিলি যাবার কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু বহুকষ্টে পরের দিন, শনিবার পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে জায়গা পেলাম। কামরা পল্টন আর পুলিশ অফিসারে ভর্তি ছিল। তিন ভদ্রলোক কথা বলার প্রতিযোগিতা লাগিয়ে রেখেছিলেন। আমি তো সমস্ত যাত্রাটা এমনভাবে বসে রইলাম যে, লোকে আমাকে বোবা বলে ভুল করতে পারত। কথা বলার কোনো দরকারও ছিল না। জানালা দিয়ে বাইরের সবুজ খেত দেখছিলাম। কোথাও কোথাও আখও ছিল। এই লাইনের যাত্রায় 'সণ্ডীলার মিঠাই' সর্বদা আকর্ষণীয় বস্তু। যদিও এখন সেই লাড্ডু আর পাওয়া যায় না, তবু নামের গুণ কিছুটা অবশ্যই চোখে পড়ে। বেরিলিতে ট্রেন লেটে পৌঁছল। স্টেশনে প্রফেসর রামাশ্রয় মিশ্র, আরো কত অধ্যাপক এবং ছাত্রদের সঙ্গে যখন গলায় ফুলের মালা পরে নামতে গেলাম তখন কামরার সঙ্গীদের অবাক হবারই কথা। তারা কি জানত এই বোবার মত বসে থাকা মানুষটা কে?

মিশ্রজীর সঙ্গে আমি তাঁর বাড়িতে গেলাম। পরিবারে পাঁচটি সন্তান, দুজন স্ত্রী-পুরুষ এবং অন্ধ মাকে নিয়ে আটটি প্রাণী ছিল আর রোজগার করার মানুষ ছিল শুধু একজন। শিক্ষিত পরিবারের বোঝা বহন করা যে কত কঠিন! এর শেষ কবে হবে?

১৬ তারিখ সকাল নটার সময় রিকশা নিয়ে একাই বেরিয়ে পড়লাম। বেরিলিতে আমার ভবঘুরে জীবনের বহু পরিচিত জায়গা আছে। ১৯১০ সালে প্রথম এই শহরে এসেছিলাম। তখন থেকেই আগাগোড়া মনের মধ্যে একটা মধুর স্মৃতি রয়েছে। আজ আবার সেইসব জায়গাগুলো দেখতে ইচ্ছে হলো। বেরিলি সিটি স্টেশনের সামনে অম্বাপ্রসাদ শাহ্-এর ধর্মশালায় গেলাম। সেখানে ১৯১০-এ উত্তরাখণ্ডের যাত্রা থেকে ফিরে কিছুদিন ছিলাম। এখনো তা একইরকম ছিল। পিছনের বাগানটাও একই রকম ছিল। উঠোনটা একটু কম পরিষ্কার মনে হচ্ছিল। পাশের সেই ধর্মশালাটাও আছে, যেখানে কাষায় বস্ত্রধারী পণ্ডিত খুন্নীলাল শাস্ত্রী বোধি-প্রাপ্তির চেষ্টা করছিলেন।

সেখান থেকে বেরিয়ে ছোট লাইনের লাগোয়া রাস্তা দিয়ে রিকশা এগিয়ে গেল। একটি সন্ন্যাসী-মঠে গেলাম। ভেবেছিলাম যে এখানে কোনো খণ্ডিত মূর্তি পাওয়া গেছে, যার থেকে বেরিলির ইতিহাসের বিষয়ে কিছু আলোকপাত হবে। কিন্তু কোনো মূর্তি পায়নি। জিজ্ঞেস করায় অলখনাথ, চম্পতরায়-এর বাগান ইত্যাদি জায়গার নাম জানতে পারলাম।

বৈরাগীদের এক আখড়ায় গেলাম। সেখানে মাড়াই কল চলছিল, যাতে দুপয়সায় এক গ্লাস আখের রস পাওয়া যাচ্ছিল। আমি তিন গ্লাস রস খেলাম, ৬ পয়সা দিলাম। মোহান্তজীরই কল ছিল, তাই তিনি পয়সা নিতে অস্বীকার করলেন।

ঘুরতে ঘুরতে ভৈরবনাথের মন্দিরে গেলাম। এখানে ১৯১০-এর ভবঘুরেমি ও সজীবতার কিছু কিছু পরিচয় পেলাম। কংকড়[1] আর গাঁজার ছিলিম চলছিল এবং ভাঙ তৈরি করার কথা হচ্ছিল। মন্দিরটি নাথদের হওয়ায় আমি পুস্তক সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম, তখন গোরখপন্থ-এর কিছু সাধারণ ছাপা পুস্তক দেখাল। বড় বড় নাথপন্থীদেরও যখন নিজেদের পরম্পরা সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই, তখন এখানে তার কি আশা থাকতে পারে? হ্যাঁ, ভাল লাগল যে, ভবঘুরেমির পরিবেশ এখানে কিছুটা চোখে পড়ছিল। ছোট্ট জায়গার উঠোনের মধ্যে বেশ কয়েকটি মূর্তি সাজানো ছিল।

মধ্যাহ্নভোজনের সময় মিশ্রজীর বাড়িতে ফিরে এলাম। চারটে পর্যন্ত ওখানেই বৈঠক চলল, তারপর বেরিলি কলেজে গেলাম। এই কলেজটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৩৭ সালে—মহাবিদ্রোহের বিশ বছর আগে। এখন এখানে প্রায় ১৬০০ ছাত্র ছিল। কলেজ-কর্তৃপক্ষের মধ্যে পুরনোপন্থী বুড়োদেরই প্রভুত্ব। উত্তর-পাঞ্চাল (রুহেলখণ্ড) উত্তর-প্রদেশের সবচেয়ে কম জাগ্রত স্থানগুলির মধ্যে একটি। বুড়োদের মধ্যে প্রাণ না থাক, কিন্তু যুবকদের মধ্যে কেন নেই, তা বুঝি না। সমস্ত জায়গায় শিক্ষিত মধবিত্ত শ্রেণীর দ্বারাই রাজনৈতিক ও সামাজিক জাগৃতি এসেছে। এখানে সেই শ্রেণীর লোকেরা অধিকাংশই ছিল মুসলমান ভদ্রশ্রেণীর, আর তারা জাতীয় ভাবনার থেকে দূরে সরে গিয়ে বিদেশী শাসকদের খুশি করার চেষ্টা করত। এটাই কি কারণ হতে পারে? কলেজে প্রথমে ছবি তোলা হলো, তারপর চা-পান। এরপর ছাত্র আর অধ্যাপকদের সামনে কিছু কবিতা পড়া হলো। কিছু ভাষণ হলো। সবশেষে আমি সাহিত্য এবং হিন্দির ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাষণ দিলাম।

১৭ তারিখ দুপুর পর্যন্ত আমার বাসস্থানেই সাহিত্যিকদের আড্ডা জমে থাকল। খাওয়ার পর দুটোর সময় বেরোলাম।

কেন্দ্রীয় জেলে সাতশোর কাছাকাছি বন্দী ছিল। হাতের সুতো কাটা, হাতের বোনার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। বন্দীরা যখন তাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে কিছু পায় না, তখন তাদের কাজ করার প্রেরণা কেন থাকবে? হ্যাঁ, একটা নতুন জিনিস দেখলাম। রান্নাঘরে পাথুরে কয়লার উনুন হয়েছিল, যাতে রুটি বানানো হচ্ছিল। এত চড়া আঁচ যে, উনুনে হাত-মুখ ঝলসানোর থেকে বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। জেলের রুটি কাঁচা থাকত, এগুলো তেমন ছিল না। ওখান থেকে কাছেই কিশোর বন্দীদের জেলখানা ছিল। সেখানে একশোর বেশি বন্দী ছিল। এখানে সকলেই কাজের জন্য পারিশ্রমিক পেত, তাই তাদের কাজ করার ইচ্ছে ছিল। সমস্ত কাজই হাতের সাহায্যে হতো। অর্থাৎ উৎপাদন অত্যন্ত নিম্নস্তরের হচ্ছিল। তবুও প্রতিটি ছেলে মাসিক বিশ-পঁচিশ টাকা উপার্জন করত।

---

[1] শুকনো অথবা সেঁকা তামাক।—স·ম·

এখানে কাপড় বোনা, সেলাই করার কাজ, জুতো, খেলনা, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদির কাজ করানো হতো।

বেরিলিতে মধ্য-ভারতের সবচেয়ে বড় পশু-গবেষণা প্রতিষ্ঠান আছে, যার দায়িত্ব রয়েছে সরকারের হাতে। শহরের বাইরে এই বিশাল সংস্থা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে পশুদের খাদ্যের বিশ্লেষণ করা হয়, আর কিভাবে পুষ্টিহীন তৃণকে অধিক পুষ্টিকারক করা যায়, তার পরীক্ষা করা হয়। কৃত্রিম গর্ভাধানেরও প্রয়োগ করা হয়। যন্ত্রদ্বারা বীর্য নিক্ষেপ করায় একটি ষাঁড় কুড়িটি গরুর জন্য, আর যদি বেশি ব্যবস্থা থাকে, তবে দুশো গরুর জন্য যথেষ্ট হয়। বিশালকায় ষাঁড় ছোট জাতির গরুর জন্য উপযুক্তও হয় না, কিন্তু এই পদ্ধতিতে কোনো ক্ষতি হয় না। একটি ছোটো পাহাড়ী গরু আর শাহীবাল ষাঁড়ের আটমাসের সুন্দর বাছুর দেখলাম। তার সামনে তার মাকে ছোট মনে হচ্ছিল। এই ধরনের প্রসবের সময় কোনো অসুবিধে হয় এমন কথা তো বলল না, তবে পূর্ব বাংলা আর আসামের সীমান্তে বুনো মোষ দ্বারা গ্রামীণ মোষের সন্তান প্রসবের সময়, বাচ্চা বড় হওয়ায় অধিক সংখ্যায় মোষের মৃত্যুর কথা শোনা যায়। সেখানে বুনো মোষ স্বজাতীয় গ্রামীণ মোষের দলে এসে পড়ে।

ফিরে এসে সন্ধের চা ডা· শ্যামস্বরূপ সত্যব্রতর বাড়িতে খাবার কথা ছিল। ডাক্তার সাহেব একজন পুরনো আর্যসমাজী আদর্শবাদী পুরুষ। সমস্ত পরিবারকে তিনি আর্যসমাজের ছাঁচে ঢালার চেষ্টা করেছেন, যদিও উপহাসাস্পদ পদ্ধতিতে নয়। টাউন হলে পৌঁছে ভাষণ দিতে হলো, সেখানে বেরিলির গণ্যমান্য নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন।

পরের দিন (১৮ ফেব্রুয়ারি) সকালের চা শ্রীরামজীশরণ সাকসেনার বাড়িতে হলো। সাকসেনাজী একজন কবি এবং অধ্যাপক। এখনও তিনি কবি, তবে অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে ওকালতি শুরু করেছেন এবং ভালোই উন্নতি করেছেন। কিন্তু কবিতার প্রতি ভালবাসা তাঁর হৃদয় থেকে যায়নি। তাঁর দেখাদেখি বেরিলির তরুণ কবি নিরংকারদেবও ওকালতিতে চলে গেছেন। নুন-তেল-কাঠের ব্যবস্থা যদি আলাদাভাবে হয়ে যেত তবে তার থেকে ভাল কোনো সাহিত্যিকের পক্ষে আর কি হতে পারে? আমার বেরিলির অভিজ্ঞতা খুবই ভাল। অনেক যোগ্য সাহিত্যকর্মীর দেখা এখানে পেয়েছি। প্রফেসর ভোলানাথ শর্মা তো যেন গোবরে পদ্মফুল। তাঁর এক-আধটা রচনা আমি আগেও দেখেছি, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে ভাল করে জানার সুযোগ এবার পেলাম। প্রফেসর ভোলানাথজী বেরিলি কলেজে সংস্কৃতের প্রফেসর। গ্যেটের প্রসিদ্ধ কবিতা 'ফাউস্ট'-এর একটি অংশের জার্মান থেকে সরাসরি হিন্দিতে অনুবাদ আমি আগেই দেখেছিলাম। কিন্তু একথা জেনে আমার আনন্দ, বিস্ময় ও দুঃখ হলো যে, তিনি গ্রিক ভাষারও বিদ্বান। আনন্দ এইজন্য যে, গ্রিক গ্রন্থরত্নগুলি সরাসরি হিন্দি রূপান্তর করার মত একজন বিদ্বান পাওয়া গেল, যিনি গ্রিক ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃততেও পণ্ডিত। আশ্চর্য এইজন্য যে এখনও পর্যন্ত কেন লোকে তাঁকে চিনল না, আর দুঃখ এইজন্য তাঁর জ্ঞানকে কোনও কাজে লাগানো হচ্ছে না। শর্মাজী প্লেটোর বিখ্যাত গ্রন্থ 'পোলিতেইয়া' (রিপাবলিক) হিন্দিতে অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু প্রকাশনার জন্য কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না। আমি তাঁকে বললাম যে,

'এই বই সম্মেলন দ্বারা প্রকাশ করব। আপনি গ্রিক মনীষীদের মহান রচনাগুলি হিন্দিতে করাটাকে আপনার জীবনের লক্ষ্য করুন। যদি অ্যারিস্টটলের (অরস্তু) সব বই আপনি হিন্দিতে করতে পারেন তবে তাতে আমাদের সাহিত্যের এত বড় উপকার করা হবে যে তা চিরকাল আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।' তিনি বইয়ের অভাবের কথা জানালেন। প্রয়াগে ফিরে আমি এ কথা আচার্য ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বললাম। তাঁর কাছে গ্রিক সাহিত্যিকদের মধ্যে অ্যারিস্টটল আর প্লেটোর দু শতাব্দী আগের ছাপা প্রায় সব বই লাতিন অনুবাদের সঙ্গে ছিল। এই খবর শুনে তিনিও আমার মতই ভীষণ খুশি হলেন, আর বললেন, 'আমার গ্রন্থাগারে এই বইগুলি থেকে কোনো লাভ নেই, শর্মাজি এগুলোকে কাজে লাগান।' আমি সেই বইগুলি সম্মেলনে দান করিয়ে সেখান থেকে ভাল মলাটে বাঁধিয়ে শর্মাজীর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আমি জোর দেওয়াতে সম্মেলন 'পোলিতেইয়া'-কে 'আদর্শ নগর' নাম দিয়ে অনেক পরে ছাপিয়ে দেয়। পণ্ডিত ভোলানাথ তাঁর কাজে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে লেগে পড়লেন। অ্যারিস্টটলের মহান গ্রন্থ 'রাজনীতি'র অনুবাদ তিনি পরের বছরই শেষ করে ফেললেন। শুধু তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হলেন না, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় গ্রিক গ্রন্থরত্নের নবীনতম যে সংস্করণ বেরোচ্ছিল, সেগুলোকেও তিনি ব্যবহার করলেন। ১৯৫০-এর শুরুতেই ছাপার জন্য বই তৈরি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আজ ছ বছর পর্যন্ত তা প্রেসের মুখ দেখেনি। ছটা বছর আমরা নষ্ট করে ফেললাম। যদি তাঁর বইগুলি তাড়াতাড়ি ছাপা হতো তবে সম্ভবত অ্যারিস্টটলের অধিকাংশ বই তিনি হিন্দিতে অনুবাদ করে ফেলতেন। এই উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃখজনক। হিন্দিতে কোথায় গতিরোধ, তা যদি দেখতে হয়, তো এখানে দেখুন। একইসঙ্গে সংস্কৃত এবং গ্রিকের বিদ্বান এবং হিন্দির ওপর সম্পূর্ণ দখল আছে এমন ব্যক্তি সর্বদা পাওয়া যায় না, অথচ আমরা তাঁর প্রতিভা থেকে লাভবান হবার চেষ্টাই করলাম না।

প্রয়াগ—পাঞ্জাব মেল এক ঘণ্টা লেট ছিল। সেই সময়ের গাড়ির পক্ষে এটা কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়। টিকিটবিহীন যাত্রীর আধিক্য ছিল, তাই তাদের শাস্তি দেবার জন্য ট্রেনে ম্যাজিস্ট্রেট সফর করছিলেন। এর ফলে বিনা টিকিটের যাত্রী কম হওয়ায় আমরা আরাম করে বসার জায়গা পেলাম। আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসে তো আর বর্ষাঋতু আসে না, তাই বৃষ্টি এক-আধ ফোঁটাই কখনো পড়ছিল। দুটোর পরে লক্ষ্ণৌ পৌঁছলাম, আর রিকশা নিয়ে রাম-ভবনে গেলাম। এখানেই দুর্গাবৌদি থাকতেন, যশপালও এখানেই ছিলেন। বৌদি বাচ্চাদের জন্য একটা পাঠশালা খুলেছিলেন।

আমরা কালবিন তালুকদার স্কুল দেখতে গেলাম। অযোধ্যা তালুকদারদেরই প্রদেশ। লাখ লাখ টাকা উপার্জনকারী ডজন ডজন রাজা-মহারাজা-নবাব-এর উপাধিতে ভূষিত, ইংরেজদের অনন্য ভক্ত তালুকদারদের পুত্ররা এখানে পড়ত। এই স্কুলটি আয়তনের দিক থেকে এত বড় যে, তার সামনে ইউনিভার্সিটিকেও ছোট মনে হয়। কিন্ডারগার্টেন থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এখানে পড়ানো হয়। ১৫০ জন তালুকদার-পুত্র তখন এখানে পড়ত। ইংরেজরা জনসাধারণের থেকে আলাদা রেখে তাদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রাজভক্তির

পাঠও এখানে দেবার ব্যবস্থা করেছিল। রাজকুমার আর নবাবজাদাদের যেভাবে রাখা উচিত, ঠিক সেইভাবেই তাদের রাখা হতো। এ দেখে আমার তালুকদারি উঠে যাবার কথা মনে হলো। ঠিক সেইসময়ই একটি তালুকদার যুবক বলল, 'এখনও তা উঠে যেতে পাঁচ ছ-বছর লাগবে।' সম্ভবত এমন কথা বলায় তার কোনো ভুল ছিল না, আর তার অভিভাবকরা সেই সময়টার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছিল। তালুকদারি কিনতে এখন আর কোনো বোকা রাজি হতো? তবে জমি, পতিত জমা, জঙ্গলের বন্দোবস্ত থেকে তারা প্রচুর টাকা উপার্জন করেছে। অনেকে ট্র্যাক্টর দিয়ে ফার্ম তৈরি করার চেষ্টা করেছে, শহরে সম্পত্তি করেছে। এইসব কারণে তালুকদারদের অবস্থা ততটা করুণ হতে পারেনি যতটা করুণ অবস্থা ছোটখাটো জমিদারদের হয়েছে। তালুকদার স্কুলের এখন আর তালুকদারির ভরসায় থাকা সম্ভব ছিল না, এটা নিশ্চিত। কিন্তু তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা টেকনিক্যাল কলেজে পরিণত করার চিন্তা তখনও পর্যন্ত কারো মাথায় আসেনি।

খবর পেলাম, উদয়শঙ্করের শৈল্পিক ফিল্ম 'কল্পনা' এসেছে। আমিও দেখতে গেলাম। উদয়শঙ্কর শিল্পী উদয়নকে ফিল্মের গল্পের আধার বানিয়েছেন আর শিল্পীর দীর্ঘজীবনকে ছোট ছোট দৃশ্যের মাধ্যমে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। দৃশ্যগুলি পর্যাপ্ত না হওয়ায় তার থেকে কোনো নিশ্চয়তাতে পৌঁছনোর আগেই তা শেষ হয়ে গেল। জনসাধারণের জন্য তো এই ফিল্ম করাই হয়নি, আমার মত দর্শকও যদি তা পছন্দ না করতে পারে, তবে তার অসাফল্য নিশ্চিত ছিল। যদি তিনি নবীন উদয়নের গল্পের মোহ ত্যাগ করে ছোট ছোট ভূমিকার সঙ্গে নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করতেন, তবে তা অবশ্যই জনপ্রিয় হতো আর আর্থিক দিক থেকেও খুবই সফল হতো। এই অসাফল্য দেখে আমার খুব দুঃখ হলো, কারণ উদয়শঙ্করের শিল্পের আমি একজন প্রশংসাকারী।

১৬ তারিখ ডা· আহমদ আর হাজরা বেগমের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। খুব ভাল এবং সৎ দম্পতি। আঁধি আসুক বা ঝড় আসুক, তাঁরা নিজেদের লক্ষ্যে অটল থেকে সামনে এগিয়ে চলেছেন। হাজরা অনেক আগেই লন্ডনে গিয়ে মন্টিসেরি ট্রেনিং নিয়েছেন, এখন তিনি একটি মন্টিসেরি স্কুলে পড়াচ্ছেন। খাবার পর শ্রীমতি দুর্গাদেবীর মন্টিসেরি স্কুলটিও দেখতে গেলাম। এইসব স্কুলের নিজস্ব উপযোগিতা রয়েছে, তাই তো লোকে বেশি খরচ করেও এইসব স্কুলে তাঁদের বাচ্চাদের পড়তে পাঠায়। কিন্তু আমার মনে হয় শিশমহলে পালিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এইসব রাজকুমার-রাজকুমারীদের শিক্ষা-দীক্ষার দেশের কাজে কোনোই গুরুত্ব নেই। সাধারণ ছেলেদের থেকে আলাদা রেখে একটা কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে পড়ানো, তাদের ভেতর সাধারণ নাগরিক মনোভাবের জন্ম দিতে পারে না। তারা অবশ্যই সাততলা মহলের ছাতের ওপর দাঁড়িয়ে নীচে সর্পিল গতি জনতার দিকে তাকিয়ে থাকবে। কিন্তু এরজন্য আমরা হাজরা, দুর্গাবৌদিকে দোষ দিচ্ছি না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এমন শিক্ষার প্রয়োজন আছে, যার ব্যবহার তারা নিজেদের মত করে করতে চায়।

সেদিনই ইসা বেলা থাবর্ন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ঘণ্টাখানেক ধরে রুশ শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে হলো। এটা মিশনারীদের কলেজ, আর এখন তারা নতুন পরিবেশে নিজেদের

মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। ছাত্র-ছাত্রীরা মাঝে মাঝে হেসেও উঠছিল, যার থেকে মনে হচ্ছিল যে, তাদের মনোরঞ্জনও হচ্ছে। জ্ঞানবুদ্ধির ব্যাপারে তো কোনো সংশয়ই নেই।

সন্ধেবেলা প্রগতিশীল লেখকদের সভা হলো। কমিউনিস্টরা এখন আমাকে তাদের থেকে আলাদা মনে করে, তাই তাদের প্রশ্নোত্তরও সেইরকমই হচ্ছিল। তাদের এই গোঁড়ামি আমার ভাল লাগত না, আর এটা তো আরোই ভাল লাগে না যে, তারা শুধু শুধু অপরের দ্বারা নিজেদের বহিষ্কৃত করানোর চেষ্টা করে। আমার ধারণা, একজন বিপ্লবীর উচিত নিজের ভেতর নিজের অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখেও অপরের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করা, তেমনিভাবে যেমনভাবে কোনো সুস্থ শরীরের ভেতর অস্থি থাকে। যদি বিরোধীপক্ষ তাদের আলাদা করতে পারে তবে তাদের ব্যর্থ করতে সফল হবে। হিন্দি, রাজভাষা আর রাষ্ট্রভাষা হলে, মুসলমানদের ওপর জুলুম হবে, তাদের সংস্কৃতির বিনাশ হবে, এইকথাই সমানে বলছিল। কিন্তু হিন্দিভাষী প্রদেশগুলিতে হিন্দির রাজভাষা হওয়ায় এখন আর কোনো সন্দেহ ছিল না। তাদের বক্তব্য ছিল—সরকার করলে কিছু হবে না। কিন্তু পাঁচ-দশ বছরে কংগ্রেসী সরকারের স্থান অন্য কেউ নেবে, একথা যারা ভাবে তারা করুণার পাত্র।

প্রয়াগ—সে দিনই রাত এগারোটার সময় প্রয়াগ যাবার ট্রেন ধরলাম, আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পরের দিন সকালে প্রয়াগে পৌঁছে গেলাম। মাঘমেলার জন্য কলেরা ছড়িয়ে পড়েছিল, ২০০ মানুষ মারা গিয়েছিল, হৈ হৈ করে কলেরার টীকা লাগানো হচ্ছিল। এ ব্যাপারে কিছুটা সচেতন তো হওয়াই উচিত, নিজে কলেরার শিকার না হয়ে যদি কলেরা ছড়ানোয় সাহায্য করা হয়, তাহলে সেটা আরো খারাপ। তবে আমার এ নিয়ে চিন্তা ছিল না। সেদিন প্রেমচন্দ, মন্মথনাথ গুপ্ত আর অন্য কিছু লেখকের বই পড়লাম। খামোখা বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম যে 'প্রমাণবার্তিক ভাষ্য' এবার ছেপে বেরোবেই, তাই প্রেসের জন্য তাকে তৈরি করতে লাগলাম।

গরমে পাহাড়ে যেতে হবে এটা ঠিক করা ছিল, কখনো কখনো কুলুর কথা মনে হচ্ছিল। ড· জর্জ রোয়েরিকের ছেলের কাছে জানতে পারলাম যে রাস্তা এখনও ভাঙা রয়েছে আর অনেক জায়গাতেই পায়ে হেঁটে যেতে হয়। বই-এর বাক্স বয়ে নিয়ে যাবার ঝামেলা কে পোয়াবে, তাই অন্য কোনো জায়গায় যাবার কথা চিন্তা করতে হবে। ট্রেনে পায়ের ছাল উঠে গিয়েছিল, তা এখনও শুকোয় নি। ডায়াবেটিস তো এই সময়ে রোগ হয়ে দাঁড়ায়, নয়তো প্রয়োজনের বেশি ওজন না কমলে চিন্তা করা উচিত নয়।

২২ ফেব্রুয়ারি রোববার ছিল। সেইদিন সন্ধেবেলা বেড়াতে বেড়াতে রসুলাবাদ সাহিত্যিক সংসদ ভবনে গেলাম। গঙ্গার পাড়ে উঁচু জায়গায় খুব সুন্দর স্থান। তবে নির্জনতাপ্রেমী কবি অথবা যোগীর জন্য এটা উপযুক্ত স্থান হতে পারে। সবাই তো আর গঙ্গাজল আর বিশুদ্ধ বায়ুর ওপর জীবনধারণ করতে পারে না। যদি বই-এর দরকার পড়ে, তাহলে কয়েকমাইল দূরের শহরে যেতে হবে। যদি জীবন ধারণের অন্য জিনিসের প্রয়োজন পড়ে, তবে তার জন্যও কয়েক ক্রোশ দৌড়তে হবে। পুরনো যুগ আর আজকের

যুগের মধ্যে পার্থক্য কতখানি? আজ যে কোনো বর্ধিষ্ণু সংস্থাকে শহর থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া ভ্রূণহত্যার সমান। হ্যাঁ, যদি দেশ সমৃদ্ধ হয়, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জীবনসামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণে সুলভ হয়, আর তার পরেও হাতে পয়সা থাকে, তবে এরকম জায়গা কিছু মানুষের কাছে কিছুদিনের জন্য উপযুক্ত হতে পারে, এখানে তারা বনভোজন করতে পারে। বন-সভাও গঠন করতে পারে।

চিন্তা-ভাবনা করে গরমের জন্য কনৌর-কিন্নর দেশই পছন্দ হলো। এপ্রিলের শেষদিকে যেখানে গিয়ে আগস্টের শেষাশেষি ফিরে আসা যেতে পারে। কিন্তু পরিভাষা তৈরি করার কাজের দায়িত্বও নিয়েছিলাম। সামনের দুমাস সেজন্য অনেক কাজ করার ছিল। শ্রীনিবাসজীর বাড়িতে আছি একথা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল, তাই অন্য কোনো নির্জন স্থান খোঁজা দরকার ছিল। চট্টোপাধ্যায়জী তাঁর কাছে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন। তিনি তাঁর রাঁধুনিকে নিয়ে একা সেই বড় বাড়িতে থাকতেন। সবদিক দিয়েই অনুকূল ছিল, কিন্তু বহুমূত্রের রোগীর হাতের কাছে প্রস্রাবাগারের দরকার পড়ে, রাত্রে তো শুধু এক-আধবার উঠলেই চলে না। আমাদের প্রাচীনপন্থী বাড়িগুলিতে পেচ্ছাপ-পায়খানার সুবিধের দিকে খুব কম নজর দেওয়া হয়। তবুও সেখানে কিছুদিন থাকা স্থির করলাম।

বেনারস—২৬ ফেব্রুয়ারি দুপুরে ছোট লাইন ধরে বেনারসের উদ্দেশে রওনা হলাম। মাঘমেলা শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই ভিড় ছিল না। মাধোসিংহ স্টেশনে গোপালমন্দিরের গোঁসাইগিন্নী উঠলেন। বল্লভপন্থী গোঁসাইরা তৈলঙ্গদেশীয়, তাদের মূল স্থানে স্ত্রীলোকরা পর্দা কি বস্তু জানে না। কিন্তু গোঁসাইগিন্নী জবরদস্ত পর্দায় এলেন। পর্দা ঢাকা দিয়ে তাঁকে এক ট্রেন থেকে আর এক ট্রেনে চড়ানো হলো। শুধুমাত্র বেনারস পর্যন্ত যাবার জন্য এত ঝঞ্ঝাটের কি দরকার ছিল, আরামে মোটরে যেতে পারত। যখন তাঁর জিনিস দিয়ে সমস্ত কামরা ভরে গেল, তখন বুঝলাম, কেন তিনি মোটরে যাননি।

মধ্যাহ্নভোজন ড· মঙ্গলদেবজীর বাড়িতে করলাম, তারপর নিরালাজীর সঙ্গে দেখা করতে গায়লঘাট গেলাম। তখন তিনি অত্যন্ত অনিদ্রায় ভুগছিলেন, সেই সঙ্গে মেজাজও গরম ছিল। কিন্তু যাইহোক না কেন, তাঁর কখনও সৌজন্যের অভাব হতো না। তখন তিনি তুলসীদাসের রামায়ণের হিন্দি করার কাজে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। বেশ কিছু সময় ধরে কথাবার্তা হলো। তিনি তাঁর এই নতুন প্রচেষ্টার কিছু নমুনা দেখালেন। হিন্দির মহান কবিদের কবিতাসংগ্রহ তাঁদেরই দিয়ে করাবার চেষ্টা সম্মেলন করেছিল, এইরকম কিছু গ্রন্থ প্রকাশিতও হয়েছিল। নিরালাজীকে বলায় তিনিও একটি সংগ্রহ প্রায় প্রস্তুত করে ফেলেছিলেন। তিনি কিছু টাকা চাওয়ায় লোকে নিয়মকানুনের কথা তুলল, তাই তিনি তাঁর সংগ্রহ দিতে আপত্তি জানালেন। এমন একজন মানুষের সামনে কি নিয়মকানুনের কথা তোলা উচিত? একবার আপত্তি জানানোর পর কি আমার চেষ্টারও কোনো ফল তাড়াতাড়ি পাওয়া যেত? এখান থেকে নাগরী প্রচারিণী, শ্রীচন্দ বিদ্যাপীঠ, দর্শনানন্দ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়, কারমাইকেল গ্রন্থাগার হয়ে উদাসী বিদ্যালয়ে স্বামী সত্যস্বরূপজীর কাছে গেলাম। একে আমি সাধুদের আদর্শ বিদ্যাপীঠ বলে থাকি, এর অর্থ এই নয় যে,

তার অবস্থা বরাবর একই রকম থাকতে পারবে। ছাত্র অল্পই ছিল, কিন্তু সকলেই উঁচু ক্লাশের। তাদের মধ্যে অনেকেই কোনো না কোনো বিষয়ে আচার্য হয়ে গিয়েছে। খাওয়া-থাকার খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল। দেড় ঘণ্টা ধরে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হলো। ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা চিন্তিত ছিল। আমি তাদের জানালাম যে, সাধু বিদ্বানদের চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। সংস্কৃতের গভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আধুনিক গবেষণার রীতিও কিছু কিছু গ্রহণ করা উচিত। যে গণতন্ত্র আর সাম্যবাদের দিকে আজ সমগ্র জগৎ ঝুঁকেছে, তাকে কোনো না কোনোভাবে ভারতে কেউ যদি কায়েম রেখে থাকে, তবে সে-ই হলো সাধু। আর্থিক কষ্টের কথা তারা বলল না, বরং বলছিল, 'অনেকগুলো ধনসম্পন্ন মঠের জন্য যোগ্য উত্তরাধিকারী পাওয়া যাচ্ছে না, আমাদের এখানে সমানে সেই দাবি আসতে থাকে।'

২৭ তারিখ খেয়ে-দেয়ে আবার বেরোলাম। রাস্তায় ন্যায়াচার্য পণ্ডিত মহেন্দ্র শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলাম, পরে পণ্ডিত জয়চন্দ্রজীর বাড়ি গেলাম। সুমিত্রাজী রুগ্ন ছিলেন। তার স্বাস্থ্য কখনোই ভাল থাকে না, তার ওপর কাজ করার অভ্যাস আছে। সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার আদি পথ-প্রদর্শক গুরু মৌলবী মহেশপ্রসাদের কাছে গেলাম। বয়সের প্রভাব শরীরের ওপর পড়াটা জরুরি। বিবাহের ফল ছিল চারটি 'পার্বতী'। স্ত্রী কবেই মারা গিয়েছিলেন। চারজনের মধ্যে শুধু কল্যাণীর বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, বাকিদের চিন্তা বাবার হওয়াই উচিত। কল্যাণী বেদ মধ্যমাতে নাম লিখিয়েছে। কিন্তু, ব্রাহ্মণ বেদ-শিক্ষক কি করে উচ্চারণ করে কায়স্থকে, তাও আবার স্ত্রীলোককে, বেদ পড়াতে পারত? সে পড়াতে আপত্তি জানাল। মনে হচ্ছিল বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক পার হওয়ার পরও এখনও এইসব কূপমণ্ডুকদের চেতনা আসেনি। আজকাল এই নিয়ে আন্দোলন চলছিল। শেষে ভবিতব্যের কাছে তাদের মাথা নোয়াতেই হবে, আরো কিছুদিন না হয় নিজেদের গোঁড়ামি দেখিয়ে নিক।

২৮ তারিখটাও ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ঘুরে আর লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করে কাটিয়ে দিলাম। পরিভাষার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সঙ্গে এখন কোনো কথাবার্তা বলা গেল না। রাস্তায় বাবু শ্রীনিবাসজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বহু বছর আগে নালন্দায় তাঁর দর্শন পেয়েছিলাম। ডা· ভগবানদাসের ভাই বাবু গোবিন্দদাস খুবই বিদ্যানুরাগী ছিলেন, কাশীতে তাঁর গ্রন্থের সংগ্রহ যথেষ্ট ভাল বলে মনে করা হতো। ইনি ছিলেন তাঁরই সুপুত্র। তিনি দেবনাগরীলিপি সংস্কারের কাজে রত ছিলেন। সেই বিষয়েই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হতে লাগল। কিন্তু বর্তমান লিপিকে বাদ দিয়ে কোনো নতুন অথবা পুরনো রূপ গ্রহণের পরিকল্পনা যে সফল হবে, এতে আমার বিশ্বাস ছিল না। তিনি অশোক ব্রাহ্মীর ক-এর ওপর দাঁড়ি লাগিয়ে দেবনাগরীর মতো ক-এর রূপ দিতে চাইছিলেন। কথাবার্তা বলতে বলতে পণ্ডিত জয়চন্দজীর কাছে গেলাম। আমাদের ইতিহাসবিদদের মধ্যে পণ্ডিত জয়চন্দজী গভীর চেতনা ও গবেষণাধর্মী মানুষ। তিনি যদি একনিষ্ঠ হতেন তবে অনেক বেশি কাজ করতে পারতেন। কিন্তু অন্যান্য কল্পনা কি তাঁকে একনিষ্ঠ থাকতে দিত? আজকাল তিনি প্রকাশনা এবং গ্রন্থ প্রণয়নের বড় বড় স্বপ্ন

দেখছিলেন খুব শিগ্‌গির এই সব বইয়ের বড় বড় সংস্করণ বেরোতে থাকবে, ভারতের সমস্ত ভাষায় তা অনুবাদ হয়ে দেশের প্রতিটি প্রদেশে ছড়িয়ে পড়বে। লাখ লাখ নয়তো হাজার হাজার টাকা খরচ হবে। স্বপ্ন দেখা খারাপ নয় কারণ কত স্বপ্নই তো সত্যি হয়ে উন্নতির পথ প্রশস্ত করে। তবে এখন তেমন কোনো সম্ভাবনা ছিল বলে আমার মনে হচ্ছিল না।

সেবা উপবনে গিয়ে বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্তের চেহারা মনে পড়তে লাগল। কতখানি উদারতা আর সহানুভূতি তাঁর হৃদয়ে ছিল। উগ্র রাজনীতিজ্ঞ, কর্মী আর সাহিত্যিকদের তিনি কত খুশি হয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকতেন। প্রশংসার কথা এই যে, তিনি দেখানোর কোনো চেষ্টা করতেন না। তিব্বত থেকে ফেরার পরে তাঁর সঙ্গে আমার বেশি সম্পর্ক হয়েছিল। সেখান থেকে যখন বই নিয়ে আসার প্রশ্ন উঠল, তখন তিনি আচার্য নরেন্দ্রদেবজীর কথায় সেখানে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। লংকা থেকে টাকা চলে এলো তাই আর তাঁর কাছ থেকে আমার আর্থিক সাহায্য নেবার দরকার পড়ল না। লংকাতে চীনা ত্রিপিটকের প্রয়োজন পড়ল। সেসময় জাপানে তার খুব ভাল তৈসো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। সেজন্য তিনি দেড় হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলেন। সেই ত্রিপিটক এখন বিদ্যাপীঠে ছিল। কিন্তু আর্থিক সাহায্যে উদারতা তাঁর ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ পরিচায়ক নয়। আমার কাজের প্রতি তাঁর অত্যন্ত ভালবাসার দৃষ্টি ছিল। ১৯৩৮-এ সারনাথে থেকে আমি কিছু লিখছিলাম। সেসময় তিনি দেখা করতে এসেছিলেন। ফেরার পথে হিন্দু-মুসলমান ঝগড়ার শিকার হলেন। কোনো মুসলমানকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। উপবনে সেই মানুষটিকে না দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। এখন সেবা উপবনেব মালিক ছিলেন তাঁর দৌহিত্র শ্রীসত্যেন্দ্র এবং তাঁর অনুজ। সত্যেন্দ্র 'আজ' আর 'জ্ঞান-মণ্ডল'কে আরো উন্নত করার ব্যাপারে তৎপর ছিলেন। লাইনো আর মোনো টাইপ ছাড়া এখন কোনো দেশের মুদ্রণ শিল্পের উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দেবনাগরী ছাপার জন্য পাঁচশোর কাছাকাছি টাইপের প্রয়োজন পড়ে। তিনি এবং পণ্ডিত পরাডকরজী চিন্তা করে একটি পরিকল্পনা করেছিলেন, যার ফলে ১২৫টি টাইপেরই প্রয়োজন পড়ত। এর মধ্যে সবচেয়ে ভাল ব্যাপার এই ছিল যে, প্রচলিত দেবনাগরী থেকে খুব কমই পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং তার সৌন্দর্যহানি হতে দেওয়া হয়নি। আমিও লিপি-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলাম। এই ব্যাপাবে অনেক সময় ধরে কথাবার্তা হলো। পরাড়করজী সম্ভবত প্রথম থেকেই রোগাপাতলা ছিলেন, কিন্তু ডায়াবেটিসের শিকার হয়েছিলেন। আমিও সেই পথেরই পথিক ছিলাম আর পুরনো অভিজ্ঞ মানুষের কাছ থেকে লাভবান হবার চেষ্টায় ছিলাম। তবে শেষ পর্যন্ত পণ্ডিত ব্রজমোহন ব্যাসেব কথাই আমার ঠিক বলে মনে হলো—'নিয়মপূর্বক ইনসুলিন নাও। আর খাওয়া-দাওয়ায় সংযম কোরো না।' খাদ্যের মাত্রার সংযম তো আমি নিশ্চিতই প্রয়োজনীয় বলে মনে করলাম, কিন্তু বাকি ব্যাস-সূত্র অব্যর্থ প্রমাণিত হলো।

পরিভাষা রচনার কাজে

প্রয়াগ—২৯ তারিখ আমি প্রয়াগে ছিলাম। খাবার পর সেদিনই চট্টোপাধ্যায়জীর বাড়ি চলে গেলাম। আমার জন্য একটা আলাদা ঘর ছিল। এখানে আমার কাজের বইগুলোকে সুরক্ষিতভাবে সাজিয়ে রাখা যেত, কিন্তু পেচ্ছাপ করার অসুবিধে অবশ্যই ছিল। সেদিনই সম্মেলনের কয়েকটি সমিতির বৈঠকে যোগদান করার জন্য সম্মেলন-ভবনে গেলাম। পারিভাষিক শব্দ রচনার ব্যাপারে দুমাস হয়ে গেছে এবং এখনও কিছু হয়নি। আমার সবচেয়ে ভয় ছিল বদনাম হবার। কোনো কাজের দায়িত্ব নিয়ে আমি নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকতে চাইনা। কিন্তু কি করা যেত? উপ-সমিতির সহকারীদের ফুরসত ছিল না।

১ মার্চ থেকে আমি ঐণীর রচনা 'গুলামান'-এর 'জো দাস থে' নাম দিয়ে হিন্দি অনুবাদ করতে শুরু করলাম। রাশিয়া থেকেই উর্দু অনুবাদ করে এনেছিলাম, কিন্তু তার কোনো প্রকাশক পাইনি। শ্রীতারিণীশ ঝা শ্রীগণেশের কাজ[১] করতে লাগলেন। এটা নিশ্চিত ছিল যে নির্জন-সাধনা করা সম্ভব হবে না, তবুও যাঁরা দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসতেন তাঁদের সঙ্গে যথাসম্ভব কম কথা বলা নিয়ম করলাম। সেদিনই সন্ধেবেলা পাটনা থেকে শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সিংহ এলেন, আর কথা আদায় করে নিলেন যে 'জো দাস থে' তিনি প্রকাশ করবেন। পরিভাষার কাজের জন্য আমি খুবই চিন্তিত ছিলাম। ড· সত্যপ্রকাশের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর ভয় ছিল যে, সম্মেলন তার আলাদা শব্দভাণ্ডার খুলতে চায়। আমি বললাম, 'আমাদের নিজের নিজের কাজ ভাগ করে নেওয়া উচিত, আর একে অপরের কাজে সম্মতি ও সহযোগিতা দেওয়া উচিত।' সে-সময় প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কাশী নাগরী প্রচারিণী সভাতেও এ বিষয়ে চিন্তা করা হচ্ছিল। গতকালের কথা ব্যর্থ হয়নি। আজ ড· বীরেন্দ্র বর্মা আর ড· মাতাপ্রসাদ এলেন। তাঁদের সঙ্গে সে বিষয়ে আরো কথাবার্তা হলো। তাঁদের কাছ থেকে জানলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ ছটি কোষ তৈরি করার কথা ভাবছেন, যার মধ্যে বিজ্ঞান-কোষ অনেকটাই তৈরি হয়ে গেছে। কলা-সম্বন্ধী পরিভাষাও তাঁরা করতে চান। সরকারি কোষের জন্য দেবনাগরী প্রচারিণী কাজ করছিল। বাকি তিনটির ভার সাহিত্য সম্মেলন নিতে পারত। সাহিত্য সম্মেলনের নেবার মানে এই নয় যে, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বানদের কাজ থাকবে না। শেষমেশ এই কাজটা তো মূলত তাঁদেরই ছিল।

৩ মার্চ রায় রামচরণের কন্যার বিয়েতে গেলাম। কয়েক শতাব্দীর পুরনো বড়লোকের মেয়ের বিয়ে, তাই পুরনো প্রথা হঠাৎই কি করে ছেড়ে দেওয়া যায়? তবুও একশো-সওয়াশো বরযাত্রীর আসাটাও শুভ লক্ষণ। ভোজে কয়েকশো লোক হয়েছিল।

---

[১] অন্যের (এক্ষেত্রে রাহুলজীর) মুখ থেকে শুনে শুনে লিখে যাওয়া। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্যাসদেবের মুখ থেকে শুনে শ্রীগণেশ মহাভারত লিখেছিলেন। —স·ম·

আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় অ্যাংলো আমেরিকান দল পাকিস্তানকে নিজেদের পকেটে পুরবার চেষ্টা করছিল, আর কাশ্মীরের ব্যাপারে গোপনে সাহায্যও করছিল। মাঞ্চুরিয়া (চীন)-তে চীনা মুক্তিসেনা সাফল্য লাভ করছিল। আমেরিকা এটা দুচক্ষে দেখতে পারছিল না। তারা নিরপেক্ষ ছিল না। বরং আমেরিকান সৈন্য পাঠানো বন্ধ করে সব রকমে সাহায্য করছিল। ভূগোলকে লাল রং পশ্চিম থেকে পুবদিকে এগোচ্ছিল দেখে বেশ আনন্দ হচ্ছিল।

ইগর আর লোলার চিঠি আসছিল। তারা আশা করছিল যে, দুবছর কাটিয়ে আমি রাশিয়ায় আবার ফিরে যাব। যখন তারা আসল কথা জানবে, কি ভীষণ হতাশ হবে। এইসময় জানতে পারলাম, বাবু মুরলীমনোহর প্রসাদ 'সার্চলাইট' থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। নিজের রক্ত দিয়ে তিনি 'সার্চলাইট'-এর জন্ম দিয়েছেন আর তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। যখন ওই পত্রিকায় কেবল লোকসানই হচ্ছিল তখন জাতীয়তাবাদী এই পত্রিকাকে মুরলীবাবু ডুবতে দেননি। এরপর পুঁজিপতিরা পত্রিকাগুলো দখল করতে শুরু করল এবং 'সার্চলাইট' তাদের হাতে চলে গেল। এখন আর কলম নয়, টাকার থলির একাধিপত্য শুরু হলো। থলি কলমকে তার আঙুলে নাচাতে চাইল। মুরলীবাবু এতে রাজি হলেন না। এখন তাঁর রক্তে সিঞ্চিত চারাগাছ অপরের হাতে চলে গেল।

কখনও কখনও ভাবতাম বেড়ানোর মধ্যে দিয়ে একটু শারীরিক ব্যায়াম করি, কিন্তু মন বলছিল—হিমালয়ে তো যাওয়া হচ্ছেই, সেখানেই নিয়মপূর্বক বেড়ানো যাবে। একথা এখন টের পাচ্ছিলাম যে, মধুমেহ (ডায়বেটিস) হলো শারীরিক শ্রম না করে পুষ্টিকারক ভোজন করারই শাস্তি। প্যাংক্রিঅ্যাস কিছুদিন যাবৎ ইনুসলিনের অভাব পূরণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। তারপর নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। বুদ্ধ কেন চংক্রমণ-এর পক্ষপাতী ছিলেন, তার গুরুত্ব এখন বুঝতে পারছিলাম।

পূর্বে লাল রং মাঞ্চুরিয়ার দিকে এগোচ্ছিল, ওদিকে পশ্চিমে চেকোশ্লোভাকিয়াতেও বামপক্ষ তার প্রভুত্ব স্থাপন করে নিয়েছিল। ইংল্যান্ড আর আমেরিকা উদ্বিগ্ন ছিল, কিন্তু হস্তক্ষেপ করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার সাহসও করতে পারছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি পরিষদের সুন্দর কাজের আরো খোঁজ পেলাম। সাইন্সের পরিভাষা তারা ছাপাচ্ছিল। অর্থনীতি, বাণিজ্য, ইতিহাস, রাজনীতি, ভূগোল, দর্শন, আইন, ভাষাবিজ্ঞান, ব্যাকরণ, শিক্ষা, কাব্য, গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন, ভৌতবিদ্যা, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান এবং কৃষির দিকেও পা বাড়াচ্ছিল। আমার ধারণা, সম্মেলন আর পরিষদের মিলেমিশে কাজ করাটা ভাল।

৭ মার্চ রোববারটা বিশ্রাম করাব দিন ছিল। সেদিন মহিলা ছাত্রনিবাসে বক্তৃতা দিতে হলো। নিজে লেখক এবং ভুক্তভোগী হবার ফলে লেখকদের সমস্যা আমি জানতাম। আর নিজের সহধর্মীদের উৎসাহ দেওয়া এবং সাহায্য করাকেও আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। এমন করতে গিয়ে কখনও কখনও লেখক-প্রকাশকের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ব, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আর তখন তা মাথাব্যথার কারণ হতে পারে। মানুষ তার বিবেকবোধের অভাবে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে, তারপর সবাইকে দোষ দিয়ে বেড়ায়।

আমি মনকে বললাম, 'ভাই, তুমি এসব ঝামেলায় পোড়ো না। শহরের চিন্তায় কাজীর রোগা হবার দরকার নেই।'

কয়েকদিন ধরে যাবো যাবো করে ৮ মার্চ সন্ধেয় শ্রীতারিণীজির সঙ্গে বেড়াতে বেরোলাম। দারাগঞ্জের দিকে বাঁধের নীচে ফসল কেটে রাখা হচ্ছিল। এবারে ফসল ভাল হয়েছে। বিহারে শস্যের দাম কম হবার খবর এসেছিল, ভাবলাম ফসল ভাল হবাব জন্যই এটা হয়েছে। শস্যের চোরাবাজারীরা হায় হায় করছিল। শীতের এখন আব লেশমাত্রও ছিল না। মার্চের প্রথম সপ্তাহেই এতটা পরিবর্তন। কেবল বাতে কিছুটা সময কম্বল গাযে দেবার দরকার পড়ত। এখন পাহাড়ে পালানোর প্রস্তুতির দিকে মনোযোগ ছিল। কনৌব যাওয়াটাই ঠিক হবে বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু আমার প্রথম কনৌব যাত্রায বোঝা বওযাব লোকের অভাব হওয়ায় খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল।

পরের দিন সন্ধেতেও বেড়াতে গেলাম। ড· বদবীনাথপ্রসাদেব বাড়িতে গেলাম। লক্ষ্মীদেবী জানালেন, স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে। শুনে আনন্দ হওযাই উচিত। ভাবছিলাম এটা সম্ভবত সিগারেট ছেড়ে দেবার আশীর্বাদ, অথবা খাওয়ায সংযম, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত দুঘণ্টা পরে পরে পেচ্ছাপ করার দরকার ছিল, ততদিন কি কবে মনে শান্তি পাওযা যেত? চট্টোপাধ্যায়জী আমার খুব খেয়াল বাখতেন, এতো বেশি রাখতেন যে, মাঝে মাঝে সংকোচ হতো। তিনি অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। তাঁব বিদ্যা এবং বিদ্যানুবাগেব প্রতি আমাব গভীর শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু লেখনীর সাহায্যে তিনি তাঁর এই জ্ঞানেব ব্যবহাব কবতেন না, এ নিয়ে বরাবর আমি তাঁকে দোষ দিতাম। ধর্মীয় অনুষ্ঠানেব ব্যাপাবে তাঁকে একদম প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত বলে মনে হতো, কিন্তু গবেষণায তিনি ছিলেন আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন কট্টর নাস্তিক। সরলতা তাঁর প্রতিভায় সোনায সোহাগাব কাজ কবত। বিদ্যার প্রেম-বৈরাগী ছিলেন তিনি। মায়ের অনন্ত ভক্ত। এমন মা, যাঁকে উচ্চশ্রেণীব এক বন্ধু ডাইনী পর্যন্ত বলতে ছাড়েন না, কিন্তু চট্টোপাধ্যাযজী তা শুনতে চান না। মা যা কিছু ফরমাশ করবেন তা পূরণ করাটাকে তিনি তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেন। মাতৃভক্তিব জন্য তিনি একযুগ ধরে নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে রেখেছিলেন। তাঁর একমাত্র মেয়েব খুবই দুঃখজনক মৃত্যু হয়েছিল। বেচারা বাবাকে দেখার ইচ্ছে নিয়েই প্রাণত্যাগ করে, আব তখন তাঁর চোখ খোলে। সেসময় পণ্ডিতগিন্নী বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ বাঁধুনি কিছুদিনের জন্য বাড়ি গিয়েছিল, একজন ব্রাহ্মণী আসত রান্না করতে। কযেক বছবেব মধ্যে নতুন আর্থিক সমস্যা এক নতুন প্রথা চালু করেছে। বাসন মাজার ঝি বাঁধা সময়ে পালা করে বাড়ি বাড়িতে বাসন মাজে। শুধু এক বাড়িতে মাজলে পঁচিশ-ত্রিশ টাকা দিতে হয়, খুব কম পরিবারই তা দিতে রাজি হয়। এরা পাঁচ-সাত টাকা নিয়ে এখন এই কাজ করতে শুরু করেছে। একইভাবে রান্না করার লোকও কয়েক বাড়িতে রান্না করে। এদের মাইনেই শুধু দিতে হয়, খাওয়া নয়। এতে মধ্যবিত্ত লোকেদের বোঝা কমেছে আর সেইসঙ্গে কাজ করার লোকেদেরও লোকসান হয় না।

এখন কিন্নরদেশে মন ছুটছিল। তার চিরহরিৎ দেবদারুর ঘন বন মনে পড়ছিল—সেখানে একটা কুটির বানাতে হবে, আর চিনীরই কাছে। সেই জায়গায় ডাক

পাবার সুবিধে থাকবে। রেলপথ থেকে কয়েকশো মাইল দূরে তিব্বত সীমান্তে এই জায়গাটা পছন্দ করতে দ্বিধাও হচ্ছিল। মানুষ যতদূরেই যাক না কেন নিজের অসন্তুষ্টির জন্যই বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধও থাকে। কখনও কখনও আলাদা থাকলেও মানসিক স্থিতি গাড়ির চাকার মত ওপর-নীচ হতে থাকে। মানুষের যত বেশি সম্বন্ধ থাকে, ততই থাকে তার আনন্দ-বিষাদ। আনন্দকে মানুষ স্বাভাবিক বলে মনে করে, আর বিষাদকে অনভীষ্ট মনে করে তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে অনুভব করে।

১১ তারিখ মশার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। সন্ধে থেকে মশারির ভেতর ঢুকে থাকা মুশকিল ছিল। গরম বেড়ে চলছিল। খাওয়ায় সংযম ছিল, লঙ্কা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। ঘি, তেল নামমাত্রই ব্যবহার করা হতো। কখনও কখনও ঘোল পেতাম। সন্ধে ছটার সময় এক ঘণ্টার জন্য বেড়াতে যেতাম। গরম আর মশার জ্বালায় রাতে লেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম। রাতে স্নান করলেও গরমের হাত থেকে পরিত্রাণ কোথায়?

পণ্ডিত ভোলানাথ 'পোলিতেইয়া'র অনুবাদ পাঠিয়েছিলেন, যেটা আমি ১৫ মার্চ পেয়ে গিয়েছিলাম। পরের দিন পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায় এলেন। তিনি আচারে-বিচারে চট্টোপাধ্যায়জীর দ্বিতীয় সংস্করণ ছিলেনই, আর দুজনের ভাবও ছিল খুব। পূজারী তো ছিলেনই। সেইসঙ্গে স্বপাকাহারীও ছিলেন। কিন্তু চট্টোপাধ্যায়জীর সঙ্গে তাঁর একটা বড় প্রভেদ ছিল—তিনি তাঁর জ্ঞানের দ্বারা অপরকে লাভবান করার জন্য খুব কলম চালাতেন। সংস্কৃত সাহিত্যের সুন্দর রচনাগুলি তিনি হিন্দিভাষীদের জন্য সুলভ করছিলেন। তাঁর 'ভারতীয় দর্শন'-এর তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে ভারি বিষয় অধ্যয়নেও হিন্দিভাষীদের রুচি আছে।

১৭ মার্চ যেন শীত ফিরে এলো। রাতে কম্বল গায়ে দিতে হলো। কম্বল সরিয়ে রেখেছিলাম।

এটা ছিল রাজ্যগুলির মিশে যাওয়া এবং সেখানকার প্রজাদের জোরদার আন্দোলনের সময়। ১৭ তারিখ জানতে পারলাম যে আলোয়ার, ভরতপুর আর করৌলীকে মিলিত করে মৎস্যরাজ্য স্থাপিত হয়েছে, বিন্ধ্যপ্রদেশে বুন্দেলখণ্ডের রাজ্যগুলি আর রিওয়া মিলিত হয়েছে। রিওয়ার আব্দার সামলাতে সেখানকার সরকারকে পৃথক করে রাজাকে রাজ্যের প্রধান করে দেওয়া হয়েছে। ধনীদের সমর্থক সর্দার প্যাটেল মুকুটধারীদের একদম লুপ্ত করে দেওয়াটা ক্ষতি মনে করছিলেন, অথবা মনে করছিলেন যে কিছু কাজ আমরা করছি আর পরের কাজ সময় করবে। রামপুর-বুশহর রাজ্যেরই কিন্নর-দেশে গরমের সময় আমাদের যাবার কথা। খবর পেলাম সেখানেও প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়েছে। কাগজে পড়লাম জনতা পুলিশের বন্দুক কেড়ে নিয়েছে। এখন দুমাস পরে আমাদের যাবার ছিল, ততদিনে অন্যান্য ব্যাপারও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১৮ দিন ধরে লেখার পর ১৮ মার্চ 'জো দাস থে' শেষ করে ফেললাম। তাজিক থেকে উর্দুতে অনুবাদ করতে এক মাস লেগেছিল। নিজের মৌলিক ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মধুর স্বপ্ন'র চিন্তা বার বার আসত, কিন্তু এখনও হাত দিতে মন ইতস্তত করত। এই উপন্যাস লেখার জন্য আমি ইরান আর রাশিয়াতে অনেক সামগ্রী জড়ো করেছিলাম। 'মধ্য এশিয়া

কা ইতিহাস'-এর জন্য অনেক নোট আর কয়েক মণ বই রাশিয়া থেকে এনেছিলাম। এই দুটি বইয়ে হাত দেবার জন্য আমার মন অস্থির ছিল। কাজটা সেখানেই কনৌর প্রবাসের জন্য ছেড়ে রাখছিলাম। ভাবছিলাম, 'সেই গরমের সময় কাজ করার জন্য কুটির থাকুক, ভোট সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান হোক, বৌদ্ধগ্রন্থ সম্পাদন ইত্যাদি কাজও চলুক। তিব্বত থেকে যেসব সংস্কৃত গ্রন্থের ফটো আমি নিয়ে এসেছিলাম তার মধ্যে জ্ঞানশ্রীর তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধী গ্রন্থের চিন্তা বারবার আমার মনে আসত। যদিও 'প্রমাণবার্তিকভাষ্য' এখনও প্রকাশকের অভাবে এমনিই পড়ে ছিল, তবুও ভাবছিলাম, পাটনায় দুসপ্তাহ থেকে যদি জ্ঞানশ্রীর গ্রন্থ কপি করতে পারতাম, তবে ভাল হতো।

১৮ মার্চ পরিভাষা উপসমিতির বৈঠক হলো। শুধু ড. সত্যপ্রকাশই আসতে পেরেছিলেন। আমি এক বছরে ৬০ হাজার পরিভাষা তৈরি করার কথা চিন্তা করলাম।

২১ তারিখ রোববার স্থায়ী সমিতির বৈঠক হলো, কিন্তু পারিভাষিক শব্দের পরিকল্পনা কিছু এগোল না। ট্যান্ডনজী জানালেন, সবার আগে সরকারি পরিভাষার কাজ করা দরকার। তিনি যুক্তপ্রদেশের অ্যাসেম্বলির স্পিকার ছিলেন, পরিভাষার অভাবে তাঁর অসুবিধে হচ্ছিল। পরিভাষা রচনার জন্য তিন হাজার টাকাও মঞ্জুর হলো। আমরা ভেবেছিলাম, কয়েক হাজার শব্দেই কাজ চলে যাবে, কিন্তু শেষে 'শাসন কোষ'-এ ১৫ হাজার শব্দ নিতে হলো। পাহাড়ে যাবার আগে এই কাজটা শেষ করা দরকার ছিল, অর্থাৎ হাতে খুব বেশি হলে দেড় মাস ছিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল, আমরা এই কাজ করে ফেলব। কাজে সাহায্য করার লোকের দরকার ছিল। চট্টোপাধ্যায়জীর কাছে শ্রীবিদ্যানিবাস মিশ্রর প্রতিভার কথা শুনেছিলাম। শ্রীবিদ্যানিবাসকে ডাকার জন্য চিঠি লিখতে বললাম। শ্রীপ্রভাকর মাচবেও সাহায্য করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। এই দুই তরুণ পণ্ডিত আর বহু সাহায্যকারীর সহায়তায় এই কাজ সহজেই হতে পারত। এখন আমার মনে হচ্ছিল যে, এই কাজের জন্য সম্মেলন-ভবনটি সত্যনারায়ণ কুটিরে থাকলে ভাল হবে।

১৯ মার্চ জানতে পারলাম, হায়দ্রাবাদে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে। একতাবদ্ধ মুসলমানরা তাকে ছোট পাকিস্তান বানাতে চাইছিল। নিজাম তার বিরুদ্ধে যাবার সাহস কি করে করতে পারত, কিন্তু জুনাগড়ের উদাহরণ তার সামনে ছিল। জুনাগড়ের নবাব পাকিস্তানের সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছিল, আর শেষে তাকেই দেশ ছেড়ে পাকিস্তানে পালাতে হয়েছিল। নিজামের নিরঙ্কুশ শাসন বরদাস্ত করতে করতে লোক বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হায়দ্রাবাদ সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত নিতে ভারত সরকার দ্বিধা করছিল। তার নিজের এবং নিজের জনতার শক্তির আন্দাজ ছিল না, আর আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের লাল লাল চোখ ভয় জাগাতে সক্ষম ছিল।

২০ তারিখ দাঁতের কষ্ট দূর হবার নাম করল না। দাঁতের ডাক্তারের কাছে গেলাম। জানা গেল, দাঁতে গর্ত হয়নি, এনামেল খারাপ হয়ে গেছে, যার জন্য বেশি গরম অথবা ঠাণ্ডা জল খেলে কষ্ট হচ্ছিল। তিনি বললেন যে, দাঁত পরিষ্কার করতে হবে এবং ডানদিকের নীচের শেষ দাঁতটা তুলতে হবে। দাঁতের কষ্ট নিয়ে সুদূর পাহাড়ে যাওয়াটা

ঠিক হবে না, সেইজন্য সেটা ঠিক করে নেওয়াই স্থির করলাম।

৩০ মার্চ ডাক্তার একটা দাঁত তুলে দিলেন। অবশ করার জন্য ছুঁচ ফোটানো হলো। তখন ব্যথা হয়নি, পরে সন্ধে নাগাদ হতে থাকল। বাকি দাঁতগুলোও ডাক্তার পরিষ্কার করে দিলেন।

২১ মার্চ সম্মেলনে কার্য-সমিতি ও পরে স্থায়ী-সমিতির বৈঠক হলো। পারিভাষিক শব্দের কর্ম-পরিকল্পনায় এত ঢিলেমি দেখে আমি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম। কোনো কাজ নেবার পর সে কাজ সম্পূর্ণ করতে আলসেমি দেখানো আমার দৃষ্টিতে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আমি আমার সমস্ত কাজই গুটিয়ে নিয়ে এই কাজে লেগে পড়তে তৈরি ছিলাম। ঐনীর লঘু উপন্যাস 'য়তীম' (অনাথ)-এর অনুবাদের কাজ তো এমনিই নিয়ে রেখেছিলাম। সেটা পাঁচ-ছদিনের বেশি লাগার মত কাজও ছিল না। আমি যতটা দ্রুত কাজ করি ট্যান্ডনজী ততটাই ঢিলেঢালা স্বভাবের মানুষ। আমি দৌড়তে চাইতাম আর তিনি পিঁপড়ের থেকেও অলস গতিতে হাঁটতে চাইতেন। আমি বিরক্ত হয়ে উঠতাম। তবে সরকারি কাজের পরিভাষা রচনার তাড়াতাড়ি করার ব্যাপারে তিনিও একমত ছিলেন।

২৫ আর ২৬ মার্চ দোল ছিল। দোলের হৈ-হল্লা আগের থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এত দামী হওয়া সত্ত্বেও জায়গায় জায়গায় কি করে যে এত বেশি পরিমাণ কাঠ জমা করা হয়েছিল, সেটা চিন্তার বিষয়। কংগ্রেসীরা গান্ধীজীর শোকে এইবছর দোল না খেলার নির্দেশ দিয়েছিল, কিন্তু সবদিক দিয়ে দুঃখী মানুষদের দুঃখ ভোলার কোনো মুহূর্তকে নিষিদ্ধ করাটা ঠিক নয়। লোকেরা নির্দেশ মানে নি।

২৫ মার্চ থেকে আমি পরিভাষা সম্বন্ধীয় সামগ্রী জোগাড় করা শুরু করলাম। গোয়ালিয়র রাজ্য হিন্দিতে অনেক আইনের বই ছাপিয়েছিল। সেগুলো আনালাম। প্রয়োগের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত অভিজ্ঞ মানুষ দ্বারা রচিত পরিভাষা খুব ভাল হয়। কিন্তু এমন অভিজ্ঞ মানুষদের গতি ভয়ঙ্কর ঢিমে হয়। তাই শুধু তাঁদেরই আশ্রয় নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

২৫ মার্চ খবর পেলাম, সোস্যালিস্টরা কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে গেছে। কমিউনিস্টদের অনেক আগে আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল, এবার সোস্যালিস্টরাও কংগ্রেস ছাড়ল। কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে নীচের থেকে ওপর পর্যন্ত এমন নোংরামি ছড়িয়েছিল যে, সোস্যালিস্টরা মনে করল, এটা ডুবন্ত নৌকা, এর থেকে ঝাঁপ দেওয়াই ভাল। কিন্তু এর দ্বারা তারা কংগ্রেসকে স্থান-ভ্রষ্ট করতে পারবে না। এর জন্য মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মাতে হবে যে কংগ্রেসের কাঁধের বোঝা অন্যরাও বহন করতে প্রস্তুত আছে। এ তখনই সম্ভব, যখন সমস্ত বামপন্থী দল নিজেদের সংযুক্ত মোর্চা তৈরি করবে। এ কথা বলার দরকার পড়ে না যে, কংগ্রেসের পরে যে দলগুলি সর্বাধিক শক্তিশালী তাদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নাম সর্বপ্রথম আসে। আর লাল রঙ দেখে ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মতো সোস্যালিস্টরা তো কমিউনিস্টদের নামেই খেপে ওঠে। শুধু দেশের কমিউনিস্টদেরই নয়, বাইরের কমিউনিস্ট অথবা কমিউনিস্ট প্রভাবিত দেশগুলিকেও তারা দুচক্ষে দেখতে পারে না। একটা ছোলা ভাঁড় ফাটাবে, এমন কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সোস্যালিস্টদের স্বর্গ

এই ভূতলে আসতে কয়েক যুগ অপেক্ষা করার প্রয়োজন, জনতা তা করতে হতে পারে না। তাদের এই নীতির জন্য তারা কংগ্রেসেরই পক্ষ সমর্থন করছে, কারণ অন্য কার্যকরী নেতৃত্বের অভাবে লোক কংগ্রেসের অবহেলা কি করে করবে? কংগ্রেসের পক্ষে এটা জরুরি নয় যে, সব লোকই তার সক্রিয় সমর্থন করুক। যদি সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ নিরপেক্ষ থাকে, তবে নিজেদের স্বার্থে কংগ্রেসের সঙ্গে লেগে থাকা মানুষ তাকে জিতিয়ে দিতে সফল হবে।

ভাই রামগোপাল কয়েক বছর ধরে আমার সঙ্গে একই রকম স্বপ্ন দেখছিলেন। আমাদের ভালবাসা এবং ঘনিষ্ঠতা অসাধারণ ছিল। দুঃখ এই যে, অকালেই তিনি প্লেগের শিকার হলেন। তাঁর স্মৃতি-চিহ্ন হিসেবে দয়াশঙ্কর রয়েছেন। তিনি ২৩ তারিখ দেখা করলেন। বি· এ· পাশ করে তিনি মহোবাতে ভূগোলের অস্থায়ী শিক্ষক ছিলেন। এম· এ· অথবা এল· টি· করে উন্নতি করতে চাইছিলেন। এমন তরুণকে যদি সাহায্য না করা হয় তবে আর কাকে করা হবে? কিন্তু আজকাল সুপারিশের যুগ। সুপারিশও এমন লোকের হওয়া দরকার যে উচ্চ পদাধিকারীদের কোনো কাজে আসতে পারে। আমার মধ্যে সে যোগ্যতা নেই, তার মানে আমার দেওয়া কথা বৃথা হতো। আমি সেটা এড়িয়ে থাকতে চাইছিলাম না। তবুও· কিছু তো করতেই হবে, লাগে তীর না লাগে তুকই সই।

২৭ মার্চ ঘাম হতে শুরু করল। পাহাড়ে যাবার কথা মে মাসে। কি করে দিন কাটবে? কুলু থেকে শ্রীচন্দ্রকান্তজীর চিঠি এলো, এবছর সেখানে যাবার জন্য, কিন্তু সেখানে যাবার পক্ষে সবচেয়ে বড় বাঁধা ছিল রাস্তার। এখনও মোটর চলার রাস্তা ভাল তৈরি হয়নি। ড· জর্জ রোয়েরিকের একটা আকর্ষণ ছিল, কিন্তু তাঁরও বিদেশ চলে যাবার কথা ছিল। আমি এই সময়ে কুলুতে যাবার অক্ষমতা জানিয়ে দিলাম।

রাজাপুর—২৮ তারিখের রোববারের দুপুরে সাহিত্যিকদের একটি দল গোস্বামী তুলসীদাসের জন্মস্থান রাজাপুরের উদ্দেশে রওনা হলো। এখন সরকারি রোডওয়েজ-এর বাস চলছিল না। আমাদের বাস ভর্তি ছিল। ড· উদয়নারায়ণ তেওয়ারী, পণ্ডিত বাচস্পতি পাঠক, নির্মলজি, শ্রীরামবহোরী শুক্ল সঙ্গে ছিলেন। আড়াই ঘণ্টায় আমরা যমুনার তীরে পৌছলাম। রাস্তার কয়েকটি গ্রামে প্লেগ ছড়িয়েছিল। ঘরের বাইরে ঝুপড়ি বানিয়ে লোকেরা তার মধ্যে ছিল। ফসল কাটা হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীন ভারতের গ্রামেও সেই আগের মতই নগ্ন-ক্ষুধার্ত চেহারা চোখে পড়ছিল। দুপুরে প্রচণ্ড গরম ছিল। যমুনার তীরে দোতলা পাকা ধর্মশালা ছিল। এখানেই সামান্য জলপান আর বিশ্রাম হলো। তারপর পায়ে হেঁটে নৌকোর দিকে এগোলাম। বালি ভীষণ গরম, মাথা ভনভন করছিল। নৌকোয় করে ওপারে পৌছলাম। এই শতাব্দীর শুরুতে কিছু উৎসাহী মানুষ চাঁদা তুলে তুলসীদাসের মন্দির বানিয়েছিল। যমুনা তার নীচের মাটি ভাঙছিল। গ্রামটাও ক্রমে ভেঙে পড়ছিল। রাস্তায় এমনি একটা পাথর রঙ করে তাকে সংকটমোচন হনুমান বানানো হয়েছে। তবে রাজাপুর অর্বাচীন স্থান নয়। রাস্তায় চারমুখওলা মুখলিঙ্গ পেলাম, যে বলে দিচ্ছিল—আমি গুপ্তযুগের (চতুর্থ-পঞ্চম খ্রি·) কাছাকাছি সময়ের। আবার এক জায়গায় নৃত্যরত কুড়ি

হস্তবিশিষ্ট গণেশের মূর্তি পেলাম, সে জানাল—একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে আমি আজকের থেকে ভাল অবস্থায় ছিলাম। এগুলো তো মাটির ওপরে ওপরে পাওয়া পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী, ভেতরে কে জানে আরো কত জিনিস পাওয়া যাবে। রাজাপুর যমুনার একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘাট, যা একটি চালু বাণিজ্য-পথের ওপর অবস্থিত। ঘাটের রোজগার তুলসীদাস-স্মারকের প্রাপ্য। ১৮৪১-এ এই রোজগার বার্ষিক ৪২০০ টাকা ছিল। গ্রামের বেশির ভাগ বাড়িই কাঁচা। পাকা বাড়িগুলোরও নীচের অংশ মাটি দিয়ে তৈরি। রাজাপুরে রামচরিত মানসের একটি পুরনো হস্তলিখিত পুঁথি আছে, যেটিকে গোস্বামীজীর নিজের হাতে লেখা বলা হয়। 'রামু, ফলু' ইত্যাদি শব্দের শেষের উ-কার বলে দিচ্ছিল যে লেখাটা পুরনো, কিন্তু রামায়ণের শ্লোকগুলোতে শ-এর জায়গায় তিনবার স-এর ব্যবহার বলে দিচ্ছিল যে তা গোস্বামীজীর হাতে লেখা পুস্তক হতে পারে না। রাজাপুরে একটা ছোটমত বাজার আছে। স্মারকের রক্ষা আর বৃদ্ধির বিষয়ে একসভা হলো, তারপর সেদিনই সেখান থেকে প্রয়াগে ফিরে এলাম।

গরমের দিনে বাইরে কোথাও যাওয়া-আসার প্রোগ্রাম করা ভীষণ কষ্টের ব্যাপার। কিন্তু শ্রীজগদীশচন্দ মাথুর যখন স্বয়ং এসে ২০-২১ এপ্রিলের বৈশালী-উৎসবে সভাপতি হবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন, তখন আমার পক্ষে আপত্তি জানানো মুশকিল হয়ে পড়ল। সভাপতি হলেই হবে না, বৈশালীর ওপর একটা ভাষণ তৈরি করতে হবে এবং ভারতের পরম যশস্বী তথা ঐতিহাসিক এই গণরাজ্যের বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করতে হবে। হতে পারে, বৈশালী এখনকার জেলার সমান একটি গণরাজ্য ছিল, কিন্তু এথেন্স তো তার থেকেও ছোট ছিল। গোস্বামীজী বলেছেন, 'রবিমণ্ডল দেখত লঘু লাগা। উদয় তাসু ত্রিভুবন তম ভাগা।'[১] স্বেচ্ছাচারিতার ঘনান্ধকারে এটি লিচ্ছবিদের গণ-প্রকাশ-স্তম্ভ ছিল।

সত্যনারায়ণ কুটির—পরিভাষার কাজে বেশ কিছু মানুষের সাহায্য নেওয়া দরকার, আর কখন কি বই গ্রন্থাগার থেকে আনাতে হয়, একথা ভেবে ৩১ মার্চ সম্মেলন ভবনের সত্যনারায়ণ কুটিরে চলে এলাম। ট্যান্ডনজী কিছু জিনিস দেবেন বলেছিলেন। লক্ষ্ণৌ-এ তাঁর কাছে লোক গিয়ে খালি হাতে ফিরে এলো। আমার প্রতিমুহূর্তে চিন্তা ছিল, অথচ তাঁর কাছে দু সপ্তাহ প্রতীক্ষায় নষ্ট করে দেওয়াটা কোনো ব্যাপার ছিল না। আমি তার এবং চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিলাম যে, যদি এমনই হয় তবে আমাকে কাজ থেকে সরে যেতে হবে। আগের নহাজার শব্দ জমা হয়েছিল, তার মধ্যে অনেকগুলিই কাজের নয়, তবুও পাঁচ হাজার আকাঙ্ক্ষিত শব্দ পাওয়া যেত। আমি সংকল্প করলাম, এপ্রিলের শেষ নাগাদ দশ হাজার শব্দের কোষ তৈরি করে ট্যান্ডনজীকে দিয়ে দিতে হবে।

কুটিরে আসার ফলে খাবার সমস্যা দেখা দিল। খাবার ব্যবস্থা শ্রীনিবাসজী তাঁর বাড়িতে করে দিলেন। গরমের জন্য রাত-দিন বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পাখা থেকেও যখন-তখন গরম হাওয়া আসত। এই সময় সিমলা থেকে রজনীর চিঠি এলো

[১] 'সূর্য দেখতে অতিক্ষুদ্র লাগে। উদিত হলে সে অন্ধকাব ভাগে।।'—স ম

'ঝংকার'-এর ব্যাপারে সম্মতি পাঠানোর জন্য। আমি তাঁর কাছ থেকে রামপুর-বুশহর সম্বন্ধে খবর নিলাম। তিনি লিখলেন, 'রামপুরের রাস্তায় দূর পর্যন্ত বাস যায়। সঙ্গে যাবার জন্য লোকেরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে'। ২২ বছর আগের অভিজ্ঞতার ওপর পুরো বিশ্বাস করা যায় না। এখন এই তাজা খবর পেয়ে কনৌর যাওয়া পাকা হয়ে গেল।

২ এপ্রিল খবর পেলাম যে লঙ্কায় আমার বন্ধু ভিক্ষু প্রজ্ঞালোকের মৃত্যু হয়েছে। ১৮ বছর আগে তাঁকে অবশ্যই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ মনে হতো, কিন্তু তাঁর প্রতিভার সন্ধান তখন পাওয়া যায়নি। পরে তিনি এক সিদ্ধহস্ত লেখক বলে প্রমাণিত হয়েছেন এবং তাঁকে বিদ্যালংকার বিহারের এক দৃঢ়স্তম্ভ মনে করা হয়েছে। এই প্রিয় বিহারটিকে বামপন্থী চিন্তাধারার কেন্দ্র বানানোতে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। এমন একজন পুরুষের এত তাড়াতাড়ি মৃত্যু হওয়া খুবই দুঃখের কথা।

বালিয়া—৩ এপ্রিল ড· উদয়নারায়ণ তেওয়ারীর সঙ্গে বালিয়ায় সাহিত্য সম্মেলনের জন্য যেতে হলো। গরমের দিন, তাও আবার ছোট লাইনে যাত্রা। সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় আমরা রওনা হলাম। বেনারস যেতেই গাড়ি চার ঘণ্টা লেট হয়ে গেল। ইঞ্জিন পুরনো হওয়াটা একটা কারণ, তাছাড়া কার্য-ক্ষমতাও কম। সরকারের প্রতিটি অঙ্গের যেখানে একই হাল, সেখানে শুধু রেলের ব্যাপারে অক্ষমতার অভিযোগ জানিয়ে কি হবে? সরকারি যন্ত্র চালানোর জন্য তিনগুণ-চারগুণ অফিসার আর ক্লার্ক রাখা হয়েছে, কিন্তু কোনো কাজই ঠিকমত হয় না। রেলের সেকেন্ড ক্লাশ কামরা দেখে মনে হচ্ছিল ভিখিরি হয়ে যাওয়া কোনো খানদানী ধনীর কামরা। মেঝে উঠে গেছে, গদিগুলো নোংরা এবং তাদের অবস্থা খুব খারাপ, পায়খানার কমোড ভাঙা, যা অতিকষ্টে শুধু পেচ্ছাপ করার জন্য ব্যবহার করা যায়। হাত ধোয়ার বেসিন গায়েব এবং কলে জল নেই। সব জায়গায় জীর্ণতা, সব জায়গা অপরিষ্কার।

৪ এপ্রিল ৩ ঘণ্টা লেট হয়ে বেলা এগারোটায় আমরা বালিয়া পৌঁছলাম। বেশ গরম ছিল। জেলা বোর্ডের সেক্রেটারি শ্রীশ্যামসুন্দর উপাধ্যায়ের বাড়িতে উঠলাম। পুরনো ঢংঙের বাংলো, যার ছাদ ছিল যথেষ্ট উঁচু আর পুরু, যার জন্য গরম কিছু কম বোধ হচ্ছিল। তিনটের সময় থেকে সম্মেলন শুরু হওয়ার ছিল, কিন্তু তখন তো গরম খুব বেশি থাকে। ভালই হলো, সাড়ে পাঁচটার সময় তা শুরু হলো। লিখিত ভাষণ তৈরি করার সময় কোথায় পাব, আমি মৌখিক ভাষণই দিলাম।

এখন জেলা বোর্ডের নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছিল। সভাপতি এবং সদস্য সকলেরই নির্বাচন হবে। জেলার সর্বপ্রিয় তরুণ তারকেশ্বর পাণ্ডে কংগ্রেসের হয়ে জেলা বোর্ডের জন্য দাঁড়াচ্ছিলেন, প্রদেশও এটা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু জাতপাত বাদ সাধল। অন্য একজনকে টিকিট দিয়ে দেওয়া হলো। তারকেশ্বর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন না, কিন্তু কোনো সোস্যালিস্টকে কি করে আটকানো যেত?

বালিয়া আসলে শহর নয়, একটা বড়মত গ্রাম। অনতিদূর গঙ্গা বয়ে গেছে, আর তার তীরে কোনো বাঁধ দেওয়া নেই। গ্রামটি পুরোপুরি গঙ্গার ওপর নির্ভরশীল। জল এবং

বৈদ্যুতিক আলোর কোনো ব্যবস্থা নেই। পায়খানার এমন খারাপ ব্যবস্থা বোধ হয় কখনও আমাদের দেশে ছিল না। কিন্তু এ শুধু বালিয়ার কথা নয়। টীস, যাকে এখানে সরযু (ছোট) বলা হয়, বালিয়ার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। বস্তুত, সরযুর দ্বারাই বালিয়ার ধ্বসে পড়ার ভয় আছে।

পরের দিন নর্মাল স্কুলে বক্তৃতা দিতে গেলাম। এখানে বালিয়া আর গাজীপুর দু জায়গারই শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ নিতে এসেছিলেন। সন্ধেবেলা হাঁটতে হাঁটতে গ্রন্থাগারে গেলাম। বই মাত্র তিন হাজার ছিল। সেগুলো খুব ভালভাবে ব্যবহার করা হতো। সামনে সেগুলো ঘুরতো। গ্রন্থাগার নিজস্ব বাড়িও বানিয়ে নিয়েছে, আশা করা যায় দ্রুত উন্নতি করবে।

ছটার থেকে ভোজপুরী সম্মেলন আরম্ভ হলো। ডা· রামবিচার পাণ্ডের ভোজপুরি কবিতা ভীষণ ভাল লাগল। তিনি কলকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের স্নাতক। যদিও আয়ুর্বেদের জন্য দরকার ছিল না তবু নিজের পড়ার আগ্রহ থেকে তিনি বি· এ· আর এম· এ· পাশ করে ছিলেন। কিছু তরুণও তাঁদের কবিতা শোনালেন। এইসময় বারবার চিতু পাণ্ডের কথা মনে পড়ছিল। সম্মেলন ভোজপুরী প্রদেশ নির্মাণের প্রস্তাব পাস করল। তিন কোটি ভোজপুরী ভাষী দুটো প্রদেশের মধ্যে বিভক্ত হয়ে থাকে অথচ তার কোনো কদর নেই—এটা দুঃখের কথা। কিন্তু আজকাল জনগণ আর তাদের ভাষার সম্মান কি দিল্লীর দেবতাদের দরবারে থাকা সম্ভব ছিল? তবে একদিন নিশ্চয়ই জনগণের দিন ফিরে আসবে।

নটা পর্যন্ত সম্মেলনে আমি খুশি মনে ছিলাম। তখনই তার এলো ড· উদয়নারায়ণের মেয়ে কলাবতীর মৃত্যু হয়েছে। যখন আমরা রওনা হয়েছিলাম তখন এমন কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কলাবতী আর লীলাবতী দুই যমজ মেয়ে। শারীরিকভাবে অবশ্য তারা দুজনই দুর্বল ছিল, কিন্তু এমন আশংকা কি করে হতে পারে?

রাতেই গাড়ি ধরলাম আর পরের দিন (৯ এপ্রিল) সওয়া আটটার সময় আমরা রামবাগ (প্রয়াগ শহর) স্টেশনে পৌছে গেলাম। সত্যনারায়ণ কুটিরে পৌছলাম। ত্রিপাঠী আর ঠাকুর আগে থেকেই কাজে লেগেছিলেন। আজ বিদ্যানিবাসও এসে পড়লেন। এটা বুঝতে বেশি সময় লাগল না যে বিদ্যানিবাস শুধু প্রতিভাশালী নন, সেই সঙ্গে খুবই পরিশ্রমী যুবক। ইউনিভার্সিটির সমস্ত পরীক্ষায় তিনি প্রথম এবং এক নম্বর হতেন, সব বিষয়েই ভাল ছিলেন, সংস্কৃততেও 'শাস্ত্রী' করে নিয়েছিলেন। আমাদের কাজের সম্বন্ধে তিনি সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ স্মরণ শক্তি সেকাজের জন্য আরোই সহায়ক হতো। গোরখপুর জেলার সরযুপারিদের পঙ্‌ক্তি-কুলের ছিলেন। মাছ-মাংস না খেয়েও পঙ্‌ক্তি হয়, একথা তাঁকে দেখার আগে যদি আমাকে কেউ বলত, আমি বিশ্বাস করতাম না। সরযুপারিদের মধ্যে এদের সবচেয়ে উচ্চ-কুলীন মনে করা হয়। পঙ্‌ক্তি নিজের বাসনপত্রও অন্যকে দেয় না, আর অন্যের ছোঁওয়া কোনো রান্নাই খায় না। পঙ্‌ক্তি বিয়েও করতে পারে পঙ্‌ক্তির মধ্যেই। অপঙ্‌ক্তি (টুটহে)-র সঙ্গে বিয়ে করলে জাতি থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হয়। এই বহিষ্কারের ফলস্বরূপ পঙ্‌ক্তিদের এখন মাত্র

কয়েকশো পরিবার রয়ে গেছে, যাদের ভেতর বিয়ে, গোত্র ছেড়ে খুব নিকট সম্বন্ধীদের মধ্যে হয়। বিদ্যানিবাসজীকে নিজের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও করতে হতো, যে কাজের জন্য তিনি কোনো একজনকে সঙ্গে এনেছিলেন। দুধ-ফলে ছোঁয়াছুঁয়ি মানতেন না এটা ভাল ব্যাপার ছিল। সরযুপারিদের মধ্যে পঙ্‌ক্তির রেওয়াজ কোনো বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ঘটনা নয়। দশম-একাদশ শতাব্দীতে এই ধরনের প্রচেষ্টা প্রায় সমস্ত উত্তর-ভারতে হয়েছে। গহড়বার গোবিন্দচন্দ কনৌজীদের মধ্যে সকুটলে আর সরযুপারিদের মধ্যে পঙ্‌ক্তি তৈরি করেন। তাদের জন্য বড় বড় জায়গীর এই শর্তে দেওয়া হয় যে তারা নিজেদের খাওয়া-দাওয়া,বিয়ে এবং আচার-ব্যবহারে অন্যদের থেকে পৃথক থেকে জাতিবাদকে মজবুত করবে। সেইসময় বহুসংখ্যক কুলীন তৈরি করা হয়ে থাকবে, যারা সংখ্যায় বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক স্রোত ভাগ হয়ে যাবার ফলে দরিদ্র হয়ে গেছে, কৌলীন্য পালন করা আর সম্ভব হয়নি, যে কারণে তাদের মধ্যে অনেকে পঙ্‌ক্তি থেকে বেরিয়ে সাধারণ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সম্মিলিত হতে শুরু করেছে। এর কাছাকাছি সময়ে মিথিলায় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ আর বাংলায় কুলীন ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি হয়েছিল। ধর্মীয় গোঁড়ামি আর চিন্তাধারায় বিদ্যানিবাসজী তাঁর গুরু পণ্ডিত চট্টোপাধ্যায়েরই মত, সুতরাং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বিষয়েও তিনি তাঁরই মত দৃষ্টিভঙ্গী রাখবেন, এটা আমি আশা করেছিলাম। আট বছর আগে তাঁর লেখনী নিজের কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি, তবে সম্ভাবনা সেই সময়েও ছিল। এখন তো বিদ্যানিবাস হিন্দির একজন ভালো প্রাবন্ধিক।

এই সময় সরকার কমিউনিস্টদের দমন করার কাজে লেগেছিল। যদিও শুধুমাত্র বাংলাতেই পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তবু গ্রেফতারি নির্বিচারে হচ্ছিল। যে কোনো রেলওয়ে দুর্ঘটনা অথবা তেমন কোনো ব্যাপার হলে, সেটা কমিউনিস্টদের কাজ বলে সোজা তাদের মারধোর করা হতো। নেহেরু এখন নামমাত্রই সমাজবাদী ছিলেন। সম্ভবত আমেরিকাকে খুশি করার জন্য ফ্যাসিস্টদের রাস্তা অবলম্বন করা হচ্ছিল। নেহেরু আসলে সেইসময় কেবল সর্দার প্যাটেলের ভেঁপু ছাড়া আর কিছু ছিলেন না। সমস্ত শক্তি এবং চাবিকাঠি প্যাটেলের হাতে ছিল, যিনি প্রগতিশীল চিন্তাধারার কথা শুনতেও রাজি ছিলেন না। দেশের পুঁজিপতিরা তাঁকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়েছিল, আর সমাজে সেসময় যেসব খারাপ জিনিস দ্রুত ছড়াচ্ছিল, তাদের মূল স্রোত খুঁজে দেখলে প্যাটেলের কাছেই পৌঁছতে হবে।

কংগ্রেসের সূত্রধার এইসময় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ছিলেন। চারদিকে তখন তাঁরই প্রভাব খাটছিল। তিনি কোনোরকম প্রগতিশীল পদক্ষেপ নিতে রাজি ছিলেন না। রাজ্যগুলির একীকরণ এবং হায়দ্রাবাদের ব্যাপারে যে কাজ তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে করেছেন, তার অবশ্য প্রশংসা করতে হবে। তিনি মনে করতেন যে দেশের দারিদ্র দূর করার জন্য আমাদের দেশী পুঁজিপতি আর আমেরিকা ঠিক থাক। আমেরিকা বুদ্ধু নয় যে, নিরপেক্ষ ভারতের জন্য তার থলি খুলে ধরবে। পাকিস্তান আর ভারত উভয়কে নাচানোর জন্য সে প্রস্তুত ছিল, আর শুধুমাত্র নাচের জন্য সে কিছু পয়সা ছুঁড়ে দিতে পারত।

সত্যনারায়ণ কুটিরে কাজ ধূমধামের সঙ্গে হতে লাগল। অনেক বছর আগে

পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র তাঁর 'কর্ণবধ'-এর কিছু অংশ শুনিয়েছিলেন। এখন তিনি সেটা সবে আরম্ভ করেছিলেন। ৮ এপ্রিল তিনি তার আরো কিছু অংশ শোনালেন। আমি উতলা হচ্ছিলাম যে, এমন সুন্দর ও স্বতন্ত্র কাব্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু কবি তো চিরকাল মুক্ত থেকেছেন। আজ যখন আমি এই লাইনগুলো লিখছি তখনও একটু অংশ বাকিই আছে। প্রশংসা করতে গিয়ে আমি সেদিনও জোর দিয়ে বলেছি, 'সব কাজ ছেড়ে এটা শেষ করে ফেলুন।'

১০ এপ্রিল নবরাত্রির ব্রত আরম্ভ হলো। শ্রীনিবাসজীর বাড়িতে অন্নাহার আর তাঁর বড়ভাই-এর বাড়িতে ফলাহার চলল। আমি দু জায়গাতেই গেলাম। তখন ফল খেতে ভালো লাগত, তবে এখানের খরবুজের স্বাদ পানসে ছিল।

১১ এপ্রিল পেচ্ছাপ পরীক্ষা করে জানা গেল যে চিনি খুব বেশি আছে, কিন্তু এখন ইনসুলিন নেবার প্রতিবন্ধকতায় বাঁধা পড়তে চাইছিলাম না।

সম্মেলনের নৌকো কোনোরকমে চলছিল। এখনই নয়, সম্ভবত কিছুদিন আগে থেকেই। ট্যান্ডনজী তাকে নতুন পথ দেখাতে পারতেন, কিন্তু তিনি একদিনের কাজের সিদ্ধান্ত এক বছরের আগে নিতে পারতেন না। সম্মেলনের পরীক্ষা এখন বেশ বড় পরীক্ষা ছিল, যাতে আধ লাখের কাছাকাছি ছাত্র বসত। যেখানে গুড় থাকে সেখানে পিঁপড়েও এসে যায়, আর সম্মেলনের অবস্থা এখন প্রায় সেরকম হতে চলেছিল। আমি তো মনে করতাম, সম্মেলনের প্রচার যুগ শেষ করে এখন উচ্চ সাহিত্য অকাদেমির রূপ নেওয়া উচিত। সম্মানার্থ প্রতিবছর সভাপতির নির্বাচন আর অধিবেশনও হোক, কিন্তু পদাধিকারীদের নির্বাচন তিনবছর পর পর হোক, যাতে একবার আসা পদাধিকারী তার যোজনার কাজ কিছুটা সম্পূর্ণ করতে পারে। সাহিত্যসৃজনের কাজে সম্মেলনের শক্তিকে লাগানো দরকার, আর আগে মহান কবিদের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করা উচিত, তারপর বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থগুলির হিন্দি করা উচিত।

স্বামী সত্যানন্দের সঙ্গে ১৩ এপ্রিল দেখা হলো। বলদেব চৌবে নামে তিনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর কত স্বপ্নের যে সঙ্গী ছিলেন। আজমগড়ে তিনি হরিজন গুরুকুল খুলেছিলেন আর হরিজন উত্থানের কাজে তিনি তাঁর জীবন নিয়োজিত করেছেন। এরজন্য তিনি তাঁর নিজের সমাজের পরোয়া করেননি। তাঁর ইচ্ছে ছিল যে, আমি কিছুদিন তাঁর গুরুকুলে গিয়ে থাকি, কিন্তু কে জানত যে সময় এত দামী হয়ে পড়বে।

পরের দিন গরম বাড়ায় চিত্ত বিকল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু মনস্থির করে নিয়েছিলাম—'এ মাসটা তো এখানে কাটাতেই হবে।' সন্ধের খাওযা বিদ্যাবতী আর তার স্বামী দুবরী দুবের বাড়িতে হলো। বিদ্যাবতী বলদেব চৌবের মেয়ে। চৌবেজীর মত খাটলে তাঁর সন্তানরা মিড্‌ল-এর থেকে বেশি এগোতে পারত না। কিন্তু তাদের পিসি মহাদেবীর বরদহস্ত তারা পেয়েছিল, তাই সকলেই এম· এ· পাশ করতে সফল হয়েছিল।

পরের দিন বিদ্যুৎ না থাকায় কয়েক ঘণ্টার জন্য পাখা বন্ধ হয়ে গেল। এরপর আর কি। মনে হলো, জীবনটা পাখার সাহায্যেই চলছিল।

বিদ্যানিবাসজী খুবই তৎপরতার সঙ্গে এবং খুব ভাল কাজ করছিলেন। বৈতনিক কাজ

করায় তাঁর দ্বিধা ছিল—কখনো কেউ একথা বলতেই পারে। কিন্তু তাঁর আর্থিক অবস্থা এমন ছিল যে তিনি অবৈতনিক কাজ করতে পারতেন। 'শাসন শব্দকোষ' তৈরি হয়ে টাইপ হয়ে যাবার পর ভারতের অন্য প্রদেশের অভিজ্ঞদের কাছে গিয়ে পরামর্শ নেবার দরকার ছিল। শ্রীপ্রভাকর মাচবে সাহায্য করবেন বলে লিখেছিলেন, এটা খুবই আনন্দের কথা।

কবি শীল কানপুর যাবার জন্য কথা আদায় করে নিয়েছিলেন। ১৬ তারিখ তিনটের সময় রাতের গাড়িতে আমরা কানপুর গেলাম। গরমের মধ্যে যাওয়া একটুও পছন্দ ছিল না, কিন্তু কি করা যেত! রাত তিনটের সময় রামমোহন কটরায় শ্রীললিতমোহন অবস্থীর বাড়িতে গেলাম। শীলজী সঙ্গে ছিলেন তাই রাস্তা জিজ্ঞেস করার দরকার ছিল না। সংকীর্ণ রাস্তা, তার ওপর জায়গায় জায়গায় গরু শুয়ে, লোকেরা গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য আকাশের নীচে খাটিয়ার ওপর পড়েছিল।

পরের দিন ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে সর্বজনীন সভা হলো। ছুটির জন্য ছাত্ররা ছিল না, তাই যতটা ভিড় হবার কথা ততটা হয়নি.তবে শ্রোতার প্রবাহ সংখ্যার অভাবকে পূরণ করেছিল। আমার একটু বিরক্তি হতে পারত, কারণ তরুণরাই তো আমার প্রিয়। ব্যবস্থাপক বলছিলেন, 'কংগ্রেস এবং প্রতাপসম্পন্ন লোকেরা বাধা দিয়েছে।' সভা থেকে আমি শ্রীগণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীব বাড়িতে গেলাম। তাঁর জ্যেষ্ঠ সুপুত্র শ্রীহরিশঙ্কর বিদ্যার্থীর সঙ্গে দেখা হলো। এখন তিনি কানপুর ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের অধ্যক্ষ ছিলেন। কানপুরে সত্যিসত্যিই অনেক ইমপ্রুভমেন্ট—সংস্কার-এর প্রয়োজন ছিল। মাত্র একশো বছর আগে গঙ্গার ধারের এই গ্রামে লক্ষ্ণৌ-এর নবাবের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার উদ্দেশ্যে ইংরেজরা তাদের ফৌজি কম্পু (ক্যাম্প) বানিযেছিল। এই কম্পু থেকে কানপুর হয়েছে। সেসময় কে আশা করেছিল যে একশো বছর পরে তা ১৩-১৪ লাখ জনসংখ্যার শহর হয়ে দাঁড়াবে? সেইজন্য দূরদর্শী হয়ে শহরটাকে নিয়ম-রীতি মেনে সাজানোর দিকে কেউ মনোযোগ দেয়নি। খালি জমিতে যার যেখানে ইচ্ছে হয়েছে সেখানে সে নিজের জন্য ঘর বানিয়ে নিয়েছে। এইরকম সংকীর্ণ রাস্তা, সংকীর্ণ গলিতে, মণিরামের বাগানের মতো জায়গায়—মোটর চালাতে ড্রাইভার কেন, যারা গাড়িতে চড়ে তাদেরও প্রাণ কাঁপে। শহরের বাইরে মনে করে বাংলোগুলো বানানো হয়েছিল কিন্তু এখন সেগুলোও শহরের ভেতরে এসে গেছে। ৫০ হাজারের ওপর শরণার্থীও এসে এখানে বসবাস করছে। ক্রমাগত নতুন বাড়ি বানানো হচ্ছিল তবুও তার অভাব ছিল। ব্যবসায়ী শরণার্থীদের সঙ্গে অন্য বানিয়ারা যখন প্রতিযোগিতায় পারে না, তখন নানারকম দোষ বার করতে শুরু করে—'ওরা নকল জিনিস দেয়। ওদের আচার-বিচার আলগা। মেয়েরা নগ্ন হয়ে স্নান করে ইত্যাদি।' দেশকাল হিসেবে আচার-বিচারে প্রভেদ হয়েই থাকে। পশ্চিম উত্তর-প্রদেশের ব্রাহ্মণরা মাছ-মাংসের নাম পর্যন্ত শুনতে চায় না, আর পুবের লোকরা গোঁফে তা দিয়ে তা খায়। মেয়েরা শুধু পাঞ্জাবেই নগ্ন হয়ে স্নান করে না, এখানেও তা করে। হ্যাঁ, এটুকু তফাৎ অবশ্যই আছে যে, আমাদের এখানে তারা পুরুষের নজর বাঁচিয়ে স্নান করে।

১৮ তারিখ সারাদিন কানপুরে থাকার ছিল। আমার ফটোর শখ আছে। ভ্রমণ আর ভ্রমণ-সম্বন্ধী লেখক হবার ফলে ফটোর গুরুত্ব আমি বুঝেছি। একবার এই ব্যয়বহুল শখে যখন মানুষ পড়ে যায় তখন যতই হাতটানার চেষ্টা করুক না কেন, খরচ তাকে করতেই হয়। আমার কাছে সোভিয়েত দেশ থেকে আনা 'ফেদ' ক্যামেরা ছিল। এর নেগেটিভ খুব ছোট, একটা ফিল্মে ২৬টা ফটো হয় আর এনলার্জ না করলে তার কোনো দাম থাকে না। এখানে চিত্রা স্টুডিও থেকে একটা রিফ্লেক্স ক্যামেরা (অর্গোফ্লেক্স) ৩৩৫ টাকা সাড়ে দশ আনায় কিনে ফেললাম। একটু একটু বুঝতে পারছিলাম যে, এটা দিয়ে কাজ হবে না। আমাকে আরো দামী ক্যামেরা কিনতে হবে। কিন্তু সামনে দেখে লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

দুপুরের খাওয়া শ্রীপুরুষোত্তম কাপুরের বাড়িতে হলো। সেখানে প্রিন্সিপাল হীরালাল খান্নাজীর সঙ্গেও দেখা হলো। আরো কয়েকজন বন্ধু এসেছিলেন। এই বাড়িতেই কমিউনিস্ট সন্তোষ কাপুরের জন্ম হয়েছে। সন্তোষ তার সমস্ত যৌবন কানপুরের মজুরদের সেবা আর সংগঠনে ব্যয় করেছে। আজও তার একটা পা সর্বদা জেলের দিকে বাড়ানো। নিজের উদ্দেশ্য আর স্বপ্নের ব্যাপারে সে অদম্য। শীলজীর এ ব্যাপারে খুব দুঃখ হয়েছে যে, মিউনিসিপ্যালিটি আমাকে মানপত্র দেয়নি। উনি কি এটা বোঝেন না যে, আমার রাস্তা কোনদিকে, আর মিউনিসিপ্যালিটির মানপত্র কোনদিকে?।

খাওয়ার পরে বুদ্ধপুরীতে শ্রীমেঘার্থীজীর বিদ্যালয়ে গেলাম। অনেক দিন পরে শ্রীসন্তরামজীর সঙ্গেও সেখানে দেখা হয়ে গেল। তরুণ মুখ এখন বুড়ো হয়ে গেছে। মাঝের সময়টুকু দেখার সুযোগ হয়নি, নাহলে এতটা পরিবর্তন মনে হতো না। মেঘার্থীজী প্রথমে বুদ্ধের নামে আকৃষ্ট হন, তারপর নিজের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধকেও আর্যসমাজী বানাতে চাইতেন, কিন্তু এখন তিনি অনেক এগিয়ে গিয়েছিলেন। নবাবপুরায় শ্রীছৈলবিহারী কণ্টক শিক্ষিতদের একটা ছোটমত বৈঠক হিন্দি প্রচারিণী সভাতে করেছিলেন। কণ্টকজী জলপান করাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এখন তো এক এক মিনিটেরই অনেক দাম ছিল। সেখান থেকে বন্ধুরা শরণার্থীদের বস্তির এক সিনেমায় চা খাওয়ার জন্য নিয়ে গেল, তারপর গেলাম নাগরী প্রচারিণী সভায়। পণ্ডিত লক্ষ্মীধর বাজপেয়ী সভার অধ্যক্ষ ছিলেন। বাজপেয়ীজীর সমস্ত জীবন হিন্দির সেবায় রত ছিল। তিনি পত্রিকা সম্পাদন করেছেন, বই লিখেছেন, প্রকাশনার কাজ করছেন। আমার কাছে সবথেকে বড় কথা হলো এই যে, হিন্দি সাহিত্যিকদের মধ্যে সবথেকে পুরনো আর সর্বপ্রথম আমি আগ্রায় তাঁকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছিলাম। ভাষণের পর কানপুরের মহাশেঠ শ্রীরামরতন গুপ্তর বাড়িতে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং খাওয়া—এই দুটো কাজ করার ছিল। এইভাবে সারাদিনটাই কানপুরে অত্যন্ত ব্যস্ত রইলাম। কানপুরে তো আমার জন্য এটা নিয়মের মত হয়ে গিয়েছিল। বাঁচার শত চেষ্টা করেও দিনে চার-পাঁচটা সভায় গিয়ে বলাটা মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দশটার সময় রাতের গাড়ি ধরে একটায় প্রয়াগ পৌঁছে ছোট লাইন (ও· টি· আর·) ধরলাম।

বৈশালীতে, ১৯৪৮

ছোটলাইনের গাড়িতে উঠলে মন কুঁড়ে বলদ হয়ে যেত। বেনারস পর্যন্ত গাড়ি খুব জোরে চলল, তারপর ছ্যাকড়া হয়ে গেল। ভিড় ছিল, তবে সেকেন্ড ক্লাশে অতটা ছিল না। বালিয়া আর ছাপরার কাছাকাছিতে শ্রেণীবিভাগ উঠেই যায়। লেঠেলদের জায়গা, টিকিট কালেক্টররাও নিজেদের প্রাণ সস্তা মনে করে না। শোনপুর পৌঁছে বুঝলাম, গাড়ি দুঘণ্টা লেট আছে। এখন গাড়িতে দুজন মানুষই থেকে গিয়েছিল, তাই শোবার সুযোগ পাওয়া গেল। রাত তিনটের সময় মজঃফরপুর পৌঁছলাম। সেই রাতে কোথাও আসা-যাওয়া মুশকিল হতো কিন্তু সেক্রেটারি উপস্থিত ছিলেন। ঘুম পুরো হয়নি, গিয়ে শুয়ে পড়লাম। বৈদ্যুতিক পাখার নীচে শুয়েছিলাম। সামনে মধুর খাদ্য দেখে মশারা কি করে ধৈর্য ধরে? মনে হচ্ছিল, ঝাঁকে ঝাঁকে এসে মাথার ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। শেষমেশ মাথাটাও ঢাকতে হলো।

আমাদের নিমন্ত্রণকারী ছিলেন শ্রীদিগ্বিজয় সিংহ। তাঁর ঠাকুর্দা বাবু লংগট সিংহ একজন সাধারণ চাপরাসি ছিলেন। পরে নিজের অধ্যবসায় দিয়ে লাখ লাখ টাকা রোজগার করেছেন কিন্তু দারিদ্রের মধ্যে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও টাকা তাঁকে নিজের দাস করতে পারেনি। মজঃফরপুরে শিক্ষার প্রচারের জন্য তিনি কয়েক লাখ টাকা দিয়েছেন, আর তাই দিয়ে গ্রিয়র্স ভূমিহার কলেজ তৈরি হয়েছে। ইংরেজের নাম রাখলে কলেজের প্রতিষ্ঠা আর বৃদ্ধির কাজে সহায়তা হয়, সেইজন্য এই নাম রাখা হয়। এখন তার নাম লংগট সিংহ কলেজ।

কলেজে নবসংস্কৃতি কেন্দ্রে গিয়ে দেড় ঘণ্টা বলতে হলো। দুপুরের খাওয়া সেরে দিগ্বিজয় বাবুর বাড়িতেই থেকে গেলাম। চারটের সময় তাঁরই মোটরে বৈশালীর পুণ্যভূমির উদ্দেশ রওনা হলাম। ভারতে তার স্থান সেরকমই, যেমন ইউরোপে এথেন্সের স্থান। গণরাজ্যই তো আমাদেরও লক্ষ্য। শ্রীজগদীশচন্দ্র মাথুর (আই· সি এস· যখন এখানে সাব-ডিভিশনাল অফিসার ছিলেন তখন তাঁর মনোযোগ বৈশালীর দিকে আকৃষ্ট হয়, আর তিনিই বিস্মৃত বৈশালীকে মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। বৈশালীর নাম এখন বসাঢ়। কোলহুয়া, বনিয়া, বসাঢ় ইত্যাদি কত গ্রামে প্রাচীন বৈশালীর অবশেষ ছড়িয়ে আছে। সরকারি-বেসরকারি সমস্ত মানুষ বৈশালী মহোৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল। এপ্রিলের গরমের মাসটা সভা-সমিতির নয় কিন্তু এই ঋতুতেই বৈশালীতে শ্রমণ মহাবীরের জন্ম হয়েছিল। কৃষি-বিভাগ আর সহযোগ-সমিতির প্রদর্শনী চলছিল, তাঁবু খাটানো হয়েছিল, দুপুরের সময় এইসব তাঁবুতে যারা থাকে তাদের কি অবস্থা হয়? কিন্তু আমার এ কথা খেয়াল হয় নি যে, তাদের কাছে গরমে পাহাড়ে থাকাটা ছিল অস্বাভাবিক আর এখানে থাকাটা স্বাভাবিক।

রোদ একটু কমলে বেড়াতে বেরোলাম। কোলহুয়াতে অশোক স্তম্ভ দেখতে গেলাম। যদিও এখন সেটা এক সাধুর কুটিরের আঙিনায় পড়েছে, তবু তার উপরিভাগ অনেক

আগে থেকে চোখে পড়ে। বৈশালীর মহিমা প্রদর্শন করার জন্য অশোক এই স্তম্ভ স্থাপন করেন। সম্ভবত এটাই মহাবন কূটাগারশালা ছিল, যেখানে ভগবান বুদ্ধ প্রায়ই এসে থাকতেন। বাইরে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মুকুটধারী বুদ্ধমূর্তি ছিল, যার দাতা তার ওপর খোদাই করিয়েছিল, 'দেব ধর্ম্মোয়ং প্রবরমহায়ানিয়ায়িনঃ করণিকোচ্ছাট মাণিক্য-সুতস্য।' যার থেকে জানা গেল, এই মূর্তি নির্মাণকারী ছিলেন কায়স্থ উচ্ছাট, যাঁর বাবার নাম ছিল মাণিক। করণিক অথবা করনন কায়স্থ আজও তিরহুতে দেখা যায়। যদিও বৈশালী থেকে কয়েক মাইল দূরে প্রবাহিত গণ্ডক-এর অপর পার থেকে যে ভোজপুরী ভূভাগ শুরু হয়ে যায়, সেখানে বসবাসকারী কায়স্থদের শ্রীবাস্তব মুক্তির (প্রবেশ) নিবাসী বলা হয়। বৈশালী তার বুদ্ধভক্ত কায়স্থদের জন্য বিখ্যাত। সংস্কৃতির মহাপণ্ডিত বৌদ্ধ আচার্যদেরও সে জন্ম দিয়েছে।

কায়স্থ পণ্ডিত গয়াধর এখানকার মানুষ ছিলেন, যাঁকে সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করার জন্য তিব্বতে ডাকা হয়েছিল।

কোল্হুয়া থেকে চকরামদাস আর বনিয়া গ্রামে গেলাম। এই গ্রামগুলি পুরনো ধ্বংসাবশেষের ওপর গড়ে উঠেছে। বনিয়ার শ্রীবিজলী সিংহ বেশি লেখাপড়া শেখেননি কিন্তু তাঁর পুরনো জিনিস জমানার শখ ছিল। যথেষ্ট জিনিস জমা হয়ে গেলে, যারা তার মর্ম বোঝে তাদের তা দর্শন করার জন্য পৌঁছে যাওয়াটা স্বাভাবিক। বিজলী সিংহর বাড়িতে বড় বড় লোক আসাতে গ্রামের লোকেদের মধ্যে কারো কারো ঈর্ষা হওয়াটাও স্বাভাবিক। তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না। আমাদের জিপ ফিরে এলো, আর খাওয়া সেরে আবার আমরা সেখানে গেলাম। তাঁর সংগ্রহে মৌর্যযুগের এবং কুষানযুগের বহু মুদ্রা ছিল। মাটির পুরনো মূর্তি ও আরো অনেক জিনিস তিনি তাঁর খাপরার ঘরে সাজিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর এই অনুরাগ প্রশংসনীয়, কিন্তু পুরনো জিনিসের জন্য জায়গাটা সুরক্ষিত বলা যায় না। এমন গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী কোনো ব্যক্তির হাতে থাকাটাও আমি ঠিক মনে করি না। এটা জরুরি নয় যে, ভক্তের সন্তান ভক্তই হবে, তাই পরে এইসব জিনিস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাবার ভয় আছে। বিজলী সিংহ এখনও তাঁর কার্যে রত ছিলেন। জানুয়ারি (১৯৫৬)-তে আমি এসেছি শুনে পাটনা এলেন, আর সর্বদা সঙ্গে থাকলেন। যখন আমি কলকাতা রওনা হলাম, তখনও তিনি স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁর মুখ ভুলে গিয়েছিলাম, আর নামও। প্রায়ই এমন হয় যে নাম আর মুখ দুই একসঙ্গে মনে করতে পারি না। আলাদা আলাদা মনে করতে পারি। কিন্তু সেই সময় কোনোটাই মনে আসছিল না।

বিজলী সিংহ নিশ্চয়ই ভাবছিলেন যে, আমি তাঁকে চিনতে পারছি। চিনতে যদি নাও পারি, তাহলেও অল্পসময়ের পরিচিত মানুষের সামনেও তেমন ব্যবহার করা আমার স্বভাব নয়, যাতে তার মনে কষ্ট হয়। বিজলী সিংহ যদি তাঁর পরিচয় দিয়ে দিতেন যে, আমি সেই লোক, যে বনিয়াতে পুরাতাত্ত্বিক বস্তু সংগ্রহ করে রেখেছে, তবে আমার খুব আনন্দ হতো এবং তাঁর গত আটবছরের কাজের কথা জিজ্ঞেস করতাম ও শুনতাম। সমস্ত সময়টাতে

আমি তাঁকে চিনতে পারলাম না। আমার বন্ধুরা বলতে লাগল, এই লোকটা গোয়েন্দা পুলিশের। আমি তাদের বলে দিলাম, 'পুলিশ এমন সাদাসিধে লোক দিয়ে আমার বিষয়ে কাজ করাতে পারে না।' হ্যাঁ, স্বাধীন ভারতেও পুলিশ আমাকে নিয়ে একইভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে, যেমন ছিল ইংরেজদের সময়ে। পরে আমার আফশোশ হলো, যখন জানতে পারলাম যে সেই সাদাসিধে লোকটি বিজলী সিংহই ছিলেন।

বনিয়াতে এবং আরো অন্য জায়গাতেও খেতের ভেতরে কখনও কখনও কুয়ো দেখতে পাওয়া যায়। এই কুয়োগুলো বৃত্তাকার ইঁট দিয়ে তৈরি হয়। এখন এই ধরনের ইঁট বানানোর রেওয়াজ এখানে নেই। কিন্তু ছাপরা, গোরখপুর, বস্তি—তিনটি জেলা পার করে চতুর্থ গোণ্ডা জেলাতে যদি আমরা যাই, সেখানে দেখা যাবে লোক আজও ইট বানিয়ে ও পুড়িয়ে নিয়ে কুয়ো তৈবি করে। এগুলো সস্তা হয়। সাধারণ কাজের জলের জন্য এগুলো যথেষ্ট। এক জায়গায় পাশাপাশি তিনটে কুয়ো ছিল। লোকেরা বুঝতে পারছিল না যে, এত কাছাকাছি কুয়ো বানানোর কি দরকার ছিল। কিন্তু এগুলো তো কুয়ো ছিল না, এগুলো তো পায়খানার কুয়ো, অর্থাৎ শৌচকূপ। সেসময় সামাজিক স্বাস্থ্য আর নাগরিক পরিচ্ছন্নতার দিকে লোকেদের বেশি নজর ছিল, তাই প্রতিটি বাড়িতে শৌচকূপ থাকা জরুরি ছিল। সেখানকার লোকেদের একথা বোঝাতে খুব অসুবিধেও হলো না, কারণ শৌচকূপের ঢাকনা তিন টুকবোয় ভাঙা অবস্থায় সেখানেই পাওয়া গেল। এর মাঝখানে এক বিঘত গোল ছ্যাঁদা ছিল, পাদানও বানানো ছিল আব সামনে একটা ছোট ছ্যাঁদা পেচ্ছাপ বেরোনোর জন্য ছিল। লোকেদের কথাটা বিশ্বাস হয়ে গেল, কিন্তু তারা কুয়ো মনে করে তার জল খাচ্ছিল। আমি বললাম, 'এর জন্য চিন্তা করবেন না। কয়েক মাস পরেই তো পায়খানা ফুলকপির চেহারা নেবে, তাকে কি অভক্ষ্য মনে করা হয়? আর এই শৌচকূপ তো আজ থেকে সহস্রাব্দ আগে ব্যবহৃত হয়ে থাকবে।'

২১ তারিখ সকালেও আমরা প্রাচীন বৈশালীর পরিক্রমায় বেরোলাম। বাওনপোখ-এ একটি শিলায় গণেশ এবং সপ্তমাতৃকার মূর্তি খোদাই কবা দেখলাম। পাশেই বুদ্ধ, তারপর ষষ্ঠ তীর্থঙ্কর পদ্মপ্রভু, সিংহনাদ অবলোকিতেশ্বর, হরগৌরী আর বিষ্ণুর মূর্তি ছিল। এর মধ্যে বিষ্ণুর মূর্তি সবচেয়ে প্রাচীন, বাকি সব একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর। অবলোকিতেশ্বরের খণ্ডিত মূর্তিটি বড সুন্দর ছিল। সেখান থেকে দক্ষিণ ভগবানপুর রত্তী গেলাম। বৈশালীর লিচ্ছবিদের একটি শাখা ছিল জ্ঞাতৃ, যাকে পালিতে নাতী, নাত অথবা নত্তীও বলা হয়ে থাকে। তীর্থঙ্কর মহাবীরকে বৈশালিক এবং জ্ঞাতৃপুত্র (পালি, নাত-পুত্র) বলা হয়েছে। তাঁর বৈশালীতে জন্ম আর জ্ঞাতৃ-সন্তান হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এখনও অনেক জৈন একথা মানতে সম্পূর্ণ রাজি নয়। মাঝে এই দেশে জৈনদের নির্মূল হয়ে যাওয়া আর পরে জায়গাগুলোকে ইচ্ছেমত প্রাচীন নাম দিয়ে তীর্থ বানিয়ে দেওয়াতে এদের পক্ষে এই দ্বিধাটা স্বাভাবিক। 'ভগবানপুর রত্তী'র মানে হলো রত্তি পরগনার ভগবানপুর। ভগবানপুর নামে অনেক গ্রামই আছে তাই এই বিশেষণ লাগাতে হয়েছে। রত্তি, নত্তি অথবা জ্ঞাতৃরই বিকৃত রূপ। এখনও এই পরগনায় জথরিয়া ভূমিহার অধিক সংখ্যায় বসবাস করে। এরা লিচ্ছবিদের সেই জ্ঞাতৃশাখার সন্তান, জ্ঞাতৃ থেকেই 'জথরিয়া'

শব্দটি এসেছে। মহাবীরও কাশ্যপ-গোত্রী ছিলেন আর এরাও কাশ্যপ-গোত্রী। জ্ঞাতৃরা ক্ষত্রিয় ছিল, আর এরা নিজেদের ভূমিহার ব্রাহ্মণ বলে, এই প্রভেদ অবশ্য আছে, যার সমাধান করা কঠিন নয়। এখানে বিশেষ কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি, চিহ্ন থাকলেও তা মাটির অনেক নীচে থাকবে। বসাঢ়ের পাশে স্তূপ দেখলাম, যার ওপর এখন কবর বানানো হয়েছে। এটা সম্ভবত সেই জায়গায় আছে, যেখানে বৈশালীর পশ্চিম দ্বার ছিল, আর যেখান দিয়ে বুদ্ধ শেষবার কুসিনারা অভিমুখে যাবার সময় বেরিয়েছিলেন। জলখাবারের পর মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত জৈন সভায় ভাষণ দিলাম, তারপর জ্বলন্ত রোদের মধ্যে জিপে বেরিয়ে পড়লাম। কম্মন ছাপরার বাগানে চার-পাঁচ হাত নীচে অর্থাৎ বারো-তেরশো বছর আগের (গুপ্তযুগ) একটি চতুর্মুখ বিশাল মুখলিঙ্গ দেখলাম। সেটা গুপ্তযুগের আগের হবে। বোধহয় এটাই ছিল বৈশালীর পূর্বদ্বারের বাইরের চৈত্য। তখন পূজ্য বেদিকে চৈত্য বলত আর তা শুধু বৌদ্ধদের নয় অন্যদেরও হতো।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বিহারের রাজ্যপাল অণে সাহেব এলেন। ভিড় ছিল, লাউডস্পিকার ঠিকমত কাজ করছিল না, সেইজন্য কিছু শোনা কঠিন ছিল। লাটসাহেব ভাষণ দিয়ে একটু পরে চলে গেলেন। আমিও আমার বৈশালীর ওপর লেখা ভাষণ পড়লাম। বহু প্রস্তাবই পাস হলো। তখন কথাবার্তা চলছিল যে বৈশালীতে প্রাকৃত-এর একটি গবেষণাগার অথবা ইনস্টিটিউট খোলা হোক। বিহার পরে দ্বারভাঙ্গাতে সংস্কৃত ইনস্টিটিউট, নালন্দাতে পালি ইনস্টিটিউট আর বৈশালীতে প্রাকৃত ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছে। এই তিনটি জায়গার মধ্যে দ্বারভাঙ্গাই একমাত্র জায়গা, যেখানে গবেষণার জন্য যথেষ্ট সামগ্রী রয়েছে। সেখানে শহর আছে, একটা বেশ ভালো ডিগ্রি কলেজ আছে, আর মহারাজার খুব বড় নিজস্ব লাইব্রেরি আছে। বাকি দুটো জায়গায় প্রতিটি জিনিসের বন্দোবস্ত নিজেকেই করতে হবে। কয়েক লাখ টাকার বাড়ি বানাতে হবে, তারপব একটা বড় গ্রন্থাগার তৈরি করতে হবে, আর সবচেয়ে অসুবিধে হলো যে, শত শত ছাত্র আর গবেষকদের সেখানে নিয়ে গিয়ে রাখাটা সহজ হবে না। যাই হোক, এই জায়গাগুলোর নিজস্ব গুরুত্ব আছে। নালন্দাকে ভোলা যায় না, কিন্তু সেখানে শুধু পালি ইনস্টিটিউট রাখা ঠিক নয়। বৌদ্ধ সাহিত্য এবং বৌদ্ধ জগতের অন্য ভাষাগুলিরও অধ্যয়নের কেন্দ্র ওখানে করা উচিত। বৈশালীতে কেবল জৈন সাহিত্য নয়, রাজনীতি এবং গণরাজ্যের ইতিহাসের গবেষণা কেন্দ্র বানানো উচিত। দ্বারভাঙ্গাতে মিথিলা ইনস্টিটিউট থাকুক।

প্রয়াগ—বৈশালীর থেকে রাত এগারোটায় বেরিয়ে একটার ট্রেন ধরলাম। ছাপরা পৌঁছতে সকাল হয়ে গেল। খুব গরম বোধ হচ্ছিল, পাখার থেকে লু'র হল্‌কা বের হচ্ছিল। এদিকে এমন গরম যে, বলছিল তাড়াতাড়ি পালা। ওদিকে আমগাছে কুশির গুচ্ছ দুলে দুলে বলছিল, 'আমি কিছুদিনের মধ্যেই বড়, হলুদ আর মিষ্টি হয়ে যাব। পাকা আমের থেকে কেন বঞ্চিত হতে যাচ্ছো?' একদিকে আম আমাকে টেনে সমতলে রাখতে চাইছিল, আর একদিকে গরম আমাকে তাড়িয়ে পাহাড়ে পৌঁছে দিতে চাইছিল। পাহাড়ের ওপরে এবছর আমরা কনৌর যাচ্ছিলাম, যেখানে পাকা আম কোনোরকমেই ভালো অবস্থায় পৌঁছতে

পারে না। দিগ্বিজয়বাবু খুব ভাল একটা আমের টুকরি রেলে শিমলায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, আমি সিমলারই আশেপাশে কোথাও থাকি। বিল্টি শিমলা থেকে অষ্টম-দশম দিন ডাকযোগে চিনী পৌঁছল। তখন আমি এই কামনা করছিলাম, যদি কেউ রেল থেকে চুরি করে টুকরিটা খেয়ে নেয় তো ভাল হয়।

তেষ্টায় খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। খাওয়া-দাওয়া করা মুশকিল ছিল। সন্ধে সাড়ে সাতটায় প্রয়াগ পৌঁছে সত্যনারায়ণ কুটিরে চলে এলাম। টাইপ করার কাজ কাগজের অভাবে বন্ধ হয়ে আছে জেনে বড়ই বিরক্তি জন্মাল। ট্যান্ডনজীর ওপরেও রাগ হচ্ছিল। অত্যন্ত দীর্ঘসূত্রী ও অস্থির স্বভাবের মানুষ। কিন্তু কাজটা তো উতরাতেই হতো। সুনীতিবাবু সরকারি কাজে ব্যবহার্য পরিভাষা তৈরি করেছেন। তাতে পদাধিকারীদের আর কার্যালয়গুলির নামেরই সূচি ছিল, কিন্তু নির্মাণের রীতি খুবই ভাল ছিল। আমি তাদের মধ্যে থেকে অনেকগুলিই গ্রহণ করলাম। অ-কারানুক্রমে যে শব্দগুলিকে সাজানো হয়েছিল, সেগুলোকে এখন ইংরেজি আর হিন্দিতে টাইপ করাতে হতো। এই কাজেও আমি কিছু লোক লাগিয়ে দিয়েছিলাম। এই সময় সম্মেলনের কর্মচারিরা বেতনবৃদ্ধির দাবি করলো। আসলে তারা জানত যে সরকারও ৫০-৫৫ হাজারের সাহায্য দিতে যাচ্ছে। তাহলে তাদের বেতনই কেন কম থাকবে? ২৩ তারিখ এই কারণেও বিরক্ত হলাম যে, আমাদের সঙ্গে যারা কাজ করছিল চন্দ্রগ্রহণের জন্য তারা সবাই ত্রিবেণী স্নান করতে চলে গেল। বিদ্যানিবাসজী জানপ্রাণ লাগিয়ে কাজ করছিলেন। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী শব্দকোষ দেখানোর জন্য তাঁর কলকাতা, কটক, আর নাগপুর যাওয়া দরকার ছিল। আমি চাইছিলাম পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে তিনি এসে পড়ুন, তাহলে পরের দিকনির্দেশ সামনেই করে দিয়ে যেতাম। কিন্তু এখন টাইপিস্টদেরই বন্দোবস্ত হচ্ছিল না।

মাঝে কিছুদিন অনুপস্থিত থাকার জন্য কিছু কাজ দুবার করে করতে হলো। বিদ্যানিবাসজী সংস্কৃতের মোহ ছাড়তে পারেননি, বেশ কিছু সংস্কৃত শব্দ দিয়েছেন। মানুষকে ভাষা শেখানো আমাদের কাজ ছিল না, বরং যেসব শব্দর হিন্দিতে প্রচার আছে, সেগুলির থেকেই নতুন শব্দ গঠন করা ছিল আমাদের কাজ। তিনদিনের কাজ বেড়ে গেল। যাইহোক, প্রথম প্রথম এমনটা হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

২৫ তারিখ মাচবেজীও এসে পড়লেন। তিনিও বিদ্যানিবাসজীর মতই তৎপর ছিলেন। যদি বিদ্যানিবাসজী ডানদিকে সরতে চাইতেন, তবে তিনি তাঁকে টেনে এনে মাঝখানে রাখতে সক্ষম ছিলেন। সেদিন তাপমাত্রা ১১০ ডিগ্রিতে পৌঁছল। পাখা গরম হাওয়া ছাড়তে শুরু করল।

২৬ তারিখ বেনারস থেকে রায় কৃষ্ণদাস উপস্থিত হলেন। তিনি বিশেষ করে এটা দেখতে চাইছিলেন যে, আমরা সেই কাজের পুনরাবৃত্তি করছি না, যা নাগরী প্রচারিণীসভা করছে। সম্মেলন আর নাগরী প্রচারিণী সভার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। আমি তাঁকে পরিভাষা সমিতির প্রস্তাব দেখিয়ে জানালাম যে, আমাদের কাজ একে অপরের পরিপূরক হওয়া উচিত।

রায়সাহেব আমাকে ইনসুলিন নেবার পরামর্শ দিলেন। দু-চারটে সূঁচ নিতে তো আমি

রাজি ছিলাম, কিন্তু এখন প্রতিদিন সূঁচ লাগানোর হাত থেকে পালাতাম। মনের কোনো কোণে এই আশাও ছিল, 'যদি দেবহিমালয় কৃপা করে, সেখানে প্রতিদিন দুঘণ্টা তো হাঁটতেই হবে।' প্যাংক্রিআস পেনশন নিলে শরীরে কি পরিবর্তন হয় তা একটু একটু দেখা দিতে লাগল। তেষ্টা আর পেচ্ছাপ দুইই একসঙ্গে খুব জোর পেত, মুখের স্বাদ খারাপ থাকত, চামড়া শুকনো থাকত, তাছাড়া মনে একরকম বৈকল্য অনুভব করতাম। ডা· রবি বর্মা পেচ্ছাপ দেখে জানালেন যে, চিনি খুব বেশি আছে। আটটার সময় ইনসুলিনের সূঁচ নিলাম। ৩ ঘণ্টা পরে রাত এগারোটার সময় মুখের স্বাদে তফাৎ বুঝতে শুরু করলাম। তবুও মনে হচ্ছিল, ইনজেকশন বড় বাজে উৎপাত। সূঁচ গরমজলে সেদ্ধ করে পরিষ্কার রাখতে হবে, তারপর ইনজেকশনের সমস্ত জিনিস—ইনসুলিন, স্পিরিট, তুলো, সূঁচ, চিমটা ইত্যাদি—সব কাছে রাখতে হবে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল যে, এইসব ঝঞ্ঝাট একার কাঁধে বওয়া যাবে না। কিন্তু এবারের মত হিমালয় একাই যাব ঠিক করেছি।

২৮ তারিখ সন্ধে-সকাল দুবার ইনসুলিনের ইনজেকশন নিলাম। সন্ধেবেলা সকালের থেকে দ্বিগুণ পরিমাণে নিলাম।

২৮ তারিখ তিব্বতের বিষয়ে কিছু জানতে পারলাম। খোঁজ পেলাম, সরকার ও সেরা বিহারের ভিক্ষুদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেছে। সেরাতে শিক্ষিত রেডিং লামা, ত্রয়োদশ দলাই লামা মারা যাবার পর তিব্বতের রিজেন্ট হয়েছিলেন। আমার বন্ধু গেশে তন্-দর তাঁর অধ্যাপক ছিলেন। তন্-দর এখন সেরা-র একটি বিভাগের খম্বো (ডিন) ছিলেন। তিনি খুবই প্রতিভাশালী বিদ্বান। বাহির-মঙ্গোলিয়ার নিজের মাটি ছেড়ে ২৫-৩০ বছর ধরে সেরাতে প্রথমে ছাত্র এবং পরে অধ্যাপক হিসেবে থেকেছেন। জেনে ভীষণ দুঃখ হলো যে, এই ঝগড়ার ফলে বদমাশ সাধুরা গেশে তন্-দরকে মেরে ফেলেছে। তাঁর সর্বতোমুখী বিদ্যা এখন কাজে লাগত। এমন বহুমূল্য একটা জীবন এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল! আমার অন্য বন্ধু ও সঙ্গী গেশে মেন্দুম্ ছোম্‌ফেল (সংঘধর্মবর্ধন)-এর বিষয়ে জানতে পারলাম যে প্রগতিশীল চিন্তাযুক্ত তাঁর বই ছাপানোর জন্য তাঁকে জেলে আটক করে দেওয়া হয়েছে। অনেকবার চাবুক চালানো হয়েছে। ধর্মবর্ধন বড় কুশল শিল্পী, ভাল কবি আর সেইসঙ্গে দর্শনের পণ্ডিত ছিলেন। আমার সঙ্গে থাকার প্রভাব পড়ায় তাঁর চিন্তাও মার্কসবাদী হয়ে গিয়েছিল। নবীন তিব্বত তাঁর কাছ থেকে অনেক আশা করতে পারত, কিন্তু তিনিও সময়ের আগেই চলে গেলেন। গেশে ধর্মকীর্তি আমার সঙ্গে দুবার ভারতে এসেছেন। তিনি বৈকাল-এর কাছাকাছি জায়গার মোঙ্গল ছিলেন। তিনি আজকাল তিব্বতী শব্দকোষ বানানোর কাজে রত ছিলেন। আমি প্রয়াগে ছিলাম, আর এই শোকাবহ ঘটনাগুলো হিমালয়ে ওপারে সুদূর লাসায় ঘটছিল। কিন্তু মনে হচ্ছিল, সেসব আমার চোখের সামনেই হচ্ছে। আমার মন খুব বিষণ্ণ ছিল।

এখন আমি ডায়াবেটিসের ব্যাপারে আর বেশি উপেক্ষা করতে রাজি ছিলাম না। ৬০ ইউনিট ইনসুলিন ইনজেকশন দিলে পেচ্ছাপে চিনি বন্ধ হতো। ২৯ তারিখ দিনে দুবার ইনজেকশন নিলাম। ডা· রবি বর্মা ইনসুলিন, পেনিসিলিন, পিচকিরি, গরম করার চামচ আর অন্যসব জিনিস জোগাড় করে দিলেন। সব নিয়ে ১০৯ টাকা খরচ হলো।

ডাক্তার তাঁর ফী নিতে রাজি হলেন না। আমি এমন জায়গায় যাচ্ছিলাম, যেখানে ইনজেকশন দেবার লোক পাওয়া যায় না, তাই ৩০ এপ্রিল নিজের হাতে ইনজেকশন নিলাম।

সেইদিন শব্দকোষ প্রায় শেষ হয়ে গেল। টাইপিস্ট ইংরেজি আর হিন্দিতে শব্দগুলিকে টাইপ করছিলেন। বিদ্যানিবাসজীও বাড়িতে গিয়ে ফিরে এলেন। কোন সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা পরিভাষা নির্মাণ করছি, এই নিয়ে একটা লেখা তৈরি করলাম।

২ মে রোববার ছিল। আজ সম্মেলন কার্যনির্বাহী সমিতির বৈঠক হলো। 'শাসন শব্দকোষ' দেখে বিশ্বাস হয়ে গেল এবং সমিতি বিজ্ঞানের পরিভাষার জন্যও পাঁচ হাজার টাকা মঞ্জুর করে দিল।

পরের দিন আমার হিমালয়ের উদ্দেশে রওনা হবার ছিল। আনন্দজী খুব করে বলছিলেন আমি যেন সঙ্গে কাউকে নিই, কিন্তু আমার চিনী যাওয়ার ছিল, সেখানে যাত্রায় অনেক অসুবিধের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব, যা করতে যে কেউ রাজি হতো না। তাই আমি প্রয়াগ থেকে আমার সঙ্গে কাউকে নেওয়া পছন্দ করিনি। এইটুকু বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, শিমলা থেকে কোনো লোক জুটে যাবে। হ্যাঁ, এই বন্দোবস্ত এই যাত্রার জন্যই ছিল। এখন তো বুঝতে পারছিলাম যে, কোনো লোককে সঙ্গে রাখতে হবে, যে লিখতেও পারে আর ইনজেকশনও দিতে পারে।

কিন্নর দেশে

৬ মে সাড়ে আটটার সময় কালকা মেলে প্রয়াগ থেকে রওনা হলাম। কত বন্ধু দেখা করতে এলেন। ওষুধের একটা পার্শেল ঘরেই ফেলে গেলাম। অনেক জিনিস এক জায়গায় রাখলে এমনই হয়। সেই পার্শেলে পেচ্ছাপ-পরীক্ষার ওষুধ ছিল। আমাদের কামরায় দুজন বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন, যাঁদের মধ্যে একজন দিল্লী আর অন্যজন কালকা পর্যন্ত সঙ্গী হলেন। অল্পসময়ের মধ্যে আমরা চিরপরিচিতের মত হয়ে গেলাম। সঙ্গে একজন ইংরেজও যাত্রা করছিলেন। বিশবছর ধরে তিনি দার্জিলিঙের চা-বাগানগুলিতে ম্যানেজার ছিলেন। চা-বাগানগুলিও তো এখন ইংরেজদের হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। উত্তর-ইরানে চা-বাগান বানানো হচ্ছিল। এখন তাঁকে সেজন্যই সেখানে ডাকা হয়েছিল। চা-বাগানের কুলিদের সহজ জীবনের তিনি খুব প্রশংসা করছিলেন। কেনই-বা প্রশংসা করবেন না? তারা তো কোনোরকম আপত্তি ছাড়াই তাঁদের ইশারায় সব সময় কাজ করতে তৈরি থাকত। 'বদমাশ' কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তাঁর অবশ্যই অভিযোগ ছিল, কারণ তারা কুলিদের খেপাচ্ছিল। দাসত্বের যুগে মানুষের পশুর মতো কাজ করাটা মালিকদের কাছে

স্বাভাবিক মনে হতো। আজও কোটি কোটি টাকার মাল উৎপাদনকারী চা-বাগানের কুলিরা যদি আধপেটা থেকে কাজ করে, তবেই তাদের ভাল বলে মনে হয়।

বারোটা থেকে ছটা পর্যন্ত চলন্ত ট্রেনে খুব গরম ছিল। খাবার খেতে ইচ্ছে হলো না। আটটার পরে আমরা দিল্লী পৌঁছলাম। ২ ঘণ্টার বেশি গাড়ি থেমে থাকল। সিট রিজার্ভ ছিল। চারটে সিট আর মানুষও ছিল চারজন, তাই রাতে আরাম করে শুলাম। দিনের বেলা গল্পে-গল্পে সময় কেটে গেল বুঝতে পারলাম না।

সিমলা—৪ মে সকালে আমরা কালকা পৌঁছে গেলাম। ছোট গাড়ি ধরার ছিল। দুটো সুটকেশ আর বিছানা লাগেজে পাঠিয়ে দিলাম, বাকি জিনিস সঙ্গে রাখলাম। চণ্ডীগড় এলো। এখানেই পূর্ব-পাঞ্জাবের রাজধানী হতে যাচ্ছিল। এই চেষ্টা মহম্মদ তুঘলকের দৌলতাবাদ সৃষ্টি করার থেকে খারাপ ছিল। দৌলতাবাদে তো তবু আগে থেকেই দেবগিরির মত একটা নগর ছিল, আর এখানে জঙ্গলে রাজধানী হতে যাচ্ছিল। জলন্ধর প্রাচীন কালেও একটি বড় রাজধানী ছিল। আজও সেটি একটি বড় শহর, আর তার থেকে কয়েক মাইল দূরেই রয়েছে কপুরথালার মহল। পাঞ্জাবের রাজধানী হবার পক্ষে সেটাই সবচেয়ে উপযুক্ত ছিল, কিন্তু বোঝাবে কে? জানতে পারলাম যে একজন মন্ত্রীর এখানে অনেক জমি ছিল, রাজধানী হবার নামে সেগুলি লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়ে গেছে। (চণ্ডীগড়ের রাজধানী এখন সরকারিভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে, কিন্তু পাঞ্জাবী ভাষার প্রদেশে অবস্থিত এই নগরের সৌভাগ্যকে পাঞ্জাবী ভাষা যে কোনো সময় কেড়ে নিতে পারে)।

ছোট লাইনের কামরা আর ইঞ্জিনও ছোট। ট্রেন ছোট ছোট চাকায় বাচ্চা ছেলের মত আস্তে আস্তে সাপের ভঙ্গিতে এঁকেবেঁকে ওপরে চড়ছিল। রাস্তায় পাহাড়ের ভেতর কত যে সুড়ঙ্গ পেলাম। চার হাজার ফুট উচ্চতায় ওঠার পর গরমের হাত থেকে মুক্তি পেলাম। এখানে এখন গম পাকতে শুরু করেছিল। দুপুর নাগাদ সিমলা পৌঁছে গেলাম। স্টেশনে প্রফেসর লাজপত রায় নায়ার তাঁর বোন রজনীজীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। জিপে চড়ে ওপরে পৌঁছলাম। অল্প চড়াই পায়ে হেঁটে পার করতে হলো। ফবগ্রোভ বাংলোয় পৌঁছতে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। বাড়িটি ভারি সুন্দর সবুজ জায়গায় অবস্থিত। পরিচ্ছন্নতা আর শান্তিতে চারিদিক ভরা ছিল। রেলের লম্বা সফরের পর স্নান করাটা ছিল অনিবার্য। স্নান করলাম, কিন্তু পেট খারাপ হয়েছিল, ব্যথাও ছিল। কয়েকবার পাতলা পায়খানা আর একবার বমিও হলো। রাত নটায় ছুটি পেলাম। আজ খাবার খেলাম না। প্রফেসর নায়ার পাঞ্জাব সরকারের প্রচার বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল (মহানির্দেশক) ছিলেন। তিনি কিছু ফিল্ম দেখালেন, যার মধ্যে লোকশিল্পের কিছু দৃশ্য ছিল, কিন্তু পেটব্যথার চোটে মন দিতে পারলাম না।

সেদিন সন্ধেবেলা সিমলার প্রধান রাস্তা—ম্যাল-এ বেড়াতে গেলাম। পাঞ্জাবী মেয়েরা আধুনিকতার ব্যাপারে সারা ভারতে প্রথম। তারা ম্যালকে প্যারিসের ফ্যাশানে ভরা রাস্তা বানিয়ে তুলছিল। এখানে ভারত আর প্যারিসের ফ্যাশনের খুবই বিচিত্র সংমিশ্রণ

হয়েছিল। এক তম্বী ময়ূরকণ্ঠী রঙের পাতলা শাড়ি আর ব্লাউজ পরার সময় এটা খেয়াল রেখেছিল যে, তার পেটের সৌন্দর্য যেন ঢাকা না পড়ে। যদি স্বাস্থ্যবতী আর সুন্দর হতো, তাহলে গুপ্তযুগের মূর্তির মত সুন্দর মনে হতো, কিন্তু সে দেখতে ছিল একদম পেত্নীর মত। সন্ধের সময় মনে হতো ম্যালে সৌন্দর্য আর বেশভূষার প্রদর্শনী চলেছে। এরা পাহাড়ী নয়, পাঞ্জাবী তরুণী ছিল। তরুণ প্রজন্ম আগের প্রজন্মকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছিল। একটি মেয়ে তার ভাইকে বলছিল, 'আমি আমার বন্ধুর কাছে যাচ্ছি।' ভাই জবাব দিল, 'অমুক যুবকটি তো তোমার বন্ধু না?' বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতেই যদি এমন দেখা যাচ্ছে, তাহলে এরপরে কোথায় পৌঁছবে, বলা মুশকিল।

কিন্নর দেশের বিস্তৃত বর্ণনা আমি আগে 'কিন্নর দেশ মে'-তে করেছি, যা 'হিমাচল প্রদেশ'-এও লেখা হয়েছে, তাই সেইসব কথা আবার এখানে বলা উচিত নয়। এখানে সংক্ষেপেই কিছু বর্ণনা করতে হবে। সিমলাতে আমি ৪ থেকে ১২ মে পর্যন্ত রইলাম। প্রফেসর লাজপত রায়ের অতিথি হয়ে। এই পাঞ্জাবীদের আমার সব সময় খোলামনের অতিথিপরায়ণ বলে মনে হয়। প্রফেসর নায়ার-এর মধ্যে এই গুণ আরো বেশি ছিল। তাঁর স্ত্রীও আমার কোনো অসুবিধে যাতে না হয় সেদিকে নজর রাখতেন। এখানে এসে নিয়ম করে ইনসুলিন নেওয়া আরম্ভ করিনি। খাওয়াতেও সংযম রাখতে পারিনি। এগিয়ে যাবার চিন্তা ছিল। পায়ে হাঁটার সাহস কখনও কখনও কবতাম, কিন্তু চড়াইতে নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে দেখে ঘোড়ার প্রয়োজন ছিল। স্বাধীন ভারতের এখন ২২টি রাজ্য মিলিয়ে হিমাচল প্রদেশ তৈরি হয়েছিল, যার চিফ কমিশনার আমার পুবনো পরিচিত শ্রীএন· সি· মেহতা ছিলেন। এমনিতেও তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম, কিন্তু এখন তো তাঁর প্রদেশে কয়েকমাসের জন্য যাচ্ছি, তাই দেখা করা জরুরি ছিল। টেলিফোন করলাম। মেহতাজী ছিলেন না, আমার নম্বর দিয়ে দিলাম, আর ভাবলাম যদি টেলিফোন আসে তো দেখা করতে যাব। টেলিফোন এলো। ৭ মে হিমাচল সরকারের সচিবালয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। যে বাড়িতে সচিবালয় ছিল, তার নাম রাখা হয়েছিল হিমালয়ধাম। মেহতাজীর সঙ্গে দেখা হলো। ব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ব্যস্ততা দেখালেন না। কিছু কথাবার্তা হলো। তিনি বললেন, 'ফল উৎপাদন আর রাস্তা নির্মাণ—এগুলোই সবার আগে করতে হবে। কন্নৌরে আঙুর বাগান আছে, জিপে করে যাতে সেখানে যেতে পারেন, এমন রাস্তার ব্যবস্থা করতে হবে।' একথাও বললেন, 'আমরা লোকশিল্পের প্রদর্শনীর জন্য একটি দল বাইরে পাঠাতে চাই। সেদিকে খেয়াল রাখবেন।' আমার সবচেয়ে বড একটা কাজ হলো যে—তিনি রামপুরের উচ্চাধিকারীকে চিঠি লিখে দিলেন—ঘোড়া, ভারবাহক আর ডাকবাংলো ইত্যাদির ব্যবস্থা যেন তিনি করে দেন এবং ঠানাদারে যেন ১৩ তারিখে একটি ঘোড়া আর দুজন কুলি প্রস্তুত থাকে।

৮ তারিখে আমার দেওলীর সাথী ঠাকুর গোবিন্দ সিংহের সঙ্গে দেখা হলো। তার সঙ্গে কন্নৌর (স্পিলো)-এর ঠাকুর গোপালচন্দ নেগীও ছিলেন, যিনি এলাহাবাদে এল· এল· বি·-র দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তিটি শোঙ নিবাসী নেগী ঠাকুরসেন বি· এস· সি·, এল· এল· বি। নেগী ঠাকুরসিংহ কৃষির স্নাতক, নৌসেনাতে চলে

গিয়েছিলেন, আর এখন হিমাচলের জন্য কিছু করতে চাইছিলেন। জানতে পারলাম, যে চিনীর কমিশনারী ঘর এখনও খালি পড়ে আছে। তার এক অংশে হাসপাতাল আছে। নেগীজী তাঁর পরিচিতদের কয়েকটি চিঠি লিখে দিলেন।

সেদিনই কালীবাড়ি গেলাম। এর প্রতিষ্ঠা ১৮১৫ সালে সেইসময় হয়েছিল, যখন হিমালয়ের ভারতীয় পাহাড়গুলি ইংরেজররা নেপালীদের থেকে কেড়ে নিয়েছিল। বাঙালীরা সর্বপ্রথম পশ্চিমী সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে। তাদের মধ্যেও কিছুলোক আধুনিকতার ঘোড়দৌড় লাগিয়েছিল, কিন্তু সেসময় অনেক আগে পার হয়ে গেছে। এখন তাদের মধ্যে আধুনিকতা, আধুনিক সজ্জা, বেশভূষাও আছে তবে গাম্ভীর্যের সঙ্গে।

সিমলা ঘুরে-ফিরে দেখলাম। তার থেকে দূরের বাংলোগুলিতেও গেলাম। কুফরীতে বনভোজনও করলাম। ১২ তারিখ সওয়া পাঁচটার সময় রেস্তোরাঁতে পাঞ্জাবের মন্ত্রীরা চায়ের পার্টি দিলেন, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী ড· গোপীচাঁদ এবং অন্যান্য মন্ত্রীরাও এলেন। সেদিনই দুপুরে পণ্ডিত ভগবত দত্তজীর সঙ্গে দেখা হলো। এখনও তিনি একইরকম অধ্যয়নশীল ও আর্যসমাজের পক্ষপাতী রয়েছেন। কালিদাস আর সমুদ্রগুপ্তকে তিনি খ্রিস্টাব্দের শুরুতে নিয়ে যেতে চান আর বুদ্ধকে নিয়ে যেতে চান খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে। মতভেদ যতই থাকুক না কেন, আমাদের মধ্যে সেরকমই মধুর সম্পর্ক ছিল, যেমন ছিল ১৯১৬ সালে। ৪২ বছর বয়সের প্রভাব তার ওপর পড়েনি, এটা অবশ্যই ঈর্ষা করার মত ব্যাপার। লাহোরে মডেল টাউনে নিজের বাড়িতে তিনি শান্তিতে থাকতেন। নিশ্চিন্ত জীবন ছিল। দেশভাগ হয়ে গেল। ৯ আগস্ট (১৯৪৭) সপরিবারে চলে এলেন। এখন কষ্টের জীবন। বাড়িঘর নেই। ছেলে মধ্য-এশিয়া মিউজিয়ামে কাজ করছে, স্ত্রী অমৃতসরের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজ পেয়ে গেছেন, এটাই আনন্দের কথা।

১৩ মে সাড়ে সাতটার সময় আমরা বাসে রওনা হলাম। ২৯ মাইল পরে নারকণ্ডা পর্যন্ত বাস যেত, যার উচ্চতা ছিল ৯০০০ ফুট। এখান থেকে রামপুর ৩২ মাইল দূরে। কিন্তু আমাদের জন্য ঘোড়া আসবে ঠানাদারে। ঘটনাক্রমে রামপুর হাইস্কুলের হেডমাস্টার পণ্ডিত দৌলতরামজীও এই বাসে এসেছিলেন। জিনিসপত্র নেবার জন্য পাঁচ টাকায় খচ্চর ঠিক করলাম আর আমি নিজে ১১ মাইলের যাত্রা পায়ে হেঁটে করার জন্য রওনা হলাম। প্রথম ঘণ্টায় চলার গতি চার মাইল ছিল, পরে কিছুটা ঢিলে, নবম মাইলের কাছে পৌঁছে একটা ঘোড়া পেলাম। ঠানাদারে ডাকবাংলোতে উঠলাম। তিব্বতে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীদেবীদাসজী স্টোকের পুত্র, শ্রীপ্রীতম সিংহ আর পুরনো পরিচিত ড· ভগবান সিংহ বোধ-এর সঙ্গে দেখা হলো। একদম আপনজনদের মধ্যে এসে পড়েছিলাম। রামপুর থেকে আসা ঘোড়া-খচ্চর প্রস্তুত ছিল।

পরের দিন ছটার সময় রওনা হবার আগে রায়সাহেব দেবদাসজী পরোটা আর ফল নিয়ে এলেন। রাতে পেট ঠিক ছিল না, তাই আজ উপোস করব ভেবেছিলাম। ফল খেলাম। সন্ধে হবার আগেই রামপুর পৌঁছে গেলাম। ডাকবাংলো শহরের থেকে দূরে ছিল। আমরা সেখানকার উচ্চাধিকারী সরদার সাহেব যখন তাঁর বাংলোতে থাকতে বললেন, আমরা সানন্দে তা গ্রহণ করলাম। তিনি কোয়েটাতে রেভিনিউ অফিসার ছিলেন।

ঘর ভাঙার পর এদিকে চলে আসেন। আর এখন এই কাজে ছিলেন। রাস্তায় এক জায়গায় ঘোড়া আমাকে পাথরে ফেলে দিয়েছিল। চার জাযগায ঘা হয়ে গেছে। ইনসুলিন নেওয়া জরুরি ছিল। আমাদের নিমন্ত্রণকারী ইনজেকশন দিতে দক্ষ দেখলাম। ১৫-১৬ তারিখ রামপুরেই কাটালাম। রাস্তার জন্য কিছু জিনিস কিনলাম। চিনীর বিষয়ে কিছু খোঁজখবর নিলাম। রামপুরের রাজা এখন বালক ছিল, রাজমাতা ছিলেন দুঃখী। এমন দিন আসবে কখনও ভাবেননি। এখন আর তাঁর কোনো কদর নেই। রাজার ঘোডা আর খচ্চবগুলোকেও সরকাবি করে নেওয়া হচ্ছিল। ভাণ্ডারে কয়েক লক্ষ টাকার গয়না থাকার কথা, কিন্তু সব পাখা মেলে উড়ে গেছে। দু-চারহাজার টাকাব যা গয়না ছিল তা রানীকে দিতে কিসের আপত্তি ছিল? বেচাবি নিজের দুঃখের বর্ণনা দিতে গিযে নিজেকে সামলাতে পারলেন না—তাঁর চোখে জল এসে গেল।

১৭ তারিখ সকাল সাড়ে ছটায় রওনা হলাম। মাল বইবার জন্য দুটো সরকারি খচ্চর পেয়েছিলাম। সওয়ারী ঘোড়ার পিঠ কাটা ছিল। এক মাইল যাবার পর তা জানতে পেরে তাকে ফিরিয়ে দিলাম। ৯ মাইল গিয়ে গৌরার ডাকবাংলোতে দুপুরের জন্য থামলাম। মার্চে খবরের কাগজে রামপুর-বুশহরে প্রজাবিদ্রোহের বিষয়ে পড়েছিলাম। গৌরা ডাকবাংলোও সেইসময় বিদ্রোহের একটা মুখ্যস্থান ছিল। মাস্টার অনুলাল ও পণ্ডিত সত্যদেব প্রজাদের নেতা ছিলেন। রাজ্য-শাসক তার পুরনো চাল চালতে চাইছিল। সরাহনে অনুলালকে গ্রেফতার করে গৌরার ডাকবাংলোতে আনা হয়। যারা গ্রেফতার করেছিল সেইসব পুলিশ নিজেরাই গ্রেফতার হয়ে যায়। পরের রাজ্যের জজ, পুলিশ অফিসার এবং এক ডজনের বেশি সিপাই গুলি চালিয়ে কাজ সারতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। অনেকদিন পর্যন্ত রামপুরে প্রজাদের রাজত্ব ছিল। মাস্টার অনুলাল আর পণ্ডিত সত্যদেবের নেতৃত্বের জন্যই লুটপাট হয়নি। শেষে ভারত সরকার পুলিশ পাঠায় এবং বিনাগুলিতেই শান্তি ফিরে আসে।

আজ ২১ মাইল হেঁটে সিমলা থেকে ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত সরাহনের ডাকবাংলোতে পৌছলাম। সমস্ত রাস্তাটা পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছিল তাই ক্লান্তি ছিল। শেষের তিন-চার মাইলের চড়াই তো খুবই কঠিন মনে হয়েছিল। বাংলোতে পৌছতে পৌছতে একেবারে ভেঙে পড়েছিলাম। অধ্যাপক সোহনলালজী আগেই নেগীজীর চিঠি পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আরামের সমস্ত বন্দোবস্ত করলেন। ২০ টাকায় পরবর্তী বিশ্রামস্থল পর্যন্ত একটা ঘোড়ারও ব্যবস্থা করে দিলেন।

সহিস দৌলতরামকে আগেই রওনা করে দিলাম। ঘোড়াটির চেহারা বেশ তেজী এবং মজবুত। আমি ভেবেছিলাম, চলতে গিয়ে সে হাওয়ার সঙ্গে কথা বলবে, কিন্তু তেমন প্রমাণ পাওয়া গেল না। শোল্ডিং নালা পার করে আমি একটি দোকানে বসেছিলাম। পাশের খেতে খাম্বাদের তাঁবু পড়েছিল। খাম্বারা তিব্বতী যাযাবর, যারা শীতে মানস সরোবর আর গরমে দিল্লী এবং ভারতের অন্যান্য শহরে ঘুরে বেড়ায়। তিব্বতীতে কথা বলায় আমার প্রতি তাদের আকর্ষণ জন্মাল। তারা আমাকে চা খাওয়ার জন্য ডাকল। চা-খাওয়ার থেকে বেশি আমার তিব্বত আর খাম্বাদের বিষয়ে জানার ইচ্ছে ছিল।

তরুণটির বৌদ্ধধর্মে অনুরাগ ছিল। ব্রাহ্মণধর্মকে সে মিথ্যাধর্ম বলে মনে করে। তার যথেষ্ট জ্ঞান আছে, কমিউনিস্ট পার্টির নামও সে শুনেছে, সম্ভবত এটা জানে না যে, দু-বছর পরে তিব্বতে কমিউনিস্ট পার্টির দুন্দুভি বাজতে শুরু করবে। সে চায় ভোটদের মধ্যেও গরিবদের শোষণ বন্ধ হওয়া উচিত। সেদিন ২৩ মাইল হেঁটে সাড়ে পাঁচটার সময় নচার পৌছে গেলাম। চারদিকে ছিল দেবদারুর ঘনবনের শোভা। এদিককার জঙ্গলের কনজারভেটরের কার্যালয় এখানেই। কনজারভেটর ঢিলন সাহেব জলন্ধরের অধিবাসী। চা খাওয়ানোর পর তিনি আমাদের নিজের শাক-সবজির বাগান দেখালেন। এখন কোনো ফল পাকেনি। নেগী ঠাকুরসিংহ এখানেও চিঠি লিখে দিয়েছিলেন, আর বাবু অমীচাঁদ খুবই সাহায্য করলেন। সকালের চা ঢিলন সাহেবের বাড়িতে খাওয়ার কথা ছিল। তারপর পঙ্গী পর্যন্ত বাবু অমীচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। পরের ডাকবাংলো ছিল বঁগতুতে, যার অল্প নীচে শতদ্রু পার হওয়ার জন্য লোহার পুল ছিল। উৎরাই-এর রাস্তা, তাই ঘোড়া থাকা সত্ত্বেও তার কোনো কাজ ছিল না। ডাকবাংলোয় নটার সময়েই পৌছে গেলাম। রাস্তার ইন্‌স্পেকটর শ্রীলক্ষ্মীনন্দ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দেখা করলেন। চারঘণ্টা বিশ্রাম করার পর তিনি আমাদের সঙ্গী হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর ঘোড়া আর রোগী পর্যন্ত একজন লোক সঙ্গে দিলেন। বঁগতু পুল সওয়া পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। আমরা কত ঠাণ্ডা জায়গায় ছিলাম, তা খুব সহজেই বোঝা যেতে পারে। সামনে একটু দূরে শতদ্রুকে সোজা আটকে দেওয়া পাহাড় এসে পড়ল। একে ভাঙতে বোধ হয় শতদ্রুর লক্ষ লক্ষ বছর সময় লাগবে। জলের রাস্তা তো বেরিয়ে এলো কিন্তু মেঘের বাস্তা অতটা খোলা নয়। চার মাইল যাবার পর বাবু লক্ষ্মীনন্দকে ছেড়ে দিলাম। কিছুদূর সমতলের মত জায়গায় চলার পর তিন মাইলের কঠিন চড়াই পেলাম। মাদি ঘোড়াটাকে দেখতে দুর্বল মনে হচ্ছিল, কিন্তু সে পার করে দিল। ১২৫ মাইলে উড়নীর ডাকবাংলোতে বিশ্রাম করলাম। এখানকার লোকেদের স্কুলের অভাবে খুব অসুবিধে হচ্ছিল। আমি তাদের হয়ে একটা দরখাস্ত লিখে দিলাম। এখন আমরা একদম কিন্নর দেশে এসে গিয়েছিলাম। আজকাল এখানে জীবনধারণ কেমন দামী হয়েছে, তা এর থেকে বোঝা যাবে যে, দুটো খচ্চরের রাতের খাবার জন্য ৬ টাকার ঘাস কিনতে হলো। আটা এক টাকা চার আনা সের, তাও সুলভ নয়।

২০ মে জল খাবার খেয়ে সকালে রওনা হলাম। এখানে-ওখানে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আর বেশির ভাগটা পায়ে হেঁটে রোগী পৌছলাম। রোগীর চার মাইল আগে শীতে বরফের ধস খুব বিশ্রীভাবে রাস্তা ভেঙে দিয়েছিল। বেরাস্তায় দেওয়ালের মত খাড়া চড়াইতে চড়তে হলো। যদি উৎরাই হতো তাহলে তো আমার সাহস হতো না, গড়িয়ে পড়ার ভয় ছিল। রোগীতে নেগী সন্তোষ দাসের সঙ্গে দেখা হলো। ধস ডাকবাংলোকে ভেঙে-চুরে অনেক দূরে ফেলে দিয়েছিল। বনবিভাগের তৎপরতার জন্য এখানে অনেক জায়গায় ভাল দেবদারু বন হয়েছে, বনের রক্ষাও হয়েছে। রোগী গ্রামে আপেল, খুবানি, আখরোট, আঙুরের অনেক বাগান আছে। এখানকার কালো ছোট আঙুর কয়েক শতাব্দী ধরে বিখ্যাত। প্রাচীনকালে কনৌজ-এর রাজাদের কাছেও বোধহয় এখান থেকে লাল মদ

যেত। গুর্জর প্রতিহারদের সময় কিন্নর দেশ অবশ্য কান্যকুব্জ সাম্রাজ্যের ভেতরে ছিল।

চিনী—সেইদিন পাঁচটার সময় চিনী পৌঁছে বনবিভাগের ডাকবাংলোতে উঠলাম। বেশ কদিনের ডাক একসঙ্গে পেলাম। সেগুলি আদ্যন্ত পড়তে বহু সময় লেগে গেল। এখন ৭ আগস্ট পর্যন্ত চিনী আমার ঘর-বাড়ি হয়ে গেল। গ্রামে প্রায় ৯০টি ঘর আছে। মিড্‌ল স্কুল আছে, যার প্রধান শিক্ষক এখানকার পোস্টমাস্টারও। এখানে তহসীলও আছে। তহসীলদার আর স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচয় হলো। তাঁরা সবরকমে আমাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এখন আমি বুঝতে পারলাম, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা নিজের দায়িত্বে রাখলে বড়ই মাথাব্যথার কারণ ঘটবে। পরের দিন যখন পুণ্যসাগর আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য হঠাৎই এসে পড়লেন, তখন এই চিন্তা দূর হয়ে গেল। সে একজন কিন্নর। কিন্নরদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ। তিনি সাধু হয়ে এখন সোনম্‌ গ্যেন্‌ছো হয়েছেন, যার অনুবাদ আমি পুণ্যসাগর করেছি। ষষ্ঠ ক্লাস পর্যন্ত তিনি পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু পড়াশোনা উর্দুতে করেছিলেন। যদি হিন্দিতে করতেন তাহলে আমাদের দুজনেরই বেশি সুবিধে হতো। তবু আমার সঙ্গে থাকতে থাকতে তিনি যথেষ্ট হিন্দি পড়তে শুরু করেছিলেন। খাওয়ার ব্যাপারে এখন আমি নিশ্চিন্ত থাকত পারতাম। সে সময় শাক-সবজির খুবই অভাব ছিল, তবে দোকান থেকে খাবার জিনিস পাওয়া যেত। কিছু কিছু জিনিসের অবশ্যই অসুবিধে ছিল কিন্তু উপোস থাকার মত অবস্থা ছিল না।

২১ মে দুপুরের পর স্কুলে গেলাম। বসতির সবথেকে উঁচু জায়গায় তা অবস্থিত। যেখানে একসময় চিনী ঠকরস (ঠাকুর)-এর দুর্গ ছিল। বেলে পাথর দিয়ে দেওয়াল বানানো হয়েছিল। দেয়ালের চিহ্ন নেই, পাথর অবশ্যই পাওয়া যায়। মাটি দিয়ে ঢাকা, পুরনো ধ্বংসাবশেষের ভেতর কি লুকিয়ে আছে, তা জানার ইচ্ছে হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু জিজ্ঞাসা পূরণ হওয়া তত সহজ নয়। অনেক আগে আমি রহস্য জানার চেষ্টা করেছি, এখানে-ওখানে খনন করিয়েছি, কিন্তু তাতে পাথর আর পোড়াকাঠ পাওয়া গেছে। এই দুর্গও সেরকম হয়ে থাকবে, যেমন এখানে লবরং আর কামরুতে আছে, অর্থাৎ প্রায় বর্গাকার ২০-২৫ হাত লম্বা-চওড়া এবং ছতলা-সাততলা প্রাসাদ, যেখানে কিছু কিছু কাঠও ব্যবহৃত হয়েছে। ধাতুর মধ্যে শুধু একটা লোহার বাণের ফলা পেলাম। দুর্গের একদিকে চিনী গ্রাম, অপর দিকে কিছুটা নীচে নেমে তহসীল ও অন্যান্য সরকারি ইমারত। দুর্গের একদিকে পাহাড়ের জন্য অস্বাভাবিক লম্বা ও চওড়া একটি খেত আছে, যেটি চিনীর দেবতার খেত। স্কুলে দেড়শোর বেশি ছেলে পড়ত। দূর দূর গ্রামের ছেলেরা দারিদ্রের জন্য আর্থিক সাহায্য না পেলে এখানে পড়তে আসতে পারে না। খোলামেলা এবং উঁচু এই জায়গাটা ঠাণ্ডা, সেইজন্য নীচে অপেক্ষাকৃত কিছু গরম জায়গায় চলে যেতে হতো। ডাকঘরে একবারে সাড়ে সাতশো টাকার বেশি জমা নেওয়া হয় না, তাই দুবারে টাকাটা জমা করলাম।

বনবিভাগের ডাকবাংলোতে থাকতে পারতাম, কিন্তু সেটা মুখ্যত বনবিভাগের অফিসারদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে, তাই আমরা অন্য কোনো জায়গায় থাকতে চেয়েছিলাম।

রেঞ্জার শ্রীদেবদত্ত শর্মা অমৃতসরের বাসিন্দা, যুবক এবং মিশুকে লোক। তিনি নবপরিণীতা স্ত্রী আর বোনের সঙ্গে বাংলোর পাশের কোয়ার্টারে থাকেন। আমাদের এখানে পয়সা দিয়ে থাকা অতিথি রাখার ব্যবস্থা নেই, আলাদা ব্যবস্থা করার দরকার ছিল। সেখান থেকে কয়েক ফার্লং দূরে রাস্তার ওপর মিশনারিদের বাড়ি দেখতে গেলাম। সামনের বাড়িটা হাসপাতালের জন্য ছিল, যেখানে বহু বছর ধরে কোনো ডাক্তার ছিল না, কম্পাউন্ডার ঠাকুর সিংহই ডাক্তারের কাজ করতেন। সব থেকে পিছনের ঘরগুলিতে ঠাকুর সিংহের পরিবার থাকত। আর মাঝখানে তিন-চারটি ঘরের একটা বেশ ভাল বাড়ি খালি পড়েছিল। এটাই আমরা পছন্দ করলাম।

পরের দিন মাল নিয়ে যাবার লোক পেতে অসুবিধে হলো। ঘটনাচক্রে বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধ-পূজার জন্য অনেক সাধুনী জমা হয়েছিল, তারাই সানন্দে আমাদের মালগুলো মিশনারি বাংলোতে পৌঁছে দিল। সেখানে একসময় জার্মান মিশনারিরা থাকত, তারপর স্যালভেশন আর্মির লোকেরা আসে। সে সময় এখানকার ফল আর ফুলের বাগানগুলো খুব ভাল অবস্থায় ছিল। মালী এখনও ছিল, কিন্তু বাগান দেখার জন্য কেউ ছিল না। ১৯২৬ সালে আমি এখানে গুজবেরি খেয়েছিলাম, এখন সেগুলি নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। হল্যান্ড থেকে নাশপাতি আনিয়ে লাগানো হয়েছিল, এখনও তাতে বড় বড় ফল হয়। কত শখ করে হয়তো এই বাগান করা হয়েছিল, কিন্তু এখন তা একেবারেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

২২ মে তহসিলদার মঁগতরাম সফর থেকে ফিরলেন। পুরনো আপেল, খুবানি, ও আখরোটের সঙ্গে কিছু শাকও নিয়ে এলেন। রাজার ভৃত্য ছিলেন, নতুন সরকার এখন রাখবে কি না ভেবে উদ্বিগ্ন ছিলেন, চিফ কমিশনারের সুপারিশের চিঠি এসে গিয়েছিল, তাই চাইছিলেন তাঁর হয়ে আমি সুপারিশ করি। আমি তাঁকে বললাম যে, সবথেকে বড় সুপারিশ এটাই হবে যদি তিনি এখানের ফল, খনিজ সম্পত্তি, হস্তশিল্প ইত্যাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে চিফ কমিশনার সাহেবকে পাঠিয়ে দেন।

পুণ্যসাগরের আসাতে আমার তিন-চতুর্থাংশ চিন্তা দূর হয়ে গেল। এটা পুরোপুরি ঘটনাচক্র যে তিনি এসে পড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না, তবে তিনি বোধহয় আমার নাম জানতেন। প্রথমে স্বাস্থ্যের দিকে চিন্তা গেল। ২৩ মে পেচ্ছাপ পরীক্ষা করে জানতে পারলাম অল্প চিনি আছে। পানমেলিটেস-এর বড়ি খেয়ে যাচ্ছিলাম, ইনসুলিন-এর ইনজেকশন আপাতত নিলাম না। পাহাড়ে দুধ আর ঘি পাওয়া যেত কিন্তু এখানে তাও দুর্লভ। একটা কম্বল আর একটা এণ্ডিতেকেটে যাওয়ার মত শীত ছিল। ২৪ মে থেকে আমি দু ঘণ্টা করে বেড়াতে শুরু করে দিলাম।

চিনীতে প্রত্যেক দ্বিতীয় দিনে ডাক আসত, কিন্তু রাস্তা খারাপ থাকায় আর অব্যবস্থার কারণে সময় নিশ্চিত ছিল না।

এবার চিনীতে আশা করেছিলাম 'মধুর স্বপ্ন' লিখে ফেলব, কিন্তু সেই সময় আসতে এক বছর বাকি ছিল। হ্যাঁ, তার মাল-মশলা জড়ো হচ্ছিল। কনৌরের লোকগীতের দিকেও নজর পড়ল। সেগুলো বেশিরভাগই প্রেম, সৌন্দর্য, সম্পত্তি, অলৌকিক কার্য অথবা দেবতা ইত্যাদি বিষয়ে হয়ে থাকে, আর অন্য সব জায়গার লোক-গীতের মতনই

এগুলোরও আয়ু বেশি হয় না। একবার ঝড়ের মত বেরিয়ে তারা সমস্ত কিন্নর দেশকে অনুরণিত করে তোলে, তারপর দূরে চলে যাওয়া শব্দের মতো ক্ষীণ হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। সম্ভবত দেবতাদের গীতগুলির আয়ু বেশি হয়। সেখানে থাকতে আমি অনেকগুলি গীত সংগ্রহ করি, যেগুলি 'কিন্নর দেশ মেঁ'-তে ছাপা হয়েছে। এখানে থাকার সময় ভিন্ন ভিন্ন ধরনের লোক দেখা করতে আসত। চম্বানিবাসী নেপালী রামানন্দের শিষ্য পরমানন্দ চেতন চার-পাঁচ বছর ধরে কিন্নর দেশে জাঁকিয়ে বসেছিলেন। ভবঘুরে, পাহাড়ে খুব ঘুরে বেড়িয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে এখানে পৌঁছলেন আর কিন্নরীদের চক্রে পড়ে গেলেন। এখন আর সম্মানও নেই, কিন্তু কিন্নরে সুরা খুবই সুলভ আর তিনি তা বিনামূল্যে পেয়ে যান। তাই সুরা-সুন্দরী তাঁকে ছাড়বে তবে তো কিন্নর দেশ থেকে বেরোবেন? পরমানন্দ চেতন কাশ্মীব থেকে নেপাল পর্যন্ত সমস্ত পাহাড় চষে বেড়িয়েছেন। দশ বারো হাজা'র ফুট উচ্চতা তাঁর কাছে কিছুই নয। অম্‌দোর আর এক ভবঘুরের সঙ্গে দেখা হলো। একযুগ তিনি তিব্বতে কাটিয়েছেন। এখন তিব্বত ও ভাবত তাঁব পায়ের নীচে। পাহাড়ের যাত্রায় স্পুতে আর একজন মঙ্গোল ভিক্ষুকে পেলাম। তিরিশ বছর আগে সম্ভবত কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য তিনি দেশ ছেড়ে লাসার ডেপুঙ মঠে এসেছিলেন। এখানে কিছুদিন লেখাপড়া করার পর আবাব ভারত আর তিব্বত চক্কর কাটতে শুরু করেন। এইরকম চক্করে শুধু ভবঘুরেমির লালসা মেটে তাই নয, তীর্থযাত্রী হওয়ায় জীবিকা নির্বাহও হয়ে যায়। চতুর্থ ভবঘুরে হলেন নেপালী রঙ্গাচার্য যিনি তোতাদির রামানুজী যজ্ঞগুরুর শিষ্য ছিলেন। তিনি পূর্ব-নেপালের ধনকুটাতে জন্মগ্রহণ করেন, পরে জীবিকাব সন্ধানে বর্মাতে গিয়ে পৌঁছোন। শেষে ভবঘুরেমি তাড়া করে, আর ঘুরতে ঘুবতে মাদ্রাজের দিকে গিয়ে রামানুজী সাধু হন। সেখানের কত যে পরিচিত জায়গার বিষয় নিয়ে বলতেন। আজকাল বেশিরভাগ তিনি মোনে—কামরুতে থাকতেন আর লোকে তাঁকে 'ম্যোনেরোলা' বলে ডাকত, যার অর্থ হলো 'মোনের ফকিব'। তাঁর পায়ে সবসময় চাকা বাঁধা থাকত। অনেক দুর্গম পথে তিনি একবার-দুবাব নয, পাঁচ-পাঁচবার কৈলাশ মানসরোবর গেছেন। ১৯৫৩-তে আমি কাঠমাণ্ডু গেলাম, সেখানেও তিনি কিন্নর দেশ থেকে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পাহাড় পার করে হাজির হয়েছিলেন। পাঠশালা খোলার নেশা ছিল তাঁব। অধিকারীও সানন্দে সাহায্য করতেন।

খাওয়ার অসুবিধে পুরোপুরি দূর হয়নি, সবথেকে অসুবিধে ছিল শাক-সবজির। ১ জুন তহসিলদার সাহেব কিছু শুকনো মাংস পাঠিয়ে দিলেন, আর পুণ্যসাগর বিচক্ষণ গৃহিণীর মতো অল্প অল্প করে দশদিন পর্যন্ত তা চালিযে ছিলেন। এখন অল্প সবুজ শাক পাওয়া যাচ্ছিল, ফল পেতে এখনও এক মাসের বেশি দেরি ছিল। রোড-ইন্‌স্পেটর বাবু লক্ষ্মীনন্দ ঘি পাঠালেন, কিন্তু দাম নিতে অস্বীকার করলেন। এও এক বিপদ। ঘিয়ের খরচ এমনিতে বেশি ছিল না, রুটিতে মাখানো হতো না। আর ভাজার কাজ তেল দিয়েও হয়ে যেত।

৩ জুন সন্ধেবেলা অল্প জ্বর এলো। যখন-তখন পেট খারাপ হতো। পরিমিত খাওয়ার দিকে বেশি নজর দেওয়া দরকার ছিল।

কোনো একটি জায়গায় প্রাচীন স্থানগুলির খোঁজ পেতে হলে, দেশেব অভিজ্ঞ লোকের

কাছে সেইসব স্থানের বিষয়ে জানতে চাওয়া উচিত, যাদের সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর যোগ রয়েছে। এখানে পাহাড়ে সমস্ত প্রাচীন স্থানগুলিকে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতনিবাস মনে করা হয়। ব্রহ্মচারী পরমানন্দ জানালেন যে, শতদ্রুর এই পারে আছে কোঠী, কাশ্মীর, রারং, লবরং, কনম্, স্পু, ডুবলিং, টসীগংগ, সোমং, নাকো আর শতদ্রুর ওপারে আছে মোরং, ঠঙ্গী, চারং। বস্পা উপত্যকাতে আছে সাংলা আর কামরু।

কিন্নর দেশের দেবতারা মাটি-পাথর দিয়ে তৈরি নয়, আর তারা নিষ্ক্রিয়-নির্জীবও নয়। তারা তাদের বিমানেই ঘুমোয়, বিমানে চড়েই বেড়াতে বেরোয। বিমান একটি ছোট খোলা পাল্কির মত হয়, যার ভেতরে চার-পাঁচ হাত লম্বা একটা ভুর্জপত্রের ডাল রাখা হয়, যেটা স্প্রিঙের মতো ইশারায় নাচে। এই বিমানের মাঝখানে কাঠের কঞ্চি দিয়ে একটু উঁচু মতন একটা জায়গা বানিয়ে দেওয়া হয়, যার ওপর রেশমী কাপড় দিয়ে ঢেকে রুপো অথবা গঙ্গা-যমুনা-এর মুখ সেঁটে দেওয়া হয়। এটাই দেবতা। গ্রামের দুঃখ-সুখ আর সমস্ত ব্যাপারে দেবতার রায় নেওয়া জরুরি। দেবতা কখনও কারও মাথায় ভর করে কথা বলে, কখনও চিঠি দিলে তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। তবে সব থেকে বেশি বাহনেব কাঁধে চেপে বিমানের নড়ার সংকেতে কথা বলে। যদি বিমান প্রশ্নকর্তাব সামনের দিকে ঝোঁকে, তবে তার অর্থ 'হ্যাঁ', যদি অপর দিকে ঝোঁকে তবে 'না'। যদি ওপবে-নীচে লাফায় তো খুব ভাল আর যদি অত্যধিক লাফায় তবে দেবতা রুষ্ট হয়েছে। চিনীব দেবতার নাম নরেনস (নারায়ণ)। দেবতা যথেষ্ট ধনী, গ্রামেব সবথেকে ভাল খেতটা তার। এ ছাডা সে যখন চায়, তখন নতুন কর উসুল করে। খুশির সঙ্গে যে দান-দক্ষিণা পাওয়া যায তার কথা আলাদা। সময়ে-সময়ে দেবতার নিজস্ব উৎসব হয়ে থাকে, যে সময় দেবতার সমস্ত রোজগার পিঠে-লুচি আর অন্য মিষ্টি বানিয়ে প্রসাদ বিতবণে খরচ করা হয়। কখনও কখনও দেবতা বনভোজন করতেও যায়, তখন দুটি বাহনের অতিরিক্ত বাজনদার আর তলোয়ারধারীদের পুরো পল্টন সঙ্গে সঙ্গে যায়। চিনীতে কোলী (হরিজন)-দের নিজেদের আলাদা বিষ্ণু মন্দির রয়েছে, যাতে ন্যম্ শূ (তিব্বতী দেবতা, বুদ্ধমূর্তি)-র থাকার সম্ভাবনা আছে, তবে তাকে কয়েক বছব পরে পরে ভাণ্ডার থেকে বার করা হয়। এইগুলি ধাতুমূর্তি এবং পুরনো রীতি অনুযায়ী এদেব ওপর হস্তলেখও থাকা উচিত।

ডিম যদিও খুব সুলভ ছিল না, তবুও পাওয়া যেত। ৪ জুন পাতলা পায়খানা হলো, মনে হলো আমাশয় হয়েছে। পায়খানা কম করতে খাটে শুযে পড়া দরকার বলে মনে হলো। এই সময় বই না পড়ে জীবনের ওপর দৃষ্টি পড়তে লাগল—'জীবন নিঃসার তো নয়, যদিও তাকে স্বর্গে তোলা ঠিক নয়। জীবন-পথ প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থ প্রয়োজন। আর তা যদি সমধর্মী লেখকের হয় তবে তা খুবই সহায়ক হতে পারে। অতীত কি সত্যসত্যই স্বপ্ন? না। তার স্মৃতি সুখের হয়। হ্যাঁ, কখনও কখনও তা দুঃখজনকও হয়। এই কথা স্বপ্নের বিষয়ে নয়। আর বর্তমান সময়ে তো ভোগ্যবস্তু কঠিন জিনিস। ব্যক্তিগতভাবে একটি মানুষের মন কখনও অবসাদগ্রস্ত হয়, নিরাশায় ভরে যায়, কিন্তু তা দিয়ে সকলের জীবনের মূল্যায়ণ করা উচিত নয়। যৌবনে মানুষের হাতে প্রচুর সময় থাকে, আর প্রাচুর্যের জন্য মানুষ তা খরচ করতে গিয়ে মিতব্যয়িতা করতে পারে না, যদি

করত তবে অভিজ্ঞতা আরো বেশি হতো, এবং অভিযান করতে পারত। কিন্তু যদি কেউ তার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে একটা জীবনকে দৃষ্টান্ত করে তোলে, তবে অপরে কি তা কাজে লাগাবেই? সম্পূর্ণভাবে তো নয়, তবুও তার দ্বারা কিছুলোকের কল্যাণ নিশ্চয়ই হবে। বাইশ বছর আগে আমি এখানে দু-একদিন ছিলাম। আজ প্রথম অর্ধেক মাস কেটে গেল। আমার মধ্যে কি প্রভেদ হয়েছে? তখন একরকম অভিযান করতে বেরিয়েছিলাম। কাশ্মীরের পথে লাদাখ গিয়েছিলাম, তারপর তিব্বতের পশ্চিমভাগে ঢুকে এখানে বেরিয়ে এসেছিলাম। অপরিচিত দেশ ছিল, ভাষাও ছিল অপরিচিত। শুধুমাত্র এই শরীরই একরকম আমার উপায় ছিল। তবে সেই সঙ্গে যৌবনের উৎসাহ ছিল। আজও কখনও কখনও উৎসাহ জেগে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা হয়—সম্পূর্ণ করার সময়ের দিকেও মনোযোগ দাও।'

পরের দিন (৫ জুন)ও শুয়ে রইলাম। মন বসানোর জন্য বাইবেল পড়তে লাগলাম। মুসার পাঁচটি পুস্তক (তৌ রেত) আর জিহোভার পুস্তকটি শেষ করে ফেললাম। এটি ইহুদি জাতির একপ্রকার ইতিহাস। ইহুদীরা মেসোপটেমিয়া থেকে বেরোয়, প্রথমে ফিলিস্তিন যায়, তারপর ফিলিস্তিনের বিজেতা মিশরীয়দের হাতে পড়ে তাদের দেশে রাখালি করতে থাকে। ইয়াকুবের নামই ইসরাইল ছিল, যেজন্য ইহুদীদের বনীরাইল বলা হয়। ইয়াকুবের পুত্র ইউসুফ ইসরাইল গিয়েছিল। তারপর তার পরিবারের লোকেরাও সেখানে যায়। কে জানে কত প্রজন্ম ধরে তারা সেখানে সুখ-দুঃখ ভোগ করতে থাকে, কিন্তু সর্বদাই তারা ফিলিস্তিনের স্বপ্ন দেখেছে। মুসা আর তাব ভাই হারুন তাদের বার করে ফিলিস্তিনে পৌছে দেয়। মুসা রাজনীতিজ্ঞ ছিল, যোদ্ধা ছিল না। যোশুয়া যোদ্ধা ছিল, যে ইহুদীদের ত্রাণকর্তা হয়েছিল। উপজাতীয় সমাজ ছিল। সমানে যুদ্ধ হতো। যুদ্ধে নারী এবং শিশুদেব হত্যা করতেও তারা পিছপা হতো না, বিশেষ করে বয়স্ক নারীদের তারা একটুও দয়া দেখাত না। ইহুদীরা মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিল। মূর্তি বানানোর জন্য অধিক উন্নত সংস্কৃতির প্রয়োজন ছিল। বয়স্ক নারীদের কাছ থেকে তাদের সবসময় ভয় ছিল যে তারা জিহোভার পূজা ছেড়ে মূর্তিপূজা করতে শুরু করবে। মূর্তি এবং দেবতা ধ্বংস করাকে তারা পুণ্যের কাজ মনে করত। এই ব্যাপারটা ইসলাম তাদের কাছ থেকেই শিখেছে। মুসার পাঁচটি পুস্তক পড়তে আমার কাছে আরোই চিত্তাকর্ষক বোধ হচ্ছিল। তার মধ্যে জিহোভা আব তার বসার বাক্সটি কিন্নরের দেবতা আর তার বিমানের মত মনে হচ্ছিল। যখন জিহোবা ইহুদী পয়গম্বরদের সঙ্গে কথা বলছিল, আমার এখানের দেবতার তার জ্যেষ্ঠ কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলার কথা মনে পড়ছিল।

৯ জুন আগের মত পাঁচ মাইল হাঁটতে গেলাম। খুব ক্লান্তি আর দুর্বলতা বোধ হলো। পেট এখনও পরিষ্কার হয়নি। দিনের বেলা দই-ছাতু খেলাম আর সন্ধেবেলা ছাতুর নিরামিষ সুপ খেলাম। তেষ্টা খুব বেশি পেত, যদিও পেচ্ছাপ বেশি বার যেতে হতো না, তাই পেচ্ছাপে চিনি বেশি থাকার-সন্দেহ ছিল না। ৫৫-এর ওপরে বয়স হয়েছিল, তার প্রভাব পড়াই উচিত। যদি মধুমেহ না হতো তাহলে অন্য কোনোভাবে দুর্বলতা আসত। হজম-শক্তি কমে যাওয়া আর পেট পরিষ্কার না হওয়াটাও সম্ভবত তারই লক্ষণ। তবুও

সংযমী হওয়াটা দরকার ছিল, যাতে এই জীবনে যথাসম্ভব বেশি কাজ করা যায়। আমি টের পাচ্ছিলাম, একজন স্থায়ী সহযাত্রী থাকা অতি আবশ্যক, যে লেখার কাজটা করতে পারে। লোক তো পাওয়া যায়, কিন্তু স্থায়ী যে হবে তাতে সন্দেহ আছে। সেই সঙ্গে ইনসুলিনের ইনজেকসন দিতে পারলে, আরো ভাল হয়। ৬ জুন লিখেছিলাম—'প্রতিবছর দু হাজার পাতা লেখার পরিকল্পনা করা উচিত। কাজ যদি না হলো, তাহলে বেঁচে থেকে কি কল?'

চিনীতে থাকতে পরিভাষার কাজের দিকে মন পড়ে থাকত। অনেকদিন পরে বিদ্যানিবাস আর মাচবেজীর চিঠি কলকাতা থেকে এলো। সুনীতিবাবু আমাদের কাজের প্রশংসা করেছেন আর কাজে সাহায্য করার জন্য চিঠি দিয়েছেন। 'শাসন-শব্দকোষ' টাইপ করা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্রেসে পাঠানোর আগে একবাব সেটা দেখে নেওয়া দরকার ছিল। এতো দূরে দুজনকে ডেকে পাঠানো সহজ ছিল না, তাই ভাবলাম যে, জুলাই-এর শেষে কোটগড়ে নেমে যাই। এখন খুব গরম হবে, তাই সমতলে নামা ঠিক হবে না, সেখানেই ডেকে নিয়ে একমাস থেকে প্রেস কপি সংশোধন করে নেওয়া যাবে।

তিব্বত সীমান্তে

কিন্নর দেশে বর্ষা খুব কম হয় বলে যাত্রা করায় কোনো অসুবিধে ছিল না। কিন্নরের সীমায় অবস্থিত ভারতের শেষ গ্রাম নমগ্যা পর্যন্ত যাত্রা করে নেওয়াটা আমরা ভাল মনে করলাম। ১২ জুন পুণ্যসাগর যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস বাঁধতে শুরু করলেন। তহসিলদারের এক চাপরাসি সাহায্য করল, আর এমন একজন লোক বেছে দিল যে রাস্তায় লোক আর ঘোড়া দুটোরই ব্যবস্থা সহজে করতে পারবে।

১৩ তারিখ সকালে তখনও পেট একটু খারাপই ছিল, তাই অল্প দই খেয়ে রওনা হলাম। এখান থেকে ঘোড়া নিলাম না, কারণ পরের বিরতিস্থল পংগী ছিল ৬ মাইল দূরে, যা আমাদের প্রতিদিনেব হাঁটার থেকে মাত্র এক মাইল দূরে। দুজন ভারবাহক মাল নিয়ে চলল। প্রায় সমতল তিব্বত-ভারত সড়ক, যেটা শিমলা থেকে তিব্বতের সীমা পর্যন্ত যেত। ইংরেজরা এটা পশ্চিম তিব্বত হাতিয়ে নেওয়ার মনোভাব থেকে বানিয়েছিল, আর সেইজন্যেই এদিকের সীমাকে নিজেদের নক্সায় নির্দিষ্ট করেনি। রাস্তা সবুজ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছিল। দেবদারু আর নেওজা (পাইন)-র গাছ ছিল তার মধ্যে। দেবদারুর বাইরের ছাল শুকনো পাপড়ির মত হয়, আর নেওজার হয় সবুজ। দুটোরই গাছ, ডালাপালা আর পাতা সুন্দর হয়, পাতা বারোমাস সবুজ থাকে। ছালের সৌন্দর্য নেওজার বেশি। নেওজারই ফল থেকে চিলগোজা বেরোয়। এখানে তাকে বেশি মূল্যবান মনে করা হয়।

পংগী শিমলা থেকে ১৪৪ মাইল ৬ ফার্লং দূরে। একদম শেষে গিয়ে সামান্য চড়াই পেলাম। অল্প বিশ্রাম করার পর লোক নিলাম। লোকের মজুরি মাইল প্রতি দু-আনা নির্দিষ্ট, পরের বিরতি-স্থল রারং পর্যন্ত ১২ আনা দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি এক টাকা করে দিলাম। ঘোড়াওলা ৮ মাইলের জন্য ৪ টাকা চাইছিল। আর দয়া দেখিয়ে এক টাকা ছেড়ে দিতে বলল। আমি ঘোড়া নিলাম না। শুধু এক জায়গায় বেশি চড়াই ছিল, তাছাড়া জমি প্রায় সমতল ছিল। আজ ১৪ মাইল হেঁটেছিলাম, তাই রারং পৌঁছতে পৌঁছতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। পংগী আর রারং এই দুটি গ্রামের লোক জল জল করে হাঁক পাড়ছিল, আর পাশেই খাদে কত জল বেকার বয়ে যাচ্ছিল। দূর থেকে খাল কেটে জল নিয়ে আসা তাদের সাধ্য ছিল না।

১৪ জুন গ্রামের ভেতরে মন্দিরগুলি দেখতে গেলাম। এমনিতে চিনীতেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আছে তবে রারং তো পুরোপুরি বৌদ্ধ গ্রাম। একটি মন্দিরের দেয়ালে সম্প্রতি আঁকা চুরাশি-সিদ্ধর ছবি ছিল। কিছু পরে ঘোড়াও এসে পড়ল। আর তাতে চড়ে এখান থেকে সাত মাইলের কাছাকাছি জংগীর উদ্দেশে রওনা হলাম। জংগীর বসতি অনেক পুরনো , গ্রামও বড়। কাছেই শতদ্রুব পারে মোরং গ্রাম, একটি ছোট টিলার ওপর সেখানকার 'পাণ্ডব'দের কেল্লা দেখা যাচ্ছিল। কনৌরে বেশ কয়েকটি ভাষা প্রচলিত আছে, এখানকার ভাষা ভিন্ন। তবে চিনীতে প্রচলিত হম্‌কদ্‌ ভাষা সব জায়গাতে চলে।

লিপ্পা (৮৯০০ ফুট)—লিপ্পার অবস্থান রাস্তা থেকে একটু সরে গিয়ে, কিন্তু আমরা তার বিষয়ে যে সব কথা শুনেছিলাম, তার জন্যে সেখানে যাওয়া প্রয়োজন বলে মনে হলো। ঘোড়া আর দুজন ভারবাহক পাওয়া গেল। ভারত-তিব্বত সড়ক ধরে তিন মাইল গেলাম। তারপর বাঁদিকের রাস্তা ধরলাম। প্রথম দু মাইল চড়াই পড়ল, আর রাস্তাও খুব কঠিন। সব থেকে বাজে ব্যাপার তখন হতো, যখন তীক্ষ্ণ ঢালু জমির ওপর দিয়ে যেতে হতো, ভয় লাগত। যদি পা পিছলায় কোথায় গিয়ে পড়ব কে জানে! পার্বত্য-যাত্রা তারাই ভাল করতে পারে যারা ভাল গাছে চড়তে পারে এবং শরীর যাদের হাল্কা। এই দুটোর অভাবের সঙ্গে সঙ্গে এখন আমার বয়সের বোঝাও বইতে হচ্ছিল। যাইহোক, বেরিয়ে যখন পড়েছি তখন পিছনে ফেরা সম্ভব নয়। শেষপর্যন্ত পাহাড়ের একপ্রান্তে পৌঁছলাম, যেখান থেকে লিপ্পার বড় গ্রাম সামনে চোখে পড়ছিল। বনবিভাগের কোয়ার্টার পিছনে পড়ে রইল। কাঠের পুল দিয়ে একটি অপেক্ষাকৃত বড় নদী পার হলাম। এরপর ছোট স্রোতের পুল পার হলাম। এখানে অনেকগুলি জলচক্র লাগানো ছিল, দেবরাম জ্যোতিষী লিপ্পার বাসিন্দা ছিলেন, যার পঞ্জিকা তিব্বত আর লাদাখেও প্রচলিত আছে। তাঁর ছেলে সোনম্ আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে এলেন, আর সঙ্গে করে গুম্ফা (বিহার)-তে নিয়ে গেলেন। এটি তাঁর বাবা তৈরি করেছিলেন। চড়াই খুব কষ্টকর ছিল, তবে আমি ঘোড়ায় চড়ে গেলাম। গুম্ফাটি গ্রামের ওপরে মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত, যার ওপরেও ঘর আছে। একটি বড় ঘরে খাট পাতা হলো, যেখানে মৈত্রেয় (ভাবী বুদ্ধ)-র মূর্তি ছিল। প্রথমে বড় আনন্দ হলো, পরে সেটা অনুতাপে পরিণত হলো, যখন ছোট ছোট পোকার কামড়ে ঘুমের

দফা রফা হলো। জাপানী শিল্পীরা সারনাথ মন্দিরের দেয়ালে বুদ্ধের জীবনসম্বন্ধী যে ছবি বানিয়েছিল সেগুলির কার্ড সুলভ ছিল। তাই দেখে লাদাখী শিল্পী এখানের দেয়ালগুলি চিত্রিত করেছিল, যা খুব খারাপ হয়নি। লাসার কন্-জুর গ্রন্থসংগ্রহ রাখা ছিল, আর তের্গীর বৃহৎসংগ্রহ তন্-জুর এখন রাস্তায়। নীচে গ্রামের বাইরে আরো একটি কন্-জুরশালা ছিল যেখানে কন্-জুরের পুঁথিগুলি রাখা ছিল। সেদিন বিশেষ উৎসব ছিল। প্রথমে পিঠে বই চাপিয়ে স্ত্রী-পুরুষের মিছিল বেরোল আর শেষে কন-জুরশালার সামনে নরনারী নৃত্য করতে শুরু করল। মন্দিরের সদাব্রত থেকে মদ বিতরণ করা হচ্ছিল। আর নাচ তো ন—হাত ধরাধরি করে হাঁটা। একদিকে ছিল মেয়েদের পঙ্ক্তি, অন্যদিকে পুরুষদের।

১৬ জুনও লিপ্পাতে থাকলাম। কনৌরের সবথেকে ধনী বংশীলালজী লিপ্পার বাসিন্দা এবং স্থানীয় জেলদার[১] ছিলেন। কয়েক প্রজন্ম ধরে তাঁদের পরিবারে কনৌরের বাইরের পাহাড়ী স্ত্রীদের সঙ্গে বিবাহের রেওয়াজ আছে, কারণ তাঁদের উচ্চকুলীনা মনে করা হয়। লোকনৃত্যে কাল তাঁরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। উপত্যকাটিকে দেখলে মনে হয় আগে এখানে বসতি বেশি ছিল। অনেক পুরনো খেতের চিহ্ন পাওয়া যেত, সামনে পশ্চিমের ঢালে কিছু দেবদারুর শিকড় পাওয়া যায়, এখন এই ঢাল একদম ন্যাড়া। ওপরে একটা কেল্লা আছে যেখানে উদুখলের পাথর পাওয়া যায়। শুধু চাল কোটার কাজই নয়, একসময় তাতেই আটা পেষা হতো। এদিক দিয়ে গেলে চারদিনে মানুষ স্পিতী পৌঁছতে পারে। প্রাচীনকালে স্পিতীর লোকেরা এবং সুযোগ পেলে এখানকার লোকেরাও লুটপাট করতে যেত—একদিনের রাস্তা অসরঁগ-এ জলচক্রের কলের পাথর পাওয়া যায়। আক্রমণকারীদের আসার খবর জায়গায় জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে জানানো হতো। জিজ্ঞেস করে জানলাম যে, এখানেও খছেরোম্খং (মুসলমানী কবর) পাওয়া যায়। এখানকার লোকেরা একথা ভুলে গেছে যে, শুধু মুসলমানরাই নয়, এক সময় তাদের পূর্বপুরুষরাও মৃতদের কবর দিত। পুরনো বাড়ির এবড়ো-খেবড়ো পাথরের দেয়ালও কখনো বেরিয়ে পড়ত। গুম্ফা বানানোর সময় তিনটি মাটির বাসন বেরিয়েছিল। আজকাল লিপ্পাতে মাটির বাসন বানানোও হয় না। তাদের ব্যবহারও নেই। আট বছর আগে নম্বরদার -এর বাড়ির ঠাকুঘরে অসাবধানে আগুন লেগে যায়, তার ফলে সম্পূর্ণ গ্রাম নষ্ট হয়ে যায়। এইসব পুরনো গ্রামে প্রাচীনকালের কত জিনিস পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু বাড়িগুলিতে বেশির ভাগ কাঠ থাকায় যখন-তখন এমনি আগুন লেগেই যায়। নতুন করে বাড়ি বানানোর জন্য পঞ্জীরাম খেতে ভিত খুঁড়তে শুরু করে। সেখানে মৃতের ঘর বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে দেয়াল মনে হয়েছিল। গুপ্তধনের খোঁজে খোঁড়ার পর ঘর বেরোয়। সেটির দেয়ালে নীচে নামার জন্য পাথরের পাদানি ছিল। ঘরটি ওপর থেকে পাথর দিয়ে ঢাকা ছিল। হালেই জলের কুয়ো বানাতে গিয়ে একটি কবর থেকে নরকঙ্কাল বেরিয়েছে জেনে আমার ঔৎসুক্য বেড়ে গেল। জল লেগে কঙ্কালটি অনেকটাই গলে গিয়েছিল, খুলিও ফাটা

[১] যিনি কয়েকটি গ্রামের তত্ত্বাবধায়ক।—স.ম.

ছিল, কিন্তু সেটি দীর্ঘকপাল ছিল, অর্থাৎ আজকের মানুষের মত আয়তকপাল নয়। এখানে কি খস[১]-রা থাকত? কনৌররা নিজেদের খোসিয়াও বলে, কিন্তু তাদের ভাষা সেই কিরাত বংশের, যাদের ভাষার অবশিষ্ট চম্বা থেকে আসামের নাগা পর্যন্ত সমস্ত হিমালয়ে পাওয়া যায়, আর পণ্ডিতেরা যাকে মোন-খ্মের বলেন।

কবরে কোনো জিনিস পাওয়া গেল না। আমি নতুন তৈরি বাড়ির দিকে যাবার কথা ভাবছিলাম, এমন সময় বাড়ির মালিক একটি কাঁসার অর্ধগোল বাটি আর একটি মাটির চোঙ নিয়ে এলো যেগুলো ওই কবরে পাওয়া গেছে। সম্ভবত কোনো গহনাও ছিল কিন্তু পঞ্জীরাম তা অস্বীকার করল। বাটিটা জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল আর চোঙের মুখ এত সংকীর্ণ যে আঙুলও তার ভেতরে গলছিল না। এর মধ্যে মদ আর বাটিতে খাবার দিযে যে মৃতের সঙ্গে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৭ জুন জেলদার বংশীলালের বাড়িতে প্রাতরাশ করলাম। তাঁর চার ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই মারা গেছে। বংশীলালজী নিজে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। মেজভাই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে ঘরের কাজ করছে, সব থেকে ছোট ভাই রামপুরের হাইস্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়ছিল। এই ঘর লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতীর আরাধনাও করতে চায়, এ তারই প্রমাণ। মায়ের হাত গলা কান সোনায় ভরে উঠছিল। তিনিও কোচী (নীচের পাহাড়ী) আর তাঁর বউও কোচী। এঁদের বাড়ি খুব খুব পুরনো। কিন্তু রাতে হঠাৎ প্রচণ্ড আগুন লাগে এবং কাগজপত্র, মূর্তি আর পুঁথিগুলো পর্যন্ত পুড়ে যায়, কোনবকমের মানুষ তাদের প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়।

কনম্—লিপ্পা থেকে কনম্-এর দিকে রওনা হলাম, যা আট-ন মাইলের বেশি দূরে নয়, কিন্তু চড়াই ভীষণ কঠিন। কোথাও কোথাও সিঁড়ি আছে, যেখানে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া সম্ভব নয় তাই অনেকটাই পায়ে হাঁটতে হলো উৎরাইও এমন কঠিন যে ঘোড়া ব্যবহার করা গেল না। টিলায় পৌঁছে সেখান থেকে লবরং আর কনম্-এর গ্রাম দেখা যাচ্ছিল কিন্তু তা ছিল অনেক দূরে। উৎরাই-এর পর উৎরাই ছিল। এখন দেবদারু ছিল কিন্তু তত ঘন নয়। লবরং-এর অর্থ হলো গুরু অথবা লামার মহল। সাততলা, ২০ হাত চওড়া, ২৫ হাত লম্বা এখানের দুর্গকে তো ঠাকুরের মহল বলা হয়। কাটা পাথর আর কাঠের সুন্দর জোড়া দেওয়া দেওয়াল। ভেতরে বসে তীর মারার জন্য ছিদ্র করা ছিল। সব থেকে ওপরের তলা ভেঙে পড়ছিল। মানুষের মনে এখানের ঠাকুরের খুব ক্ষীণ স্মৃতি আছে। মধ্যযুগে তিব্বত আর কনৌরের মানুষের মধ্যে লুঠপাটের প্রতিযোগিতা লেগে থাকত। তখন প্রয়োজন পড়লে মানুষ এই দুর্গে এসে আশ্রয় নিত।

দুর্গর কাছেই আছে সক্রনশু দেবমন্দির, যেটি পাথর দিয়ে তৈরি। ওপং সিংহর খানদান অনেক পুরনো, কিন্তু এখন তা সন্তানহীন। কনৌরে পাণ্ডব বিবাহের রেওয়াজ আছে, যে কারণে জনসংখ্যা বাড়তে পারে না, আর লড়াই ও সন্তানহীনতার জন্য তা কমার সম্ভাবনা

[১] গাড়োয়াল প্রদেশের প্রাচীন নাম অথবা তার বাসিন্দা।—স·ম

থাকে। লবরং-এ ৬৫টি পরিবার ছিল, আগে হয়তো এর থেকে বেশি ছিল। প্রায় দু মাইল নামার পর আমরা রাস্তা পেয়ে গেলাম, তারপর আরো কিছুদূর হেঁটে কনম্-এর ডাকবাংলো পেলাম। কনম্ ১০,০০০ ফুট থেকে ৯৪৭০ ফুট উচ্চতায় এবং শিমলা থেকে ১৭০ মাইল ৬ ফার্লং দূরত্বে অবস্থিত। এখানেও খ-ছে-রো-খং (মুসলমানদের কবর) আছে বলে খোঁজ পেলাম। রাস্তা বানাতে আর খেতে মাটি কোপাতে গিয়ে অনেক কঙ্কাল পাওয়া গেছে। কিন্তু লোকেরা মনে করে যে সেগুলো মুসলমানের। তারা কি করে জানবে এই কঙ্কালগুলি থেকে তাদের এবং তাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাসের ওপর অনেকখানি আলোকপাত হতে পারে। কন্-জুর দেবালয়ে তিব্বতী ভাষায় ভারতীয় গ্রন্থের দুটো বৃহৎ সংগ্রহ কন্-জুর আর তন্-জুর রাখা আছে। জীবিকার জন্য একটি খেতও ছিল, যার রোজগার থেকে বাড়ি মেরামত আর বছরে একবার যে সব ভিক্ষুরা পাঠ করে তারা খাবার পায়। কনম্ -এর দেবতা ডবলা খুব ধনী এবং শক্তিশালী। ফেরত যাত্রায় ২৬ জুন আমি কনম্ ভাল করে দেখি। তখন নম্বরদারের মাধ্যমে ডবলার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল, যা খুবই আকর্ষণীয়। দেবতাদের অনাচার দেবতাদেরই সাহায্যে দূর করা যায়। চিনীর নিচে কোঠীর দেবী সমস্ত কনৌর-এর মহা-মহিমান্বিতা দেবী। সে শত শত ছাগবলি গ্রহণ করে, বুদ্ধের ধর্ম মানে না। চিরকুমারী বলে তার ক্রোধ খুব বেশি। আমি সেদিন এই উদ্দেশ্য নিয়ে ডবলা দেবতার সঙ্গে কথা বলতে চাইলাম যে, ডবলা আর দেবীর বিবাহ হয়ে যাক। আর বৌদ্ধ পতির প্রভাব পত্নীর ওপর পড়ুক। আমি হিন্দিতে বলছিলাম আর নম্বরদার অগরজিৎ তা কনৌর ভাষায় ডবলাকে বলছিলেন। নম্বরদার বললেন, 'আমাদের দেবতা হিন্দি' বুঝতে পারেন।' আমিও জানতাম যে সে দুনিয়ার সমস্ত ভাষাই বুঝতে পারে। কিন্তু দেবতার সামনে এমন কোনো কথা যাতে বেরিয়ে না যায়, যার থেকে তার রেগে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাই আমি নম্বরদারকেই দোভাষী বানালাম। আমার কথামত নম্বরদার জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কোঠীর দেবীকে বিয়ে করবেন তো?

ডবলা তার মাথা দুদিকে জোরে নাড়াল, যার অর্থ হল, 'আমি বিয়ে করব না।'

নম্বররদার—বিয়ে করায় আপত্তি কিসের, মানুষের মত দেবতারাও বিয়ে করেন। আপনি কি পুরোপুরি আপত্তি জানাচ্ছেন?

আবার মাথা নড়ল, অর্থাৎ 'না।'

নম্বরদার—তাহলে কোঠীর চণ্ডিকাদেবীর বিয়ে কার সঙ্গে হবে? তিনি অনেক বড় দেবী, তাঁর সমান কোনো দেবতা নেই, চিনীর না, খবাঙ্গীর না, পংগীর না, রারং-এর না, জংগীর না, লিপ্পার না আর লবরং-এরও না? চিনীর নরেনকে কি বিয়ে করা উচিত?

—না, নিকট-সম্বন্ধী, বিয়ে হতে পারে না।

নম্বরদার—ডম্বরসাহেব, চিনীর দেবতা নারায়ণের সঙ্গে না হয়ে কি সুঙ্গরার গ্রস মনসির-এর সঙ্গে হওয়া উচিত?

—না, সেও সম্বন্ধী।

নম্বরদার—আর কামরুর বদ্রীনাথের সঙ্গে? তারও রাজার লাখেরাজ সম্পত্তি আছে আর দেবীরও লাখেরাজ সম্পত্তি আছে।

—হ্যাঁ, হতে পারে। খুশিতে লাফিয়ে ডবলা আনন্দ প্রকাশ করল।

নম্বরদার আরো জিজ্ঞেস করায় ডবলা চণ্ডিকার বিয়ের আশা প্রকাশ করল কিন্তু পরে দেবীকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে, সে এই বন্ধনে জড়াতে রাজি নয়। নম্বরদার একই সঙ্গে ডলবা দেবতার মহামন্ত্রীও। জিজ্ঞেস করায় ডবলা আয়ব্যয়ের খরচের হিসেব চাইল, আর বলল, যে দুবছর ধরে হিসেব হয়নি।

কনম্ তিব্বতের এক প্রসিদ্ধ লামা লোচবা-রিন্-ছেন্-জড়পো (রত্নভদ্র অনুবাদক)-এর গদি-স্থান। রত্নভদ্র একাদশ শতাব্দীতে জন্মেছিলেন। তিব্বতের সবথেকে বড় পণ্ডিতদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। সংস্কৃতের অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ তিনি তিব্বতীতে করেছিলেন। তিব্বতে যখন মহাপুরুষদের অবতার বলে স্বীকার করার নিয়ম শুরু হলো, আর প্রত্যেক বিহারের গদিতে অবতারী মোহান্তরূপে স্বীকৃত ছেলেদের বসানো হতে লাগল, তখন এই লোচবারও অবতার জন্মাল। লোচবার গুম্ফাকে আগের বার উপেক্ষিত বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু এবার তার অবস্থা ভাল দেখলাম। সেখানে কিছু ভিক্ষুর সঙ্গে দেখা হলো, যাদের মধ্যে অনেকে তিব্বতে লেখাপড়া করে এসেছিল।

স্পূ (৯২০০ ফুট)—১৮ জুন আমরা কনৌরেরের অন্য একটি বড গ্রাম সুং নম্ দেখার আগ্রহ নিয়ে রওনা হলাম। কনম্-এর পরে কিছুটা দূরে এখন গাছের খুব অভাব হয়েছে। তিব্বত একটা ন্যাড়া পাহাড়ের মত ছিল। রাস্তা বেশিরভাগই সমতল। শুধু শ্যোশো খাদের কাছে দু মাইল উৎরাই পেলাম। খুব রোদ ছিল আর এখানে তা খুব সুখকর বলেও মনে হচ্ছিল না। খাদের ওপর লোহার পুল ছিল। এখানে যে নদী বয়ে চলেছিল, সেটাও স্পীতির সীমান্ত পর্বত থেকে আসছিল। পুল পার হয়ে নদীর বাঁদিকের পার ধরে ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম। কিছুলোক, যাদের মধ্যে বেশির ভাগই স্ত্রী, রাস্তা মেরামত করছিল। দু-মাইলের কাছাকাছি যাবার পর শ্যোশো গ্রাম পেলাম। এখানেই ভারবাহক আর ঘোড়া বদলানোর ছিল। ঘোড়া ভাল পাওয়া গেল না। চডার সময় তাকে বিগডে যেতে দেখে চড়ার ইচ্ছে ছাড়তে হলো। এক মাইল যাবাব পর বুঝতে পারলাম, রাস্তাটা মেরামত করা হয়নি এবং তা রোমাঞ্চকর। আমি শরীরের দিক থেকেও দুর্বল ছিলাম। সুং-নম্-এর লোকেরা প্রতীক্ষা করছিলেন, কিন্তু সেখানে যাবার চিন্তা ছেড়ে আমি ফিরে এসে রাতের মতো শ্যাশোর বিস্ট অমরনাথের বাড়িতে থেকে গেলাম। তিনি আগেকার অত্যন্ত ধনী ও প্রভাবশালী বাড়ির মানুষ। সুং-নম্-এর ওপরে গ্যাপোং-এ তাঁর আরো ভাল বাড়ি ছিল। অমরনাথের পিতা চরণদাস, পিতামহ ইন্দরদাস আর প্রপিতামহ নংতারাম ছিলেন। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে কনিয়ম-এর লাদাখ সীমান্তে নংতারাম পথপ্রদর্শক ছিলেন। ইন্দরদাস রাজার প্রভাবশালী অমাত্য ছিলেন। তাঁর সময়ে এই বাড়ির প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি হয়। বিশ বছর আগে পর্যন্ত অবস্থা খরাপ ছিল না। তারপর বাড়িতে লোক পাগল হতে শুরু করল। দুটো ভাই মারা গিয়েছিল। সংসারচন্দ গ্যাপোং-এ পাগল হয়ে পডে আছে আর অমরনাথ এখানে। তখন অমরনাথের বয়স ছিল ৪৮ বছর, বাড়িতে কোনো সন্তান ছিল না। স্বামী, স্ত্রী, মা এই তিনটি প্রাণী। এখনও পেট চালানোর মত সম্পত্তি ছিল। কিন্তু লোক

যত্র-তত্র লুঠে খাচ্ছিল। এখন এই বংশ নির্মূল হবার মুখে। কয়েক প্রজন্ম ধরে পাণ্ডব বিবাহ হবার দরুন বংশ বাড়েনি, এরপরে শ্যাশোর বিস্ট-এর নাম উচ্চারণ করার মত কেউ থাকবে না। সেই বাড়ির ইঁট-কাঠ থেকে দুঃখ ঝরে পড়ছিল। অমরনাথ খুবই আগ্রহের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কখনও বুদ্ধিমানের মত কখনও নিবুদ্ধির মত কথা। এই বছর খুব বেশি বরফ পড়েছিল,তাই পাশ দিয়ে যে ছোট খাদটা গেছে তাতে অনেক জল ছিল, না হলে এটা শুকিয়ে যায়। বিস্ট-এর বাড়িই শুধু নয়, সমস্ত গ্রামটাই ছিল শ্রীহীন।

১৯ জুন ভারবাহকদের জন্য প্রতীক্ষা না করে আমি রওনা দিলাম। চাপরাসি তাদের ব্যবস্থা করে আমার সঙ্গে যাবার জন্য তৈরি ছিলই, পুণ্যসাগরও সঙ্গে ছিল। খাদের ওপর পুল পর্যন্ত আগের রাস্তাই ছিল, তারপর কিছুটা সমতল জায়গা দিয়ে রাস্তা চলল। একটা টিলা পার হওয়ার জন্য নদীর ধার ছেড়ে চড়াইতে উঠতে হলো। তারপর বাংলোর দিকে চড়াই থাকল। স্পূ একটা বড় গ্রাম। এই গ্রামে অনেক পাড়া আছে। শিমলা থেকে এটা ১৮৬৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এর নাম স্পূ কেন হলো? কিছুলোক জানাল যে, এটা 'যুগ-এর অপভ্রংশ', 'খুন্নু যুগ'-এর অর্থ হলো' কনৌর-এর গুহা'। স্থানীয় লোকের ভাষা তিব্বতী। এখন পর্যন্ত হিন্দিতেই কাজ চালাচ্ছিলাম, যা বোঝার মত লোক কনৌর পুরুষদের মধ্যে সবাই ছিল না, আর মেয়েরা তো কনৌরী ছাড়াই আর কিছুই জানত না। এখন কারোর সঙ্গে কথা বলতে হলে দোভাষীর দরকার ছিল না, সকলেরই মাতৃভাষা ছিল তিব্বতী। যদিও স্পূই শেষ গ্রাম নয়, কিন্তু তার বিশাল এবং সবুজ খেত আর বড় গ্রাম দেখে মোরাবিয়ান জর্মন মিশনারিরা তাকে ১৮৮৩ সালে নিজেদের প্রচারকেন্দ্র নির্বাচিত করেছিল। রেস্লপ্ দম্পতি প্রথম আসে আর এখানেই মরা যায়। লোকেরা দেখেছে যে, এদের আরো কত মিশনারি নাকি মানুষের সেবা করতে করতে প্রাণত্যাগ করেছে। দেখে দুঃখ হচ্ছিল যে, তাদের কবর এখন লুপ্ত হয়ে গেছে, আর তাদের ওপরে বসানো প্রস্তর-ফলকগুলো বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে।

তখন শ্যাশোর থেকে এদিককার রাস্তা তৈরি হয়নি। সেটা তৈরি হয় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে। ডাকবাংলো হয় ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে। মিশনারিরা একটি ছোট গির্জা বানিয়েছিল, যা এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। মিশনারিরা ছুতোরের কাজ জানত, ছুতোরগিরির সঙ্গে সঙ্গে তারা মোজা-সোয়েটার বোনা আর শিক্ষা-প্রচারের কাজও করেছে। আজ গ্রামের সব মেয়েরাই মোজা-সোয়েটার বুনতে পারে, এ তাদেরই কৃপায় হয়েছে। জার্মান পাদরী মার্কস—যে একজন ভাল ছুতোরও ছিল—এখানে একটা অনেকগুলো বড় কামরার বাংলো বানিয়েছিল, যা এখনও ভাল অবস্থায় আছে। যদিও তার কাঁচ ভেঙে পড়ছিল। এটা থাকায় মিডিল স্কুলের জন্য কোনো বাড়ি বানানোর দরকার হবে না, তবে এখনও তো এখানে কোনো স্কুল নেই। স্পূর লোকেরা সবাই বৌদ্ধ। এখানে বেশ কয়েকটি বৌদ্ধমন্দির আছে। লোচা লাখড় (অনুবাদক দেবালয়)-এ বুদ্ধের সঙ্গে সারিপুত্ত, মৌদ্গল্যায়ন-এরও মূর্তি আছে। একটি মাটির অবলোকিতেশ্বর, একটি কাঠের বোধিসত্ত্ব-প্রতিমাও আছে। লোকেদের স্ত্রী-পুরুষের কোনো চিন্তা নেই। আর বোধিসত্ত্বকে তারা শ্বেততারা বলে মানে। মন্দির কয়েক শতাব্দীর পুরনো। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপালিকার হাতে লেখা পুঁথির ছবি

ভারতীয় কলমে আঁকা বলে মনে হয়। গ্রামের দ্বিতীয় মন্দির দোংগজুর, যেখানে কোটি কোটি 'ওম্ মণি পদ্মে হুম্' মন্ত্র লেখা কাগজ ভরা বেলনাকার বিশাল মানী আছে। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি সময় সময় সেখানে গিয়ে মানী ঘুরিয়ে পুণ্যলাভ করে। কালিম্পঙের পাদরী থর্চিন্ স্পূ-তেই জন্মেছেন। যখন আমি মন্দির দেখতে গেলাম তখন তাঁর নেত্রহীন ভাই মানী চালাচ্ছিলেন। মানীর পিছনে দুটি পুরনো বোধিসত্ত্ব-মূর্তি ছিল, তাদের গঠন ভারতীয় বলে মনে হচ্ছিল, অর্থাৎ তারা সাত-আট শো বছরের পুরনো হবে। এখানেও মাটির বাসনের সঙ্গে খসদের সমাধি পাওয়া যায়, কিন্তু তার কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই, তাই ফরমাশ অনুযায়ী খুঁড়ে বার করা যায় না।

নম্বরদার দেবীচন্দ এখন নম্বরদারী থেকে পদচ্যুত হয়েছেন। তিনি তিব্বতে অনেক ঘুরেছেন। তূচীর সঙ্গে পশ্চিম তিব্বতে গিয়েছিলেন। তাঁর এ কথা তো বিশ্বাস করা চলত যে, তূচী সেখান থেকে বহু হস্তলিখিত পুঁথি ন্যায়-অন্যায়ভাবে হস্তগত করেছিল কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করতে মন চাইত না যে, অধিক বোঝা হয়ে যাবার জন্য ছবিগুলো কেটে বাব করে পুরনো পুঁথিগুলো আগুনে সমর্পণ করা হয়েছিল। কবর থেকে বেরোন হাতে তৈবি একটা মাটির চোঙ পেলাম। সেটা এবং লিপ্পায় পাওয়া জিনিসগুলোও আমি চিফ-কমিশনার সাহেবকে কোনো মিউজিয়ামে বাখার জন্য দিয়ে দিলাম।

স্পূর লোকেদের এখনও বিশ্বাস ছিল যে, দেশে ইংরেজদেরই শাসন চলছে। নোট আব ডাকঘরের টিকিট সেখানে ইংরেজদেরই চলছিল যেখানে এই সাদা-সিধে লোকগুলো কি করে বিশ্বাস করত যে, ইংরেজরা এখন আর নেই? পংগীব দেবতা পর্যন্ত এমন মূর্খ যে একথা মানতে রাজি ছিল না। ঘটনাচক্রে এই সময় স্বদেশী টিকিট আমার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল, সেটা পাঠিয়ে আমি দেবতাকে বোঝানোর চেষ্টা কবেছিলাম। দেবতা বুঝলে তবেই তো ভক্ত বুঝবে।

২১ তারিখও আমরা স্পূতেই রইলাম। মিশনারিদের সময় এখানে ডাকঘরও ছিল। স্কুল তো তার পরেও কতবছর ধরে ছিল, ছেলেদের অভাব হওয়ায পরে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয। স্থানীয় ছেলেদের মাতৃভাষায় পড়ানো হলে ছাত্রের অভাব হতো না। হিন্দিতে পড়ানোর চেষ্টা হলে, দু-তিন বছরে তারা কতটুকু বুঝবে? প্রথম দু বছর তো এখানে আর আশেপাশের তিব্বতীভাষী এলাকায় তিব্বতী ভাষাকেই মাধ্যম করা উচিত। এই উপত্যকায় স্পূ, ডবলিং, নম্‌গ্যা, খব্, টশীগংগ-এ তিব্বতী বলা হয়। পাশের পাহাড়ের সীমা পার করে হঙ্গরঙ্গ-র চাংগী, নাকো, মঙ্গলিং, লিয়ো, চুলিং ইত্যাদি গ্রামও তিব্বতী ভাষী।

নম্‌গ্যা (৯৮০০ ফুট)—স্পূ থেকে আট মাইল দূরে শতদ্রুর বাঁদিকে ভারতের শেষ গ্রাম নম্‌গ্যা। এখান থেকে আরো দু মাইল দূরে অর্থাৎ শিমলা থেকে ১৯৬ মাইল দূরে একটা শুকনো মত নালা আছে, সেটাই হলো তিব্বত আর ভারতের সীমা—এখন চীন আর ভারতের সীমা। কিন্তু নম্‌গ্যার পরে তিব্বতের প্রথম গ্রাম শিপ্‌কীতে শতদ্রুর পার ধরে যাওয়া যায় না, তার জন্য শিপ্‌কীর টিলা পার হতে হয়।

২২ তারিখ আমরা স্পু থেকে রওনা হলাম আর দুপুরের কাছাকাছি নম্‌গ্যা পৌঁছে গেলাম। রাস্তা ভাল ছিল, যাত্রার জন্য ঘোড়াও ছিল। তো সেই রুক্ষ পর্বতমালায় নম্‌গ্যাকে ইন্দ্রপুরীর একটা টুকরো বলে মনে হচ্ছিল। গ্রামের আশেপাশের জমি সবুজে ঢাকা ছিল, খেতে কচি সবুজ যব লাগানো ছিল। খুবানি (চুলী), আখরোটের গাছগুলো সবুজ পাতায় ঢাকা ছিল। এখানেও কিছু আঙুরলতা ছিল, সেগুলো আরো বাড়ানো যেতে পারত। বর্ষা অত্যন্ত কম হলে আঙুর খুব মিষ্টি হয়, একথা বলার প্রয়োজন নেই। জিজ্ঞেস করায় এখানেও খসদের সমাধি থাকার কথা জানতে পারলাম। লোকেরা বলল, এই সমাধিগুলিতে অবশ্যই বাসন পাওয়া যায়। বাসন পাওয়ার অর্থই হলো যে সেগুলি মুসলমানদের কবর নয়, যদিও লোকেরা সেরকমই বিশ্বাস করে। গ্রামের বাইরে একটা জায়গা খোঁড়ানো হলে পচা হাড় পাওয়া গেল। কয়েক বছর আগে এই গ্রাম আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে বহু ঐতিহাসিক জিনিসও হয়তো পুড়ে গিয়েছে। একটি পরিবারের দেবভবনে নেপালে তৈরি ধাতুর তিনটি মূর্তি পেলাম। প্রায় প্রতিটি পরিবারে হস্তলিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ পাওয়া যায়, আর সেগুলির উপসংহারে দাতা ও রাজার নামও লেখা থাকে, যা দিয়ে এখানকার ইতিহাসের ওপর আলোকপাত হয়। তিরিশটি ঘর নিয়ে নম্‌গ্যা গ্রাম। পাণ্ডব-বিবাহ জনসংখ্যা-বৃদ্ধি রোধ করেছে, না হলে আরো বেশি পরিবার হতো।

নম্‌গ্যাবাসীদের মন থেকে কাজাকদের ভয় এখনো দূর হয়নি। মধ্যবিত্ত এবং ধনী কজাকরা বলশেভিক বিপ্লবে অসন্তুষ্ট হয়ে নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করে সিঙ্কায়াং (চীনা তুর্কিস্থান)-এ চলে আসে। সেখানেও ঘর করতে না পারার লুঠপাট করতে করতে তিব্বতে ঢোকে। পশ্চিম-তিব্বতের কিছু গুম্ফাও তারা লুঠ করে। নম্‌গ্যার দিকে তাদের আসার খবর চলে এসেছিল। নম্‌গ্যার তিরিশটি পরিবার, অধিকাংশই অস্ত্রহীন এবং অন্যরা পলতে লাগানো বন্দুক নিয়ে কি করে সেই সশস্ত্র নিষ্ঠুরদের মোকাবিলা করতে পারত? কয়েক দিন কয়েক রাত তো মানুষের ঘুম চলে গিয়েছিল। শেষে কাজাকরা এদিকে এসে লাদাখের দিকে ঘুরে গেল। এইভাবে বিপদ দূর হলো। নম্‌গ্যার মানুষের তো তখনও জানা ছিল না যে, তার পরের গ্রামগুলোর খুব শিগ্‌গির একটা নতুন ভবিষ্যৎ হতে যাচ্ছে। শিপ্‌কীর লোকেরাও সেই ভাষায় কথা বলে যে-ভাষায় নম্‌গ্যার লোকেরা বলে, সেই ধর্ম মানে যা নম্‌গ্যাবাসী মানে। সেসময় উভয়ের জন্যেই 'হনোজ দেহলী দূর অস্ত'[১]-এর ব্যাপার ছিল। তাদের এটাও জানা ছিল না যে, সে সময় চীনে দেবাসুর সংগ্রাম শুরু হয়েছে। আর এক বছরের মধ্যেই অসুররাজ চিয়াং-কাই-শেককে চীন থেকে পালাতে হবে। মাও-এর নেতৃত্বে নতুন চীনের জন্ম হচ্ছে, বছর শেষ হতে হতে যে তিব্বতেরও নেতৃত্ব করবে। তখন দু মাইল দূরে অবস্থিত শুকনো নালা চীন আর ভারত গণরাজ্যের সীমা হয়ে যাবে। তারপর প্রগতির দিকে তিব্বত দ্রুত ছুটতে শুরু করবে আর ভারতের ছ্যাকড়া তার পুরনো গতিতে এগোতে থাকবে। কিছু সময় পেরোবার পর নম্‌গ্যাবাসী আশ্চর্য হয়ে শুনবে আর চোখ ডলে দেখবে যে, ওপারে মোটর দৌড়চ্ছে, উড়োজাহাজ

[১] 'এখনও ঘরের চৌকাঠ (গোবরাট) অনেক দূর।'—স·ম·

উড়ছে, হাজার হাজার একর জমি ট্রাক্টরে চষে নানারকম আনাজ, শাক-তরকারীতে লকলক করছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী পিছিয়ে থাকা দেশে কয়েক বছরেই অনেক এগিয়ে যাবে, নিরক্ষরতা দূর হয়ে যাবে, ময়লা-নোংরা থাকত যে তিব্বতী তাকে পোশাকে-শরীরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখাবে, আর চাঙ্ থাঙ্-এর অসভ্য মেষপালককে সম্ভ্রান্ত পুরুষের মত দেখাবে।

২৩ জুন সকালেই দুধ-রুটি খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সাড়ে সাত মাইলের রাস্তার পাঁচ মাইল হেঁটে গেলাম। সামান্য উতরাইয়ের পথে বাহনের দরকার ছিল না। রাস্তায় বিশ্রাম নেবারও দরকার পড়ল না নটার সময় স্পূ পৌঁছে গেলাম। স্পূ এবং এদিককার অন্যান্য ডাকবাংলো ভ্রমণবিলাসী, প্রকৃতির আনন্দ উপভোগকারী ইংরেজ পর্যটকদের জন্য তৈরি হয়েছিল। এই বাংলোগুলিতে প্রচুর ইংরেজি বই ছিল। যে পর্যটক কোনো নতুন বই পড়ে শেষ করত, সে সেটা বাংলাতেই রেখে যেত। সব বই যে সুরক্ষিত আছে একথা বলা যাবে না।

স্পূতে ফিরে আমি আবার দুদিন থেকে গেলাম। এর মধ্যে কিছু সময় বই পড়ার কাজেও লাগালাম। ডিকেন্সের উপন্যাস 'মার্টিন চুজেলবেট' শেষ করলাম, এক আধ জায়গায় কয়েকটি হৃদয়স্পর্শকারী বাক্য পেলাম, না হলে আর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। এদিককার লোকদের কনৌর-এর লোকরা জাড় বা খইবা বলে। জাড়-এর অর্থ হলো জাঠ। এই নাম কেন দেওয়া হলো? খইবার অর্থ বরফের মানুষ, এ কথাটা ঠিকই।

২৫ জুন সকালে রওনা হলাম। শ্যাশোর পুল পর্যন্ত পায়ে হেঁটে এলাম। তারপর ঘোড়ায় চড়ে ষোল মাইলের রাস্তা সম্পূর্ণ করে দুপুরের একটু পরে কনম্-এর ডাকবাংলোতে পৌঁছলাম। আসার পর ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হলো, ঠাণ্ডা বেড়ে গেল। রেঞ্জার শ্রীদেবদত্ত শর্মা আজই সুঙ্গনম্ থেকে এসেছিলেন। তিনি লিপ্পা থেকে 'কণ্ডে কণ্ডে' সুঙ্গনম্ গিয়েছিলেন, যার অর্থ হলো, অজপথস্তে—ছাগলের রাস্তা ধরে গিয়েছিলেন। সমতলের লোকেদের কাছে এটা খুবই সাহসের কথা। শর্মাজী ভীষণই তৎপর লোক। সমস্ত রকম কষ্ট সহ্য করার জন্য তিনি তৈরি। তাঁর কাছ থেকে পাঁচ দিন আগের (২০ জুন) 'ট্রিবিউন' কাগজ পেলাম। পরের দিন কনম্-এই রইলাম। সেদিনই ডবলা দেবতার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল।

২৭ তারিখ সকালে জলখাবার খেয়ে নীচের দিকে পা বাড়ালাম। নম্বরদার অগরজিৎ-এর ঘোড়াটা দুর্বল ছিল। রেকাবটাও ভেঙে গেল আর জিনেরও জবাব দেবার মত অবস্থা। দু-মাইল তাতে চড়ে গেলাম, তারপর লিপ্পা খাদে পৌঁছে তাকে ফিরিয়ে দিলাম। দুপুরের আগে জংগী পৌঁছলাম। ভারবাহক আর ঘোড়া প্রস্তুত ছিল। ভারবাহকদের রওনা করিয়ে খাবার পর আমরাও রওনা হলাম। ঘোড়া বসে পড়ছিল। দু-মাইল যাবার পর তাকেও ফিরিয়ে দিলাম। রারং-এ গ্রামের বাইরে সেই ছোট মঠে উঠলাম যেখানে আগের বার থেকেছিলাম। প্রায় ৯ হাজার ফুট উঁচুতেও মাছির জ্বালাতনে অস্থির হচ্ছিলাম। আমি মেহেতা সাহেবকে কনৌরের বিষয়ে কিছু সুপারিশ লিখে পাঠিয়েছিলাম। তিনি তাঁর জবাবে লিখলেন, 'ফলের বাগান বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া

হচ্ছে। চিনীর জন্য ডাক্তার পাঠাব। তিব্বতী শিক্ষারও শিগ্‌গির ব্যবস্থা করতে চাই।' আমি তাঁকে দ্বিতীয় চিঠি দিলাম, যাতে জংগী, অকপা, রারং-এর লোকেদের জলকষ্টের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, আর এও জানালাম যে, এখানে জলের খাল সহজে কাটা যেতে পারে।

২৮ তারিখ সকালে রওনা হলাম। পংগীতে কিছুক্ষণ থাকলাম। এখানেও একজন কলসির মধ্যে হাড় পেয়েছিল। এটা জিজ্ঞাসার বিষয় ছিল। আবার রওনা হয়ে বারোটার সময় চিনী পৌঁছে গেলাম।

আবার চিনীতে

১৬ দিন পরে আমরা চিনীতে ফিরেছিলাম। এর মধ্যেই কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছিল। খুবানির গাছগুলো এখন পাকা ফলে ভরা। সেগুলো সবাই খুব খেতে শুরু করেছিল। খুবানি কনৌরের গরিবদের সব থেকে বড় আশ্রয়। কাঁচা আর টক খুবানি চাটনি বানিয়ে খাওয়া হয়। পাকলে তাই দিয়ে পেট ভরানোর চেষ্টা করে। ছাতের ওপর হলুদ ফল, শুকানো অবস্থায়, দূর থেকে গ্রামকে একটা অদ্ভুত রঙ এনে দেয়। আমি ওপরের দিকে উঠে যাওয়া রাস্তা থেকে নীচের গ্রামগুলির এই হলুদ ছাতের অর্থ বুঝতে পারছিলাম না। জিজ্ঞেস করায় পুণ্যসাগর রহস্য পরিষ্কার করলেন। শুকনো খুবানি কৌটোয় ভরে রেখে দেয়। সামান্য তরকারির সঙ্গে এটাই গরিবদের প্রধান খাদ্য। কনৌরে খুবানির গাছ খুব বেশিমাত্রায় হয়। হ্যাঁ, ভাল জাতের খুবানি জন্মায় না আর যে জাতের গাছ এখানে লাগানো হযেছে তাকেই বাড়ানো হয়।

মেহতাজি তাঁর এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে, এখন রামপুর-বুশহর আর আশপাশের আরো কয়েকটি এলাকা মিলিয়ে তার নাম মহাসু জেলা হয়েছে। তহসিল থেকে জানতে পারলাম, সর্দার বলদেবসিংহ রামপুর থেকে চলে গেছেন। মহাসু জেলার ডেপুটি কমিশনার করা হয়েছে পণ্ডিত করতারকৃষ্ণকে। আরো কয়েকজন রাজ্যের পুরনো কর্মচারীকে পেনসন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পরিবর্তনে জনসাধারণের আর কি আগ্রহ থাকতে পারে, তারা যদি প্রত্যক্ষভাবে কিছু ভাল দেখে,তবেই মানতে পারে।

ফলের মধ্যে এখন চুলী (খুবানি) আর আলুচা খুব পাওয়া যাচ্ছিল, সবুজ শাকেরও প্রাচুর্য ছিল। মেঘ হচ্ছিল। লোক ভীষণ লুব্ধ হয়ে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে অপেক্ষা করছিল কিন্তু বৃষ্টির বদলে মেঘ বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছিল। যব ও মটরের ফসল কাটা হয়ে গিয়েছিল। গম কোথাও কোথাও এখনও দাঁড়িয়ে। কাটা খেতে ফাফড়া আর ওগলা লাগানো হয়েছিল। শীতের সময় এখানে তিব্বতের দিক থেকে উত্তুরে হাওয়া আসে। সেজন্য ঠাণ্ডা খুব বেড়ে যায়, আর এখন নিচু থেকে হাওয়া আসে বলে ঠাণ্ডা কম থাকে। অন্যান্য পাহাড়ী জায়গার

মত এখানেও রতিজ রোগ একটা বড় সমস্যা। এর প্রতিরোধ করার জন্য পেনিসিলিন সহায়ক হতে পারে, তবে খুব বেশিমাত্রায় ইনজেকসন দিলে পরেই লোকেরা এর হাত থেকে বাঁচতে পারে।

আসার পর এক অনাকাঙ্ক্ষিত কর্ম দেখলাম—রাতে পোকামাকড়ের আক্রমণ হতো, দিনে মাছিরা অস্থির করে রাখত। এই যাত্রায় পেট তো বারবার হরতাল করার জন্য তৈরি থাকত, পাতলা পায়খানা হতো। যদিও সুস্বাদু খাবারের প্রতি লোভ ছিল না, কিন্তু কখনো দু গ্রাম বেশি খাওয়া হয়ে গেলে টক ঢেকুর উঠত। আমি এই সবকিছুকেই ছাপ্পান্ন বছর বয়সের ফল বলে মনে করতাম। এখন পর্যন্ত লেখার কাজ প্রায় বন্ধই ছিল। এবার নিয়ম করে 'কিন্নর দেশ' লিখতে শুরু করলাম। চেষ্টা করতাম, যাতে এক্সারসাইজ বুকের ১৬ পাতা অবশ্যই লিখতে পারি। কনৌরের বিষয় জ্ঞানলাভ করার জন্য বন্ধুরা সাহায্য করতেন। তহসিলদার মঙ্গতরামজী আমার কথায় স্থানীয় খনিজ পদার্থ আর ফলের নমুনা সংগ্রহ করছিলেন। তামা, সুর্মা, রূপা, সীসা, দস্তা, সোনা থাকার কথা বলা হচ্ছিল, কিন্তু যতক্ষণ তা চোখের সামনে না দেখছি, ততক্ষণ বিশ্বাস করতে রাজি ছিলাম না।

পাহাড়ে না পাওয়া যায় ধোপা, না তেলি, না নাপিত, না কুমোর। এইসব কাজ এছাড়া অন্য কাজও লোকেরা নিজেরাই করে নেয়। স্কুলের হেডমাস্টারমশাই ১১ জুলাই আমার চুল কেটে দিলেন। আমি রোববার স্নান করার নিয়ম করেছিলাম। শাস্ত্রের কথা মানলে হিমালয়ের এই কোণে হাওয়াই জলের কাজ করে, কিন্তু আমার এখনও অতটা ক্ষমতা হয়নি। ডা· ঠাকুরসিংহ খুবই মজার গল্প শোনাতেন। ডাক্তারের অভাবে কম্পাউন্ডারই ডাক্তারের উপাধি পেয়ে গিয়েছিল। বলছিলেন, 'বেপরোয়া নওজওয়ান ছিলাম। মিশনারিদের কৃপায় দুঅক্ষর পড়েছিলাম। স্যালভেশন আর্মির মিস্টার মার্টিমোরের পাল্লায় পড়ে গেলাম। তিনি খ্রিস্টান হবার জন্য বললেন, তো আপত্তি করতে পারলাম না।' মার্টিমোর সাহেব তাঁকে ব্যাপটিজম দেবার জন্য সিমলায় নিয়ে চললেন। ঠাকুরসিংহ মনে করতেন, পরমেশ্বর তো সবারই এক। রাস্তায় আর্যসমাজী রেঞ্জারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে তাঁকে বুঝিয়ে দিল। তখন হুঁশ এলো কিন্তু সাহেবের হাত থেকে বাঁচা যায় কি করে? রেঞ্জার উপায় বলে দিল, 'খ্রিস্টান হবার পরে না তোমার নিজের বাড়ির লোকের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে, না তোমার জাতের লোকেদের সঙ্গে, না তুমি বাড়ির এক পয়সা পাবে, আর না তোমাকে কেউ বিয়ে করবে। পাদরীর কাছে বিয়ে আর টাকা, ব্যাস এই দুটো দাবি করবে।' ঠাকুরসাহেব দাবি করলেন এবং খ্রিস্টান হবার হাত থেকে বেঁচে গেলেন। আজকাল তিনি কানে একটু কম শুনছিলেন, কিন্তু লোকের খুব বিশ্বাস ছিল তাঁর ওষুধে। খরচ অনেক কম করে দিলেও কিছু ওষুধ রাজ্য থেকে আসত। আঘাত-টাঘাত লেগে গেলে কোনো ডাক্তারের থেকে কম ছিলেন না তিনি। পেনিসিলিনের শুধু নামই শুনেছিলেন, তা পাওয়া সমতলেও মুশকিল ছিল। আমি নিজের জন্য দু-এক শিশি নিয়ে এসেছিলাম। তাঁর এক রোগীর অসাধ্য অসুখে আমি পেনিসিলিন দিতে বললাম। তার ওপর ওষুধ অব্যর্থভাবে কাজ দিল। সে জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে নিজের ঘরে মরতে এসেছিল। এই সাফল্যে আমার আর ঠাকুরসিংহের মহিমা তো বেড়ে যাবারই কথা?

রোক্‌পা থেকে তামার মাটি এসেছিল। একশো বছর আগে সরাহনের পার্শ্ববর্তী জায়গার এক কাঁসারি রোক্‌পাতে কাজ করত। তামা বানানোর জন্য সে ঝুপড়ি তৈরি করেছিল। সেইসময় বানানো তামার বাসন এখনও সুঙ্গনম্-এর দিকের মানুষের কাছে আছে। জেলদার মাটি নেবার জন্য খনিতে গেলে, লোকেরা বারণ করছিল, 'এরকম কোরো না, নীচের লোকেরা চলে আসবে আর আমরা মারা পড়ব। চুলী দিয়েও আমাদের জীবন চালাতে পারব না, দেবতারাও রেগে যাবে।' সত্যি সত্যিই মানুষ নিজের অবচেতনে শোষক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নত মানুষদের সবসময় ভয় পায়। ইংরেজরাও খনি দেখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু লোকেরা অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে খারাপ মাটি দেখিয়ে দিয়েছিল। খনির কাছেই পদুম (শুক্‌পা) আর কিছুদূরে নেবজে গাছ আছে। সত্যিই যদি এই গাছের কাঠ কয়লা দিয়ে তামা গলানো হতো তাহলে জঙ্গল বাঁচত না। মাটি হাতে নিলে ভারি বোধ হচ্ছিল, কিন্তু এর মধ্যে কত শতাংশ তামা আছে তা বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারতেন।

জুলাই-এর মাঝামাঝি আপেলের রঙ এখন লাল হয়ে এসেছিল, আগে ঘোলাটে মত ছিল। বেমী (ছোট জাতের পিচফল) এখানে সবশেষে পাকে। তার স্বাদ টক-মিষ্টি। কনৌরের লোক সুরার বড় পরীক্ষক এবং তারা অনন্য উপাসক। রস বার করে মদ বানানোর পরীক্ষা তারা সব ফলের ওপর করেছে। তাদের বিশ্বাস যে, একমাত্র বিষাক্ত ফল ছাড়া অন্য যে কোনো জংলী অথবা বাগানের ফলের থেকে মদ বার করা যায়। বেমীর মদকে তো লোক আঙুরের মদের থেকেও ভাল বলে। যে মদে পুরো নেশা হয় না, তাদের কাছে এমন মদের কোনো দাম নেই।

নীচের দিকে কম উচ্চতার জায়গাতে ফল প্রথমে পাকতে শুরু করে। তারপর ফলের এই সময় আস্তে আস্তে ওপর দিকে এগোতে থাকে। কল্পার বাংলোর আপেল ১৭ জুলাই এলো। কিছুটা টক ছিল, তবে তত নয় যতটা গতবছব লন্ডনে খেয়েছিলাম। শীতের ঠিক পরেই মাংস দুর্লভ হয়ে পড়ে। পুরনো মাংস শেষ হয়ে যেতে থাকে আর হঠাৎ কখনো-সখনো কিছু শুকনো মাংস পাওয়া যায়। এই সময় তাজা মাংসের জন্য জানোয়ার মারা হয় না, কারণ শীতের সময় খোরাকের অভাবে তারা রোগা হয়ে যেতে থাকে। এখন তারা মোটা তাজা হয়েছে। নেগী সন্তোখদাস তাজা মাংস পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শস্যের ফসল তৈরি হয়ে যাওয়ায় এখন আটার কোনো অসুবিধে ছিল না।

রামপুরের হেডমাস্টার এবং এদিককাব স্কুল-ইন্‌সপেক্টর পণ্ডিত দৌলতরাম তাঁর ছেলের সঙ্গে ১৭ জুলাই এসে আমাদের পাশের কামরাতেই উঠলেন। বলছিলেন যে, সমস্ত বুশহরে এবছর মাত্র ৯টি স্কুল খোলা হবে। হিমাচলের প্রভুদের ততদিন পর্যন্ত স্কুল খোলার ইচ্ছে নেই যতদিন না ট্রেন্ড শিক্ষক তৈরি হয়। স্বাক্ষরতাকে তাঁরা অগ্রাধিকার দিতে চান না। মূর্খদের আর কি বলা যায়? দৌলতরামজী আমার সঙ্গেই সিমলা থেকে রামপুর এসেছিলেন। তিনি খুবই সজ্জন এবং পরিশ্রমী পুরুষ ছিলেন। এই সময় হঙ্গরঙ্গের দিকে যাচ্ছিলেন, এটা খুবই সাহসের কাজ ছিল। ২০ জুলাই সারাদিন বৃষ্টি হলো। লোক খুব খুশি। বৃষ্টির ফলে ফাফড় আর ওগলার ফসলে খুব লাভ হওয়ার কথা।

—১৯৫৮—

ডা· ঠাকুর সিংহের রোজ সন্ধেবেলা মদ চাই। একা মদ খাওয়ায় মজা নেই, বিশেষ করে যখন তা খুবই সস্তায় পাওয়া যায়। তিনি গত বছরের শুকনো আপেল আর নাসপাতির কয়েক মণ টুকরো গুদামে ভরে রেখেছিলেন। নিজেরই ঘরে নিজের হাতে মদ বানিয়ে নিতেন। তাঁর পেয়ালার সঙ্গীদের মধ্যে বুড়ো ধর্মানন্দও ছিলেন। একদিন ধর্মানন্দকে ঠাকুর সিংহ মদের গাঁজ চাখতে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ঠিক আছে।' এরপর ভাপে গলিয়ে রস বার করা হলো। পান করে দেখার পর বোঝা গেল নেশা হয়নি। বেশ কিছুদিন ধরে ঠাকুর সিংহ ধর্মানন্দকে গালি-গালাজ করে গেছেন। একদিন ধর্মানন্দ খুব মদ গিলেছিলেন। পড়ে গিয়ে কয়েক জায়গায় ঘা হয়েছিল। মুখও ফেটে গিয়েছিল। সেই অবস্থায় ঠাকুর সিংহের কাছে এলেন। তিনি মলম-পট্টি করে দিলেন।

আমার রোজ ২ ঘণ্টা করে হাঁটা চিনীতে থাকতে বরাবর চলছিল। তাতে কিছু লাভ হয়েছে বলে মনে হতো না।

২৭ জুলাই নাগাদ আঙুরও উঠতে শুরু করল, কিন্তু এখনও রোগীর কালো-মিঠে আঙুর তৈরি হয়নি। তহসিলদার মশাই ফলের যে হিসেব সংগ্রহ করেছিলেন তাতে মনে হলো রোগী থেকে জঙ্গি পর্যন্ত এবং মোরং থেকে বারং পর্যন্ত শতদ্রুর দুই পারে ফলের খনি আছে। আঙুর তো এখানকার একটা বেহায়া গাছ। পণ্ডিত দেবদত্ত শর্মার বাড়িতে নালিতে আঙুর গাছ দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি এখানে আঙুর লাগাচ্ছেন?' তিনি টেরও পাননি কবে সেখানে একটা বীজ পড়েছে আর তা থেকে এমন লতানো গাছ হয়ে গেছে।

২৮ জুলাই নেগী সন্তোখদাস তাঁর ওখান থেকে কালো ছোট আঙুর পাঠালেন, যেগুলো খুব মিষ্টি ছিল। চিনী থেকে শিমলায় এক মণ জিনিস পাঠাতে ২০ টাকা ভাড়া লেগে যেত, যেতেও লেগে যেত কদিন। এত দামী জিনিস নীচের বাজারে কি করে বিক্রি হতো? চিনীর পাশের কলপার মাঠে ছোট উড়োজাহাজ নামার যদি ব্যবস্থা করা যেত তবে এখনও কনৌর থেকে দশ হাজার মণ আঙুর দিল্লী পাঠানো যেত। এর থেকে এই গরিব প্রদেশের কিছু আর্থিক সাহায্য হয়, আর উৎসাহিত হয়ে সে আরো বাগান করতে পারে। সেদিন থেকে ৮ বছর পার হয়ে গেছে, এখনও রামপুরের পরে মোটর যায়নি।

শ্রীশিবযোগী তেওয়ারীর ৩ আগস্টের চিঠি থেকে জানলাম, তাঁর আমেরিকা যাবার ভিসা হয়ে গেছে। খুবই কষ্টে এই অসাধারণ প্রতিভাশালী যুবক তাঁর পড়া শেষ করেছেন। যদি অনুকূল পরিস্থিতি পেতেন, তবে কয়েক বছব ধাক্কা খেতে হতো না। এবার সম্ভবত তাঁর রাস্তা প্রশস্ত হবে, এ কথা জেনে আমার আনন্দ হলো।

কোঠী চিনীর থেকে দু-তিন মাইল নীচে আর তা সমুদ্রতল থেকে ছ-সাত হাজার ফুটের বেশি উঁচু জায়গা নয়। ২৩ জুলাই শ্রীদেবদত্ত শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে আমি সেখানে গেলাম। ২ মাইল উৎরাই। নীচে চুলী শেষ হয়ে গিয়েছিল, এখানে এখন শুকানো হচ্ছিল। এখানকার অবশেষ দেখে মনে হচ্ছিল যে, এক সময় কোঠী চিনীর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হয়তো ওপরে দুর্গ ছিল আর নীচে রাজধানী। কোঠীর আরো একটি বৈশিষ্ট্য আছে, এখানের বৌদ্ধদের এবং হিমাচলের এই অঞ্চলের লোক-দেবতাদের প্রাধান্য রয়েছে।

নীচের মত এখানকার দেবতারাও পাথর আর কাঠের তৈরি। ভৈরব মন্দিরে ২০টি পুরনো মূর্তি ছিল যার মধ্যে ৪টি বাদ দিয়ে বাকি সব ছিল পাথরের। মূর্তিগুলোও ছিল খুব সুন্দর। একাধিক বীণাপাণী, একটি হরগৌরী আর একটি দ্বাদশভূজ মূর্তি ছিল। নীচে কুণ্ডের পশ্চিম পারে পূর্বাভিমুখ চতুর্মুখ শিবের মূর্তি ছিল, যার উচ্চতা প্রায় দুফুট। গড়ন খুব সুন্দর। মাথার পিছনে উৎফুল্ল অষ্টাদশ কমলের প্রমাণমণ্ডল। কোঠীর শাসক তখন শৈব ছিল, মূর্তিগুলি তার প্রমাণ। কাছেই খেতের প্রান্তে রেখাঙ্কিত পাথরের শিবলিঙ্গও এই কথাই প্রমাণ করছিল। চিঠি দেওয়ায় দেবী বিবাহতে আপত্তি জানাল। আমি চাইলাম যে দেব-বাহনকেও খুঁচিয়ে দেবীর রায় জিজ্ঞেস করা যাক, কিন্তু লোকটা কেটে পড়ল।

কনৌর থেকে ফেরা

৮ আগস্ট রোববার ছিল। সেদিনই চিনী থেকে বিদায় নিতে হতো। দশটার সময় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে আমরা রওনা হলাম। মাস্টার রামজী দাস আর মাস্টার শ্রীনারায়ণ সিংহ চললেন। আমি কনৌরের অপর মহানদী বস্‌পার উপত্যকাও দেখে নিতে চাইলাম। বস্‌পা শতদ্রুর শাখানদী। এই নদী আর ভাগীরথীর মধ্যে শুধু একটি পর্বতশ্রেণীর বিভেদ রয়েছে। ছিতকল থেকে ভাগীরথীর পার দিয়ে হরসিল-এ পৌছনোর রাস্তাও আছে, যদি কেউ সাহস করতে রাজি থাকে।

চিনী থেকে প্রথমে আমরা কোঠী গেলাম। রাস্তায় দেবদারুর জঙ্গল ছিল। যেখানে স্থানে স্থানে পাথরের দেয়াল দেখে মনে হচ্ছিল যে, কোনোসময় এখানে আজ থেকে বেশি চাষ হতো। কুণ্ডে খণ্ডিত শিবের দর্শন করলাম। এ হয়তো একসময় গুর্জর প্রতিহার সাম্রাজ্যে ছিল। দেবীর মন্দির সম্ভবত সেখানে ছিল যেখানে আগে রাজমহল ছিল। এখন সুবা হয়েছে, চিনীর জায়গায় কোঠীকেই তহসিলের জন্য উপযুক্ত মনে করা হয়েছে, আর এ পর্যন্ত মোটর-রাস্তা তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কোঠীর দিন ফিরে আসছে। দেবীর মন্দির দেখার পর আমরা সেখান থেকে খ্বাঙ্গী পৌছলাম। এখানকার শ্যামচরণজী মরণাপন্ন হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন, যাঁর পেনিসিলিনে লাভ হয়েছিল। কোঠীর থেকে খ্বাঙ্গী পর্যন্ত উৎরাই-এর পর উৎরাই পড়ে। আমি তাঁর বাড়িতে গেলাম। আশা ছিল, এবার তিনি বেঁচে যাবেন। নীচে নেমে সেই জায়গায় পৌছলাম, যেখানে শতদ্রু পার হবার জন্য লোহার মোটা তারে চাকার সাহায্যে একটা খাঁচা ঝুলছিল। নদীর দুতীরে দুটো লোক নিযুক্ত ছিল, যারা কোনো মানুষ খাঁচায় বসলে দড়ির সাহায্যে তাকে নিজেদের দিকে টেনে নিত। আমরা তিন-সাড়েতিন হাজার ফুট নীচে নেমে এসেছিলাম, তার প্রভাব পরিষ্কার টের পাচ্ছিলাম। এই জায়গাটা বেশি গরম। কোঠী বেশি অনুকূল তাপমাত্রার জায়গা। তার বাসযোগ্য বহু জমিও আছে। কিন্তু সে পর্যন্ত মোটর রাস্তা আনতে ইঞ্জিনিয়ারদের কম

অসুবিধের মুখোমুখি হতে হবে না। সেদিন আমরা ঘাট থেকে কয়েকমাইল এগিয়ে শোঙঠোঙ (৫,৩৫০ ফুট)-এ রাতটুকু থাকলাম। কনজারভেটর টিলন এখন সফরে বেরিয়ে এখানে ছিলেন। আমরাও বনবিভাগের বাংলোয় জায়গা পেলাম। টিলন সাহেব সীসার তারের নমুনা দেখালেন। বেলা ছিল, পাশের খেতে আগাছা পরিষ্কার করার কাজে রত মেয়েদের গলা শুনে আমি সেদিকে গেলাম। তারা খুরপি, কোদাল সামনে ফেলে দিল। আমি একটা টাকা দেওয়ায়, চুনীলাল ডাক্তারের প্রসিদ্ধ লোকগীত শুনিয়ে দিল।

শোঙঠোঙ থেকে সামান্যই দূরে এবং ওপরে বারং। বারঙের রঘুবর-এর কথা আমার বার বার মনে পড়ে বুকের ভেতর কষ্ট হয়। প্রাইমারি পর্যন্ত পড়ার পর রঘুবর তিব্বত চলে গিয়েছিলেন। সেখানে বেশ কয়েক বছর ধরে তিব্বতী ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র পড়তে থাকেন। যখনই আমি টশীল্হুনপো পৌঁছতাম, তিনি আমার কাজে সাহায্য করতেন। খুবই বুদ্ধিমান আর সম্ভাবনাময় যুবক ছিলেন। তাঁর কাছে অনেক প্রত্যাশা ছিল। তিনি নিজের জন্মভূমিতে এলেন, কিন্তু মরার জন্য। এখন যদি তিনি কোথাও জীবিত থাকতেন, তবে কত ভাল হতো। চিনী তহসিলে ভাষার দিক থেকে লোকেরা মোন-খ্মের (কিরাত), জাতির দিক থেকে খশ-কিরাত আর ধর্মের দিক থেকে বৌদ্ধ। তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসা এদের জীবিকার মুখ্য উপায়। প্রায় সব পুরুষই তিব্বতী বলতে পারে। এখান থেকে বহু যুবক সাধু-শিক্ষালাভ করতে তিব্বত যায়। চিনী অথবা কোঠীতে সংস্কৃত-তিব্বত-সম্বন্ধী গবেষণা সংস্থা খোলা যেতে পারে, যেখানে তিব্বতী সাহিত্য থেকে জ্ঞানলাভকারী ভারতীয় তরুণদের পাঠানো যেতে পারে। এক সময় শত শত বছর ধরে কয়েকশো ভারতীয়-তিব্বতী বিদ্বান মিলে আমাদের যে সাড়ে পাঁচহাজার গ্রন্থ তিব্বতীতে অনুবাদ করেছিলেন, তার থেকে কয়েকশো অত্যাবশ্যক গ্রন্থ আবার আমাদের ভাষায় অনুবাদ করার কাজও এখান থেকে সম্পূর্ণ করা যেতে পারে। এখানকার সুপণ্ডিত নেগীলামাকে এই পরামর্শ দিয়েছিলাম, তিনি তিব্বতী সাহিত্যে তিব্বতেও স্বীকৃত মহাপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু এই কথার গুরুত্ব তিনি বুঝতে পারতেন না।

সাংলা (৮৫০০ ফুট)—সকালের খাবার খেয়ে পুণ্যসাগর আর আমি আটটার সময় রওনা হলাম। শতদ্রুর বাম তীর ধরে কিছুদূর যাবার পর ডানতীরে আঙুরের মাচান চোখে পড়ল। যত জায়গায় লাগানো যায়, রোগীবাসীরা আঙুর লতা লাগিয়ে রেখেছে। এখানকার আঙুর এত মিষ্টি হয় কেন? আঙুরের জন্য ভারতে তিনটি জিনিসের অত্যন্ত প্রয়োজন—(১) সেই ভূভাগে খুব কম বৃষ্টি হওয়া উচিত, ১০ ইঞ্চির থেকে কম হলে আরো ভাল, (২) আঙুরের প্রচুর রোদ পাওয়া দরকার, (৩) যদি পাহাড়ী জায়গা হয় তবে তার উচ্চতা ৬০০০ ফুটের বেশি হওয়া উচিত নয়। বিশেষ সারের প্রয়োজন তো আছেই। কোয়েটা কিছুটা এইরকমই জায়গা। সেখানকার আঙুরে শতকরা ১৭ ভাগ চিনি থাকে। বিজ্ঞান প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে, এটা সে পশ্চিম-পাঞ্জাবের মন্টগোমারীতে শতকরা ২৫ ভাগ চিনিযুক্ত আঙুর তৈরি করে দেখিয়ে দিয়েছে। কনৌরে রোগী ছাড়া আর

অন্য কোনো জায়গার আঙুর তত মিষ্টি হয় না, তবে নাসিকের মত টকও হয় না। এদের জাত উন্নত করার প্রচুর সম্ভাবনা আছে।

আড়াই ঘণ্টা চলার পর আমরা বস্পা নদীর পুলে পৌঁছলাম, আর পারে পারে তার বাম তীর ধরে ওপরের দিকে যেতে লাগলাম। সপিনীর নম্বরদার অমীনচন্দ মালা পরালো। বুএ-তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম, তারপর আট মাইল হেঁটে সাংলা পৌঁছে গেলাম। সমস্ত বস্পা উপত্যকা অত্যন্ত মনোহর সবুজ জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ে ভরা। ঘোড়া পাওয়া গিয়েছিল, তবে আমরা তাতে খুব কম চড়েছি। পৌনে পাঁচটার সময় ডাকবাংলোতে পৌঁছলাম, যা নদীর বাঁদিকে রয়েছে, গ্রাম রয়েছে তার ডানদিকে। বিশাল বাংলো। এখানকার নয়নাভিরাম প্রকৃতির আনন্দ উপভোগ করার জন্যই ইংরেজরা বনবিভাগের টাকা খরচ করে এই বাংলো বানিয়েছিল। পাহাড়ের বাংলোতে মেথর পাওয়া যায় না। মেথর নামের কোনো জাতও নেই। সেইজন্য ইংরেজদের সময় তাকেই বাংলোতে থাকতে দেওয়া হতো যে সঙ্গে মেথর নিয়ে যেত।

উপত্যকা এখানে খুব চওড়া আর কয়েক ক্রোশ লম্বা। মনে হয় ভাগীরথী গঙ্গার হর্সিল উপত্যকা এখানে চলে এসেছে। তা আছেও এর সামনের পাহাড়ের ওপারে। কিন্তু এই উপত্যকা তার থেকেও বেশি দেবদারুতে সমৃদ্ধ।

১০ আর ১১ আগস্ট আমাদের সাংলাতেই থাকতে হতো। লোকেরা খেয়ালী—কখনও তাদের খুব স্নেহপরায়ণ দেখা যায় আবার কখনও অশিষ্ট। আগের আনা আটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, আর এখানে তা পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ল। সকাল আটটার সময় পুণ্যসাগরকে নিয়ে নদী পার হলাম। শহরের বসতির মধ্যে বেরিং নাগার গ্রামদেবতার ছোট মন্দির আছে। আরো অন্য মন্দিরও আছে। এটা কনৌরের সব থেকে বড় গ্রাম, যাতে ২২৭টি ঘর আছে। এর মধ্যে ৬৩টি তাঁতি, ৪টি লোহার, ৫টি ছুতোর আর বাকি সব খোসিয়া। বেরিং নাগরের কাছে ১৪ বিঘা জমি আছে। তার জন্য একটি বিশাল মন্দির তৈরি হচ্ছিল। বাসপা দেখার আগে আমাদের মোনে (কামরু) দেখতে হতো, বাসপা তো থাকার জায়গা থেকে কাছে ছিল। গ্রামের বাইরে এক মাইল আসতেই পথে মোনে রৌলাকে পেলাম। ব্যাস আর কি, এখানের প্রভাবশালী লোক পেয়ে গিয়েছিলাম। গ্রামের বাইরে একটি গুম্ফাকে তিনি ভাল ঘরের চেহারা দিয়ে দিলেন। সেটা দেখিয়ে গ্রামের ভেতর বদ্রীনাথের মন্দিরে নিয়ে গেলেন। মন্দিরের ভেতরে কোমরবন্ধ না বেঁধে কেউ যেতে পারে না। সেখানে গ্রামের গণ্যমান্য লোকেরা জমা হয়েছিল। নেগী শ্যামসুন্দর দাস আর নেগী বুজুকসেন মন্দিরের মাথস (সহতা)-ও উপস্থিত ছিলেন। তিনজন গ্রোক্স (দেববাহন)—বৃদ্ধ পুরনজীত,পালুরাম আর ইন্দরসেন-এর সঙ্গেও পরিচয় হলো। পুজারেস জবানদাস, কৈতস (কায়স্থ) হরিমনদাস, কারদার গঙ্গারাম ও গোকরণদাসকেও সেখানে পেলাম। লবরং-এ আমরা যেমন দেখেছিলাম কামরুতেও ঠিক সেরকম একটা দুর্গ আছে। রামপুরের রাজা আগে কামরুরই ঠাকুর ছিলেন, যিনি অনেক ঠাকুরদের জয় করে সমস্ত কনৌর নিয়ে একটা রাজ্য তৈরি করেন আর তারপর নিজের লোকদের নিয়ে সিমলা পর্যন্ত শতদ্রু উপত্যকা আর যমুনার উপরি-শাখা পব্বর-উপত্যকায় নিজের রাজ্য

বিস্তৃত করেন। এটা কয়েকশো বছরের পুরনো কথা। রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী কামরু (মোনে) থেকে সরিয়ে সরাহন আর পরে রামপুরে নিয়ে যেতে হয়। মোনেতে এখনও পুরনো দিনের অনেক রেওয়াজ প্রচলিত আছে। এখানের বদ্রীনাথই রামপুর রাজাদের কুলদেবতা ছিলেন, আর তিনি কখনও কখনও খুব জাঁকজমকের সঙ্গে গাড়ওয়ালে বদ্রীনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁকে বড় বদ্রীনাথের সঙ্গে এক সিংহাসনে বসিয়ে পুজো করা হয়। সংবত ১৯৩২ (সন ১৮৩৫)-এ এরকমই এক যাত্রার কথা বদ্রীনাথের রাবল পুরুষোত্তমকে লেখা পত্রে ছিল—'সোসতী শ্রী মহাস্ত্রী বদরীস পর চরজা রাওল পরসোতম জী স্ত্রী মহাস্ত্রী পরমভটারক শ্রী মহারজধিরজ স্ত্রী সমসেরসিংঘে পএলগণা পহুঁচে। ইহাঁ কে সমাচার বলে হৈ। তাহ কে বলে চহিএ। উপ্রন্ত ইসসে হমারে গদী কা দেবতা ত্রসনরুসী বদ্রীনাথজী মারফত নেগী রোনবদ্র ব চোবদারী নেগী হীরামন কে বদ্রীজী কে ভেজে গএ। সো দেবতেজী কো সংগার পহনাকর সংগসন উপ্র বঠালকে পুজা মনতা হচ্ছী তরহ করনা। বদ উসকে মরফত নেগী রোনবদ্র কী দেবতেজী কো বেজ দেনা। আইন্দে সুব পত্র লিখতে রেহেনা। সং· ১৯৩২ হড গতে ২৭ সুব।' রাজা শমশেব সম্বন্ধী অন্য চিঠিতে লেখা ছিল—

'স্ত্রী মহাস্ত্রী পরমবটারক শ্রী মহারাজদিরাজ শ্রী মহারজ স্ত্রী সমসেব সিংঘে দেবন বচনে। কমরু দেবতে বদ্রীনাথজী কে করদারন নেগী রোনবদ্র দীসে অচ রাম রম বচনে বোল্যা উপ্রন্ত জোকী বদ্রীনাথজী অবকে বদ্রী জানে কা হুকম ফরমাবতে হোগা সো দেবতেজী কী মরজী হুকম মাফিক দেবতাজী বদ্রী ক্ষেত্র মেঁ বেসক লে জানা। বমূজব রকম কে বদ্রী ক্ষেত্র মেঁ পূজা কর দেনী ঔর স্রকারী তরফসে দেবতেজী কা রকম খরচ অজ তক মিলাকর তী সো অববী রখম মূজর দেবতেজী খরচ স্রকার সে মিল জায়েগী। তুমনে রখম বমুজব খরচেলগা দেনী। তুমকো স্রকার সে মুজবে মিলে গে। সং ১৯৩২-র হ প্রবিস্টে ৩১ লিখ্যা হুকম পরমন সুভ।'

কেল্লার ভেতরে কয়েকজন মানুষ ছাড়া কেউ যেতে পারে না। সেখানে পুরনো কাগজপত্র আর অন্য কিছু জিনিস আছে বলে খবর পেয়েছিলাম। দুর্গের গুরুত্বটা হলো এই যে, এখানে সভার রাজা যতক্ষণ না গদিতে বসত ততক্ষণ তাকে রাজা বলে স্বীকার করা হতো না। ভেতরে কিছু ধাতু-মূর্তি ছিল যাদের থানপতি বলা হয়। তিব্বতের সীমা এখান থেকে কাছে। সাতদিনে পশ্চিম তিব্বতের প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ মঠ থোলিং-এ পৌঁছনো যায়। স্পা-উপত্যকার উপরিভাগে ছিত্কুল ইত্যাদি লোকেদের মুখাকৃতি তিব্বতী। পরম্পরা বলে দিচ্ছে যে কোনো সময় সাংলাতে আলাদা ঠাকুর ছিল, আর মোনেতে আলাদা। দুজনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। শেষে বস্পার ঠাকুর মুখোবিস্নান-এর স্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করে। আর পতিকুলের জায়গায় পিতৃকুলকে সাহায্য করে। এইরকম বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সাংলা পরাধীন হয়।

মোনের কেল্লাকে মোনেগোরং বলা হয়। এটা নীচে লম্বা-চওড়ায় পৌনে ২৪ হাত। এতে পাঁচটা তলা আছে, সবার নীচে পাঁচটা ঘর—গুদাম, স্নানঘর, বড় ঘর. রান্না ঘর আর জলের ঘর। দোতলায় তিনটে ঘর। সবচেয়ে ছোট একটা খালি ঘর আছে, পূজার ঘর খুব

বড় আর তৃতীয়টি থানপতির ঘর, যার মাঝখানে রাজার গদী আছে। তিনতলায় আছে পাঁচটা ঘর। একটা কখনো খোলে না, দ্বিতীয়টা ভীমাকালী এলে বলিদানের, তৃতীয়টা বলির পশুকে সিঞ্চন করার, চতুর্থ সরাহনের ভীমাকালীর বসার, পঞ্চম রাজার জিনিস—কবচ, বারুদ, হাতিয়ার, মুদ্রা ইত্যাদি রাখার। চারতলায় চারটে ঘর আছে। সবচেয়ে বড়টায় রাজার বৈঠক, ছোটোয় রানীবাস, তৃতীয়টা স্নানঘর, চতুর্থটায় বড় রান্নাঘর। পাঁচতলায় শুধু একটা ঘর আছে, যেটাতে দুর্গের দেবতা বটকুলা থাকে।

বাস্পা উপত্যকা, বিশেষ করে সাংলা, আর নীচের গ্রাম এখন বৌদ্ধধর্মে খুব কম প্রভাবিত রয়েছে এবং ব্রাহ্মণ না থাকাসত্ত্বেও তাদেরই প্রভাব ছড়িয়ে আছে। টেহ্‌রীর ভাগীরথী-উপত্যকার ব্রাহ্মণ আজকাল এখানে পূজা এবং কোষ্ঠী তৈরি করার জন্য এসেছেন। মোনের বদ্রীনাথ মন্দিরের কাছেই একটা ছোট মত বুদ্ধমন্দির আছে, যেখানে লোকেদের ঘর থেকে পাওয়া অনেক বুদ্ধমূর্তি রাখা আছে। তাদের মধ্যে একটি ধাতুমূর্তি খুব সুন্দর ও প্রাচীন। এখানে কিছু হস্তলিখিত পুঁথিও আছে, যাদের অধ্যায়ের উপসংহার থেকে কিছু ঐতিহাসিক কথা জানা যায়।

সেদিন অনেকটা সময় মোনে আর সাংলাতে কাটিয়ে আমরা বাংলোতে ফিরে এলাম। ১১ তারিখ আবার দেখাশোনা করতে লাগলাম। সাংলার বৌদ্ধমন্দিরটি পুরনো মনে হলো। সেখানে শাক্যমুনির সঙ্গে সারিপুত্ত আর মৌদগল্যায়ন-এর মাটির মূর্তি ছিল। 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র ২৬ ইঞ্চি লম্বা আর ৬ ইঞ্চি চওড়া হস্তলিখিত পুঁথিটি বহু পুরনো ছিল, যা তার তালপাতার নকলের ওপর তৈরি প্রতিটি পাতার দুটো গোল ছিদ্র ও কিছু উচ্চারণ-রীতি থেকে বোঝা যাচ্ছিল। এর তিনটি পুঁথি হয়তো ছিল, যার মধ্যে দ্বিতীয়টিই এখানে আছে। এরমধ্যে অনেক ছবিও আঁকা আছে। মৃতদের জন্য এখানে গরুড়-পুরাণ আর 'বর্‌-দোস্‌-খোস্‌-গ্রোল্‌-ছেন-মো' দুই পাঠ করা হয়। এই পুস্তকের উপসংহারের লেখা থেকে বোঝা যায় যে, খুনু (কনৌর)-কে বুদ্ধ-শাক্যমুনির উত্তম ধর্মক্ষেত্র বলে স্বীকার করা হতো। এখানেই ধার্মিক রাজা শমশের সিংহের সময়ে অমাত্য (কলোন)-কে রোনমধর-এর সময় এই পুস্তক লেখা হয়েছিল। অর্থাৎ পুস্তক একশো বছরের বেশি পুরনো ছিল না।

ছোলটূ—যে চাপরাসি পেয়েছিলাম,দেখা গেল সে বড়ই দায়িত্বহীন। ১১ তারিখ সে গায়েব যে হলো ১২ তারিখেও তাকে দেখা গেল না। নিজেরাই তিন টাকা করে ১৪ মাইলের জন্য চারজন ভারবাহক ঠিক করে ১২ আগস্ট রওনা হলাম। ব্রুয়ে পর্যন্ত পংগী ব্রহ্মচারী পরমানন্দও সঙ্গে জুটে গেলেন। আটটার থেকে হেঁটে ৬ ঘণ্টায় কিলবা পৌঁছলাম। শতদ্রুর বাম তীরে এটি অপেক্ষাকৃত গরম জায়গা। এখানের শাদা আঙুর পেকে শেষ হয়ে গিয়েছিল, কালো আধপাকা পেলাম। পিচকলও খুব ভাল আর সুস্বাদু। সেই রাতটা সেখানে থেকে সকালে জলখাবার খেয়ে রওনা হলাম আর পাঁচ মাইলের সফর দেড়-দু ঘণ্টায় সম্পূর্ণ করে আমরা ছোলটূ পৌঁছে গেলাম।

শতদ্রুর বাম তীরে বেশ সমতল জমিতে বন-বিভাগ খুব সুন্দর বাগান করেছে। অনেক

ফলের গাছ আছে, যেগুলো লাগানোর সময় এটা খেয়াল রাখা হয়েছে, যেন এর দেখাদেখি লোকেদের মধ্যে বাগান করার শখ বাড়ে। আঙুর বেশি ছিল, তবে টক এবং এখন তা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সবেদা লাগিয়েও দেখা হয়েছে, তবে তা কাবুলের সবেদার মত মিষ্টি নয়। নাশপাতি খুব ভাল ছিল, খরবুজও বেশ সুস্বাদু। ফল কোয়েটার মত মিষ্টি না হবার কারণ হলো বর্ষার আধিক্য। এখানেই সাহসরামের এক বৈরাগী সাধুকে পেলাম। তিনি পঁচিশ বছর ধরে তিনি হিমালয়েই চক্কর কাটছেন। এরকম বিনা জিনিসপত্রে যাত্রা করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। আর যাত্রাও শুধু যাত্রা করার জন্যই করতেন। ভবঘুরে যেমনই হোক আমার কাছে স্নেহের পাত্র—'কে জানে কোন রূপে নারায়ণ পাওয়া যায়।' কে জানে এরই মধ্যে হয়তো গোবরে পদ্মফুল কোনো মহা-ভবঘুরে পাওয়া গেল। তাঁর সঙ্গে বসে খেতে আমার খুব আনন্দ হলো।

সরাহনা—১৪ আগস্ট সকালে রওনা হয়ে দুমাইল দূরে টাপরিতে কেগারু[১] বদলানো দরকার ছিল। চাপরাসির চাপে আমরা লোক পেতাম, কিন্তু কেউ থোড়াই মন থেকে কাজ করতে আসত? মন থেকে কাজ করবে এমন লোক রাখতে হলে, সিমলা থেকে খাওয়া আর মজুরি নির্দিষ্ট করে তাকে আনা দরকার। টাপরি থেকে কিছুদূর গিয়ে পুল পার হয়ে আবার শতদ্রুর বাম তীরে এগারোটার সময় বাঁগতূ ডাকবাংলোতে পৌছলাম। রোড-ইন্‌স্পেক্টর বাবু লক্ষ্মীনন্দকে পেলাম। একটু অসুবিধে হলো, সঙ্গে আসা ভারবাহকরা নিচার-এর জন্য তৈরি হয়ে গেল। বাবু লক্ষ্মীনন্দর মাদি ঘোড়াটা চড়ার জন্য পেলাম। নিচার-এ আমরা এক ঘণ্টা থাকলাম। সেখানে ডাকঘর থেকে কিছু চিঠি নিলাম, তারপর রওনা হয়ে সাতটার সময় পৌন্ডা পৌছলাম। বাবু লক্ষীনন্দজী সরাহন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিলেন, যেখানে ১৫ আগস্ট রোববার আমরা পৌছলাম।

আজ স্বাধীনতা দিবস। আজকের দিনেই গত বছর ইংরেজরা ভারত মুক্তি দিয়েছিল। কিন্তু এখানে কোনো হৈচৈ ছিল না। স্বাধীনতা যতক্ষণ না সাকার হয়ে উঠছে ততক্ষণ মানুষ কি করে তার গুরুত্ব বুঝতে পারবে? পৌন্ডা থেকে একটার সময় চৌরা ডাকবাংলোতে পৌছলাম। সেখানে দেড়ঘণ্টা খাওয়া-বিশ্রামের জন্য থেকে সেদিন ছটার সময় সরাহন পৌছে গেলাম। সেই সময় বৃষ্টি হচ্ছিল।

১৬ আগস্ট আমাদের সরাহনেই থাকার কথা। কামরুর পরে আর রামপুরের আগে সরাহনই বহুদিন ধরে রাজধানী ছিল। সেখানের ভীমাকালী হলো রাজ্যের ইষ্ট দেবী। ভীমালীর মন্দিরে বহু পুরনো কাগজপত্র, অন্যান্য ঐতিহাসিক সামগ্রী আর মুদ্রা থাকার সম্ভাবনা ছিল, এইজন্যই আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এখানে এসেছিলাম। বাংলোর নীচে রাবী-ব্রাহ্মণদের গ্রাম আছে, যেখানে ২৪টি ভরদ্বাজ, ১৬টি বশিষ্ঠ, ২০টি কৌশল গোত্রী পরিবার থাকে। রামপুরের রাজা যদিও নিজেকে চন্দ্রবংশী ও প্রদ্যুম্নর সন্তান বলেন, আর কনৌর ঠাকুরদের বংশের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ গোপন করতে চান কিন্তু রাবী-ব্রাহ্মণদের

[১] 'ভারবাহক'-এর স্থানীয় প্রতিশব্দ।—স·ম·

পরম্পরা একথা বলে যে, দু-ভাইয়ের মধ্যে একজন রাজা হয়েছে আর অন্য ভাইদের সন্তানরা হয়েছে রাবীর ব্রাহ্মণ। একটি পুঁথি খুবই সযত্নে রাখা ছিল, দেখার জন্য ঔৎসুক্য হলো, কিন্তু যখন জানলাম সেটা কাগজের তখন আর না দেখার আফশোশ হলো না। ব্রাহ্মণদের কাছে থাকা কত পুরনো পুঁথি শতদ্রুতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবু এখনও কিছু পুস্তক আছে। একাদশ স্কন্দ ভাগবতের বিষয়ে সংবত্ ১৬৯২ (১৬৩৫ খ্রী·)-এ দোহা-চৌপাইতে চতুরদাসের লেখা একটি পুঁথি দেখলাম। গীতার একটি টীকাও পাহাড়ী আর হিন্দি মেশানো ভাষায় লেখা ছিল।

দেবীর মন্দিরে গেলাম। মন্দিরের বিস্ট (ম্যানেজার) সপনীর নেগী বিদ্যানন্দের মুখ থেকে একথা শুনে থ হয়ে গেলাম যে, সর্দার বলদেব সিংহ এখানকার সব পুরনো কাগজ পুড়িয়ে ফেলেছেন। কাগজগুলো কি অপরাধ করেছিল? হ্যাঁ, অপরাধ করতে পারে, কারণ সেই সময় রামপুরে রাজার আর সরাহনে দেবীর ভাণ্ডার লুঠ হয়েছিল। আতঙ্কে কেউ টু শব্দ করতে পারত না। যার টু শব্দ করার সাহস ছিল তাকেও সেই লুঠে শামিল করে নেওয়া হয়েছিল। যে কোনো সংস্কৃত ব্যক্তি বা সমাজের জন্য এটাই ছিল পুঁজি। সিমলা ফিরে গিয়ে চিফ কমিশনারের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। আমার বই 'কিন্নর দেশ মেঁ'-তেও আমি লিখেছি, কিন্তু কেউ তা গ্রাহ্য করেনি, এই মহা অপরাধ সবাই গুলে খেয়ে বসেছে। বাংলোর এক অংশে রামপুরের এস· ডি· ও· সাহেব তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এসে উঠেছিলেন। শিষ্টাচারের জন্য আমি তাঁকে নমস্কার জানালাম, কিন্তু তাঁর নমস্কার গ্রহণ করারও ফুরসত হলো না। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বেচারি তাস খেলায় মগ্ন ছিলেন। নিজের এই বেয়াদবিতে আমার আফশোশ হলো। এখান থেকেই পুণ্যসাগরজী নিজের গ্রামে গেলেন।

রামপুর—১৭ আগস্টে পাঁচ-টাকার তিনজন কুলি নিয়ে নটার সময় আমরা রামপুরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম, আর পাঁচটার সময় সেখানে পৌঁছলাম। রাস্তায় এক-আধবার সামান্য বৃষ্টি পড়ল। রাতে রেঞ্জ কোয়ার্টারে থাকলাম। মশা আর ছারপোকা ঘুমোতে ছিল না, তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য উঠে বসলাম আর সারা রাত লেখাপড়ায় কাটিয়ে দিলাম।

১৮ আগস্টও রামপুরেই থাকার ছিল। নিজের বইয়ের জন্য আরো কিছু সামগ্রী জড় করলাম। সেদিন সকালে উঠেই স্কুলে চলে গেলাম। পণ্ডিত দৌলতরামজী মশারির ব্যবস্থা করে দিলেন। রামপুরেও পশমিনার চাদর তৈরি হয়। এগুলি বেশি পরিষ্কার আর গরম হয়, তবে কাশ্মীরের মত পরিষ্কার হয় না। পোকাদের কাছে পশমিনা রসগোল্লার মতই সুস্বাদু জিনিস। গরমে তাকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল, তবুও আমি দুটো চাদর নিলাম। ১৯-২০ তারিখে রামপুরে থেকে বইয়ের কাজে অথবা বন্ধু ও পরিচিতদের সঙ্গে দেখাশোনায় ব্যস্ত রইলাম। শ্রীবিদ্যাধর বিদ্যালংকার এই যাত্রায় আমাকে খুবই সাহায্য করেছেন। রামপুর থেকে কোনো জিনিসের দরকার পড়লে তিনি পাঠিয়ে দিতেন। তিনি গুরুকুল কাংড়ীর আয়ুর্বেদের স্নাতক, আর এখানে বনবিভাগে খাজাঞ্চীর কাজ করছিলেন। এখানে তাঁর বিদ্যার কোনো ব্যবহার ছিল না, তাই অসন্তুষ্ট ছিলেন। ফ্রেজার-এর বই 'হিমালা' এখানে

পড়তে পেলাম। ১৮১৪-র গোর্খা-ইংরেজ যুদ্ধে ইংরেজ সেনার সঙ্গে ফ্রেজার বিসাহর ও গাঢ়ওয়ালে ঘুরেছিল। তার এই বই ১৮২০ সালে লন্ডনও ছাপা হয়েছিল। এর মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল।

২০ তারিখ বিসাহরের প্রজা আন্দোলনে প্রধান অংশগ্রহণকারী পণ্ডিত সত্যদেব ও মাস্টার অনুলাল দেখা করতে এলেন। এখন তাঁরা দুধের মধ্যে মাছি হয়ে গেছেন। আমলাতান্ত্রিক কাঠামো দেশীয় রাজ্যকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে, যেখানে না প্রজাদের কোনো দাম আছে আর না আছে তার নেতাদের। তিব্বত-সীমান্তে বসবাসকারী লোকেদের আগ্নেয়াস্ত্র রাখায় কোনো বাধা ছিল না। এখন তার হিসেব-নিকেশ হচ্ছিল, আর সরকার অস্ত্র-আইন জারি করতে যাচ্ছিল। অনুলাল আর সত্যদেবজী শুধু সাহসের সঙ্গে রাজ্যের অত্যাচারের বিরোধিতাই করেন নি, ক্ষমতা হাতে আসার পর তার যথাযথ ব্যবহার করেছেন। কিছুদিনের জন্য এখানে না ছিল রাজার রাজ্য আর না ভারতীয় সরকারের রাজ্য। সেইসময় লুঠপাট হওয়া খুব সহজ ছিল, কিন্তু এই দুজন নেতাই তখন শান্তি স্থাপন করেছিলেন। রাজ্য এবং দেবীর ভাণ্ডার লুঠ হয়েছিল, এটা দিল্লীর দেবতাদের পাঠানো আমলাদের কাজ। মাস্টার অনুলাল আর পণ্ডিত সত্যদেবের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারতেন না, কারণ সিমলা থেকে গুলি-গাঁঠরি নিয়ে আসা সেপাইরা এখানের সবরকমের 'বিদ্রোহ' দমন করার জন্য তৈরি হয়ে এসেছিল।

নৌগড়ী—২১ আগস্ট নটার সময় জলখাবারের পর বেরোলাম। আজ ২৩ মাইলের যাত্রা সম্পূর্ণ করে কোটগড় পৌঁছলাম। লালা খুশিরামের কথা শুনে তাঁর কারখানা দেখার ইচ্ছে হলো। লালাজীও সঙ্গে ছিলেন। খুশিরামের বাবা বনবিভাগের ঠিকেদার ছিলেন। অনেক টাকা রোজগার করেছেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত সব নষ্ট করে ছেলেকে দারিদ্রের মধ্যে ফেলে চলে গেছেন। খুশিরামের স্বপ্ন দেখার শক্তি ছিল, আর হাতে-পায়ে কাজ করার জন্যও তিনি তৈরি ছিলেন। শতদ্রু আর নৌগড়ীর খাদে কোনায় অনেক জমি পড়ে ছিল। পাথরে ঢাকা ছিল সে-জমি। পনেরো বছর আগে তিনি পাথর পরিষ্কার করতে শুরু করেন। নৌগড়ীর জল থেকে জলচক্র বানানোর জন্য নালা কাটেন আর তাতে আটার চাকি বসিয়ে দেন। আস্তে আস্তে চাল কোটার চাকি, চাল ঝাড়ার চাকি, তেলের ঘানি আর কাঠ চেরাইয়ের কাজ এই দলবল নিয়ে করতে শুরু করেন। একটা ডায়নামো বসিয়ে বিদ্যুৎও উৎপন্ন করতে শুরু করেন, যার কাজ এখন রাজা আর অফিসারদের রেডিওর ব্যাটারিতে বিদ্যুৎ ভরা, আর ঘরে আলো জ্বালানো। এই সময় ২৫ মণ ও ১০ মণ আটা প্রতিদিন পেষাই করার মত দুটো চাকি চলছিল। অধিকাংশ মেশিন ভারতেই তৈরি। তেলের ঘানি প্রতিদিন দু কানেস্তারা সরষের আর চার কানেস্তারা খুবানির তেল বার করে। চালের চাকি ৪০ মণ ধান প্রতিদিন কোটে। ডায়নামো ছিল ১১০ ভোল্টের, যেটা তিনহাজার টাকায় কিনেছিলেন। ডায়নামো আর তেলের মেশিন বাদ দিয়ে আর সব জিনিসই স্বদেশী। সেই সঙ্গে থাকার জন্য ছিল খুব সুন্দর দোতলা বাড়ি। খেতে ফল আর শাক-সবজি যথেষ্ট হতো। শূন্য থেকে শুরু করে সেসময় তিনি ৪০-৫০ হাজার টাকার জিনিস দাঁড়

করিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো যে, তাঁর এই প্রচেষ্টা দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন, ছোট ছোট উদ্যোগ কিভাবে সাফল্যের সঙ্গে চালানো যায়।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার আর কি পরিকল্পনা আছে?' তিনি জানালেন, 'প্রথমে তো নালাটা বড় করে তিনগুণ বেশি জল দেবার উপযুক্ত করতে হবে, যার জন্য তিন হাজার টাকা খরচ হবে। ২২০ ভোল্টের ডায়নামোর জন্য ১০ হাজার টাকা, আর ২২০ ভোল্টের মোটরের জন্য ৫ হাজার আর ২ হাজারের অন্য জিনিস। এই হলে পরে জল দিয়ে নয়, বরং জল থেকে তৈরি বিদ্যুৎ দিয়ে আমার মেশিন চালাতে শুরু করব। ৮ হাজার লাগিয়ে উল ধোয়ার, ধোনার, রঙ করার, আর গোলা করার মেশিন বসিয়ে লোকেদের গোলা করা উল সস্তায় দিতে শুরু করব। ৫ হাজার আরো লাগাতে পারলে উল কাটা-বোনার মেশিনও বসে যাবে।' এটা নিশ্চিত যে, যদি উল ধোয়া, ধোনা, রঙিন বলের চেহারায় লোকেরা পায় তাহলে উলের কাপড়ের ব্যবসা অনেক বেড়ে যাবে, আর একটু উন্নত চরকা দিয়ে লোক তার থেকে যথেষ্ট পয়সা রোজগার করতে পারবে। মাত্র ৫০ হাজার টাকার ব্যাপার ছিল। তখন এবং এখনও সরকার ব্যবসায়ীদের কোটি কোটি টাকা ঋণ দিচ্ছে। আমি এই কথাটা চিফ কমিশনার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলাম, কিন্তু জানিনা হিমাচল প্রদেশ সরকারের কানে তা ঢুকেছে কি ঢোকেনি। খুশিরামজীকে আমি বললাম, 'আপনার এই কাজ দিয়ে আপনি নিজের এবং অপরেরও অনেক উপকার করতে পারেন। রাজনীতির খপ্পরে পড়বেন না, তাহলে বন্ধুর থেকে শত্রুই বেশি তৈরি করবেন। খুশিরাম দেখতে ভারি সাদা-সিধা প্রৌঢ় মানুষ। রামপুরের রাজার দরবারে পৌঁছনো তার কাছে সহজ ছিল, কিন্তু সিমলার দরবারে যে তিনি পৌঁছতে পারবেন, এতে সন্দেহ আছে।

নিরত—নৌগড়ী থেকে চার মাইল যাবার পর দত্তমন্দির পেলাম। নৌগড়ী থেকে নীচে শতদ্রুর এই বাম তীর প্রাচীন কালেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে হয়। সম্ভবত রামপুরের জমিতে রাজধানী হবার আগেও কোনো পুরনো বসতি ছিল। সেখানে শতদ্রুর বিস্তার কম হবার জন্য সেখানেই লোহার পুল তৈরি হয়েছে। ওপারে পাঞ্জাবের কুলু আর এপারে হিমাচল প্রদেশ। হিমাচল প্রদেশ বানানোর সময় এটাও খেয়াল হলো না যে, কাংড়া-কুলুকেও মিলিয়ে দিয়ে একটা বাজার বানিয়ে দেওয়া হোক। দত্ত মন্দিরে কিছু দোকান আছে, আর আছে পুরনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। চার মাইল হাঁটার পর নিরত পৌঁছলাম। এই মন্দিরটি নবম-দশম শতাব্দীর বলে মনে হয়। বুটপরা দ্বিভূজ সূর্যের মূর্তি তার প্রাচীনতার কথা জানাচ্ছিল। বুটপরা মূর্তি শকদের দ্বারা প্রচারিত হয়। কিন্তু এই মূর্তিটিকে খ্রিস্টপূর্ব তিন শতাব্দীর বলে মেনে নেওয়া যায় না। অক্ষয়বটের পাশে বহু খনিজ, বিষ্ণু ও হরগৌরীর মূর্তি ছিল। ধুতি না পরে মন্দিরের ভেতরে যাওয়া যায় না। ৪ ঘর ব্রাহ্মণ পূজারী আছে, যারা নিজেদের আদি গৌড় এবং ভরদ্বাজ গোত্রীয় বলে—'উত্তরে মাংসভোজনম্' -এর শাস্ত্রবাক্য তারা মেনে চলে কিন্তু দারিদ্রের জন্য ছমাসে একদিনই হয়তো মাংস খেতে পায়। মন্দিরের জমি আশেপাশের জমি থেকে বেশি নিচু, তাও তার প্রাচীনতার কথাই বলে। মন্দিরের বাইরে মণ্ডপ (জগমোহন) আছে। সবই

পাথর দিয়ে তৈরি আর শিখরযুক্ত। পাশে দেবীর মন্দির আছে, যেখানে পশুবলি হয়। শতদ্রুর পারে কয়েক মাইল নীচে, আর ওপরেও তিব্বতের সীমার ভেতর পর্যন্ত এতো প্রাচীন কোনো মন্দির নেই। জেলেরা মাছ ধরে রেখেছিল কিন্তু তা কাটা ছিল না, আর আমরা সেটা বয়ে নিয়ে যেতেও রাজি ছিলাম না, তাই 'শুতুদ্রি' মাতার প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হলাম।

শেষে আমরা সেই জায়গায় পৌঁছলাম, যেখান থেকে কোটগড়ের চড়াই শুরু হয়। ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়েছিলাম। বৃষ্টি হচ্ছিল। ঠানাদার আর কোটগড় একটি সম্মিলিত বসতি, বাজারের নাম ঠানাদার। সত্যানন্দ স্টোকের বাসস্থানের জন্য বিখ্যাত। বাজার থেকে কিছুটা দূরে সরে গিয়ে হাসপাতাল, যেখানে ডা· ভগবান সিংহের বাড়ি ছিল। মালপত্র নিয়ে আমরা সেখানে পৌঁছলাম। ডাঃ ভগবান সিংহ আমার পুরনো বন্ধু। ১৯৩৩ সালে যখন তিনি লাহুলে ডাক্তার ছিলেন, তখন কুলুতে তাঁর দেখা পেয়েছিলাম। তিনি পাঞ্জাবী, কিন্তু বৌদ্ধধর্মে প্রভাবিত হয়ে এখন নিজেকে বৌদ্ধ লেখেন। তাঁর স্ত্রী লাজ আজন্ম বৌদ্ধ। এখন সমস্ত পরিবারই তথাগতের ধর্ম মানে। এক তো বহুদূরের রাস্তা পার করে ক্লান্ত অবস্থায় এসেছিলাম, আর তাছাড়া রোগীর কাছে ডাক্তারের ছায়া খুবই মূল্যমান। এখন পাঁচদিনের জন্য তাঁরই অতিথি হয়ে গেলাম।

কোটগড় সেসময় খ্রিস্টান মিশনারিদের গড় ছিল। চার্চ মিশন এখানে অনেক বাড়ি বানিয়েছিল, মিড্‌ল স্কুল বানিয়েছিল, অনেক ধর্মপ্রচারক থাকতেন। কিন্তু ইংরেজি শাসনের ওপর সবকিছু ভিত্তি করে ছিল। তাদের চলে যাবার পর অবনতি হবার কথা। এখন মিশনের ইনচার্জ ছিলেন পাদরী ধন সিংহ। লাইব্রেরি এখনও ভাল অবস্থাতে ছিল। শিক্ষার চাহিদা আছে, তাই মিড্‌ল স্কুল এখন হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে। রঙ-ঢঙ দেখে মনে হচ্ছিল, এখানের মিশনেরও সেই অবস্থা হবে, যা স্পু, চিনী আর কেলং-এর হয়েছে। ডাক্তারবাবুর বাড়ির পাশের বাড়িটা এখনই ভেঙে পড়ছে। যে বাড়িতে ডাক্তার বৌধ থাকতেন, সেটাও তাঁরই জন্য সুরক্ষিত ছিল।

আগস্টে কোটগড়ে চিনীর মতই ঠাণ্ডা লাগত। এই জায়গাটা সাত হাজার ফুট উঁচু। কোটগড় এখন তার আপেলের জন্য বিখ্যাত, যার সমস্ত কৃতিত্ব স্বর্গীয় সত্যানন্দ স্টোকের প্রাপ্য। নিজের জন্মভূমি আমেরিকা থেকে পাদরী সত্যানন্দ স্টোক পাহাড়ীদের খ্রিস্টান করার জন্য এসেছিলেন। ধনী পরিবারের পুত্র ছিলেন তিনি, তাই ধর্মপ্রচার তাঁর কাছে জীবিকার মাধ্যম ছিল না। এখানে আসার পর কিছু প্রাচীন খ্রিস্টীয় পরম্পরা আর কিছু ভারতীয় সম্পর্ক তাঁকে নির্জনবাসী যোগী বানিয়ে দিয়েছিল। অল্পদিনের জন্য নয়, সাত বছর ধরে তিনি একটি গুহায় বাস করতে থাকেন। পরে তাঁর এটা নিরর্থক মনে হয়, প্রচারের কাজেও আর তিনি কোনো রস পান না। তারপর তিনি এক পাহাড়ী যুবতীকে বিয়ে করে গৃহস্থ হয়ে যান। বিবাহ করে অথবা এমনিই ভারতীয় নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে অনেক ইউরোপিয়ানই ভারতে থেকে গেছে। হোর্সিল-এর শিকারী উইলসন ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে এসে হিমালয়েরই হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পাহাড়ী স্ত্রীর সন্তান পিতার সংস্কৃতিতে দীক্ষিত হয়ে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হয়েছে, আর একমাত্র বেঁচে থাকা বধূর মৃত্যুর পর ওই

পুরুষের চিহ্নমাত্র থাকবে না। সে গাড়ওয়ালে প্রথম আলুর প্রচার করে। নদীর দ্বারা ওপরের জঙ্গলের কাঠ নীচে পাঠাবার সর্বপ্রথম রাস্তা সে বার করে। স্টোক অধিক দূরদর্শী ছিলেন। তিনি দেখলেন, এই মাটির সঙ্গে অভিন্নতা স্থাপন না করলে কাজ হবে না। তিনি হিন্দু ধর্ম নিয়ে স্টোক হয়ে গেলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যিনি ইংরেজি সৈন্যে লোক ভর্তি করার কাজ করেছিলেন এবং বিজয়স্মারক নিজের বাংলোর ভেতর খাড়া করেছিলেন, ইংরেজদের ভারতকে এখনও পরাধীন করে রাখার মনোবৃত্তি দেখে তিনি বিদ্রোহী হয়ে গেলেন। খাদী পরলেন, প্রচার করলেন, জেলে গেলেন। নিজের হাতে তৈরি করা বিজয়স্মারক সরিয়ে দিয়ে সেখানে ছোট একটা গীতামন্দির করে দিলেন। ছুতোরের কাজে তিনি দক্ষ ছিলেন। তিনি নিজের হাতে গীতা আর উপনিষদের বাণী দেবনাগরী অক্ষরে কাঠের ওপর খোদাই করে সেখানে বসিয়ে ছিলেন। মন্দিরে কোনো মূর্তি ছিল না, কেবল গীতার প্রতীক কৃষ্ণ আর অর্জুনের ছবি ছিল। পরে নিজের পুত্র প্রীতমচন্দের আগ্রহে হোমকুণ্ডও বানিয়ে দিয়েছিলেন।

সত্যানন্দের তিন পুত্র আর তিনকন্যা ছিল। সবচেয়ে বড় প্রীতমচন্দ এদিক দিয়ে যাবার সময় আগেই আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আর সবচেয়ে ছোট লালচন্দের সঙ্গে ২৬ আগস্ট তার বাড়িতে কয়েক ঘণ্টা ধরে কথা হলো। লালচন্দের বিয়ে হয়েছে স্থানীয় আপেলবাগানের সবচেয়ে বড় মালিক তহসিলদার অভীচন্দের মেয়ের সঙ্গে। দুই ছেলের বিয়ে রায়সাহেব দেবীদাসের মেয়েদের সঙ্গে হয়েছে। মেয়েদের মধ্যে একজনের অ্যাংলো ইন্ডিয়ানের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। এক জামাই কোয়েটার উকিল, যিনি উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে চলে এসেছেন।

কোটগড়ে সত্যানন্দ স্টোককে স্মরণ করতে গেলে এই কথাই যথেষ্ট নয়। কোটগড়বাসীদের তিনি পিতা ছিলেন। যখন তিনি মারা যান, সমস্ত কোটগড় আর আশেপাশের লোকেরা তাঁর জন্য এমনভাবে কেঁদেছিল, যেন তাদের নিজেদের বাবা মারা গেছে। নিজের সন্তানদের দায়িত্ব তিনি বুঝতেন কিন্তু তার থেকেও বেশি কোটগড়বাসীদের সেবা নিজের আদর্শ বলে মনে করতেন। দেশবিদেশ থেকে নানান জাতের আপেল আনিয়ে নিজের জায়গায় লাগিয়েছেন, আর তার চারা তৈরি করে লোকেদের লাগানোর জন্য প্রেরণা দিয়েছেন। দেশের বেনেরা পাহাড়ে এসে বিশ্রীভাবে লোকেদের লুঠ করে। একবার তাদের থেকে চড়া ধার করলে ঘরবাড়ি, খেতখামার বিক্রি করিয়েও তা শোধ হয় না। এমন ধারের হাত থেকে স্টোক লোকেদের বাঁচাতেন, নিজে বিনা সুদে টাকা দিতেন। এইভাবে এখানের লোকেদের জমি বিক্রি হতে দেননি। যখন লোকেরা আপেল হতে দেখল, আর সিমলায় গিয়ে ভাল দামে তা বিক্রি হতে দেখল, তখন তারা আপেলের বাগান করতে শুরু করল। আজ এই সমস্ত এলাকা আপেল বাগানে ভর্তি। এখানকার আপেল দিল্লী এবং অন্যান্য শহরে যায়। এখানকার সোনালি আপেল তো খুবই সুস্বাদু এবং মিষ্টি হয়।

ডা· বৌধ কয়েক বছরের মধ্যেই এবার চাকরি থেকে অবসর নিতে যাচ্ছেন। ডায়াবেটিস এখন আর আমাকে ভবঘুরে হবার উপযুক্ত করে রাখেনি। কোথাও একটু ছড়ে

গেল, তো তাই নিয়ে মাসের পর মাস বসে থাকো। এ কি ভবঘুরেমির পক্ষে অনুকূল হতে পারে? ডা· বৌধ সিমলা থেকে সোজা কুলু যাবার পথের ওপর, প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায়, অনীতে আট-দশ একর জমি কিনে রেখেছেন। এখনও এই রাস্তাটা মোটর চলার উপযুক্ত করে বানানো হয়নি, তবে তা বানানোর কোনো অসুবিধে নেই। এই রাস্তা দিল্লী থেকে নাক বরাবর উত্তরে কুলুতে গিয়ে পৌছোয়। শতদ্রুর ওপরে লোহার পুল আছে, আর আগে পিছনে রাস্তাটুকু চওড়া করে দিতে যা দেরি। ওদিকে ১৫ মাইল মোটর-রাস্তা বঞ্জারত পর্যন্ত এসেছে। এখন দুই সরকারের এতে ভাগ আছে, শতদ্রু থেকে দক্ষিণে হিমাচল প্রদেশেব আর শতদ্রু থেকে উত্তরে পাঞ্জাব সরকারের। সরকারের ভাগের কাজ নিয়ে আরোই মুশকিল হয়। তবে কোনো একসময় এটা মোটর-রাস্তা হয়েই যাবে, আর তখন অনী ও তার আশেপাশের অঞ্চলের ভাগ্য খুলে যাবে। কুলুর আপেলও এই পথেই আসবে। অনীতে মিশনাবিরা তাদের আড্ডা বানিয়েছিল। তাদের বাংলোগুলো বিক্রি হয়ে গেছে। আমারও এখন কোথাও কোনো ঠাণ্ডা জায়গায় থেকে কাজ করার কথা মনে হচ্ছিল। ডা· বৌধ অনীতে তাঁর সঙ্গে অথবা আলাদাভাবে থাকার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পাশ দিয়ে ঝর্নার জল বয়ে গেছে, জঙ্গলের মনোহর দৃশ্য, আর দেড় মাইল দূরত্বে ডাকঘর। পাঁচ-ছ হাজারে কাঠের একটা ছোটমত বাংলো বানানো যেত। মন তো ছটফট করতে শুরু করেছিল।

২৩ তারিখও বৃষ্টি হচ্ছিল। সিমলা যাবার রাস্তা বন্ধ ছিল। পায়ে হেঁটে যাওয়ায় এইসময় পাহাড় থেকে পাথর পড়ার ভয় ছিল। তাই যতক্ষণ আবহাওয়া অনুকূল না হয় ততক্ষণ এখান থেকে যাবার কথা চিন্তা করা যেত না। যত্র-তত্র দেখাসাক্ষাৎ করায় সময়টা খরচ করলাম।

২৩ আগস্ট রায়সাহেব অমীচাঁদ-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। রায়সাহেব এখনও তহসিলদার ছিলেন, এই বছর তাঁর আপেলবাগান ৪৫ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। এও তখন, যখন ৬০-৬৫ টাকার পেটি (৩৫ সের) এখনকার ৪৫-৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। রাস্তা ঠিক না থাকায় খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে আপেল নারকণ্ডা নিয়ে যেতে হয়। এরকম আবহাওয়ায় কোটগড়ে রেলওয়ে অটো এজেন্সি থাকে, যারা পাঠানোর কাজ নিজের দায়িত্বে করে। এজেন্সির ইনচার্জ রমেশচন্দ্র খুবই উৎসাহী যুবক ছিলেন। তিনি দায়িত্ব নিয়ে রেখেছিলেন, 'যখনি জিপ আসবে, আমি ব্যবস্থা করব।' বাগানের ব্যবস্থার জন্য রায়সাহেবের চিন্তা করার দরকার ছিল না। তাঁর স্ত্রী সুভদ্রাদেবী সমস্ত কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করে নিতেন। দম্পতির এক ছেলে বি· এ· পড়ছিল, অকালেই তার মৃত্যু হয়। এখন একটি ছেলে প্রকাশচন্দ ছিল, যে কৃষিতে এম· এস·সি· করে কিছুদিন সরকারি কর্মচারী ছিল। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে সেখানেই একা থাকত। খুবই সম্ভাবনাময় যুবক ছিল সে। বলতে দুঃখ হয়, এই গতবছর (ডিসেম্বর ১৯৫৫) সিমলার দিকে কোনো দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে। মা-বাবা আর যুবতী বিধবার ওপর দিয়ে কি গেছে, তা ভাষায় কি করে প্রকাশ করা যায়? এখন তার মায়ের চিঠি এসেছিল, যার মধ্যে নিজের বিহ্বলতা আর বিবশতা প্রকাশ করেছিলেন। এর আগেই কেউ আমাকে এই দুর্ঘটনার কথা বলেছিল, আর

পরে ডা· বৌধের চিঠিতেও জানতে পেরেছিলাম। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও এই বৃদ্ধ দম্পতির ঘর শূন্য হয়ে গেল। সময় কিছুটা মলমের কাজ দেবে, কিন্তু সারা জীবনেও ঘা যে শুকোবে না, তাতে সন্দেহ নেই।

ডা· বৌধের বাড়ির পাশে নীচে উতরাই-এর দিকে তাকালে দূরে আবার উঠে যাওয়া পাহাড় চোখে পড়ছিল। এই উতরাই-এর সবচেয়ে নীচের অংশে মানসসরোবরের জল নিয়ে শতদ্রু নীচের দিকে বয়ে চলেছে। সেই জল, যা আগে অনেকটাই এমনি এমনি সমুদ্রে যাবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হতো, এখন মানুষের হাতে পড়ে ভাকরা-নাঙ্গাল এর কৃত্রিম সমুদ্র আর বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগতে চলেছে। এই উতরাই-এর রাস্তায় গেলেই সেই সড়ক পাওয়া যাবে, যা কুলুতে গেছে। একবার পাতিয়ালার প্রথম রাজা অস্টিনকে কুলু পর্যন্ত এনে দেখিয়ে দিয়েছিল যে রাস্তা বানানো কঠিন কাজ নয়।

পাহাড়ের দারিদ্র একটা বড় সমস্যা, আর যাতায়াতও। ইংরেজ রাজত্বের আর একটা বড় দান হলো রতিজ রোগ। যেখানে যেখানে গোরাদের ছাউনি ছিল, সেখানে সেখানে প্রমেহ আর উপদংশ ছড়িয়েছে। ডা· ভগবান সিংহের থেকে বেশি এ বিষয়ে আর কে বলতে পারত? তিনি জানালেন, লাহুল কোটগড়ে ২৫ শতাংশ লোক এর রোগী। কুলু, বাগী, নির্মণ্ড, কোটনখাই-তে বোধহয় বড়জোর ৩০ শতাংশ লোক রোগমুক্ত পাওয়া যাবে। প্রমেহ স্ত্রী-পুরুষকে নিঃসন্তান করে দেয়, যার ফলস্বরূপ প্রতিটি গ্রামে কত ঘর নির্মূল হয়ে গেছে অথবা হচ্ছে। পেনিসিলিন প্রমেহর অব্যর্থ ওষুধ, কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে এই রোগকে তখনই নির্মূল করতে পারে যখন সন্দেহভাজন কোনো ব্যক্তি ইনজেকশন ছাড়া না থাকে। উপদংশের ওপর তাব প্রভাব পড়ে না। যদিও বলা হয় কুষ্ঠর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, তবু লোক অঙ্গ-ভঙ্গ তো হয়ই।

ডা বৌধ-এর জায়গা অনী নারকণ্ডে থেকে ২৪ মাইল আর লুরীর পুল থেকে ১৩ মাইল দূরে (শতদ্রুর পার মাত্র ১১ মাইল)। লুরী শতদ্রুর এ পারে। সে পর্যন্ত জিপ আর মোটর যেতে পারে। ডা· ভগবান সিংহের বড় ছেলে বহুদিন আগে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল। চিন্তা হবারই কথা, কিন্তু ভবঘুরে কি বিনা প্রসববেদনায় জন্ম নেয়? জোয়ান ছেলে, দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়তো। যদিও এইরকম স্পষ্টবাদিতা আমি ডাক্তার সাহেবের সামনে দেখাতে পারতাম না।

দেশভাগের সময় ১৯৪৭-এর শেষ তিনমাসে পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমানের যে দাঙ্গা হয়েছিল, তার ছিটে এখানেও এসে পড়েছিল। গুর্জররা আধা-যাযাবর মুসলমান। এরা মোষপালন করে, সেগুলো বিক্রি এবং ঘি বেচে রোজগার করে। মোষের পিছন পিছন সমানে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়ানো তাদের কাজ। সেই আঁধিতে এদের ওপরেও প্রহার হলো। অনেকে হিন্দু সেজে নিজেদের প্রাণ বাঁচালো। এখন আবার তারা নিজেদের ধর্ম মানে। তাদের জন্য আর একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে। পাহাড়ের পিঠের দিকে ঠাণ্ডা জায়গায় খুব ভাল ঘাস হয়। আগে পাহাড়ীদের কাছে এই চারণভূমির কোনো দাম ছিল না, এখন তারাও তাদের পশুদের জন্য গোচারণভূমি চাইছে আর গুর্জরদের তার থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে। গুর্জররাও বছরের পর বছর ধরে নিজেদের

ব্যবহার করা ভূমি ছেড়ে দিতে পারে না। এ বড় মাথাব্যথার ব্যাপার। গুর্জরদের মধ্যে চৌআন, টিগু, দেদড়, গোরসী, চাড, পুসবাড, ঠাকরিয়ে কাউস, লোদা, কসাণে, পটাণে ইত্যাদি ভেদ পাওয়া যায়। গুর্জররা মধ্য-এশিয়া থেকে শকদের সঙ্গে ভারতে এসেছিল। আমাকে জানানো হলো, কোটগড়ে একটি ঘর আছে যে সেই আঁধির সময় হিন্দু হয়ে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। লালচন্দ স্টোকের মেসো নসীব আলীর ওপরও এর আঁচ এসে পড়েছিল। কিন্তু তার নামটাই শুধু মুসলমান, এমনিতে তিনি ছিলেন খ্রিস্টান। এখন বুড়ো হয়ে গেছেন, স্টোকের কৃপায় বাগান হিসেবে সামান্য সম্পত্তি আছে, তা দিয়ে দিন চালান। নসীব আলী জাতিতে দরদ, যাঁর দেশ গিলগিট, এখন পাকিস্তানে পড়ে। ইনি খাম আর তিব্বতে বহু দূর পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন। ইচ্ছে হতো, দু-চারদিন কাছে বসে তাঁর যাত্রার বিবরণ তৈরি করে নিই। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে হিমালয় পারের দেশগুলি খুঁজে বার করার জন্য বহুলোক দুঃসাহসিক যাত্রা করেছিল। গিলগিট থেকে পূর্বদিকে চীনের সীমার ভেতর পর্যন্ত যাওয়া ভবঘুরের যাত্রার কম বিবরণ হবে না।

কোটগড় ছাড়ার সময় বুঝতে পারলাম সামনের এপ্রিলে অনীতে অবশ্য আসতে হবে। ডা· ভগবান সিংহের কাছ থেকে দুএকর জমি নেব, আর তিন-চার হাজারে কাঠের কুটির তৈরি হয়ে যাবে। কোটগড়ে থাকার মত অনুকূল জায়গা নেই। মে-জুন মাসে এখানে জল দুর্লভ হয়ে যায়, কাঠের কষ্ট, চাকরের কষ্ট তো আছেই। অবশ্য অনী মোটর-রাস্তা থেকে ২৪ মাইল দূরে, যার মধ্যে ৯ মাইল আবার চড়াই পড়ে, তবে এই অসুবিধে কয়েক বছর পরে আর থাকবে না, ততদিনে কুলুর মোটর-রাস্তা তৈরি হয়ে যাবে। তবে যেসব দিনের এই কল্পনা আকাশকুসুমই। ডা· ভগবান সিংহও পেনশন নেবার পর বাচ্চাদের শিক্ষা আব নিজের কাজের জন্য অনীর থেকে কুলুকেই বেশি ভাল মনে করলেন।

নারকণ্ডা (৯,১৬০ ফুট) জিপের অপেক্ষা আর কতদিন করব? ২৭ তারিখ সকাল নটায় জিনিসপত্র কুলির মাথায় চাপিয়ে রওনা দিলাম। নারকণ্ডা আসলে নাগকণ্ডা। কণ্ডাতে সেই নাগদেবতার ছোট মন্দির এখনও আছে, যার জন্য এই কণ্ডা (ডাণ্ডা, জোত)-র এই নাম হয়েছে।

নারকণ্ডা যখন আর ৪ মাইল বাকি, তখন বাঁদিকে ৬ মাইলে একটা মোটর-রাস্তা বাগী যেতে দেখা গেল। বাগী নারকণ্ডার থেকে উঁচু জায়গা। এখনও রাস্তা চালু হয়নি। এটা সামনে বাড়তে বাড়তে রোড়ু পর্যন্ত চলে যাবে, যার ফলে যমুনার শাখা পব্বরের বিশাল উপত্যকাও সম্প্রতি যাতায়াতের জন্য খুলে যাবে। বারোটা বেজে ২০ মিনিটে আমরা নারকোণ্ডায় পৌঁছলাম। বলা হয়েছিল, সেখানে জিপ আসে, জিপ-টিপের কোথাও কোনো পাত্তা ছিল না। এখানকার ডাকবাংলো খুব বড় আর আদর্শ বাংলো। অনুমতি নেবার কোনো দরকার নেই, যে আসে সেই থাকে। আর খানসামা নির্দিষ্ট দামে চা, খাবার দেয়। সমস্ত বাংলো এমন হলে পর্যটকদের কত আরাম হয়। আজ জন্মাষ্টমী ছিল। দোকানদার নিজের ভক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী তা পালন করছিল। আজ আমরা এখানেই থাকব। কিন্তু চিন্তা ছিল কালকের জন্য। এই সময় রামপুরে কাউকে পৌঁছে দিয়ে ফেরৎ একটা রিকশা পেয়ে গেলাম। ২২ মাইল পরে ঠিয়োগ পর্যন্ত ১৮ টাকা ভাড়ায় মালপত্রসহ আমাকে

নিয়ে যেতে রাজি হলো। সেখান থেকে তো মোটর বাস সিমলা যায়ই।

ঠিয়োগ—২৮ তারিখ সাতটার সময় বেরিয়ে পড়লাম। ২২ মাইলের মধ্যে সাড়ে ১৭ মাইল আমি হেঁটেই গেলাম। আসলে মালপত্রের জন্যই রিকশা দরকার ছিল, নয়ত আমি হেঁটেই যেতে পারতাম। শেষেও তাড়াতাড়ি যাবার জন্য রিকশায় উঠলাম, কারণ জানতাম দুটোর সময় মোটর চলে যায়। মোটর প্রস্তুতও ছিল, কিন্তু যেখানে মানুষের ভাড়া দেড় টাকা আর আলুর ফী মণ প্রতি ৪ টাকা, সেখানে কোন মোটরওলা মানুষকে চড়ানোর বোকামি করবে? কৈলাশ মোটর সার্ভিসের ড্রাইভার নিতে অস্বীকার করল। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল হয়ত কোনো মোটরওলাই নিয়ে যেতে চাইবে না। প্রাইভেট মোটর সার্ভিসের এই অবস্থাই হয়। যাইহোক, চার ঘণ্টা বসতে হলো। ছটার সময় অন্য গাড়িতে জায়গা পেলাম। সেটাতেও ১২-১৪ বস্তা আলু চাপানো হয়েছিল। রাস্তায় বেশ ভাল বৃষ্টি হলো। রাত সাড়ে নটার সময় মোটর থেকে নেমে ফার গ্রোভে নায়ার সাহেবের কাছে পৌছলাম।

সিমলা—এখন ৫ দিনের জন্য সিমলাবাসী হয়ে গেলাম। খবর পেলাম ৫ সেপ্টেম্বর সম্মেলন-কার্যসমিতির বৈঠক আছে, সেজন্য সেদিন ওখানে পৌছনো দরকার ছিল। এই পাঁচটা দিন সিমলা ঘুরে বেড়িয়ে, যত্র-তত্র মানুষের সঙ্গে বিশেষ করে শ্রীএন· সি· মেহতার সঙ্গে দেখা করে কাটালাম। মেহতাজীকে আমি বললাম, এমন সব ফলের চাষ করার জন্য কিন্নর দেশের খুবই গুরুত্ব আছে, যেসব ফলের জায়গা কোয়েটা (পাকিস্তানে)-তে চলে গেছে। সেখানে নানারকম ধাতুও আছে, কিন্তু এই দুই কাজের জন্যই মোটর-রাস্তা বানানো দরকার। চিনীর কল্পা-তে ছোট বিমানের জন্য অবতরণ-ভূমি তৈরি করা যেতে পারে। চিনীর মিড্‌ল স্কুলকে হাইস্কুল করা দরকার। তিব্বতী ভাষাভাষী লোকেদের তিব্বতী শিক্ষা দেওয়া উচিত। এছাড়াও আমি সেখানকার পুরাতত্ত্ব ও কোঠির মূর্তিগুলির বিষয়ে জানালাম আর বললাম যে, তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। তাঁর কথায় মনে হচ্ছিল, এই সব ব্যাপারের কিছুই বুঝি হবার সম্ভাবনা নেই। হিমাচল প্রদেশ থেকে সব মিলিয়ে যা রোজগার হতো, তা আমলাতন্ত্রের খরচের জন্যই পর্যাপ্ত ছিল না। অন্য কাজ শুধু দিল্লীর সাহায্যে হতে পারত। ৩০ আগস্ট দেখা হলে ঠাকুর গোবিন্দ সিংহও একই কথা বললেন যে, সমস্ত খোশামুদে কিংবা অন্য প্রদেশের অফিসার দিয়ে দপ্তর ভর্তি করে রেখেছে। রাজাদের সামনে যেমন খোশামোদ চলত, তার থেকেও বেশি এখন এদের রেওয়াজ হয়েছে। একজন ম্যাট্রিক পাশ লোক রঘুবীর জুব্বলের এস· ডি· ও· হয়েছে। বুশহরে সেরকমই আর একজন মানুষকে পাঠানো হয়েছে। একদিনের কাজ সারা মাস ধরেও হয় না। রোড়ু তহসিলের অড়ইল-এর জলের ট্যাঙ্ক খারাপ হয়ে গেল, যে কারণে কল থেকে জল পাওয়া যাচ্ছিল না। লোকেদের খুব কষ্ট যাচ্ছিল কিন্তু কোথাও কেউ কর্ণপাত করবে না। মজ্জীর হাসপাতাল ভেঙে দেওয়া হলো। কোনো অফিসার সিমলা ছেড়ে বাইরে যেতে রাজি নয়। যদি কেউ সফরে যায়, দশ আনার জায়গায় পাঁচ আনা

সের দুধ নিতে চায়। এমন হলে পরে অনেকে কেনই বা মনে করবে না যে, এর থেকে রাজার রাজ্যই ভাল ছিল?

হিমালয়ের কোথাও থাকার ইচ্ছে প্রকাশ করলে মেহতাজী চম্বার খাজিয়ার-এর কথা বললেন। এটা তো মানতামই যে, কোথাও যদি আমার স্থায়ী নিবাস বানাতেই হয় তবে তা ৬০০০ ফুটের কাছাকাছি হওয়া উচিত। বাঘি ১০ হাজার ফুটের থেকে উঁচুতে, কিন্তু ৬০০০ ফুটের ওপর হলে আপেল টক হয়ে যায়। কুলুর চন্দ্রকান্তজী চিনীতে আসতে চাইছিলেন, এলে ঠিক লেখায় সাহায্য করতেন, কিন্তু তাঁর কষ্টও হতো। এখানে সিমলায় একসঙ্গে ঘুরে বেড়ালাম। বি· এ· পাস করে এখন কোনো কাজ খুঁজছিলেন। সাহিত্যেরও শখ আছে, কিন্তু খালি পেটে তো আর সাহিত্যসেবা করা যায় না? তাঁর নিজের খেত আর বাগান আছে, যা দিয়ে জীবিকা চালিয়ে সাহিত্যসেবা করা কষ্টকর ছিল না, কিন্তু আজকের শিক্ষিত ছেলের এমন জীবন কি করে পছন্দ হতে পারে?

দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তির সময় রাজকোষ এবং রাজাদের জিনিস কিভাবে হাত সাফাই হয়েছিল, তার অনেক কথা জানতে পারলাম। রামপুরের ভাণ্ডারের সম্বন্ধে তো আগেই লিখেছি। আর সরাহনের দেবীর ভাণ্ডার লুঠের যাতে কোনো চিহ্ন না থাকে, তার জন্য পুরনো কাগজপত্র সব জ্বালানো হয়েছিল, তাও আগে বলেছি। রাজাদের রুপোর টি-সেট, পুরনো ছবি, অন্য আরো কত জিনিস সরকারি অফিসাররা নিজেদের করে নিয়েছিল। কয়েক মাসের জন্য তো 'রামনাম কী লূট হৈ, লূট সকে তো লূট'[1] এই শ্লোগান চলছিল। লাখ লাখ টাকা মানুষ নিজেদের ঘরে ঢুকিয়েছে।

১ সেপ্টেম্বর বন্ধুরা এখানকার ফ্যাশনেবল রেস্তোরাঁ ডেবিকো-র বলরুম (নৃত্যশালা)-এ নিয়ে গেল। সাড়ে ৪ টাকায় সিট রিজার্ভ করা ছিল—খাবারের সঙ্গে নৃত্য ও অন্যান্য প্রদর্শনী দেখার। গোগিয়া পাশা এবং তার দলবল নাচ আর অন্য খেলা দেখাল। পাশা তাশ আর সিগারেটের কিছু মজার খেলা দেখাল, অন্যরা সার্কাসের খেলা দেখাল। চার আনার টিকিট কাটলে দলের মেয়েদের সঙ্গে নাচ করার ছাড় ছিল। এক শিখ ছোকরা, যে একেবারে নাচ জানত না, চার আনার করে টিকিট নিয়ে বারবার একটি মেয়ের সঙ্গে নাচতে লাগল। চার আনার টিকিট কেটে যে কেউ পিঠে হাত রাখলে, সুন্দরী তার সঙ্গে নাচতে বাধ্য ছিল, আর অপর নাচের সঙ্গীকে ছেড়ে দিতে হতো। নর্তকীরা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছিল। শিখ ছোকরাকে এইভাবে তাড়াতাড়ি টিকিট নিয়ে হাত রাখতে দেখে ভয় করতে শুরু করেছিল যে, এখানে আবার হিন্দু-শিখ লড়াই না লেগে যায়।

সিমলা থেকে আমরা প্রয়াগে ফিরে এলাম।

---

[1] এই লোকোক্তিটির ভাবার্থ, 'লুটের রাজত্ব চলছে, 'যে লুটতে পারবে লুটে নাও।'—স·ম·

পরিভাষার কাজে

প্রয়াগ—গরমে আবার সিমলায় আসার ইচ্ছে ছিল,তাই কিছু জিনিসপত্র এখানেই রেখে দিলাম। লন্ডন থেকে আনা রেডিও এখানে রেখে চিনী গিয়েছিলাম, এখন সেটাকে অকাজের মনে করে বিক্রি করে মুক্ত হলাম। কালকা থেকে প্রয়াগের জন্য ৪৯ টাকা ১৫ আনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সিট রিজার্ভ করে রেখেছিলাম। তাই রেলের চিন্তা ছিল না।

৩ সেপ্টেম্বর নাইয়ার দম্পতি ও তাদের বোন রজনীকে আতিথ্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আড়াইটের সময় ডিপোতে পৌছলাম। জানানো হলো, গাড়ি ছাড়বে এক ঘন্টা পরে, কিন্তু ছাড়ল চারটের সময়। নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে গরম বাড়ছিল, আর অন্যদিকে দাঁতে ব্যথা হচ্ছিল, কোনটা বেশি কষ্ট দিচ্ছিল তা বলতে পারব না। সোলন-এ সহযাত্রীরা চা খেতে ঘন্টাখানেক লাগিয়ে দিল। পরের যাত্রা রাতে করতে হলো গাড়ির আলো। ভীষণই কম ছিল। ভয় হচ্ছিল গাড়ি নীচের দিকে না চলে যায়। যাইহোক, কোনোরকমে সাড়ে আটটার সময় কালকা পৌছে গেলাম। গাড়ি প্রস্তুত ছিল। ওপরের বার্থ পেয়েছিলাম—এর হাত থেকে বাঁচতে চাই, কারণ রাতে বেশ কয়েকবার পেচ্ছাপ করার জন্য নামতে হয়। ট্রেন সাড়ে দশটায় রওনা হলো। সকালে দিল্লী পৌছল। এক ঘন্টার বেশি দাঁড়িয়ে থাকল। দাঁতের ব্যথায় আমি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলাম। সারাদিন ওপরেই বার্থে শুয়ে রইলাম. কিছু খেলাম না, পাখা প্রাণ বাঁচাচ্ছিল। ভাবছিলাম, মার্চের শেষে পাহাড়ে চলে যাওয়া উচিত আর নভেম্বরের শুরুর আগে সেখান থেকে নামার কথা চিন্তা করা উচিত নয়। ব্যাস, পাঁচ মাসের বেশি সমতলের জন্য রাখা দরকার, তবে কিছু কাজ করা সম্ভব হবে। তবেই শরীর সুস্থ রাখা যাবে। আমার কম্পার্টমেন্টে চারজন লোক ছিল। সুন্দরলাল গোঁসাই লাহোরে উকিল ছিলেন, মাসে দুহাজার টাকা রোজগার। সেইসঙ্গে হাইকোর্টে জজ হবার আশাও ছিল। পাকিস্তান সবকিছুর ওপর জল ঢেলে দিয়েছে। দুহাজার এখনও রোজগার করছেন। ঘরবাড়ি গেছে, তবে থাকাটা কোনোরকমে হয়ে যায়। পঁচিশ হাজার টাকার গ্রন্থাগার ছিল। এর তিন-চতুর্থাংশ বই আনাতে পেরেছেন জফরুল্লার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল বলে। দ্বিতীয়জন ছিলেন শাহজাদা মেজাজের কোনো শেঠের পুত্র. যিনি সবসময় মোটর আর মোটরের কল-কব্জার কথা বলছিলেন। তৃতীয় ভদ্রলোক কিছুটা হাসিমুখের ছিলেন, যিনি কানপুরে নেমে গেলেন। এইসময় যমুনা,গঙ্গা, ঘাঘরার বন্যায় যুক্তপ্রদেশে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। বন্যা কিংবা খরা, যুক্তপ্রদেশের কোনো না কোনো অংশকে প্রতি বছর ঘিরে থাকে। প্রাণের ক্ষতির থেকে বেশি বিপদ জীবিকা নষ্ট হওয়ার। এর ওষুধ তখনই হতে পারে, যখন ফসলের অনিবার্য বিমা করা হবে। ভাল ফসল হবার সময় সরকার কিছু শতাংশ নিয়ে নিক, আর ফসল নষ্ট হলে বীমার হিসেবমত শস্য দিয়ে দিক। ৪ তারিখ প্রয়াগ পৌছে শ্রীনিবাসজীর বাড়িতে উঠলাম।

৫ তারিখ রোববার ছিল। সরকারি কার্যালয়ের কর্মচারীদের সুবিধের জন্য সম্মেলনের

সমিতিগুলির বৈঠক বেশিরভাগ রোববারই হয়ে থাকে। সেদিন এগারোটার সময় কার্যসমিতির বৈঠক হলো। সম্মেলন-নিয়মাবলীর সংশোধনের কাজ হচ্ছিল। নিয়মাবলীর সংশোধনের কাজ আরো আগে থেকে চলছে। ট্যান্ডনজী যদি আর একটু কম দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে কাজ করতেন, তাহলে হয়তো নিয়মাবলী অনেক আগেই স্বীকৃত হয়ে যেত। আর তখন গুড়ের পিঁপড়ের পাল্লায় পড়ে ভুগতে হতো না এবং সম্মেলনও পাঁকে পড়তো না। সংশোধন রাখা হলো যে, সম্মেলনের প্রধান আর প্রধানমন্ত্রী তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হোক আর তাঁরাই মন্ত্রীমণ্ডল তৈরি করুন। দিল্লীতে সম্মেলন ভবন বানানোর জন্য সরকার এই শর্তে পাঁচ লাখ টাকা দিচ্ছিল যে, সম্মেলনও আরো পাঁচ লাখ টাকা জমা করবে। এতে কিছু অসুবিধে ছিল না, কিন্তু তাতেও শেষ সিদ্ধান্ত ট্যান্ডনজীর হাতে ছিল। সব জায়গায় কিছুদূর যাবার পর রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। ট্যান্ডনজী উঁচু আদর্শ নিয়ে চলেন, তাঁর বিধান নিয়ে সন্দেহ করা চলত না। তবে কোনো কোনো কাজ ঘণ্টা মিনিটে স্থির করলে তবেই হয়, অথচ তিনি বছরের পর বছরেও সিদ্ধান্তে পৌছতে চান না।

সেই দিনই কুমারী কেম্প-এর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি যুগোস্লাভিয়ার নাগরিক, এখন এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে রুশভাষা পড়াচ্ছিলেন। যুগোস্লাভিয়ার ভাষা আর রুশ ভাষার খুব কাছাকাছি সম্বন্ধ। ইংরেজিও তাঁর কাছে তাঁর মাতৃভাষারই মত, তাই তাঁর মত একজন অধ্যাপিকা সহজে পাওয়া যেত না। কিন্তু তাঁর নিজের বিষয় ছিল পুরাতত্ত্ব আর নৃতত্ত্ব, যে কাজের এখানে খুব সুবিধে ছিল না, তাঁর সামনে এটা একটা বড় বাধা ছিল।

এ সময় বন্যা হয়েছিল। ১৯১৬-র বন্যায় যতটা জল উঠেছিল তার থেকেও উঁচুতে উঠেছিল জল। গঙ্গার জল নিয়ে ফেলার জন্য যে নালিগুলো বানানো হয়েছিল, সেগুলো এখন জল নিয়ে আসার নালি হয়ে উঠত যদি তাদের খোলা রাখা হতো। মানুষ শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। ৮ তারিখ তো ক্রাস্থবেট মহিলা কলেজের ভেতর একটা ছোটখাটো নদী বয়ে চলেছিল, যমুনা ক্ষুদ্র নদীর মত গর্বে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। ৯ তারিখ দুই বোন যখন নামতে শুরু করল, তখন লোকের ধড়ে প্রাণ এলো।

'শাসন শব্দকোষ' প্রেসে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, আর চারভাগের এক ভাগ কম্পোজও হয়ে গিয়েছিল। কমানো-বাড়ানো যা কিছু করা দরকার, তা প্রুফে করতে হতো। সবার আগে এই কাজটাই সম্পূর্ণ করার দরকার ছিল। 'কিন্নর দেশ মেঁ'-এর কিছু অংশ এখনও লেখা বাকি ছিল, আর 'আজ কী রাজনীতি' ও 'ঘুমক্কড় শাস্ত্র' তখনও মাথাতেই রয়েছে, কাগজে লেখা হয়নি। তার জন্যও প্রকাশকের দাবি ছিল। ৯ সেপ্টেম্বর 'শাসন শব্দকোষ'-এর প্রথম ফর্মা ছাপার নির্দেশ দিলাম। সেদিন বুঝতে পারলাম পেচ্ছাপ খুব বেশি হচ্ছে। হিমালয়ের নিয়মিত হাঁটার কোনো ফল হলো না? আমি নিরাশ হলাম না, পরের দিন থেকে রোজ ৬ মাইল হাঁটার নিয়ম করে নিলাম। এতটা কিংবা এর চেয়ে কিছুটা কম কয়েক মাস পর্যন্ত নিয়মিত হাঁটতে লাগলাম। বেনারস থেকে দুঃখজনক খবর পেলাম—রায় কৃষ্ণদাসের বাড়ি পড়ে গেছে। আজকাল বাড়ি বানানো খুব সহজ নয়। তাঁর খানদানী বাড়ি খুবই সুন্দর ছিল। পাশ দিয়ে গঙ্গার স্রোত দেখা যেত। সেদিনই জানলাম, হায়দ্রাবাদের বিষয়ে ভারত সরকার কিছু করবে বলে ঠিক করেছে। ১৩ তারিখ খবর

পেলাম, যে ভারতীয় সৈন্য শোলাপুর, বেজওয়াড়া, মনমাড় আর চান্দা—চার জায়গা দিয়ে হায়দ্রাবাদে ঢুকেছে, যার মধ্যে দক্ষিণ (বেজওয়াড়া আর পশ্চিম শোলাপুর) দিক দিয়ে মূল আক্রমণ হচ্ছে। শোলাপুর থেকে তারা আড়াইশো মাইল আগে এগিয়ে গেছে। পরিচালক জেনারেল রাজেন্দ্র সিংহের একটি কমিউনিক থেকে এটা পরিষ্কার ছিল যে, ভারত সরকার নিজামকে বহাল রাখতে চায়। শুধু তাই না, সে তো অনেক আগের থেকে এও চাইছিল যে, হায়দ্রাবাদের মধ্যে পড়া মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রের অংশটুকুকে সর্বদা তার অকৃত্রিম বন্ধুদের থেকে আলাদা রাখা হোক। রিজবীর সেলামী রজাকাররা (স্বয়ং সেবক) হায়দ্রাবাদে চূড়ান্ত ব্যাপার করল। সেখানে দ্বিতীয় পাকিস্তান কায়েম হয়ে গেল। হাজার হাজার হিন্দু পরিবার নিজেদের নিরাপত্তাহীন মনে করে রাজ্যের বাইরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু, রজাকাররা আধুনিক সৈন্যের রিবোধ কি করে করতে পারত? পরের দিনের খবর থেকেও এটা জানা গেল যে, খুব বেশি প্রতিরোধ হচ্ছে না। ১৭ সেপ্টেম্বর বিকেল পাঁচটায় নিজাম অধীনতা স্বীকার করল আর পাঁচদিনেই হায়দ্রাবাদ-কাণ্ড শেষ হয়ে গেল। হায়দ্রাবাদে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হোক, তার জন্য প্যাটেলই দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু নেহরু তাঁর সর্বজ্ঞভাব নিয়ে সবসময় দ্বিধাগ্রস্ত থেকেছেন। এও বলা হয় যে, সৈন্যদের এগোনোর হুকুম দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, সেদিনই মাঝরাতে ইংরেজ প্রধান সেনাপতি সরকারকে জানায় যে, এমন করলে পাকিস্তান আক্রমণ করবে এবং দিল্লী, আমেদাবাদ আর বোম্বাইকে পাকিস্তানী উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত কবে দেবে। দিল্লীব দেবতারা ঘাবড়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন তো হাত থেকে তীর বেরিয়েই গেছে।

প্রয়াগে থেকে ছাত্র এবং যুবকদের সংগঠনগুলির কোনো না কোনো কাজে অংশ নেওয়াটা জরুবি হয়ে দাঁড়ালো। ১৩ সেপ্টেম্বর কায়স্থ পাঠশালার ছাত্র-সংঘের উদ্ঘাটন করতে গেলাম। পরের দিন সন্ধেবেলা ইন্দো-সোভিযেত সোসাইটির উদঘাটন করতে হলো এবং ভাষণ দিতে হলো।

বহুদিন ধরেই আমি এ বিষয়ে জোর দিচ্ছিলাম যে, উর্দুর অমূল্য সম্পদগুলিকে দেবনাগরী অক্ষরে পরিবর্তিত করা উচিত। আমি সভাপতি থাকার সময় সম্মেলন থেকে এমনি ১৬টি পুঁথি বার করবার কথাও হয়েছিল, কিন্তু কেউ সে কাজে এগিয়ে আসেনি। গোয়েলজী উর্দু কবিতার ওপর একটি খুব সুন্দব বই 'শের-ও-শায়রী' লিখেছেন, যার ভূমিকা আমাকে লিখতে বললেন। এই কাজ করতে আমার খুব আনন্দ হলো, কারণ উর্দু কাব্যে গোয়েলজীর এমন গভীর জ্ঞান ও লেখার ক্ষমতা ছিল যার দ্বারা হিন্দি পাঠকদের পক্ষে উর্দু কবিতা বোঝা খুব সহজ হতো। বেশ বড় বই। লা-জার্নাল প্রেসে খুব সুন্দর করে ছাপা হয়েছে। হিন্দিভাষীরা যে উর্দু কবিতার অনুরাগী, তা এর থেকে বোঝা যায় যে বইটির প্রথম সংস্করণ একবছরেই শেষ হয়ে গেল, আর তাই গোয়েলজী উৎসাহিত হয়ে কয়েক খণ্ডে 'শের-ও-সুখন' প্রকাশিত করে উর্দু কবিতার খুব বড় একটা অংশ হিন্দি পাঠকদের জন্য সুলভ করে দিলেন। এটা খুশির কথা, কিন্তু আমি একে যথেষ্ট মনে করি না। উর্দুর সমস্ত মূল্যবান গদ্য ও পদ্য সাহিত্য দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা উচিত। উর্দুভাষার জন্যও দেবনাগরী লিপি তাদের নিজেদের লিপি হয়ে যাওয়া উচিত। উর্দু আমাদের ভাষা,

উর্দুর সাহিত্য আমাদের, উর্দুর মহান কবি আর লেখক আমাদের অস্থি-মজ্জা। উর্দুলিপিতে বই-এর প্রকাশনা এখন অনেক কমে গেছে, সেই লিপির পাঠকও ক্রমেই কমে যাচ্ছে। এই অবস্থায় উর্দু সাহিত্য দেবনাগরীতে তাড়াতাড়ি পরিবর্তিত হওয়াটা আরো বেশি জরুরি। এর অর্থ এই নয় যে, উর্দু সাহিত্যর উর্দুলিপিকে বয়কট করা উচিত। হ্যাঁ, উর্দুর প্রচারে উর্দুলিপির বাধা হয়ে সামনে আসা উচিত নয়।

পেচ্ছাপে চিনির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় এখন আর তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। তার চিকিৎসার জন্য নানারকম পরীক্ষা করে দেখেছি। আয়ুর্বেদিক ওষুধও খেয়েছি। ৩০ সেপ্টেম্বর এক সপ্তাহের জন্য আমি শস্যহীন ভোজন করব ঠিক করলাম, আর ডিম, মাংস, মাছ এবং ফল এইগুলি ভোজন তালিকায় রাখলাম। আমি একেই ফলাহার বলতাম। আর সত্যি সত্যি যদি ফল বাদেও দুধকে ফলাহার বলে ধরা হয়, তাহলে এগুলি নয় কেন? সকালে আধসের দুধ শ্রীনিবাসজীর বাড়ি থেকে চলে আসত। মাংস বা মাছ জল ছাড়াই বসিয়ে দেওয়া হতো। সিদ্ধ হয়ে নিজের থেকেই ঝোল তৈরি হয়ে যেত। নুন ছাড়া অন্য কোনো মসলা বা তামসিক জিনিস সঙ্গে খেতে চাইতাম না, কিন্তু মাছের গন্ধ চাপা দেবার জন্য পেঁয়াজ এবং অন্য কিছু জিনিস দেওয়া দরকার হতো। ট্যান্ডনজী এমনিতে বড়ই রাধাস্বামী ভক্ত, কিন্তু আমার ওপর তাঁর বিশেষ স্নেহ বা অনুগ্রহ যাই বলুন না কেন, ছিল। তিনিও চাইতেন আমার স্বাস্থ্য ভাল থাকুক, যাতে আমি ভালভাবে কাজ করতে পারি। একদিন তিনি অন্য এক পরিচিত রোগীর উদাহরণ দিয়ে বলেও ছিলেন যে, তিনি মাংস খান। এইভাবে কিছুদিন ভোজন করার পর উপকার বুঝতে পারলাম, এবং পেচ্ছাপ কম হতে লাগল। হাঁটাটাও আমি আগের মত অক্ষুণ্ণ রেখেছিলাম, তবুও ২৫ অক্টোবর অবাধে চিনি আসতে দেখে মনে হলো—ইনসুলিন নেওয়াই উচিত। কিন্তু নিয়মপূর্বক ইনসুলিন নিতে এখনও দুবছর দেরি ছিল, যখন সবদিক থেকে পথ হারিয়ে আর বিপদে পড়ে দেখেছিলাম, ইনসুলিন ছাড়া 'নান্যাঃ পন্থা বিদ্যতেৎয়নায়।'

বহু বছর পরে ২৯ তারিখ সন্ধেয় আর্যসমাজে হিন্দি দিবস সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হলো। আমি মনে করেছিলাম, এত বছরে এখানেও পরিবর্তন হয়ে থাকবে, কিন্তু সে আবার কেমন ধর্ম, যদি তাতে কালের প্রভাব পড়ে? সভাশেষে এখনও সেই 'হে দয়াময় আমাদের সবাইকে শুদ্ধতা দাও'-এই পদ্য গাওয়া হচ্ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম এই দেখে যে, নিজেকে আর্যসমাজী বলে পরিচয় দেন এমন এক ভদ্রলোক ফলিত জ্যোতিষ বিষয়ে ছিটগ্রস্ত প্রতিশ্রুতির পক্ষ নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইলেন।

এদিকে 'শাসন শব্দকোষ'-এর ছাপার কাজ চলছিল, ওদিকে এর পরের পরিভাষার কাজের ব্যাপারে আমরা প্রস্তুত হচ্ছিলাম। বিদ্যানিবাসজী ও মাচবেজী কলকাতা, কটক, নাগপুর ইত্যাদি জায়গায় গিয়ে সেখানকার যোগ্যতাসম্পন্ন বিদ্বানদের সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন। সবাই আমাদের শব্দকোষ খুব পছন্দ করেছেন। সাইন্সের পরিভাষা তৈরি করার জন্য সাইন্স এবং ভাষা দুইয়েরই জ্ঞান আছে এমন যোগ্য ব্যক্তির সন্ধান করা হচ্ছিল। ড· মহাদেব সাহা সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের খোঁজ দিলেন। তিনি সাইন্সের এম· এস· সি· ছিলেন, সংস্কৃত ও রুশ ভাষা আর তাছাড়া ইউরোপের অনেকগুলি ভাষায়

অভিজ্ঞ ছিলেন। এই কাজের জন্য তিনি উপযুক্ত ছিলেন আর তা-ই প্রমাণিত হয়েছিল। অনেক ব্যাপারে তিনি বিদ্যানিবাসজীর মতই ছিলেন। প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ড· বিশ্বনাথ নরবণে দর্শনের পরিভাষার দায়িত্ব নিতে রাজি ছিলেন।

নিজের আর্থিক অবস্থার দিকে নজর দেওয়া দরকার ছিল, কারণ সম্মেলনের পয়সা নিয়ে কাজ করতে আমি রাজি ছিলাম না। এবছর ৪,১০০ টাকার কাছাকাছি কিতাবমহল-এর কাছ থেকে রয়ালটি পেয়েছিলাম, যা একা থাকা সত্ত্বেও আমার জন্যে অপর্যাপ্ত ছিল। একসময় এই পরিমাণ টাকা আমি অনেক বেশি বলে ভাবতাম, কিন্তু এখন তা দিয়ে কাজ চালানো মুশকিল ছিল।

পরের গরমে আবার কোথাও পালাতে হতো, আর সেখানেও খরচ করতে হতো। সঙ্গে একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন অনিবার্য বলে মনে হচ্ছিল। পুণ্যসাগরের জ্ঞান এত কম যে, তাঁকে দিয়ে কাজ চালানো সম্ভব ছিল না। সিমলাতে চন্দ্রকান্তজী আমার সঙ্গে ছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, আমি কুলুতে যাই। কুলুর শহর আমার খুব পছন্দ। খাণ্ডালা (পুনা) থেকে জর্জ রোয়েরিক-এর চিঠি এলো, তাতে তিনি লিখেছিলেন, 'আমি আমার শহরের বাড়ি 'উরুস্বতী'কে বিক্রি করতে চাই না, কিন্তু কাজের সুবিধের জন্য কালিম্পং অথবা সিকিমে থাকতে চাই।' শহরের খরচও বেশি ছিল। তাছাড়া দেশভাগের সময় মুসলমানদের যে নির্মম হত্যা হয় তাতে তাঁর পরিবারকেও দুঃখ পেতে হয়েছিল। এখন তো লাদাখে পাকিস্তানের আক্রমণের জন্য কুলু আর লাহুলের লোকেরাও চিন্তিত হয়ে উঠেছিল।

২৬ সেপ্টেম্বরের কার্যসমিতির বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এও স্বীকৃত হলো যে, সম্মেলনের সময় 'বন্দেমাতরম'-কে জাতীয় সংগীত হিসেবে গাওয়া হোক। ভারত সরকার এটি এবং 'জনগণমন-অধিনায়ক' দুটোকেই জাতীয় সংগীত বলে স্বীকার করে। 'জনমনগণ' কোনো নেতার জন্য সম্বোধিত সংগীত, তা জনতা অথবা দেশের উদ্দেশে নয়, হয়তো এর থেকে নেতাদের অহং-এর তুষ্টি হয় তাই তাকে জাতীয় সংগীত করে দেওয়া হয়েছে। দিল্লীতে সম্মেলন-ভবন বানানোর বিষয়ে কোনো কথাই বৈঠকে হতে পারল না, দুদলের নেতাদের মধ্যে লম্ফ-ঝম্ফ শুরু হয়ে গেল।

'কিন্নর দেশ মেঁ' এখন প্রেসে ছিল। লেখা বই যদি খুব শিগগিরি ছাপা শুরু হয়ে যায়, তবে লেখকদের খুবই আনন্দ হয়। দিনে গরম তো পাখার সাহায্যে কোনোরকমে দূর করতাম, কিন্তু রাতে কোনো উপায় ছিল না। বৈদ্যুতিক আলোর ওপর হাজারে হাজারে পোকা ঝাঁপিয়ে পড়তো এবং কাজ করা মুশকিল হয়ে উঠত।

এই সময় এলহাবাদে আব্বাসের গল্প 'সর্দারজী' নিয়ে হইচই লেগে গিয়েছিল। প্রাদেশিক সরকার মোকদ্দমা চালাচ্ছিল। হিন্দু-মুসলমান ঝগড়ায় যে বর্বরতা দেখানো হয়েছিল, তার বর্ণনাতে এক সর্দার (শিখ)-এর মুসলমানকে বাঁচাতে গিয়ে অদ্ভুত আত্মাহুতির চিত্রণ এতে ছিল। প্রথম ভাগে কিছু অপ্রিয় সত্য বলা হয়েছিল, যা নিয়ে শিখরা চেঁচামেচি লাগিয়েছিল এবং সরকারকে এই মোকদ্দমা চালাতে হয়েছিল। শেষে লেখক বেঁচে গিয়েছিলেন। তবে এটা তো জানা গেল যে, লেখকের পথ কৃপাণের মত ধারালো।

লিখি যা লিখতে আমার রুচি হয়। ড· ধীরেন্দ্র বর্মা এদিকে
অকাদেমির জন্য একটা ভাষণ তৈরি করতে বলেছেন। আমি
ভাষণ তৈরি করার কথা দিলাম। তখন জানতাম না যে, আমাকে এত বড়
হবে, আর দুর্লভ সময় থেকে কয়েক মাস বের করে তাকে দিতে হবে, তারপর বই ছেপে তৈরি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ নাগাদ তা পাঠকের হাতে পৌঁছনোর সুযোগ হবে।

টাইপের সংস্কার করার দিকেও আমার মন চলে যাচ্ছিল। ভাবছিলাম, যদি ওপর-নীচের মাত্রাগুলোকে পাশে রাখা যায়, তাহলে হিন্দির ছোট আকারের টাইপও দেখতে যথেষ্ট বড় আর মোটা মনে হবে। আজকাল দশ পয়েন্টের শরীরযুক্ত টাইপের আকার আসলে ৬ পয়েন্টের সমান হয়। এই অসুবিধের জন্য ৬ পয়েন্টের টাইপ হিন্দিতে ঢালাই করা যায় না। আমি এ কথা প্রয়াগের এক টাইপ ফাউন্ড্রির মালিককে জানালাম। তিনি এরকম টাইপ ঢালাইও করে দিলেন। আমি চাইছিলাম, আমার দু-একটা বই এই টাইপে ছাপাই। অক্ষরের আকারে তো কোনো তফাৎ ছিল না, তাই পড়তে কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। সংশোধন করা টাইপে আমার কোনো একটা বই আনন্দজী ছাপবেন বলে ঠিক করেছিলেন। পরে সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল আর টাইপ যেমনকে তেমন রইল।

৪ অক্টোবরের রাতে ভোর পর্যন্ত পাখার সাহায্য নিতে হলো। খাওয়া পরের দিনের ডায়েরি অনুসারে—'*সকালে আধ সের খাঁটি দুধ শ্রীনিবাসজীর বাড়ি থেকে আসে, আর সন্ধেবেলা এখানে আনিয়ে নি। আধসের মাছ অথবা মাংস আর সওয়া সের আপেল অথবা অন্য ফল—যার ক্যালরির পরিমাণ ১৬৫০, যা অপর্যাপ্ত। যদি পোয়াটাক মাংস আরো বাড়ানো যায় তাহলে আরো ৮০০ ক্যালরি বেড়ে ২২০০-২৩০০ ক্যালরি হয়ে র্যাপ্ত হবে।*'

ট্যান্ডনজীর জন্য '*শাসন শব্দকোষ*'-এ *তাড়াতাড়ি হাত লাগানো সম্ভব হয়েছিল।* দিকে সংবিধানের মুসাবিদার হিন্দি অনুবাদ যখন দেখলাম, মাথা খারাপ হয়ে গেল। এ তো হিন্দির কোনো শত্রুরই কাজ হতে পারত। এটা অনুবাদ করা হয়নি, বরং নতুন একটা ভাষা মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি তার খানিকটা অনুবাদ করে দেখালাম, তাতে ট্যান্ডনজী এবং অন্য বন্ধুদের ইচ্ছে হলো যে, সংবিধানের ইংরেজি

প্রক্রিয়াকে আরো কাছ থেকে দেখার সুযোগ হলো, আর তা নিয়ে *আমি একটা ব্যাঙ্গাত্মক* রচনাও লিখে ফেললাম।

দারভাঙ্গা—দারভাঙ্গায় ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স হচ্ছিল। প্রয়াগ থেকেও ড· বাবুরাম সাকসেনা, ড· উদয়নারায়ণ তেওয়ারী যাচ্ছিলেন। ওদিকে মজঃফরপুরে বিহার প্রাদেশিক হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন হচ্ছিল, তারও ব্যগ্রতা ছিল তাই ১৫ অক্টোবর সাড়ে সাতটার সময় রামবাগ স্টেশন থেকে ছোট লাইনে রওনা হলাম। সেকেন্ড ক্লাশের অবস্থা অন্তত এই ট্রেনে একটু উন্নত মনে হচ্ছিল। ভাল কামরা লাগানো ছিল। বেনারস, গাজিপুর, বালিয়া, ছাপরায় ভিড় অবশ্যই ছিল আর ছাপরা-বালিয়ায় দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, এখনও পুরনো দিনের মতোই লোক বেশি সংখ্যায় মজুরি করার জন্য বাংলার দিকে চলেছে। আগে তারা পূর্ববাংলার খেতে গিয়ে কাজ করত, কিন্তু এখন তো সে জায়গা পাকিস্তানে। শ্রমিকরা পাগলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা দিয়ে সমুচিত কাজ করানোর ব্যবস্থা নেই। শারীরিক ও মানসিক শ্রমের এই বেকারিত্বই আমাদের দারিদ্রের কারণ।

রাত দুটোর সময় ট্রেন মজঃফরপুর পৌছল। শ্রীরামধারী প্রসাদজী, বাবু উমাশঙ্করজী আব শ্রীদেবদত্ত শাস্ত্রীর সঙ্গে স্টেশনেই দেখা হয়ে গেল। রাতে সর্বপ্রথম কাজ ছিল শুয়ে পড়া।

সকালে বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হতে থাকল। অসহযোগের দিনগুলোতে কংগ্রেসের উদ্দীপনাপূর্ণ সময়ে কত অসংখ্যবার আসা-যাওয়া করেছি। কিন্তু ২০-২৫ বছরে তো নতুন প্রজন্ম এসে যায় আর পুরনো পরিচিত মুখ বিরল হয়ে যায়। অধিবেশনের সময় মজঃফরপুর পুরসভা আমাকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করল। তিনটের সময়ই অধিবেশনে যোগদান করলাম। অভিনন্দনের উত্তরে আমাকেও একঘণ্টা বলতে হলো। এই সময় মনের ওপর ডায়াবেটিসের প্রভাব পড়ছিল, মনে হচ্ছিল কেমন যেন নেশার মধ্যে বলছি। সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তিও বোধ হতো। আসলে অনেক আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল যে,

—১৯৪৮—

যেতেন বলে আমার জানা নেই। তবে কিছু ঘাটতির জন্য ড· উমেশ মিশ্রর গুণের কথা ভুলে যাওয়া যায় না। তাঁর সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ আছে। তবে হ্যাঁ, তিনি একশো বছর আগের দৃষ্টিতেই তাকে দেখেন।

ডায়াবেটিসের জন্য চিন্তা থেকেই যেত, মুখের স্বাদ আর বারে বারে পেচ্ছাপ করাই শুধু অসুবিধের কারণ ছিল না, মন প্রশান্ত রেখে কাজও করতে পারছিলাম না। কখনও ভাবতাম শরীরের ওজনও এর কারণ। কি ভাল হতো, যদি ১৫ পাউন্ড কমে যেত। ডায়াবেটিসের রুগীর পক্ষে কি এটা খুব মুশকিল? আর এখন (১৯৫৬ সালে) তো সেদিনও দেখতে হচ্ছে, যখন শরীরের ওজন যতটা (১৫২ পাউন্ড) হওয়া উচিত ছিল ততটাই হয়ে গেছে। কনফারেন্সে আসার আরো একটা প্রলোভন ছিল—ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা বিদ্বানদের সঙ্গে পরিভাষা ও হিন্দির বিষয়ে কথাবার্তা বলব। হিন্দি-বিরোধ তো কেবল তামিলনাড়ুর ব্যাপার, আর বস্তুতপক্ষে তার মূলে রয়েছে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের প্রশ্ন। ৯০ শতাংশের ওপর অব্রাহ্মণ, তবুও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ব্রাহ্মণরাই সেখানকার ধন-বিদ্যার সর্বেসর্বা হয়ে আসছে, তারই প্রতিশোধ আজ সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নিচ্ছিল। ব্রাহ্মণ বিদ্বানরাও অব্রাহ্মণদের মতই তামিলের পক্ষ অবলম্বন করতে বাধ্য ছিল। ত্রিবাঙ্কুর ও অন্ধ্রের প্রতিনিধি হিন্দি এবং পরিভাষার ব্যাপারে আমাদেব মতই উৎসাহ দেখাচ্ছিলেন, যদিও এখনও অনেকে ভীষণভাবে ইংরেজির মোহে ছিল। আমাব তো মাথায় আসছিল না, যে কি করে কোনো বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এ কথা মেনে নিতে পারে যে, ইংরেজি আমাদের দেশে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তার প্রভুত্ব কায়েম বাখবে। আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে নতুন প্রজন্ম ইংরেজির যোগ্যতায় দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। আজ (১৯৫৬-তে) তো নবযুবকদের মধ্যে সে-ই শুদ্ধ ইংরেজি বলতে ও বুঝতে পারে যার শিক্ষা কনভেন্ট এবং ইউরোপিয়ান স্কুলে হয়েছে। এটা নিশ্চিত যে. এই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এরকম লোকের সংখ্যাও খুব কমে যাবে। আগামী প্রজন্ম যদি ইংরেজির বোঝা বইতে রাজি না হয়, তাহলে এই ষাটের বুড়োদের চেল্লামিল্লি কি ব্যর্থ নয়?

১৮ অক্টোবর আড়াইটের সময় কনফারেন্স শেষ হলো। আমি এখানে পরিভাষা সম্বন্ধী আমার রচনাটি পড়েছিলাম, আর শেষদিন নাটক-রূপক তর্কেও কিছু বলেছিলাম। সেদিন [illegible] হিন্দি-মহারথীদের স্বাগত জানানোর জন্য টাউন-হলে সভা হলো, যেখানে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা বানানোর প্রচেষ্টার বিষয়ে বলতে গিয়ে আমি বললাম যে, আমাদের ভাষাগুলির উৎস হিসেবে সংস্কৃতের স্থান সর্বদা থাকবে। কিন্তু এখন মেয়ের সময়ে মায়ের সিংহাসনের লোভ ছেড়ে দেওয়াই উচিত। মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেরও আমি সমর্থন করলাম, আর বললাম যে, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর স্থানীয় অনেক বড় বড় বাড়ি বিনা পয়সায় পাওয়া যাবে। দারভাঙ্গায় মহারাজের নিজস্ব গ্রন্থাগার আছে, বইয়ের সংখ্যায় তাকে খুব বড় বলা যায় না, কিন্তু সেখানে বেশি পরিমাণে ভাল ভাল বই সংগৃহীত আছে। ছাপা বইগুলির মধ্যে এমনও অনেক আছে, যেগুলি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আরম্ভের দিনে দেশে অথবা বিদেশে মুদ্রিত হয়েছিল।

[illegible] সকালে আমাদের বিদ্যাপতির পদ শোনার সুযোগ হলো। হিন্দি ও

বাঙলার কিছু বিদ্বান মৈথিলী কণ্ঠে মৈথিলী কোকিলদের কবিতা শুনতে চাইছিলেন। তার ব্যবস্থা মহারাজের অনুজ রাজাবাহাদুর বিশ্বেশ্বর সিংহের করা হয়েছিল। দরবারী গুণীরা ওস্তাদী ঢঙে তা শোনালেন, যা আমরা যে কোনো জায়গায় শুনতে পেতাম। আমরা তো লোককণ্ঠে তা শুনতে চেয়েছিলাম। তাছাড়া এই দরবারী গুণীদের মধ্যে এমন নির্লজ্জতা থাকতে পারে, আমরা কখনো ভাবতেও পারিনি। শ্রোতাদের মধ্যে মহিলা বিদুষীও ছিলেন, আর সেই গুণী বিদ্যাপতির নামে বিপরীত রতির পদ শোনাচ্ছিলেন। আমরা কোনোমতে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালাই।

বিকেল পাঁচটায় স্টেশনে পৌঁছলাম। প্রয়াগের জন্য নির্দিষ্ট কামরা যুক্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা এখন নিশ্চিন্ত ছিলাম। পরের দিন (২০ অক্টোবর) আমাদের গাড়ি চলছিল। ড· উমেশ মিশ্রর পরের প্রজন্ম তাঁর হাতে থাকবে না, আর তৃতীয় প্রজন্ম তো পুরোপুরি বিদ্রোহ করবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু, এখন তিনি ছড়ি ঘুরিয়ে তাঁর ছেলেদের ওপর নিজের খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম চালাচ্ছিলেন। তিনটে ছেলে উপোসী থেকে যাত্রা করছিল, রেলে ছোঁয়াছুঁয়ি আর খাওয়া-দাওয়ার সেই সনাতন নিয়ম পালন করা উচিত, তাতে চব্বিশ ঘণ্টার ব্রত পালনই করতে হোক না কেন। আর এই সবই সেই পরম অসন্দিগ্ধ পরলোকের জন্য, যার ওপর তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস নেই বললেই চলে। সমস্তিপুর স্টেশনে সুন্দর সুস্বাদু রান্না করা মাছ বিক্রি হচ্ছে দেখে আমার মনে হলো সত্যি সত্যি মিথিলা স্বর্গের একটি কোণ। কোনো একজন মৈথিলী এ বিষয়ে বলেছেন যে, অমৃত অন্য কোনো জায়গা নয়, বরং 'ব্রু মো বযং সকলশাস্ত্রবিচারদক্ষা ঃ জম্বীরনীরপরিপূরিতমৎসখণ্ডে,' লেবুর রস দিয়ে তৈরি মাছের টুকরো যে কত সুস্বাদু হয় তা সৌভাগ্যবানরাই জানে। আর সকল শাস্ত্রের পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণরাই প্রাচীন আর্যপ্রথা গ্রহণ করে কাশী অথবা অন্য কোথাও মাছ বা মাংস খাওয়াতে সংযম করে না। পশ্চিমের ম্লেচ্ছদের মধ্যে গেলে কখনও কখনও তাদের নিজেদের পরমপ্রিয় খাদ্য ছাড়তে হয়, আর তার জন্য দেশে ফিরে প্রায়শ্চিত্ত করার পর যখন জম্বীর-নীর-পরিপূরিত মৎস্য খণ্ড পায় তখন সে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। মৈথিলীদের সাহসের কেন প্রশংসা করা হবে না? মৎস্য, কচ্ছপ, আর বরাহ এই তিন অবতারকে যখন তারা চেটেপুটে খেয়েছে, 'ইতি সংচিত্য ভগবান নরসিংহ বপুর্দধৌ।' (তিন অবতারকে খেয়ে ফেলার ভয়ে ভীত বিষ্ণু নৃসিংহ অবতার ধারণ করেছিলেন।) যদি শুধু সিংহের অবতার নিতেন, তাহলেও বাঁচার পথ ছিল না। আমি দেখছিলাম তিনটি তরুণের মুখ চব্বিশ ঘণ্টার ব্রতের জন্য শুকিয়ে গিয়েছিল।

প্রয়াগ—২০ তারিখ প্রয়াগ পৌঁছে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত আমি আবার পরিভাষার কাজে লেগে পড়লাম, ভোজনে ফলাহারী হলাম, আর আমি যেরকমটা বলেছি—আমার ফলাহারের অর্থ হলো অন্নের সর্বপ্রকারে বর্জন। তার মধ্যে দুধ, মাংস, মাছ আর ফল একত্রিত ছিল। রোজ ৫-৬ মাইল করে হাঁটাও হতে লাগল।

২২ অক্টোবর শ্রীপতজী তাঁর জাতি আর ধর্মের বন্ধন ছিঁড়ে বিয়ে করলেন। তাঁর স্ত্রী জোহরাদেবী বেনারসের সুশিক্ষিতা গ্রাজুয়েট মহিলা। দেখে অবাক লাগছিল যে, পতিকুলে

আনন্দোল্লাস ছিল। শিবরানীদেবী তাঁর বৌকে সানন্দে গ্রহণ করছিলেন, কিন্তু মাতৃকুলে দুঃখ ও শোক ছেয়ে ছিল—কি করে মুসলমানের মেয়ে কাফের হবার জন্য কাফেরের ঘরে যাবে। কাল যখন প্রথম আঘাত করে তখন তা ভালর জন্য হলেও তাকে প্রিয় মনে হয় না। কিন্তু কালই তাকে আবার সহনীয় ও প্রিয় করে তোলে। সামাজিক ব্যাপারে পিছিয়ে থাকা হিন্দুরা এগিয়ে চলেছে, এর থেকে সুদিনের আশা হয়। আমি হেসে বললাম, 'বড় বৌকেও অহিন্দু নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে কাউন্সিলে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। আজ প্রেমচন্দজী থাকলে তিনিও শিবরানীজীর মতই পুত্রবধূকে অতিশয় আনন্দের সঙ্গে আশীর্বাদ দিতেন।'

২৩ অক্টোবর রাজেন্দ্রবাবুর চিঠি থেকে বুঝলাম যে, তিনিও সংবিধানেব রঘুবীরী অনুবাদে সন্তুষ্ট নন।

২৫ অক্টোবর তেষ্টা ও পেচ্ছাপ খুব বেড়ে গেল, মনে হতে লাগল, চংক্রমণ এবং ভোজন-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ডায়াবেটিস তাড়ানো সম্ভব নয়। ইনসুলিন নিতেই হবে। যদিও আমি দেড়-দু ঘণ্টা রোজ হেঁটে আসতাম, তবু ১৬ ঘণ্টা একটানা বসা হতো। সকাল আটটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত—শুধু খাওয়ার জন্য কয়েক মিনিট থেমে বসে বসে কাজই করে যেতাম। আমার চিঠি রাজেন্দ্রবাবু শ্রীঘনশ্যামসিংহ গুপ্তের কাছেও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে কিছু তিক্ত কথাও ছিল। কিন্তু গুপ্তজী হলেন নম্রতার মূর্তি। তাঁর নিজস্ব আগ্রহ বা স্বার্থও রঘুবীরী প্রণালীতে নেই। তিনি একসঙ্গে কাজ কবার জন্য বললেন, আর পরে আমরাও খুব ভালবাসার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেছি।

৩০ অক্টোবর 'শাসন শব্দকোষ' ছাপা হয়ে গেল, আর পবেব দিন একশো কপিব মলাটিও বাঁধাই হয়ে গেল। সেদিনই সম্মেলনের কার্যালয়ের নতুন ভবনের ভিত আমাকে স্থাপন করতে হলো। আর ট্যান্ডনজী সম্মেলন-প্রেসের উদ্‌ঘাটন করলেন। প্রেসের জন্য আমি খুব উৎসুক ছিলাম। পরিভাষার কাজ তখনই ঠিকভাবে আর দ্রুত এগোতে পারে, যখন প্রেস পুরো সাহায্য করার জন্য তৈরি থাকে।

বাইরের প্রেসে সন্তোষজনকভাবে কাজ হতো না। তখন প্রেসের জন্য যে দোতলা বাড়ি বানানো হয়েছিল তাকে লোকেবা যথেষ্ট মনে করলেও আমি যথেষ্ট নয় বলে মনে করতাম। পরিভাষার শব্দকোষগুলি ছাপার জন্য দেবনাগরী ও ইংরেজি দুরকম টাইপের প্রয়োজন ছিল, আর ছাপাও ভাল হওয়া দরকাব ছিল, তবেই তা অন্যান্য প্রদেশের বিদ্বানদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারত। সমস্ত প্রদেশেব ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিতদের কাছ থেকে আমার পরিভাষার কাজে সাহায্য নেওয়া দরকার ছিল। যদি তাঁরা তাঁদের কাজ তাড়াতাড়ি এবং সুন্দরভাবে ছাপা হতে দেখেন, তবে আরোই উৎসাহের সঙ্গে সাহায্য করবেন। ট্যান্ডনজী প্যাটেলবাবুকে মোনোটাইপ মেশিন কেনার জন্য বলে রেখেছিলেন। কখনো-সখনো মনে পড়ত, তখন জিজ্ঞেস করতেন। প্যাটেলবাবু বলতেন, 'বাবুজী, প্রায় হয়ে গেছে।' আমি এ ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিলাম। সে সময় মোনোটাইপ মেশিন পাওয়া সহজ ছিল না, এ কথা ঠিক আর এও ঠিক যে, চোরাবাজার থেকে কাজটা তাড়াতাড়ি হতে পারত। তবে আমি মনে করতাম, যদি চেষ্টা করা হয় তাহলে সম্মেলনের মত একটা সংস্থার পক্ষে তা পাওয়া কঠিন হবে না। এমনটাই হলো। আমার একটি কলকাতা যাত্রায়

আমি কথাবার্তা বললাম। আমার তরুণ বন্ধু শ্রীপরমানন্দ পোদ্দার কোম্পানির এজেন্টের সঙ্গে কথা বলল, কারো জন্য আসা একটি মেশিনের কিছু শর্ত পূরণ হচ্ছিল না, এজেন্ট সেই মেশিনটি দিতে রাজি হলো। আমি সম্মেলন ও রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি দুজনকেই লিখলাম, শিগ্‌গির দাম দিয়ে মেশিন তুলে আনুক। দুজনই খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হলো। মেশিন সম্মেলনে চলে এলো। আমি জানতে লাগলাম, আমাদের পরিভাষার কাজ খুব তাড়াতাড়ি হবে, কিন্তু নিজের ভাবা কথা সবসময় থোড়াই ফলে?

শ্রীবিদ্যানিবাস মিশ্র খুবই তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছিলেন। তাঁর জ্ঞান এবং স্মরণশক্তি আমাদের কাজের পক্ষে খুবই উপযোগী হয়েছিল। কিন্তু মাঝে মাঝেই তাঁর মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত, বেতন নিয়ে কাজ করার জন্য যখন কেউ টীকা-টিপ্পনী কেটে বসত, তখন তিনি বিরক্ত হয়ে যেতেন। আবার তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক করতাম। এই সময় সংবিধান-সভায় রাষ্ট্রভাষা হিন্দির প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। মৌলানা আজাদা তার তীব্র বিরোধী ছিলেন, নেহেরু তাঁর সমর্থক ছিলেন। রাজেন্দ্রবাবু বিধানসভার অধ্যক্ষ ছিলেন, আর তাঁর মধ্যে এমনি ভারতীয়ত্ব ছিল যে, তিনি কখনোই ইংরেজিকে সমর্থন করতে পারতেন না। তিনি সবসময় হিন্দির পক্ষপাতী ছিলেন। নিজের সদাব্যস্ত জীবন থেকে সময় বার করে নিয়ে লিখতেনও, কিন্তু প্রকাশ্যে এই বিবাদে অংশ নিতে পারতেন না। যদি হিন্দি ও ইংরেজির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলা হতো, তবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলও হিন্দির পক্ষে থাকতেন। কিন্তু সংবিধান-সভায় হিন্দি-হিন্দুস্তানির প্রশ্ন তুলে দেওয়া হয়েছিল, আর হিন্দুস্তানি দ্বারা উর্দু ভাষা-লিপিকেও রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা চালানো হচ্ছিল।

৩১ অক্টোবরের বৈঠকে পরিভাষার কাজের জন্য ১০ হাজার টাকা খরচ করা ঠিক হলো। উপযুক্ত লোকেদের রাখার দরকার ছিল। শ্রীভগবৎদত্ত শর্মা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের শাস্ত্রী এবং এম·এ· ছিলেন। উদ্বাস্তু হয়ে এখন প্রয়াগে ছিলেন। এমন লোকেব আগে কাজ পাওয়া উচিত। ট্যান্ডনজী এবং আমারও এই মত ছিল। তাঁকে পরীক্ষামূলকভাবে রেখে তৎপরতা ও অভিজ্ঞতা দেখার পর আড়াইশো টাকা মাসিক দেওয়া ঠিক হলো। মাচবেজীও সময় দেবার কথা বলছিলেন, কিন্তু এখনও কিছু ঠিক করা হয়নি, কারণ তিনি রেডিওর চাকরিতে ছিলেন। সহকর্মীদের পাওয়াটা সবথেকে জরুরি ছিল। এরই মধ্যে দিল্লী যাবার দরকার পড়ল। সংবিধান-সভার এই অধিবেশনে রাষ্ট্রভাষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবার কথা ছিল।

দিল্লী—৪ নভেম্বর রাত নটার গাড়িতে শ্রীনর্মদেশ্বর উপাধ্যায়ের সঙ্গে দিল্লীর উদ্দেশে রওনা হলাম। পরের দিন সকালে গাড়ি ইটাবার কাছাকাছি যাচ্ছিল। টুন্ডলাতে কম্পার্টমেন্টের তিন সহযাত্রী নেমে গেলেন, আর আগ্রায় উকিল শ্রী বনোয়ারীলাল চতুর্বেদী এবং দিল্লীর শ্রীগুরুদত্তজী নতুন সহযাত্রী হলেন। খাবার সময় হয়েছিল, আর আমি ছিলাম 'ফলাহারী'। মুসলমান মাংস বিক্রি করছিল, আমি কয়েক 'দোনা'[১] নিলাম।

---

[১]শাল বা পলাশ পাতা দিয়ে বানানো বাটি।—স·ম·

একে মাংস, তাও মুসলমানের! চতুর্বেদীজী ঘাবড়ে গিয়ে অন্য কম্পার্টমেন্টে যেতে উদ্যত হলেন। তারপর কেন জানি না থেমে গেলেন। আবার মিলেমিশে কথাবার্তা হতে থাকল। আমার নাম তিনি জানতেন। আমি বললাম, 'চতুর্বেদীজী, মথুরার চৌবে তো শকদের পুরোহিত ছিলেন, আর নিজেও মূলত শক ছিলেন। তখন তো এই মাংস কেন, অন্য মাংসও তাঁদের রান্নাঘরে রোজ রান্না হতো।'

দুটোর সময় গাড়ি দিল্লী পৌঁছল। ড· শ্রীনারায়ণ চতুর্বেদীজী স্টেশনে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ি গেলাম। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে আসা লক্ষ-লক্ষ শরণার্থী এখনও নিঃস্ব অবস্থায় দিল্লীতে পড়ে ছিল। আসলে তারা যদি উদ্যমী না হতো আর নিজের সাহায্য নিজেই করার জন্য প্রস্তুত না থাকত, তবে তাদেরকে এবং দেশকেও খুব খারাপ অবস্থায় পড়তে হতো। আমি চিন্তা করছিলাম, যদি পূর্ব বাংলা থেকে এমন বিশাল সংখ্যায় লোক আসত, তাহলে কি অবস্থা হতো।

সেদিন (৫ নভেম্বর) সন্ধেবেলা ঘুরতে ঘুরতে মধ্য-এশিয়া মিউজিয়ামে গেলাম। এখন ড· বাসুদেবশরণ আগরওয়াল ছিলেন না। ড· আগরওয়ালের মত সুযোগ্য পুরুষকে দিল্লী নিজের কাছে রাখতে পারল না, এ দিল্লীরই দোষ। খোসামুদে দরবারী লোকেদেরই দিল্লীর পছন্দ, সেখানে আত্মসম্মানজ্ঞান সম্পন্ন পণ্ডিত কি করে বসবাস করতে পারে? আগরওয়ালজীও সেখানে টিকতে পারেননি। পরে ড· মোতিচন্দেরও একই অভিজ্ঞতা হয়, আর তিনিও বোম্বাই ফিরে যান। সংগ্রহালয়ে তখন শ্রীকৃষ্ণদেবজী ছিলেন। কৃষ্ণদেবজী বিহার-শরীফের বাসিন্দা, পাটনায় ছাত্রাবস্থা থেকে তিনি আমার পরিচিত। কিন্তু এখন তো ১২-১৪ বছর পার হয়ে গেছে। পুরনো প্রজন্মের সময়ের মূল্য বোঝা উচিত, আর পুরনোকে আঁকড়ে থাকার কখনো চেষ্টা করা উচিত নয়। আমি এ ব্যাপারে খুব সাবধান থাকি। কয়েকদিন আগে পাটনার এক প্রফেসরকে আমি যখন 'আপনি' সম্বোধন করি, তখন তিনি বলেন, 'আপনি তুমি করে বললেই আমার ভাল লাগে।' কিন্তু আমি জানি যে 'তুমি' করে বললে সেটা কালকে উপেক্ষা করা হয়।

সেই আঙিনার ভেতর কিছু তাঁবু পড়েছিল, যার মধ্যে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আসা আমাদের কত ভাই একটি বর্ষা কাটিয়েছে। পণ্ডিত ভগবৎদত্তজীও এখানে ছিলেন। তাঁব ছেলে সত্যশ্রবা মিউজিয়মে কাজ করছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হলো। পরিভাষার কাজের প্রয়োজনীয়তা তিনিও বুঝতেন। তাঁর বন্ধু এক ইঞ্জিনিয়রের কাছেও নিয়ে গেলেন। ভাষায় বিশেষ দখল না থাকলেও ইঞ্জিনিয়র একথা বুঝতেন যে, নিজেদের ভাষাতেই আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান পড়তে হবে। তিনি তাঁর বিভাগীয় কিছু পরিভাষা তৈরি করালেন এবং এই বাসনা নিয়ে তা পণ্ডিত নেহেরুকে দেখাতে চাইলেন যে, এর জন্য নেহেরু তাঁকে সাধুবাদ দেবেন, কিন্তু উল্টে তাঁকে বকুনি খেতে হলো, 'তুমি নিজের কাজ করো, অনধিকার চেষ্টা কোর না।' হিন্দির উন্নতি করতে কত রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম।

৬ নভেম্বর সকাল-সন্ধে দুবেলা শ্রীঘনশ্যামসিংহ গুপ্তর সঙ্গে পরিভাষা বানানোর ব্যাপারে কোন কোন দিকে খেয়াল রাখা উচিত, এ বিষয়ে কথা হলো। আমাদের দুজনেরই

এক মত ছিল—পরিচিত শব্দ দিয়ে পরিভাষা তৈরি হোক, আর জনসাধারণের কাছে তা পৌছোক। অতি পরিচিত শব্দগুলিকে যেন বয়কট করা না হয়। কিন্তু, গুপ্তজী তাঁর রঘুবীরী অনুবাদকে আইনগত সূক্ষ্মতার দৃষ্টিতে বেশি উপযুক্ত বলে মনে করতেন। তবে, যখন আবার নতুন করে অনুবাদ করার সময় হলো, তখন তিনি তাঁর সেই আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন।

সেইদিন বৌদ্ধবিহারে গিয়ে এক ভূতপূর্ব ইঞ্জিনিয়র ভিক্ষুর সঙ্গে দেখা হলো, যিনি দিল্লীর কাছে এক গ্রামে ভাগচাষে সাহায্য করছিলেন। তিনি সরকারি ব্যবস্থায় খুশি ছিলেন না। পাঁচশো একর জমি একসঙ্গে ভাগে রেখে প্রত্যেক পরিবারকে সাড়ে সাত একর জমি দেওয়া হয়েছে। দু নৌকায় পা রেখে কি যাত্রা করা যায়? প্রত্যেক পরিবার প্রথমে নিজের সাড়ে সাত একর চাষ করবে, তারপর ভাগের জমির খোঁজ খবর নেবে। এই পরিকল্পনা তো অসফল হতোই—পরে বলা হবে যে, এই পদ্ধতি ভারতের প্রকৃতির অনুকূল নয়। কিন্তু, যদি আমাদের নিজেদের জমিতে পুরোমাত্রায় শস্য উৎপন্ন করতে হয় তবে তা সাইন্সের সাহায্যেই হওয়া সম্ভব, আর সাইন্সের সাহায্য তখনই নেওয়া সম্ভব যখন ছোট ছোট জমির আল ভেঙে দিয়ে বিশাল খেত বানানো হবে এবং সবাই একসঙ্গে কাজ করবে।

৭ নভেম্বর রোববার দিন শ্রীবিয়োগী হরিজীর সঙ্গে দশটার সময় বেড়াতে বেরোলাম। কুতুব গেলাম। কিছুটা অন্যরকমই মনে হলো। বোধহয় বহুদিন পরে এলাম বলে। কুতুবের কাছে পুরনো মন্দিরগুলোর ধ্বংসাবশেষ দেখলাম, লৌহ গরুড়স্তম্ভে রাজা চন্দ্রের অভিলেখ পড়লাম, তারপর পুরনো দিল্লীর সবজিমণ্ডি হয়ে ফিরলাম।এখন সবজিমণ্ডিতে একজনও মুসলমান নেই। তাদের বাড়িতে শরণার্থী হিন্দুরা বসবাস করছে। কিন্তু এটাই সেই জায়গা যেখানে গত বছর মুসলমানরা দৃঢ়ভাবে সৈন্যদের মোকাবিলা করেছিল।

পরেরদিন শ্রীহরভগবানজী তাঁর মেয়ে গায়ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে এলেন। লাহোরের কৃষ্ণনগরে তিনি বড় সাধ করে ঘর বানিয়েছিলেন। যৌবনের সংঘর্ষের পর এখন কিছুটা নিশ্চিন্ত জীবন কাটাতে শুরু করেছিলেন, এখনই ঝড় উঠল আর ঘর গেল ভেঙে। মেয়ে বৌদ্ধধর্মানুরাগী ছিল এবং পালি পড়তে চাইছিল। আমি দু-চারদিন পড়িয়ে দিলাম, কিন্তু এইটুকুতে কি কাজ হতে পারে? বৌদ্ধবিহারের ভিক্ষু পালিতে পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর সাহায্য নেবার কথা বললাম।

৭ নভেম্বর হিন্দি দিবসের সভা হরিজন-নিবাসে হচ্ছিল। সভাতে ঠক্কর বাপাও এলেন। ৮০ বছরের তপস্যা করা তপস্বীব দর্শনে কার না আনন্দ হয়? সবথেকে বেশি দলিত ও উৎপীড়িতদের উন্নতির কাজেই তিনি তাঁর সমগ্র জীবনব্যয় করেছেন। ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, এই দুনিয়া যাকে সাফল্য বলে তার রাস্তা যদি গ্রহণ করতেন, তবে তাঁর জীবন অন্যরকম হতো। তবে, তখন তিনি আর ঠক্কর বাপা হতে পারতেন না। তাঁর সময় হয়ে এসেছিল, তবে তা বালির দাগের মত হবে।

সেদিন সন্ধে সওয়া পাঁচটার সময় দৌড়াদৌড়ি করে মোটরে মীরাট গেলাম। বক্তৃতা দিলাম, আর সেই রাতে সাড়ে বারোটার সময় ফিরে এলাম। আজকাল যাতায়াতের এই

—১৯৪৮—

নতুন মাধ্যমগুলি যাত্রা কত সহজ করে দিয়েছে। এটা তো মোটর ছিল, বিমানে তো আরো দূরের যাত্রা করা যায়।

পরের দিন শহরে আর্যবীর দল দ্বারা সংঘটিত সভায় সভাপতি হয়ে আমাকে বলতে হলো। সভা হিন্দির বিষয়ে ছিল, নয় তো আমার সেখানে যাবার প্রয়োজন হতো না। সভায় আসাতে সবথেকে বড় লাভ এই হলো যে, ১৮ বছর পরে ড· অনন্তরাম ভট্টের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। খবরের কাগজে পড়ে তিনি সেখানে এসেছিলেন। ড· ভট্টের সঙ্গে দেখা হয়েছিল লংকাতে ১৯৩০-এ, যখন আমি তাঁকে উৎসাহ দিয়ে জার্মানিতে পাঠিয়েছিলাম। সেই থেকে তিনি আগাগোড়া জার্মানিতে থেকেছেন, আর দেশ স্বাধীন হবার খবর শুনে খুবই উৎসাহের সঙ্গে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। তাঁর সাহস ও জ্ঞানের খুবই প্রশংসা করি। চাইতাম যে, তার সৎব্যবহার হোক। তাঁর আশা ছিল যে, দিল্লীতে তাঁর যোগ্য কোনো কাজ পাওয়া যাবে, তাই এখানে পড়ছিলেন। সেইদিনই ড· সত্যনারায়ণ সিংহের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। তিনি বার্লিন থেকে ফিবেছিলেন। সোভিয়েত ও সাম্যবাদের প্রতি তাঁর বরাবর সহানুভূতি ছিল, তবে সম্ভবত এখানে নিজের জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে বাধা দেওয়ায় সোভিযেত অফিসারদেব প্রতি তিনি রুষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন, সেরকমই বলছিলেন। বুদ্ধিজীবী তাঁর বুদ্ধির দাঁড়িপাল্লায় সমস্ত জিনিস পরিমাপ করে, আর অধিকাংশ মানুষেব লাভের ব্যাপারটা ভুলে যায়।

পরেব দিন ড· ভট্টের সঙ্গে দু-তিন ঘণ্টা ধরে কথা হলো। অল্পদিনেই তিনি বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন আর ভারতে আসার জন্য পস্তাচ্ছিলেন। তিনি সংস্কৃতের বিদ্বান ছিলেন। তেমন মনোবৃত্তিও পোষণ করতেন, কিন্তু ইউরোপ গিয়ে সব ব্যাপারে ইউরোপিয়ান হয়ে গেলেন। সেখানকার ব্যবস্থা আর নিয়মিত জীবন তাঁর খুব পছন্দ ছিল। এখানে তিনি অনিয়মিত-অব্যবস্থিত জীবন দেখছিলেন। সেখানে সমস্ত জিনিসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ছিল, আর এখানে ছিল তার অভাব। পার্লামেন্ট ভবনের সিঁড়ি আর কোণাতেও লোকেরা পানের পিক ও সিগারেটের টুকরো ফেলতে ইতস্তত করত না। ভট্টের নিজেকে জলছাড়া মাছের মত মনে হতো। লংকায় যাবার কথা ভাবছিলেন। আমি বললাম পরিভাষার কাজ যদি পছন্দ হয়, তাহলে তার ব্যবস্থা হতে পারে, তবে বেতন যোগ্যতানুসার পাওয়া সম্ভব নয়।

১০ নভেম্বর আমরা প্রয়াগ থেকে দিল্লী চলে এলাম। ট্রেনে ইন্দোর মেডিকেল কলেজের অ্যানাটমির অধ্যাপাক ড· সিংহকে পেলাম। তিনি তাঁর বিষয়ের শব্দগুলি জোগাড় করে দিতে রাজি ছিলেন, যদিও পরে শ্রীসেনগুপ্ত নিজেই তা করেন এবং ড· সিংহের সাহায্যের দরকার হয়নি।

রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন

প্রয়াগ—কৃষি-বিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষার আমাদের প্রয়োজন ছিল। ১১ নভেম্বর নৈনীর কৃষি কলেজে বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ যখন এলো, তখন আমি খুবই খুশি হয়ে সেখানে গেলাম। এটি ছিল আমেরিকানে মিশনারিদের একটি সংস্থা। অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকেই আমেরিকান ছিলেন। তাঁরা পারিভাষিক শব্দের সংগ্রহের কাজে সাহায্য করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন, আর পরে পশুপালন-বিষয়ক শব্দগুলি দিলেনও। কিন্তু আমাদের প্রকাশনা সম্পর্কিত ব্যবস্থায় এত গোলমাল ছিল যে, সেগুলো কাজে লাগানো গেল না।

শৃঙ্গবেরপুর—১২ নভেম্বর আনাপুর যেতে হলো। ২১ মাইল মোটরে গেলাম। সঙ্গে কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু ছিলেন। যাত্রার সব থেকে বড় প্রলোভন ছিল শৃঙ্গবেরপুর (সিঙ্গরৌর) দেখা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মহাবৈয়াকরণ নাগেশ ভট্টকে কিছু টাকা সাহায্য করেছিলেন এবং তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এখানকার রাজা রাম। সেই বিদ্বান তাঁর নাম অমর করে দিয়েছেন—'শৃঙ্গবেরপুরাধীশাদ্ রাম তো লব্ধজীবকঃ।' এখন দুশো বছর পরে সেই রামের বংশের খোঁজ করেও কিছু জানা গেল না। আনাপুর থেকে ৪ মাইল দূরে গঙ্গার ধারে সিঙ্গরৌরের বিশাল ধ্বংসাবশেষ আছে। বাল্মিকী রামায়ণে শৃঙ্গবেরপুরের নাম পাওয়া যায়। তা দিয়ে এই নগরের প্রাচীনতা ততক্ষণ প্রমাণিত হয় না যতক্ষণ না এখানকার জিনিসগুলি তার সাক্ষী দেয়, আর সাক্ষীর এখানে কোনো অভাব ছিল না।.৪ ইঞ্চি মোটা, ১৩ ইঞ্চি চওড়া ও ১৮ ইঞ্চি লম্বা ইঁটগুলি বলে দিচ্ছিল যে, মৌর্যযুগ আর তার আগেও এখানে নগর ছিল। শুঙ্গযুগের এক পুরুষমূর্তি কান্তাদেবীর মন্দিরে সিঙ্গীরিস-এর নামে পূজিত হয়। শৃঙ্গবেরপুরকে পণ্ডিতম্মন্যরা সিঙ্গীরিসীপুর বানানোর চেষ্টা করেছে, আর এই জন্যই সিঙ্গীরিস-এর পত্নী তথা রামের বোন শান্তির মন্দির দাঁড় করানো হয়েছে। এমন হতে পারে যে, পাশের স্ত্রীমূর্তিটিও শুঙ্গযুগের। দুর্গের মধ্যে একটি বুট-পরা সূর্যমূর্তি ও সূর্যলিঙ্গ (মুখযুক্ত শিবলিঙ্গ) দেখলাম। সূর্য চোগাধারীও। এই দুটো মূর্তিই চতুর্থ শতাব্দীর হতে পারে। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর তো এখানে অনেক মূর্তিই আছে। মনে হয়, মুসলিম শাসনকালের প্রারম্ভে এই নগরটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। বহু পরে এখানে রাম নামে কোনো জায়গীরদার ছিল যে, নাগেশ ভট্টকে আশ্রয় দিয়েছিল। বর্তমানে সংস্কৃত পাঠশালাও চালু আছে। সময় তার অনুকূল হবে কি হবে না, তা ভবিষ্যৎ বলবে।

এখানে প্রয়াগ জনপদ সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হবার ছিল। তারই সভাপতি হয়ে আমাকে আসতে হয়েছিল। অনেক লোক হয়েছিল। অধিবেশন শেষ করে সওয়া সাতটায় রওনা হয়ে আমরা রাতে প্রয়াগ পৌছে গেলাম।

সারনাথ—নভেম্বরে সারনাথের বার্ষিক উৎসব হয়ে থাকে। ধারে-কাছে থাকলে আমি ঠিক সেখানে পৌছে যেতাম, একটা লোভ এও ছিল যে, দেশবিদেশ থেকে আসা অনেক

বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। তাই ১৩ নভেম্বর সকাল সাড়ে সাতটার ছোট লাইন ধরে সারনাথের উদ্দেশে রওনা হলাম। খেতে রবিফসল মাথা তুলছিল। দু মাস আগেই বন্যার জন্য হাহাকার পড়ে গিয়েছিল, আর এখন তার কোনো প্রভাব বোঝা যাচ্ছিল না। বেনারসে একাদশী মেলা ফেরৎ যাত্রীদের ভিড় বেড়ে গেল, সিকরৌড়েই কামরা ভরে গিয়েছিল, আর অলইপুরে তো সেকেন্ড ক্লাশেও তিল ধরার জায়গা রইল না। ক্যান্টনমেন্টেই আমরা ফার্স্ট ক্লাসে গিয়ে বসেছিলাম, এটা ভাল করেছিলাম। কামরার ছাতেও লোকেরা উঠে বসেছিল, কিন্তু সামনে বড় লাইনের পুলে মাথায় ধাক্কা লাগতো, তাই জবরদস্তি তাদের নামানো হলো। একটার সময় সারনাথ পৌঁছলাম। স্টেশন থেকে সারনাথ ধাম খুব দূরে নয়, কিন্তু মাল নেবার জন্য এক্কা আর কুলি জোগাড় করতে বরাবর ঝামেলায় পড়তে হয়। ধর্মশালায় গিয়ে উঠলাম।

সন্ধেবেলা বর্মী ধর্মশালায় কিত্তিমা বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। এখন মুখে বার্দ্ধক্যের ছাপ পড়েছিল। কয়েক বছর আগে দেখা তাঁর তরুণ মুখই দেখছিলাম আমি। কিত্তিমা বাবা তাঁর গুরু মহাস্থবির চন্দ্রমণি (কুশীলনারা)-র মত ভারতেই বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণের কাজে তাঁর সারাজীবন ব্যয় করেছেন। আজকাল বর্মীযাত্রীরা কম আসছে, তার জন্য আর্থিক অসুবিধেও হচ্ছে।

সারনাথে ঘোরার সময় কি করে সেই পুরুষটির স্মৃতি মনে না এসে পারে, যিনি 'বহুজন হিতায়' বিচরণ করার উপদেশ দিয়ে বহুজনের দাবি জোরদার করেছিলেন, আর নাগার্জুন যাঁকে অপ্রতিম বুদ্ধ সম্বোধন করে তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রতীত্যসমুৎপাদ আর মধ্যমা-প্রতিপদ (মধ্যম বর্গ)-এর মহিমা গেয়েছিলেন।

আনন্দজী আর কাশ্যপজীও এখানে ছিলেন। ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপ এই সময় তাঁর ভিক্ষুদশার প্রতি কিছুটা উদাসীন হয়ে উঠেছিলেন, আর চীবরের জায়গায় পাড়হীন কাপড় পড়েছিলেন। আমি তাঁকে বোঝালাম, 'ভিক্ষু বেশ ছাড়বেন না, এর সাহায্যে অনেক সাংস্কৃতিক কাজ আপনি করতে পারবেন।' ক্ষণিক আবেগ এসেছিল, পরে তা ঠিক হয়ে যায়।

১৪ নভেম্বরে পণ্ডিত গুরুসেবক সিংহের সঙ্গে দেখা হলো। সম্ভবত এটাই ছিল প্রথম দেখা। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছরের। যখন আমি তাঁর জন্ম শহর নিজামাবাদে পড়তাম,তখন তিনি ডেপুটি-কালেক্টর ছিলেন, আর শিক্ষণীয় বিষয়ে কোনো প্রবন্ধ লিখতে হলে আমি ও আমার বন্ধুরা সবসময় তাঁর উদাহরণ দিতাম। উপাধ্যায়জী হরিঔজীর ছোটভাই। সরকারি পদে থেকে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন, আর বহুদিন পর্যন্ত সমবায় সংস্থার পরিচালনার ভার তাঁর হাতে ছিল। অবসরগ্রহণ করে এখন তিনি নিজামাবাদে থাকতেন না? তাহলে এইসব গ্রাম অথবা বড় বড় গ্রামের উন্নতির কি আশা থাকতে পারে? তবে সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে কোনো সংস্কৃত পুরুষকে তাঁর সন্তানদের শিক্ষা ইত্যাদির দিকেও খেয়াল রাখতে হয়, আর তার আনুকূল্য বেনারসের মতো শহরেই পাওয়া সম্ভব।

বুদ্ধগয়া মন্দিরকে বৌদ্ধদের হাতে আনার আন্দোলনের শুরু হওয়া এক শতাব্দীর বেশি

হয়ে গেছে। ইংরেজ শাসনকালে রাজেন্দ্রবাবুর কর্তৃত্বে এর জন্য একটি সমিতিও তৈরি হয়েছিল। সমিতি সুপারিশ করেছিল যে মন্দিরের ব্যবস্থা বৌদ্ধদের হাতে থাকা উচিত। দেওয়ানি মামলার হাত থেকে বাঁচার জন্য সমিতি বুদ্ধগয়ার মোহান্তকেও কার্যনির্বাহ-সমিতিতে রাখার কথা বলেছিল। ইংরেজরা চাইত না বুদ্ধগয়ার মত এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশের কেন্দ্রীভূত স্থানের কার্যনির্বাহ এমনতর হোক। স্বাধীন ভারতে এই প্রশ্ন পুনরায় ওঠা স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু বিহার সরকার আইনের যে খসড়া পেশ করেছিল, তাতে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল, যাতে কার্যনির্বাহ-সমিতিতে বৌদ্ধদের প্রভাব বেশি না হতে পারে। সেইজন্য ন জন সদস্যের মধ্যে চারজনকে বৌদ্ধ রাখা হলো, আর চারজন হিন্দু এবং একজন গয়া জেলার কালেক্টর, যদি তিনি হিন্দু হন। এটা ছিল সরাসরি বৌদ্ধদের ওপর সন্দেহ প্রকাশ করার ব্যাপার। সারনাথে এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস হলো এবং বলা হলো যে, কার্যনির্বাহ-সমিতিতে দু-একজনের বেশি হিন্দু থাকা উচিত নয়, আর শুধু ভারতীয় বৌদ্ধদের জন্য নয়, বরং বিশ্বের সমস্ত বৌদ্ধদের জন্য তা উন্মুক্ত করে দেওয়া উচিত। জেনে আনন্দে হলো, সারনাথের মহাবোধি স্কুল এখন এফ· এ· পর্যন্ত অনুমোদন পেয়েছে।

গোরখপুর—গোরখপুর আসবার জন্য শ্রীবিদ্যানিবাসজীর খুব আগ্রহ ছিল। ১৫ নভেম্বর সাড়ে দশটার সময় আমি সেদিকে যাবার গাড়ি ধরলাম। পরের দিন দু ঘণ্টা লেট ট্রেন নটার সময় গোরখপুর পৌছল। বিদ্যানিবাসজীর বাবা শ্রীপ্রসিদ্ধনারায়ণ মিশ্র (উকিল)-র বাড়িতেই উঠলাম। নীচে মেয়েদের একটি স্কুল ছিল, যেখানে কারোর মনে হয়নি যে সেটিকে ঝাঁট দেবারও কোনো দরকার আছে। গোরখপুর গিয়ে শ্রীমহাবীরপ্রসাদ পোদ্দারের সঙ্গে কি করে দেখা না করে থাকা যেত? একটি খুবই দুঃখনজক ঘটনা ঘটেছিল, আমার মনেও তার প্রভাব পড়েছিল। তাঁর বড় ছেলে পুত্র আনন্দ আত্মহত্যা করেছিল। খুবই সম্ভাবনাময় তরুণ ছিল। লেখাপড়াতেও ভালো ছিল, আর বড় বড় স্বপ্ন দেখতো। এম· এ· পাশ করেছিল। আমি যখন রাশিয়ায় ছিলাম, আমার কাছে কয়েকটি বইয়ের বিষয়ে জানতে চেয়েছিল। একটি তরুণীর সঙ্গে প্রেম ছিল, যে তার জাতি ও প্রদেশের ছিল না। দুজনের মিলনে বাধা হলো আর দুজনে আত্মহত্যা করা ঠিক করল। আনন্দ করল কিন্তু মেয়েটির সাহস হলো না। মা-বাবার কি অবস্থা হলো, তা বলার প্রয়োজন নেই।

এদিকে কয়েক বছর ধরে বুদ্ধের নির্মাণ-স্থান কসয়া যেতে পারিনি, তাই ১৮ তারিখ কসয়ার উদ্দেশে রওনা হলাম। চন্দাবাবার এখন ৭৩ বছর বয়স হয়েছিল। সর্বপ্রথম ১৯১৯-এ তাঁর দর্শন করেছিলাম। বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, কিন্তু এখনও সুস্থ আছেন। বৌদ্ধ স্কুল এখন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় হয়ে গেছে। তার জন্য পাকা বাড়িও তৈরি হয়ে গেছে। কুশীনারাতে আর একটি ধর্মশালা ও মন্দির বেড়েছে, যা বিড়লা বানিয়েছে। ছোট একটি প্রইমারি পাঠশালা চন্দ্রমণি বাবার নামে তৈরি হয়েছিল, সেটিও এখন পাকা হয়ে গেছে। বৌদ্ধমঠের আরো দুটি নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছিল। মনে হলো আগের থেকে অনেক

পরিবর্তন হয়েছে। কয়েক শতাব্দী ধরে বিস্মৃত থাকার পর বুদ্ধ আবার তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে আসছেন, নতুন প্রজন্ম প্রাণ খুলে তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছে।

১৭ আর ১৮ তারিখ গোরখপুরের কয়েকটি সংস্থায় ভাষণ দিলাম। সেন্ট এনড্রু কলেজের সংস্কৃত পরিষদের উদ্বোধনী ভাষণ দিতে হলো। পণ্ডিত দেশের পুরনো জাতীয় কর্মী গৌরীশঙ্কর মিশ্রর সঙ্গে দেখা হয়ে খুব আনন্দ হলো। এখন জীবন-সন্ধ্যা এসেছে। সবথেকে বড় স্বপ্ন, দেশের স্বাধীনতা, চরিতার্থ হয়ে গেছে। কিন্তু জনগণের জন্য কিছু হচ্ছে না, এ কথা জেনে তাঁর দুঃখ হচ্ছিল।

বারাণসী—১৬ তারিখ রাত দশটার গাড়িতে রওনা হয়ে পরের দিন সাড়ে আটটার সময় বেনারস পৌঁছলাম। এবার ছ দিন থেকে এখানকার প্রফেসরদের পরিভাষা নির্মাণের কাজে সাহায্য করতে প্রেরণা দিতে এসেছিলাম। স্টেশন থেকে রিক্সায় পণ্ডিত জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের বাড়ি পৌঁছলাম। পণ্ডিত জয়চন্দ্রজীর মত ইতিহাসের গভীর পণ্ডিতের আর্থিক অবস্থা সবসময় অনিশ্চিত থেকেছে, যা সবথেকে বেশি ভোগ করতে হয় তাঁর স্ত্রী সুমিত্রাদেবী শাস্ত্রিনীকে। কিন্তু যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন শাস্ত্রিনীকে আমি কখনো চিন্তিত দেখিনি। অতিথি সৎকারের জন্য তিনি সর্বদা হাসিমুখে তৈরি থাকতেন।

জল খাবার খেয়ে কাজে বেরোলাম। ভারতীয় জ্ঞানপীঠে ন্যায়াচার্য পণ্ডিত মহেন্দ্র শাস্ত্রী নেই। শেঠদের ছায়া অত্যন্ত বিরল হয়ে থাকে। রাস্তায় বৃদ্ধ পণ্ডিত শিববিনায়ক মিশ্র বৈদ্যর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি তাঁর সঙ্গে তাঁর দাতব্য ঔষধালয়ে নিয়ে গেলেন, নগবাতে যেটা তিনি দেশভক্ত বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্তের নামে খুলে রেখেছেন। বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু এখনও তাঁর কর্মক্ষমতা যায়নি। কংগ্রেসের গতিবিধিতে অসন্তুষ্ট হওয়াটা স্বাভাবিক। আমি বললাম, 'নিরাশ হবার কারণ নেই। এটা আপনি তরুণদের ওপর ছেড়ে দিন।'

সেখান থেকে অস্সীতে জগন্নাথ মন্দিরে গেলাম। সেখানে আমার বাল্যবন্ধু দশরথ পাণ্ডে ছিলেন, যাঁর সঙ্গে ১৯১০ অথবা ১৯১১-তে দু-চার দিন ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। সে সময় তাঁর বয়স ১৮ বছরের বেশি ছিল না, কিন্তু এখন মুখে একটাও দাঁত নেই। সমস্ত চুল সাদা হয়ে গেছে। জগন্নাথ মন্দিরের ভেতর নরসিংহের মন্দির আছে যার পূজারী উড়িয়া সাধুও সে সময় যুবক ছিলেন। এখন তিনিও পাকা আমটি হয়েছেন, তবে দশরথজীর মতো অতটা নয়। ইচ্ছে হলো, যাই আমাদের বিদ্যার্থী জীবনের একটি স্মরণীয় জায়গা মোতিরামের বাগানও দেখে আসি। তার অবস্থা দেখে দুঃখ হলো। তার মানে এই নয় যে, মোতিরামের বাগানে কোনো পরিবর্তন দেখতে চাইছিলাম না। কিন্তু যে ধরনের পরিবর্তন হয়েছিল, তা খারাপ। বাগান কিনে নিয়ে শেঠ গৌরীশঙ্কর গোয়েঙ্কা নিজের নামে পাঠশালা বানানোর প্রস্তুতি করছিলেন। চারপাশের দেয়াল সব ভেঙে গিয়েছিল। সবথেকে আফশোশের কথা, কাশীর মহান পণ্ডিতদেরও গুরুতুল্য ব্রহ্মচারী মঁগনীরামের বাস্থানের কোনো চিহ্নই সেখানে রাখা হয়নি। মঁগনীরাম বিদ্বান আর বেদান্তের সাক্ষাৎ মূর্তি ছিলেন, তাঁর ত্যাগের কথা আর কি বলা যায়? তাই পণ্ডিত চক্রবর্তী শিবকুমার শাস্ত্রীও গুরুপূর্ণিমার দিন তাঁর পুজো করতে আসেন। কৃত্রিমতা কখনো তাঁকে ছুঁতে পারেনি। যে

কুটিরে তিনি থাকতেন সেটি আগে থেকেই পাকা ছিল। দু দিকে কুঠরী, মাঝে দালান আর বাইরে চওড়া পাকা চাতাল—এই ছবি এখনও আমার মানস-পটে অঙ্কিত আছে। দুটি ছোট ছোট গেরুয়ার টুকরোয় শরীর ঢেকে চাতালে পায়চারীরত মঁগনীরামের মূর্তি আমি ভুলতে পারি না। ভাস্করানন্দ পুরোপুরি ভণ্ড ছিলেন, তাঁর বিদ্যাও তেমন কিছু ছিল না কিন্তু নগ্ন থাকার জন্য তাকে স্বর্গে ভুলে দেওয়া হয়েছিল—অল্পদূরেই তাঁর শ্বেতপাথরের সমাধিটি তখন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যদি কোনো ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের স্মারক কাশীতে থাকা উচিত ছিল, তবে তিনি হলেন মঁগনীরাম ব্রহ্মচারী। যদি মানুষের হাত তাঁর কুটির ভেঙে না ফেলতো তবে তা আরো একশো বছর টিকে থাকতে পারতো। কিন্তু শেঠ, মঁগনীরামের মধুর স্মৃতিকে লুপ্ত করে দিয়ে স্বয়ং অমর হতে চেয়েছেন, এ ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। নামের ব্যাপারে অন্তত মঁগনীরাম ব্রহ্মচারী একেবারেই কাঙাল ছিলেন না। জীবিত অবস্থাতেও শুধু বিজ্ঞলোকেরাই এই গোবরে পদ্মফুলটিকে চিনতেন। মৃত্যুর পরেও তাঁর কোনো স্মারকের আকাঙ্ক্ষা থাকার কথা নয়। কিন্তু বেদান্তের যারা দোহাই দেয় তারা কোন রোগের ওষুধ?

আমার থাকার সময় মোতিরাম বাগানে বিদ্যার্থী আর সন্ন্যাসীদের জন্য তিন কি চারটি ক্ষেত্র চালু ছিল, যেখানে ৬০-৭০জন মানুষ খাবার পেত। এখন সেইসব ক্ষেত্রের বাড়িগুলো ধরাশায়ী হয়েছে। কয়েক ডজনের বেশি বিদ্যার্থী থাকতো, এখন কারো পাত্তা নেই। বাগানে শ'য়ে শ'য়ে লেবু গাছ আর কিছু বড় বড় গাছও ছিল, যার জন্য গরমেও ঠাণ্ডা থাকতো। ঠিক মাঝখানে টিনের নীচে ছিল বাঁধানো চাতাল, সেও এখন নেই। শঙ্কর যুবক ছিলেন। বিরক্ত হয়ে কাশীবাস করার জন্য চলে এসেছিলেন। পুরনো স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তাঁকে পেলাম। এখন চোখে দেখতে পান না। অনেক মনে করানোর পর আমাকে চিনতে পারলেন। দুজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীও সেখানে ছিলেন। অদ্বৈতাশ্রম-এর- স্বামীর সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলতে লাগলাম। তাঁর মনে আছে, এক দণ্ডধারী স্বামীর ভাইপো বনমালীকে আকেজন বিদ্যার্থী ফুসলিয়ে কোথাও নিয়ে গিয়েছিল। বনমালী আমারই জেলার বাসিন্দা ছিল আর ফুসলানোর দোষ যাকে দেওয়া হচ্ছিল, সে ছিলাম আমি। আমাদের দুজনের ভাব ছিল। আমি যখন কাশী থেকে বৈরাগী সাধু হবার জন্য পরসা চলে যাই, তখন বনমালীরও মনেও বৈরাগ্য দেখা দেয় এবং সেও পরসা গিয়ে পৌঁছোয়। আমি সে সময় দক্ষিণী পথের লম্বা যাত্রায় বেরিয়েছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে সে বরদরাজ দাস হয়ে যায়। কত বছর ধরে বরদরাজ আর আমি কখনো একসঙ্গে আর কখনো আলাদা আলাদা কিন্তু মানসিকভাবে একে অপরের কাছাকাছি থেকেছি। অসহযোগের সময় এলো, তখন পাঁচ-ছ বছরের জন্য আমি ছাপরার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলাম। কিন্তু এখন বরদরাজ সেখান থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে দেখা করার অনেক চেষ্টা করেছি, এবং আজও আমার বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা করার খুবই আগ্রহ রয়েছে। গৌহাটি-কংগ্রেসে অনেক খোঁজ করেছি কিন্তু বিফল হয়েছি। শুনেছিলাম, সে আসামে চলে গেছে, আর সাধু থেকে আবার গৃহস্থ হয়ে গেছে। যেমনই হোক বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল।

বাগানে যেখানে আগে একটা দরজা ছিল এখনও সেখানে খেলাঘরের মত পাকা

কুঠরিগুলো রয়ে গিয়েছিল। সেখানে চক্রপাণি ব্রহ্মচারী কয়েকজন বিদ্যার্থী থাকতেন। ছাতের ওপর কতদিন আমি বই মুখস্থ করতাম। তখন দেয়ালের সাহায্যে জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট কুটির বানানো ছিল, যেগুলো দেখলে প্রাচীন আশ্রমের কথা মনে পড়ত। কিন্তু আজ সবকিছুই লুপ্ত হয়েছে। অদ্বৈতাশ্রম-এর স্বামী আর তাঁর সঙ্গী দণ্ডধারী সেই পুরনো জগৎ লুণ্ঠিত হওয়ায় অসন্তুষ্ট ছিলেন। তবে এইটুকু সন্তুষ্টি অবশ্যই ছিল যে, শেঠ তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। দুজনে খুবই বৃদ্ধ ছিলেন। বেশিদিন পর্যন্ত তাঁদের বাঁচার আশা ছিল না।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। প্রোফেসর ললিতকিশোর সিংহ, রঘুবীরী শৈলীর পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিকতাব নামে ইংরেজি পরিভাষার বিশেষভাবে সমর্থক ছিলেন। প্রোফেসর ফুলদেব সহায় ও ড· ব্রজমোহন আমাদের পরিভাষা পছন্দ করতেন, কিন্তু রঘুবীরের শৈলী নতুন শব্দ তৈরি করা সহজ করে দিত, তাই সেইদিকেই ঝুঁকেছিলেন। সত্যি সত্যিই তা সহজ ছিল—উপসর্গ, প্রত্যয আব ধাতুগুলিকে অঙ্কের নিয়মে জুড়ে বাদ দিয়ে অসংখ্য শব্দ বানানো। কিন্তু যাদের জন্য এই শব্দগুলি বানানো হচ্ছিল, তাদের অসুবিধের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া দবকার ছিল, যেটা বুঝতে ড· বঘুবীর আর তাঁর সঙ্গীরা বাজি ছিলেন না। আসল বাস্তাটা এই দুইযের মাঝখানে ছিল।

২০ নভেম্বর আবার বেরোলাম। বাঙালীটোলা,দশাশ্বমেধ, কচৌড়ী গলি, মণিকর্ণিকা, সিন্ধিয়াঘাট, নন্দন সাহুর গলি, গোধুলিয়া আমাব সব পুবনো জাযগাগুলো দেখে বেড়ালাম। তারপর বিদ্যানিবাসজীর সঙ্গে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েব দিকে গেলাম। ভিনগাব কুঠিতে পণ্ডিত গুরুসেবক সিংহ উপাধ্যায় আছেন জেনে অল্পসময়ের জন্য তাঁব সঙ্গেও দেখা করে নিলাম। বৃদ্ধদের সব থেকে বড় পুজো হলো তাঁদেব সঙ্গে দেখা করে কিছু মিষ্টি কথা ও পুরনো স্মৃতি শোনা এবং শোনানো। বিশ্ববিদ্যালযে প্রোফেসর ফুলদেব সহায় রসায়ন সম্বন্ধী প্লাস্টিক ইত্যাদির পরিভাষা দিতে রাজি হলেন। ড দয়াস্বরূপ খনিজ আর ধাতুসম্বন্ধী পরিভাষায় ভাব নিতে বাজি ছিলেন। ড· পন্ত বিমান-চালনা শাস্ত্রর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ভূগর্ভ আর ধাতুবিদ্যা বিষয়ে সাহায্য করতে ড· বাজনাথ বাজি হয়েছেন বলে জানা গেল, কিন্তু তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হলো না। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেব প্রিন্সিপাল সেনগুপ্ত মেকানিক্যাল আর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জন্য আশ্বাস দিচ্ছিলেন। ড· বোডবোল খুব বেশী বাগ্মী হওয়ায় বিশ্বাস তো হচ্ছিল না, কিন্তু আশা ছিল, তাঁর টেকনোলজি কলেজ থেকে পরিভাষার কিছু কাজ করিয়ে দেবেন। ডা· গোডবোল শিক্ষার জন্য বহুদিন পর্যন্ত জাপান জার্মানিতেও ছিলেন, তাই ভালোভাবেই জানতেন যে, ইংরেজি পরিভাষা আন্তর্জাতিক নয়, যদি আন্তর্জাতিক রাজ্যগুলির মধ্যে জাপান আর জার্মানিকে ধরা হয়। প্রিন্সিপাল সেনগুপ্ত খুবই উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বানদের সঙ্গে দেখা করার পর পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, প্রথমে কাজটা অবশ্যই কঠিন হবে, কিন্তু শেষে তা সম্পূর্ণ করতে অসুবিধে হবে না। আমি ভেবে নিলাম দু মাসে বিদ্বানদের কাছ থেকে শব্দ সংগ্রহ করতে হবে, একমাসে সম্পাদক-বিভাগকে দেখিয়ে

অবশিষ্ট শব্দগুলির প্রতিশব্দ দেওয়া, একমাস সম্পাদক মণ্ডলী দিয়ে সংশোধন করানো, টাইপ করে দু মাস পরামর্শের জন্য সংকলক বিদ্বান আর ভারতের অন্যান্য ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে অভিমতের জন্য পাঠানো, আর শেষের একমাস ধরে শেষবারের মত সংশোধন করে প্রেসের জন্য কপি তৈরি করে দেওয়া। ছাপার জন্য এক মাস রেখে দিলে মোট আট মাসের কাজ ছিল। বহু বিষয়ের কাজ একসঙ্গে হতে পারতো, তাই আট মাসের ভেতর বেশ কয়েকটি বিষয়ের পরিভাষা ছেপে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব ছিল। আমার মনে হয়, এই পুরো চার-পাঁচ লক্ষ পরিভাষা তৈরি করতে চার-পাঁচ বছরের বেশি লাগতো না। যদি পরিভাষা নির্মাণের কাজ বন্ধ না হয়ে যেত তাহলে ১৯৫২-৫৩ নাগাদ হিন্দি এবং ভারতের সমস্ত ভাষা পরিভাষার অভাব থেকে মুক্ত হয়ে যেত। সম্মেলনের ভেতরের ঝগড়া অতটা বাধা সৃষ্টি করতে পারত না, যতটা পরিভাষা ছাপার ব্যাপারে ক্লান্তিকর আলস্য করেছিল। কোন মুখে আমি বিদ্বানদের সময় আর শ্রম লাগিয়ে শব্দ সংগ্রহ করতে বলবো, যখন আমি দেখছিলাম যে, সেগুলো ছাপার কোনো আশাই নেই?

২১ নভেম্বর ড· মঙ্গলদেব শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনিও আমার এই পরিকল্পনা পছন্দ করলেন। সে সময় কাশীতে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় বানানোর কথা চলছিল। ড· সম্পূর্ণানন্দ কাশীতে এই কৃতি আর কীর্তির সমর্থক ছিলেন, যার জন্য যোজনা তৈরি করতে ড· মঙ্গল দেবকে বলা হয়েছিল। আমার এটা অকেজো সাদা হাতি বলে মনে হচ্ছিল। এমনিতেই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগ আছে, তাকেই আরো মজবুত করা উচিত ছিল, আর সরকারি সংস্কৃত কলেজকে তারই অঙ্গ করে দেওয়া উচিত ছিল। সংস্কৃতের বিদ্যার্থীর সংখ্যা তো দিনের পর দিন কমে যাচ্ছিল, তাহলে এই লম্বা-চওড়া নামধারী সংস্থায় পড়ুয়া কোথা থেকে আসবে? যদি খামোখা সাদা হাতি বাঁধতেই হয়, আর এখন তো প্রায় বাঁধা হয়েই গেছে, তাহলে এখানে সংস্কৃত পড়ানোতে এমন পরিবর্তন করা উচিত যাতে বিদ্যার্থী ৩ মাস না পড়ে ৯ মাস পড়ে, আর নিজ নিজ বিষয়ের গুরুত্ব রক্ষা করে কিছু এমন বিষয়ও গ্রহণ করে যা সরকারি চাকরি পেতে সাহায্য করবে। আজ সংস্কৃত নিয়ে সব থেকে বড় সমস্যা হলো—কি করে তার গভীর পাণ্ডিত্যকে রক্ষা করা যায়। পুরনো মহাবিদ্বানরা মহাপ্রস্থান করতে চলেছেন, তাঁদের স্থান গ্রহণ করার জন্য খুব কম নতুনের জন্ম হচ্ছে। এই মহান ক্ষতিকে কি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় রোধ করতে পারবে? আমার বুদ্ধিতে তার রাস্তা অন্য।

সেইদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি কলেজের প্রিন্সিপাল লুথরার সঙ্গে দেখা করলাম। পুরনো যুগের আমলা, আমলাতান্ত্রিক গড়িমাসির অনন্য ভক্ত। তিনি পরামর্শ দিলেন, উপাচার্য একটি পরিপত্র বার করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিক, তাহলে এই কাজ সহজে হতে পারে। উপাচার্য পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্যের কাছ থেকে পরিপত্র বার করা মুশকিল ছিল না, কিন্তু পরিপত্র বার করালে তখন প্রশ্ন উঠবে—প্রফেসাররা এই কাজের জন্য তাঁদের ডিউটির সময় দেবেন, তাতে তাঁদের নিজেদের কাজে অসুবিধে হবে। আমি চাইছিলাম, এই কাজকে ডিউটির অতিরিক্ত মনে করে করা হোক।

সেইদিন সন্ধে সাড়ে ছটায় হরিশ্চন্দ্র কলেজে বক্তৃতা দিতে হতো। বক্তৃতা দিতে গিয়ে

একটা লাভ তো আমার হয়—যাদের ওপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সেইসব তরুণদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ। আর একটা লাভ হলো, কাগজে বেরোনোর জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা জেনে এবং তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত।

২০ তারিখ দাঁতের ব্যথায় ঠোঁট ফুলে গিয়েছিল, খাওয়াতেও রুচি ছিল না। কাজের জন্য আমি শ্রীভগবদ্দত্ত শর্মা আর শ্রীবিদ্যানিবাসজীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠালাম। প্রিন্সিপাল লুথরার সঙ্গেই দেখা হয়েছিল। তিনি আবার পরিপত্রের কথা বললেন। তিব্বত থেকে আনা 'প্রমাণবার্তিক ভাষ্য' কয়েক বছর ধরে কয়েকটি দরজা ঘোরার পরেও পোকার খাবার হবার জন্য রাখা ছিল। আচার্য মহেন্দ্র শাস্ত্রীর আশা ছিল, যদি জ্ঞানপীঠ তা ছেপে দেয়। তাঁরা নিয়েও গেলেন, কিন্তু এখনও প্রজ্ঞাকরের এই মহান কৃতির প্রকাশিত হওয়ার ভাগ্য হয়নি।

পরের দিন (২৩ নভেম্বর) শরীর কিছুটা ভাল বোধ হলো। একটাব সময় আমরা আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে গেলাম, পদার্থ বিজ্ঞানে ড· আসুন্ডী একমাত্র মানুষ ছিলেন, যিনি খুবই উৎসাহের সঙ্গে নিজের বিষয়ের গবেষণায় রত ছিলেন। তিনি তাঁর ছোট্ট মতন প্রয়োগশালায় পারদের কিরণ নিয়ে গবেষণা দেখালেন। এখানে সেই কাজ হচ্ছিল, যে কাজে অর্থ ও সামগ্রীর কোনো অভাব হওয়া উচিত নয়, কিন্তু ড· আসুন্ডী নিজের ওপরই নির্ভর করতে বাধ্য ছিলেন। ভাল ভাল বড় যন্ত্র তিনি এখানে কোথা থেকে আনতে পারবেন? ড· আসুন্ডী একজন কন্নড়ভাষী, অর্থাৎ সেই প্রদেশের বাসিন্দা, যাকে ইংরেজির খুবই পক্ষপাতী বলা হয়ে থাকে। তবে পরিভাষার ব্যাপারে তিনি খুবই উৎসাহ দেখাচ্ছিলেন। সাত-আটজন অধ্যাপক তাঁর বিভাগে একত্র হলেন। আমি সেখানে পরিভাষা নির্মাণের ব্যাপারে বললাম। ড· সদ্গোপাল প্রসাধন এবং প্রফেসর রামচরণ স্ফটিক সম্পর্কিত পরিভাষার ভার নিতে রাজি হলেন। একজন তরুণ বিদ্বান, হিন্দি মাধ্যম হলে বিস্তৃত সাহিত্য থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, 'হিন্দি অথবা অন্য কোনো ভাষা মাধ্যম হলে পরেও যে সব ভাষায রোজ রোজ নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রকাশিত হয়ে থাকে, বিশ্বের সেইসব দু-তিনটে ভাষা প্রত্যেক গবেষককে পড়তে হবে। হিন্দি অথবা অন্য যে কোনো প্রাদেশিক ভাষার উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হবার অর্থ কখনোই এই নয় যে, আমাদের জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি আর রুশ ভাষায় কাজ চালানোর মত জ্ঞান লাভ করতে হবে না। আয়ুর্বেদ বিভাগের ড· ঘাণেদারের সঙ্গে কথাবার্তা হলো। তিনি হিন্দিতে কয়েকটি বই লিখেছেন। পরিভাষা গ্রহণ করার বিষয়ে তিনিও রঘুবীরী পথের পথিক। বস্তুত ইংরেজি পরিভাষা গ্রহণ করতে তথা রঘুবীরী পরিভাষা বানাতে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয় না। প্রথমটির জন্য তো কিছু করতেই হয় না, দ্বিতীয়টির জন্য যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধাতু আর প্রত্যয় জোড়া দিতে হয়। তাই অনেক বিদ্বানই এই পদ্ধতির মধ্যে একটিকে গ্রহণ করতে চান। মাঝের পথ পরিশ্রম সাধ্য, যাকে আমাদের দেশ পরিভাষার জন্য দু-হাজার বছর ধরে গ্রহণ করে এসেছে, আর ইউরোপেব উন্নত ভাষাগুলিও সেই পথেই চলেছে। অর্থাৎ জ্ঞাত শব্দ দিয়েই পরিভাষা তৈরি করা উচিত।

—১৯৪৮—

২৪ নভেম্বর ডি· এ· বি· উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে গেলাম। এই বিদ্যালয় যখন সবে স্থাপিত হয়েছিল,তখন তিন মাস পর্যন্ত আমি এখানে ছাত্র ছিলাম। কোনো ইংরেজি স্কুলে পড়ার এইটুকুই সুযোগ আমার হয়েছিল। তখন এটি গোধূলিয়ার কাছে সিকরোড যাবার রাস্তা থেকে একটু দূরে একটি ভাড়াবাড়িতে ছিল। এখন বিদ্যালয়ের নিজস্ব বিশাল বিশাল বাড়ি আছে। ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এগারোশো ছেলে পড়াশোনা করছে। সেই সময় আর্যসমাজ শিক্ষা-প্রচারের জন্য খুব চেষ্টা করছিল, আর তারই ফলস্বরূপ আজ জায়গায় জায়গায় দয়ানন্দ স্কুল ও দয়ানন্দ কলেজ আছে। মেয়েদের লেখাপড়ার বিরোধী তো তাঁরা ছিলেন না, তবে চাইতেন তাদের হিন্দি আর খুব বেশি হলে সংস্কৃত পর্যন্ত সীমিত রাখা হোক, তাই তাঁরা মেয়েদের স্কুল বেশি খুলতে পারেননি। কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীকৃষ্ণদেব প্রসাদ গৌড় 'বেঢব বেনারসী'র সঙ্গে আমার একটা অন্য সম্পর্ক আছে। আজমগড় জেলার ছোট শহর নিজামাবাদে তাঁর মামাবাড়ি, যেখানে তাঁর শৈশবের বহু বছর কেটেছে। নিজামাবাদ থেকেই আমি উর্দু-মিড্‌ল পাশ করেছিলাম। তখন তো বেঢবজীর সঙ্গে পরিচয় হয়নি, তবে তাঁর দাদু-মামা আর মামাতো ভাইদের রোজ দেখতাম। বাদশাহী যুগে কোনো একসময় গৌড় কায়স্থরা নিজামাবাদে গিয়ে বসবাস শুরু করে। এখনও তাদের পাকা-কাঁচা হাবেলীগুলো জানান দিচ্ছে যে একসময় তাদের অবস্থা খুব ভাল ছিল। বেঢবজীর দাদামশাইয়ের বাড়ি নিজামাবাদের সব থেকে বড় জমিদার বংশ ছিল। হাবেলী কি, আমার তো তখন সেগুলো মহলের মনে হতো। স্টেশন থেকে দূরে বড়গ্রাম অথবা ছোট শহরে থাকা সত্ত্বেও গ্রাম্য বাতাবরণ ছিল না। শিক্ষার দিকেও তাদের মনোযোগ ছিল, যদিও নিজামবাদে মিড্‌ল স্কুলের বেশি পড়া যেত না, আর তাও হিন্দি-উর্দুতে। হরিঔধজীও কিছুদিন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। আমার শিক্ষক পণ্ডিত সীতারাম শ্রোত্রিয় তাঁরই শিষ্য ছিলেন। নিজামাবাদে শিক্ষার আরো প্রসার হয়েছে, কিন্তু তাতে নিজামাবাদের কোনো লাভ হয়নি। শিক্ষাপ্রাপ্ত হবার পর জীবিকার জন্য লোকেদের বাইরে যেতে হয়েছে এবং কোনো বড় শহরে গিয়ে সেখানকার বাসিন্দা হয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীসেনগুপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেকেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরো কথাবার্তা হলো। বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পরিভাষাগুলি তিনি দিতে রাজি হলেন। ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপ সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়েই পালি পড়াচ্ছিলেন। পরিভাষার কাজ যাতে দ্রুত হয়, তাই তার দেখাশোনার দায়িত্ব নিজে নিলেন। সব মিলিয়ে বেনারসের এই যাত্রা খুবই উৎসাহবর্ধক ছিল। পরে যদি কাজ না এগোয় তবে সে দোষ তাঁদের নয়।

বিদ্যানিবাসজীকে কাল আসতে বলে পণ্ডিত ভগবদদত্ত শর্মার সঙ্গে রাতেই প্রয়াগের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম।

প্রয়াগ—এসেই ইনকামট্যাক্স অফিসারের হুকুম পেলাম। বিদেশে থাকাকালীন আমার আয়ের বিবরণ চেয়েছিল। লেনিনগ্রাদের প্রোফেসর হিসেবে আমি মাসিক চার হাজার

রুবল পেতাম। সরকারি বিনিময় ধরলে তা দু হাজার টাকার থেকে বেশি হতো। তবে সেখানের জিনিসের দাম যদি দেখা হয় তাহলে অনেক জিনিসই এখান থেকে বিশ-ত্রিশ গুণ দামী। কিভাবে হিসেব করা যাবে? বিদেশে আমার রোজগারের জন্য দেশের দু-চার বছরের রোজগার যদি ইনকামট্যাক্স হিসেবে দিতে হয় তবে তার অর্থ হলো না খেয়ে মরা। ইনকামট্যাক্সের এই ঝামেলার মীমাংসা হতে কয়েক বছর লাগল।

হিন্দির ছোট টাইপের প্রয়োগে সব থেকে বড় অসুবিধে ছিল তার ওপর-নীচের মাত্রা, যার জন্য আমাদের অক্ষরের আকার দু গুণ হওয়া সত্ত্বেও অর্ধেক মোটা হতো। আমি সে ব্যাপারে কিছু চিন্তা করেছিলাম, যা আমি আগে বলেছি। কৈলাশ টাইপ ফাউন্ড্রির মালিক তার মিস্ত্রি সুলতানকে দিয়ে এরকম টাইপ বানিয়ে দিতে রাজি হয়েছিল, যাতে মাত্রাগুলি ওপরে-নীচে না হয়ে সামনে-পিছনে হবে। শেষে এই টাইপ তৈরিও হয়েছিল, কিন্তু তাকে কাজে লাগানো যায়নি।

২৮ নভেম্বর প্রয়াগে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের আগমনের ধূম লেগেছিল। বল্লভভাই কংগ্রেস আন্দোলনের বড় সেনানী ছিলেন, গান্ধীজীর তাঁর ওপর অসীম বিশ্বাস ছিল। ভারত স্বাধীন হবার পর রাজ্যগুলির ঝগড়া মেটাতে তিনি খুবই দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। হায়দ্রাবাদের সমস্যা সমাধান করাও তাঁরই কাজ ছিল। কিন্তু তিনি পুঁজিপতিদের সমর্থক এবং যে কোনোরকমের প্রগতিশীল চিন্তাকে কঠোরভাবে দমন করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আজকের ভারতের সমস্যা বুঝতে পাবতেন না, তাদের সমাধান করার সাহসও রাখতেন না। সমস্ত ভারতে প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রভাব তো নেই, তাই কংগ্রেসী নেতা আর পুঁজিপতিরা তাঁকে স্বাগত জানানোব জন্য বুক পেতে দিতে প্রস্তুত ছিল। প্যাটেলের জীবদ্দশায় নেহেরু শুধুমাত্র তাঁর শব্দযন্ত্র ছিলেন। প্যাটেল স্বয়ং বক্তা ছিলেন না, তাই তাঁর এমন একজন ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল।

মামুলি কথায় কি করে তিল থেকে তাল হয়, ২৯ নভেম্বরে একটি ঘটনা তার উদাহরণ। শ্রীনিবাসজীর ছোট ছেলে নীলুকে চাকর বেডাতে নিযে গিয়েছিল। সেই সময় প্রয়াগে গুজব ছড়িয়েছিল যে, শহরে 'কাঠ-শুঁকিয়ে' ঘুবে বেড়াচ্ছে, যে কাঠ শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে বাচ্চাদের উঠিয়ে নিয়ে যায়। চাকরের সঙ্গে নীলুকে কেউ যেতে দেখেনি। শোরগোল পড়ে গেল। পাগলের মত লোক এদিক-সেদিক দৌড়তে লাগল। শেষে যখন চাকরের সঙ্গে নীলু ভালয় ভালয় ফিরে এলো, তখন সবার ধড়ে প্রাণ এলো।

কানপুর—পরিভাষার কাজে মগ্ন ছিলাম। বেনারসের পরে কানপুরের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেবার জন্য ২৯ নভেম্বর কানপুর পৌছলাম। প্রফেসর বালমুকুন্দ গুপ্তের কাছে থাকলাম। পরের দিন তাঁকে এবং শ্রীললিতমোহন অবস্থীকে নিয়ে কৃষি কলেজে পৌছলাম। প্রফেসর সরগা হিন্দি-পরিভাষার গুরুত্ব বুঝতে চাইছিলেন না, আর বোঝানোর পরেও নিরাশার কথা বলতে থাকলেন। কিন্তু ড· উদয়নারায়ণ সিংহ কাজ করতে রাজি ছিলেন। চর্মস্কুলের প্রধান শিক্ষকও তাঁর বিষয়ের পরিভাষা দিতে সম্মত হলেন। পরিভাষাগুলি টাইপ করে তার কয়েকটি করে কপি করার প্রয়োজন ছিল, যাতে ভারতের

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিশেষজ্ঞদের কাছে যেগুলো পাঠানো যায়। তার জন্য ডুপ্লিকেটর মেশিনের কথাবার্তা চলছিল। এখানে সেটা তৈরি পাওয়া গেল, আর ২৯০০ টাকায় সম্মেলনের জন্য আমি সেটা কিনিয়ে দিলাম।

১ ডিসেম্বর টেক্সটাইল (বয়ন) ইনস্টিটিউটে গেলাম, সেখানকার তিনজন অধ্যাপক—অগ্নিহোত্রী, বল্লা, আর চক্রবর্তী বয়ন সম্বন্ধী পরিভাষা দেবার দায়িত্ব নিলেন আর বললেন, 'জানুয়ারির শেষ নাগাদ আমরা এই কাজ সম্পূর্ণ করে দেবো।' আসলে যে বিদ্বানের সঙ্গে আমরা দেখা করতাম, তিনিই পরিভাষার গুরুত্ব বুঝতেন আর আমাদের সাহায্য করার জন্য কোমর বাঁধতেন। আমরা জানতাম, এ হলো প্রেমের বেগার। বিদ্বানদের তাঁদের নিজস্ব সময় একাজে দিতে হবে। হারকোর্ট বাটলার টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে চিনি ও তেল সম্বন্ধী পরিভাষার কাজ শ্রী শ্রীশচন্দ্র কৌশলের নিরীক্ষণে হতে লাগল। কৌশলজী টেকনোলজিতে বি· এস· সি· ছিলেন, যদিও জীবিকার জন্য তিনি ইনকাম ট্যাক্সের মোকদ্দমাগুলির দেখাশোনার কাজ নিয়েছিলেন, আর তাতে সাফল্য লাভ করতে করতে এল· এল· বি· পাশ করে উকিল হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সেইসব ব্যক্তিদের একজন যাঁরা পরিভাষা তৈরির ব্যাপারে সবথেকে বেশি তৎপর ও অধীর ছিলেন।

অন্যান্য দিনও বক্তৃতা দিতে হয়েছিল তবে ২ ডিসেম্বর বক্তৃতার লাইন লেগে গিয়েছিল। মারোয়াড়ী বালিকা বিদ্যালয়ে এগারোটায় বক্তৃতা দিলাম, তারপর সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, গুরুসহায় খমী স্কুল আর ক্রাইস্ট চার্চ স্কুলে ভাষণ দিয়ে শ্রীকৈলাশচন্দ্র কাপুরের বাড়িতে খেলাম। শ্রমজীবী সাংবাদিক সংঘ আর প্রতাপ কার্যালয়েও বলতে হলো। সন্ধেবেলা কৈলাশবাবুর বাড়িতে খেতে খেতেও একটা বৈঠক হয়ে গেল।

৩ তারিখ মূলত যেখানে-সেখানে ঘোরার কাজ হলো। গঙ্গার পারে সতীঘাটে গেলাম, যেখানে ইংরেজ স্ত্রী ও বাচ্চাদের হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। ১৮৫৭ সালেও সেখানে মন্দির বর্তমান ছিল। এরপর কোম্পানিবাগে সেই কুঁয়োটি দেখলাম, যার ভেতর শতশত ইংরেজ নর-নারীকে মেরে অথবা আধমরা করে ফেলে দেওয়া হয়েছিল বলা হয়। তাকে এখন একটি সুন্দর পাথরের স্মারকের চেহারা দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৭-এর ১৬ আগস্টের আগে ভারতীয়দের সেটা দেখার জন্য খুলে দেওয়া হয়নি। এখন খোলা হয়েছিল। স্মারকের পাকাবাড়িটি বিদ্যমান ছিল।

সেদিনের প্রাতরাশ আর মধ্যাহ্নভোজন শ্রীপুরুষোত্তম কাপুরের বাড়িতে হলো। এদিকে আমি বিবাহপ্রথা আর তার গীতগুলি সংগ্রহ করার জন্য কয়েকজন মহিলাকে বলেছিলাম। পুরুষোত্তমজীর ধর্মপত্নী বিমলাজীকেও আমি আর্জি জানাতে চাইলাম। বলতে বলতে দশজনের মধ্যে কোনো একজন তো তার জন্য তৈরি হয়ে যাবে। বিমলাজী উত্তরপ্রদেশে কয়েক প্রজন্ম আগে এসে বসবাস শুরু করা 'পাঞ্জাবী' ক্ষত্রিয়দের বিবাহপ্রথা আর গীত সংগ্রহ করেও দিলেন, কিন্তু তা অসম্পূর্ণ থাকায় প্রকাশিত হতে পারল না। বেশ কয়েকজন মহিলার মধ্যে শুধু কিরণকুমারী গুপ্তা নামে এমন একজনকেই পাওয়া গেল, যিনি 'বাদামী অগ্রবাল' বিবাহপ্রথার ওপর একটি সুন্দর বই লিখে প্রকাশ করিয়েছিলেন।

দিল্লী—সেইদিন সাড়ে বারোটার সময় কলকাতা মেল ধরে নটার সময় দিল্লী পৌঁছলাম। আজকাল দীর্ঘকাল ধরে দিল্লীতে আমার থাকা শ্রীচন্দ্রগুপ্ত বিদ্যালংকারের বাড়িতে হতো। দিল্লীতে বিদ্যালংকারের স্ত্রী শ্রীমতি স্বর্ণলতা ও অন্যান্য তরুণ-তরুণীরা মিলে একটি নাট্যদল স্থাপন করেছিলেন, এই প্রয়াস প্রশংসনীয়। কানপুরে আমি সমানে বন্ধুদের বলেছি যে, ১৩-১৪ লক্ষ জনসংখ্যার এই মহানগরীতে হিন্দি রঙ্গমঞ্চ না থাকাটা খারাপ দেখায়।

৪ ডিসেম্বর ইম্পিরিয়াল কৃষি গবেষণা দেখতে গেলাম। প্রথমে এই সংস্থাটি পুশা (মজঃফরপুর)-তে ছিল। ভূমিকম্পে যখন সেখানকার পাকাবাড়িগুলো ধ্বংস হয়ে গেল তখন তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়। ড· উষানাথ চ্যাটার্জি আর শ্রীবাবুরাম পালিওয়ালেব সঙ্গে পরিভাষা সংগ্রহ করার বিষয়ে কথাবার্তা হলো, দুজনেই কাজ কবাব আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

বহুদিন পরে ৫ ডিসেম্বর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রজীর সঙ্গে দেখা হলো। বোধহয ১৯১৬ হবে, যখন ঈশ্বরচন্দ্রজী বেনারসে পড়াশোনা করতেন, তখন অনেকদিন পর্যন্ত আমি তাঁব অতিথি ছিলাম। তিনি সংস্কৃতেব, বিশেষ করে মীমাংসা আদি দর্শনেব গভীব বিদ্বান ছিলেন। ছেলেদের সঙ্গে দিল্লীতে থাকতেন। আমি চাইলাম, তিনিও পবিভাষার কাজে আসুন, কিন্তু ছেলেদের ছেড়ে তিনি এখান থেকে যেতে পারতেন না। প্রযাগে এমন কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। গঙ্গাদত্ত শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি কাজ কবাব এবং চালানোর ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। দিল্লীতে ডা· সত্যকাম ভরদ্বাজ কান, নাক ও গলাব রোগের বিশেষজ্ঞ, সেই সঙ্গে তিনি একজন হিন্দিভাষাব অনুবাগী। তাঁব নিজের জমে ওঠা পসার থেকে সময় বার করা খুব কঠিন ছিল, কিন্তু তিনি তাঁব বিষয়েব পরিভাষার ওপব কয়েক বছর ধরে কাজ করেছেন, তবে সেগুলো ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি।

৫ তারিখ রোববার দিন চন্দ্রগুপ্তজীর বাড়িতে সাহিত্যসভা হলো। এই সচল সভা আমার খুব পছন্দ হলো। সভায় জৈনেন্দ্রজী, নবীন, শ্রীসিয়াবামশরণ গুপ্ত, অজ্ঞেয়, আব উর্দুর মহাকবি জোশ প্রভৃতি এসেছিলেন। কবিবা নিজেদেব কবিতা শোনালেন, অন্যেবা ভাষণ দিলেন, কিছু বার্তালাপ হলো। রাজেন্দ্র একজন তরুণ মাদ্রাজী, যিনি শুধু ইংরেজিতেই লেখেন। তিনিও বললেন। যে কোনো তরুণেরই নিজেব ভাষা ছেড়ে পবেব ভাষায় লেখার চেষ্টা করাটা আমার ভাল মনে হয় না। যদি প্রতিভা থাকে, তাহলে নিজেব সাহিত্যেই তার স্থান হবে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সরোজিনী নাইডু, তরুদত্তকেই যখন ইংরেজিতে পাত্তা দেওয়া হয়নি, তখন কে অন্যকে পাত্তা দেবে?

এদিকে অনেকদিন ধরেই মাথার ভেতব খিচুড়ি পাকছিল, আর 'আজ কী রাজনীতি' বইটির মাধ্যমে দেশের সমস্যাকে তুলে ধরতে চাইছিলাম। এই সময় তার উপকরণ সংগ্রহ করার আর আগমী বছর গরমে তা লিখে ফেলার কথা ভাবতে শুরু করেছিলাম। আমাদেব সরকার কত অলস আর গতিহীন, তা দেখে রাগ হতো। পাকিস্তানে পালিয়ে যাওযা মুসলমানদের কয়েকশো মোটর দিল্লীতেই এক জায়গায় রাখা ছিল। সমস্ত বর্ষা আর গরমের দিনগুলো আমি তাদের সেখানে দেখেছি। সেগুলো অত্যন্ত রদ্দি হযে যেতে কি আর দেরী ছিল? সেগুলোকে কি নীলাম করে টাকা তোলা যেত না? তাতে সেগুলোর

ব্যবহারও হতো, আর পরে দাবীদার তার টাকা পেয়ে যেত। এগুলো নষ্ট হওয়াটা কি রাষ্ট্রের সম্পত্তি নষ্ট হওয়া নয়? আমলাতন্ত্র সত্যিসত্যি একটা কাঠের মেশিন। তার কাছে আর কি আশা করা যেতে পারে?

সে সময় নিজের লেখা বইগুলি প্রকাশ হতে দেরি দেখে মনে হচ্ছিল, বইগুলি পত্রিকার আকারে প্রকাশ করি। তবে তিনটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে প্রকাশনার তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতা পরে অর্জন করে নিয়েছিলাম। আমার তো মনে হয়েছে যে, লেখকদের এর মধ্যে পড়া উচিত নয়। এটা একটা স্বতন্ত্র ব্যবসা, যা পুঁজির সঙ্গে মানুষের সম্পূর্ণ সময় নিয়ে নিতে চায়।

৬ ডিসেম্বর পুরনো সেক্রেটারিয়েটে পাব্লিকেশন ডিভিসন দেখতে গেলাম, যেখান থেকে 'আজকাল' 'বিশ্ব-দর্শন' ইত্যাদি আরো অনেক পত্র-পত্রিকা বেরোয়। যুদ্ধের সময় ইংরেজরাই এই বিভাগটির প্রতিষ্ঠা করেছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল পত্রিকা ও বইয়ের দ্বাবা প্রচার করা। সেই সময় শুধু ভারতীয় ভাষায়ই নয়, রুশ এবং চীনা ভাষাতেও পত্রিকা বেরোত। প্রেসে এখনও রুশ আর চীনা টাইপ ছিল। আমার বন্ধুরা রুশ 'স্বয়ং-শিক্ষক' লেখার জন্য অনেকবার বলে ছিল, তাতে বড় অসুবিধে ছিল রুশ টাইপের অভাব। এখানে রুশ টাইপ ছিল, কিন্তু তার কোনো ব্যবহার হচ্ছিল না, আর কম্পোজিটারও পাওয়া যেত না। তারা বাইরের বই ছাপতে খুব একটা পছন্দ করতো না।

সেখান থেকে হরিজন নিবাসে রাষ্ট্রভাষা সমিতির বৈঠকে পৌছলাম। একবার তো উল্টোদিকের বাস ধরলাম। আর দু মাইল যাবার পর যখন টের পেলাম, তখন সেটা ছেড়ে অন্য বাস ধরলাম, যেটা খারাপ হয়ে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। যখন চলতে শুরু করল তখনও তার থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। আগুনের ভয় ছিল। যাই হোক, অন্য বাস ধরে হরিজন নিবাসে পৌছলাম।

রাষ্ট্রভাষা সমিতির বার্ষিক বাজেট এখন পাঁচ লক্ষ টাকার ছিল। এই বছর দেড় লক্ষ টাকা বাড়ির জন্য আর ৩৫ হাজার টাকা প্রেসের জন্য খরচ করার কথা ছিল। প্রাদেশিক সমিতিগুলিকেও কয়েক হাজার টাকা সাহায্য হিসেবে দেবার ছিল। আমাদের দেশের রাষ্ট্রভাষা হিন্দির প্রয়োজন আছে এব জ্বলন্ত প্রমাণ হলো এই বাজেট। সেইদিন ড· মোতিচন্দ সিন্ধিয়া ভবনের কাছে এক জায়গায় পশ্চিম ভারতীয় চিত্রকলা বিষয়ে ম্যাজিক লণ্ঠন নিয়ে এক সারগর্ভ বর্ক্তৃতা দিলেন। আমি তার সভাপতি ছিলাম। সেজন্য শেষে আমাকে বলতে হলো।

৭ ডিসেম্বর পণ্ডিত ভগবদদত্তজী আমাকে ভারত সরকারের জলসেচন বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার খোসলা সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। রাস্তায় তিনি জানালেন যে, কাল নেহেরুজী তাঁদের ওখানে এসেছিলেন, তাঁরা যখন তাদের হিন্দি পরিভাষা নির্মাণের নমুনা দেখালেন, তখন তাঁকে অনধিকার চেষ্টা বলে তিনি খুব তিরস্কার করেছেন, আর ইংরেজি রাখার ওপরই জোর দিয়েছেন। বেচারাদের সমস্ত উৎসাহ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। খোসলাজীর সঙ্গে দেখা হলো তবে এই কালকেই ঢালা ঘড়া ঘড়া জলের প্রভাব এত তাড়াতাড়ি কি করে দূর হতে পারে?

দিল্লীর আবহাওয়া আমার যেন দম আটকানো বলে মনে হতো। সেখানকার ইন্দো-আংলিয়ানদের[১] সব কাজে ঘৃণা হতো। খ্রিস্টান হয়ে শাড়ি-ধুতি পরিহিত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মনোবৃত্তির মানুষ জন্মাতে পারে, তা এদের দেখলে বোঝা যায়। বেশির ভাগ তো বরং ধুতির নামে নাক সিঁটকোয়, আর কোট-প্যান্ট, টাই-কলার লাগিয়ে পুরোপুরি সাহেব হওয়ার অভিনয় করে। আড়ম্বর বেশি রাখাটা উন্নতির জন্য আর প্রতাপ দেখানোর জন্যও দরকার ছিল। এই কারণে আয়ের থেকে বেশি ব্যয় করতে হতো, যার জন্য তারা যেন তেন প্রকারেণ ধন উপার্জন করার চেষ্টা করে। তাহলে আর এই শ্রেণীর ভেতরে আচারজনিত পতন, ঠকবাজী, ব্যভিচার ইত্যাদি ছড়াবে না কেন? এই সব ইন্দো-আংলিয়ানদের শিকড় না জনতার ভেতরে আছে, আর না আছে ইতিহাসে এদের কোনো স্থান। সময়-অসময়ে ভারতীয়-সংস্কৃতির নাম নেওয়াটাকে তারা জরুরি মনে করে। তাদের ইংরেজি চাই। হিন্দি অথবা অন্য কোনো প্রাদেশিক ভাষা নয। এরা হলো ইংরেজির কূপমণ্ডুক। ইংরেজির বাইরের বিশাল দুনিয়ার এরা কোনো খবর রাখে না। ইংরেজি রাজ্যের প্রতি এদের ভালবাসা, ইংরেজি রীতি-রেওয়াজকে এরা সর্বোৎকৃষ্ট মনে করে। ব্রিটিশবিরোধীদের এরা বিরোধী, ইংরেজদের চলে যাওয়াতে এদের খুব দুঃখ। ইংরেজি পড়ে এরা দশ-পনেরো বছর কাটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু না পড়েই হিন্দি সাহিত্য জানতে চায়। ভারতীয় জনতার প্রতি এরা তেমনই ভীত, যেমন ইংরেজরা ছিল। ভারতের কল্যাণের এরা কোনো পরোয়া করে না। এই পুরো শ্রেণীটা নেহেরুর সংরক্ষণ লাভ করেছে, তাই তাদের অন্যকে নিয়ে কিসের চিন্তা থাকতে পারে?

সেইদিনই ড· অনন্তরাম ভট্টের সঙ্গে দেখা হলো। এখনও পর্যন্ত কৃতকার্য হননি। কোনো সরকারি চাকরির খোঁজে ছিলেন। কিন্তু সরকারি কাজে যোগ্যতার থোড়াই দরকার আছে, সেখানে তো সুপারিশ দরকার। তিনি এখনও নিরাশ হননি। আমিও চাইছিলাম যদি দিল্লীতে উনি কাজ পেয়ে যান তবে তাঁর পক্ষে সেটা ভাল হবে। এখানে থেকে উনি আমাদের পরিভাষার কাজেও সাহায্য করতে পারতেন। যে হোটেলে ছিলেন, সেখানে সাতশো টাকা দেনা হয়ে গিয়েছিল, সেজন্য চিন্তিত ছিলেন।

কৃষি প্রতিষ্ঠানে সেদিন আবার গেলাম। ইন্টোমোলোজিস্ট সত্যসাধন মুখোপাধ্যায় আর মেকোলজিস্ট শ্রীরায়চৌধুরী খুব ভালভাবে কথাবার্তা বললেন, কিন্তু পরিভাষা নির্মাণে তাঁদের বিশেষ ইচ্ছে ছিল না। হ্যাঁ, তাঁরা জানালেন যে, আমেরিকায় ছাপা পরিভাষার বিশেষ শব্দকোষ রয়েছে। তা দিয়ে আমাদের কিছুটা কাজ হতে পারত, তবে আমরা আমাদের পরিভাষার কষ্টিপাথর বিশেষজ্ঞ বিদ্বানদেরই করতে চেয়েছিলাম।

মীরাট—এবারের সাহিত্য সম্মেলন মীরাটে হচ্ছিল, যার সভাপতি হয়েছিলেন শেঠ গোবিন্দদাস। আমার কার্যকাল শেষ হয়ে আসছিল। ৭ তারিখ মোটরে রওনা হয়ে আমরা সন্ধে ছটায় প্রফেসর ধর্মেন্দ্র শাস্ত্রীর বাড়িতে পৌঁছলাম। সেখানে আমাদের থাকার কথা ছিল।

[১]এই শব্দের দ্বারা লেখক এখানে ইংরেজ মনোভাবাপন্ন ভারতীয়দের বোঝাতে চেয়েছেন।—স·ম·

৮ ডিসেম্বর সকালে গড়মুক্তেশ্বরের রাস্তায় হাঁটতে গেলাম। রাস্তায় ঘুঁটে বিক্রেতারা শহরের দিকে যাচ্ছিল। তাদের কথাবার্তা আমি মন দিয়ে শুনতে লাগলাম। হিন্দি এদেরই ভাষা। যমুনার দুই তীরে ছড়িয়ে থাকা কুরু আর কুরুজাংগল দেশের এটাই জনভাষা, তাই কৌরবীয় ভাষার প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। অনেক দিন ধরে আমি চিন্তা করছিলাম যে, প্রেমচন্দের কুরুদেশে জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল, যাতে তিনি তাঁর অমূল্য রচনার সাহায্যে কথোপকথনের হিন্দি কেমন হয় তার নামুনা পেশ করতে পারতেন। ঘুঁটেওলারা একে অপরের সঙ্গে কথা বলছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ঘুঁটে কি ঘর থেকে আনছো?' উত্তর পেলাম,'আজ্ঞে না, কিনে আনছি।' পরে রুড়কীতে জমিদারের একটা ছোট্ট গ্রামে বসে থাকা দশ বছরের একটি ছেলেকে 'কি করছো' জিজ্ঞেস করায় সে উত্তর দিল, 'রখবাড়ী করু।' আর অপর একটি ছেলে তার বাবাকে বলছিল, 'খাক্কে জানা।'

কৌরবী বুলি বড়ই মধুর ও নমনীয়। এটা জেনে আফশোশ হচ্ছিল যে, যেখানে অন্যান্য ভাষায় হাজার হাজার গীত ও কাহিনী সংগ্রহ করে প্রকাশ করা হয়ে গেছে, সেখানে কৌরবীর বিষয়ে কৌরবরাই উদাসীন রয়েছে।

সেদিন কুমার আশ্রমেও গেলাম। প্রথম যখন আমার বন্ধু বলদেব চৌবে এটি প্রতিষ্ঠা কুরেন, তখন তা একটি ভাড়া করা বাগানে ছিল, এখন তার নিজস্ব জমি হয়েছে, আর সেখানে কলেজ ও স্কুলে পাঠরত ৩০-৩২ জন হরিজন বিদ্যার্থী থাকে।

তিনটের সময় (৮ ডিসেম্বর) স্থায়ী সমিতির বৈঠক হলো। খুব খারাপ লাগল, যখন দেখলাম সম্মেলন নিয়মাবলীর সংশোধনের কাজ ট্যান্ডনজী আবার ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছেন। এখন পরের অধিবেশন পর্যন্ত সংশোধন হতে থাকবে। কিন্তু ১৯৪৯-এও এমনি ঢিলে-ঢালা পদ্ধতি থাকবে, এতে সন্দেহ নেই। সংস্থার কোনো একটা কাজে ঢিলা পড়লে, সব কাজে ঢিলা পড়ে যায়। পরিভাষার কাজে জানপ্রাণ লাগিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন দ্বিধা হচ্ছিল যে, কাজটা আর করব কি না। যে সব বিদ্বানদের পরিভাষা সংগ্রহ করার কথা বলছিলাম, তাঁদের খেয়াল করাটাও তো আমার দরকার ছিল। সত্যাগ্রহের সময় লোকেরা ট্যান্ডনজীর নাম 'কনফিউশনদাস' রেখেছিল। সত্যি সত্যি কোনো ব্যাপারেই তিনি সময়মত সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। স্থায়ী সমিতি বিষয়নির্বাচনী সমিতির চেহারা নিয়ে রাত সাড়ে আটটায় বসল। পণ্ডিত বালকৃষ্ণ শর্মা 'নবীন' প্রস্তাব রাখলেন যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যম হিন্দি হওয়া উচিত। এটা খুবই অদূরদর্শিতাপূর্ণ প্রস্তাব ছিল। হিন্দিভাষীরা নিজেদের ঘরে বসে এটা বোঝে না যে অন্যান্য প্রদেশের ভাষাভাষী লোকেদের নিজেদের ভাষার সঙ্গে ততটাই ঘনিষ্ঠ ভালোবাসা আছে, যতটা আমাদের আছে হিন্দির সঙ্গে। বেঢবজীও সেই বন্যায় গা ভাসালেন। ট্যান্ডনজী কিছু বললেন না, কিন্তু মনে মনে আশীর্বাদ দিচ্ছিলেন। এঁরা ভাবছিলেন এইভাবে হিন্দি ভাষা দেশের কেন্দ্রীকরণের কাজে একটা বড় মাধ্যম হবে। কিন্তু কোনো বাঙালী কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সরিয়ে দিয়ে সেখানে হিন্দিকে বসাতে রাজি হবে? উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে উড়িয়া নয়, হিন্দিকে মাধ্যম করতে কোনো উড়িয়াবাসী কি পছন্দ করবে? তামিল, তেলুগু, মালয়ালাম, কন্নড়, মারাঠী ইত্যাদি অঞ্চলেও এই ধরনের কোনো কাজের

ঘোর বিরোধিতা হবে, অশান্তি লেগে যাবে। এই সব হলে হিন্দিরই অনিষ্ট হবে, লোক হিন্দির শত্রু হয়ে যাবে। আমি এই সব কথা বলে প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করলাম। কিন্তু সেখানে সেটা পাস হয়ে গেল।

১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্মেলনের অধিবেশন চলল। ট্যান্ডনজী সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা এবং তার প্রাণও, কিন্তু তার ভেতরে দুর্বলতা আসার কারণও তাঁর দীর্ঘসূত্রতা। যদি প্রথমেই অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যে নতুন নিয়মাবলী তৈরি হয়ে সম্মেলনের নতুনভাবে সংগঠন হয়ে যেত তাহলে হয়তো তাকে সেইদিনগুলো দেখতে হতো না যা এখন দেখতে হচ্ছে। খোলা অধিবেশনে যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হিন্দি মাধ্যম হবার প্রস্তাব হলো, আমি তার তীব্র বিরোধ করি, শেষে প্রস্তাব ফিরিয়ে নেওয়া হয়। যদি প্রস্তাব পাস হয়ে যেত, তাহলে তখনই আমাকে পরিভাষার কাজ থেকে সরে যেতে হতো, কারণ অহিন্দিভাষীদের কাছে আমার পক্ষে সাহায্য চাওয়া কি করে সম্ভব?

মীরাট সম্মেলনে খাওয়া-দাওয়ার খুব সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। সমস্ত কাজই মহিলারা নিজেদের হাতে রেখেছিল। খাবারের ব্যবস্থা দেখে তো অতিথিরা প্রশংসা করে ক্লান্ত হচ্ছিল না। সমস্ত জিনিসই নিয়মিতভাবে ঠিক সময়ে পাওয়া যাচ্ছিল। মীরাট কমিশনারী যুক্তপ্রদেশে আর্যসমাজের কেন্দ্র ছিল। এখানে সবার আগে আর সব থেকে বেশি আর্যসমাজের প্রচার হয়েছিল, যে কারণে মহিলাদেব শিক্ষার উন্নতি হয়েছিল। আর্যভাষা পর্যন্ত সীমিত থাকা মহিলাদের কন্যারা হাইস্কুল পর্যন্ত পৌঁছেছিল আর নাতনীরা কলেজে গিয়েছিল। আজকের তরুণীরা তাদের দিদিমাদের থেকে অনেক এগিয়ে গেছে, তাদের আধুনিক রূপে দেখা যাচ্ছে। তাদের মায়েরা কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেছে এবং জনতার নেতৃত্ব করার শিক্ষালাভ করেছে। সম্মেলনের মণ্ডপের তিনভাগ মহিলাতে পূর্ণ থাকত।

এবার পণ্ডিত বলভদ্র মিশ্র প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন, আমিও তাঁর পক্ষে ভোট দিয়েছিলাম। সেদিনই (১২ ডিসেম্বর) রাতে কবি সম্মেলন হলো। আগের রাতের কবি সম্মেলনে কিছু গণ্ডগোল হয়েছিল, তাই আজ আমাকে সভাপতি করা হলো। আমি আগে না দেখে কবিতা পড়ার অনুমতি দিলাম না। সম্মেলন শান্তিপূর্বক হয়ে রাত এগারো-বারোটার সময় শেষ হয়ে গেল। 'অঞ্চল' আর 'মুকুল'-এর কবিতা সবাই খুব পছন্দ করল। এর জন্য শুধু সভাপতির প্রশংসা পাওয়া উচিত নয়, বরং জনতার বিবেকও এ কাজে সহায়ক হয়েছিল, যে-জনতা অনুমতি না পাওয়া কবিতাকে অনভ্যর্থনা জানাতে তৈরি ছিল।

রুড়কী—পরিভাষার খোঁজে আবার ১৩ ডিসেম্বর মীরাট থেকে রওনা হলাম। বাস ধরলাম মজঃফরনগরে বাস কয়েক মিনিটের জন্য দাঁড়াল। ১৯১৬ অথবা ১৯১৭-তে কিছুদিনের জন্য আমি মজঃফরনগরে ছিলাম। তখন সেটা শহর নয়, একটা বড় গ্রাম বলে মনে হতো। কিন্তু তখন থেকে এখন এর মধ্যে ৩২ বছর পার হয়ে গেছে, যার প্রভাব উত্তরপ্রদেশের কোনো শহর অথবা বড় গ্রামের ওপর পড়বে না এমন হতে পারে না। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে উৎখাত হয়ে আমাদের দেশভাইরা পশ্চিম ইউ· পির সব শহরে

বসবাস করতে শুরু করেছে। মীরাটে তাদের সংখ্যা কয়েক হাজার, দেরাদুনে তো ৫০ হাজারেরও বেশি। মুজঃফরনগরেও তারা হাজারে হাজারে বসবাস করছে, আর সেই কারণেই শহরগুলির চেহারা পাল্টে গেছে। ইচ্ছে তো করছিল যে, পুরনো পরিচিত জায়গার স্মৃতিগুলি আবার নতুন করে নি, কিন্তু সময় কোথায়? সেই সময়কার মানুষদের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনাও ছিল না।

সওয়া এগারোটার সময় রুড়কী পৌঁছে গেলাম। তিনটের সময় সেখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বিদ্বানদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। এখন তো এটা ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। টমসন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রূপে এর প্রতিষ্ঠা ১৮৪৭-এ, আজ থেকে ১০১ বছর আগে হয়েছিল। এখানে অধ্যাপকদের মধ্যে কেউ আমার পরিচিত ছিলেন না। ছাত্রেদের মধ্যে বাসুদেব পাণ্ডেকে পেলাম। বাসুদেবের স্মৃতি বড়ই দুঃখজনক। পড়াশোনায় সে সবসময় খুব ভাল ছিল, আর নিজের শ্রেণীতে প্রথম হতো। এলাহাবাদে এম· এস· সি·-র প্রিভিয়স সম্ভবত শেষ করেছিল, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং-এর উপযোগিতা তার থেকে বেশি বলে সে এখানে এসে ভর্তি হয়েছিল। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সাহিত্যানুরাগ পেয়েছিল। খুবই তৎপরতার সঙ্গে সে পরিভাষার কাজে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছিল। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশের জন্য বড় বড় আশা নিয়ে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু জিপ দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হলো! নিজের বিদ্যা তথা যোগ্যতা দিয়ে দেশের কোনো উপকার সে করতে পারল না। সামান্য ইঞ্জিনিয়ার সে ছিল না, তা হতেও সে চায়নি। আজকের পরিস্থিতিতে যোগ্য ব্যক্তিদের কাজ করায় যে কত বাধা, সে অভিজ্ঞতা তার হচ্ছিল, কিন্তু সে নিরাশ হয়নি।

বাসুদেব আমাদের অনেক সাহায্য করেছিল। তার মাধ্যমে অন্যদের সঙ্গেও পরিচয় হলো। প্রিন্সিপাল নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথাবার্তা হলো। তিনি আমাদের কাজে সম্মতি জানালেন। অধ্যাপকদের ভেতরে অতটা উৎসাহ তো দেখিনি, কিন্তু আশা ছিল যে, কিছুটা কাজ দেখার পর তাঁরাও সাহায্য করতে রাজি হবেন। ছটার সময় ছাত্রদের সামনে আমাকে বলতে হলো। আমি বললাম যে, দেশের আর্থিক উদ্ধার ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিসিয়ান আর বিজ্ঞানীরাই করতে পারে, যাদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারদের দায়িত্ব সবথেকে বেশি। তখন সেখানে দুইশো ছাত্র পড়ত। আমি মনে করতাম যে, নবনির্মাণের কাজে আমাদের হাজারে নয় লাখে লাখে ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন হবে, যাদের তৈরি করতে রুড়কীকে সবথেকে বেশি অংশগ্রহণ করা উচিত। রুড়কীতে দুশো নয় হাজার ছাত্র অনায়াসে পড়তে পাবে। তার প্রয়োগশালা আর যন্ত্রশালাগুলিকে আরো বেশি ব্যবহার করা যায়। তিন শিফ্‌টেও তো এখানে পড়ানো যেতে পারে—ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাকা বাড়ি আর প্রয়োগশালা সব থেকে ব্যয়সাধ্য জিনিস, যার তিনগুণ ব্যবহার একই খরচে হতে পারত। পরে যখন আমাকে জানানো হলো যে, এত পাশ করা ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে অনেকেরই কাজ জোটে না, তখন খুব ধাক্কা খেলাম। আর নিজের 'অসময়ের সানাই'-এর জন্য আফশোশ হলো। আমাদের এখানে যতক্ষণ সব আয়োজনের পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপিত না হবে ততক্ষণ প্রগতির এই অবস্থা থাকবে। কোথাও বিশেষজ্ঞের দরকার পড়বে আর

কোথাও সে বেকার থাকবে। প্রয়োজন অনুসারে সময় মত তাদের তৈরি করা হবে না এবং সব যোজনা আলগা হয়ে যাবে। রুড়কী কলেজ খুবই উপযুক্ত স্থানে আছে, এখানে চার হাজার ছাত্রের থাকার জায়গা করা সম্ভব। প্রথমে কোনো সময় এটিই ভারতের একমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল। কিন্তু এখন ভারতের প্রায় সমস্ত বড় জায়গায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খুলে গেছে। এখানকার ছাত্ররা অধিকাংশই হিন্দিভাষী, তাই হিন্দির মাধ্যমে সহজেই তাদের পড়ানো যেতে পারত।

পরের দিন (১৪ ডিসেম্বর) হাঁটার জন্য গঙ্গার মহা-নহরের পারে পারে অনেক দূর গেলাম। সেই পুলটিও দেখলাম, যার নীচে সোলানী নদী আর ওপরে খাল বয়ে যায়। সামনে মহিবড় গ্রাম পেলাম, এই বিচিত্র নামটি বলে দিচ্ছিল যে এটি প্রাচীন কুরুদেশের একটি গ্রাম—মহিষবাট অথবা মহাবাট অথবা মহাবট হতে পারে। নামের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আশা জাগলো যে, এখানে কোনো পুরনো জিনিস পাওয়া যাবে। কিন্তু জিনিস যতো বেশি পুরনো হবে তা ততই বেশি মাটির নীচে থাকবে। গ্রামে মুসলমানও আছে আর হিন্দুও। মুসলমানরা মিষ্টি (মেলী) তৈরি করছিল।

আজ কলেজের সংগ্রহশালা আর প্রয়োগশালা ভাল করে দেখার সুযোগ পাওযা গেল। প্রফেসর গরদে জানালেন, 'অধ্যাপকের প্রয়োজন আছে, যাঁদের পেতে কোনো অসুবিধে নেই। এক হাজার ছাত্রকে আমবা এখানে পড়াতে পারি।' হ্যাঁ, যোগ্য অধ্যাপকদের পাবাব তখনই সুবিধে হবে, যখন বেতনের গ্রেড চারশো থেকে নশো পর্যন্ত কবে দেওয়া হবে। তিনি এবং প্রফেসর জয়কৃষ্ণজী আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। সেদিন চা-পার্টি হলো। ছাত্রেরা প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করল। সবাই গ্র্যাজুযেট ছিল, অনেকেই এখানকাব তিন বছরের পাঠ্যক্রমের শেষ শ্রেণীতে ছিল। যুবকদের মধ্যে খুব উৎসাহ দেখলাম। সন্ধেবেলা ড· হর্ষরূপ কুলশ্রেষ্ঠর বাড়ি গেলাম। তাঁব সুশিক্ষিতা সুপুত্রী কুলশ্রেষ্ঠদের বিবাহপ্রথার বিষয় নিয়ে কিছু করবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল, কিন্তু কাজ এগোতে পারেনি।

দেরাদুন—১৫ ডিসেম্বর ডাকের বাস ধরে দেরাদুন গেলাম। রুড়কী সাহারানপুর জেলায় অবস্থিত, যার উত্তর সীমায় আছে শিবালিক, পাহাড়। শিবালিকের অপর পারে আছে দেরাদুন শহর আর জেলা। শিবালিক, সওয়া লাখ—সওয়াদলত-এর অপভ্রংশ। এই সওয়া লাথ পাহাড় হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত, কিন্তু বয়সে তার থেকে পুরনো আব প্রকৃতিতেও তার থেকে আলাদা। এখানে শিবালিক হিমালয় থেকে অনেক সরে এসেছে, আর দুটো পর্বতশ্রেণী দুন (দ্রোণী) তৈরি করেছে। একেই দেহরা শহরের সঙ্গে যোগ কবে 'দেরাদুন' বলা হয়। শিবালিকের উচ্চতা খুব বেশি নয়, কিন্তু পর্বত তো পেরোতেই হয়। যেখানে সেখানে পাহাড় পেরনো যায় না। হাজার হাজার বছর ধরে দেখতে দেখতে মানুষ সুগম রাস্তা খুঁজে বার করেছে যে, রাস্তা দিয়ে লোক আসা-যাওয়া করে। শিবালিকেও এমন রাস্তা আছে। এখানের মত সব জায়গাতে উপত্যকা হিমালয় আর শিবালিকের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করেনি। গঙ্গা আর যমুনার মাঝখানে অবস্থিত এই শিবালিকের কোনো চূডাই তিন হাজার ফুটের থেকে বেশি উঁচু নয়, আর মুসৌরী দেখার পর তো একে

পোকা-মাকড়ের মত মনে হয়। সম্ভবত এইজন্যই প্রাচীনকালে একে কীটাগিরি বলত। রুড়কী আর সাহারানপুর থেকে আসা রাস্তা মোহনা ডাঁড়া দিয়ে শিবালিক পার করে। রুড়কী থেকে দেরাদুন ২৫ মাইল। পাহাড়ীতে রাজাজীর নামে সংরক্ষিত একটি অভয়ারণ্য আছে যেখানে শিকার করা বারণ। একসময় যখন শিবালিক দুদিকেই ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিল তখন এখানে বাঘ আর হাতি থাকত। এখন তো বাঘই কখনও-সখনও দেখা যায়।

দেরাদুনে সৈনিক স্কুল আছে। এখানে এই আশায় এসেছিলাম যে, সৈনিক পরিভাষা সংগ্রহ করার জন্য লোকেদের বলব। এ তো জানাই ছিল যে, কোনো সৈনিক অফিসার ততক্ষণ পর্যন্ত এই কাজের দায়িত্ব নিতে পারবে না যতক্ষণ না সরকারের তরফ থেকে উৎসাহ দেওয়া হয় আর তাব জন্য দিল্লীর দেবতাদের কাছ থেকে কোনো আশাই করা যেত না। রামরায় দরবারে গেলাম। মোহান্ত লক্ষণদাসের নাম খুব শুনেছিলাম। এখন তাঁর উত্তরাধিকার মোহান্ত ছিলেন শ্রীইন্দ্রেশদাস, যিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম· এ· আর শ্রী বিদ্যানিবাস মিশ্রের সহপাঠী। তিনি সানন্দে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। সঙ্গে করে নিয়ে মিলিটারি অকাদেমি, ফরেস্ট রিসার্ভ ইনস্টিটিউট, সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কার্যালয় দেখালেন। অকাদেমিতে এখন ছুটি চলছিল, কিন্তু মেজর এ· এম· চ্যাটার্জি সৈনিক পরিভাষার বিষয়ে কিছু আশা দিলেন। ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে শ্রীজগদম্বাপ্রসাদের নাম জানানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি সেখানে ছিলেন না। সার্ভেতে এ ব্যাপারে কারো আগ্রহ ছিল না। ওপর থেকে হুকুম এলে পিঁপড়েব চালে চলতে রাজি ছিল। সন্ধেবেলা পণ্ডিত গযাপ্রসাদ শুক্ল আর সন্ত নিহালসিংহের সঙ্গে দেখা কবতে গেলাম, কিন্তু দুজনেই অনুপস্থিত ছিলেন। দেরাদুন যাত্রায কোনো কাজ হলো না। হ্যাঁ, পরে দেবাদুনেব সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে তার শুভারম্ভ এই সময অবশ্য হযেছিল। দেরাদুনে আগে এক সময় ১৬ হাজার মুসলমান বাস করত, এখন খুব বেশি হলে দু-তিন হাজাব রয়ে গেছে। সমস্ত কর্ণপুরা মুসলমানদের মহল্লা ছিল, সেখানে একটি কি দুটি বুড়ো বেঁচে ছিল। তারা পালাতে পারত না, লোকে তাদেব ওপর দয়া দেখিয়েছে বলে থেকে গেছে। এখন কর্ণপুরা, পশ্চিমোত্তর সীমায় হিন্দুদের মহল্লা, সেখানে পশ্চিম পাঞ্জাবের ভাষা বলা হয়। শরণার্থীদের সংখ্যা বলা হচ্ছিল ৫০ হাজার। ব্যবসা আর দোকান তাদেব হাতে। পুরনো ব্যবসায়ীরা তাদের দোকান খুব ভাল দাম পেযে লোভে পড়ে বেচে দিয়েছে, এখন মনের দুঃখে তাকিয়ে থাকে। নানান রকমের ভাল ও সস্তা জিনিস দিতে যে প্রস্তুত, সে দোকানে খদ্দের যাবে না কেন?

লক্ষ্ণৌ—১৬ ডিসেম্বরের সওযা পাঁচটার গাড়িতে দেরাদুন থেকে রওনা হলাম। পরের দিন সকাল সাতটায় লক্ষ্ণৌ পৌছলাম। স্টেশন থেকে সোজা মহাস্থবির বোধানন্দের কাছে রিসালদার বাগের বিহারে পৌছলাম। খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু এখনও তেমনি সাহসের সঙ্গে কথা বলছিলেন। জীবনের শেষ ধাপে নিরাশা কেন হবে? মৃত্যুকে ভয় কেন? মৃত্যু তো অভাবরূপ, জীবনে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভয় পাবার কারণও থাকতে পারে।

লক্ষ্ণৌ-এ বিশেষ করে চিকিৎসা সম্বন্ধী পরিভাষার জন্য মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকদের সঙ্গে দেখা করতে হতো। এখানকার কাজের দায়িত্ব শ্রীপুত্তনলাল বিদ্যার্থী নিতে রাজি হলেন। তিনি রিটায়ার করেছিলেন আর হিন্দি-প্রেমের জন্য কিছু করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁর বাড়িতে গেলাম, কিন্তু বিদ্যার্থীজী ছিলেন না। একটু দূরে মেডিকেল কলেজ। সেখানে ডা· সুরেশ চন্দ্র কাপুরের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি কানপুরের শ্রীকৈলাস কাপুরেব সুপুত্র। তরুণ এবং উৎসাহী। পরিভাষার গুরুত্বও বোঝেন। তাঁর সঙ্গে ডা· মালব্য আর ডা· প্রকাশচন্দ্র গুপ্তের সাক্ষাৎ কবলাম। ডা· সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত সবথেকে বেশি উৎসাহ দেখালেন। পরে মালব্যজী জৈব-রসায়নের শব্দকোষ তৈরি করে দেন আর তা প্রকাশিতও হয়ে যায়। একজন ডাক্তারও এটা শুনতে রাজি ছিলেন না যে, মেডিকেল সাইন্সের শিক্ষা হিন্দির মাধ্যমে হোক। তাঁরা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'অন্তত এই সাইন্সটাকে নষ্ট করবেন না।' তাঁদের চিন্তায় ইংবেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় মেডিকেল সাইন্স পড়ার অর্থ তাকে নষ্ট করে দেওয়া। কিন্তু কি করা যাবে? দুনিয়াব বহু বড বড দেশ এই নষ্ট করার কাজ করছে। জাপানে ইংরেজিতে মেডিকেল সাইন্স পড়ানো হয় না। রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালিও সাইন্সকে নষ্ট করতে উঠে পড়ে লেগেছে। লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজের বহু অধ্যাপকই কাজ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁরা যদি সে কাজ করতে না পারেন,তবে সেটা সম্মেলনের দোষ যে, তাঁদেব কাছ থেকে কাজ নিতে পারল না।

মেডিকেল কলেজের থেকে আবাব বিদ্যার্থীজীব বাড়িতে গেলাম, এদিকে তিনি হজরতগঞ্জে আমাব প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁব সঙ্গে দেখা হলো। পরেরদিন (১৮ ডিসেম্বর) সাড়ে আটটার সময়ই তাঁর সঙ্গে বেরোলাম। ডা· সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ডায়বেটিসের কথা শুনে আমাব রক্ত পবীক্ষা করলেন, কিন্তু তাতে চিনি পাওয়া গেল না। সেদিন ডা· আর· এন· মিশ্র, ডা· যাজ্ঞিক আর ডা· মাথুর-এর সঙ্গেও দেখা করলাম। যাজ্ঞিক আর মাথুর সাহেব তাঁদেব বিষয়ের পরিভাষাগুলি ফেব্রুয়ারি নাগাদ দিতে সম্মত হলেন, আর তাগাদা দেবার জন্য বিদ্যার্থীজী তো রইলেনই। লক্ষ্ণৌ-এব কাজে বেশ খুশি হলাম।

সেদিনই রাতের ট্রেন ধরে ১৯ তারিখ ভোরেই প্রয়াগে পৌঁছে গেলাম। ড· বদরীনাথ প্রসাদের বাড়িতে উঠলাম। তখনও আলো ফোটেনি, তাই ফটক খোলা ছিল না। আমাকে বাইরেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। প্রয়াগে সম্মেলন কার্যালয়ে গিয়ে কাজের দেখাশোনা করা দরকার ছিল। রোববারেব ছুটি ছিল, কিন্তু পণ্ডিত ভগবদদত্ত শর্মা তাঁর কাজ করে যাচ্ছিলেন। পরের দিন প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত বলভদ্র মিশ্রর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর সঙ্গে কাজের বিষয়ে কথাবার্তা হলো। এবার কলকাতা যাবার ছিল।

কলকাতা—২০ ডিসেম্বর সওয়া আটটার সময় দিল্লী মেল ধরার ছিল। সেকেন্ড ক্লাসে দাঁড়ানোর পর্যন্ত জায়গা ছিল না, এদিকে রাত কাটাতে হতো। টিকিট বদলিয়ে প্রথম শ্রেণীর নিলাম। সহযাত্রী ছিলেন এক ফৌজী ডাক্তার। তাঁর বদলী হয়েছিল, তাই সারা বাড়ির জিনিসপত্র লাগেজ হিসেবে কম্পার্টমেন্টে ভরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। অবশ্য সেজন্য আমার শোওয়ায় কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। পরের দিন দুপুর পৌনে বারোটায় হাওড়া স্টেশনে

পৌঁছলাম। শ্রী মোহনসিংহ সেংগরের সঙ্গে ৫০, বিবেকানন্দ স্ট্রিট-এর রামভবনে শ্রীরামেশ্বর টাটিয়ার বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। সেদিন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎটুকুই হলো। এখন ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত এখানেই থাকতে হতো। সে সময় মোটরের পেট্রোল খুব দুর্লভ ছিল, কিন্তু রোজ সকালে আমি গড়ের মাঠে হাঁটতে যাবার জন্য গাড়ি পেতাম। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর তার আশেপাশে পায়চারি করতাম। এক বছরের বেশি হয়ে গেছে ইংরেজরা চলে যাওয়া কিন্তু তাদের সমস্ত উত্তরাধিকার বহন করার জন্য আমাদের দেশের কর্ণধার প্রস্তুত ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ামের পলাশী গেট এখনও আমাদের পলাশীর পরাজয়কে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ময়দানের মূর্তিগুলি একইভাবে স্বস্থানে বিরাজমান রয়েছে। দিল্লীর দেবতাদের তাতে কোনো গ্লানি নেই, কিন্তু আমাদের জনতা আগের থেকেই তাদের মধ্যে অনেকের নামকরণ করে রেখেছিল। তাদের কাছে আউটরাম ছিল ৫৭ সালের বিদ্রোহের যশস্বী বীর কুঁবরসিংহ।

সেদিন বারোটার সময় সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। আমাদের পরিভাষার কাজ তিনি আগে দেখেছিলেন। দু-ঘণ্টা ধরে কথাবার্তা হলো। যদিও তিনি ইংরেজিকে কায়েম রাখার পক্ষপাতী ছিলেন তবুও নিজেদের ভাষার প্রতি দয়াও দেখাতে চাইতেন। একই মত ড· সত্যেন্দ্র বোসেরও ছিল, যার সঙ্গে আমি পরের দিন দেখা করি। তিনি আমাদের দেশের সব থেকে বড় বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন এবং সাইন্সের গভীর গবেষকও। লক্ষ্ণৌ-এর ড· চন্দ্রশেখর তো সাইন্সের ব্যাপারে হিন্দির নামও শুনতে রাজি ছিলেন না। ড· বোস মাতৃভাষাগুলির উপর দয়া করতে প্রস্তুত ছিলেন কারণ তার দ্বারা সাধারণ লোকেদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার হতে পারে। সেই কারণেই তিনি বাংলায় 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকা বার করছিলেন।

২২ তারিখ শ্রীবীরেন্দ্র দাসগুপ্তর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি এক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সাহিত্যপ্রেমী দম্পতির সঙ্গে আলাপ করাতে নিয়ে গেলেন। তারপর যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও গেলাম। ২৪ তারিখ ব্যবসায়ী সম্মেলনে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ হলো। বীরেন্দ্রবাবু বাঙালীদের কলমপেশা মনোবৃত্তি ত্যাগ করে শিল্প-বাণিজ্য শুরু করেছেন এবং তাতে সফলও হয়েছেন। শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে সাহিত্যপ্রেম থাকাটা আবশ্যক তাই তিনি নিজেকে শুধু পয়সা উপার্জন করায় সীমিত রাখতে চাননি। সেই সময়ই তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন, 'জাপানের এক বৌদ্ধ বিহারে নেতাজীর অস্থি আমি দেখেছি। তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর সঙ্গে আগেই পত্রদ্বারা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি শারীরস্থান (অ্যানাটমি)-এর পরিভাষা সংগ্রহের কাজে লেগে পড়েছিলেন। তিনি এও জানিয়েছিলেন যে এখানকার বাঙালী বিদ্বানদের কাছ থেকে সাহায্য পেতে আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আসলে পরিভাষার যে কাজ আমরা করছিলাম তা শুধু হিন্দি ভাষার ছিল না। অসমীয়া, বাংলা, ওড়িয়া, তেলুগু, তামিল, মালয়ালম, কান্নড়, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, নেপালীই শুধু নয়, বরং সিংহলী, বর্মী, শ্যামী আর কম্বোজীর জন্যও এই কাজ হচ্ছিল। তাই জানতে পারলে সব জায়গা থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে এতে আমার সন্দেহ ছিল না।

আমার বিশ্বাস ছিল যে, যদি আমরা গোটা ছয় ভালো পারিভাষিক কোষ প্রকাশিত করে দেখাতে পারি, তবে আমাদের কাজে সব জায়গা থেকে সাহায্য পাওয়া শুরু হবে।

কলকাতা, বাংলার শুধু রাজনৈতিক নয় সাংস্কৃতিক রাজধানীও বটে। বঙ্গভাষী সর্বপ্রথম ইউরোপ এবং আধুনিক যুগের সংস্পর্শে এসেছে, তাঁরাই সর্বপ্রথম জেনেছে যে আমাদের জন্য মুক্তি এবং প্রগতির সেটাই একমাত্র রাস্তা, যা ইউরোপ গ্রহণ করেছে। বিগত শতাব্দীর উত্তরার্ধেই এখানকার মনীষীরা ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানেব গভীর অধ্যয়ন করতে শুরু করেছেন, আর তার থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন, যেখানে হিন্দিভাষীরা পঞ্চাশ বছরেরও বেশি পিছিয়ে আছে। এর প্রভাব বঙ্গভাষী সমাজেও পড়েছে। সাহিত্য এবং সংস্কৃতির প্রতি তাঁদেব অনুরাগ দেখে ঈর্ষা হয়। আমাদের এখানে এখনও হিন্দি রঙ্গমঞ্চের কোনো টিকি নেই। বাংলায় তা দশাব্দি ধরে, বরং শতাব্দী ধরে নিজের শিকড় গেড়ে বসেছে, আর এমন কি সিনেমাও তাকে উৎখাত করতে পারেনি। এই যাত্রায় আমার শ্রীরঙ্গম আর স্টার এই দুটো রঙ্গমঞ্চে যাওযার সুযোগ হলো। ২৩ তারিখ শিশির ভাদুড়ী অভিনীত 'মাইলেক মধুসূদন' নাটক দেখতে গেলাম। দর্শকদেব সংখ্যা দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, নাটকের প্রতি লোকের প্রেম আছে। অভিনয়ও ভাল। উপকরণের অভাব আছে আর আজকাল তো সে অভাব সব দেশেই দেখা যায়, একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া, যেখানে সরকার সাহায্য দিতে একটুও দ্বিধা করে না এবং জনতা নাটক দেখার জন্য ভেঙে পড়ে।

পরের দিন স্টারে 'গোলকুণ্ডা' নাটক দেখলাম। কালকেব নাটকে গাম্ভীর্য ছিল কিন্তু গতির অভাব ছিল। আজকের নাটকে গতি বেশি ছিল, গাম্ভীর্য ছিল কম। সেইজন্য এই নাটকে বিনোদনের ভাগও বেশি ছিল।

সেইদিন বিকানীরের এক জ্যোতিষী হস্ত-সামুদ্রিক (হস্তরেখা)-এর কেরামতি দেখাতে এসেছিলেন। বলছিলেন যে আয়ুর্বেদ থেকে যেসব কথা জানা যায় তা হস্তরেখা থেকেও জানা যেতে পারে। আমার এইসব ফালতু কথা শোনার সময় ছিল না, বিনযের সঙ্গে কোনোরকমে তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচালাম।

২৫ তারিখ শ্রীসুরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর বাড়িতে খাওয়ার জন্য ঢাকুরিয়া যেতে হলো। এব আলাদা একটি পুরসভা আছে। কলকাতা উপনগরীতে এমন আরো কতগুলি পুরসভা আছে, যাদের কলকাতার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে যাওয়া উচিত। সুরেশবাবু চার ভাইয়ের মধ্যে সব থেকে বড়। তাই বাড়ির তিনিই কর্তা। যদিও তিনি রসায়নে এম· এস· সি· করেছেন, তবুও তিনি একজন অসাধারণ রুচিসম্পন্ন পুরুষ। তাঁর বিষয়ের সঙ্গে সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন, রুশের কি সম্বন্ধ আছে, আর ফলিত জ্যোতিষ নিয়ে মাথা ঘামানো তাঁর কেন এত পছন্দ যখন তিনি তা দিয়ে রোজগার করবেন না? তবে অসাধারণ প্রতিভাদের মধ্যে এমন অদ্ভুত ব্যাপার থেকেই থাকে। তাঁর বইয়ের খুব শখ,আর নিজের উপার্জনের পয়সায় তিনি সমানে তা কিনে থাকেন। রুশ বইও তাঁর কাছে অনেক দেখলাম। বাবা নেই, মায়ের তিনি অনন্য ভক্ত। অবিবাহিত হলেও সারা বাড়ির আর্থিক চিন্তা তাঁর মাথায়।

শান্তিনিকেতন—'বৌদ্ধসংস্কৃতি' নিয়ে লেখার জন্য কিছু সময় শান্তিনিকেতনে এসে থাকার দরকার ছিল, তাই ২৭ তারিখ আমি সেখানে পৌঁছলাম। পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী আর শান্তি ভিক্ষুর সঙ্গে হিন্দিভবনে গেলাম। খাওয়ার পর চীনাভবন দেখলাম, এখানে অনেক চীন-সম্বন্ধী গ্রন্থ ছিল। তারপর বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে গেলাম। আমাদের কম গ্রন্থাগারেই পৌনে দু লাখ গ্রন্থ আছে। বৃহত্তর ভারত তথা ভারত বিষয়ক গ্রন্থের তো এখানে বিশাল ভাণ্ডার। বাইশ বছর আগে প্রথমবার লংকা যাবার সময় এখানে এসেছিলাম। সেই সময় থেকে এখন বেশ পরিবর্তন হয়েছে। রাতে ছোট একটি সভাতে ভাষণ দিতে হলো।

পরের দিন সকাল ছটার গাড়িতে তুলে দেবার জন্য দ্বিবেদীজী, শান্তি ভিক্ষু, শ্রী প্রহ্লাদ প্রধান আর রামকিংকরজী স্টেশন পর্যন্ত এলেন। ইন্টার-এ বসলাম। কামরাগুলিতে বহু জায়গা খালি পড়ে ছিল।

এগারোটা বাজার পরে গাড়ি শেয়ালদা পৌঁছল। তাকে গঙ্গার পুল পার হতে হলো, অর্থাৎ সেই রাস্তায় দিল্লীর ট্রেন শেয়ালদা পৌঁছতে পারে।

২৮ তারিখ যুগান্তর ক্লাবে মুরারকাজী আর অন্যদের নিমন্ত্রণে গেলাম। ইংরেজদের সময় এই সুন্দর ভবনটি কোনো ক্লাবের ছিল। তাদের কলকারখানাগুলি কিনে নেওয়া মারোয়াড়ী ধনকুবেরদের এখন এগুলোও সামলাতে হচ্ছিল। বাড়িটি খুবই সুন্দর ছিল আর পরিচ্ছন্নতা ও ব্যবস্থার কথা কি বলব? এই ক্লাবে তারাই মেম্বার হতে পারে যারা বউ নিয়ে আসতে রাজি। এক প্রজন্ম আগে মারোয়াড়ী শেঠদের এ ব্যাপারে অসুবিধে থাকতে পারত, কিন্তু এখন তো সেই মারোয়াড়ীই মুছে যেতে বসেছে। হ্যাঁ, খাবার সবই নিরামিষ ছিল কিন্তু ভালো এবং ছুরি-কাঁটা ও বাসনপত্রও ছিল সুন্দর। এক প্রজন্ম দেরি, তারপর এখানে আবার সেই পরিবেশ চলে আসবে, এক প্রজন্ম আগে এই ভবনটি যাতে অভ্যস্ত ছিল।

২৯ ডিসেম্বর বাংলা এশিয়াটিক সোসাইটি হলে ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে ভাষণ দেবার কথা ছিল। আর্যাবর্ত সংস্কৃতি সংঘের লোকেরা এর ব্যবস্থা করেছিল। আমার চিন্তাধারার সবকিছুই মধুর কি করে হতে পারে? লোকেরা কটু কথাও ধৈর্য ধরে শুনল।

সেখান থেকে যুগান্তর ক্লাবের তরফ থেকে দেওয়া ভোজে যোগ দেবার জন্য আজও হিন্দুস্থান ক্লাবে যেতে হলো। আজ সেখানে বহু ভদ্রলোক সস্ত্রীক এসেছিলেন। পর্দা উচ্ছেদ করতে শ্রীমুরারকাজী মারোয়াড়ী সমাজের নেতা হয়েছিলেন। সে সময় তাঁকে অনেক অসুবিধে ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু এখন তিনি চারদিকে সাফল্য দেখতে পাচ্ছিলেন। ভোজে ছজন মহিলা ছিলেন।

৩০ ডিসেম্বর সকালে হাঁটার জন্য ঘোড়দৌড়ের মাঠ হয়ে টালীগঞ্জে পচিসীয়াজীর বাড়িতে জলখাবার খেতে গেলাম। পচিসীয়াজী শ্রীঘনশ্যামদাস বিড়লার ভায়রা, তাঁর স্ত্রী এবং সোমানী-কন্যা সরস্বতী দু বোন। কোনো জ্যোতিষী ভাগ্যগণনা করে বলেছিল যে কন্যার ভাগ্যে সৌভাগ্য-বিরোধী দুষ্ট গ্রহ আছে। তার থেকে বাঁচার জন্য বাবা একদম সাধারণ ঘরের এক ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেন; কিন্তু কোটিপতি শ্বশুরকুল কি করে

জামাইকে এমন অবস্থায় রাখে? সরস্বতীজী লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে পতিকুলে এলো। তাঁর সম্মান হওয়াই উচিত। স্ত্রী আর্থিক দিক থেকে স্বাধীন হলে সর্বত্র তার সম্মান হয়। বিয়ের পনেরো বছর পরেও সরস্বতীজীর সন্তান হয়নি, কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য এই ওজুহাত যথেষ্ট হয়নি। এখন তাদের সাড়ে তিন বছরের একটি খুব সুন্দর, স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিমান ছেলে আছে। শহরের বাইরে পচিসীয়া দম্পতির এটি নিজস্ব বাংলো। গাড়ি থাকলে দশ-বারো মাইলের দূরত্ব কোনো ব্যাপাব নয। বাচ্চাটিকে একজন ইংরেজ মহিলা দেড় ঘণ্টা সামলায়। তার মধ্যে তার পিতামহ-প্রপিতামহের পিছিয়ে থাকাব চিহ্নমাত্রও নেই। পচিসীয়াজীর পাড়ায় একজন রুশ ইঞ্জিনিয়ার কার্নিলোফ-কার্নেলী থাকতেন যিনি জাররাজত্বের জেনাবেল কার্নিলোফেরই কোনো আত্মীয় ছিলেন। বলশেভিক বিপ্লবেব সময় পালিয়ে এসেছিলেন। এখানে ওখানে ভাসতে ভাসতে এখন এখানে এসে বাস করছিলেন এবং আর্থিক দিক থেকে খুবই ভাল অবস্থায় ছিলেন। পচিসীয়াজী আমাকে তার সঙ্গে আলাপ করাতে নিয়ে গেলেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাছে বলশেভিকবা ছিলেন শয়তান, তাদের রাজ্যে কোনো গুণ নেই, তাবা লাখ লাখ শিশু মেবে ফেলেছে। পোলান্ড থেকে হালে পালিয়ে আসা অপর এক ভদ্রলোকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, যিনি সমস্ত কথাতে কার্নেলীর সমর্থক ছিলেন। মানুষ সোভিয়েত রাশিয়ার বদনাম করার জন্য বছবের পর বছর ধবে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে প্রচার করে যাচ্ছে।

সেদিন রাত সাড়ে সাতটার সময় হিন্দি পরিষদে সভা ছিল। আমিও বললাম। ওস্তাদ আলাউদ্দীন সেতার শুনিয়ে মুগ্ধ করলেন। আমার আফশোশ হচ্ছিল যে তাড়াতাড়ি হাওড়া পৌছে পাঞ্জাবমেল ধরতে হবে।

১৯৪৮-এর শেষ দিনটি লক্ষ্ণৌতে কাটল। সেকেন্ড ক্লাশে যথেষ্ট জায়গা ছিল। এখন এই সেকেন্ড ক্লাশকেই ফার্স্ট ক্লাশে বদলানো হতে যাচ্ছিল। তখন ইন্টারকে সেকেন্ড বলা হবে।

নতুন বছর শুরু

লক্ষ্ণৌ—১ জানুয়ারিও লক্ষ্ণৌতে থাকলাম। সেদিন সন্ধেবেলা শহরে বেরিযে দেখি পত্রিকাগুলোর বিশেষ সংস্করণ বিক্রি হচ্ছে। কাশ্মীরে পাকিস্তানের সঙ্গে গুপ্ত লড়াই চলছিল। ভয় ছিল যে কোনো সময়ে তা খোলা যুদ্ধে পরিণত হবে। হঠাৎ আক্রমণ কবে পাকিস্তান কাজ গোছাতে চেয়েছিল। ভারতের কোনো আশা ছিল না। কিন্তু যখন কাশ্মীব রক্ষার জন্য ভারতীয় সেনা পৌছে গেল, আর জোজিলা পার করে আমাদের ট্যাঙ্কগুলি অসম্ভবকে সম্ভব করল—শুধু তাই নয়, লাদাখের দিক দিয়ে এগিয়ে যাওয়া আমাদেব সেনা গিলগিটের দিকে হামলা করতে লাগল, তখন পাকিস্তান আর তার মুরুব্বীবা

শলা-পরামর্শের জন্য তৈরি হওয়াই ভাল মনে করল। ভারত এবং পাকিস্তান এবার হাতিয়ার ছেড়ে কথা বলতে সম্মত হলো। এই কথাই পত্রিকাগুলোর বিশেষ সংস্করণে ছাপা হয়েছিল। পত্রিকার বক্তব্য অনুসারে পুনাছ, মীরপুর, মুজঃফরাবাদ আর গিলগিট পাকিস্তানের হাতে থাকবে। সংক্ষেপে যার কাছে যতখানি জায়গা আছে, তাই তার কাছে থাকবে।

লক্ষ্ণৌ-এর বন্ধুরা জানালেন যে, আগের বার যখন আমি এখান থেকে চলে গিয়েছিলাম, তখন গোয়েন্দা পুলিশের ইনস্পেক্টর খুব মাথা গরম করে আমার খোঁজ করেছিলেন। এক বছরের ওপর হলো দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু সি· আই· ডি·-র কাছে আমার ফাইল তো সেই একইভাবে মজুত আছে। তাই তাদের চিন্তা হবে নাই বা কেন। এখন তো সেই পুরনো ফাইল নতুন নতুন রিপোর্ট সহযোগে আরো মোটা হতে থাকবে, কারণ ইংরেজরা যাবার পরেও দেশকে যে রাস্তায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাতে আমাদের জনতাকে যে দুঃখভোগ করতে হচ্ছে, তা চুপচাপ বরদাস্ত করা আমার শক্তির বাইরে।

সীতাপুর—সীতাপুরে হিন্দি সাহিত্যের একটি সম্মেলন হচ্ছিল। সেখানে যাবার জন্য আগ্রহ বোধ করলাম আর লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ বৈদ্য তথা রাষ্ট্রকর্মী পণ্ডিত শিবরামজী তার মোটরে ২ জানুয়ারি আমাকে নিয়ে চললেন। বৈদ্যজীর মধ্যে প্রাচীনতা ও নবীনতার বিচিত্র সংমিশ্রণ ঘটেছে। একজন সফল বৈদ্য, নিজেই নিজের মোটরে চালান। আজ বহু বছর হয়ে গেছে তিনি তাঁর শরীর জল লাগিয়ে অপবিত্র করেননি। নিজের ওপর দিয়ে তিনি প্রাকৃতিক জীবনের পরীক্ষা চালিয়েছেন। ঘাম আর দুর্গন্ধকে শরীর থেকে আলাদা করার জন্য জল ছাড়াও অন্য উপায় আছে, তাই তার কাছে বসলে এটা বোঝা যায় না যে তাঁর শরীর চিরকাল জলস্পর্শ পরিহার করে এসেছে।

লক্ষ্ণৌ থেকে সীতাপুর ৫২ মাইল, আর পথ বেশির ভাগই সিমেন্টের। পথে কমলাপুর পড়ল, সেখানে এক বৃদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিতের সঙ্গে কিছুক্ষণ ধরে কথাবার্তা হলো। তারপর রওনা হয়ে পৌনে দুটোর সময় আমরা সীতাপুর পৌঁছে গেলাম। বাদশাহী আমলে আমাদের জেলাগুলোকে 'সরকার' বলা হতো। বড় সরকারগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি ইংরেজ আমলেই একটি থেকে দুটি জেলাও হয়ে গেছে। আকবরের প্রধানমন্ত্রী আবুল ফজল রচিত 'আইন-এ-আকবরী'তে মুঘল সাম্রাজ্যের সরকাবগুলির নাম দেওয়া আছে। সীতাপুর তখন খৈরাবাদ সরকারে ছিল। ইংরেজ আমলে সীতাপুরকে জেলা করে দেওয়া হলো, আর রেল ইত্যাদি সুবিধের জন্য সীতাপুর খৈরাবাদকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। শহরের জনসংখ্যা ৪০ হাজারের কাছাকাছি। মেয়েদের ইন্টার কলেজ এখন ডিগ্রি কলেজ হতে যাচ্ছে। সেখানে এক হাজার মেয়ে (পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এক হাজার আর পরে পাঁচশো) পড়ে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে এখানকার নাগরিকদের স্ত্রীশিক্ষার দিকে বিশেষ নজর আছে। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগও এখানকার লোকেদের আছে।

আমাকে জেলার ডেপুটি কলেক্টর আর· এন· চতুর্বেদীর কাছে রাখা হলো। চতুর্বেদীজী কাব্যানুরাগী এবং নিজেও একজন কবি। তিনি যে কট্টরতার পক্ষপাতী নন তা এর থেকে

বোঝা যায় যে, পুরনো আই· সি· এস· স্যার জগদীশপ্রসাদের মেয়ে তাঁকে বিয়ে করেছেন। সেদিনই শহরে সভার জন্য মিছিল বেরোল, সভাপতি হওয়ায় আমাকেও যেতে হলো। চারটের সময় সভা শুরু হলো। স্বাগতাধ্যক্ষের ভাষণের পর আমি একঘণ্টা বললাম। ভাষণ লিখে নেবার সময় হয়নি, কারণ সেদিনই আমাকে সভাপতি হতে বলা হয়েছিল। রাতে কবি সম্মেলন হলো। বংশীধর শুক্লর মর্মস্পর্শী ও সুন্দর কবিতার রসাস্বাদন লোকে খুব আনন্দের সঙ্গে করল। বংশীধরজীর অবধী কবিতা অন্যান্য ভাষাঞ্চলেও খুব পছন্দ করা হয়, আর এখানে তো অবধীর নিজের জায়গা। কোথাও কোনো কবি সম্মেলনে গেলেই তাঁর কবিতা বার বার শোনার আগ্রহ হয়। তিনি একেবারে স্বভাব কবি, আর বর্তমান বৈষম্যের কারণে মানুষ যে যাতনা ভোগ করছে তিনি তার ভুক্তভোগী এবং প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর কোমল হৃদয় তা সহ্য করতে পারে না এবং সেই বেদনাই তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। শুক্লজীর অনেক কবিতা ছড়িয়ে ও লেখা অবস্থায় পড়ে আছে, যেগুলো তিনি থাকতেই প্রকাশিত হয়ে যাওয়াটা অত্যন্ত দরকার, কিন্তু অরাজক নগরীতে কে তা করে? কবি সম্মেলনে চতুর্বেদীজীও তাঁর কবিতা শোনালেন।

এখানেই আমার পিসতুতো ভাই রমেশের ছেলে চন্দ্রভূষণ পাণ্ডের সঙ্গে দেখা হলো। সে একজন কনস্টেবল। রমেশ আমার নিজের পিসি আব আমার প্রথম সংস্কৃত গুরু পণ্ডিত মহাদেব পাণ্ডের পুত্র। তাঁর স্বর্গীযা প্রথমা স্ত্রী চন্দ্রভূষণকে রেখে মারা যায়। চন্দ্রভূষণ তার মামার বাড়ির সম্পত্তি পেয়েছিল, যা যথেষ্ট ছিল। বুঝতে পারলাম না যে, তা ছেড়ে তার চাকরি করার কেন চিন্তা হলো। এও বুঝলাম যে বাপ-বেটায় বনিবনা নেই। সমাজের ওপরের খোলসের ভেতর এইসব ব্যাপার আজকাল যদি বেশি দেখা যায়, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

৩ জানুয়ারি জলখাবার খেয়ে হরগাঁও গেলাম। হরগাঁওতে বিড়লার চিনি মিল আছে, যেখানে চিনির সঙ্গে সঙ্গে স্পিরিট, স্টার্চও বানানো হয়। মিল খুব বড়। মিলের প্রধান পরিচালকের বাড়িতেই খাওয়া হলো। কথায় কথায় তিনি জানালেন, 'কাগজ বানানোর জন্য আমরা আখের ছিবড়ে আমাদের সম্বলপুরের মিলে পাঠিয়েছিলাম, তার থেকে কাগজ ভাল হয়েছে।' পরে বিড়লার অন্য এক অফিসার জানালেন, 'কাগজে সামান্য দোষ থেকে যাচ্ছে, যা দূর করার এখন কোনো উপায় নেই। সব থেকে বড় কথা হলো, সীতাপুর থেকে উড়িষ্যার সম্বলপুরে কাগজ বানানোর জন্য ছিবড়ে পাঠানো খুবই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। যদি এখানে একটা মিল দাঁড় করানো যায়, তাহলেও একটা মিলের ছিবড়ে দিয়ে কি আর বানানো যাবে? আবার বহু মিল মালিক ছিবড়ে ইন্ধন হিসেবে জ্বালিয়ে দেয়, এটাও একটা অসুবিধে। ইংরেজ আমলে শুধুমাত্র ইংরেজদেরই কিছু মিলকে অ্যালকোহল (মদ্যসার) তৈরি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এখন তা বানানোর জন্য ছাড় দেওয়া হয়েছে। চিনির থেকে করা অনেকটা গাঢ় রস বেকার চলে যেত, যার থেকে অ্যালকোহল বানিয়ে চারভাগের এক ভাগ পেট্রোলের সঙ্গে মিশিয়ে মোটরে ব্যবহার করা যেত। আমাদের দেশ পেট্রোলের দিক থেকে গরিব, তাই এইভাবে চারভাগের এক ভাগ বাঁচানোটা কম হতো না। মিলের মালিক বিড়লার আসার কথা ছিল। এখানকার সব সংস্থা তাঁর কাছে দান

চাইবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

হরগাঁওতে সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দীর ভাঙাচোরা কিছু মূর্তি পাওয়া গেল। লাল পাথরের একটা পাঁচ ফনাওলা নাগ পাওয়া গেল। কুষাণযুগেও কি এই স্থানটির কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল? হরগাঁওর সঙ্গে কি মৌখরী হরিবর্মার কোনো সম্বন্ধ আছে?

কানপুরে কমিউনিস্ট নেতা এবং মজুরদের মধ্যে জীবন কাটিয়ে দেওয়া কর্মী কমরেড় সন্তসিংহ ইউসুফ এখানেই নজরবন্দী হয়ে আছেন, একথা যখন জানতে পারলাম, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কথায় কথায় নজরবন্দী করে স্বাধীনতা অপহরণ করাটা আজকের যুগে ইংরেজ আমলের থেকেও বেশি সহজ হয়ে গেছে। ইংরেজরা তাদের শত্রুদের সঙ্গে যেমন কড়া ব্যবহার করত, আজও তাতে ঢিলেমি করা সরকার বরদাস্ত করে না। অন্য সব ব্যাপারে পিঁপড়ের গতি হলেও দমন করার কাজে খুব চটপটে।

নীমসার-মিসরিখ—ভারতের এক পরম পবিত্র তীর্থ নৈমিষারণ্য সীতাপুর জেলাতেই অবস্থিত। এমন স্থানে পুরাতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ থাকতে পারে, একথা ভেবে আমার সেখানে যাবার ইচ্ছে হলো। ৪ জানুয়ারি পৌনে দশটার সময় চতুর্বেদীজী আমাকে নিয়ে গেলেন। প্রথমে মিসরিখ পড়ল। ৩৯ বছর আগেও আমি নীমসার-মিসরিখ হয়ে উত্তরাখণ্ডে গিয়েছিলাম। সেই সময়ের স্মৃতি খুব ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। তাহলেও এটুকু মনে ছিল যে, মিসরিখে একটা পুকুর আছে, যাকে খুব পবিত্র মনে করা হয়। পুকুর এখনও ছিল আর সমস্ত তীর্থই তার পারে। পুরনো জিনিস খুঁজতে গিয়ে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মূর্তি পাওয়া গেল. দু-একটি আরো আগের। আরো মূর্তি পাওয়া যেত, একশো বছর ধরে মানুষ মূর্তিগুলো বয়ে নিয়ে যেতে ব্যস্ত থেকেছে, এইসব জিনিসের ব্যবসায়ীরা তো পঞ্চাশ বছর ধরে অবাক কাণ্ড করছে। দধীচী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞাননাথগিরি শাহজহাঁপুর থেকে এসেছিলেন। আরো অনেক কথা জানা যেত, যেগুলো হয়তো ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই, তবে অন্য কাজে লাগে। চার-পাঁচ মাইল আরো যাবার পর নীমসারের চক্রতীর্থ পেলাম। চক্রতীর্থ একটি গোল গভীর কূপ, যার অল্প একটু জল সবসময় ওপর দিয়ে বেরোয়। এমন বহমান কুয়োর অভাব নেই। সরাইন নামের ছোট একটি নদী এই জেলার একটি কুয়ো থেকে বেরিয়েছে। গল্প আছে যে, এক চামার যুবতী নরৈনী ভাসুর বাধ্য করায় পুকুরে জল না পেয়ে কুয়োতে গিয়েছিল। তার কাছে দড়ি ছিল না। সমস্ত কাপড় জোড়া লাগিয়ে সে জল তুলতে চেষ্টা করল কিন্তু তা জল পর্যন্ত পৌঁছচ্ছিল না। দেরী হচ্ছে দেখে ভাসুর এলো। লজ্জায় নরৈনী কুয়োতে ঝাঁপ দিল। তার আত্মত্যাগে কুয়োর মন গলল আর তার মুখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসে বইতে লাগল। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে বহু জায়গায় এমন দেখা যায়। বর্ষায় মাটির শুষে নেওয়া জলের অনেকটাই কুয়োর মুখ দিয়ে বাইরে বেরোতে থাকে।

ফেরার সময় রামকোটের ধ্বংসস্তূপ দেখলাম। খণ্ডিত মূর্তিগুলি তার প্রাচীনতার কথা বলে দিচ্ছিল। বড় বড় ইঁটও আছে কিন্তু সেদিন চোখে পড়ল না।

সন্ধেবেলা জেলার আধিকারিকদের সঙ্গে চা-খাওয়া আর পরিচয়ের সুযোগ হলো।

রাতে কলা-প্রদর্শন। একটা পর্যন্ত তা চলল। প্রায় দশ হাজার দর্শক ছিল অর্থাৎ শহরের জনতার এক চতুর্থাংশের তাতে আগ্রহ ছিল।

৬ জানুয়ারি সকালে ওইল যাবার ছিল। ওইল পুরনো জায়গা এবং একটি ভাল মফস্বল শহর। কিন্তু রাস্তায় খারাপ হয়ে মোটর আসতে দেরি হলো, তাই সেখানে যাবার চিন্তা ছাড়তে হলো। শ্রীরূপনারায়ণ চতুর্বেদী একজন ভালো কবি ও সাহিত্যানুরাগী। তাঁর স্ত্রীও শিক্ষিতা। তাঁদের তিন ছেলে আর তিন মেয়ে। আজকালের মধ্যবিত্ত পরিবারে আধডজন সন্তান নিজেদের এবং মাতা পিতারও কষ্টের কারণ হয়।

সীতাপুর ১৩ লাখ জনসংখ্যার জেলা, যাতে চারটি তহসিল আছে। খৈরাবাদ কিভাবে নষ্ট হলো আর সীতাপুর তৈরি হলো, সেকথা আগেই বলেছি। জেলায় কৃষকদের রোজগারের একটা নতুন রাস্তা বেরিয়েছে। এখানে চীনাবাদাম প্রচুর জন্মায়, যা একটা বড রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য। আখের সদ্ব্যবহার করার জন্য তো অনেক মিল তৈবি হয়েছে, কিন্তু চীনাবাদাম এখনও প্রাকৃতিক রূপেই বাইরে যায়—তেল নিষ্কাশন শিল্পের দিকে কেউ এখনও নজর দেয়নি।

পৌনে পাঁচটার সময় ট্রেনে রওনা হলাম। পুরনো ইন্টার ক্লাস এখন সেকেন্ড ক্লাস হয়েছে, আর ফার্স্ট ক্লাস তুলে দিয়ে সেকেন্ড ক্লাসকে এখন ফার্স্ট ক্লাস করা হয়েছে। ট্রেনে ভীষণ ভিড় ছিল। কয়েকশো লোক পাদানিতে ঝুলছিল। আটটাব সময় লক্ষ্মৌ পৌঁছলাম। আশা খুবই কম ছিল, তবু প্রয়াগের গাডিতে ওপরের সিট (সেকেন্ড ক্লাস) রিজার্ভ করা গেল, তাই শুয়ে শুয়ে বাতের যাত্রা কবলাম। এমন ঘুমোলাম যে প্রয়াগে গিয়ে ঘুম ভাঙল।

প্রয়াগ—ভোর হতেই আমি শ্রীনিবাসজীব বাডিতে পৌঁছলাম আর সকালে বেডানোর জন্য ত্রিবেণী পর্যন্ত গেলাম। পরিভাষা নির্মাণের কাজটাকে কি করে এগোন যায় তাই নিযে চিন্তা ছিল। দিল্লী থেকে যে যুবকটির আসাব কথা ছিল তিনি আসতে পারেননি, তাঁব কোনো চিঠিও আসেনি। ড· ভট্ট এখন দ্বিধায় পডেছিলেন। সাহায্যকারী আসাব এখন প্রায় কোনো নিশ্চযতা ছিল না। এর মধ্যে আমি 'বৌদ্ধ সংস্কৃতি'র বিষয়ে হিন্দুস্তানী অকাদেমিতে ভাষণ দিতে সম্মত হয়েছিলাম। ভাষণটি গ্রন্থাকারেও লিখতে হতো। লেখার জন্য ১৫-১৬ বছরের ম্যাট্রিক পাস একটি যাদব তরুণ (লল্লন)-কে পাওয়া গেল। তার এখন পড়ার সময়, এইভাবে তাকে কাজে লাগিয়ে অগ্রগতির পথ বন্ধ কবতে আমাব খারাপ লাগছিল। কিন্তু সে কোনো কাজ পাচ্ছিল না, তাই ততদিন পর্যন্ত তাকে রাখাটাই আমার পছন্দ হলো। এই বছর, আব বিশেষ করে এই সময়, শীত খুব বেশি পডছিল। দিল্লীতে তা ৩০ ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ববফ জমতে মাত্র ৪ ডিগ্রিব অভাব ছিল। আমি ভাবছিলাম, ঠাণ্ডার এই তাপমাত্রাও এক বিপদ। যদি আমাদের এখানে সাধারণ তাপমাত্রা চার কি পাঁচ ডিগ্রি কমে যায় তাহলে সকালে পুকুবেব জল জমে যাবে, নদীব পারে বরফের সাদা প্রলেপ দেখা যাবে, সমস্ত গাছ পাতা ঝরিযে ন্যাড়া হয়ে যাবে, খেতের ফসল ঝিমিয়ে যাবে, আর শীত ঠেকানোব ব্যবস্থা কবতে অসমর্থ লক্ষ লক্ষ লোক মবে

যাবে, পশুপাখিদের কথা আর কি বলব? ত্রিবেণীর তীরে মাঘমেলার যাত্রীর ভিড়। এই সময় একমাসের জন্য এখানে প্রত্যেক বছর উৎসব লেগে যায়। পরের দিন ড· উদয়নারায়ণ তেওয়ারী আর নাগার্জুনজীর সঙ্গে আবার বেড়াতে গেলাম। মেলার প্রস্তুতি চলছিল। এখনও পর্যন্ত আমাদের মেলাগুলিতে পেচ্ছাপ-পায়খানার সমস্যার সমাধান হয়নি। প্রথমত, যথেষ্ট সংখ্যায় এইসব জায়গার ব্যবস্থা করা হয় না, আর তাছাড়া আমাদের পবিত্রতা-প্রেমী দেশের লোকেদের সর্বজনিক পরিচ্ছন্নতার দিকে কোনো দৃষ্টি নেই।

যদিও দু-চার হাজার টাকার বেশি আমার কাছে ছিল না, কিন্তু ব্যাঙ্কে রাখা টাকা নিয়ে চিন্তা হতো—যদি টাকার মূল্য বিচ্ছিরিভাবে পড়ে যায়, আর হাজার টাকার চতুর্থাংশ মূল্যও না থাকে! শেষপর্যন্ত তো যুদ্ধের আগের একটার দাম এখন চার আনার থেকেও কমে এসে দাঁড়িয়েছিল।

সারনাথ—৮ জানুয়ারি সকাল সাতটার সময় ছোট লাইনের গাড়ি ধরলাম। ছোট লাইনেও ১ জানুয়ারি থেকে পুরনো ফার্স্ট ক্লাশ তুলে দিয়ে বাকিসব প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় শ্রেণী করে দেওয়া হয়েছিল। ট্রেনে খুব বেশি ভিড় ছিল না। লল্লনেরও এই ট্রেনে যাবার কথা ছিল, কিন্তু কোনো কারণে গাড়ি ধরতে পারেনি। এদিকে নিজের হাতে লেখার অভ্যাস কমে গিয়েছিল, আর যা আমি লিখতাম তা মানুষের পড়ার যোগ্যও হতো না, তাই লিপিকারের প্রয়োজন ছিল। সারনাথে গিয়ে 'বৌদ্ধ সংস্কৃতি' লিখতে হবে, তাই লিপিকারের গাড়ি ধরতে না পারাতে চিন্তা হলো।

বারোটার সময় সারনাথ পৌঁছে গেলাম। এখানকার অধিকাংশ ভিক্ষু সারিপুত্ত মোগ্গলানের ধাতু[১]গুলিকে স্বাগত জানানোর জন্য কলকাতা চলে গিয়েছিল। ধর্মশালার একটি কামরায় উঠলাম। স্বামী সচ্চিদানন্দও এখন তিন সপ্তাহ ধরে এখানেই ছিলেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি সংস্কৃতের সুপণ্ডিত এবং উদারচিন্তা সম্পন্ন ছিলেন। জীবনকে নিশ্চিন্তভাবে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য মানুষের কিছু অতিরিক্ত কাজও হাতে নেওয়া উচিত, না হলে অবসর সময়ে চিন্তা অস্থির করতে শুরু করে, বিশেষ করে জীবনের সন্ধ্যেয় তো তার বেগ আরো বেড়ে যায়। স্বামী সচ্চিদানন্দ না লেখার কাজ ঠিকমত সামলেছেন, না পড়ার কাজ। এই সময় তিনি চারদিকে শুধু নিরাশাই দেখছিলেন। কখনও কখনও উত্তরকাশীতে গিয়ে স্বামী রামতীর্থের অনুকরণ করার কথা বলতেন।

৯ তারিখ সকালে কুয়াশা পড়ছিল, যখন আমি ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে গেলাম। ফিরে দেখি, লল্লন এসে গেছে। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল, অন্য ট্রেন ধরে রাত দশটার সময়ই সারনাথ স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিল। যাইহোক, আজ থেকে বই লেখানো শুরু করলাম।

---

[১] বুদ্ধ অথবা অন্য কোনো মহাত্মার অস্থি ইত্যাদি, যাকে বৌদ্ধরা কৌটোয বন্ধ কবে স্থাপনা কবতেন।—স·ম·

তখন ঠিক করেছিলাম যে দুসপ্তাহ এখানেই থেকে বই লেখানোর কাজটা করি, আর তারপর একমাসের জন্য শান্তিনিকেতন চলে যাই। প্রয়োজনীয় বইগুলি পাবার সেখানে বেশি সুবিধে ছিল। লল্লন আস্তে লিখলে সুপাঠ্য হতো, তাড়াতাড়ি করলে দুষ্পাঠ্য হয়ে যেত।

১০ তারিখ সকালে হাঁটার জন্য লাটভৈরবের দিকে গেলাম। বেনারসের উত্তরপ্রান্তে লাটভৈরব এখন মুসলমানদের কবর আর দরগার চেহারা নিয়ে অবস্থান করছে। একাদশ শতাব্দীতে মহম্মদ গজনী যখন বেনারস লুঠ করে, সেইসময় শহরের প্রধান অংশ এখানেই ছিল, এই ভৈরবও সেই সময়েরই। মাটির ওপরে পুরনো জিনিস আর কি পাওয়া যাবে, কিন্তু নীচে তা পাবার ঢের সম্ভাবনা আছে। সারনাথ থেকে সোজা লাটভৈরব হয়ে চকে আসার রাস্তা আছে। রাস্তাটি সেই সময় বেশির ভাগটাই কাঁচা ছিল। বরুণার ধারে আছে পয়গম্বরপুর গ্রাম। প্রাচীনকালে অন্য কোনো নাম থেকে থাকবে, যাকে বদলে মুসলমানী নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে স্ত্রী ও পুরুষমূর্তি একটি সুন্দর প্রস্তর-স্তম্ভে খোদাই করা দেখলাম। স্তম্ভটি শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়েছিল। সামনে বরুণার ওপর অস্থায়ী পুল ছিল, যার কাছে একসময় স্থায়ী পুল ছিল, এটা তার ধ্বংসাবশেষ থেকে বোঝা যায়। এখন সারনাথের সঙ্গে সঙ্গে এই ভূখণ্ডের ভাগ্যও আবার জাগছে। বুদ্ধজয়ন্তীর ২৫তম শতাব্দী পালন করার জন্য যে প্রস্তুতি হয়েছিল তাতে বরুণার ওপর পুলও তৈরি হয়। এর ওপর দিয়ে শহর থেকে সোজা পাকা রাস্তা সারনাথ যাচ্ছে। রাস্তা তৈরি হয়ে যাওয়ায় এদিকে নতুন বাড়িও তৈরি হতে শুরু করবে। তবে আজকের যুগে সেই শহরই দৃঢ়তার সঙ্গে উন্নতি করতে পারে যেখানে শিল্প-বাণিজ্য বাড়ছে। বেনারসে তেমন কিছু ব্যাপার চোখে পড়ে না। পুরনো ধনী নাগরিকরা শহরের বাইরে বাগানবাড়ি আর বাংলোর ব্যাপারে শৌখিন ছিল, কিন্তু জমিদারি উঠে যাওয়ায় এবং অন্যান্য অসুবিধে—যেমন শহরের বাইরে বাংলোয় বসবাসের অর্থ নিরাপত্তাহীন থাকা—এর জন্য যাদের এমন বাংলো আছে, তারাও সেগুলো বেচে দিয়ে মুক্ত হতে চাইছিল। তবুও এই রাস্তার জন্য সারি সারি বাড়ি হয়ে শহর আর সারনাথ মিশে যাবে, এর সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। বরুণার নিচের দিকে অল্পদূরেই রেলপুল দেখে একটা নিষ্ঠুর ঘটনা মনে পড়ে গেল—সে সময় ঠিকেদাররা সারনাথে পাথরের ভাঙাচোরা মূর্তি আর স্তম্ভ সুলভ দেখে ছ্যাকড়া গাড়িতে তুলে পুলের নীচে ফেলে দিয়েছিল! সেগুলো কত না ঐতিহাসিক কথা নিজেদের সঙ্গে নিয়ে ওখানে পুলের পায়ের তলায় ডুবে আছে।

বরুণা পার করে আমরা একটি পুরনো পুকুরে পৌঁছলাম। পুকুর পারে একটি মসজিদের আঙিনায় লাটভৈরব আছে। হিন্দুরা এখনও, যখন তখন এখানে পুজো দিতে আসে। প্রথমে এটাই ঝগড়ার মূল ছিল। সম্ভবত এই কারণেই তার চারদিকে লোহার কাঠঘরা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মসজিদ কবে বানানো হয়েছে তা বলা মুশকিল, তবে মন্দির ভেঙে যে বানানো হয়েছিল, সে কথা দেয়ালের মধ্যে এখানে-সেখানে অলংকৃত উৎকীর্ণ পাথরগুলি বলে দিচ্ছিল। দেয়ালে আর আঙিনায় পড়ে থাকা পাথরগুলির মধ্যেও কিছু মূর্তি অবশ্য পাওয়া যাবে। পয়গম্বরপুর থেকে অলইপুর পর্যন্ত মুসলমানদের বসতি

আছে। সেখানে জোলারা থাকে। সারা দেশের জন্য কাপড় তৈরি করা যে জাতির কাজ, তাদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে, এতে সন্দেহ কি? বেনারস তার সুন্দর কাপড়ের জন্য কত যুগ ধরে প্রসিদ্ধ। বুদ্ধের সময় এখানকার মিহিসুতোর খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে ছিল, পরে রেশম আর কিংখাবের জন্য বাইরে বাইরেও প্রসিদ্ধ হয়েছে। এই জোলারাই তো এইসব কাপড় বানাতো। মুসলমান আক্রমণের প্রথম অর্ধশতাব্দীতেই মনে হয়, উত্তর-ভারতের সমস্ত তন্তুবায় মুসলমান হয়ে জোলা নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মহম্মদ গজনীর আক্রমণের সময় সারনাথ থেকে এখান পর্যন্ত এই অংশটিতে খুব ঘনবসতি ছিল, আর সেই সময় ধ্বংস হবার পর এর দিন আর ফেরেনি। জেনে খুব খুশি হলাম যে, এখানে মুসলমানদের সঙ্গে পাঞ্জাবের মত ব্যবহার করা হয়নি, নাহলে একজনও মুসলমান দেখার জন্য চোখ ব্যাকুল হয়ে উঠতো।

১১ তারিখে সকালের ৬ মাইল পায়চারি গাজীপুর সড়কে করলাম। এই মাটিতে প্রাচীন ইতিহাসের পরিচায়ক সামগ্রী জায়গায় জায়গায় লুকিয়ে আছে, তাই আমি রাস্তা বদলে বদলে হাঁটতে শুরু করেছিলাম। কিছুদূর যাবার পর অনেকগুলি ইটভাটা আর বহু উদ্যানগৃহ ছিল। ধনী কাশীবাসীদের উপবন তো উপনগরেই হওয়া উচিত। প্রাচীনকালে এইসবের আরো বেশি শখ ছিল। আমার ছাত্রজীবনে লোক প্রায়ই বনভোজন করার জন্য নিজের অথবা অপরের বাগানে চলে যেত। দুধ দিয়ে সিদ্ধি তৈরি হতো, আগুনে গমের আটার লিট্টি হতো আর গোল হাড়িতে ডাল রান্না হতো। সেদ্ধ হয়ে ফেটে যাওয়া লিট্টিগুলো ঘিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া হতো। তারপর বন্ধুরা একসঙ্গে বসে খেত। এখন আর জীবন তত নিশ্চিন্ত নয়, তাই উদ্যানগুলি শ্রীহীন। যদিও তখনো থেকে এখন আসা-যাওয়ার অনেক বেশি সুবিধে হয়েছে। মোটরে দশ মাইল পৌছনোও এখন পঁচিশ মিনিটের কাজ। আরো একটু আগে ডানদিকে একটু সরে একটা উঁচু জায়গা দেখলাম। এখানে হয়তো কোনো স্তূপ ছিল, কিন্তু বিশেষভাবে জানতে হলে খননের প্রয়োজন ছিল।

শীতের সময় সারনাথে দেশ-দেশান্তর থেকে বৌদ্ধযাত্রী আসে। লংকা আর তিব্বত থেকে আসা যাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা থাকত আমার। এইভাবে পুরনো মধুর স্মৃতিগুলিকে জাগ্রত করা সম্ভব হতো। আমাদের এখানে গ্রীষ্ম আর বর্ষাও দুঃসহ হয়ে থাকে, তাই অপর দেশের যাত্রী বৈশাখ পূর্ণিমার মহাপর্বের লোভ থাকা সত্ত্বেও আসত না।

আজ চারদিকে যে পরিস্থিতি আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, তাতে বুদ্ধের উপদেশ 'আদীপ্ত পর্যায়' মনে পড়ছিল। সমস্ত বস্তুই আদীপ্ত, পুড়ছে। পুরনো কাঠামো পুড়ে খসে পড়ছে। সেটা খারাপ নয়, কিন্তু নতুনের ভিত্তি-স্থাপন হতে দেখা যাচ্ছে না, এটা চিন্তার ব্যাপার। ১২ তারিখ জানতে পারলাম, আজ থেকে পনেরো দিনের জন্য মহাবোধি হাইস্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গ্রাম-পঞ্চায়েতের নির্বাচন করানোর জন্য পাটোয়াররা যে ভোটার সূচি তৈরি করেছিল, তা সংশোধন করার কাজ শিক্ষকদের দেওয়া হয়েছে। দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত রোজ তাঁরা একাজ করতে গ্রামে যান। আমার শুনে আশ্চর্য লাগত যে, দশটা থেকে চারটা তো সেই সময়, যখন কৃষকরা ঘরে অনুপস্থিত থেকে খেতে কাজ করে।

তাহলে কি করে সংশোধনের কাজ সম্পূর্ণ হবে! এখন ছিল রবি ফসলে সেচনের সময়, যে কাজ সামান্য থেমে গেলে কৃষকদের সারা বছর পস্তাতে হয়। বেনারসের কাছে হওয়ায় গ্রামের বহুলোক দুধ-দই, ঘুঁটে অথবা অন্য জিনিস বেচাকেনা করতে শহরে চলে যায়। এই সময় এও জানতে পারলাম যে, এখানকার গ্রামগুলিতে দালদা থেকে ঘি বানানোর শিল্প খুব ধুমধামের সঙ্গে চলছে। তারা মোষের দুধের সঙ্গে দালদা মিশিয়ে দেয়, তারপর তার থেকে ঘি-মাখন তৈরি হয়ে বেনারসে বিক্রির জন্য যায়। দালদা বর্জন করে ঘি-এর নামে যে সব লোক দালদা খায় তাদের বুদ্ধির প্রতি আমার করুণা হতো। যারা দালদা বন্ধ করানোর জন্য আইন বানাতে চায়, তাদের বুদ্ধির প্রতি আরো বেশি করুণা হতো। দালদাতে ভিটামিনের অভাব থাকতে পারে, কিন্তু তা বিষ নয়। মানুষের স্নেহজাতীয় বস্তুর প্রয়োজন আছে, যার পূরণ এর থেকে হয়, ভিটামিনের অভাব টমেটো অথবা অন্য জিনিস খেয়ে পুরণ করা যায়। যদি ঘি দালদার দামে পাওয়া যেত তবে কে না তা খেত। ঘিয়ের থেকে অর্ধেক দামে এই জিনিস মধ্যবিত্ত মানুষদের খুব সাহায্য করছে। আজ চা যেমন অতিথি সৎকারের একটি সস্তা ও সুন্দর উপকরণ দালদাও ঠিক তেমনি।

পাটোয়ারেরা তাদের ইচ্ছেমত ভোটার-সূচি করে দিয়েছিল। মেয়েদের ভোটের কোনো দাম ছিল না, তাই তাদের নাম তোলায় খুবই গোলমাল করা হয়েছিল। গোলমাল তো উঁচু জাতের লোকেদের ধূর্তামির জন্যও হয়েছিল। তাদের মধ্যেই কিছু শিক্ষা আছে, আর তারাই পঞ্চায়েতের মূল্য কিছুটা বোঝে। তারা জানত যে, গ্রামের কোথাও কোথাও দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ছোটজাতের লোক বসবাস করে। তারা যদি তাদের সংখ্যা অনুসারে পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হয়ে আসে তবে বড় জাতের যুগ যুগ ধরে স্থাপিত স্বেচ্ছাচারিতার অবসান হবে। পাটোয়াররাও বড় জাতি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লালা (বেনে বা কায়স্থ) ছিল। কেন নাম লেখানো হচ্ছে তার অর্থ এমন উল্টো বোঝানো হয়েছিল যে লোকেদের আশঙ্কা হয়েছিল। কেউ যদি বলে কন্ট্রোলে কাপড় পাওয়া যাবে বলে নাম লেখানো হচ্ছে তবে বেচারারা বলে, 'বড়লোকেরা কন্ট্রোলের কাপড় পাবে, আমরা কি পাব?' যদিও শিক্ষকরা পঞ্চায়েতের কিছু গুণের কথা বোঝানোর চেষ্টা করতেন, কিন্তু লোকেদের দুঃখ দূর হতো না। এবার কিছু ছোটজাতের লেখাপড়া জানা লোক পঞ্চায়েতের গুরুত্ব বুঝতে শুরু করেছিল, তারাও ঘুরে ঘুরে বোঝাতে লাগল। কিছুদিন পরে হাওয়া পাল্টাল আর ছোটজাতের লোকেরাও পঞ্চায়েতে দাঁড়াতে শুরু করল। সেইসময় পঞ্চায়েতের নির্বাচন হওয়া পর্যন্ত এমন হাওয়া পাল্টে গিয়েছিল, যা তার আগে কখনো দেখা যায়নি। বড় আর ছোটজাতের সোজাসুজি দুটো দল হয়ে গিয়েছিল। বড় জাতের মধ্যে ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লালা ও ভূমিহার আর ছোটজাতের মধ্যে ছুত-অছুত সমস্ত লোক। কত শতাব্দী পরে এই প্রথম সমাজে এই ধরনের স্পষ্ট ফাটল চোখের সামনে দেখা যেতে লাগল। একদিকে ছিল ধন ও অধিকারের মালিক—শোষক, আর অপরদিকে তার থেকে বঞ্চিত—শোষিত। আজও সেই ফাটল জোড়া লাগেনি, কিন্তু যাদের হাতে ধন আর প্রভুত্ব আছে তারা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের লোকেদের চোখে ধুলো দেয় আর শোষিতদের নেতাদেরকে কিনে নিয়ে নিজেদের কাজ গোছায়। আখেরে সংখ্যা গরিষ্ঠ শোষিতদের কিছু লোকই তো শোষকদের

সৈনিক হয়ে নিজের ভাইদের হাজার হাজার বছর ধরে গোলাম করে রেখে এসেছে।

সাগর—সাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্য সম্মেলনে আসার জন্য নিমন্ত্রণ এলো। তেমন হলে, কাজ ছেড়ে দিয়ে এক সপ্তাহ নষ্ট করতে আমি রাজি হতাম না, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছ থেকে পরিভাষা নির্মাণের কাজে সাহায্য পাবার আশা ছিল, তাই আমি গ্রহণ করলাম। দুপুরের পরের ছোট লাইন ধরে প্রয়াগ পৌঁছলাম। তারপর শোবার লোভে সেখান থেকে সাগরের জন্য প্রথম শ্রেণীর টিকিট করালাম। ট্রেনগুলিতে মকর সংক্রান্তির জন্য লোকের ভিড় ছিল। সারা রাত চলে ভোর পাঁচটায় কটনী পৌঁছলাম। এরপরে যাবার মাত্র দুটোই ট্রেন ছিল, পৌনে এগারোটা পর্যন্ত ওখানেই প্রতীক্ষা করতে হতো। স্টেশনের বাইরে দেখলাম, রাস্তার দুধারে শরণার্থীরা চা, মিষ্টি, আরো অন্য দোকান খুলে রেখেছে। লল্লনও সঙ্গে ছিল, কিন্তু এখনও সে মায়ের আঁচলে বাঁধা ছেলে। কোথাও যায়নি, যাত্রায় অপুট। যাইহোক, বীনার ট্রেন পেলাম, তাতে রওনা হয়ে পৌনে চারটের সময় সাগর পৌঁছলাম। সাগর একটি বড় গ্রাম—বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন থেকে তিন মাইল দূরে। যুদ্ধের সময় ইংরেজরা সৈন্যদের জন্য এখানে অনেক অস্থায়ী ব্যারাক বানিয়েছিল, সেগুলিরও লোভে বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে স্থাপিত করা হয়েছিল। কিন্তু এই বাড়িগুলো কতদিন পর্যন্ত টিকবে, আর যদি এই লোভেই এখানে আরো বাড়ি বানানো হতে থাকে, তাহলে বলবো—বুদ্ধির পরিচয় নেই। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাতশো ছাত্রছাত্রী পড়ছিল। ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ছিল না, তাই বাইরের ছাত্রের এখানে আসা কি করে সম্ভব? আমরা প্রোফেসর নন্দদুলাল বাজপেয়ীর বাড়িতে উঠলাম।

১৪ জানুয়ারির সকালে জব্বলপুরের রাস্তায় হেঁটে ৩ মাইল দূরে সেই জায়গা পর্যন্ত গেলাম, যেখান থেকে কানপুর আর দামোহর রাস্তা আলাদা হয়েছে। প্রথমেই চল্লিশটি ঘরের একটি ছোটমত গ্রাম বহেরিয়া পড়ল। বজরং (মহাবীর)-এর স্থানে দশম শতাব্দীর একটি ছোটমত পাথরের মূর্তি পেলাম। সেখানে ছোট্ট শিবলিঙ্গ আর একটু বড় নন্দীও ছিল। পাথরের মূর্তিটি দ্বিভূজ ছিল আর তার কোমরের ওপরের অংশটুকুই অক্ষত ছিল। একটি হাত বুকের ওপর আর অপর হাতটি খড়্গাধারীর মত ওপরে ওঠানো ছিল। সম্ভবত এই পুরুষ মূর্তিটি নৃত্যের মুদ্রায় ছিল। কিছু লেখাও ছিল কিন্তু শুধু 'স' পড়া যাচ্ছিল। এর অর্থ হলো বহেরিয়া গ্রামটি অন্ততঃপক্ষে দশম শতাব্দীতেও বিদ্যমান ছিল।

আড়াইটের সময় হিন্দি পরিষদের এবং রাত সাড়ে সাতটার সময় ছাত্র-সংঘের উদ্বোধন করতে গিয়ে আমাকে ভাষণ দিতে হলো।

সেইদিন সন্ধেবেলা সাগরের বসতির দিকে গেলাম। কাছারির কাছে বিশাল সরোবর আছে, যার নামে বসতির নাম সাগর হয়েছে। কে এই সাগরকে খনন করিয়েছিল তা জানা যায় না। এটিকে অপৌরুষেয় বলে মনে করা উচিত। সরোবরটি যথেষ্ট পুরনো আর ধারে ধারে মাটি পড়ে শুকিয়ে গেছে। তোপখানার অফিসারদের ভোজনালয়ের বাংলোর আঙিনায় চারটে সদ্য বানানো স্তূপের ওপর বসানো পাথরের কিছু মূর্তি দেখলাম। এর মধ্যে শকদের (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী) সময় থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের মূর্তি

ছিল। সাগর দশার্ণ[১] কেন্দ্রে অবস্থিত। সমুদ্রতল থেকে দুহাজার ফুটেরও বেশি উঁচুতে হওয়ার জন্য গরম এখানে অসহ্য হয় না। এখানে লু বয় না। স্বাস্থ্যের পক্ষে এই জায়গাটা খুব ভাল। বিশ্ববিদ্যালয়কে এখন এখানে অস্থায়ীভাবেই রাখা হয়েছে। তাকে পথরিয়া পাহাড়ীতে নিয়ে যেতে চায়, যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও ভাল, আর জলের চিন্তাও নেই।

সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুপ্রদর্শ বাটিকা, ভূতত্ত্বীয় প্রয়োগশালা ও অন্যান্য জিনিস দেখলাম। বিশ্ববিদ্যালয় সবে খুলেছিল, যার জন্য শ্রীহরিসিংহ গৌড় তাঁর কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি দিয়ে দিয়েছিলেন। উপার্জনের এর থেকে আর ভাল উপযোগিতা কি হতে পারত? হরিসিংহের জন্ম এখানেই হয়েছিল, তাই তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর জন্মভূমিতেই তৈরি হোক। সাগর বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একটি শিক্ষালয় না, মধ্যপ্রদেশের হিন্দিভাষী অংশের শিক্ষা-সংস্থাগুলির পরীক্ষালয়ও।

১৫ তারিখ সমাবর্তন অনুষ্ঠান হলো। ভাষণ দেবার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম এলেন। সম্পূর্ণ ইংরেজি পরিবেশ ছিল, কিন্তু জয়রামদাস হিন্দিতে বললেন। ইংরেজিকে একটুও নীচে নামানো বুড়ো হরিসিংহের বরদাস্ত করা সম্ভব নয়, কিন্তু করবেন কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরাও এত বড় দাতাকে অসন্তুষ্ট করতে চাইত না। জয়রামদাসজীর ভাষণে এই অঞ্চলে পাট চাষের জন্য খুশি এবং তার উন্নতির জন্য উপদেশ ব্যক্ত হয়েছিল। শ্রোতারা আশ্চর্য হয়ে তা শুনছিল। সাগর এমন একটা জায়গা যেখানে না পাট চাষ হয় আর না সেখানে তার বিকাশের কোনো সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মন্ত্রীকে এর জন্য দোষ দিয়ে কি হবে? সবসময় তাকে কোনো না কোনো সভায় উদ্‌ঘাটন, সমাবর্তন অনুষ্ঠান অথবা অন্য কোনো সমারোহতে বলতে বলা হয়। নিজের দেহটাকে তিনি কোনোরকমে সেখানে পৌঁছতে পারেন, কিন্তু সব জায়গার জন্য যদি ভাষণ তৈরি করতে হয, তাহলে তো হয়ে গেল। কেউ হয়তো ভাষণ তৈরি করে দিয়েছে আর তিনি সেটা পড়ে দিয়েছেন। অন্য মন্ত্রীদেরও এমন করতে দেখা গেছে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তো একবার হমীরপুরের ভাষণ ঝাঁসীতে আর ঝাঁসীর ভাষণ হমীরপুরে পড়ে দিয়েছিলেন,যা শুনে লোকেরা খুব অবাক হয়েছিল। সেদিন সন্ধেবেলা শহরে এক সর্বজনীন সভায় বলতে হলো। হিন্দি পরিষদ আমাকে আর পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্লকে মানপত্র দিল।

এদিক দিয়ে দুটি মাত্র ট্রেন যায় তাই খুব কষ্টে দৌড়াদৌড়ি করে রাত সাড়ে এগারোটার ট্রেন ধরলাম। রাস্তায় তিন ঘণ্টা লেট ছিল, তাই প্রয়াগ যাবার ট্রেন পাবার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলাম। ১৬ তারিখ নটার সময় আমরা কটনী পৌঁছলাম। সারাদিনের জন্য কটনীতে পড়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। কটনী আমাদের দেশের অসাধারণ ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক ড· হীরালালের জন্মভূমি। তিনি কতবার আমাকে এখানে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করেছেন। ড· জয়সওয়াল আর ড· হীরালাল সমধর্মী ছিলেন। ঘটনাচক্রে দুজন একই বংশের রত্ন ছিলেন। ড· হীরালালের জীবিত অবস্থায় আমি তাঁর

[১] মধ্য-ভারতে অবস্থিত একটি নগরের প্রাচীন নাম।—সম·

বাড়িতে যেতে পারিনি। এবার এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে আমি সেখানে যাওয়াটা জরুরি মনে করলাম। কলচুরি ইতিহাসের তিনি অসাধারণ বোদ্ধা ছিলেন। দুঃখ হয়, তাঁর জ্ঞানরাশিকে তিনি কাগজে লিখে যেতে পারেননি। তাঁর গ্রন্থাগার দেখলাম। হীরালালজীর ভাইপো এখন তার মালিক। তিনিও ভাবছিলেন। আর আমিও জোর দিলাম যে, এই বইগুলো সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া উচিত, সেখানে এগুলোর সদ্ব্যবহার হতে পারে এবং এই বই ও বইয়ের সংগ্রাহকদের নামও রক্ষিত হতে পারে।

লোকেরা জানতে পারায় সাহিত্যানুরাগীদের সমাবেশ হয়ে গেল, সেখানে বলতে হলো। সব শেষে রাত্রে সর্বজনীন সভায় বললাম। কতবার কটনীর ওপর দিয়ে গেছি, কিন্তু কটনী শহর দেখার এবারই সুযোগ হলো। এখানে কাছেই সিমেন্ট কারখানা, আরো অন্য জিনিসের উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। বীনা, প্রয়াগ, জব্বলপুর, বিলাসপুর-এর রেলওয়ে লাইনের জংশন হওয়ায় শহরটির যাতায়াতের খুব সুবিধে আছে।

১৭ জানুয়ারি সকাল ছটায় পৌঁছে শ্রীনিবাসজীর বাড়ি গেলাম। আজই সারনাথ চলে যেতে হতো। কাল স্থায়ী সমিতির বৈঠক হয়েছিল। সম্মেলনে দলাদলি কিছুটা উগ্ররূপ ধারণ করছিল, ক্ষমতাসীন দল টাকার থেকে লাভ করতে চাইছিল। পণ্ডিত বলভদ্র মিশ্র খুবই খাঁটি এবং কড়া মানুষ, শুধু তাঁর ওপরই আশা ছিল। পরিভাষা কোষের কাজেও বাধার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এখন থেকে হাত-পা ছেড়ে দেওয়াটা আমার পছন্দ ছিল না। ঠিক করলাম, যতক্ষণ কাজ চালানো সম্ভব হবে, চালিয়ে যাব।

সন্ধে ছটার গাড়ি ধরলাম। নাট্যকার পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্রও সেই ট্রেনে যাচ্ছিলেন। তাঁর মহাকাব্য 'সেনাপতি কর্ণ' লেখা আরো একটু এগিয়েছিল। ট্রেনে তার থেকে অনেক অংশ তিনি শোনালেন। খুব ভাল লাগল। মনে হচ্ছিল, কেন মিশ্রজী সেটা তাড়াতাড়ি শেষ করে দিচ্ছেন না। রাত এগারোটার সময় সারনাথ পৌঁছলাম। এমন সময় জিনিসপত্র নিয়ে যাবার লোক কোথায় পাব? জিনিসপত্র বয়ে ধর্মশালা পর্যন্ত পৌঁছনো সহজ ছিল না। কোনোরকমে রাস্তার ছাউনির দরজা পর্যন্ত পৌঁছলাম, সেখানেই প্লাটফর্মের বাইরে শুয়ে পড়লাম।

১৮ তারিখ সকালে লল্লনকে পাঠিয়ে লোক ডাকালাম, তবে জিনিসপত্র নিয়ে থাকার জায়গায় পৌঁছলাম। লল্লন চিঠি পেল, মা অসুস্থ, সে চলে গেল। আবার সেই লিপিকারের সমস্যা। শ্রীঅবধবিহারীসিংহ 'সুমন' আসার জন্য ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন, তাঁকেই আসার জন্য চিঠি দিলাম। এই সময়ের মধ্যে মহাবোধি সভার গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় বইপত্র নিয়ে দেখতে থাকলাম। স্বামী সচ্চিদানন্দর সঙ্গেও কথাবার্তা হতে থাকল। তাঁর নৈরাশ্যকে মুখের কথায় দূর করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তবুও চেষ্টা করতাম। নিজের থেকেও বেশি তিনি জগৎ সম্বন্ধে নিরাশ ছিলেন। বলছিলেন, 'ধর্মের প্রতি এখন আর কারো শ্রদ্ধা নেই, সর্বত্র নির্ভেজাল বঞ্চনা চোখে পড়ে।' তাঁর চিন্তা, কিভাবে তাড়াতাড়ি জীবন শেষ হয়। আমি তো মনে করি, জীবনের চিন্তাই করা উচিত, জীবন-সমাপ্তির আবার চিন্তা কি?

এবারের গ্রাম-পঞ্চায়েতের নির্বাচনের ব্যাপারে যে সব কথা কানে এলো, তার থেকে

বুঝতে পারলাম, হাওয়া পালটেছে। অন্ততপক্ষে শহরের কাছাকাছি এই গ্রামগুলির পিছিয়ে থাকা লোকেদের ভেতরে কিছুটা আত্মচেতনা এসেছে। একটি গ্রামের ১১জন পঞ্চ-এর মধ্যে ৪জন অছুতদের মধ্যে থেকে এসেছে (অছুতদের জন্য আগের থেকেই সিট রিজার্ভ ছিল), বাকি ৭জনের মধ্যেও ছুত-অছুত দুই শোষিত একই ভাষায় কথা বলছিল।

২০ জানুয়ারি সকালে সুমনজী এসে পড়লেন। লেখার কাজ আবার শুরু হলো, এবং আগের থেকেও ভালভাবে।

বক্সার—বক্সারে জেলা হিন্দি সম্মেলন হচ্ছিল। তার সভাপতি হয়ে আমার যাবার কথা। ২১ তারিখ এক্কায় করে বেনারস ক্যান্টনমেন্টে বেলা দুটোর গাড়ি ধরলাম। চারটের কাছাকাছি আমরা দুজন বক্সারে পৌছে গেলাম। সুমনজী এই জেলারই বাসিন্দা। আমার দুবার জেলযাত্রার সময়ে আমি বক্সারে এসেছিলাম, তার ২৬ বছর পার হয়ে গিয়েছিল। সেসময় রেলযাত্রা সুখপ্রদ ছিল না, বিশেষ করে তৃতীয় শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীতেও একজন পুরনো শেঠ যাত্রা করছিলেন। তিনি সারা বাড়িটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। জিনিসপত্রের ঠেলায় সেখানে নড়াচড়ার সুযোগ ছিল না। আমরা সম্মেলনের একদিন আগে পৌছেছিলাম। এখনও প্যান্ডেলও তৈরি হয়নি। ২৬ বছর আগে ঘটে যাওয়া কংগ্রেসের কথা মনে পড়তে লাগল। সেখানেও প্যান্ডেল তৈরি করতে এমনি ঢিলেমি হয়েছিল। আর একবার ভয় হয়েছিল হয়তো মঞ্চ তৈরিই হবে না। মহারাজকুমার দুর্গাশঙ্কর সিংহ সম্মেলনের কর্তা ছিলেন। তাঁর কোনো পাত্তাই ছিল না। আমাদের সেদিনই আসার দরকার ছিল। যাইহোক, গিয়ে ডাকবাংলোয় উঠলাম। বক্সারেও একটি ভেঙে পড়া পুরনো দুর্গ আছে, যার কাছে বহুদূর পর্যন্ত পুরনো জনবসতির ধ্বংসাবশেষ আছে। সঙ্গে সুমনজী এবং অন্যরাও ছিলেন। পুরনো ধ্বংসাবশেষের জায়গায় জায়গায় কিছু মন্দির আর কিছু ধসে-পড়া বাড়ি ছিল। এর নাম চরিত্রবন কেন হলো? লোক একে চিতরথবন (স্বর্গোদ্যান) বলে। এখানে আচার্যদেরও কিছু থান আছে। উত্তর দিকটা তো বৈরাগীদের হাতে ছিল, তাহলে এই রামানুজী আচার্য কোথা হঠাৎ থেকে এসে পড়ল? সূর্যপুরার রাজা আর ডোমারায়ের মন্দির জমিদারি উঠে যাবার আগেই ধসে পড়তে শুরু করেছিল, এখন কে জানে আরো কোন কোনটা ভেঙে পড়বে!

গঙ্গার ধারে ধারে নৌকোয় করে গেলাম। জায়গায় জায়গায় মেখলা পরানো কুয়ো দেখিয়ে আমাদের সঙ্গীরা বলছিলেন, বিশ্বামিত্র ঋষির যে যজ্ঞ রক্ষার জন্য রাম-লক্ষ্মণ এসেছিলেন, এগুলো সেই যজ্ঞের কুণ্ড। আমার পক্ষে হাসি চেপে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ল। যজ্ঞের জন্য ডজন ডজন কুয়োর কি দরকার? আমি জানালাম যে এগুলি যজ্ঞ-কূপ নয়, গূথকূপ। সে সময়ের লোকেরা আমাদের থেকে বেশি পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় ছিল, তাই আশপাশ নোংরা না করে নিজেদের ঘরের ভেতর পায়খানা বানিয়ে সেখানেই মলত্যাগ করত। শ্রোতারা বড়ই হতাশ হলো। অনেক পরিশ্রম করে তৈরি করা বিশ্বামিত্রের যজ্ঞের চিহ্ন অন্যকিছু বলে প্রমাণিত হলো।

২২ তারিখ হাঁটতে হাঁটতে দুমাইল পূর্বোত্তরে কতকৌলিয়া গেলাম। এখানেই ইংরেজ

কোম্পানি পলাশী যুদ্ধের সাত বছর পরে দ্বিতীয় নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ জিতেছিল, যার স্মারক এখানে দাঁড়িয়ে ছিল। স্মারকে লেখা ছিল, 'অযোধ্যা নবাব-উজীর সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে বক্সার যুদ্ধে মেজর হেক্টর মনরোর বিজয়ের স্মারক, যা এই ময়দানে ১৭৬৪-র ২৩ অক্টোবর লড়া হয়েছিল, আর যার দ্বারা ইংরেজরা অন্তত বাংলা, বিহার আর উড়িষ্যার দেওয়ানী পেয়েছিল।' (To commemorate the victory of Major Hector Munrow over Shuza-U-daula Nawab-Wazir of Oudn in the battle of Buxar faught on this field on 23rd October 1764 A.D. by which the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa was finally won for the British.)

স্মারকের চারদিকে ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, বাংলাতে এই কথা লেখা আছে। এই স্মারকের ওপর ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট, ইংরেজরা যাবার পর, জনতার যুদ্ধ আর কুঁবরসিংহের পরাক্রমের কথা লেখা যেতে পারে। আমাদের বাংলোর অনতিদূরে ইংরেজদের পুরনো কবরস্থান ছিল। চৌকিদার মাসিক ৪২ টাকা মাইনে পেত। মড়াদের পাহারা দেবার জন্য কতকাল এখানে চৌকিদার রাখা হবে?

তিনটের থেকে সম্মেলন শুরু হলো। বাবু দুর্গাশঙ্করজী অধ্যক্ষের ভাষণ দিলেন আর আমি দিলাম সভাপতির মৌখিক ভাষণ। রাতে সংগীত-সভার আয়োজন ছিল। বেনারসের প্রখ্যাত তবলাবাদক কণ্ঠে মহারাজের তবলা শুনে খুব আনন্দ হলো। ওস্তাদী কলাবাজীতে আমার অনীহা, তাই তার রস নিতে পারলাম না। বক্সারে বাঁদরের অত্যাচারে লোকেদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। কয়েক বছর আগে কোনো একজন সাবডিভিশনাল অফিসার বলেছিল যে, এখান থেকে বাঁদর হটিয়ে দেওয়া উচিত। সেই সময় ধর্ম-ধুরন্দরেরা হনুমানজীর সেনার প্রতি এমন অত্যাচার হওয়াটা পছন্দ করেনি। বিরোধের ভয়ে অফিসার সেই চিন্তা ছেড়ে দেয়। তখন থেকে চক্রবৃদ্ধি হারে বানরের সংখ্যা বেড়েছে। এখন বক্সার শহরের জনসংখ্যার থেকে তাদের জনসংখ্যা কম নয়। বাঁদরের জ্বালায় সমস্ত খাপরা ভেঙে গেছে। আগে রাতে বাঁদররা গাছের ওপর গুটিয়ে শুয়ে থাকত, এখন তারা রাতে খাবারের খোঁজে বেরোয়। একটু গাফিলতি হলোই মেখে রাখা আটা অথবা যা কিছু হাতে পায়, নিয়ে পালায়। ছোট ছোট অনেক বাচ্চাকে তারা কামড়েও দিয়েছে। আশেপাশের গ্রামের চাষাদের ফসল বাঁচানোর পথ নেই। কত খেতের বীজ পর্যন্ত তারা বেছে বেছে খেয়ে নেয়, আর পাকলে পরে তো হনুমানজীর সমস্ত পল্টন সেখানে খুঁটি গেড়ে বসে যায়। আমি আমার ভাষণে বানর-যজ্ঞ করার কথা বললাম: এদের শুধু এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছেড়ে দিলে চলবে না, বরং পুরোপুরি বানরমেধই বাঁচার একমাত্র রাস্তা। মনে হলো, পুরনো ধর্ম-ধুরন্ধরদের নামমাত্রও আর অবশিষ্ট নেই, নয়ত বানরযজ্ঞের বিরোধিতা করে আওয়াজ উঠত।

ভোরবেলা কিরাতপুরার দিকে হাঁটতে গেলাম। সুমনজীও সঙ্গে ছিলেন। সুমনজী একজন রাজনৈতিক কর্মী এবং ভোজপুরী ভাষার লেখক। কিরাতপুরায় সকরবার ভূমিহারেরা থাকে। তারা নিজেদের ফতেহাবাদ থেকে আগত বলে জানায়। ভূমিহার একটি ঐতিহাসিক জাতি, এদের পরম্পরা থেকে ইতিহাসের ওপর আলোকপাত হতে

পারে। কিন্তু সেটা তো একজন মানুষের সারা জীবনের কাজ। এক-একটি গ্রামে গিয়ে তাদের উৎপত্তি স্থান, আর প্রাচীন মৌখিক পরম্পরাগুলি জোগাড় করতে হবে, তারপর হাজার হাজার পাতা লিখে ফেলার পর কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যাবে।

২৩ জানুয়ারি রোববার সম্মেলনের ধূম লেগে গেল। গল্প-সম্মেলন, রাজনীতি-ইতিহাস-সম্মেলন, শাহাবাদ ভোজপুরী-সম্মেলন, কবি-সম্মেলন সবকিছু হতে থাকল। ভোজপুরী-সম্মেলনের উদ্ঘাটন আমাকে করতে হলো, সভাপতি ছিলেন পরমহংসরায়। ড· উদয়নারায়ণ তেওয়ারীও বললেন। বাইরে থেকে আসা কবিদের মধ্যে শ্রীবচ্চনজী এবং বিস্মিল ইলাহাবাদী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য কবিরা তাঁদের কবিতা পড়লেন। চার ঘণ্টা ধরে সম্মেলন চলল। বচ্চনজীর কবিতার আমি বিশেষভাবে প্রশংসা করি। সর্বগ্রাহ্য ভাষায় কবিতা লিখতে তিনি জানেন। সংস্কৃততে ভারাক্রান্ত ভাষার মোহে তিনি পড়েননি, এ বড়ই আনন্দের কথা। সংস্কৃত চাপালে আর ছন্দ মেলালেই ভাল কবিতা হয় না। বিস্মিলজীর শেরগুলি খুবই ঔৎসুক্য জাগানো ছিল, আর তাঁর বলার ঢং ছিল আরোই সুন্দর। তাঁর মধ্যে আমি ইরানীদের নিজস্ব ফারসী গজল পড়াব ঢং-এর আভাস পেতাম—বিস্মিল সম্ভবত কখনও ফারসী কবি-সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেননি, ইরান যাবার তো কথাই নেই। বিস্মিলজীর নিমন্ত্রণ এখনও অপেক্ষা করছে। নিরালাজী তাঁর মাংস-রন্ধন শিল্পের প্রয়োগ আমার জন্য একাধিকবার করেছেন। বিস্মিলজী যখন তারিফ করতেন তখন জিভে জল এসে যেত। যারা খায় তারা সবাই মাংস চেনে না। বিশেষ বিশেষ অংশের পাঁঠার মাংসের বিশেষ মহত্ব আছে, আবার তাদের রান্না করারও বিশেষ নিয়ম আছে। বিস্মিলজী বললেন, 'একদিন আসুন, আমি মাংস রান্না করে খাওয়াবো।' তখন থেকে বহুবার এলাহাবাদ গিয়েছি, মাসের পর মাস থেকেছি, কিন্তু কখনও তেমন যোগাযোগ হয়নি যে, আমি বিস্মিলজীর হাতের রান্না মাংস খাই।

বক্সারের সম্মেলনের জন্য কম টাকা খরচ করা হয়নি, কিন্তু কোথাও কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সময়মত খাবার পাওয়া যেত না, যা পাওয়া যেত তাও যেমন-তেমন। শেষে তো সীমা ছাড়িয়ে গেল। বারোটা পর্যন্ত কবি সম্মেলন হতে থাকল। অতিথিদের স্টেশনে গিয়ে গাড়ি ধরার ছিল, কিন্তু খোঁজখবর নেবার জন্য কেউ ছিল না। এ এমনই উপেক্ষা, যে তাদের মধ্যে কেউ আর বক্সার আসার নাম করছিল না। দিনের বেলা ছাড়া পেলে একা খুঁজলে পাওয়া যেত, মাল নিয়ে যাবার জন্য লোকও পাওয়া যেত কিন্তু মাঝরাতে কি করা যেত? আমি মীরাটের সঙ্গে এর তুলনা করছিলাম। খাবারের কি সুন্দর ব্যবস্থা মহিলারা করেছিল। বিস্মিল তাঁর গুরু নুহ নারবীর একটি কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন যে, সাতজন মানুষের সবশেষে দুর্গতি হয়, যার মধ্যে কবিতা পড়ে ফেলা কবি আর বিদায় নেওয়া বরযাত্রীও আছে। কিন্তু আমি মনে করি, সেইদিনটির জন্য বক্সারের প্রতি এই মনোভাব পোষণ করা উচিত নয়। যাইহোক, বক্সারের সেই প্রজন্ম তো চিরকাল থাকবে না। প্রত্যেক প্রজন্মই কি তাদের আগের প্রজন্মের দুর্গুণ বহন করে?

সারনাথ—রাত্রে সমস্ত কবি এবং অন্য অতিথিরা স্টেশনে বসে ট্রেনের প্রতীক্ষা করতে

করতে টক-মিষ্টি কথায় বক্সার সম্মেলনের আলোচনা করছিল। এইসময় ট্রেন পাওয়া গেল। বেনারস স্টেশনে রিকশা নিলাম এবং ছটা বাজার আগেই সুমনজীর সঙ্গে সারনাথ পৌঁছে গেলাম। পড়া আর লেখাই কাজ ছিল। সুমনজী খুবই তৎপর ছিলেন। সবসময় কাজে লেগে পড়ার জন্য তৈরি থাকতেন। লিখতেন খুব পরিষ্কার, আর হিন্দিতে তাঁর যোগ্যতা ছিল বলে ভুল হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। এখন আমি 'বৌদ্ধ সংস্কৃতি' সম্পূর্ণ করার জন্য নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

এইসময় চীনে যে সব ঘটনা ঘটছিল, সে সম্বন্ধে সব জায়গায় খুব আলোচনা হচ্ছিল। চীনে কমিউনিস্টরা চিয়াং-কাই-শেককে তাড়িয়ে দিতে সফল হয়েছিল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল চীনও রাশিয়ার পথে যেতে বসেছে। সেইসময় পর্যন্ত জনসংখ্যা ৪০-৪৫ কোটি বলা হতো, সুব্যবস্থিত জনগণনার পরে যা ৬০ কোটি প্রমাণিত হলো। এতো বিশাল জনতা কমিউনিজমের পথে চলে গেলে সারা দুনিয়ার বিরোধীদের চোখের ঘুম নষ্ট না হয়ে কি পারে? অনেকেই মনে করে যে কমিউনিজম (সাম্যবাদ) বাদ দিয়ে মুক্তির আর কোনো রাস্তা নেই। নতুন চীনকে স্বাগত জানানোর জন্য আমার মত তারাও প্রস্তুত ছিল। যারা নিজেদের স্বার্থের কারণে বিরোধী ছিল, তারা সবরকমে হাত-পা ছুঁড়ে প্রবাহকে ঠেকাতে চাইত, কিন্তু ভেঙে পড়া আকাশকে কি পঙ্গপাল তার পায়ের জোরে আটকাতে পারে? এই দুইয়ের পরে তৃতীয় একটি শ্রেণী ছিল—ইন্দোচীন আর বর্মাকেও আর বেশিদিন কমিউনিস্ট হওয়া থেকে ঠেকানো যাবে না। তারপর ভারতের ভাগ্যেও তাই আছে। ভারতের কর্ণধার আন্তর্জাতিক রাজনীতির চিন্তায় দুর্বল। রাষ্ট্রের ভেতর শুধু দমনই তার একমাত্র হাতিয়ার। হায়দ্রাবাদে হাজার হাজার কৃষকের ছেলেদের রক্তে তিনি হাত লাল করছেন। দেশের আর্থিক সমস্যার সামনে মনে হয় তার পক্ষাঘাত হয়েছিল। প্রতিটি নেতা নিজের আর তার বন্ধু-বান্ধবদের ঘর ভরতে ব্যস্ত ছিল। শেঠরা এই লুঠে ছিল সবার আগে। তাদের সবরকমে খুশি রাখার চেষ্টা আমাদের নেতারা করছিল। এই লুঠের পরিণামস্বরূপ আর্থিক সংকটের ভয়ংকর ঘূর্ণিতে জনতাকে পড়তেই হতো। তারা নির্বাক থেকে নিজেদের অসন্তোষের ক্রোধ সংবরণ করে থাকছিল। খাদ্যসমস্যা সবচেয়ে বেশি ছিল, কোথাও গেলে প্রথমে এদিকেই দৃষ্টি যেত, আর কারোর অতিথি হতে ইচ্ছে করত না। খাদ্য সমস্যার কি সমাধান করা যায় না? আজ সাত বছর পরেও এই সমস্যার সমাধান হয়নি বলা যায়। বাইরে থেকে এখন নামমাত্র খাদ্য-শস্য আমদানি করা হয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেকে তার শরীরের প্রয়োজনীয় খাদ্য পাচ্ছে। আমাদের অর্ধেক লোক আধপেটা খেতে আর অভুক্ত থাকতে রাজি, তাই মিথ্যে এই 'খাদ্য-শস্যে স্বনির্ভর' হবার ব্যাপার।

২৬ জানুয়ারি ১৬-১৭ বছর পরে সিংহল-ভিক্ষু ভদন্ত দেবানন্দ স্থবিরের দেখা পেলাম। এখন খুব বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি আমার সেইসব সংস্কৃত পড়ুয়া ছাত্রদের একজন ছিলেন, যারা নিয়ম করে সময় দিত—নিজেদের পড়াতেও এবং আমাকে পালি পড়ানোতেও। ভারতের তীর্থযাত্রায় তিনি একা বেরিয়েছিলেন। নিজের মাতৃভাষা সিংহলী কিন্তু পালি আর সংস্কৃত ছাড়াও খুব অল্প কিছু হিন্দি শব্দও জানতেন, তারই সাহায্যে

কলকাতা থেকে সারনাথ পৌছে গেছেন। সিংহলে যদিও কয়েক লক্ষ ভারতীয় থাকে, কিন্তু তারা সকলেই তামিলভাষী, তাই তাদের সংস্পর্শে থেকে হিন্দি জানার সুবিধে নেই। উত্তর-ভারতের মজুর কলকাতা বোম্বাই পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে, দ্বীপান্তরেও লাখ লাখ সংখ্যায় চলে গেছে, কিন্তু প্রতিবেশী মাদ্রাজের তামিলভাষী সস্তা মজুর শত শত বছর ধরে সেখানে যাচ্ছে, তাই সেখানে উত্তর-ভারতীয়দের জায়গা হয়নি।

২৭ জানুয়ারি হাঁটার জন্য লমহী-ললাম-এর দিকে গেলাম। জায়গাটা সারনাথের দু-আড়াই মাইল পশ্চিমে। লাল (কায়স্থ)-দের বস্তি বলে একে লমহ্-ললানও বলে। অমর কথাশিল্পী প্রেমচন্দের এটাই জন্মভূমি। যদিও কাজের সুবিধের জন্য তিনি বেনারসে থাকতেন, কিন্তু নিজের লমহীর প্রতি তাঁর খুব ভালবাসা ছিল। তাই দোতলা বাড়ি বানিয়েছিলেন। এখন ছমাসে নমাসে কখনও কখনও শিবরানী দেবী আসেন। অমৃত আর শ্রীপতির ব্যাপারে লোকেদের অভিযোগ যে তাঁরা কখনও আসেন না। গ্রামে জন্ম নেওয়া যোগ্য পুরুষ এইভাবে গ্রাম ত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু কি করা যায়? আমাদের গ্রামগুলিতে সাংস্কৃতিক জীবন কাটানোর কোনো উপকরণ নেই, শহরে তার সুবিধে আছে। প্রেমচন্দজীর দুই সুপুত্রের যখন বেনারসকে দিয়েও আর কাজ হলো না, তখন প্রকাশনার কাজ সহজ দেখে তাঁরা প্রয়াগে চলে গেলেন। শিবরানীজী এখনও বেনারসেই থাকেন।

লমহীকে একটি পুরনো গ্রাম মনে হয়। তার বিচিত্র নাম থেকেও তা বোঝা যায়। সেখানে দশম-একাদশ শতাব্দীর একটি স্ত্রীমূর্তির খণ্ডিত মস্তকও সেকথাই বলছিল। খণ্ডিত মস্তকটি এখন পাটনা মিউজিয়ামে আছে। ফেরার সময় বডহরবা বাবা নামে দাঁড়ানো একটি গুপ্তযুগের ছোট বুদ্ধমূর্তি দেখলাম। একশো বছর আগে সারনাথের আশেপাশে কয়েকশো মূর্তি হয়তো ছিল। এখন কোথাও কোথাও তার কিছু অবশিষ্ট আছে। লমহীর পাশেই আছে মঢ়বা গ্রাম, এটিও তার নামের মধ্যে দিয়ে প্রাচীনতার কথা জানাচ্ছে।

সেইদিনই লাসার জেনারেল শোগাঙ্ তাঁর স্ত্রী, পুত্র, বোন, ভাগ্নে আর পবিচারকদের সঙ্গে সারনাথ এলেন। চীনে চিয়াং-কাই-শেককে সাফ করা হচ্ছিল। এটা নিশ্চিত ছিল যে, তিব্বতও চীনা গণরাজ্যের অভিন্ন অঙ্গ হবে। চিয়াং-কাই-শেক থাকতে যদি চীন এমন করত, তাহলে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের কোনো আপত্তি হতো না। কিন্তু কমিউনিস্ট চীন আসুক, এটা বরদাস্ত করতে আমেরিকা আর ইংল্যান্ড রাজি ছিল না। তারা এখনও সেখানে নিজেদের লোক বসিয়ে রেখেছিল, যারা এখন ভারতের ভেতর দিয়েই সেখানে যেতে পারত। তিব্বতের জায়গীরদার আর ধনীরাও কমিউনিজমের সঙ্গ ধরতে রাজি ছিল না, তাই সেখানকার কিছু প্রভাবশালী লোকেদের প্রতিনিধি-দল আমেরিকা আর ইংল্যান্ডে ধর্না দিতে গিয়েছিল। জেনারেল শোগাঙ্ এই প্রতিনিধি-দলের সদস্য। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স হয়ে তিনি যখন বোম্বাইয়ে নামলেন তখন বাড়িশুদ্ধ সবাই তাঁকে স্বাগত জানাতে গিয়েছিল। শোগাঙ্ পরিবার তিব্বতের সবচেয়ে ধনী ও সবচেয়ে পুরনো সামন্ত পরিবার। তাঁর পিতা এখনও জীবিত ছিলেন, যদিও তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা দেখে তাঁর স্ত্রী দুধের থেকে মাছি বার করে ফেলার মত তাঁকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছেন।

জেনারেল শোগাঙের বড় ভাই লাসা সরকারের চারজন মন্ত্রীর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী মন্ত্রী, সবচেয়ে ছোট ভাই ভিক্ষু। লাসার যাত্রাগুলিতে এই পরিবার সবসময় আমাকে সাহায্য করার জন্য তৈরি থাকত। বলা বাহুল্য, এই পরিবারটির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। লাসা শহরের কেন্দ্রে তাঁদের লম্বা-চওড়া আর খুব উঁচু প্রাসাদ আছে। লাসাতে থাকাকালীন প্রতি সপ্তাহে আমি স্নান করার জন্য তাঁদের বাড়ি যেতাম। পনেরো বছর পরে আমি তাঁদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছিলাম, অনেক কথা জানার-শোনার ছিল।

পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা খুব চিন্তিত ছিল। তারা চাইছিল কোনোরকমেই তিব্বত যেন চীনের সঙ্গে মিশে না যায়। কিন্তু চাইলে কি হবে? শুধু চাইলেই কি চীনা মুক্তি-সেনাদের তিব্বতে আসা বন্ধ হতো? তিব্বতের না ছিল কোনো শিক্ষিত সেনা, না ছিল গুনে দেখার মতো হাতিয়ার অথবা টাকা। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা টাকা আর হাতিয়ার দিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সেগুলো ব্যবহার করতো কারা? আর সেই সাহায্য তিব্বতে তখনই পৌঁছতো যখন ভারত একমত হতো। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা বিশেষ করে ইংল্যান্ড এখনও মনে করতো, ভারত আমাদের প্রভুত্বে আছে, সে আমাদের কথা শুনবে। সেজন্য আমাদের নেতাদের অনেক উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে যাচ্ছে, 'তিব্বতে যে বিশেষ অধিকার আমরা লাভ করেছি তা তোমাদের দিয়ে দিয়েছি। দুশো বছরের এই উপার্জনকে এত সহজে কমিউনিস্টদের হাতে যেতে দিও না। তোমাদের ওপর কোনো আর্থিক বোঝা চাপবে না। টাকা আর হাতিয়ার আমরা দিচ্ছি, লোক তুমি দাও।' কিন্তু ভারতীয় নেতা কি ভাঙ খেয়ে বসে আছে যে, অর্ধেক আকাশে টাঙানো এই দুর্গম দেশে কাটা পড়বার জন্য নিজেদের লোক পাঠাবে? যত সৈন্য পাঠাবে তার থেকে দুগুণ-তিনগুণ মজুর মাল বইবার জন্য পাঠাতে হবে। দশ-বিশ হাজার সৈন্য দিয়ে সেখানে কোনো কাজও হবে না। চিয়াং-কাই-শেক-এর লাখ লাখ সৈন্য যাদের সামনে রোদ্দুরে মাখনের মতো গলে গেছে, সেখানে সামান্য ভারতীয় সৈন্য কি করতে পারত? এই ব্যাপারে দৃঢ়তার জন্য তিব্বতী প্রতিনিধি-দলের প্রচুর নালিশ ছিল, তবে জেনারেল শোগাঙ্ ভারতের অবস্থা খুব ভালো বুঝতেন।

আমার বন্ধু গেশে ধর্মবর্ধনের সম্বন্ধে আমি ভাবতাম যে, তিনি তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাধারার দায়ে এখনও লাসার জেলে পড়ে আছেন। জেনারেল জানালেন, 'তিনি এখন জেলের বাইরে আছেন। তবে হ্যাঁ, লাসার বাইরে যাবার অনুমতি তাঁর নেই। তিনি এখন তিব্বতের ইতিহাস লেখার কাজ করছেন।' আমি জেনারেলকে বোঝালাম, 'এই সাহিত্যিক, শিল্পী ও দার্শনিক মানুষটি অসাধারণ বিদ্বান। এই সময় এমনটি তিব্বতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই। কমিউনিস্টরা তিব্বতে না এসে থাকবে না, আর ইনি তাঁর বিচারধারার জন্য প্রধানদের মধ্যে একজন হবেন। তাই নিজের স্বার্থের চিন্তা করেও তাঁর সঙ্গে আপনাদের ভাল ব্যবহার করা উচিত।'

আজকের চীনে কমিউনিস্টদের নানকিং-এর চার মাইলে পৌঁছনোর কথা জানতে পারলাম। এও জানলাম যে, চিয়াং-কাই-শেকের কুয়োমিন্টাং-এর পলাতকরা কান্তনে পৌঁছচ্ছে। চীনের মাটিতে চিয়াং-কাই-শেকের দিন এখন গোণাগুনতি। আমেরিকা জলের

মতন কোটি কোটি নয়—কয়েক অর্বুদ ডলার ভাসিয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের জেনারেলও দিয়েছে। এখন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া চিয়াং-কাই-শেককে বাঁচানোর কোনো পথ নেই। আর তা করতে আমেরিকা রাজি নয়। দুনিয়ার শোষকদের এই রাজা এই বলে নিজের মনকে বোঝাচ্ছিল—চীনা কমিউনিস্টরা মস্কোর হাতে নাচবে না, হতে পারে দুইয়ের মধ্যে ভীষণ মনোমালিন্য হয়ে গেল।

পরের দিন জেনারেল শোগাঙ্ বলতে লাগলেন, 'চীনে কমিউনিস্টদের সাফল্য নিয়ে না আমাদের কোনো চিন্তা আছে, না ডেপুঙ্-এর ভিক্ষুদের।' চিন্তা নেই, তা হতে পারে না, কিন্তু তারা ভবিতব্যের সামনে মাথা নিচু করতে প্রস্তুত ছিল।

সেদিনই আমার সুপরিচিত সিংহলের ড· অধিকারম্ এলেন। খুবই মেধাবী, পালির তরুণ বিদ্বান। লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর হয়ে সিলোনোর কোনো কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েছেন। ভাল বিদ্বান, কিন্তু বুদ্ধিবাদী না হয়ে তিনি ভাবুকতায় ভেসে যাওয়া আদর্শবাদী পুরুষ। লন্ডনে থাকতে একবার হল্যান্ডে অ্যানী বেসান্টের বানিয়ে তোলা জগৎগুরু কৃষ্ণমূর্তির সম্মেলনে যান আর কৃষ্ণজীর উপদেশে অত্যন্ত প্রভাবিত হন। সতেরো বছর পরে আজও কৃষ্ণজীর প্রতি তেমনি শ্রদ্ধা দেখে আমি তো বলতে লাগলাম, 'ধন্য এই শ্রদ্ধা, ষোলো বছরে কি দুজনের বুদ্ধি একই রকম হয়েছে?' ড· অধিকারম্ এখন পড়ানোর কাজও ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি নিজের ভাষায় (সিংহলী) সাইন্সের ওপর বই লেখার কাজ হাতে নিয়েছেন। এতে আমি সম্পূর্ণভাবে একমত ছিলাম। আমি হিন্দি ভাষায় সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আনতে চাইছিলাম, যাতে আমাদের জনগণ তার সঙ্গে সহজে এবং তাড়াতাড়ি পরিচিত হতে পারে, সেইরকমভাবে সিংহলী ভাষাতেও সিংহলে কাজ করার প্রয়োজন আছে। আমার সময়ে তো ভারতের থেকেও বেশি সেখানে ইংরেজদের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু যে-সময় (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬) আমি এই পঙ্‌ক্তিগুলি লিখছি সে-সময় সেখানের শাসকদল সিংহলীকেই শ্রীলংকার সর্বেসর্বা ভাষা হিসেবে তৈরি করতে উঠেপড়ে লেগেছে। ড· অধিকারমের নিজের কাজের জন্য এখন বেশি সুবিধে হবে এতে সন্দেহ নেই। সিংহলে থাকতেও অধিকারমের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হতো, আর লন্ডনে ১৯৩২ সালে থাকার সময় তো আমরা একই বাড়িতে থাকতাম।

এইদিনই একজন শিক্ষিত পাগল এসে পড়ল। প্রথমে তার কথা প্রকৃতিস্থের মতই লাগছিল। সে একটাকা চাইল, দিয়ে দিলাম। তারপর সে এমন কথা বলতে লাগল, যার থেকে বুঝতে পারলাম যে তার মস্তিষ্ক হাত থেকে বেহাত হয়ে গেছে। যাবার নামই করছিল না। সত্যিসত্যি কোনো মানুষের মস্তিষ্ক বিকৃত হলে সে কতখানি বিদ্রূপের পাত্র হয়, তার মূল্য কত তুচ্ছ হয়ে যায় এবং মানুষের কাছে সে কতখানি বোঝা হয়ে ওঠে। ষাঁড়-মোষের নাকে নথ লাগিয়ে তাকে বশে আনা হয়, ঘোড়ার মুখে লাগাম তাকে বশে রাখতে সাহায্য করে। বিশালকায় হাতির জন্যও মাহুতের হাতে অঙ্কুশ থাকে, কিন্তু মানুষের জন্য তার মস্তিষ্ক ছাড়া নিয়ন্ত্রণের অন্য কোনো উপায় নেই।

৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আমি সারনাথে থাকলাম। রোজ সকালে আলাদা আলাদা দিকে ৬ মাইল হাঁটতে চলে যেতাম। একদিন টিলাগুলোর দিকে বেড়াতে গেলাম। টিলাকে

ওডাঝারও বলে, অর্থাৎ অসুররা বড় বড় ঝুড়িতে কোনো কাজের জন্য মাটি বয়েছিল, একটি ওডা (ঝুড়ি) কোনো একজায়গায় ঝেড়ে ফেলেছিল, যার থেকে এত বড় টিলা হয়েছে। এখানে নিচের খেতে কুষাণ যুগের ইঁট চোখে পড়ল।

শেষদিনে মহেশজী এলেন। তাঁর সঙ্গে আগের থেকেই চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। তিনি আমার সঙ্গে থেকে লেখার সঙ্গে সঙ্গে কিছু শিখতেও চাইছিলেন। সুমনজী আসার আগে যদি আসতেন, তাহলে থেকে যেতেন। যতক্ষণ তিনি নিজে থেকে না সরে যান, ততক্ষণ আমি তাঁকে সরাতে চাইছিলাম না। মহেশ ঘরে ফিরবেন না বলে যেন প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলেন। কি করা উচিত, এ কথা জিজ্ঞেস করায় আমি বললাম, 'হয় রোজগার করে পেট চালানোর সঙ্গে সঙ্গে অধ্যয়ন করে যাও, আর যদি তা থেকে বাঁচতে চাও, তবে সাধু হয়ে যাও। কষ্টের পরীক্ষার উনুনে যে পোড়েনি, সে পরিপক্ক হতে পারে না।' মহেশের জন্য বেনারসের বন্ধুদের কাছে কিছু পরিচয়পত্র লিখে দিলাম। তখন তো তিনি সাধু হবার জন্য খানিকটা তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে সেই পথ তাঁর ভাল মনে হয়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সারনাথের নিকটবর্তী গ্রামগুলি পাকা কোঠা ও ইটের বাড়িতে ভরে গিয়েছিল। এখানের রেশমি শাড়ি আর জরির কাজের খুব চাহিদা ছিল। দেশেও যুদ্ধের কারণে আসা অর্থের বন্যা আমাদের মেয়েদের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছিল, আর বিদেশীরাও কৌতূহলবশত তা চাইত। যারা এই কাজ করত তারা খুব ভাল দাম পাচ্ছিল। কুইরীরা শাক-সবজি চাষ করা ছেড়ে দিল আর বোনা ধরল। যার কাছে অল্প পুঁজি ছিল, সে কিছুদিন শহরে শিখে এসে নিজের ঘরে তাঁত বসাল। দশ-বারো বছরের ছেলেরা কাজ শিখতে এবং সুতো তুলতে বেনারসের কারিগরদের কাছে চলে যেত, যারা তাদের ১৪-১৫ টাকা মাসিক দিয়ে দিত। এখন এই রোজগারে ঠাণ্ডা পড়ে গিয়েছিল। নতুন তৈরি ঘরগুলির অবস্থা ভাল ছিল না।

সারনাথে থাকার সময় 'বৌদ্ধ সংস্কৃতি'র প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আমি লিখে ফেললাম, বাকি এক-তৃতীয়াংশ শান্তিনিকেতনে গিয়ে লেখার ছিল। তখন এরকমই মনে হয়েছিল, কিন্তু শান্তিনিকেতন যাবার পর বই আরো বড় হয়ে যায়।

১ ফেব্রুয়ারি সন্ধেবেলা আমি প্রয়াগে পৌঁছলাম। তৃতীয় দিন বসন্তপঞ্চমী ছিল। সঙ্গম-স্নানের জন্য লোকেদের ভীষণ ভিড় ছিল। রেলে প্রচুর বিনা টিকিটের যাত্রী উঠে পড়ত। এখন টিকিট কালেক্টরের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেইসঙ্গে ধরে সাজা দেবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটও যেতেন। এই ব্যবস্থা যদি না হতো তাহলে সম্ভবত প্রথম শ্রেণীতেও জায়গা পাওয়া যেত না। এদিকে আর একটা বোঝা মাথায় এসে চেপেছিল। 'জীবন-যাত্রা'র দ্বিতীয়-খণ্ড প্রেসে ছিল, আর তার অনেকগুলি পাতা মুদ্রক অথবা প্রকাশকের কৃপায় হারিয়ে গিয়েছিল। হারিয়ে যাওয়া গ্রন্থকে আবার লেখা লেখকের কাছে সবচেয়ে ঝামেলার ব্যাপার। কিন্তু, কি করার ছিল?

ড· বদরীনাথ প্রসাদের বাড়িতে সিওয়ান ডি· এ· বি· স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও হেডমাস্টার দাড়িবাবার সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর জীবন সত্যিকারের ত্যাগ ও তপস্যার জীবন ছিল।

তাঁরই অদম্য উৎসাহের ফলে সিওয়ান (ছাপরা)-এ দয়ানন্দ স্কুল খুলেছে এবং ক্রমশ বড় হয়ে ডিগ্রি কলেজ হয়েছে।

ফোটোগ্রাফি একটা কাজেরও জিনিস, আবার বড় খরচের শখও। 'আয়কো ফ্লেক্স' আমি কিনে ফেলেছিলাম। রাশিয়া থেকে আনা 'লায়কা' (ফেদ) হারিয়ে গিয়েছিল, তাই তেমনই একটা ক্যামেরার চিন্তা সবসময়ই মাথায় ঘুরতো। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দর যখন বললেন, 'কৌডক্কা লায়কা আমার কাছে আছে, যদি নিতে চান নিয়ে নিন, আমি আরো দামি ক্যামেরা নিতে চাই', আমি তখন পাঁচশো টাকায় সেটা কিনে নিলাম। সাত বছর হয়ে গেল সেটা আমার কাছে আছে। কিন্তু আমি খুব কমই ব্যবহার করেছি। কেনার পর অনেক খুঁজেও যখন এলাহাবাদে তার ফিল্ম পেলাম না, পাটনাতেও পেলাম না, তখন আমি নিজের ভুল বুঝতে পারছিলাম।

৩ ফেব্রুয়ারি ড· বদরীনাথ প্রসাদের বড় মেয়ে ইন্দুপ্রভার বিয়ে ছিল। এইজন্যই আমি বিশেষ করে প্রয়াগে এসে ছিলাম। ড· বদরীনাথ প্রসাদ আজমগড় জেলার বড় গ্রাম মহম্মদাবাদ-এর বাসিন্দা। আমারও পিতৃগ্রাম মহম্মদাবাদ তহসিলেই ছিল তাই আমাদের সম্পর্ক নিজের ঘরের মত ছিল। বরযাত্রীদের মধ্যে ১৮ জন লোক ছিল। মীরাটের বাসিন্দা বর ছিল একজন সাইন্সের সম্ভাবনাময় মেধাবী ছাত্র। সেইসময়ই সে এম· এস· সি· পাস ছিল, পরে পারমাণবিক পদার্থবিদ্যায় ডক্টর উপাধির জন্য নিজের বিষয়ে গবেষণা করেছে। বরযাত্রীদের মধ্যে দেশের লোক বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক, মহম্মদাবাদ থেকে তো সমস্ত পরিবারের লোক চলে এসেছিল। প্রথম মেয়ের বিয়ে, তাই খুবই উৎসাহের সঙ্গে তা করা হয়েছিল। আঙিনায় মণ্ডপ তৈরি করে সেটা সাজানো হয়েছিল। দুপক্ষের পরিবারই আর্যসমাজ দ্বারা প্রভাবিত ছিল, কিন্তু সংস্কারক সমাজগুলিতে সৌন্দর্যের দিকটিকে বড়ই অবহেলা করা হয়। তা পূরণ করার জন্য আচার-অনুষ্ঠানে কিছু জিনিস বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

পাটনা—৪ ফেব্রুয়ারি সম্মেলন-ভবনে গিয়ে পরিভাষা তৈরির গতিবিধি লক্ষ করলাম। ড· নখানে দর্শন-পরিভাষার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছিলেন, আর ইংরেজি শব্দের অনেক প্রতিশব্দও তৈরি করে ফেলেছিলেন। সেদিনই প্রয়াগ থেকে পাটনার উদ্দেশে রওনা হলাম। সুমনজী সঙ্গে ছিলেন। বৃষ্টি হচ্ছিল। ভিজতে ভিজতে আমাদের গাড়ি বদল করতে হলো।

৫ তারিখ ভোর পাঁচটার সময়ও বৃষ্টি হচ্ছিল। দশটার সময় আমরা পাটনা পৌঁছলাম। রিকশা নিয়ে দুজনে বীরেন্দ্রবাবুকে খুঁজতে বেরোলাম, কিন্তু তিনি বাড়িতে ছিলেন না। ঘটনাক্রমে কাছেই প্রফেসর দেবেন্দ্রনাথ শর্মার বাড়ি পাওয়া গেল। সমস্ত কাপড় প্রায় ভিজে গিয়েছিল। দেবেন্দ্রজীর বাড়িতে আমরা উঠলাম। দেবেন্দ্রজী ছাপরার বাসিন্দা, সেখানকার একজন খুব বড় সংস্কৃত-পণ্ডিতের ছেলে এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু পণ্ডিত গোরখনাথ ত্রিবেদীর জামাই। পিতার যোগ্য ছেলে ছিলেন তিনি। সংস্কৃতের সাহিত্যাচার্য তথা সাহিত্যে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। সমস্ত সংস্কৃত-পণ্ডিতরাই জানেন যে

—১৯৪৯—

আজকাল টাকাতেই সম্মান পাওয়া যায়। আর টাকা রোজগার করতে হলে ছেলেদের ইংরেজি পড়ানো উচিত। দেবেন্দ্রজী তাঁর কিছু রেডিও-নাটক শোনালেন। কাদম্বরীর 'পারিজাত-মঞ্জরী'র ওপর খুব সুন্দর একাঙ্ক লিখেছিলেন তিনি, যাতে বাণ-এর কাব্যসৌন্দর্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে রক্ষা করা হয়েছে। শাহজাদা সেলিম (জাহাঙ্গীর)-এর লেখা 'আবুল ফজল বধ'ও খুব মর্মস্পর্শী নাটক। তাঁর কলমে শক্তি আছে, আর শব্দের মূল্যায়নে সূক্ষ্ম বিবেচনার প্রতিভা অসাধারণ। সংস্কৃতের পণ্ডিত হবার ফলে তিনি শুধু করার জন্যই সংস্কৃত শব্দের অনুচিত মূল্যাঙ্কন করতেন না।

সন্ধেবেলা পাটনার কবি ও সাহিত্যিক কেসরী, নওলকিশোর আর নলিনজীর সঙ্গে কথাবার্তা হতে থাকল। ৬ তারিখ পাটনা শহরের গান্ধী সরোবরে বিহার হিতৈষী সভার পক্ষ থেকে নগর সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিকোৎসব হলো। উৎসবের উদ্ঘাটন আমাকে করতে হলো। সেখানে কবিরা কবিতা, গল্পকারেরা গল্প পড়লেন। পাটনা একান্তভাবেই হিন্দির শহর তাই সেখানকার তরুণদের মধ্যে এই উৎসাহ স্বাভাবিক। শহরের ধনীরাও এ বিষয়ে উৎসাহী। ইংরেজদের যাওয়া এখনও দেড় বছর হয়নি, তারা রাস্তাগুলির ইংরেজি নাম তুলে দিয়ে সে-জায়গায় ভারতীয় নাম রেখে দিয়েছে। পাটনার প্রধান রাস্তা এখন অশোক রাজপথ, যেটি গঙ্গার পাশে পাশে সমান্তরালভাবে পাটনা শহর থেকে বাঁকীপুরের এক প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। মঙ্গল রোড এখন গুরুগোবিন্দ পথ। শিখদের দশম গুরু গুরুগোবিন্দ পাটনাতেই জন্মেছিলেন, তাই পাটনার উচিত তার সুপুত্রকে সম্মান জানানো।

পরের দিন দশটার সময় সেনেট হলে এম· এ·-র ছাত্রদের সামনে রাজনীতির ওপর ভাষণ দিলাম। ছাত্রদের স্বেচ্ছাচারিতায় বুড়োরা এবং সরকার অসন্তুষ্ট। পাটনার কলেজগুলোকে তো এইজন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আর অভিভাবকদের একথা লিখে দিতে বলা হচ্ছে যে, ছেলেরা নিয়ম মেনে চলবে। ইংরেজ আমলের কাজের এত তাড়াতাড়ি পুনরাবৃত্তি হবে বলে আশা ছিল না।

৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধে ছটায় আমরা দিল্লী-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস ধরলাম। আমাদের প্রথম শ্রেণীর কম্পার্টমেন্টে আমি একাই ছিলাম। সুমনজী অন্য কামরায় বসেছিলেন। সারা রাতের যাত্রা। ট্রেনটা হাওড়া হয়ে শিয়ালদহ পৌঁছয়, আর এই লাইনেই শান্তিনিকেতনের স্টেশন বোলপুর পড়ে, তাই আমাদের জন্য এই ট্রেনটি সুবিধের ছিল। পরের দিন সাড়ে সাতটার সময় গাড়ি বোলপুর পৌঁছে গেল।

শান্তিনিকেতনে

স্টেশন থেকে সোজা শান্তিনিকেতন পৌঁছলাম। প্রথমেই কাজেব চিন্তা নিয়ে পড়লাম। বৃহত্তম ভারতের বিষয়ে যত বই শান্তিনিকেতনে আছে, তা কলকাতা ইউনিভার্সিটি ছাড়া

ভারতের আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তবুও এই বইগুলোকে পর্যাপ্ত বলা যায় না। এখন আমরা ২৫ তারিখ পর্যন্ত পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর অতিথি ছিলাম। দ্বিবেদীজীর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে থাকার সুযোগ এই প্রথম পেয়েছিলাম, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এর আগে তাঁর সঙ্গে আমার কম ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁর বিদ্যা, লেখনী এবং চিন্তাশক্তির আমি খুবই প্রশংসা করি। আমি বলতাম, 'হিন্দি সাহিত্যিকরা যখন এমন গভীরতা অর্জন করবে, তখন হিন্দি দ্রুত উন্নতি করবে।' দ্বিবেদীজীর পরিবারের সব ছেলেমেয়েরা আমাকে খুশি করতে এবং আমার সাহায্যের জন্য তৈরি থাকত। দ্বিবেদীজী নিজে সরজুপারী কুলের কলঙ্ক, যাদের আশীর্বাদ করে ঋষিরা বলেছেন, 'তোমাদের মাছ-মাংস খাওয়া উচিত,' তারা যদি আজ ঋষিবাক্যের বিরুদ্ধে যায়, সেটা কি কোনো ভাল কথা? তবে পরের প্রজন্ম আবার ঋষিদের পথে চলে এসেছে দেখে আনন্দ হলো। 'নামাংসো মধুপর্কো ভবতি' (বিনা মাংসে পূজ্য অতিথির সেবা সম্ভব নয়) ঋষিদের এই কথার সঙ্গে দ্বিবেদীজী একমত ছিলেন। বাংলাদেশে মাংসর থেকে বেশি বাঙালী ঢঙে রান্না মাছ ভাল লাগে। আমি সেখানে তাকেই প্রাধান্য দিচ্ছিলাম। এরকম সমধর্মী বন্ধুদের সঙ্গে কেন যে এত কম থাকার সুযোগ পাওয়া যায়, আমার তো সেটাই আক্ষেপ ছিল।

গরম আসতে আর বেশি দেরি ছিল না। মাথায় সবসময় এই কথাটাই ঘুরছিল—এবার কোথায় যাবো। অনীতে যাবার জন্য ড· ভগবানসিংহর নিমন্ত্রণ ছিল। বাংলার এক অংশে ছিলাম বলে কালিম্পংও তার দিকে টানছিল। ৯ তারিখের ডায়েরিতে আমি লিখেছিলাম, 'গরমে কালিম্পং যাওয়া যাক···। পাকিস্তান না গিয়েও কালিম্পং যাওয়া যেতে পারে···। সেখানে সম্ভবত শহরবাসীদেরও সময় দিতে হবে, কিন্তু লাভ আছে—গৃহস্থ হবার পাপ থেকে বেঁচে যাব। ধর্মোদয় সভার বাড়ি আছে।—অনীতে থাকলে কেরোসিন তেল, চাকর-বাকর এবং বই-রক্ষা করার চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যাব। তিব্বতী-সংস্কৃত-এরও কিছু কাজ হবে।' অনীতে গিয়ে এক জায়গায় ঘর বানিয়ে বসবাস করাকে আমি গৃহস্থ হওয়া বলেছিলাম, কিন্তু প্রকৃত অর্থে এ ব্যাপারটা কালিম্পঙেই হয়েছিল।

তখন কেরোসিন তেল একটা সমস্যা ছিল, দুর্লভ ছিল তা। শান্তিনিকেতনে তার প্রয়োজন ছিল না, রাত বারোটার পরে লেখাপড়ার কাজ যদি না থাকে। এবার হাঁটার নিয়ম রোজ সকালে পালন করা হতে লাগল। আমি পাঁচ-ছ মাইল চলে যেতাম। ১০ তারিখ শ্রীনিকেতন থেকে আরো এক মাইল দূরে গেলাম। সুমনজী সঙ্গে থাকতেন, কখনও কখনও অন্য ছাত্ররাও সঙ্গে চলে আসত। ১৬ ফেব্রুয়ারি অজয় নদের দিকে গেলাম। এক শতাব্দী আগে এই নদীটি গভীর ছিল এবং বড় বড় নৌকো এই নদী দিয়ে আসত। সমুদ্রের কাছে বালি-মাটিতে ভরে গিয়ে নদীর মুখ বন্ধ হয়ে গেছে, তাই স্রোত কমে গেছে। নদীও অন্তঃসলিলা হয়ে গেছে। এর ফলে একদিকে যেমন যাতায়াতের একটা সস্তা উপায় হাত থেকে চলে যাচ্ছে, অন্যদিকে ম্যালেরিয়ার প্রকোপও বেড়ে গেছে।

ভেবেছিলাম দশঘণ্টা লেখার আর ছ-ঘণ্টা বই পড়ে তথ্য সংগ্রহ করার কাজ করা যাবে। ১০ তারিখ জানা গেল, গান্ধীজীর হত্যাকারী গডসের ফাঁসির সাজা হয়েছে, আর অন্য অনেকের কঠিন সাজা হয়েছে। গডসে তো বস্তুতপক্ষে অপরের হাতের হাতিয়ার

হয়েছিল। সে অন্যের পেশোয়া হবার আকাঙ্খার বলি হয়েছে। দেড়শো বছর আগে ভারতের সমস্যার সমাধান করতে পেশোয়া যখন সফল হয়নি এবং তার জন্য গেছে, তাহলে এখন কি আর পেশোয়াকে পুনঃস্থাপিত করা সম্ভব? হিন্দিভাষী অঞ্চলে শহরের উচ্চজাতির মধ্যে যে প্রসার হয়েছে, তা ঘটেছিল প্রথমত মুসলিম লিগের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের বিরোধের জন্য আর এখন কংগ্রেসের প্রতি অসন্তোষই তার সম্বল।

১২ ফেব্রুয়ারি রাতের খাওয়া প্রফেসর তান্যুশান-এর বাড়িতে হলো। বহুবছর ধরে তিনি বিশ্বভারতীতে চীনা পড়াচ্ছেন, আর চীনা ও ভারতের প্রাচীন সম্বন্ধকে দৃঢ় করার সংকল্প নিয়েছেন। তাঁর পরিবার তখন চীনে গিয়েছিল, যাদের নিয়ে আসার জন্য তাঁর যাবার কথা ছিল। চীনাভবনে চীনা ভাষার এবং চীন সম্পর্কিত অন্য ভাষার বইয়েরও খুব ভাল সংগ্রহ আছে। প্রফেসর তান্যুশান-এর চেষ্টায় খুব বেশি মানুষ চীনা-সাহিত্যে উন্নতি করতে পারে নি, তার কারণ চীনা অক্ষরের কঠিনতা। যে ভাষার বই পড়তে গেলে পাঁচ-ছ হাজার অক্ষরের পরিচয় থাকাটা দরকার, তাতে কি করে মানুষের আগ্রহ ও উন্নতি হতে পারে? আমি নিজে চার-পাঁচশো শব্দ শিখতে শিখতে হাল ছেড়ে দিয়েছি। হতে পারে, যদি চীনে থাকতাম তবে শিখতে পারতাম। কিন্তু চীনের এই বর্ণমালা থেকে একটা বড় লাভ হলো যে, যদি অক্ষরগুলির অর্থ সংস্কৃততে বুঝি, তবে অনেক কিছুই সেইভাবে পড়তে পারি, যেভাবে সংখ্যার সংকেতের সাহায্যে শ্রীশান্তি ভিক্ষু তিব্বতী ও চীনা ভাষাতে যথেষ্ট উন্নতি করেছেন। এটা খুশির কথা।

আমি আমার নিয়ম অনুযায়ী রোববার ছুটি পালন করতাম, যা শান্তিনিকেতনে বুধবার হতো, তাই আমারও এখন সেই নিয়মই পালন করা উচিত ছিল। গরম বেড়ে গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে মশায় একেবারে ভর্তি হয়ে গেল। মশারির ভেতরে বসে কাজ করা সহজ নয়, কিন্তু কোনোরকমে চালিয়ে নিতেই হতো। একদিন আমার আর সুমনজীর জন্য কুর্তা, চাদর, আর তোয়ালের কাপড় কিনলাম। দর্জি চারাদিনে কুর্তা সেলাই করে দেবে বলল। দাম বেশি হলেও অন্যান্য দেশের থেকে আমাদের দেশ এখনও সস্তা।

১৫ ফেব্রুয়ারি পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর লক্ষ্ণৌ থেকে ডক্টর উপাধি পাওয়া উপলক্ষে সভা হলো। শান্তিনিকেতনের সভা থেকে আমি খুব প্রভাবিত হলাম। তাকে আধুনিক বলা উচিত না, আবার প্রাচীনও না অথবা এই দুইয়েরই অনেক অর্থহীন প্রথা থেকে তা মুক্ত ছিল। অত্যন্ত শৈল্পিক ঢঙে সুন্দর আলপনা দেওয়া হয়েছিল, যার ওপর আম্রমঞ্জরীসহ মাটির সুন্দর কলস রাখা হয়েছিল। তার থেকে একটু দূরে একটা হালকা লম্বামত চৌকির ওপর পুরোধা (সভাপতি) আর দু-একজন ব্যক্তি বসেছিলেন। শঙ্খধ্বনি দিয়ে সভার আরম্ভ ও সমাপ্তি হলো। আচার্য ক্ষিতি সেন পুরোধা ছিলেন। মাঝে মাঝে ভাষণের সঙ্গে মধুর সঙ্গীতও হচ্ছিল। এই একটি সভা থেকেই রবীন্দ্রের মহত্ব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। সর্বতোমুখী সাংস্কৃতিক প্রগতি কি ভাবে করা যায় বিশ্বভারতীর চেহারায় তিনি তা দেখিয়েছেন। আমার আফশোশ হচ্ছিল যে নিমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও মহাকবির জীবনকালে আমি এখানে আসতে পারিনি। সুযোগ হওয়া সত্ত্বেও আমি তাঁর দর্শন করতে পারিনি।

শান্তিনিকেতনের জ্যোৎস্না আমার খুব প্রখর আর সুন্দর মনে হতো। সম্ভবত ওখানের পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হবার জন্য আর মহাকবির সামনে উপস্থিত না হবার অপরাধের চিন্তা থেকে এমন হতো। সারারাত ধরে পাখিদের মনোহর কলরবের কথা আর কি বলব? কোকিলেরা তো অখণ্ড ব্রত নিয়ে ছিল। এই ঠাণ্ডার দেশের পাখিরা কেন গরমে এখানে মরতে আসে? আম্রকাননে এই সময়ে চারদিকে শুধু মঞ্জরী আর মঞ্জরী দেখা যেত, যার কাছে গেলে তার মধুর গন্ধ সত্যি সত্যি মনকে পাগল করে তুলত।

'বৌদ্ধ সংস্কৃতি' লেখায় আমি তন্ময় হয়ে ছিলাম। গ্রন্থাগারিক তথা বৃহত্তর ভারতের গভীর বিদ্বান শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নানাভাবে আমাকে সাহায্য করার জন্য তৈরি ছিলেন। তবুও পরিভাষা নির্মাণের কাজ থেকে আমার মন সরে যায়নি। বেনারস ইউনিভার্সিটির রামচরণজী যখন তাঁর চিঠিতে জানালেন যে, গ্লাস-টেকনোলজির কার্য-সম্বন্ধী পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ হয়ে গেছে, তখন খুব আনন্দ হলো।

প্রয়াগ আর পাটনায় এখনও শীত শেষ হয়নি, কিন্তু এখানে তো আসার সঙ্গে সঙ্গেই তা বিদায় নিয়েছিল। শান্তিনিকেতনের বাতাবরণে 'বৌদ্ধ সংস্কৃতি' লেখার সময় আমার খেয়াল হলো, এবার আমাদের অন্য চারধাম হওয়া উচিত, যার মধ্যে উত্তরে তুঙ্গহ্বাংগ, পূর্বে ওংকারভাট, দক্ষিণে বোরোবুদুর আর পশ্চিমে বামিয়ান থাকবে। এরপর ৬৮ তীর্থও বানাতে হবে, যেগুলি সমস্ত ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত দেশগুলিতে ছড়িয়ে থাকবে। শ্রদ্ধালু ভারতীয়রা এইসব তীর্থ ও ধামগুলি দর্শন করতে যাবে।

আমরা ম্যালেরিয়া-অঞ্চলের কাছাকাছি ছিলাম। মশাদের আক্রমণ সমানেচলছিল, তাই ২২ ফেব্রুয়ারি কাঁপিয়ে জ্বর এলো। আমি তার হাতে কুইনিনের দুটো বড়ি ধরিয়ে দিলাম, ভাবলাম, দেখি সে এতে তৃপ্ত হয়, না কাল আবার আসে। আসলে সেই সময়টা জ্বর অথবা অন্য কোনো জিনিসকে অভ্যর্থনা জানানোর সময় ছিল না। সকাল আটটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত, মাঝের দুঘণ্টা বাদ দিয়ে ১৪ ঘণ্টা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সুমনজীকে আমার অনেক ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজে লেগে ছিলেন। ষাঁড়ের জোড়ার মধ্যে একটা ষাঁড় যদি অলস হয় তাহলে কাজ হয় না। লেখা কপিগুলো শান্তিজী আবার পড়তেন, ভাষা আবার গোছাতেন এবং হেডিং ইত্যাদির পরামর্শ দিতেন।

২৩ তারিখ কলাভবনের নতুন বাড়ির ভিত্তিচিত্রগুলো দেখতে গেলাম। কবিগুরুর আশ্রম কবিতা ও শিল্পকলার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত শিল্পকলার প্রতি প্রেম আমার গভীর ছিল না, তাই এই পবিত্র স্থানের দেবতা রুষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। একটা ছবি দেখার জন্য আমি টুলের ওপর উঠেছিলাম, নামতে গিয়ে দেবতা আস্তে করে টুলটা বেঁকিয়ে দিলেন এবং আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। তবে দেবতা তাদের রোষ শুধু ঠাট্টা-তামাশার মধ্যে দিয়ে শেষ করতে চেয়েছিলেন, তাই শুধু তিন-চার জায়গায় চামড়া ছিঁড়ে গেল আর দু-জায়গায় রক্তের ফোঁটা পড়ল। সত্যিসত্যি সেই জায়গাটা এত সংকীর্ণ ছিল এবং নীচে এমন সব জিনিস ছিল, তার মধ্যে হঠাৎ পড়ে গিয়ে আমার মাথা ফাটতে পারত, হাড়ও ভাঙতে পারত। কবিগুরুর সংস্পর্শে আসার ফলে এখানকার দেবতাও অত নিষ্ঠুর হতে পারেন না। কত বছর ধরে কবি তাঁদের মধ্যে মানবতার প্রচার করেছেন,

তাহলে তার ফল হবে না কেন?

শান্তিনিকেতনে থেকে যেভাবে আমি নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তাতে মন খুলে সব জিনিস দেখার অসুবিধে ছিল। তবু সেদিকে আমার চোখ বন্ধ করে রাখিনি। প্রভাতবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য আমি বললাম, 'এই বই আপনাকেই উৎসর্গ করব।' প্রভাতবাবু তাঁর মুদ্রিত বহু লেখা আমাকে ব্যবহার করার জন্য দিলেন, যেগুলো মধ্য-এশিয়া সম্বন্ধে আমাকে অনেক জ্ঞানদান করল।

২৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধেবেলা আদ্যশ্রেণীর (১২ বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের) সভা দেখলাম। তাতে ভাষণ, প্রবন্ধ, গল্প, স্বরচিত ও অন্যের রচিত কবিতা পাঠ হলো। শ্রোতৃমণ্ডলী যথেষ্ট বড় ছিল। বাচ্চারা গানও গাইল, নাচও করল। আনন্দ প্রকাশ করার জন্য হাততালি দেবার বদলে শান্তিনিকেতনে 'সাধু, সাধু' বলা হয়। প্রাচীনকালেও এমনই করা হতো তাই 'সাধুবাদ' শব্দ আমাদের এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ধন্যবাদ'ও প্রাচীনকালে হর্ষ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য 'ধন্য, ধন্য'-র ভাবোদ্রেকেরই পরিচায়ক ছিল, যার অর্থ পুরোপুরি না বুঝে 'ধন্য ধন্য' বলার জায়গায় আমরা 'ধন্যবাদ' বলি। শান্তিনিকেতনে পূর্ণ মানবতার শিক্ষা দেবার চেষ্টা হচ্ছে। এখানে প্রাচীনতা আছে, কিন্তু মূঢ়তা নেই, নবীনতা আছে কিন্তু অগভীরতা নেই, কলা আছে কিন্তু কামুকতা নেই, স্বাতন্ত্র্য আছে কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলা নেই। এই ভাব মনে নিয়ে ২৫ ফেব্রুয়াবি সেখান থেকে বিদায় নিলাম।

ওয়ার্ধা—সেদিন সকাল সাতটায় বোলপুর স্টেশনে গেলাম। কবিবরের একমাত্র পুত্র বথীন্দ্রবাবুরও সেই ট্রেনেই যাবার ছিল। তিনি দেরিতে এলেন, জিনিসপত্র তোলা গেল না। রেলওয়ের একজন সাধারণ কর্মচারী বলল, 'যাঁর জন্য সবকিছু তাঁর জিনিস কি করে পড়ে থাকবে?' সত্যিসত্যি গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল। রথীন্দ্রর পিতাই তো বোলপুরের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তবে তাঁর জন্য কি এইটুকুও করা যায় না? সেই কামরাতেই রথীন্দ্রবাবু তাঁর স্ত্রী প্রতিমাদেবীর সঙ্গে উঠলেন। শান্তিনিকেতনে থেকেও আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারিনি তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা জরুরি। আমি কবিবরেরই বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া ছবি দেখে অভ্যস্ত ছিলাম, এখন তাঁর পুত্র আর পুত্রবধূকেও বৃদ্ধ দেখছিলাম। কেমনভাবে এক প্রজন্ম নিঃশব্দে আর এক প্রজন্মের পদানুসরণ করে। আমার সেসময় মনে হলো, বিশ্বভারতীতে বথীন্দ্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গোবিন্দ মালব্য, এইভাবে পিতার জায়গায় পুত্রের স্থান গ্রহণ করা হচ্ছে কেন? আমাদের দেশের কি এটা নিজস্ব কোনো অসুখ? সাধুদের মধ্যে বিশেষ করে প্রাচীনকালের নালন্দা, বিক্রমশীলা ইত্যাদি বিদ্যাপীঠে যোগ্য গুরুর জায়গায় যোগ্য শিষ্য বসত, আর তা সম্ভবও ছিল। কিন্তু যোগ্য পিতার পুত্রও যোগ্য হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। আমি এ কথা বলছি না যে, তিনজন তাঁদের পিতার যোগ্য সন্তান নয়, তবে এই প্রথা আমার ভাল লাগত না।

কলকাতা পৌঁছে আবার হাওড়া থেকে ওয়ার্ধার ট্রেন ধরার ছিল। খুব ভিড় ছিল। সুমনজীও জায়গা পেয়ে গেলেন। বিকেল চারটেয় আমরা সেখান থেকে রওনা হলাম।

২৬ তারিখের সকালে গাড়ি বিলাসপুরে দাঁড়িয়েছিল। আমি ভাবছিলাম বিলাসপুরের আগে রায়পুর পড়বে। যাইহোক, ছত্তিশগড়ের সবুজে ভরা পাহাড়ী অঞ্চলের ভেতর দিয়ে আমরা পশ্চিমের দিকে এগোতে লাগলাম। চারটের সময় নাগপুর আর ছটার সময় ওয়ার্ধা পৌঁছে গেলাম। রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির সম্মেলন চলছিল, যে কারণে আনন্দজীর আগ্রহে আমি এখানে এসেছিলাম। হিন্দি-নগরে পৌঁছে দেখলাম সভা চলছে। বিনোবা দেবনাগরীর পক্ষে বললেন। সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করাও তিনি ভাল মনে করতেন। মশ্রুবালা একজন গান্ধীবাদী দার্শনিক। দার্শনিকের কথা যদি স্পষ্ট হয় তাহলে সে আর কেমন দার্শনিক। হিন্দি-হিন্দুস্তানী, দেবনাগরী-উর্দুর সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য—'আমরা নেহেরুকে মধ্যস্থ মেনে নি।' একথাটা আমার কি করে পছন্দ হতে পারে, যে ব্যাপারে নেহেরুর জ্ঞান প্রায় নেই বললেই চলে, আর যে বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত আগের থেকেই জানা, তাকে কি করে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া যায়? সম্প্রতি নেহেরু আর রাজেন্দ্রবাবুর কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, যার থেকে লিপি ও ভাষা-সম্বন্ধী মতভেদ কম হবার সংকেত পাওয়া যাচ্ছিল। বস্তুত সংবিধানে এখন হিন্দিকে স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারটা প্রায় স্থির হয়ে এসেছিল, যে কারণেও কিছু কিছু চিন্তাধারায় পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল। সম্মেলনে ২৫০ জন প্রতিনিধি এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইম্ফল (মণিপুর) থেকে ভাবনগর (সৌরাষ্ট্র) পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষার কর্মকর্তারাও ছিলেন। রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি প্রতিবছর এগিয়ে চলেছে। দেখলাম আরো কতগুলো নতুন বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। ১৩ একর জমি সমিতির আছে, একটি দোতলা আর অনেকগুলি একতলা বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। প্রেসও বড়ই ছিল, কিন্তু তাতেও আমার আনন্দ হল না। আমি তো ভাবতাম, ভবিষ্যতে প্রকাশনা আর প্রচারকে মুখ্য স্থান দিতে হবে। সমিতি প্রাদেশিক সাহিত্য আর বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থগুলির হিন্দি অনুবাদ করে খুব বড় কাজ করতে পারে।

প্রয়াগ—২৮ তারিখে ট্রেন ধরলাম। পরের দিন পয়লা মার্চ সকালে ট্রেন ইটারসী পৌঁছে গিয়েছিল। সেই প্যাসেঞ্জারেই সাড়ে এগারোটার সময় আমরা জব্বলপুর পৌঁছলাম। কাল সামান্য জ্বর ছিল, আজ একেবারেই নেই। দাঁতে ব্যথা হচ্ছিল, বোধহয় সেইজন্যই জ্বর এসেছিল। বেনারস থেকে নেওয়া দাঁতের ওষুধ খুবই কাজ দিল। দাঁতের ব্যথায় খাওয়ার ইচ্ছে কি করে হবে? রেস্তোরা-কারে ভারতীয় খাবার বলতে শুধু নিরামিষ পাওয়া যেত।

রাত দশটায় কলকাতা মেল প্রয়াগ পৌঁছল। সাড়ে দশটার সময় আমরা ড· বদরীনাথ প্রসাদের বাড়ি পৌঁছে গেলাম। প্রয়াগে এখন ২ এপ্রিল পর্যন্ত অর্থাৎ এক মাস পর্যন্ত জমিয়ে পরিভাষার কাজ দেখা এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতি আবার পড়ে তার অনেক অংশ হিন্দুস্তানী অকাদেমীর সভাগুলিতে পাঠ করার ছিল।

২ তারিখ হাঁটতে গেলাম। দেখলাম কেল্লার ঝাণ্ডা নত হয়ে আছে। জানতে পারলাম, সরোজিনী দেবীর মৃত্যু হয়েছে। সরোজিনী দেশের সেবা করেছেন, স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন, আর এখন স্বাধীন ভারতে তাঁর মৃত্যু হলো।

ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার মাথা ধরিয়ে ছাড়লো। আমাদের মত লোকেদের

রোজগারই-বা কত ছিল? অথচ চোরাবাজারী কোটিপতি শেঠদের মতই আমাদেরও বিরক্ত করা হয়। সব থেকে বড় সমস্যা ছিল, রাশিয়ায় আমার প্রবাসকালীন রোজগারের ওপর ট্যাক্স দেওয়া।

এদিকে ড· বদরীনাথ প্রসাদ কিছুদিন ধরে প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। গণিতে তিনি ভারতের জনা ছয় সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বানদের মধ্যে একজন ছিলেন, তাঁর থেকে কম যোগ্যতাসম্পন্ন লোককে চালাকি করে পদোন্নতি করে দেওয়া হলে তাঁর মনে বিরক্তি আসা স্বাভাবিক। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডেকেছে। আর তিনি এখন সেখানে যাবার জন্য তৈরি। যদিও সেখানে সর্বোচ্চস্থান পেয়েছিলেন, তবু দরবারি পরিবেশ ছিল। মন্ত্রী ও অন্যদের দরবারে হাজিরা দেওয়া বদরীবাবুর পক্ষে সম্ভব ছিল না, সেই জন্যেই পরে তিনি ওখানে টিকতে পারেননি এবং আবার প্রয়াগে ফিরে আসেন।

কালিম্পং যাওয়াই ঠিক হলো। অনী যাবার কথা চিন্তা করে আমি সিমলায় আমার অনেক জিনিস ছেড়ে এসেছিলাম, নাগার্জুনজীকে পাঠিয়ে এখন সেগুলো নিয়ে আসার ছিল।

পঞ্চায়েত নির্বাচন—উত্তরপ্রদেশে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার অনুসারে গ্রাম-পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয়েছিল। পুবের জেলাগুলিতে হইচই তো ছিলই না, বরং বলা উচিত, উঁচু জাতের লোকেরা মহা সংকটে পড়ে গিয়েছিল। শ্রীরামনাথ ত্রিবেদী তাঁর গ্রাম দুসৌরী (গাজীপুর)-র তিনটি গ্রামের নির্বাচনের বিষয়ে বলছিলেন— ৩৬ জন মেম্বারের মধ্যে ৪ জন ব্রাহ্মণ আর ১ জন ভূমিহার—কেবল এই ৫ জন বড় জাতির থেকে আসতে পেরেছে, বাকি সবাই নিচু জাতির। ঘোড়ার পিঠে বোঝা চাপানোর কাজ করত কানু ভুলই সাহু — সভাপতি হলো। ভূমিহার কি করে তার নীচে উপ-সভাপতি হয়? মাসখানেক ধরে বোঝাবুঝি করানোর চেষ্টা চলতে লাগল। ভোটের সংখ্যা জানাই ছিল। ভোটদানের পরিণাম কি হবে তাও স্পষ্ট ছিল। উঁচুজাতের লোকেদের টাকা ছিল, আর নিচু জাতের ছিল টাকার অভাব। প্রত্যেক 'পঞ্চ'কে জামানতের টাকা জমা করতে হতো, বেচারারা কোথা থেকে তা আনবে? আইন প্রণেতারা জেনে-বুঝেই এই চালাকি করে রেখেছিল। ভুলাই সাহু ১৫ টাকার জায়গায় ৬০ টাকা জমা করে দিল। বড় জাতের লোকেরা ধমক দিতে লাগল, 'তোমাকে দিয়ে আমরা ফসল কাটবো না, হাল চালানোর কাজে লাগাবো না, তোমাকে খামার করার জায়গা দেব না। তুমি কোন্ রাস্তা দিয়ে যাবে, আমরা আমাদের রাস্তায় চলতে দেব না…।' বাসুদেব রায় উপ-সভাপতি নির্বাচিত হলেন, যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে ছিলেন। আদালতী পঞ্চে একজন ব্রাহ্মণ আর একজন ভূমিহার, বাকি তিনজন নিচুজাতের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। তাদের পাশের গ্রাম বেটাবর-এ উঁচুজাতের লোকেরা রাগের চোটে নির্বাচন বয়কট করেছে। পণ্ডিত গণেশ পাণ্ডে তাঁর বালিয়া জেলার কথা বড় করুণ শব্দে জানালেন—'ছোট জাতি', 'সোরহ জাতিয়া', 'বেজ নেবহা' সব জায়গায় উঠে দাঁড়িয়েছে। গ্রামসভাগুলির নির্বাচনে তাদেরই জিৎ হয়েছে। ড· উদয়নারায়ণ তেওয়ারী তাঁর গ্রামের খবর অতটা শোকাবহ নয় বলে জানালেন।

সেখানে তাঁর অনুজ তথা হাইস্কুলের অধ্যাপক বিশ্বনাথ তেওয়ারী গ্রামসভার সভাপতি হয়েছেন। সম্ভবত আদালতী সরপঞ্চও তিনিই হয়েছেন। গণেশ পাণ্ডে অনেক কষ্টে তাঁদের ওখানের রাজপুত সুবেদার মেজরকে সভাপতি করাতে সফল হয়েছেন। উঁচুজাতি চার হাজার বছর ধরে ভগবানের কাছ থেকে ক্ষমতার পাট্টা পেয়েছিল। আমি বললাম, 'এখন সেই ক্ষমতার পাট্টা জাল প্রমাণিত হচ্ছে।' এইভাবে অসফল হবার পরে উঁচুজাতিরা এখন অন্যভাবে চাল চালাতে চেষ্টা করছিল। কখনও বলত, 'সরকার পঞ্চায়েতী আইন তুলে দিচ্ছে।' কখনও বলত, 'কালেক্টর আর জেলাবোর্ডের সভাপতি সেক্রেটারি নিযুক্ত করবে, তাই এখনও আমাদের কথাই থাকবে।' এও জানতে পারলাম যে লোকে বুড়োদের নয়, তরুণদের বেশি পঞ্চ হিসেবে নির্বাচিত করেছে। আমি গণেশ পাণ্ডেজীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'উঁচুজাতির মহিলারা তো নিশ্চয়ই পর্দা ছেড়ে বেরিয়ে ভোট দেয়নি?' তিনি বললেন, 'তাদের নিয়ে এসে ভোট দেওয়ানো ছাড়া গতি ছিল? নিচুজাতের মধ্যে তো পর্দা ছিল না, তারা মুখ খুলে এসে যদি ভোট দিয়ে যেত, তাহলে তো যেটুকু আশা অবশিষ্ট ছিল, তাও চলে যেত।'

পরিভাষার কাজে শ্রীসেনগুপ্তর আসাটা প্রায় নিশ্চিত ছিল। ৯ মার্চ ড· ভট্টেরও চিঠি এলো। দিল্লীতে তাঁর কোনো ব্যবস্থা হয়নি, সেইজন্য তিনি আসতে প্রস্তুত আছেন।

১০ মার্চ আমার অনুজ শ্যামলাল তাঁর বৃদ্ধ বন্ধু ডীহার পলকধারী সিংহের সঙ্গে এলো। পলকধারী বাবু ওই এলাকার ৭৫ বছর বয়সের একজন সম্মানিত পুরুষ। পুরনো যুগ তিনি দেখেছেন, এখন নতুন যুগও দেখছিলেন। নাতনীর বিয়ে দেবার ছিল। ছেলে এখানেই ইউনিভার্সিটিতে পড়ছিল, তাকেই দেখার জন্য এসেছিলেন। শ্যামলালের কাছ থেকে আজমগড় জেলার পঞ্চায়েতগুলির সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলাম। তিনি বহু বছর ধরে পঞ্চায়েতের প্রধান হয়ে আসছিলেন। পুরনো যুগের জন্য তিনি যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। মিড্‌ল পাস ছিলেন আর মামলাবাজ হিসেবে তাঁর নামও ছড়িয়েছিল। এবার নতুন নির্বাচনে গ্রামের এক তরুণ সভাপতি হয়েছে। আমি তাকে একবার বলেছিলাম, 'নিজের মজুররা যাতে ক্ষুধার্ত না থাকে তার জন্য গরমে অকর্ষিত পড়ে থাকা খেতগুলো চীনাবাদাম চাষ করতে এমনিই দিয়ে দাও।' কিন্তু এ তো অনভিজ্ঞ আদর্শবাদীর কথা ছিল। সেচের জন্য সে লোহার অরঘট্ট এনে লাগিয়েছিল। তার বাবা সর্বপ্রথম গ্রামে 'বিদেশী' আখ লাগিয়েছিলেন। সর্বপ্রথম পাথরের ঘানির জায়গায় লোহার ঘানি এনেছিলেন, সেখানে ছেলে যদি অরঘট্টের মত নতুন কোনো জিনিস আনে তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।...তবে কেউ যখন একাই সমৃদ্ধ হবার আশা করে, তখন তার রাস্তা নিষ্কণ্টক থাকতে পারে না। সেচের জন্য গ্রাম থেকে দূরের কুয়োয় অরঘট্ট লাগানো হয়েছিল, সেখান থেকে একটু সরে গেলেই লোকে অরঘট্টকে নষ্ট করে দিত। তাদের ওখানে ৩৫জন পঞ্চায়েতের সভ্যের মধ্যে শুধু ৭ জন বড়জাতের নির্বাচিত হয়েছিল। বাবু পলকধারী সিংহ বলছিলেন, 'রাজকার্য চালানোর জন্য নান্‌হজাতের লোকেরা বুদ্ধি পাবে কোথা থেকে?' শ্যামলালজী রায় দিচ্ছিলেন, 'ছোটজাতেরা শাষণ যন্ত্রকে তা জানিয়ে দেবে।'

এরা তো বেচারা গ্রামের লোক ছিল। ড· অমরনাথ ঝার মতো অভিজ্ঞ লোকও যখন

বয়স্ক ভোটাধিকারকে বিপজ্জনক জিনিস বলে জানাচ্ছিলেন, তখন বলতেই হয়—'ধিগ্ ব্যাপকং তমঃ' (শ্রেণী স্বার্থ, তোর নাশ হোক)।

১০, ২০ আর ২১ তারিখ বৌদ্ধ সংস্কৃতির ওপর আমি ভাষণ দিলাম। সেই সময় মাথার মধ্যে একরকমের আচ্ছন্নতা বোধ করতাম, যা ডায়বেটিসের জন্য হতো। তবে আমি এখনও তা পুরোপুরি বুঝতে পারিনি। প্রয়োজন ছিল নিয়মপূর্বক ইনসুলিন নেওয়া।

এবছরও দোল উৎসব (১৫ মার্চ) এখানেই পড়ল। রঙ দেবার কাজ ছেলেরা একদিন আগেই শুরু করে দিয়েছিল। সেনগুপ্তর চিঠিও এসে গিয়েছিল—আমি ১৮ তারিখ প্রয়াগ পৌছচ্ছি। সম্মেলন এই ব্যাপারে ২০ তারিখ ফয়সালা করবে। সুমনজী আর কাজ করতে অসমর্থ ছিলেন। মহেশজী কাশীতে সাধু হবার কথা ভাবছিলেন, তাই তাঁকে আসার জন্য লিখে দিলাম। ১১৬ তারিখ নাগার্জুনজী শিমলা থেকে জিনিসপত্র আনতে চলে গেলেন। ২০ তারিখ স্থায়ী সমিতির বৈঠকে পরিভাষা-কোষ নিয়ে কথা হলো, আর মুখ্য সহায়কদের মাসিক ৩০০ টাকা, সফরে সেকেন্ড ক্লাশের টিকিট এবং দৈনিক দশ টাকা ভাতা দেওয়া ঠিক হলো। ড· ভট্টর চিঠি কোথাও হারিয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁর ঠিকানা জানা ছিল না যে তাঁকে খবর দিতে পারি। তাঁর চিঠি আসার জন্য উৎসুক হয়ে রইলাম।

২২ তারিখ নাগার্জুনজী শিমলা থেকে জিনিসপত্র নিয়ে এলেন। কালিম্পঙে ভিক্ষু মহানাম ও শ্রীমণি হর্ষ জ্যোতিকে লিখে দিলাম যে, আমরা ৩ এপ্রিল এখান থেকে যাচ্ছি। কালিম্পং রওনা হবার আগে কানপুর আর লক্ষ্ণৌতে যে কাজ দিয়ে এসেছিলাম, সে ব্যাপারে জানার জন্য সেনগুপ্তজীকে ২৫ তারিখে পাঠিয়ে দিলাম। শ্রীমণি হর্ষ জ্যোতির চিঠি থেকে জানতে পারলাম, তাঁর বাবা সাহু ভাজুরত্ন ও ভিক্ষু মহানাম কালিম্পঙে আছেন। কাটিহার থেকে গাড়ি নকসালবাড়ি পর্যন্তই যায়। এখনও আসাম পর্যন্ত যাবার লাইন তৈরি হয়নি। কিন্তু নকসাল বাড়িতে মাল নেবার জন্য তাঁর মোটর এসে থাকবে। ড· ভট্টরও চিঠি চলে এলো, তিনি আসার জন্য তৈরি ছিলেন।

২৮ তারিখে আমার ভাইয়ের থেকেও বেশি প্রিয় যাগেশদত্ত পাণ্ডে এলেন। দু বছর আগেই তাঁকে আমি আমার জন্মভূমিতে দেখেছিলাম। আমার থেকে কয়েকমাসের ছোট, কিন্তু এখন তিনি বুড়ো ও রোগা-পাতলা হয়ে গিয়েছিলেন। কোথায় সেই বাল্য আর তারুণ্যের শরীর, আর কোথায় এই ঢিলে-ঢালা কাঠামো। পঞ্চায়েতের নির্বাচনে ছোটজাতের উন্নতিতে তিনিও নিরাশ ছিলেন। তাঁর গ্রাম বছবল-এও 'ছোট' জাতেরই প্রাধান্য ছিল। তাদের মধ্যে শিক্ষা নেই, লুটপাট করা স্বভাব। কি করে কাজ হবে। তাঁর নিজের বাড়িতে খুড়তুতো ভাই বিভূতি নিজের ভাইদের সঙ্গে বনে না বলে তাঁর সঙ্গে থাকত। আমাদের এখানে হালে মোষ জোতাকে খারাপ মনে করা হয়—'ভৈঁসা জোতে, লোহিয়া খায়।'[1] লক্ষ্মীছাড়া হবার সোজা উপায় বলে মনে করা হতো। কিন্তু এখন ষাঁড়ের দাম খুব বেড়ে গেছে, তাই মোষ জোতা শুরু হয়েছে। তিনি বলছিলেন, 'এবার

[1]এই লোকোক্তিটির অর্থ — যে মোষকে চাষের কাজে ব্যবহার করে তার ঘরে খাবাব শস্যটুকুও থাকে না।—স·ম·

ব্রাহ্মণদেরও হাল চালাতে বাধ্য হতে হবে।'

২৯ তারিখে সেনগুপ্ত এলেন। সব থেকে ভাল কাজ কানপুরে কৌশলজী করেছিলেন। কৌশলজীর কাজে পুরো নিষ্ঠাও ছিল। লক্ষ্ণৌতে অল্প কাজ হয়েছিল। সেইদিনই মহেশনারায়ণও চলে এলেন। ১ এপ্রিল ড· ভট্টও পৌঁছে গেলেন। এখন আমার তিনজন সঙ্গীই প্রয়াগে ছিলেন। পরিভাষা সম্পর্কিত পুস্তকগুলিকে সম্মেলন গ্রন্থাগার এবং অন্য জায়গা থেকে সংগ্রহ করা হতে লাগল। ছোটবড় ১৬টি ট্রাঙ্ক আমাদের সঙ্গে ছিল। ২ এপ্রিল ৬টি বাক্স বুক করিয়ে এলাম, ৩ এপ্রিল আমরা কালিম্পং যাবার জন্য তৈরি ছিলাম। গরম আমাকে কষ্ট দিচ্ছিল, আর ডায়াবেটিসের সঙ্গে মিলে দিনের বেলা তা এক ধরনের ক্লান্তি তৈরি করত।

কালিম্পঙে

৩ এপ্রিল শ্রীলক্ষ্মীদেবী চারজনকে জলখাবার খাওয়ালেন, আর আমরা আমাদের লটবহরের সঙ্গে রামবাগ স্টেশনে ছোট লাইন ধরতে গেলাম। মাল তোলা হলো। সিট রিজার্ভ ছিল, তাই তা নিয়ে অসুবিধে ছিল না। অনেক বন্ধু দেখা করতে এলেন। দারাগঞ্জ স্টেশনে ড· উদয়নারায়ণ তেওয়ারী এসে পড়লেন। গাড়ি ছাড়ল। বেনারসে খেয়ে নিলাম। বালিয়ার পরে ববুলহা স্টেশনে অন্ধকার হয়ে গেল। আগে থেকে জানতেন বলে ছাপরা স্টেশনে ধূপনাথজী খাবার নিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। তিনি বলছিলেন, 'এখন সমস্ত পরিবারকে একসঙ্গে রাখা মুশকিল হয়ে পড়েছে। একান্নবর্তী পরিবারে গুণও আছে আবার দোষও আছে। গুণ এই যে, যে কাজ পায় না তারও চলে যায়, কিন্তু সকলে যদি মিলেমিশে থাকতে রাজি না থাকে, তখন অসুবিধেও হয়। একান্নবর্তী পরিবারের টিকে থাকা মুশকিল। সে সাম্যবাদ চায়, যেখানে আধুনিক সমাজব্যবস্থা প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপরকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবার প্রেরণা দেয়। পুরনো সময় থেকে চলে আসা নিয়মও আসলে একান্নবর্তী পরিবারের পক্ষপাতী নয়। যদি তাই হতো, তবে তার উচিত ছিল পিতাদের সম্পর্কের কথা খেয়াল না করে একই পরিবারে জন্ম নেওয়া সমস্ত সন্তানের পরিবারের সম্পত্তির সমান অধিকার দেওয়া। এক ভাইয়ের পাঁচ ছেলে, আর একজনের এক। একজনের মা মনে করতে থাকে, আমার তো অর্ধেক সম্পত্তির অধিকার, আর এই পাঁচজন তাতে ভাগ বসাচ্ছে।'

বহুদিন ধরে পরিবার একসঙ্গে থেকে আসছিল। ধূপনাথজীর খুড়তুতো ভাই আর পরিবারের প্রধান বাবু দেবনারায়ণ সিংহ পরিবারের সব সন্তানদের একই দৃষ্টিতে দেখতেন। ধূপনাথজী এবং তাঁর অন্য ভাইদেরও চিন্তাধারা ছিল সেরকমই। কিন্তু পরের

প্রজন্মের নির্বাহ হওয়া কষ্টকর ছিল।

বারোটার কাছাকাছি আমাদের ট্রেন মজঃফরপুর পৌঁছল। এখান থেকে মগের মুলুক শুরু হয়ে গেল। বোধহয় নেহেরুজী এসেছিলেন। আর কি? আশেপাশের কয়েক মাইল দূর থেকে দর্শনার্থীরা মুফতে রেলে চড়ে এসেছিল, এখন তারা ফিরছিল। ভাড়া দিতে হবে না, তাই প্রথম শ্রেণী আর তৃতীয় শ্রেণীতে কোনো তফাৎ নেই। আমাদের কামরাও ভরে গেল। কোনোরকমে আমাদের বসার জায়গাটুকু বাঁচল। ভয় হচ্ছিল, জিনিসপত্র থেকে কেউ কিছু তুলে নিয়ে চম্পট না দেয়। সত্যিসত্যিই একটা লোক চটি পরে রওনা দিয়েছিল, দেখতে পেয়ে তাকে আটকালাম। শুধু কামরার ভেতরেই নয়, ছাতের ওপরও লোক ভর্তি ছিল। স্প্রিং তো এত বোঝা বওয়ার মত করে বানানো হয়নি। একটু পরে সে জবাব দিল আর অতিকষ্টে গাড়ি সমস্তিপুর পৌঁছল। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের কামরাটাকেই কেটে রাখা হলো। জিনিসপত্র নামিয়ে প্লাটফর্মে বসে রইলাম। ভেবেছিলাম প্রয়াগ থেকে বসে বসে আরামে কাটিহার পৌঁছে যাব, কিন্তু নৌকো মাঝনদীতে ফাঁসল।

৪ এপ্রিলের সকাল হলো। খুব তাড়াতাড়ি লোকেরা জেনে গেল, আর কত যে পরিচিত মানুষ দেখা করতে এলো! রেলের দারোগা বাবু রামাবতার নারায়ণ বাসায় যাবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করলেন, কিন্তু আমাদের অনুরোধে সেখানেই আমাদের অতিথি-সৎকার করলেন। এতে সন্দেহ নেই যে, তিনি যদি সাহায্য না করতেন, তবে গোরখপুর এক্সপ্রেসের প্রথম শ্রেণীতে আমাদের জায়গা হতো না, ভিড় খুব বেশি ছিল। বারৌনীতে ভিড় কিছুটা কম হলো, বেগুসরায়তে তা কেটে গেল। এখানেই কাটিহার নিবাসী শ্রীমহাবীরপ্রসাদ মাবণ্ডিয়া আর উকিল বিশ্বনাথ শর্মা আমাদের কামরায় উঠলেন। পরিচয় হলো, কাটিহারও অজ্ঞাত স্থান থাকল না। মাবণ্ডিয়াজী তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পরের গাড়ি পাওয়া যাবে রাত বারোটায়। মাবণ্ডিয়াজীর বাড়িতে খাওয়া হলো এবং কিছুক্ষণের জন্য বৈঠকও। তাঁর তেল আর আটার 'জমনা মিল' আছে। মারোড়ার ছেড়ে উদার কর্মপ্রত্যাশী মানুষ কোথায় কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে অথচ বর্তমান প্রজন্মর তো মারোয়াড়কেও বিদেশ মনে হয়।

রাতে ট্রেন ধরার জন্য স্টেশনে পৌঁছলাম। কাটিহারে তো মনে হয় বারোমাসই ভিড় থাকে। প্রথম শ্রেণীতে জায়গা পেয়ে যাওয়ায় নিজেদের ভাগ্যের প্রশংসা করতেই হলো। রেলের ব্যবস্থায় এখন খুব গণ্ডগোল। কামরাগুলো পুরনো হয়ে গিয়েছে, লোকেও রেলওয়ের সম্পত্তি নষ্ট করে আনন্দ অনুভব করে। ইলেকট্রিক বাল্ব ও সুইচ গায়েব করে দেয়। আমাদের কামরায় ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল। কিষাণগঞ্জে রাত তিনটেয় আমাদের ট্রেন পৌঁছল। কিষাণগঞ্জ একটা খুব বড় ও ভাল ব্যবসায়িক ছোট শহর এবং পূর্ণিয়া জেলার পূর্ব ভাগের সদর জায়গা। একেই বাংলার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ায় লোকেদের মধ্যে খুবই উত্তেজনা ছড়িয়েছিল।

ভিড় কিছুটা কম হলো। রাতে বৃষ্টি হচ্ছিল, তাতে মাটি ভিজে গিয়েছিল। কিষাণগঞ্জ থেকে নকসালবাড়ির লাইন আসলে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ছিল, যাকে কাজের যোগ্য করে দেওয়া হয়েছে। কাটিহার থেকে আসাম যাবার রেল পাকিস্তানে পড়ে গিয়েছে,

তাই সেদিক দিয়ে রেলের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আসামের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য শিলিগুড়ি হয়ে রেল তৈরি হচ্ছে, কয়েকমাস পরে ফেরার সময় যা আমরা ব্যবহার করলাম। গাড়িও খুব ঢিমেতালে চলছিল। ৫ এপ্রিল আমরা পৌনে এগারোটার সময় সেখানে পৌঁছলাম।

ভিক্ষু অনিরুদ্ধ মোটর নিয়ে স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। কালিম্পং পৌঁছনোর ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। ব্রেকে রাখা ছটি বাক্সের মধ্যে একটি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। কোনো জিনিসের জন্য রেলের লোকেরা কেন চিন্তা করতে যাবে, আর রেলওয়ে কোম্পানি কোনো গ্যারান্টি দিতেও রাজি নয়।

মোটরে জিনিস রাখলাম। আমরা চারজন বসে পড়লাম। পথে রেলওয়ে সড়কে কাজ হতে দেখলাম। বাগডোগরার বিমান বন্দর রাস্তার ডানদিকে পড়ল, যেখানে রোজ কলকাতা আর আসাম থেকে প্লেন আসা-যাওয়া করে। রেলের রাস্তা বানানোর লোকের মধ্যে পাঞ্জাবী মিস্ত্রি অনেক ছিল। শিলিগুড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে এবার চা-এর বড় বড় বাগান এসে পড়ল। সমতল জায়গাতেও চা হয়, আর পরিমাণে একর প্রতি অনেক বেশি হয়, কিন্তু তার দাম দার্জিলিঙের পাহাড়ের চা-এর মত হয় না।

শিলিগুড়িতে পৌনে পাঁচ টাকায় চারজনের খাওয়া হলো। তার মধ্যে একজনেরই খাবার নিরামিষ ছিল। একে সস্তাই বলা উচিত। তিব্বত আসা-যাওয়ার পথে এই শহরটি আমি কয়েকবারই দেখেছি। এবার ১১ বছর পরে এসেছিলাম। দেশবিভাগের জন্য শরণার্থীদের স্রোতও এসে পড়েছে, তাহলে আর শিলিগুড়ির জনসংখ্যা বাড়বে না কেন? কালিম্পং যাবার রাস্তার ধারে দূর পর্যন্ত দোকান, মোটর মেরামতের কারখানা, আর ছোটখাটো ফ্যাক্টরি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আগে শিলিগুড়িতে সন্ধেবেলা বসতাম এবং শুয়ে শুয়ে সকালে কলকাতা পৌঁছে যেতাম। এখন শিলিগুড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরেই পাকিস্তানের সীমানা, তাই এই লাইন দিয়ে যাওয়া এখন বিদেশ হয়ে যাওয়া, তবুও এখন আসা-যাওয়ায় বাধা ছিল না।

কালিম্পং—পৌনে চারটার সময় আমরা কালিম্পং পৌঁছে গেলাম। সেই একই পাকা পাহাড়ী সড়ক, যেমন আমি কয়েকবার দেখেছি, তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। বাজারের আগেই ধর্মোদয় বিহার পড়ল। স্থানীয় শ্রদ্ধাবান বৌদ্ধরা একটি বাংলো কিনে তাকে বিহারের চেহারা দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মণিহর্ষ জ্যোতির বিশেষ ভূমিকা ছিল। এখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। তিন-চারজন ভিক্ষু আগের থেকেই থাকতেন, এখন আমরা আরো চারজন অভ্যাগত এসে পড়লাম। বাক্সগুলো গুছোন হলো। প্রয়োজন অনুযায়ী বইগুলো সাজিয়ে রাখা হলো। পরের দিন থেকে নিজেদের কাজে লেগে পড়লাম। পরের দিন থেকে আমিই হাঁটার নিয়মও পালন করতে শুরু করলাম। সেদিন দূরবীন পর্যন্ত প্রায় পাঁচ মাইল পায়চারি হলো। রাস্তায় মোটর আসার নিষেধ নেই, কিন্তু বসতি কম বলে মোটর কম আসে। সেদিন আমরা তিনজন রসায়নের পরিভাষা নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা করলাম এবং তত্ত্ব ও প্রত্যয়গুলির বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নিলাম।

—১৯৪৯—

সেদিন বুধবার কালিম্পঙের হাট ছিল। শনিবারও হাট বসে। দার্জিলিং আর কালিম্পঙে হাটের এই রেওয়াজ কৃষক এবং খরিদ্দার উভয়ের দৃষ্টিতেই ভাল। যেখানে এমনটা নেই, সেখানে মধ্যস্থ লোক কৃষকদের কাছ থেকে জলের দরে শাক-সবজি কিনে ইচ্ছেমত দামে খদ্দেরকে বিক্রি করে। সন্ধেবেলা কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি হলো। বঙ্গোপসাগর আর বেশি দূরে নয়। ভয় হলো, বর্ষা আবার বিরক্ত করছে না তো। ইংরেজদের হাতে আসার আগে দার্জিলিং সিকিমের লোকেদের হাত থেকে গুর্খাদের হাতে চলে গিয়েছিল। গুর্খাদের হারিয়েই ইংরেজরা নেপালের পূর্বে এই অঞ্চল আর নেপালের পশ্চিমে আলমোড়া জেলা থেকে শতদ্রু পর্যন্ত হিমালয় অঞ্চল নিয়ে নিয়েছিল। যে সময় দার্জিলিং জেলার জনসংখ্যা খুব কম ছিল। কিরাত জাতির সঙ্গে সম্পর্কিত লেপ্‌চারা এখানকার বাসিন্দা ছিল। নেপালে জনসংখ্যার অধিক চাপ হবার দরুন সেখানকার খেটে খাওয়া মানুষেরা নিকটস্থ এই পাহাড়গুলির দিকে অগ্রসর হতে থাকে, যে কাজে ইংরেজরাও উৎসাহ দেয়। কেনই বা এমন করবে না, কারণ নেপালীদের বীরত্ব দেখে তারা তাদের সামরিক গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল, আর সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের ভাড়া করা সৈন্যদলে নেপালীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। গত শতাব্দীর শেষ দিকেই দার্জিলিং নেপালীভাষী হয়ে গিয়েছিল, আজ তো ভাষা আর জাতির দিক থেকে তাকে নেপালেব একটা অংশই বলা উচিত। প্রথমে সমস্ত নেপালীরাই অশিক্ষিত কুলি অথবা কৃষক ছিল, এখন তাদের মধ্যেও কিছু শিক্ষিত হয়েছে। দেরিতে ঘুম ভাঙার পর চোখ মুছে এখন তারা দেখে বুঝতে পারছে, নিজেদের অর্জিত ভূমিতে তাদের কুলি-কিষাণ হওয়া ছাড়া উন্নতির অন্য কোনো পথ নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই বাঙালীরা এগিয়ে আছে, সব চাকরিই তাদের আয়ত্বে, আর চাবাগানগুলো আছে ইংরেজদের হাতে। আর্থিক এবং সাংস্কৃতিকরূপে পিছিয়ে থাকা জাতিগুলি যখন নিজেদের অবস্থা দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে ভাল করার জন্য আন্দোলন করে, তখন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী তাকে নিচু মানের প্রাদেশিকতা, ভাষাগত সংকীর্ণতা, জাতীয়তা এইসব নাম দিয়ে বদনাম করে। কিন্তু যে ভাবনার আধার প্রবলভাবে আর্থিক, তাকে প্রচারের ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিশেষ করে আজকাল যখন মানুষ খানিকটা গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ করেছে এবং তারা যখন তাদের অসন্তোষ প্রদর্শন করতে পারে। দার্জিলিঙের কংগ্রেস কমিটি বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির শাখা, আর তার ইশারাতেই সে চলে। যখন বলিদান দেবার সময় ছিল তখন মনকষাকষির সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এখন কংগ্রেস স্বাধীন ভারতের লাভের অংশীদার, তাই নিজেদের স্বার্থের জন্য লোকেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি হওয়া স্বাভাবিক ছিল। দার্জিলিঙের নেপালী জনসাধারণের বিশ্বাস কংগ্রেসের ওপর ছিল না এবং ইংরেজরা প্রথম থেকেই জাতীয়তাব বিরুদ্ধে গুর্খাদের উৎসাহ দিতে শুরু করেছিল। এখন এখানে গুর্খা লিগ ও কংগ্রেসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। সম্প্রতি অ্যাসেম্বলির নির্বাচন হয়েছিল, তাতে প্রার্থীকে হারিয়ে গুর্খা লিগের লোক নির্বাচিত হয়েছিল।

কালিম্পঙে হাঁটার জন্য দূরবীনের দিকটাই ভাল মনে হতো, কারণ সেদিকটায় রাস্তা প্রায় নির্জন থাকত। সঙ্গে দু-একজন লোক অবশ্যই থাকত। কখনও মহেশ থাকতেন,

কখনও অনিরুদ্ধ আর কখনও ছাপরা জেলার কোনো যুবা অথবা প্রৌঢ়। কালিম্পং আন্তর্জাতিক ও আন্তঃপ্রাদেশিক শহর। শহরের পত্তন হয়েছিল ১৯০৪ সালে, যখন লাসায় প্রেরিত ইংরেজ সৈন্যদের রসদ পাঠানোর এই প্রধান কেন্দ্রটি তৈরি হয়েছিল। সেই সময় রসদের জন্য কমিসরিয়েটে কর্মরত ঠিকেদার-দোকানদাররা এখানে এসে পৌঁছয়। তাদের যোগাযোগ ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলকাতার সঙ্গে ছিল, সেইজন্য মারোয়াড়িদের পৌঁছে যাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। আজ বড় বড় দোকানগুলো মারোয়াড়িদের হাতে। তাদের পরের দোকানদাররা হলো নেপাল থেকে আসার নেওয়াররা, যাদের কিছু অংশ তিব্বতেও আছে। এদের পরে আসে অন্য নেপালী দোকানদাররা। কিছু তিব্বতী আর চীনা দোকানদারও আছে, তবে তারা বেশিরভাগই খাবার-দাবারের দোকান করে। দু-তিনজন তিব্বতী শেঠও আছে। এছাড়াও যথেষ্ট পরিমাণে ভোজপুরী আছে। যারা ছাপরা, বালিয়া আর আরা জেলার বাসিন্দা। এদের মধ্যে কিছু লোক ছোট ছোট দোকান চালায়, পান-বিড়িওয়ালারাও এদের লোক, দু-চারজন সস্তা গয়নার দোকান খুলেছে, আর দু-একজনই আছে যারা প্রথম শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের সারিতে পৌঁছেছে। ভোজপুরীরা আমার নিজেরই লোক। তাদের মধ্যে কেউ না কেউ সকালে হাঁটার সময় উপস্থিত থাকত। শারীরস্থান (অ্যানাটমি)-এর ন হাজার শব্দ সেনগুপ্ত জমা করে এনেছিলেন। অন্যান্য বিষয়েরও অনেক শব্দ জমা হয়েছিল, অথবা তাদের কোষ মজুত ছিল। শব্দগুলিকে অ-কারাদি ক্রমে সাজানোর জন্য কার্ডের ওপর তাদের লেখার প্রয়োজন ছিল, তার জন্য আমাদের প্রয়োজন ছিল অনেক লিপিকারের। হিমালয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করার জন্য কালিম্পং একটা বড় কেন্দ্র ছিল। মিশনারিরা ইন্টার কলেজ, মেয়েদের হাইস্কুল, গোরা এবং আধগোরা ছেলেদের শিক্ষার জন্য ছাত্রাবাস সহ গ্রেহেমস হোম আর কনভেন্ট বানিয়ে রেখেছে। এদের জন্য এখানে শিক্ষার যথেষ্ট প্রচার হয়েছে। তবে দলে দলে ম্যাট্রিক পাস ছেলেমেয়ে বেকার রয়েছে। প্রায় সমস্ত ছেলেমেয়েরা নেপালী ভাষাভাষী, তাতে আমাদের কোনো অসুবিধে ছিল না। নেপালী ভাষার সঙ্গে হিন্দির খুব মিল আছে, দেবনাগরী অক্ষরে তা লেখা হয়। আর সব শিক্ষিত নেপালীই হিন্দি বোঝে। আমরা কিছু ছেলেমেয়েকে এই কাজে লাগিয়ে দিলাম।

৯ এপ্রিল দূরবীন পরিক্রমা করতে করতে আমরা একদিকে একটু এগিয়ে গেলাম। সেখানে একটা সুন্দর ছোটমতন বাংলো 'ভুলনর ভিলা' পেলাম। জানা গেল, কোনো ইংরেজ নিজের জন্য এটা বানিয়েছিল এবং এখন দার্জিলিঙের অধিকাংশ বাংলোর মত এটাও বিক্রি হয়ে কোনো মারোয়াড়ি শেঠের হাতে চলে গেছে। এই বাংলোটা দেখে তো আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সিমেন্টের ছোট ছাতের নীচে লম্বা সারিতে ছিল কয়েকটি ঘর। পিছনের দিকেও ঘরের একটা সারি ছিল। ঘরগুলো খুব পরিষ্কার, ফার্নিচারগুলোও ঝকঝকে এবং সংখ্যায় খুব বেশি ছিল না। সত্যি, মানুষের মধ্যে কতখানি অহং আছে। এখানে ভেতরে গিয়ে মানুষ হারিয়ে যায় না, বরং তার ব্যক্তিত্বকে বড় বলে মনে হয়। এই বাংলোটির রমণীয়তার বোধহয় এটাও একটা কারণ। তাছাড়া বানানোও হয়েছিল এমন একটা জায়গায়, যেখান থেকে সুদূর হিমালয় আর তার নীচের সবুজ পর্বতশ্রেণী চোখে

পড়ত। শোনা যাচ্ছিল ৩০-৩৫ হাজারে বিক্রি হয়েছে। সেই সময় মালিক ওই দামের কমে নামতে চাইছিল না। তাই সেটা নিয়ে আমার এখানে থাকার প্রশ্নই উঠত না।

আজ আমার ৫৬ বছর পূর্ণ হলো, ৫৭তে পা রাখলাম এবং দাদুর মধ্যে কেউ এই বয়স অব্দি পৌঁছয়নি, এই বিষয়ে আমি আমার আগের দুই প্রজন্মর থেকে এগিয়ে ছিলাম। মা যদিও অনেক কম বয়সে মারা গিয়েছিলেন, তবু তাঁর বংশ দীর্ঘজীবীদের বংশ ছিল।

১০ তারিখ হাঁটার সময় পুরো একটা দল সঙ্গে হাঁটছিল। রাস্তার পাশের ইংরেজদের বাংলোগুলি নিয়ে কথা হচ্ছিল। ইংরেজরা যাবার আগেই তাদের বাংলোগুলো বেচে দিয়েছিল। যারা বেচেনি, পরে জলের দামে বেচে আফশোশ করেছে। বেশির ভাগ মারোয়াড়ি শেঠরাই বাংলোগুলো কিনেছে। এখন সেগুলো ভাড়া হচ্ছিল না, আর মালিক বছরে দু-এক মাসের বেশি এসে থাকে না। একটা বাংলো দেখিয়ে বলা হলো যে, গত বছর সাহেব এর দাম তিন লাখ চাইছিল, আর এ বছর দেড়লাখ পেয়েই সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেছে। ইংরেজদের মধ্যে এখন খুব কমই এখানে থেকে গিয়েছিল।

সেদিন সাহু ভাজুরত্নের বাড়িতে দুপুরের খাওয়া ছিল। পুরো ভোজ হলো, যেখানে তিব্বতী শেঠ, নেপালী ব্যবসায়ী আর তিব্বতী সরকারের বিদেশ পাঠানো কমিশনের সদস্যরাও ছিলেন। কমিশনের প্রধান তিব্বতী সবকারের অধ্যক্ষ—রিজেন্ট-এর ভাইপো শকাপাও ছিলেন। সব থেকে বড় তিব্বতী ব্যবসায়ী পনদা ছাঁগ আর ভুটানের রানী দোর্জে তাঁর পুত্র-কন্যা ও বধূদের সঙ্গে ভোজে এসেছিলেন। ভোজের আগে এবং পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা হলো। সাহু ভাজুরত্ন এই বাড়িটি ৩০ হাজারে কিনেছিলেন। বাড়িটি খুব বড় এবং সেইসঙ্গে একটি সুন্দর কমলালেবুর বাগানও আছে। ফলনের সময় শুধু বাড়ি আর স্থানের সুষমা দেখেই চক্ষু-মন তৃপ্ত হয় না, উপরন্তু মিষ্টি কমলালেবুও মুখ মিষ্টি করানোর জন্য তৈরি থাকে।

পরের দিন দুপুরে শকাপা আমাদের বাসস্থানে এলেন। ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতে প্রচুর ঘোরাঘুরি করে এসেছেন। চীনা কমিউনিস্টদের তিনি ভয় পাচ্ছিলেন। আশা ছিল, আমেরিকা-ইংল্যান্ড সাহায্য করবে, কিন্তু তারা নিরাশ করেছিল। নেহেরুও আশা দেননি। এখন কি করা উচিত—এটাই ছিল প্রশ্ন। আমি বললাম, 'তিব্বতে এখনও প্রচলিত অর্ধদাসত্ব সেই জায়গার পক্ষে সবচেয়ে বিপদজনক জিনিস। তাকে আঁকড়ে থাকাটা সব থেকে বড় অনিষ্টের কারণ। তিব্বতের সঙ্গে চীনের আগেও সম্বন্ধ ছিল। ইংরেজরা মাঝে পড়ে তাতে বাধা দিয়েছিল। চীন কি আবার তার পুরনো সম্বন্ধ স্থাপন করতে চাইবে? কিন্তু কমিউনিস্টদের তিব্বতে চীনা সৈনিক পাঠানোর দরকার নেই। আপনাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে, অমদো, খম আর গোলোক-এর তিব্বতী ভাষাভাষী মানুষ চীনের সীমার ভেতরে আছে, তারা নতুন পথ অবলম্বন করে তাদের তিব্বতী ভাইদের অর্ধদাসত্বের ঘানিতে পিষ্ট হতে দেবে না। সাধারণ জনতা তাদের মালিকের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এতে সন্দেহ নেই। আপনারা কি গ্রামগুলিতে খুব শিগ্‌গিরি স্কুল খুলতে পারবেন? আর তিব্বতের অগ্রগতির পথে যে সমস্ত বাধা আছে তা দূর করতে পারবেন? তিব্বতে আধুনিক ঢঙের শিক্ষার প্রয়োজন। খনি বিশেষজ্ঞ, সড়ক ও খালের ইঞ্জিনিয়ার আর সৈনিক বিশেষজ্ঞরও প্রয়োজন

আছে। ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে সাবধান, তারা যেটুকু ঠিক আছে তাও নষ্ট করে দেবে।' সেদিন অল্প সময়ের জন্য জেনারেল শোগাঙও এলেন, তবে বেশির ভাগ কথা শকাপার সঙ্গে হলো। প্রথমে তিব্বত থেকে আনা সংস্কৃত পুস্তক বিষয়ে কথা শুরু হলো, কিন্তু পরে তা রাজনীতিতে মোড় নিল।

১৩ তারিখ লাদাখী হাজী[১] ব্যাপারীর ছেলে দেখা করতে এলো। পাঁচ-ছ বছর ধরে সে লাসায় আছে, কালিম্পঙেও তার দোকান আছে। লাদাখ থেকে তিব্বতের ভেতরে ভেতরে লাসা যাবার রাস্তা আছে, কিন্তু তা যেতে দু-তিন মাস লাগে আর চোর-লুটেরার বিপদে ভরা সে রাস্তা। তাই সেদিক দিয়ে যাবার থেকে লাদাখী ব্যাপারী কাশ্মীর (শ্রীনগর) পর্যন্ত পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়ায় চড়ে এসে মোটর আর রেলপথে কালিম্পং পৌঁছোয়। এখান থেকে তিন-চার সপ্তাহে লাসা পৌঁছে যায়। তরুণটি বলছিল, 'লাসার মানুষ ভয় পাচ্ছে। ভাবছে, যদি চীনা কমিউনিস্ট লাসা পৌঁছোয় তবে আমাদের কি হবে? যদি গণ্ডগোল হয়, ব্যাপারীদের সব লুঠে নেওয়া হবে।' আমি তাকে জানালাম, 'তিব্বতের বড় ব্যাপারীরা আর তুমি একই নৌকোয় আছো, আর চীনা কমিউনিস্টরা গণ্ডগোল হতে দেবে না। হ্যাঁ,তাদের আসার আগে যদি গণ্ডগোল হয়, তবে সে আলাদা কথা।' তার কাছ থেকে এও জানতে পারলাম যে, এখন লাদাখীরা শাসনাধিকার পাচ্ছে। আমার পরিচিত ও সাহায্যকারী নোনো ছেরতন্ ফুন্-ছোগ্ এখন তহসিলদার, আর নায়েব-তহসিলদারও একজন লাদাখী। নোনো খুবই শ্রদ্ধালু বৌদ্ধ ছিলেন। পরে বিয়ে করে খ্রিস্টান হয়ে যান। ইংরেজ আমলে তাতে কিছু লাভ ছিল, কিন্তু এখন এতে লোকসান হয়েছে, কারণ লাদাখে অধিকাংশ বৌদ্ধ ভক্ত, আর তারা তাঁর দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে।

১২ এপ্রিল খবর পেলাম, রাষ্ট্রপতি ভারতীয় সংবিধানের মুসাবিদা অনুবাদের জন্য এক সমিতি বানিয়েছেন, যার মধ্যে আমার নামও আছে। সমিতির অধ্যক্ষ শ্রীঘনশ্যামসিংহ গুপ্ত, আর সদস্যদের মধ্যে সুনীতিবাবু, শ্রীজয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার আমার পরিচিত ছিলেন। এ কাজের জন্য এখন দিল্লী যাবার দরকার ছিল, আর দিল্লী থেকে সব থেকে দূরের ছোট পাহাড়ের ওপর আমি ছিলাম।

কালিম্পঙের নিজস্ব কিছু গুণ আছে,যার জন্য তাকে আমার ভাল লাগল। অন্যান্য পাহাড়ী ঠাণ্ডা দেশের মত এখানেও ঘাম হবার সুযোগ নেই, বরফ পড়ার মত ঠাণ্ডাও এখানে পড়ে না, আর তিব্বতের প্রবেশদ্বার হওয়ায় এখানে তিব্বতী বিদ্বান সমাগমের সুবিধে আছে।

প্রায় চার বছর ধরে মাথার ভেতর 'মধুর স্বপ্ন'[২] চক্কর কাটছে। তার মালমশলা আমি তেহেরান ও লেলিনগ্রাদে জোগাড় করেছিলাম। এখন ইচ্ছে হচ্ছিল, তা কাগজে লিখে ফেলি। গতবছর থেকেই মাথায় এই চিন্তা ঢুকেছে যে, এবার কোনো এক জায়গায় বসে কাজ করা যাক। ডায়বেটিসের জন্য যাত্রা করাটা এখন সুখদ নয়। থাকার জায়গাটা এমন

---

[১]যে মুসলমান পুরুষ হজ করেছেন বা মক্কাতীর্থ দর্শন কবে এসেছেন।—স ম

[২]লেখকেব উপন্যাস গ্রন্থ। ১৯৪৯ সালে লিখিত। *আধুনিক পুস্তক* থেকে প্রকাশিত।—স ম

হওয়া উচিত যেখানে বারোমাস কাজ করা যায়। এমন জায়গা শুধু পাহাড়েই হতে পারে। অনেক জায়গার দিকেই নজর দিলাম, তবে এখন কালিম্পঙের দিকেই মন টানছিল। আমার নতুন প্রকাশক অগ্রিম টাকা দেবার জন্য তৈরি ছিল। তাই সে অসুবিধে ছিল না। বন্ধুরা কয়েকটি জায়গা দেখালো। মহাপ্রজ্ঞা প্রধানজী একটি বাড়ি দেখালেন তা বিদ্যুতের আওতার বাইরে ছিল। জায়গাটাও নোংরা, হ্যাঁ, তাতে খেত অনেকটা ছিল। তবে খেত নিয়ে আমি কি করতাম? দাম বলছিল ১৫ হাজার। পুরনো সেই বাড়ির পক্ষে তা অনেক বেশি। এটাতো আমরা জানতাম যে, এর থেকে কমে পছন্দমত বাড়ি পাওয়া সম্ভব নয়। সেখান থেকে ফেরার সময় রোমান ক্যাথলিক কনভেন্ট পেলাম। ইউরোপিয়ান মিশনারিরা তাদের অনেক বাড়ি বিক্রি করে চলে যাচ্ছিল। সেই সময় তাদের বড় বড় সংস্থাগুলির অবস্থাও ডামাডোল ছিল। কিন্তু ক্যাথলিকরা খুব কমই তাদের বাড়ি কোথাও বিক্রি করছিল বা তাদের মিশন বন্ধ করছিল। অন্যান্য খ্রিস্টান মিশনারিদের থেকে তাদের সবচেয়ে বড় সুবিধে ছিল যে, তাদের কর্মকর্তা পরিবার-মুক্ত আজন্ম সেবক সাধু-সাধ্বীরা ছিল।

এপ্রিলের মাঝামাঝি খবর পেলাম, মোহন শমশেরও এখন দিন গুনছে। তার অনুজ ববর শমশেরের বক্তব্য, 'তরবারির জোরে আমরা রাজ্য জয় করেছি, আর সেই তরবারির জোরেই আমরা তাকে রক্ষা করব।' ভারত সরকারও এখন নেপালের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি, বরং রাণা-শাসন ইউ· এন· ও-র সদস্য হওয়ার ইচ্ছেপ্রকাশ করলে ভারত সরকার সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল।

স্থায়ী বাসস্থান বানানোর চিন্তায় একবার সিকিমের শেষ গ্রাম লাছেন-এর দিকে মন আকৃষ্ট হলো। তিব্বত থেকে ফেরার সময় দুবার আমি এই গ্রামটির ওপর দিয়ে গিয়েছিলাম। আপেলের জন্য সে এদিককার কোটগড় আর কুলু হয়ে উঠেছে। এই শতাব্দীর শুরুতে একজন ফিনিস মহিলা এখানে তার আড্ডা গেড়েছিলেন। ভাবলাম, অন্য মিশনারিদের মত হয়তো তিনিও তাঁর বাংলো বেচে দেবেন, সেটাই নিচ্ছি না কেন? যদি না বেচে, তাহলেও দেবদারুর সুন্দর ছায়ায় ঘুমন্ত এই জমিতে বাড়ি বানানোর জন্য জায়গা পাওয়া যেতে পারে।

২২ এপ্রিল হোমস-এর দিকে হাঁটতে গেলাম। তার এক প্রান্তে একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের বাড়ি ছিল, সঙ্গে এক একরের কিছু বেশি জমি। খাস মহলের বাইরের জমি শুধু নেপালীরাই কিনতে পারত। বাড়ি খুব পুরনো ছিল, ফার্নিচারও খুব বিবর্ণ ও ভাঙাচোরা। দাম বলেছিল ২৮ হাজার। সেদিনই খবর পেলাম, ড· জর্জ রোয়েরিক এখানেই আছেন। তাঁর এখানে আসার খবর আগেই চিঠিতে জেনেছিলাম। সন্ধেবেলা তাঁর বাসা 'কুকেটি'তে গেলাম। তাঁর মা এখন অসুস্থ ছিলেন তাই তাঁর সঙ্গে দেখা হলো না। তিন ঘণ্টা ধরে আমাদের কথাবার্তা হলো। ১৯৪৭-এ কুলুতে যে খারাপ অবস্থা হয়েছিল, তার জন্য তাঁদের পরিবারের মন উঠে গিয়েছিল। তিনি তাঁর বাবা ও ভাইয়ের মত চিত্রশিল্পী নন, তাঁর বিষয় হলো ভারত-তিব্বত-মঙ্গোলিয়ার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা, ইউরোপে তাঁর মত তিব্বতী আর মঙ্গোলীয় ভাষার এত বড় বিদ্বান সম্ভবত আর কেউ

নেই। কালিম্পঙে থাকায় তিব্বতের বিদ্বানদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করার সুবিধে ছিল, সেইজন্যও তাঁর এই জায়গাটা পছন্দ হয়েছিল। তিব্বতী ইতিহাসের একটি খুব বড় গ্রন্থ 'দেব্‌তের ডোনপো' (নীল পুস্তক)-র অনুবাদ তিনি ইংরেজিতে করেছিলেন, এখন সেটা বাংলা এশিয়াটিক সোসাইটিতে ছাপা হচ্ছে। গত বছরই কালিম্পঙে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়েছে। জর্জ তাঁর সাহিত্যিক সাধনায় রত আছেন।

২০ এপ্রিল হাঁটার সময় ভিক্ষু অনিরুদ্ধ সঙ্গে ছিলেন। ভিক্ষু অনিরুদ্ধ শ্রদ্ধাবান 'নেওয়া'র বৌদ্ধ পিতার সন্তান। পিতাও ধর্মালোক নাম নিয়ে ভিক্ষু হলেন, আর চাইলেন দুই ছেলেকেও ভিক্ষু করে দিয়ে ভবিষ্যতের পরম্পরা ছিন্ন করে ফেলি। কিন্তু ছোট ছেলে তাতে রাজি হলো না। তার কথা শুনে হাসি পেত। ভিক্ষু হবার জন্যই সে সিংহল গিয়েছিল। কিন্তু বলত, 'আমার দুটো বিয়ে লেখা আছে, তাই আমি ভিক্ষু হব না।' ভিক্ষু না হয়ে সে তিব্বতের ব্যবসায়ী হয়ে গেল। বড় ভাই সিংহলে শ্রামণের দীক্ষা নিলেন, আর এখন ভিক্ষু হয়েও অনিরুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। বর্মায় যখন ছিলেন, তখন মহাযুদ্ধ শুরু হলো। বর্মা জাপানের হাতে চলে গেল। সমস্ত যুদ্ধের সময়টা সেখানেই ছিলেন। মুখে বলার মত জাপানী ভাষা শিখে নিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো ভাষা পড়ায় তাঁর মন বসত না। তাঁর ভেতরে এখনও ছেলেমানুষী বেশি ছিল, কিন্তু স্বভাব ছিল ভাল।

দিল্লী—সংবিধানের মুসাবিদার অনুবাদ করার ছিল, তাই তার পরিভাষাগুলির বিষয়ে আমি এদিকে কিছুটা প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। ছোট লাইনের গাড়িতে খুব ভুগেছিলাম, তাই তাতে দিল্লী যাবার সাহস হলো না। ঠিক করলাম বাগডোগরা থেকে কলকাতা আর কলকাতা থেকে দিল্লী বিমানে যাব। কালিম্পঙের এক মারোয়াড়ী বন্ধু টিকিট কাটার ব্যবস্থাও করে দিল। খাবারের দিকটা মহেশজী সামলাচ্ছিলেন। আমার দু বন্ধু পরিভাষার কাজে লেগে গিয়েছিলেন।

২৩ এপ্রিল আমরা মোটরে রওনা হলাম। শিলিগুড়ি ৪২ মাইল আর সেখান থেকে ৮ মাইল গিয়ে বারোটার সময় বাগডোগরা পৌঁছে গেলাম। যাত্রায তিন ঘণ্টা লাগল। বিমানঘাঁটি অস্থায়ী মত ছিল। ফাঁকা পড়ে থাকা জমিতে লোহার জাল বিছিয়ে অবতরণ ভূমি তৈরি করা হয়েছিল। অফিসের জন্য বানানো হয়েছিল কাঠের ঘর। কোটিয়ানবাঁও (ছাপরা)-এর শ্রীরঘুবংশ প্রসাদও সঙ্গে যাচ্ছিলেন। প্রথম বিমানে চড়তে যাচ্ছেন, তাই খুব ভয় পাচ্ছিলেন। আমি সাহস দিয়ে বললাম, 'রঘুবংশবাবু, ভয় পাবেন না। যদি কখনও এমন হয়ও, তাহলে বিমানের লোকেদের যোগীর মৃত্যু লাভ হয়। ব্যাস, কযেক মিনিটেই মানুষ এপার থেকে ওপারে পৌঁছে যায়।' কিন্তু যোগীদের মত মরার জন্যই বা কজন তৈবি হয়? আজকাল তো ডাক্তাররা যখন থেকে একে হৃদয়ের গতি বন্ধ হওয়ার রোগ (হার্টফেল) বলতে শুরু করেছে, তখন থেকে আকর্ষণ আরোই কমে গেছে। যাইহোক, আমি যাচ্ছিলাম, তাই রঘুবংশবাবু কিছুটা শান্তি পেলেন। তিনটে বেজে কুড়ি মিনিটে আমরা বিমান বন্দরে পৌঁছেছিলাম, আর বিমান ওড়ার কথা এক ঘণ্টা পরে। মাল তোলা হলো। সঙ্গে শরীরও। কুড়ি সেরের বেশি মাল হলে ভাড়া দিতে হতো, কিন্তু শরীরের

ওজন নেওয়া হয় এই কথা চিন্তা করে যাতে লোহার এই গরুড় যতটা বইতে পারে ততটাই ওজন তোলা যায়।

বিমান দৌড়ে গিয়ে আকাশে উড়ল। কানে খুব জোরে আওয়াজ আসছিল, তবে তা অতটা কষ্টকর মনে হলো না, যতটা তেহরান থেকে মস্কোগামী বিমানে হয়েছিল। সেটা ছিলও মাল বইবার বিমান। অবশ্য যাত্রী না পেলে এই বিমানও কমলা লেবু এবং অন্যান্য জিনিস চাপিয়ে ছ্যাকড়াই হয়ে যেত।

পাহাড় পিছনে পড়ে রইল। সামনে নীচে আগাগোড়া সমতল জমি। বিমান দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল। মাটিতে ছোট ছোট অনেক নদী। বৃষ্টি বেশি হয় বলে সেগুলো মোটেই শুকোয় না। দেখলে সাপের মতো আঁকাবাঁকা মনে হচ্ছিল। গ্রামগুলোকে বাড়ির গুচ্ছের মত নয়—একগাদা খেলাঘরের মত দেখাচ্ছিল, আর গাছগুলোকে মনে হচ্ছিল ঘাস। জায়গায়-জায়গায় বিচরণ করা গবাদি পশুদের পিঁপড়ের মতো দেখাচ্ছিল। বিমান পাঁচ থেকে ছ-হাজার ফুট উচ্চতায় উড়ছিল। কোথাও কোথাও মনে হচ্ছিল যেন টুকরো টুকরো মেঘ তার নীচে দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। পাঁচটার কাছাকাছি সময়ে যে সঙ্কেত পেলাম তার থেকে জানতে পারলাম যে, আমরা হাজার ফুট ওপরে উড়ছি এবং গতি ঘণ্টায় ১৬৫ মাইল। চারটে বেজে ৫৩ মিনিটে বিমান ইংলিশ বাজারের ওপরে উড়ছিল। কোসীকে তো মনে হচ্ছিল যেন সহস্রধারা হয়ে গেছে, আর গঙ্গা এত সরু যে, কখন পার হলাম টেরও পেলাম না। বুঝতেই পারলাম না কখন বিহারের সীমা পার করে আমরা বাংলায় চলে এসেছি। বিমানের ষোলটা সিটের এক-তৃতীয়াংশ খালি ছিল। ভারতে এই প্রথম বিমান-যাত্রার সুযোগ পেয়েছিলাম। পুষ্পক বিমানের কথা মনে পড়ছিল। কল্পনাতেই হোক না কেন, তবু আকাশ থেকে পৃথিবী কেমন দেখায়, কবিরা তার কল্পনা করেছিল। সেই কল্পনা ততটা আকর্ষণীয় হতে পারে না, যতটা আমাদের দেশের এই পূর্বভূমিকে দেখাচ্ছিল।

সন্ধে ছটার সময় দমদম বিমান বন্দরে অবতরণ করে আমরা ট্যাক্সি নিয়ে ৪ নম্বর রামজীদাস জেটিয়া লেনে মণিবাবুর বাড়িতে পৌঁছলাম। যাত্রার পরে বিশেষ করে রাতে স্নান করা আমার অভ্যাস। ধুলো-ময়লার জন্য রেল-যাত্রায় তো তা আবশ্যিকও, তবে বিমানে তেমন কোনো ব্যাপার ছিল না। গরম পড়ে গিয়েছিল তাই স্নান করে আনন্দ পেলাম।

২৪ তারিখ সকাল ছটার সময়ই আবার বিমান বন্দরে পৌঁছলাম। বাগডোগরা থেকে কলকাতার ভাড়া ৭৪ টাকা ছিল, আর দিল্লী পর্যন্ত ছিল ২০৩ টাকা। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজের বিমান 'সাট্‌লেজ' পেলাম, তাতে ২৪টি সিট ছিল আর সবগুলিতেই যাত্রীরা বসেছিল। এই বিমানটিকে বেশি পরিষ্কার আর সাজানো বলে মনে হচ্ছিল। বিমানটি চলেও আন্তর্জাতিক বিমান পথে। এর গতি ছিল দুশো মাইলেরও বেশি, আর উড়ছিল দু হাজার ফুট উচ্চতায়। কলকাতা থেকে সাতটা বেজে ৪০ মিনিটে আমরা রওনা হলাম, দিল্লী পৌঁছতে ৪ ঘণ্টা ২০ মিনিট লাগল। যাতায়াতের এই নতুন মাধ্যম দূরত্বকে কতটা কমিয়ে আনছে! এই বিমানে ৪৪ পাউন্ডের ভাড়া ছিল না, চার পাউন্ড বেশি

হওয়ায় চার টাকা আরো দিতে হলো। কলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত সমস্ত নক্সাটা আমাদের পায়ের নীচে পড়েছিল। কোথাও কোথাও কুয়াশা বেশি ছিল, যার জন্য পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। ভালভাবে দেখার জন্য দূরবীনের প্রয়োজন ছিল। উড়োজাহাজ থেকে ফটো তোলা বারণ। নীচে নদীগুলি সর্পিল গতিতে বয়ে চলেছিল। জঙ্গল, বাগান, গ্রাম আর শহর জায়গায় জায়গায় পড়ে থাকছিল। বাড়িগুলির উচ্চতা চোখেই পড়ছিল না। কতদূর পর্যন্ত গঙ্গা, তারপর শোন এলো, তারপর কিছুদূর যাবার পর গঙ্গা পার হয়ে গোমতী ধরে চললাম। তারপর রামগঙ্গা ও গঙ্গা পার হয়ে যমুনা পড়ল, আর বারোটার সময় বিমান দিল্লীর পালাম বিমানবন্দরে নেমে পড়ল। বিমানবন্দর থেকে ট্যাক্সি নিয়ে কয়েক মিনিটেই ১৩ নং ফিরোজশাহ রোডে শ্রীচন্দ্রগুপ্ত বিদ্যালঙ্কারের বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। কালিম্পং থেকে দিল্লী পৌঁছনোর এই রাস্তা খুব ঘুরপথ ছিল। যদি বাগডোগরা থেকে সোজা দিল্লীর বিমান থাকত, তাহলে কালই আমরা কালিম্পং থেকে দিল্লী পৌঁছতে পারতাম।

কালিম্পঙে হেঁটেও ডায়াবেটিসের উৎপাত কমেনি। এখানে তা কিছুটা কম হয়েছিল। সম্ভবত ভাত খাওয়া আর ঠাণ্ডা জায়গার জন্যই, তবে এটা মনকে স্তোক দেবার মত কথা। ওজন এখনও ১৭২ পাউন্ড, যা বেশি বলেই মনে হচ্ছিল। দিল্লীতে ১০৩ গরম, কষ্ট তো হবারই কথা।

২৫ তারিখ সন্ধেবেলা পার্লিয়ামেন্ট ভবনের সেই ঘরে গেলাম, যেখানে আমাকে কাজ করতে হবে। সাতজন বিশেষজ্ঞ—জয়চন্দ্রজী, সুনীতিবাবু, দাতে, ঘনশ্যামসিংহ গুপ্ত, প্রফেসর মুজীব, সত্যনারায়ণজী আর আমি—সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এই প্রথম আমাদের দেখা হয়েছিল, তাই ভাষা ও পরিভাষা বিষয়ে ভাবনার আদানপ্রদান হলো। প্রফেসর মুজীব বাদ দিয়ে সবাই তাঁদের মত জানালেন। প্রফেসর মুজীব তো তখনই বলতেন, যখন উর্দু পরিভাষার জন্যও কোনো অবকাশ থাকত। কিন্তু পরিভাষাব ব্যাপারে ভারতের বাকি সমস্ত ভাষা একদিকে ছিল, কারণ সবাই সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে বাজি ছিল, সেখানে উর্দুর পরম্পরা তাকে আরবীর সঙ্গে জুড়ে রেখেছিল। এ বিষয়ে সবাই একমত হলেন যে, অনুবাদের ভাষা সুগম হওয়া দরকার, অজ্ঞাত ও কঠিন শব্দকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। পরিভাষাগুলি ভারতের দশটি ভাষাতেই একরকম হওয়া চাই, আর রচনার কাজে সবার সাহায্য নেওয়া উচিত। এটা বুঝতে পেরেও আমার খুব আনন্দ হলো যে, আমাদের সচিব বালকৃষ্ণ ভাষা ও পরিভাষার বিষয়ে খুবই যোগ্য ব্যক্তি। সেখান থেকে উঠে শ্রীগুপ্তজী বালকৃষ্ণজীর সঙ্গে আমবা ঠিকেদার নারায়ণদাসের বাড়িতে পৌঁছলাম। আমাদের তিনজনের অনুবাদ পরের দিন নিয়ে যাবার ভার দেওয়া হয়েছিল। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা কাজ করতে থাকলাম।

২৬ এপ্রিল আবার সমিতির বৈঠক হলো, আর কাল যে অনুচ্ছেদগুলির আমরা অনুবাদ করেছিলাম, সেগুলি গৃহীত হলো। এও ঠিক হলো যে, আমি আর প্রফেসর বালকৃষ্ণ অনুবাদ করব এবং পরের বৈঠক ১০ মেতে তা পেশ করব। সেদিনও রাত এগারোটা পর্যন্ত আমরা দুজন অনুবাদ করতে থাকলাম। আমরা যে রাস্তা ধরেছিলাম, তাতে ছ সদস্যের মধ্যে কারোরই আপত্তি ছিল না জেনে খুব সন্তুষ্ট হলাম।

২৭ এপ্রিল ডা· ভারদ্বাজের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর সঙ্গে মেডিকেল পরিভাষার কাজ নিয়ে কথা হলো। আশ্চর্য হওয়াই উচিত যে, এঁদের মত আধুনিক রীতিতে সুশিক্ষিত দম্পত্তি বিধবা-বিবাহের বিরোধী। সেই সময় হিন্দু বিবাহ-ব্যবস্থায় স্ত্রীরাও বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার পেতে চলেছিল। ডা· ভরদ্বাজ সেইসব লোকেদের দলে ছিলেন যাঁরা মনে করতেন যে, বিবাহ-বিচ্ছেদের স্বাধীনতা পেলে স্ত্রীরা পড়িমরি করে আদালতের দিকে দৌড়বে। এটা খেয়াল ছিল না যে, পুরুষরা রুপোর সুতোয় স্ত্রীদের বেঁধে রেখেছে। যতদিন পর্যন্ত স্ত্রীদের আর্থিক স্বাধীনতা নেই, ততদিন তারা পুরুষের সব রকমে গোলামী করার জন্য তৈরি থাকবে। সেদিন রাত নটা পর্যন্ত সমস্ত সময়টা বালকৃষ্ণজীর সঙ্গে অনুবাদ করার কাজে লেগে রইলাম। রঘুবীর-তন্ত্র এক বিচিত্র ক্লিষ্ট তথা নতুন ভাষা তৈরি করেছিল, যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার ছিল। শ্রীসত্যনারায়ণজী হিন্দুস্তানীর পক্ষপাতী, কিন্তু তিনিও আমাদের অনুবাদে সন্তুষ্ট ছিলেন।

দিল্লীতে রাতটা ভাল, তবে দিনের বেলা পাখাই ছিল জীবনের অবলম্বন।

২৮ তারিখে মধ্যাহ্নভোজন শ্রীসত্যনারায়ণজীর বাড়িতে করলাম, আবার আসতে হবে ভেবে গদি-মশারি এখানেই রেখে বারোটার সময় ডালমিয়ার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজের অফিসে গেলাম। লু চলছিল। টিকিট নিলাম। একটার সময় বিমান উড়ল। মাটিতে কোথায় গরমের চোটে মাথা ভোঁ ভোঁ করছিল, আর কোথায় ৯৫০০ ফুট উঁচু একশোমাইল গতিতে চলন্ত বিমানের ভেতরে সুন্দর আবহাওয়া। বেনারসের ওপর দিয়ে ওড়ার সময় সেখানকার গরমের কথা মনে পড়ল, আর তারই ৯০০ ফুট ওপরে এমন সুখদ আবহাওয়া। পৌনে পাঁচটার সময় আমরা কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছলাম এবং ট্যাক্সিকে আঠারো আনা দিয়ে ছটার সময় মণিহর্ষজীর বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। সেইসময় কমিউনিস্টদের উৎখাত করার জন্য সরকার উঠে পড়ে লেগেছিল। সেইদিন কমিউনিস্টদের অনশন ধর্মঘট সমর্থন করে মিছিল বেরিয়েছিল, তাতে গুলি চালানো হয়েছিল।

কালিম্পং—২৯ এপ্রিল সকালে দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছে ছটা বেজে ১০ মিনিটে আমরা উড়লাম। পথে মেঘ করেছিল, বিমান আরও ওপরে উঠল, আর অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাটি দেখা গেল না। একরকম চোখ বুজে আন্দাজে চলা। বিমানে যাত্রী কম আর মাল বেশি ভরা ছিল। একজন মারোয়াড়ী সহযাত্রী শঙ্কিত হৃদয়ে বসেছিল—অন্যজন ছিল বমি করতে ব্যস্ত। বিমান বেশি নড়াচড়াও করছিল না, পেটের জিনিসও নড়তে পারত না, তাহলে বমি কেন? মনস্তাত্ত্বিক কারণেই? মেঘের জন্য হিমালয়কে দেখতে পেলাম না। দু ঘন্টা উড়ানের পর বাগডোগরা পৌঁছলাম। তারপর বিমান কোম্পানির মোটরবাস আমাদের শিলিগুড়িতে পৌঁছে দিল। মুসলিম হোটেলের মালিক খাওয়ানোর সময় বলছিল, 'এখানে দুদিকের জমি ভারতের কিন্তু রেলওয়ে লাইন পাকিস্তানের।'

'বাংলার গভর্নর ড· কাটিজু আসবেন, তাঁকে স্বাগত জানাতে লোক জড়ো হয়েছিল। ১০ টাকায় মোটরের সামনের সিট পাওয়া গেল। সাড়ে বারোটার সময় ধর্মোদয় পৌঁছে

গেলাম। আনন্দজীকে সেখানে উপস্থিত পেলাম। বৈশাখী পূর্ণিমার প্রস্তুতি চলছিল। দিল্লী থেকে ফেরার পর বাড়ি কেনার উৎসাহে কিছুটা ভাঁটা পড়েছিল। চিন্তা করতে লাগলাম, সর্পবৃত্তি অবলম্বন করে অপরের বাড়িতে থাকাটাই ঠিক। কেনই বা ঘরে বাঁধা পড়ি আর কেনই বা টাকা-পয়সার চিন্তায় পড়ি? দিল্লী আবার যেতে হবে। শুনে আনন্দ হলো যে, দিল্লী থেকে সোজা বাগডোগরা আসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু, আমার সময়ে তা হওয়া সম্ভব হয়নি। দিল্লীতে বর্ষা ছিল না, কিন্তু এখন দিনরাত বৃষ্টি হচ্ছিল।

আবার হাঁটার নিয়ম পালন করা শুরু হলো। কথা বলার সময় আগাগোড়া বলেই যেতে হতো। ভাবলাম এক ঘণ্টা মৌনব্রত রাখা যাক, যাতে 'মধুর-স্বপ্ন'র বিষয়ে রেখাচিত্র বানানো যায়। একটা বাদে আমি সবই ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে এসেছি, আর এর পরে যদি লিখি তাহলে ঐতিহাসিকই লিখব। এতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। দেশ-কাল-পাত্র সম্পর্কিত কোনো অনৌচিত্য যাতে না হয়, তার জন্য সবরকমের প্রাপ্য উপকরণ অধ্যয়ন করে নোট নিতে হয়। অধ্যায় অনুসারে উপন্যাসের কাঠামো তৈরি করা, তারপর তাতে উপকরণগুলি যথাস্থানে বসানো। এরপরে বড় বড় ঘটনাগুলিরও সন্নিবেশ করা। তবে গিয়ে কাহিনী তৈরি হয়, যা অনেক জায়গাতেই লেখকের ইচ্ছে না থাকলেও দূরে টেনে নিয়ে যায়। 'মধুর-স্বপ্ন' কিছু অংশ লেখানো হয়ে গিয়েছিল। মহেশ লেখার কাজ করছিলেন। ৫ মে অষ্টম অধ্যায় লেখালাম। সেদিনই সন্ধেবেলা দার্জিলিঙের ডেপুটি কমিশনার শ্রীনির্মলজী এলেন। তিনি সেনগুপ্তের সহপাঠীও ছিলেন। দেশের পরিস্থিতি নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হতে থাকল।

পরের দিন সন্ধেবেলা ধর্মোদয়ের নীচে শ্রীমতি স্কটের অন্ধ বিদ্যালয়ে গেলাম। সেখানে ২৪টি ছেলে লেখাপড়া করছিল। তাদের সমস্ত ব্যবস্থা শ্রীমতি স্কট করেন। এই ধরনের অবলম্বনহীন মানুষকে স্বাবলম্বী বানানো একটা বড় কাজ। তাঁর কাছে খবর পেলাম লাছোনের মিশনারি বুড়ি মরে গেছে, কিন্তু ফিনল্যান্ড মিশন তাদের কাজ ছাড়েনি।

৭ মে ম্যালেরিয়া-রানী খবর পাঠাল—'এটা আমার রাজ্য, আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।' এটা কি তাকে স্বাগত জানানোর সময় ছিল? পায়ে শিরশিরানি, পেটে কিছু গণ্ডগোল টের পেলাম। আমি কুইনিনের দুটো গুলি দিয়ে ছাড়া পেতে চাইলাম। পরের দিন হাঁটা বন্ধ হলো। ক্ষিদেও ছিল না, তবে জ্বর এখনও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। সেদিনও দুটো গুলি ধরিয়ে দিলাম। মশারি দিল্লীতে রেখে আসার জন্য পস্তাতে শুরু করেছিলম, কেননা এখন মশা বেড়ে গিয়েছিল।

শারীর স্থানের পরিভাষাগুলির চূড়ান্ত রূপ দেবার জন্য আমরা ব্যস্ত ছিলাম।

১১ মে এবারের বৈশাখী পূর্ণিমা পড়ল। কালিম্পঙে প্রচুর বৌদ্ধ আছে, আর তাদের একাধিক মন্দির আছে। ধর্মোদয় বিহারে সকালে বুদ্ধপূজা হলো, দুপুরে ভিক্ষুদের খাওয়ানো হলো। অনেক স্ত্রী-পুরুষ এসেছিলেন। বিহার খুব ভালভাবে সাজানো হয়েছিল। দেড়টার সময় আনন্দজীর সভাপতিত্বে সভা হলো। এস· ডি· ও· শ্রী প্রধান ধর্মোদয় সভার গ্রন্থাগারের উদ্‌ঘাটন করলেন। বেশ মেঘ করে আসছিল, কিন্তু মেঘ যজ্ঞে বাধা দিল না। আমিও বললাম। ড· ভট্ট তাঁর ভাষায় (কন্নড়) বলতে পারতেন না, ইংরেজি আর

জার্মানির ওপর তাঁর পুরো দখল ছিল, কিন্তু তিনি সংস্কৃততে বললেন। তাঁর অকৃত্রিম সংস্কৃতের আমি আগে থেকেই প্রশংসাকারী ছিলাম। এখন এত বছর পরেও তিনি সেইরকম দখল রাখতে সক্ষম হবেন, এতটা আশা করিনি। কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে এই সময় তিব্বতীর অধ্যাপক একজন বুর্য়ত-মঙ্গোল ভিক্ষুও ওখানে এসেছিলেন।

তিব্বতে দর্শন, তর্কশাস্ত্র, বিনয়, মহাযানসূত্র ও মাধ্যমিকশাস্ত্র—এই পাঁচটি বিষয়ের পাঁচটি গ্রন্থ পড়ানো হয়ে থাকে—অভিধর্মকোষ, প্রমাণবার্তিক, বিনয়সূত্র, অভিসময়ালংকার এবং মধ্যমাক্কাবতার। এর মধ্যে শেষেরটি বাদ দিয়ে সবগুলি সংস্কৃততে পাওয়া যায়। প্রথম দুটিকে আমি সম্পাদিত করে প্রকাশ করেছি, তৃতীয়টি সম্পাদিত হয়ে ছাপা হয়ে গেছে, কিন্তু প্রকাশকের ঘরে ছাতা পড়ছে। চতুর্থ পুস্তক রাশিয়া থেকে ছাপা হয়ে গেছে, আর শেষেরটি এখন তিব্বতী ভাষাতেই পাওয়া যায়। আমি ভাবছিলাম, যদি সংস্কৃত আর তিব্বতী অনুবাদ পাশাপাশি রেখে অনুবাদ করা যায়, তাহলে তার ফলে দুটি ভাষাই যারা জানে তাদের লাভ হবে। প্রথম পুস্তকেব মুদ্রণের খরচের ভার আমার বন্ধু শ্রীত্রিরত্নমান নিয়েও নিলেন, কিন্তু সব থেকে বড় অসুবিধে হলো তিব্বতী টাইপ নিয়ে। কলকাতার একটি প্রেসের চার্জ চারগুণ-পাঁচগুণ ছিল, অন্যান্য প্রেস ফাঁসিয়ে রাখার মত, সেই কারণেই মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর ভট্টাচার্য সম্পাদিত অসংগ-এর 'যোগচর্যা-ভূমি' এখনও পর্যন্ত বেরোতে পারেনি এবং সম্পাদক একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েছেন। কালিম্পঙে শ্রীথর্চিন-এর প্রেস কাজ কবতে পারত, কিন্তু সেও কোনো পরোয়া করত না। এই সব অসুবিধের জন্যই এই কাজটা পড়েছিল, নয়তো দু-তিনটি বই অবশ্যই বেরিয়ে যেত।

পরের দিন (১২ মে) টাউন হলে আমার সভাপতিত্বে বুদ্ধ জয়ন্তী পালিত হলো সেখানে মঙ্গোল, ভারতীয়, তিব্বতী, নেপালী, সুইস ও রুশ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরা বললেন। বৌদ্ধধর্মের আন্তর্জাতিক রূপ এখানে চোখেব সমানে ছিল।

তিব্বতের ভবিষ্যতের বিষয়ে নিশ্চিন্ত ও প্রসন্ন ছিলাম। কিন্তু একটা ব্যাপারে অবশ্য আমার চিন্তা হতো যে, তিব্বতী ভাষার প্রকাণ্ড পণ্ডিতেরা পাছে শোনা কথায় কান দিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যাবার জন্য তৈরি হয়ে যায় আর তাদের বিদ্যা মূল্যহীন হয়ে যায়। ১৩ মে এমনই একজন মঙ্গোল পণ্ডিত এলেন। নিজের দেশ থেকে এসে আমার বিহারে কয়েক বছর থেকে পড়াশোনা করছিলেন। এখন ৫৫ বছর বয়স হয়েছিল। কিছু চিত্রকলার কাজও জানতেন। কালিম্পঙে আসা বছরখানেক হয়েছে। ছবি দিয়েই কিছুটা জীবিকা উপার্জন করতেন। খুব কষ্টে ছিলেন। তাঁর বিদ্যা এখানে কোনো কাজে লাগেনি। আমি জানতাম, পাঁচ টাকা দিয়ে আমি আমার কষ্ট দূর করছি। তাঁর কষ্ট দূর করার একটাই পথ ছিল—তাঁর তিব্বতে ফিবে যাওয়া। কিছুদিন পরে পড়ানো-লেখানোর কাজ তিনি ঠিক পেয়ে যাবেন।

তিব্বতে উত্তর হোয়াং-হো উপত্যকায় তুংগন (চীনা মুসলমান)-দের দিকে কমিউনিস্ট মুক্তি সেনা এগিয়ে যাচ্ছিল। সেখানকার মুসলিম নেতা তার লোকেদের সর্বেসর্বা হয়ে রাজার হালে থাকত, সে কেন কমিউনিস্টদের স্বাগত জানাতে চাইবে? তবে হেরে গিয়ে

তাদের অবশ্য পালাতেই হতো। আমার চিন্তা ছিল যে, তারা ভারতে পালানোর সোজা রাস্তা না ধরে, আর লাসা হয়ে কালিম্পঙে না আসে। এমন হলে তাদের লুটপাটে রেডিঙ্, লাসা ইত্যাদি জায়গার প্রাচীন বৌদ্ধবিহার নষ্ট হয়ে যেত, তার সঙ্গে আমাদের সহস্র অমূল্য সাংস্কৃতিক সম্পদও ধ্বংস হয়ে যেত। এই বিপদের বিষয়ে আমি রাষ্ট্রপতিকে লিখি এবং 'বিশ্ব-দর্শন'-এ একটা লেখাও লিখি। রাষ্ট্রপতি চীন স্থিত আমাদের রাজদূতকে তাঁর এর খবর দেন এবং এই সম্পদগুলির দিকে চীন সরকারকে নজর দিতে বলেন। সৌভাগ্যক্রমে তুংগনরা হেরে গিয়ে এই রাস্তায় পালায়নি। তারা আরো পশ্চিম-এর দিকে পালায় এবং শেষে তাদের নেতা সিঙকোয়াঙ হয়ে কাশ্মীরে চলে আসে।

কালিম্পঙে আর সবকিছু ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখনও খাবার ভাল ব্যবস্থা হয়নি। খাবারের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন রুচিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, তবুও এমন ছিল না যে তাঁরা তাতে হেরফের করা অপছন্দ করতেন। কিন্তু কোনো ভাল রাঁধুনি পাওয়া যাচ্ছিল না। কয়েকজন রাঁধুনি বদলাতে হয়েছিল।

ধর্মোদয়ের ওপর তলাটা আমরা প্রায় দখল করে নিয়েছিলাম। খুব ভাল জায়গা ছিল—শহরের বাইরেও আবার কাছেও। নীচ দিয়ে কালিম্পং যাবার রাস্তা গেছে। এখানে গরমের ভয় ছিল না, কিন্তু পরিচিতের সংখ্যা বেশি ছিল বলে দেখা-সাক্ষাৎ করতে গিয়ে অনেক সময় নষ্ট হতো। তবে এই অবস্থাটা শুরুতে ছিল। যখন লোকে জানতে পারল যে, রোববার এলে আমাদের সুবিধে হয়, তখন তারা সেইদিন আসতে লাগল। তখন আমি ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠতাম, ১৫ মিনিটে হাত মুখ ধোওয়া সেরে ফেলতাম, হাঁটতে দেড় দু ঘণ্টা লেগে যেত। আটটার মধ্যে কখনও জলখাবার খেতাম, তারপর লেখা অথবা শব্দকোষের কাজে লেগে যেতাম, কখনও সাড়ে আটটার থেকে নটার মধ্যে আধঘণ্টার জন্য ঘুমিয়ে নিতাম, তারপর কাজে লেগে পড়ে মধ্যাহ্নভোজন করে দৈনিক পত্রিকাকে কয়েক মিনিট দেবার পর সন্ধে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত কোষের কাজ করতাম। নৈশ ভোজনের পরে সঙ্গীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বার্তালাপ হতো, তারপর দুঘণ্টা 'মধুর-স্বপ্ন' লেখাতাম। এর পরে হাল্কা কিছু পড়তাম আর তারপর ড· ভট্টর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলে শুয়ে পড়তাম।

ড· ভট্টর ১৮ বছরের জার্মানি প্রবাস বড়ই মজার অভিজ্ঞতায় ভরা। সংস্কৃতের পুরনো পণ্ডিত ছিলেন। যখন জার্মানির উদ্দেশে রওনা হলেন, তখন ডিম খাওয়াও তাঁর পক্ষে মুশকিল ছিল। পণ্ডিতী দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্গে গিয়েছিল। জার্মানিতে পৌছনোর পর তাঁর কাছে খুব বেশি হলে একশো টাকা অবশিষ্ট ছিল। আমি চিঠি লেখাতে টুবিংগন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের প্রফেসর কাজের বদলে তাঁকে কিছু আর্থিক সাহায্য দেবার কথা বলেন এবং দেনও। কিন্তু সেই সাহায্য এতই কম ছিল যে, তা দিয়ে তিনি খুব কষ্টে কাজ চালাতে পারতেন। আমি মন্ত্র শিখিয়ে দিলাম—মানুষের ঝাঁপ দেওয়া উচিত। যদিও যেখানেই সে ঝাঁপ দেবে, সেখানে মানব-সমুদ্রই থাকবে, আর মানবতা তো সর্বত্র মানুষকে রক্ষা করার জন্য তৈরি থাকে। অজ্ঞাত-অপরিচিত স্থানেও মানুষের বন্ধু হয়ে যায়, তখন গাড়ি চলতে শুরু করে। যারা ঝাঁপ দেয় তাদের মধ্যে হাজারে একজনই ডোবে। ৯৯৯ জনকে ছেড়ে

আমাদের ওই একজনের দলে নাম লেখানোর কি দরকার? ড· ভট্ট সংস্কৃতের কোনো একটি বিষয় নিয়ে টুবিংগনে পি· এইচ· ডি· করেন। এরপর প্রাচীন শিক্ষায় মন ভরল না তাঁর, অর্থশাস্ত্র-রাজনীতি নিয়ে বার্লিন ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট হলেন। তাঁর শিক্ষা ও প্রতিভা সহায়তা করল—তিনি বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসার হয়ে গেলেন। কলমেরও শক্তি নিয়ে ভারতের বিষয়ে লিখতে থাকলেন। পরে ভারত বিষয়ক গণিত নিয়ে তাঁর পরিচয়-গ্রন্থ এত ভাল হয়েছিল যে, সে-বইয়ের কয়েক লক্ষ মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল। বই ও লেখার রয়াল্টিও পেতে থাকলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাগল। ড· ভট্ট নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য অধীর ছিলেন, আর সেজন্য কাজ করছিলেন। নেতাজী যখন সেখানে পৌছলেন এবং জার্মান-ইংরেজিতে পত্রিকা বার করতে চাইলেন, তখন তার মুখ্য সম্পাদকের জন্য ড· ভট্টর ওপর তাঁর নজর পড়ল। এরপর নেতাজীর ডান হাত হিসেবে ততদিন কাজ করতে থাকেন, যতদিন না নেতাজী সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে পূর্বে পৌছে যান। তারপরেও ভট্টজি নিজের কাজে একইভাবে লেগে ছিলেন।

জার্মানির পরাজয় হলো। মিত্রশক্তি কিভাবে তাঁকে স্বাগত জানাবে, তা তিনি জানতেনই। তাই দক্ষিণ জার্মানির এক গ্রামাঞ্চলে তিনি চলে যান এবং কোনো চাষার ঘরে খেতের কাজ আর শুয়োর পালনে সাহায্য করতে থাকেন। জার্মান ভাষায় দখল ছিল, কিন্তু নিজেকে জার্মান কি করে বলতে পারতেন যখন তাঁর রং আমাদের দেশের মতোও পুরো ফর্সা ছিল না। নিজেকে পূর্ব-ইউরোপের রোমনী (জিপ্‌সী) বলে তিনি এই অভাবটি পূরণ করেছিলেন। তিন বছর পর্যন্ত এইভাবেই তিনি তাঁর সময় কাটান। এই সময়টা ছিল তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির মৃত্যুর সময়। এখন তিনি তাড়াতাড়ি জার্মানি ছাড়তে বাধ্য ছিলেন না। এরই মধ্যে তাঁর হৃদ্‌রোগ হয়ে যায়। ওষুধ পাওয়ার অসুবিধে ছিল। এই সঙ্গে জন্মভূমি ও তার স্বাধীনতা তাঁকে টানছিল। কোনোরকমে চুপচাপ তিনি জার্মানির সীমা পার করে সুইজারল্যান্ডে আসতে সফল হন। আমাদের দূতাবাস বিদ্যমান ছিল, তার সাহায্যে অনেক বড় বড় আশা নিয়ে তিনি তাঁর জন্মভূমিতে এলেন। কিন্তু এখানে এখন গুণের কদর কোথায়?

ড· রোয়েরিক চাইতেন, ভারতীয় ও তিব্বতী ভাষা ও সংস্কৃতির গবেষণার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান বানানো হোক। এর জন্য কালিম্পং ছিল সবথেকে উপযুক্ত স্থান, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের জন্য টাকার প্রয়োজন পড়ে। শুধু প্রকাশনার জন্য নয়, তিব্বতী, মঙ্গোল বা ভারতীয় বিদ্বানদের জন্যও খরচের দরকার। সিকিমের মহারাজের কাছ থেকে তো আপাতত আশা করা চলত না, কারণ তিনি এর বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব বুঝতে অসমর্থ ছিলেন। আর সাহায্য করলে গ্যাংটকে রাখার জন্য ইচ্ছে প্রকাশ করতেন। চাঁদা আর টাকা তোলা আমি শিখিনি, তাই সে ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারতাম না। হ্যাঁ, আমার লেখনীর সাহায্যে প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে আমি তৈরি ছিলাম।

২৪ মে হাঁটতে হাঁটতে চীনা স্কুলের দিকে গেলাম। কয়েক বছর আগে চীনা ছেলেদের পড়ানোর জন্য এই স্কুল খোলা হয়েছিল। তার পাশে এক একর জমির ওপর একটা

কাঠের ঝুপড়ি ছিল। আমি সেটাও দেখতে গিয়েছিলাম। পাঁচ হাজারে সেটা পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু এখন আমি খুঁটিতে বাঁধা পড়তে চাইছিলাম না। বড় বড় বাড়ি জলের দরে বিক্রি হচ্ছিল—আমি তো তাদের সম্বন্ধে ভাবতেও পারতাম না। ড· রোয়েরিক যে বাংলোতে থাকতেন, তার পাশেই কোনো ইংরেজের বিশাল বাংলো ছিল, লড়াই-এর সময় তার দাম সাত লাখ ছিল, আর এখন সুরজমল-নাগরমল পৌনে দু লাখে কিনে নিয়েছে।

শারীরস্থানের পরিভাষার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন অন্যান্য কাজে হাত দিয়েছিলাম।

দিল্লী—২৫ মে আবার আমরা দশটার সময় মোটরে করে বাগডোগরা বিমান-বন্দরে পৌঁছলাম। কালিম্পঙে জানানো হয়েছিল যে টিকিট তৈরি আছে, কিন্তু এখানে এসে জানা গেল, কোনো টিকিট নেওয়া হয়নি। যাইহোক, জায়গা খালি ছিল, টিকিট পেয়ে গেলাম। একটার সময় রওনা হয়ে আড়াইটের কিছু পরে কলকাতা পৌঁছে গেলাম। মণিহর্ষজীর বাড়িতে রাতে থাকলাম। তিব্বতী-সংস্কৃত বই ছাপার চিন্তা মাথায় ছিল। তাই প্রেসগুলির সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। ওরিয়েন্টাল প্রেস ছাপতে রাজি ছিল কিন্তু তাদের কাছে উপকরণ ছিল কম। তাদের টাইপও খুব বড় ছিল, যার জন্য 'অভিধর্মকোষ' ১৬ ফর্মায় ছাপা যেত। ব্যাপটিস্ট মিশন তাদের ছোট টাইপে সাত ফর্মায় ছাপতে পারত, কিন্তু খুব বেশি চার্জ দিয়েও তারা কাজ নিত কিনা সন্দেহ ছিল।

২৬ মে সাড়ে সাতটার সময় দমদম থেকে বিমানে চড়ে ঠিক বারোটাব সময় দিল্লী পৌঁছে গেলাম। নীচে মাটিতে নামতেই রোদে মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। আজ পত্রিকায় এই আনন্দদায়ক সংবাদ পেলাম যে, কমিউনিস্টরা বিনা লড়াইতেই সাংহাই নিয়ে নিয়েছে। যদি শহরের ভেতরে লড়াই হতো, তাহলে সেই বিশাল শহরের অনেকটা ধ্বংস হতো।

শ্রীসত্যনারাণজীর ঘর তালাবন্ধ ছিল। তাই ১৩ ফিরোজশাহ রোডে শ্রীমতি কমলা চৌধুরীর বাড়িতে শ্রীজয়চন্দ্রজীর কাছে উঠলাম। এসে খবর পেলাম, বৈঠক ১ তারিখ পর্যন্ত মুলতুবি রয়েছে, অর্থাৎ আমি পাঁচদিন আগে এসে গেছি। কিন্তু এর মধ্যে শ্রীবালকৃষ্ণজীর সঙ্গে একত্রে কিছু কাজ করতে পারতাম। যদিও তার জন্যে পাশেই কোথাও আমাকে খেয়ে নিয়ে কাজ করতে হতো।

২৭ মে কাউন্সিল চেম্বারের ১৯ নম্বর ঘরে নটার সময় বালকৃষ্ণজীর সঙ্গে বসলাম। ঘরটি বায়ুনিয়ন্ত্রিত, তাই এখানে না ছিল গরমের ভয় না ঠাণ্ডার। সংবিধান-সভা এখন পর্যন্ত সংবিধানের ৯২টি অনুচ্ছেদ পাস করে দিয়েছিল, সেগুলো দেখলাম। অনুবাদের কাজ করতে লাগলাম। এর মধ্যে বালকৃষ্ণজী অনেক অনুবাদ করে ফেলেছিলেন। জানতে পারলাম, প্রফেসর মুজীব ইস্তফা দিয়ে দিয়েছেন। উর্দুর কোনো কথাই তো এখানে শোনা হচ্ছিল না, তাই তিনি তাঁর থাকাটা অকাজের মনে করছিলেন। উর্দুর প্রতি এই অশিষ্টতার জন্য অনুবাদ সমিতির নালিশ নেহেরুজীর কাছে পৌঁছেছিল। তিনি এর বিরুদ্ধে রাজেন্দ্রবাবুকে এক পত্র লেখেন। কিন্তু এটা সমিতির সদস্যদের দোষ ছিল না যে, তারা

পরিভাষা রচনা ও ভাষার প্রয়োগের ক্ষেত্রে একই রাস্তা গ্রহণ করছিল। উর্দুর সঙ্গে হিন্দির মনোমালিন্যের কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু মারাঠী, কন্নড়, মালয়ালম, তেলুগু ও বাংলাকে তো এই দোষ দেওয়া যাবে না। পরিভাষা রচনার দুহাজার বছরের পরম্পরা যদি একরকমই থাকে, তাহলে তার দোষ সমিতির সদস্যদের ওপর দেওয়া যায় না। কিন্তু নেহেরুজী আর তাঁর মত লোকেদের কি করে বোঝানো যাবে?

কেন শহরের থেকে গ্রাম, সমতলের থেকে পাহাড় আমার বেশি পছন্দ হয়? একথা অবশ্য বলি না যে, শহর আর সমতল আমাকে কামড়াতে ছোটে। কালিম্পং গ্রাম নয়, তবু তা আমার পছন্দ। হ্যাঁ, তার থেকেও বেশি আমার পছন্দ ভারত সীমান্তের শেষ গ্রাম লাছেন, কারণ সেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুব বেশি, বিশ্বের সর্বসুন্দর বৃক্ষ দেবদারু সেখানে অধিক মাত্রায় আছে। সেই সঙ্গে আমার কাছে সব থেকে বড় আকর্ষণ—তিব্বতের সীমান্ত রয়েছে কাছে, সেখানকার ভাষায় কথা বলা লোকও যেখানে পাওয়া যায়, যারা মূলত কিরাত জাতির সঙ্গে সম্পর্কিত। সম্ভবত দিল্লীর ১০৮ ডিগ্রি তাপে ঝলসাতে ঝলসাতে আমার ঠাণ্ডা জায়গাগুলির কথা বেশি করে মনে পড়ত।

১ জুন থেকে অনুবাদ-সমিতির বৈঠক শুরু হলো। দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত আমরা সেই কাজে নিযুক্ত থাকতাম। সংবিধান-সভা সংবিধানের যেসব অনুচ্ছেদগুলো পাস করে যাচ্ছিল, আমাদের সেগুলিই অনুবাদ করতে হতো। গাড়ি চালু হয়ে গেছিল, তাই না ছিল কোনো অসুবিধে, না দেরি। এতদিন বসে বসে 'মধুর-স্বপ্ন'র প্রেস-কপি তৈরি করে যাচ্ছিলাম। কখনও কখনও গায়ত্রীজী তাঁর বাবা শ্রীহরভগবানজীর সঙ্গে আসতেন, তাঁকে পালি পড়িয়ে দিতাম। অনুবাদের কাজে শ্রী ঘনশ্যামসিংহজী সব থেকে বেশি পরিশ্রম করতেন। তিনি উকিলও ছিলেন আর ইংরেজি সংবিধানকে অক্ষরে অক্ষরে মেলানোর পরিশ্রম করতে রাজি ছিলেন।

দিল্লীর সম্বন্ধে বলা উচিত—তিনলোকের থেকে মথুরা ভিন্ন। এমনিতে তো সব শহরই গ্রামের থেকে আলাদা থাকার ভাব করে। কিন্তু দিল্লীকে তো মনে হয়, ভারতের মাটিতেই নেই। এখানকার শ্রেষ্ঠ লোকেরা যে আচরণ করে, ইতর লোকেরাও চোখ বুজে সেইমতই চলার চেষ্টা করে। দিল্লী বলতে সেখানকার গরিব লোকদের ধরা যাবে না। তারা তো সেখানকার দরজা-দেওয়াল, সেখানকার রাস্তা আর নালাগুলোর মত অনেকটাই নির্জীব। তাদের সেখানকার নাগরিক বলা যায় না, আর বহুসংখ্যক লোকের নাম ভোটদাতাদের রেজিস্টারেও নেই। দিল্লী হলো ভারতের সর্বোচ্চ বিলাসপুরী। এখানে সব ব্যাপারেই পাশ্চাত্য প্রভাব রয়েছে—আচকান আর চুড়িদার পায়জামা নামেই শুধু ভারতীয়। বেশভূষা আর সাজসজ্জার জন্য মানুষ পেট কেটেও খরচ করতে রাজি। গাড়ি যতক্ষণ না হচ্ছে সমাজে কোনো মূল্যও নেই, দূরে দূরে যে সব সমারোহ হয় সেখানে যাওয়া যায় না। তাই ধার করে হোক বা ঘুষ নিয়ে হোক এই অতিপ্রয়োজনীয় বস্তুটিকে কাছে রাখাই চাই। না রাখলে পরে বিপদও। প্রত্যেক সুন্দরী যুবতী কেবল পাউডার আর লিপিস্টকের জোরে মর্যাদা পেতে পারে না, তাই নিজের ঘরে কার না থাকলে অপরের সাহায্য নিতে বাধ্য হতে হয়। মেয়েদের পড়াশোনা করতে হয়। বসন্তকালে লন্ডনে কুমারীদের জমায়েত

এইজন্য হতো যাতে সেখানকার নাচ ও পান-সভায় সম্মিলিত হয়ে তারা নিজেদের জন্য বর খুঁজতে পারে। এখন পেন্সন-প্রাপ্ত লোক অথবা অন্য শহরের বাসিন্দা মা-বাবা তাদের যুবতী মেয়েদের এই কারণেই দিল্লীতে আনছেন। দুনিয়ার সব জায়গায় ঘটে যাওয়া ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কি আমাদের এখানেও হবে?

এই সময় শ্রীনবীনজীর বিয়ের কথা চলছিল। চুল পেকে গেলে বিয়ে তামাদি হয়ে যায় না—এ আমি মানি, আর ড· প্রাণনাথজী বধূর গুণ ও রূপের প্রশংসা করে ক্লান্ত হতেন না। নবীনজীও কবি, তাঁর দৃষ্টি প্রতারিত করতে পারত না।

৬ জুন পর্যন্ত আমাদের অনুবাদের কাজ চলল। ৭ তারিখ আমাদের এখান থেকে যাওয়া স্থির হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় সংবিধানে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্ন নিয়ে চিন্তাভাবনা হবার ছিল। অহিন্দি ভাষাভাষীদের হিন্দি -বিরোধীরা পুরোপুরি খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিল, তাই সে-বিষয়ে হিন্দি-ভাষীদের কিছু কাজ করার ছিল। ৫ তারিখ ফিরোজশাহ রোডে অবস্থিত দীবানচন্দ হলে সন্ধেবেলা এই নিয়ে সভা হলো। প্রোফেসর ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর পণ্ডিত জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার দুঘণ্টা করে বললেন। আমিও আধঘণ্টা হিন্দির সমর্থন করলাম। বাইরে বেরোলে অন্ধ্রদেশীয় এক তরুণকে পেলাম। সে জোর দিচ্ছিল যে, সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করা হোক। যেন সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষার আসনে বসাতে হিন্দির থেকে কম অসুবিধের সম্মুখীন হতে হতো। তারপরে ভারতের এত বড় জনতাকে অপ্রচলিত একটা ভাষা কি করে শেখানো যাবে?

অনেকেই দেখা করতে এলেন। ড· কিরণকুমারী গুপ্তার কাছে জেনে আনন্দ হলো যে, তিনি অগ্রবাল বিবাহপ্রথার ওপর তথ্য জোগাড় করছেন।

৬ জুন শরণার্থীদের জায়গা দেখতে গেলাম। দেড় বছরের ওপর হয়ে গেল কিন্তু এখনও তারা একই রকমভাবে কোনো জিনিসপত্র ছাড়াই জীবন কাটাচ্ছে। ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়, নোংরা ঝুপড়ি, পেচ্ছাপ পায়খানার যথোচিত ব্যবস্থা নেই, যে কারণে তাদের বস্তিও নোংরা। যেভাবে তারা থাকছে তাতে কোনো শিশু মোটরের নীচে চলে এলে তাজ্জব হবার কিছু নেই। যারা নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে, তাদের অবস্থা কিছু উন্নত হয়েছে। তবে একশো ভাগ লোকের কাছ থেকে তা আশা করা যায় না। নতুন দিল্লীতে কয়েক জায়গায় ফুটপাথ থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরিয়ে নিয়ে কোনো থাকার যোগ্য জায়গায় পৌঁছে দিলেও হতো। শুধু তাই নয়,খোলা আকাশের নীচে রোদে জলে মরার জন্য তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো। এই দিল্লীতেই ভাইসরয় (রাষ্ট্রপতি)-এর এস্টেট আছে, কয়েকশো বিশাল সজ্জিত কামরাই শুধু নয়, উপরন্তু বিস্তৃত গোশালা, মহিষশালা আছে, শাক-সবজির খেত ও ফলের বাগান আছে। মন্ত্রী আর অন্যান্যদের ভবন-বৈভব দেখে ইন্দ্রেরও ঈর্ষা হতে পারে, অথচ এখানেই এই উলঙ্গ-ক্ষুধার্ত মানুষগুলো নিজের বাসভূমি থেকে নির্বাসিত হয়ে নরকের জীবন কাটাচ্ছিল।

কালিম্পঙে শেষ কাজ

৭ জুন সওয়া বারোটার সময় পালাম বিমান বন্দরে গেলাম। ঘণ্টাখানেক পরে বিমানে চড়ে মাটি ছাড়লাম। আজ অর্ধেক সিট খালি ছিল। বিমান সাড়ে এগারো হাজার ফুট উচ্চতায় উড়ছিল। তখন ছিল গ্রীষ্মের যৌবনকাল এবং আমরা উত্তর-প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন শহর—বেনারস ইত্যাদির ওপর দিয়ে উড়ছিলাম। আমার সঙ্গীদের যখন পায়ের ওপর কম্বল ঢাকতে দেখলাম, তখন নীচে মাটিতে ঝলসাতে থাকা মানুষগুলোর কথা মনে পড়তে লাগল। আমার এতো শীত করছিল না যে কম্বল নেবো। এটা ভাইকিং বিমান ছিল। সম্ভবত এতটা ওপরে ওঠার জন্যই কুয়াশা বেশি ছিল এবং কিছুই সম্পূর্ণ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। শোন পার করার পর ঝড়ের সংকেত পাওয়া গেল। আলো দিয়ে সংকেত করা হলো। সবাই চেয়ারের সঙ্গে নিজেদের কোমরের বেল্ট বেঁধে নিল, যাতে ঝড়ে বিমান দুললে লোক গড়িয়ে না পড়ে। চার ঘণ্টায় যাত্রা সম্পূর্ণ করে আমরা সওয়া পাঁচটার সময় কলকাতা বিমান বন্দরে নামলাম। বিমান কোম্পানির ট্যাক্সিতে মণিবাবুর বাড়ি পৌঁছে গেলাম।

৮জুনও কলকাতায় থাকার ছিল। পত্রিকায় দেখলাম, সিকিমের শাসন প্রজা-প্রতিনিধিদের হাত থেকে ভারত সরকার নিয়ে নিয়েছে। রাজার নিরঙ্কুশ শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে প্রজারা তাদের প্রজামণ্ডল তৈরি করে সংঘর্ষ শুরু করেছিল, তাতে বাধ্য হয়ে রাজা তার মন্ত্রীসভা তৈরি করে শাসনের অনেক কাজই মন্ত্রীদের হাতে দিয়ে দিয়েছিল। রাজা এখনও ছেড়ে দিচ্ছিল না। যখন মন্ত্রীরা হাতে এলো না,তখন সে ভারত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করল এবং মন্ত্রীসভা ভেঙে দিয়ে সরকারের ব্যবস্থার জন্য একজন দেওয়ান চেয়ে নিল। ভারত সরকার রাজার ওপর দয়া দেখাল। যদিও সিকিমও ভারতের অন্যান্য বহু দেশীয় রাজ্যের মতই আর একটি রাজ্য, কাজেই যে অবস্থা বাকি রাজ্যগুলোর হয়েছিল, সিকিমেরও তাই হওয়া উচিত। এমন অবস্থায় তাকে দার্জিলিঙের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। সেখানে বসবাসকারীদের ভাইবন্ধুরা সিকিমেও থাকে। কিন্তু তা করা হলো না। সিকিমকে ভারতসংঘের বাইরে রাখা হলো। ভুটান আর নেপালের মত তাকে আলাদা রাজ্য ধরা হলো। এইভাবে আর একজন রাজাকে এবার প্রজাদের আঙুল দেখানোর সুযোগ দেওয়া হলো, অপরদিকে ভারতীয় আমলাতন্ত্রের নিরঙ্কুশ শাসন সেখানে স্থাপিত করে দেওয়া হলো। কেউ এদিকে নজর দেবার প্রয়োজন মনে করেনি, যদি সেটা ভারত ভূখণ্ডের বাইরের রাজ্য হয়,তবে উত্তরের প্রতিবেশীও তার সঙ্গে স্বাধীন সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইবে। বস্তুত বর্তমান শতাব্দী আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত সিকিম আর ভুটানকে তিব্বতের অধীন বলে মনে করাও হতো।

কালিম্পং—৯ তারিখ সওয়া দশটার সময় বিমান উড়ল আর বারোটার আগেই আমরা

বাগডোগরা পৌঁছলাম। আকাশ পরিষ্কার ছিল, তাই হিমালয়ের দৃশ্য খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছিল। চামোলুঙ্গমা (এভারেস্ট)-র সৌন্দর্য অতুলনীয়। পিছনে শুভ্র পর্বতমালা আর সামনে ছিল সবুজে ঢাকা পাহাড়। বাগডোগরায় মণিবাবুর মোটর পেলাম। কিছুক্ষণ শিলিগুড়িতে থেমে তিনটের সময় আমরা ধর্মোদয় পৌঁছে গেলাম।

দুপুরের দিকে কিছুটা গরম বোধ করছিলাম। কালিম্পং ৪০০০ ফুট উঁচু। গরমের থেকে পুরোপুরি বাঁচতে গেলে ৬০০০ ফুট উচ্চতা চাই, যেখানে ঠাণ্ডায় বরফও পড়ে। 'মধুর-স্বপ্ন' শেষ হয়ে গিয়েছিল। ১১ জুন থেকে 'আজ কী রাজনীতি' লেখাতে শুরু করেছি। জুনের মাঝামাঝি বর্ষাও পুরোপুরি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সকালে আকাশ পরিষ্কার থাকলে তবেই বাইরে বেড়াতে যাওয়া।

কালিম্পং আসা দেড় মাস হয়ে গিয়েছিল। আসার পরে যতগুলি শব্দ লেখানো প্রয়োজন ছিল, সেগুলি তরুণ-তরুণীরা লিখে ফেলেছে। যখন-তখন জমা হওয়া শব্দগুলি লেখানোর জন্য আমাদের একজনকেই দরকার ছিল। শ্রীপরমহংস মিশ্র ১৯৩০ থেকেই আমার পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন এখানে মিশন স্কুলের শিক্ষক লিখবার জন্য ছেলে মেয়েদের ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'কোনো একজন লিখতে-বুঝতে পারে সবথেকে চালাক ছেলে অথবা মেয়েকে পাঠান।' যে সব মেয়েরা কাজ করছিল তাদের মধ্যে কমলা পরিয়ারও ছিল। পরমহংসজী তাকেই সুপারিশ করলেন এবং ১৪ জুন থেকে সে এসে কাজ করতে লাগল। তার অক্ষরও পরিষ্কাব ছিল। ম্যাট্রিক পাস বলে ইংরেজিও ঠিক ছিল, বলে হিন্দির জ্ঞানও ভাল ছিল। ম্যাট্রিক পাস ছেলেমেয়েদের কাজ পাওয়া সহজ ছিল না। কমলা শরীরের দিক দিয়ে খুব দুর্বল ছিল এবং তার বেকারত্বের জন্য চিন্তিত ছিল। তার পড়ার খুব ইচ্ছে, কিন্তু দারিদ্রের মার কি করে এগোতে দিতে পারে? আমাদের কাছ থেকে বই নিয়ে গিয়ে সে পড়ত।

১৪ জুন সন্ধেবেলা বেড়াতে বেড়াতে চন্দ্রালোক-এ গেলাম। অনেক সাধে শ্রীনির্মলকুমার জৈন নিজের জন্য এই বাড়িটা এমন একটা কোনায বানিয়ে ছিলেন, যেখানে দূরবীন দিয়ে ছোট পাহাড়ের দুদিকের জমি দূর পর্যন্ত দেখা যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পর্কে না আসা যায়, ততখক্ষণ মানুষের সম্বন্ধে আর কি জানা যায়? বিশেষ করে যার কলমের গৌরব নেই তার সম্পর্কে তো জানাই যায় না। আমার অনেকগুলি বই তিনি পড়েছিলেন, সবথেকে পরে প্রকাশিত 'জো দাস থে'ও। তাই আমার নিজের পরিচয় দেবার দরকার ছিল না। আমার তাঁকে বড়ই অধ্যয়নশীল ও সুসংস্কৃত পুরুষ বলে মনে হলো। তাঁর পুরো পরিবারে সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। শিল্প-বাণিজ্য নিয়ে বড বড় স্বপ্ন দেখেছেন। চিনির মিলই শুধু করেননি, অ্যালুমিনিয়াম তৈরি করার কারখানা সর্বপ্রথম তিনিই করেন। তবে শেষপর্যন্ত সব জিনিসের ওপরই সাট্টাবাজ শেঠদের অধিকার হয়ে গেল। অর্থনৈতিক বিপ্লবকে তিনি ভয়ের চোখে দেখতেন না। তাঁরা দুভাই আজকাল এখানে থাকতেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে রাত সাড়ে নটায় আমরা ধর্মোদয় ফিরে এলাম।

২৫ তারিখ থেকে 'ঘুমক্কড় শাস্ত্র' লেখা শুরু করলাম। মহেশনারায়ণ লেখায় চটপটে

আর তাঁর হাতের লেখাও ছিল পরিষ্কার। ভবঘুরে হবার জন্য কয়েকশো তরুণ ভবঘুরেমির বিষয়ে আমার কাছে প্রশ্ন করে যেত এবং জানতে চাইত যে, সে পথে কিভাবে তাদের অটল থাকা উচিত। ভবঘুরে হবার জিজ্ঞাসাকে এত বর্ধিত হতে দেখে আমার আনন্দও হয়, আর সেই সঙ্গে এও অনুভব করতে থাকি যে, চিঠিতে উত্তর দিয়ে অথবা খুব বেশি হলে কথা বলেও জিজ্ঞাসার উত্তর পুরো দেওয়া সম্ভব নয়, তাই এ বিষয়ে একটা বই লেখা উচিত। বই লেখার সময় আমার এ বিশ্বাস ছিল না যে, তরুণদের বাইরেও তাকে কদর করার লোক অনেক পাওয়া যাবে। সবথেকে আগে শ্রীকানাইয়ালাল মুন্সীর মুখ থেকে এই সপ্তম শাস্ত্রের প্রশংসা শুনলাম। তারপর বিহারের দুটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পাঠ্যপুস্তকে তার কিছু অংশকে স্থান দিল। আমার তো বরং এতে ভয় হয়ে গেল। এ তো 'খাল কেটে কুমীর ডাকা'[১]-র মত ব্যাপার হলো। তরুণরা তো ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাবার জন্য তৈরি হয়ে বসে থাকে। পাঠ্যপুস্তকে যদি তারই জন্য উত্তেজিত করা হয়,তবে তা ছাত্রদের মা-বাবাদের কাছে ভাল ব্যাপার হতে পারে না।

এই সময়ই দক্ষিণ কলকাতায় পার্লামেন্টের একটি সিটের জন্য পুনর্নির্বাচন হলো। শ্রীশরৎচন্দ্র বোস চারগুণ বেশি ভোটে কংগ্রেস প্রার্থীকে হারিয়ে নির্বাচিত হলেন। কংগ্রেসীরা কখনও আশা করতে পারত না যে, নেতাজীর অগ্রজ ও দেশের একজন বড় জাতীয় নেতাকে তারা হারাতে পারবে। তবুও নিজেদের ছোট করার জন্য তারা কংগ্রেসী প্রার্থী দাঁড় করিয়েই দিল।

এই সময় 'মধুর স্বপ্ন' আর 'ঘুমক্কড় শাস্ত্র' দুটোরই লেখা একসঙ্গে চলছিল। কখনও কখনও 'আজ কী রাজনীতি'-র ওপরও লেখা হতো।

মহেশজীর এখন নতুন যৌবন ছিল তাঁর পড়ার তীব্র ইচ্ছে ছিল, আর ক্ষমতাও ছিল। তিনি শুধু হিন্দি জানতেন। পরে সংস্কৃত ও ইংরেজি না জানার জন্য তাঁর আফশোশ হতো। এটা ভেবে আমি তাকে বলি, 'আরো পড়ো।' তিনিও সেটা পছন্দ করতেন কিন্তু সঙ্গে থাকার জন্য এত কাজ থাকত যে, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট সময় দিতে পারতেন না। আগেও আমি বলেছি, 'যদি নির্ঝঞ্ঝাটে পড়তে চাও তাহলে সাধু হয়ে যাও।' সাধু হবার অর্থ মহেশজীর মত লোকেরা এই ধরে নেয় যে, একবার যদি সে জালে পড়ো, তাহলে আর বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু জাল যদি এতই পছন্দ হয়ে যায় তবে বেরোনর দরকারটা কি? আমি দেখতাম, সাধু হয়ে মানুষ বিদ্যার জন্য আজীবন বিদ্যার্থী হয়ে থাকে। যাদের টাকা-পয়সা নেই তাদের ভবঘুরেমির জন্য ওর থেকে বড় কোনো রাস্তা নেই। মহেশজীর কখনও কখনও কথাটা পছন্দ হতো, কখনও বিগড়ে যেতেন। বিবাহিত ছিলেন, স্ত্রীকে ভালও বাসতেন। সম্ভবত সেটাই পথের বাধা ছিল। তিনি যখন পাঁচ-ছ বছরের জন্য ঘর ছেড়ে চলে যান, তখন বাবা নিরাশ হয়ে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে একদিন মাদ্রাজ পৌঁছে যান, আর দ্বিপদ মহারাজকে চতুষ্পদ বানিয়ে দেন। যাইহোক, তাঁর ভেতরে দ্বিধা ছিল। ইচ্ছাপ্রকাশ করায় আমি একবার আমার বন্ধু স্বামী সত্যস্বরূপজীকে তাঁর সম্বন্ধে লিখে

---

[১] এই ভাবার্থে মূলগ্রন্থে ব্যবহৃত প্রবাদটি হলো—*আ বৈল, মুঝে মার।*—স·ম·

দিই। এটাও স্থির হয়ে গেল যে, দু-তিনমাসের খরচের কোনো ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ১৮ জুন ঠিক করে ফেললাম, জুলাই-এ মহেশজী বেনারস যাক।

বইগুলো লেখার কাজ ছিল। এই সমস্যা দেড় বছর ধরেই ছিল। সুবিধেমত লিপিকার কখনই পাওয়া যেত না। পাওয়া গেলে সে বেশিদিন পর্যন্ত সঙ্গে থাকতে রাজি হতো না, অথবা আমারই তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মামুলি কলম পেশায় তার তরুণ জীবন নষ্ট করাটা পছন্দ হতো না। মহেশজী যাবার পর আবার সেই সমস্যা উপস্থিত হলো। ভারতে ফেরার পর লিপিকারের জোরেই তো আধ ডজনের বেশি (কয়েকটি যথেষ্ট বড়) বই আমি লিখেছি। লিপিকার ছাড়া ডায়াবেটিসও একটা সমস্যা ছিল, যদিও তা নিরাময় হবার আশা এখন খুব কম ছিল, আর অবস্থা এমনই হয়েছিল যে, তার কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আমার রোজ ইনসুলিন নেওয়া উচিত ছিল। তবে এখন পর্যন্ত আমি তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে এসেছি। বহুদিন পর্যন্ত বাঁচা যাবে এমন আশা নেই। এই সময়ই আমার কাছে কমলাও কাজ করছিল। মহেশজীর পর লেখার কাজ সে ভালভাবেই করে নেবে, আর টাইপ করাও শিখে নেবে, যার ফলে প্রত্যেক বইয়েব দুটো করে কপি তৈরি হয়ে যাবে। এই দিক দিয়ে এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ধর্মোদয়ে যে বাড়িতে আমরা থাকতাম, সেটা খুবই পরিষ্কার আর থাকার পক্ষেও ভাল ছিল। কিন্তু শহরের কাছাকাছি বলে, যতই করি না কেন, লোকেদের আসা-যাওয়া লেগে থাকত, যার জন্য সময় নষ্ট হতো। এমনিতে রোববারটা পুরো সময় আমি দেখা-সাক্ষাতের জন্য দিতে তৈরি ছিলাম। আমি খুঁজছিলাম, যদি নির্জনে সুবিধেমত কোনো বাড়ি পাওয়া যায়।

১৯ জুন ছিল রোববার। সকালে ড· রোয়েরিকের কাছে গেলাম। কোনো এক শায়ের ঠিকই বলেছেন, 'খুব নিবহেগী জো মিল বৈঠেঙ্গে দীবানে দো'। আমরা দুজনেই একই রোগের রুগী ছিলাম। তিব্বতের বিষয়ে আমাদের অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা ছিল, আর তার জন্যই কাজ করতে চাইতাম। ড· রোয়েরিকের সঙ্গে ঠিক হলো যে, ধর্মকীর্তির মহান কীর্তি 'প্রমাণবার্তিক'-কে ইংরেজিতে অনুবাদ করা যাক। সেই সময় এই কাজ সম্পূর্ণ হতে পারেনি। স্থির হলো ড· রোয়েরিক তিব্বতী অনুবাদ থেকে ইংরেজি করুন, আর পরে আমি সংস্কৃত থেকে তা মিলিয়ে নেব। একটি পরিচ্ছেদের কিছুটা অনুবাদ করেও ছিলেন, আর তিনটি পরিচ্ছেদ থেকে গিয়েছিল। কারোকে এই মহান গ্রন্থের অনুবাদ করতেই হবে।

সন্ধেবেলা শ্রীমতি জ্যোৎস্না চ্যাটার্জি এলেন। এই বিদূষী মহিলাটির কত বিষয়ে যে কৌতূহল ছিল! তাঁর বৌদি শ্রীমতি বুলবুল দে প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা ছিলেন, তাঁরও যে কত জিজ্ঞাসা ছিল। আজকের সভায় ননদ মূলত শ্রোতাই রইলেন। তখনও এটা জানতাম না যে, আমাকে জ্যোৎস্নাজীর বাংলোই ভাড়া নিতে হবে।

সেইদিনই স্বামী সত্যস্বরূপজীর চিঠি পেলাম। তিনি মহেশজীর ব্যবস্থা করে দেবার জন্য লিখেছিলেন। মহেশজীর যাওয়া নিয়ে আমার কিছুটা দ্বিধাও ছিল, কারণ কমলা তৎপর ছিল বটে কিন্তু খুবই অসুস্থ মত, রোগা-পাতলা, এত কাজ সামলাতে পারবে কিনা তাতে সন্দেহ ছিল। মহেশজী রান্নাঘরের ব্যবস্থা আর জিনিসপত্র কেনাকাটার হিসেবও

রাখতেন। এইসময় শ্রীরামেশ্বরসিংহও আমাদের পরিভাষা তৈরির কাজে সাহায্য করার জন্য চলে এসেছিলেন। যাকে মানুষ ছোটবেলা থেকে দেখে, বড় হয়ে গেলেও তার ছোটবেলার চেহারাই চোখে ভাসে। রামেশ্বরজী ছাপরা জেলার স্টেশন থেকে দূরে পোখরপুর গ্রামের এক অত্যন্ত ভদ্র ও সুসংস্কৃত পরিবারে জন্মেছেন। এ আমি শুধু শিষ্টাচারের জন্য বলছি না। তাঁর আগের প্রজন্ম তাঁদের জীবন, শিক্ষা ও চাষবাসে এতটা পরিবর্তন করেছিলেন যে সেই গ্রামে তা আশা করা যেত না। তাঁদের পরিবারে নাগরিক রুচি চোখে পড়ত। শুধু ছেলেদের নয়, পরিবারটি মেয়েদেরও উচ্চশিক্ষা দিয়েছিল। যদিও সামাজিক দিক দিয়ে উন্নতি করতে পারেনি, তবে শিক্ষিত ও সংস্কৃত করে দেবার ফলে পরবর্তী প্রজন্ম নিজে নিজেই রাস্তা করে নেয়। যদি প্রথম প্রজন্ম ছোঁয়াছুঁয়ি, শ্রাদ্ধ, মূর্তিপুজো থেকে মুক্ত হয়, তাহলে পরের প্রজন্ম জাত-পাত থেকেও মুক্ত হয়ে যাবে। এই পরিবারেরই একটি মেয়ে গতবছর নিজের রাজপুত বংশ ছেড়ে দুকুলের পরোয়া না করে বিয়ে করেছে। রামেশ্বরজী বড়ই যোগ্য ও আদর্শবাদী যুবক। সবচেয়ে মুশকিল হলো যে, তিনি হলেন বাতাসে উড়ে বেড়ানো পাখি, কোনো এক জায়গায় দু-চার মাসের বেশি থাকা তাঁর পক্ষে কষ্টকর। তবে, এখনও তিনি ভারতের বাইরে যাননি। মহেশজী গেলে রামেশ্বরজী আর সেনগুপ্তও কিছু কাজের দায়িত্ব নেবেন, এ ভরসা ছিল।

২১ জুন পাটনা থেকে বীরেন্দ্রজী এলেন। এখন অন্যান্য কাজের সঙ্গে আমরা নতুন বাড়ির খোঁজেও ছিলাম। ধর্মোদয়ে একটা বছর কাটাতে কোনো অসুবিধে হতো না। তখন তো মনে হতো, কয়েক বছর এখানে থেকেই কাজ করতে হবে। ওখানেই যদি থাকতাম, তাহলে কাজের কথা বলতে পারি না, কিন্তু ড· ভট্টর খুব খারাপ ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ার সুযোগ হয়তো হতো না। ২২ তারিখ বাড়ির খোঁজ করতে আমরা সেদিকে গেলাম যেখানে কবিবর রবীন্দ্রের বাংলো 'চিত্রভানু' আছে। মহাকবির নামের নির্বাচনেও কত তীক্ষ্ণ বোধ ও সুরুচি ছিল, তা এই নাম থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। তার কাছেই শ্রীঅবনী মিত্রের একটি বাড়ি ছিল। বাড়িটা ছোট, তবে খারাপ ছিল না, আমাদের চার-পাঁচজন লোকের চলে যেত। ফেরার সময় কেউ বলাতে আমরা শ্রীমতি জ্যোৎস্না চ্যাটার্জির 'পার্বতী' বাংলো দেখতে চলে গেলাম। মাসিক ১৫০ টাকা ভাড়া ছিল। তখন তা বেশি মনে হতো না। এটা শহর থেকে দূরেও ছিল আর খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও ছিল। আশেপাশে ভালো লোক থাকত, তাই এটা মনে ধরে গেল।

প্রকাশনা বিষয়ে বীরেন্দ্রজীর সঙ্গে কথা হলো। সেদিকে বেশি মনোযোগ দেবার দরকার ছিল। আমার সমস্ত খরচ বইয়ের রয়াল্টি থেকেই চালাতে হতো, আর খরচ মাসে পাঁচশো টাকার কম ছিল না। 'সাহিত্য সম্মেলন' থেকে এক পয়সা নেবার কথা চিন্তাও করতে পারতাম না। তা করতে হলে আমি কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নিতাম। যদি আগের বইগুলির নতুন সংস্করণ বেরোতে থাকে আর নতুন বই ছাপা হতে থাকে, তবে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। আমার বইয়ের পাঠক সারাদেশে যথেষ্ট ছিল। তাদের শুধু জানা দরকার যে, নতুন কোনো বই বেরিয়েছে, তাহলেই তারা কিনতে প্রস্তুত ছিল। প্রবাদ আছে, 'নামী চোর মারা যায়, নামী বনিয়া কমা খায়।' নির্দিষ্ট রোজগার থাকা উচিত।

আমি এখন ঠিক করেছি, সমস্ত সংস্করণের রয়াল্টির অর্ধেক টাকা অগ্রিম নেবো। বীরেন্দ্রজী আমার অনেকগুলো বই প্রকাশিত করেছেন, কিন্তু উভয় পক্ষের ঢিলেমির জন্য তাঁর সঙ্গে এই নিয়ম পালন করা যায়নি। ২৫ তারিখ কিতাব মহলের রয়াল্টির হিসেব এলো, তার থেকে জানতে পারলাম, পাঁচ হাজার টাকা পাব।

'সুবহ্ হোতী হৈ শ্যাম হোতী হৈ। উম্র যোঁ হী তমাম হোতী হৈ।'[১] এই কথা আমি বলতে পারি না, কারণ আমার জীবন এমনি-এমনিই শেষ হচ্ছিল না। সপ্তাহের সাতটা দিনই কাজে লেগে থাকতাম, আর সেইজন্যই বুঝতে পারতাম না যে, কখন সকাল হলো, কখন সন্ধে হলো আর কখন সপ্তাহ্ শেষ হয়ে গেল। হ্যাঁ, জীবনের শেষ বছরগুলিতে তো তা খরচের খাতায় জমা হয়ে যাচ্ছিল। ২৭ জুন আমি দার্শনিকতায় ভাসমান হয়ে লিখেছিলাম, 'মানুষের উচিত সামর্থ বুঝে সেই অনুসারে কাজ হাতে নেওয়া এবং সেইটুকুর জন্যই চিন্তা করা। লোকে টানতে চায় কিন্তু সেই টানে পড়া উচিত নয়।'

২৮ তারিখ 'আজ কী রাজনীতি'র প্রথম অধ্যায় কমলা টাইপ করে দিল। অন্যের কলমের সাহায্য নিলে লেখকের কত সুবিধে হয়, সে অভিজ্ঞতা আমার কয়েক বছরের। এখন তা আরো এক পা এগিয়েছিল। যদি পাণ্ডুলিপি টাইপ করা থাকে, তবে তাতে প্রেসের লোকেদেরও সুবিধে হয়, আর কার্বন দিয়ে এক কপি করে নিজের কাছেও রাখা যায়। 'মেরী জীবন-যাত্রা'-র পঞ্চাশ পাতা হারিয়ে দিয়ে প্রেসের লোকেরা শিখিয়ে দিয়েছিল যে, প্রেস-কপির একটা নকল নিজের কাছে অবশ্যই রাখা উচিত। কখনও কখনও আমি রেকর্ডারে বলে ডিক্টেট করার কথা ভাবতাম। পরে যখন দেখলাম, রেকর্ডার আবার সেই গতিতেই বলে যায়, যাকে দ্রুতগতিতেই লেখা যেতে পারে এবং তারপরে টাইপ করার সুযোগ আসে, মনে হলো এ আমার দ্বারা হবে না। এখন লিখে টাইপ করানোর কথাই ভাবছিলাম, কিন্তু পরে অভিজ্ঞতা বলে দিল যে, টাইপরাইটারে বলে লেখানোতে আরো সুবিধা। তাই পরে সেই পথই অবলম্বন করেছিলাম।

৩০ জুন 'ঘুমক্কড় শাস্ত্র' শেষ হয়ে গেল, তারপর 'আজ কী রাজনীতি' নিয়ম করে লিখতে শুরু করলাম। ১ জুলাই আবার 'পার্বতী' দেখতে গেলাম। সেইদিন থেকে এবার কমলাকে সাহিত্য-সহায়িকা হিসেবে রাখাটা ঠিক করে ফেললাম। ২ তারিখ 'পার্বতী'-কে দেখে মনে হলো যে আমরা পাঁচজন লোকই এখানে থাকতে পারি। ফার্নিচার কম ছিল আর বাড়িও তত ভাল নয়। শ্রীনির্মলকুমারজীর এর থেকে ভাল একটি বাড়ি পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু তার ভাড়া ছিল মাসিক দুশো টাকা। শেষে আমরা ছমাসেব জন্য 'পার্বতী' নেওয়াই ঠিক করলাম এবং তার জন্য লেখাপড়া করে নিলাম।

'পার্বতী'—৩ জুলাই জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে বারোটার সময় আমরা নতুন বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। এবার তার দোষগুলোও বুঝতে শুরু করেছিলাম। বস্তুত, একদিকে একটা বড় ঘর আর একটা কুঠরি ছিল। অন্যদিকে দুটো ঘর খাওযা আর বসার জন্য ছিল। এছাড়াও

[১] 'সকাল হয় সন্ধে হয়। জীবন এমনি-এমনিই শেষ হয়।'—স.ম.

একচিলতে বারান্দাসহ একটি কুঠরি ছিল, দুটি ছোট ছোট স্নানের ঘরও ছিল। রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘরের কুঠরি লাগালাগি কিন্তু আলাদা ছিল। বাংলোটা কালিম্পঙের ছিল মধ্যে যেখানে প্রত্যেক বাড়িতে ফ্লাশযুক্ত পায়খানা থাকা অনিবার্য। আশেপাশে চারদিকে ছোট ফুলবাগান ছিল। খোলা জায়গা ছিল। আমরা বসার ঘরটাকে কাজ করার ঘর বানিয়ে দিলাম। খাবার টেবিল খোলা বারান্দায় পাতলাম আর সেই ঘরটাকে শোবার ঘরে বদলে দিলাম। বড় ঘরটিতে ভট্ট আর সেনগুপ্তের খাট পাতা হলো, কুঠরিতে আমি আমার খাট পাতলাম, তার পাশের বারান্দাসহ কুঠরিটা মহেশ দখল করলেন। রামেশ্বরজী এখনও আসেননি, তবে তাঁর আসা ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তখন তাঁকে কোথায় রাখা যাবে সে বিষয়েও ভেবে রেখেছিলাম—ফোল্ডিং খাট কাজ করার ঘরে পেতে দেবো। কিছুদিনের জন্য শ্রীবিদ্যানিবাসজী আসছেন, অন্যরাও আসতে পারেন। তাঁদের জন্য রান্নাঘরটা ছিল। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বুঝে গিয়েছিলাম যে, ওখানে আমাদের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নেই। বাড়ি নিয়ে নেওয়ার পর এখন বেশি সুবিধেব বাংলোও পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু এখন তো ছমাসের জন্য আমরা 'পার্বতী'তে জমিয়ে থাকতে বাধ্য ছিলাম। 'পার্বতী'র থেকে অল্প দূরে কিছুটা সমতল জায়গা ছিল। সর্বজনীন ব্যবহারের জন্য শেঠ জালান তা বানিয়ে দিয়েছিল, তাই আমি তার নামকরণ করেছিলাম 'জালান-স্থল'। সেটা এত ছোট ছিল যে তাকে ময়দান বলা যেত না। আর ফুলও এত কম যে, তাকে ফুলবাগানও বলা যেত না। আমার জন্য তা খুবই উপযুক্ত জায়গা ছিল। বর্ষার জন্য দূরে হাঁটতে যেতে পারতাম না, এখানে ওইটুকু জাযগার মধ্যে একশো-পঞ্চাশ পাক মেরে হাঁটার কাজ সম্পূর্ণ করতাম। সেখান থেকে আকাশ পরিষ্কার থাকলে দূরে হিমালয়ের হিমশিখর-শ্রেণী চোখে পড়ত, রঙ্গিত আর তিস্তা নদীর সবুজ উপত্যকার নয়নাভিরাম দৃশ্য সামনে দেখা যেত।

একজন লেপ্চা খ্রিস্টান প্রৌঢ়কে রাঁধুনি হিসেবে পাওয়া গেল, যাকে আমরা খাওয়া ছাড়া ১৫ টাকায় রেখে দিলাম। তার কাজ এতই সন্তুষ্ট করত যে কালিম্পং ছেড়ে আসার সময় আমরা তাকে সঙ্গে আনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে তার ঘর ছেড়ে আসতে রাজি ছিল না। যাইহোক, খাওয়া নিয়ে কিচকিচ আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল।

ভট্টজী জার্মানি থেকেই হৃদয়রোগে পীড়িত ছিলেন। এখানে সবসময় ওষুধ ব্যবহার করে থাকতেন। ৪ জুলাই রাতে তাঁর শরীর খুব খারাপ হয়ে গেল। আমরা ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলাম। শহর থেকে দূরে থাকাটা সবসময় লাভজনক হয় না। শহরের কাছে থাকলে সহজে ডাক্তার ডাকতে পারতাম। এখন এখান থেকে এক মাইল, দেড় মাইল গিয়ে মাঝরাতে কিভাবে ডাক্তার ডাকা যেত? খুব জোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। কে জানে তার প্রভাব ড. ভট্টের স্বাস্থ্যের ওপর পড়েছিল কিনা।

৬ জুলাই শ্রীবিদ্যানিবাসজী তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে দশ-বারো দিনের জন্য এলেন। পরিভাষার কাজ করতে গিয়ে তাঁকে সম্মেলনের বেতনভোগী কর্মকর্তা হতে হতো, যা তিনি পছন্দ করেননি, কারণ তিনি সম্মেলনের মাথা-গরম সদস্য হিসেবে থাকা বেশি ভাল মনে করতেন। এইসময়ই রেডিও থেকে শব্দকোষ বানানোর কাজ পেলেন। সেটা হয়তো বেশি স্থায়ী হতো তাই সেটা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। বই লেখার উৎসাহ এত বেড়ে

গিয়েছিল যে, ভাবছিলাম 'মেরী জীবন-যাত্রা'র তৃতীয় বইটিও লিখে ফেলি। তবে তা লেখার সুযোগ সাত বছর পরে এখন পেয়েছি। 'পার্বতী'তে আসায় এই লাভটা অবশ্যই হয়েছিল যে, সাক্ষাৎকারীদের জন্য বেশি সময় নষ্ট হচ্ছিল না। ১০ জুলাই সোমবারও পাঁচ কি সাতজন লোক আসতে পেরেছিল। ১১ তারিখ রামেশ্বরজীও এসে গেলেন। তিনি ফার্মাকোলোজি নিয়ে হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে বি· এস· সি· করেছিলেন। তিনি তারই পরিভাষা নিয়ে লেগে গেলেন। এরজন্য তিনি অনেক বইও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। মহেশজীকে আরো কিছুদিনের জন্য আটকে দিলাম, তাঁর যাওয়ায় কাজে অসুবিধে হবে মনে হচ্ছিল। কমলা লেখার কাজ করছিল। টাইপ তো আগে নিয়ম বর্হিভূতভাবে অনেকটা শিখে নিয়েছিল, পরে নিয়মমাফিক শিখে সে তার গতি আরো বাড়িয়ে নিয়েছিল। কিন্তু স্বাস্থ্য খুব খারাপ ছিল, চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে যেত। ওজন একেবারে কম (৯২ পাউন্ড) ছিল, আর ওজন যতক্ষণ না বাড়ে, ততক্ষণ শরীরে কাজ করার পুরো শক্তি আসতে পারে না। বুদ্ধি খুব ভাল ছিল। স্বাস্থ্যের দিকে সবচেয়ে বেশি নজর দেবার দরকার ছিল, কিন্তু সেদিকে সে ছিল একদম বেপরোয়া। এমনিতে সে অসুস্থ ছিল না। ঘরের ভীষণ দারিদ্র তাকে এমনি করে দিয়েছিল। দারিদ্রের এমন প্রহার বোধহয় কোনো শিক্ষিতা তরুণীকে খেতে হয়নি।

১২ জুলাই তিব্বতের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী পন্-ড্রা-ছাং এলেন। এটি তাঁর পরিবারিক নাম। ব্যক্তিগত নাম মনে রাখার দিকে লোক বেশি নজর দেয় না। তাঁর সঙ্গে কথা হতে থাকল। তাঁর দোকান তিব্বতের অনেকগুলি শহরে আর কালিম্পঙেই যে শুধু আছে তাই নয়, পূর্ব-তিব্বত (খম্ প্রদেশ) আর চীনেও তার অনেকগুলি শাখা আছে। চিয়াং-কাই-শেক আর কুয়োমিন্টাং শাসন সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি চাইতেন না যে, কুয়োমিন্টাং আর চীনে থাকুক। চিয়াং-কাই-শেকের ঘুড়ি চীন থেকে প্রায় কাটাই পড়েছিল। জিজ্ঞেস করছিলেন, 'তিব্বতের কি করা উচিত?' আমি বললাম, বাইরের সাহায্যের আশা করা বেকার, চীনই তিব্বতের নিজের। আর চিরকাল তাই থেকেছে। চিয়াং-কাই-শেকের রাহু এবার মাথা থেকে নেমে গেছে। কমিউনিস্টরা তিব্বতের ভালর জন্য সবকিছু করবে। পুরনো ব্যবস্থা এখন চলতে পারে না। বাইরে পালানোর চিন্তা ছেড়ে আপনাদের নিজেদের দেশে থাকা উচিত। আপনার যোগ্যতা দেশের সেবার জন্য প্রয়োজন। কমিউনিস্টরা তাকে উপেক্ষা করবে না।' পরে পন-ড্রা-ছাং কালিম্পঙে কমিউনিস্ট চীনের তরফ থেকে কাউন্সিল-জেনারেল হন। এর থেকে বোঝা যাবে নতুন চীন গুণের কত কদর করে। আর তিব্বতী বাণিজ্যের জন্য তাঁর থেকে বেশি যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া মুশকিল ছিল। সেদিন পন্-ড্রা-ছাং কমিউনিস্ট চীনের প্রতি সদ্ভাব দেখিয়েছিলেন, তা তাঁর হৃদয়ের নির্ভেজাল মনের ভাব প্রকাশ করেছিল, কারণ আমার সামনে সেই ভাব প্রকাশ করে তাঁর কোনো লাভ ছিল না।

১৭ তারিখ জেনারেল সোমাঙ্ (সুর-খঙ্=কোনার ঘর)-এর সঙ্গে দেখা হলো। গুজব ছড়িয়েছিল যে লাসায় চিয়াং-কাই-শেকের প্রতিনিধিকে মেরে ফেলা হয়েছে। লাসার সঙ্গে ডাক ও তার-এর সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল, তাই এই গুজব ছড়িয়েছিল। জেনারেল জানালেন

যে, চীনের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করার জন্য তিব্বতী সরকার লাসা থেকে চীনাদের বিদায় করছে। অর্থাৎ এখন লাসা সরকার নতুন চীনের সঙ্গে কথা বলতে প্রস্তুত ছিল না।

কালিম্পঙে যে সব পরিবারের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন আইরিশ মহিলা শ্রীমতি ক্রিম্পও ছিলেন। আইরিশ হবার জন্য তিনি তাঁর ইংরেজ কর্নেল স্বামীর ভাবনার বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতেন। ইংরেজ তাঁর বাড়িগুলো বেচে চলে গিয়েছিলেন, তিনিও তাঁর কুঠি বেচে আয়ার্ল্যান্ড চলে যেতে চাইতেন, আর তাঁর একমাত্র ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে বসবাস করতে চাইত। ১৩ জুলাই আমি ঘুরতে ঘুরতে তাঁর বাংলো দেখতে গেলাম। দোতলা বিশাল বাংলো, যাতে আটটি ঘর, দুটি রান্নাঘর এবং খাবার ঘরও ছিল। ভাড়া মাসিক চারশো টাকা চাইছিলেন। আর পাশের বাংলো ১৬০ হাজার টাকায় বিক্রি করতে চাইছিলেন। এখন আর বিশেষ রোজগার ছিল না, কখনও সিজিনে দু-একজন নিজের খরচে থাকার মত অতিথি আসত, তাতে কি হতো? আমরা থাকতে বাড়ি বিক্রি হয়নি, কিন্তু পরে প্রায় দেড় লাখে সরকার তা কিনে নিয়েছিল।

সন্ধেবেলা দেড় মাইল হেঁটে ফেরা কমলার পক্ষে খুব মুশকিল হতো। তাই তার থাকারও কোনা ব্যবস্থা করতে হতো। ভাবছিলাম, মহেশ চলে গেলে ওই কুঠরিটা সে পেয়ে যাবে। কমলার খুড়তুতো বোন কালিম্পঙের বাসিন্দা হয়ে যাওয়া ছাতা (বালিয়া)-র উকিলবাবু রাধামোহনের স্ত্রী ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর ননদের সঙ্গে এলেন। ননদের বিয়ে হয়েছিল আমাদের ছাপরার মহমুদপুরে, যেখানে আমি অনেকবার গিয়েছিলাম। ড· ভট্ট আর সেনগুপ্ত দুজনই যোগ্য আর দুজনই আমার প্রিয় ছিল, কিন্তু দুজনেরই স্বভাবে কিছু অসাধারণ ব্যাপার ছিল যার জন্য কখনও কখনও খটমট লেগে যেত। ১৪ তারিখ দুজনের মধ্যে খুব ঝগড়া হয়ে গেল। দুজনের খাট দুটো আলাদা আলাদা ঘরে রেখে দেওয়াটাই ভাল মনে হলো।

১৬ তারিখ 'পার্বতী' থেকে সেনগুপ্তের সঙ্গে মহেশ কলকাতার উদ্দেশে আর বিদ্যানিবাসজী প্রয়াগের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন। এতদিন পর্যন্ত হইচই ছিল, এখন তার অভাবে কিছুদিন পর্যন্ত খারাপ লাগতে লাগল। সেইদিন কাজাকদের বানানো মোমো এলো, আর এত বেশি এলো যে আমরা খেয়ে উঠতে পারলাম না। মোমো সামোসার মত আটার ভেতর মাংসের কিমা ভরে ভাপে সেদ্ধ করা চীনা খাবার। এটা আমার খুব প্রিয়। চীনা তুর্কিস্তান থেকে পালিয়ে আসা কাজাকদের মধ্যে দু-একটি পরিবার এখানে বসবাস করছিল। তারাও মোমো-প্রেমী। খুব আদরের সঙ্গে তারা আমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছিল।

১৮ তারিখ বৃষ্টি হচ্ছিল, সেইসময় কোনোখান থেকে ফেরার পথে বৃষ্টিতে ভিজে শ্রীমতি ক্রিম্প তাঁর পুত্র আর অপর একজন ইংরেজ মহিলা শ্রীমতি আইরিন রায়-এর সঙ্গে এলেন। শ্রীমতি রায় ইংল্যান্ডে পড়ার সময় এক ভারতীয় ডাক্তারকে বিয়ে করেছিলেন। এখন গরমে এখানে এসে খ্রিস্টান পরিবারে থাকছিলেন। জানতে পারলাম, তিনি খুব ভাল টাইপ করেন। পরে জানা গেল তাঁর গতি অসাধারণ। আমার এখন কোষের ইংরেজি

শব্দগুলি গ্রন্থাকারে টাইপ করানো দরকার ছিল, যার জন্য তাঁকে বলতে দ্বিধাবোধ করছিলাম। কারণ তাঁকে কম পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে না আর হয়তো তিনি এ কাজ করতে সম্মত হবেন না। জানতে পারলাম স্বামীর সঙ্গে কিছু মনোমালিন্য হয়েছে (পরে দুজনের প্রেম পূর্ববৎ স্থাপিত হয়ে যায়)। শ্রীমতি রায় সানন্দে কাজ গ্রহণ করলেন, কিন্তু তাঁকে পারিশ্রমিক দিতে আমাকে খুব কষ্ট করতে হয়। তিনি যখন টাইপ করতেন তখন এত দ্রুত খটখট শব্দ হতো যে বিশ্বাস হতো না—এতো দ্রুতগতিতে টাইপের ওপর আঙুল চলতে পারে। তিনি আসায় কমলারও একটা বড় লাভ হলো। কমলা হিন্দি টাইপ করছিল, কিন্তু টাইপ করার কৌশল সে নিয়মানুসারে শেখেনি। আইরিনের মত গুরু সে অন্য কোথায় পেত? তিনি খুব যত্ন করে কমলাকে টাইপ করতে শেখালেন, যদিও সেটা ছিল দেবনাগরী টাইপরাইটার, কিন্তু টাইপরাইটারের যোজক এবং তার ওপর আঙুল চালানোর নিয়ম তো একই রকম। অল্পদিনের মধ্যে কমলা তা শিখে গেল আর তার টাইপের গতিও বেড়ে গেল।

২৪ জুলাই কুয়োমিন্টাং রেডিও থেকে খবর পেলাম লাসায় কমিউনিস্টদের প্রভাব বেড়ে গেছে আর আমাদের প্রতিনিধিদের বার করে দেওয়া হচ্ছে। বিরোধীদের নেতা সুর-খঙ-চাঙের লোক। সুর-খঙ-চাঙে আমাদের পরিচিত জেনারেলের বড় ভাই ছিলেন। সেদিন আমি মধ্যাহ্নভোজন তাঁর সঙ্গেই করেছিলাম। এখন লাসায় ভাবা হচ্ছিল যে কুয়োমিন্টাঙের লোকেদের উত্তরে তুঙ্গনদের এলাকায় অথবা ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

তৃতীয়বার দিল্লী—২৫ তারিখ আবার অনুবাদ-সমিতির কাজের জন্য বাগডোগরা গিয়ে এগারোটার বিমান ধরলাম। টের পেলাম যে চশমা ভুলে এসেছি। চশমা ছাড়া দিল্লী গিয়ে কিভাবে কি করতাম? বহুবছর ধরে পরার জন্য তার প্রয়োজন অনিবার্য ছিল। দুপুরের পর কলকাতা পৌঁছে প্রথমেই চিন্তা হলো একটা চশমা নিয়ে নেওয়া যাক। ধর্মতলায় চশমার দোকানে গেলাম। কিন্তু দোকানদার বিধি-বিধান জানাতে লাগল—প্রথমে চোখে ওষুধ দেবে, তারপর পরীক্ষা করে নম্বর জানা হবে, তবে চশমা দেবে। 'ন-মণ তেল'-এর শর্ত মানতে কি করে রাজি হতাম আমি? পরের দিনই আমাকে দিল্লী পৌঁছতে হবে। আমি বললাম, 'যে চশমা আমার চোখে লাগে, ঝটপট সেটা আমাকে দিয়ে দিন।' ৫০ টাকায় চশমা কিনে নিলাম। বড় দোকান ছিল, নয়ত অন্য জায়গায় তার চারভাগের একভাগ দামেও পাওয়া যেত। সেনগুপ্ত কিছুদিনের জন্য ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিল। তার সঙ্গেও দেখা হলো আর সেঙ্গরজীর সঙ্গেও দেখা হলো। কলকাতায় পৌঁছলে সেঙ্গরজীর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা থাকার অবসর হবে না, এ হতে পারে না। ২৬ জুলাই সকাল সাতটায় যে বিমান রওনা হয় সেটা গিয়ে ধরলাম। এটা বিড়লা কোম্পানির ছিল, যেটা পাটনা বেনারস, লক্ষ্ণৌতে থেমে সাড়ে ছঘণ্টায় দিল্লী পৌঁছত। ডাকোটা বিমান পাঁচ হাজার ফুট পর্যন্তই ওপরে উড়তে পারে, মাটির কাছাকাছি ওড়ার জন্য বিমানের ভেতরটা গরম বোধ হচ্ছিল। দেড়টার সময় আমি দিল্লী পৌঁছলাম। সেদিনই তিনটে সময় অনুবাদ-সমিতিতে উপস্থিত

হলাম। রোজ কাজ চলতে থাকল।

২৯ জুলাই আমার সবচেয়ে ছোট ভাই শ্রীনাথ তার দু ছেলে ওমপ্রকাশ আর জয়প্রকাশকে সঙ্গে নিয়ে এলো। এখনও সে কোনো মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি নিয়ে ফেরি করত। দিল্লীতে থাকা দশ-বারো বছর হয়ে গেল, কিন্তু এখনও ফেরি করাতেই লেগে থাকল। যদি খানদানি বানিয়া হতো তাহলে এতদিনে দোকান করে ফেলত। বলছিল, 'যদি টাকা থাকত তাহলে আমি নিজের দোকান এই মুহূর্তে দাঁড় করিয়ে দিতে পারতাম।' আমি তাকে সেজন্য ২১০০ টাকা দিলামও, কিন্তু ব্যবসার বুদ্ধি অন্যরকম হয়। সে আবার ফেরিওলাই হয়ে থাকল। হ্যাঁ, শহরে থাকার জন্য তার ছেলেদের পড়ার কিছু সুবিধে হয়েছিল, তবে সে তো বাড়ির অন্য ছেলেদেরও হচ্ছিল।

দিল্লীর চারদিক ইংরেজি পরিবেশ। ২৯ তারিখ এক মহিলাকে তার কুকুরের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে শুনলাম। শুনেওছিলাম যে কুকুর ইংরেজিতে বললেই বুঝতে পারে। আমার এমন বিশ্বাস ছিল না। মুসৌরি আসার পর আমি চার সপ্তাহের ভূতনাথকে আমার কাছে রেখেছিলাম। সে পাঁচ বছরের হয়ে গেছে, কিন্তু ইংরেজির একটা অক্ষরও বোঝে না। এই মুহূর্তে সংবিধান-সভায় ইংরেজির স্থান হিন্দি নেবে কি নেবে না তাই নিয়ে বিবাদ চলছিল। যে আমলাদের ইংরেজির সাহায্যে রুটি জুটত, তাদের জীবনভর তার হাত থেকে মুক্তি পাবার গ্যারান্টি দেওয়া সত্ত্বেও তারা হিন্দির উন্নতি দেখতে চায় না। শুধুমাত্র ইংরেজির দৌলতে দিল্লীর সমস্ত কার্যালয়ে যারা ছেয়ে আছে, তারা হিন্দির ঘোর বিরোধী। আর আফশোশ তো এটাই যে তারা নেহরুজীর কাছ থেকে বল পাচ্ছে। আজকাল ইংরেজি আর ভাই-ভাইপো-ভাগ্নে অথবা বোন-ভাইঝি-ভাগ্নী এই দুই যোগ্যতাই মানুষকে উঁচু পদে পৌঁছে দিতে পারে। এই পক্ষপাত অত্যন্ত ভয়ংকর। মানুষ তীব্র আলোচনা করছে, তাদের মনে আগুন জ্বলছে। আমাদের এক মহাপুরুষের বোনের সম্বন্ধীর মেয়ে একটি বিভাগে উঁচু চাকরিতে ছিল। বিয়ের পর তার চাকরি ছাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যেখানে দেবাতিদেব এর সম্বন্ধের ব্যাপার, সেখানে ছাড়ানোর সাহস কে করবে? ওপরে এক জায়গায় যদি এমন অন্যায় হয়, তবে নীচের লোকেরা তার থেকে কেন উৎসাহ পাবে না?

'ঘুমক্কড় শাস্ত্র'র জন্য রাজকমল-এর লোকেরা এক হাজার টাকা অগ্রিমও দিয়ে দিল। এবার তার তিন ফর্মা ছাপাও পাওয়া গেল। শাস্ত্র ১৯৪৯ সালেই ছাপা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার তিন হাজার কপি ১৯৫৬ সালে শেষ হয়েছিল। এটা বলে দেয় যে হিন্দি বইএর বিক্রি কেমন।

এই যাত্রাতে হিন্দির জন্য অখিল ভারতীয় সম্মেলন ডাকা হয়েছিল, তাতেও যোগ দেবার ছিল। শেঠ গোবিন্দদাসজী পরামর্শ দিয়েছিলেন (তিনিই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন) যে, ভারতের সমস্ত প্রদেশে বিদ্বানদের সম্মেলন করে সেখানে হিন্দির পক্ষ সমর্থন করানো যাক। তাহলে তার প্রভাব পার্লামেন্টের ওপর খুব বেশি পড়বে। সম্মেলন এর জন্য বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করল, কিন্তু সেখানে যে সব লোক এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেককে দেখেই নিরাশা হচ্ছিল। ড. নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী হিন্দি আর উর্দু

উভয়কেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ উভয়েরই কালো অক্ষর তাঁর কাছে মোষের মত ছিল। এইসঙ্গে তিনি এও জানতেন যে শিক্ষাবিভাগের দেবতা আজাদ আর ভারত সরকারের মহাদেব উর্দুর সমর্থক। উর্দু-হিন্দি চুলোয় যাক, তাঁর তো শুধু দেব-মহাদেবের কৃপা-দৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় আর কার্যালয়গুলিতে তো তিনি অনন্তকাল ধরে ইংরেজি চান। সুনীতিবাবু হিন্দি ভাষা আর দেবনাগরীকে স্বাধীন ভারতের জন্য অলংকার করে রাখতে চান। অপর দেশগুলির সঙ্গে দৌত্য-সম্বন্ধ স্থাপিত করার ব্যাপারে তার মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার হওয়া উচিত, কিন্তু সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাধ্যম ইংরেজিই থাকুক। ড· খাণ্ডের ভাবনা অনেক সংশোধিত ছিল, আর সংস্কৃতের পণ্ডিত হয়েও তিনি জানতেন যে, হিন্দিই আমাদের দেশের সম্মিলিত ভাষা হতে পারে। ড· কুন্‌হন রাজা দেখতে চাইতেন সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হয়েছে।

৬ আগস্ট সকাল আটটার সময় ইম্পিরিয়াল হোটেলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা বিদ্বানদের একটা বড় সভা হলো। নটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত লোকেরা তাঁদের মত প্রকাশ করলেন। বেশিরভাগ লোক হিন্দির পক্ষে ছিলেন আর দশ-পনেরো বছর সময়সীমার মধ্যে ইংরেজিকে পুরোপুরি সরিয়ে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। লোকেরা ইংরেজিতে ভাষণ দিলেন। আমি দেখছিলাম, সমস্ত প্রদেশ থেকে আসা বিদ্বানরা সংস্কৃত জানেন, তাই আমি আমার মতামত সংস্কৃতের মাধ্যমে প্রকাশ করলাম, যা লোকে পছন্দও করল। যাইহোক, এই সভা থেকে হাওয়ার গতি কোনদিকে তা বোঝা গেল। দুপুরের পরে কনস্টিট্যুশন ভবনে বিদ্বদ্-পরিষদের বৈঠক হলো। ড· কাণে আসতে পারেননি, সুনীতিবাবু ইংরেজির দিকে বেশি ঘেঁষেছিলেন, তাই ড· গোডবোলকে সভাপতি নির্বাচিত করা হলো। ড· রাঘবন, তামিলনাড়ুর ড· নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী মালাবারের মহাকবি বল্লতোল আর চন্দ্রহাসন, কন্নড়ের নাগাপ্পা আর এইরকম অন্য পণ্ডিতরাও ভাষণ দিলেন। আমাকে সংস্কৃতে বলার জন্য অনুরোধ করা হলো, আমি তাতেই বললাম। তারপর মহামহোপাধ্যায় গিরধর শর্মা বললেন, 'রাহুলজী রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, তাই আমিও আমার মত সংস্কৃততেই প্রকাশ করছি।' ওই পরিষদে এমন অনেক বিদ্বান ছিলেন যারা হিন্দি বুঝতেন না। ছটা পর্যন্ত পরিষদ চলল। খুব বেশি সংখ্যায় লোকেরা হিন্দির সমর্থন করল। পরের দিন আবার পরিষদ হলো, যেখানে প্রস্তাব পাস হলো—ভারতের, রাষ্ট্রভাষা দেবনাগরী লিপিতে হিন্দি হওয়া উচিত, আন্তর্জাতিক কাজের জন্য খুব তাড়াতাড়ি হিন্দিকে গ্রহণ করা উচিত, আন্তঃপ্রাদেশিক তথা কেন্দ্রের কাজে দশ বছরের ভেতর হিন্দির ব্যবহার হওয়া চাই, সব ছাত্রকে নিজের মাতৃভাষার বাইরে হিন্দি আর হিন্দিভাষীদের অন্য কোনো একটি ভাষা অনিবার্যভাবে পড়াতে হবে। আদর্শ বাক্যে সংস্কৃতকেও ব্যবহার করা উচিত। বিকেল দুটো থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত পরিষদে উক্ত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়ে গেল।

সেদিন রাতে শ্রীশিব্বনলাল সাকসেনার সঙ্গে কথাবার্তা হলো। সেইসময় রাশিয়ায় বেশিদিন থেকে ফিরে আসা ভারতীয় কমই ছিল। সাকসেনাজী আমার কাছে রাশিয়ার সম্বন্ধে বহু কথা জানতে চাইলেন। তারপরে কমিউনিস্ট চীন আর কমিউনিস্ট রাশিয়াকে নিজের চোখে ভালভাবে দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল আর বুঝতে পেরেছিলেন যে, কত

—১৯৪৯—

দ্রুত সেখানে পরিবর্তন হয়েছে, লোকেদের অবস্থার ক্রমোন্নতি হচ্ছে। সেইদিনই শ্রীমহেশপ্রসাদ শ্রীবাস্তবও চলে এলেন। তাঁর সঙ্গে তো মধ্যরাত্রের পরেও কথা হতে থাকল। আমি মূলত শ্রোতা ছিলাম। বক্তা মহেশপ্রসাদজী ছিলেন। কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কয়েকবার জেলে গিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই বিজয়লক্ষ্মী ও অন্যান্য নেতাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। রিওয়াঁর কোনো গ্রামের তিনি বাসিন্দা। বিজয়লক্ষ্মী যখন ভারতের রাজদূত হয়ে রাশিয়া যাচ্ছিলেন, মহেশপ্রসাদজী বলায় তাঁকে চাপরাসি বানিয়ে নিয়ে যান। বছরখানেক শ্রীবাস্তব তাঁর সঙ্গে মস্কোতে ছিলেন। হিন্দি ভাল জানতেন, আর হিন্দি টাইপ করতেও জানতেন। চাপরাসি হয়ে তিনি গিয়েছিলেন, কিন্তু মস্কো যাবার পর তিনি সুযোগ পেলেন, যখন সোভিয়েত সরকারের গতিবিধি দেখে ভারতীয় দূতাবাসকে তাদের লেখাপড়ার কাজে হিন্দি ব্যবহার করতে বাধ্য হতে হলো। সেখানে যে আই· সি· এস· আর বড় আমলা গিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই বাল্যকাল থেকে ইংরেজির দুধ পান করেছিলেন। হিন্দির সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এক রুশ সহায়িকা শ্রীবাস্তবকে প্রশ্ন করছিলেন—অমুক মহাশয় তাঁর ছোট ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে ইংরেজিতে কেন কথা বলেন? সেই অল্পশিক্ষিত রুশ মহিলার মনে এই শঙ্কা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু আমাদের ইন্দো-আংগ্লিয়ানদের মাথায় সেটা আসেনি। লজ্জা তো তখনই হয়ে যখন মানুষ কিছু বুঝতে পারে। শ্রীবাস্তব তাঁকে বললেন, 'উনি ভাষা অভ্যাস করাচ্ছেন।' এটা ভুল। অভ্যাস করাচ্ছিলেন না, বরং তাঁর সাহেবজাদা আর সাহেবজাদীকে অভিজাত শ্রেণীতে রাখার জন্য নিজের ভাষাকে তিরস্কার করা আর ইংরেজিকে গ্রহণ করাটা জরুরি। বিজয়লক্ষ্মীজীর সঙ্গে প্রয়াগ থেকে একজন হরিজন রাঁধুনিও গিয়েছিল। আমাদের দেশী সাহেব-মেম ইউরোপীয় খাবারও খেয়ে নেন, কিন্তু বাল্যের মশলা দেওয়া মুখরোচক খাবারের স্বাদ তাদের মুখ থেকে যেতে চায় না, তাই ভারতীয় রাঁধুনিরও দরকার পড়ল। আমাদের দেশে কাজ করার চাকর-বাকরের ওপর মালিকের খুব দয়া হলে কখনও কখনও কিছু মিষ্টি কথা বলে দেন। মানুষ হিসেবে তাকে সমান ভাবা হোক—একথা তো কল্পনাতেও আনা যায় না। সেখানে রুশ বিদেশ-বিভাগের কোনো বড় অফিসার এলে, যদি তার সময় হতো রাঁধুনির সঙ্গে টেবিলে বসে চা খেত, আর মন খুলে কথাও বলত। রাঁধুনি রাশিয়ার ওপর খুশি হবে না কেন? একবার তো এদেশে কোনো অভদ্র ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে সে ভাবতে শুরু করেছিল যে সেখানকারই হয়ে যাবে। ভারতীয় দূতাবাসের সব নিম্নশ্রেণীর চাকররা রাশিয়ার প্রতি খুশি ছিল। কারণ সেখানকার বড় লোকেরাও তাদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করত, কিন্তু ঘোঁট-পাকানো আমলারা রুশদের সব ব্যাপারে নাক সিঁটকাত। রুশদের সঙ্গে মেলামেশাও করত না তারা। ভাষার অসুবিধে ছিল, তবে সেটা তারা অনেকটাই দূর করতে পারত। তাদের ওঠা-বসা বেশিরভাগই ইংল্যান্ড আর আমেরিকার দূতবাবাসের লোকদের সঙ্গে হতো, যাদের রুশরা খুবই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত। বিজয়লক্ষ্মী তাঁর সমস্ত কার্যকালে রাশিয়াকে ভারতের কাছে আনতে পারেননি, তার কারণ ছিল এই।

প্রয়াগ—৯ আগস্ট অনুবাদ-সমিতির কাজ করে সেইদিনই রাতে প্রয়াগের ট্রেন ধরলাম।

দিল্লীর এতটা দৌড়োদৌড়ি গরমের সময়ই হচ্ছিল। যদিও বেশিরভাগ সময় কালিম্পঙেই থাকতাম, তবু পাহাড় থেকে নীচে নামতে লোম ঝরে যেত। এখন ভাবছিলাম, ভাল হয় যদি আবার শীতের আগে দিল্লী আসার দরকার না পড়ে। ১০ আগস্ট সাড়ে নটার সময় প্রয়াগ পৌঁছে গেলাম। স্টেশনে সেনগুপ্তজীকে পেলাম। শ্রীনিবাসজীর খেয়ে সম্মেলন-কার্যালয়ে পৌঁছলাম। 'শারীরস্থান' এবং অন্যান্য কতগুলি শব্দকোষ এখন প্রেসের জন্য তৈরি ছিল। এখানে দেখলাম, ছাপার গতি অত্যন্ত মন্দ। এ বড়ই নিরাশাজনক কথা, কারণ কম করে ছটা শব্দকোষ প্রকাশিত হলে পরেই আমাদের গাড়ি দ্রুত চলতে পারত।

কালিম্পং—১২ আগস্ট সকালে রামবাগে কাটিহারের ছোট লাইনের ট্রেন ধরলাম। ট্রেনে প্রথম শ্রেণীর কামরা ছিল না, তাই দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট বদল করতে হলো। ১৩ তারিখ সকালে গাড়ি বারৌনী ছাড়িয়েছিল আর সাড়ে এগারোটার সময় কাটিহার পৌঁছল। সময় ছিল না তাই নেমে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। পরের গাড়ি খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া গেল। ধীরে ধীরে চলে রাত দশটায় নকসালবাড়ি পৌঁছলাম। সেখান থেকে এক টাকা দিয়ে বাসে চড়ে শিলিগুড়ি স্টেশনে পৌঁছলাম। একটা ট্যাক্সির সঙ্গে কথা বলে তাতেই রাতে শুয়ে থাকলাম। তাড়া ছিল তাই ভাড়া যা চাইল দিতে রাজি হয়ে গেলাম। ২৮ টাকা দুজন লোকের জন্যও বেশি ছিল, ট্যাক্সিও ছিল খুব পুরনো। ভয় হতে লাগল, রাস্তায় কোথাও খারাপ না হয়ে যায়! যাইহোক, কোনোরকমে আটটার সময় 'পার্বতী' পৌঁছে গেলাম।

কমলা টাইপ করাতে খুবই উন্নতি করেছিল। নিজের মনে হিন্দি বই পড়ছিল। আমি ভাবলাম এই বছর সম্মেলনের 'বিশারদ পরীক্ষা' দিয়ে দিক, কিন্তু কালিম্পঙে অথবা তার কাছাকাছি কেন্দ্র ছিল না, তাই সে বছর তা সম্ভব হলো না। শ্রীসেনগুপ্ত লক্ষ্ণৌতে ড· মালব্য ও অন্যান্য জায়গার পণ্ডিতদের কাছ থেকে পরিভাষা নেবার জন্য থেকে গিয়েছিলেন। 'পার্বতী'তে ড· ভট্ট আর রামেশ্বরজী কাজ করছিলেন। একদিন কমলা বৃষ্টিতে খুব ভিজে গেল, তাই ১৮ আগস্ট থেকে তাকেও এখানে থাকার ব্যবস্থা করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে বলে দিলাম। কমলার বাবা মারা গিয়েছিলেন, আর পাঁচ ভাইবোনের পরিবারে বড় ভাই কোনোরকমে নিজের খরচ-খরচাটুকু রোজগার করতে পারত। মা দর্জির কাজ করত, কিন্তু তার কাছে ভাড়ার মেশিন ছিল। আমি কমলাকে বললাম, একটা মেশিন কিনে তোমার মাকে দিয়ে দাও। সে দিয়ে এলো। ছেলে যা করেনি, তা মেয়ে করল, এতে মা খুশি।

কমলা এখন অনেক কাছে চলে এসেছিল। আগেই বলেছি ডায়াবেটিসের ইনজেকশন দেওয়া আর লেখার কাজে সাহায্য করেছে। এদিকে অনেকদিন ধরেই আমার চিন্তা হচ্ছিল যে, স্থায়ী কিছু ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এটা কমলা করতে পারত। তারপর তার স্বভাব লক্ষ করলাম। পড়ার আকাঙ্ক্ষা আর প্রখর বুদ্ধি ছিল তার, তাই আরো ঘনিষ্ঠ হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীমতি রায় তাকে এখন টাইপে পণ্ডিত বানিয়ে দিয়েছিলেন, দুঘণ্টায় একটা লেখা টাইপ

করে ফেলা তার কাছে সহজ ছিল।

চীনে কমিউনিস্ট মুক্তিসেনা লঞ্চাউ শহর নিয়ে নেবার পর ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তুঙ্গনের একনায়কের রাজধানী সিনিংও নিয়ে নিয়েছিল। পিকিং রেডিও ঘোষণা করল, তিব্বতী ভাইদেরও আমরা বিরোধীদের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না। এও জানতে পারলাম যে, ৪০টি খচ্চরে জিনিসপত্র চাপিয়ে দুজন আমেরিকান লাসা যাচ্ছে। এর কারণ কি? চীন মুক্তি সেনার লাসায় আসাটা তাদের কি করে পছন্দ হতো? তারা চারদিকে হাত-পা ছুঁড়ছিল। কিন্তু, শেষপর্যন্ত তাতে কোনো ফল হবে, তার সম্ভাবনা সেইসময়ও বোঝা যাচ্ছিল না। আমি তো এমনিতেই গোয়েন্দা পুলিশের চোখে একরকম বিপদজ্জনক ছিলাম। এখন কালিম্পঙে এসে তিব্বতের সীমার কাছে এসে বসেছিলাম। ইংল্যান্ডের কোনো পত্রিকায় এর উল্লেখও করেছিল, কিন্তু শুধু কথায় ছাড়া কোনো কাজের সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ ছিল না। আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি চীনের প্রতি ছিল। আমি জানতাম, চীনের সঙ্গে থাকাতেই তিব্বতের মঙ্গল, আর এছাড়া তার জন্য অন্য কোনো পথও নেই। এই কথা যে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে বলতাম বা চিন্তা করতাম, তা নয়। এর সম্বন্ধে 'নবীন চীন স্বাগত' ইত্যাদি প্রবন্ধও লিখেছি। যে মানুষ তার সব কথাই পরিষ্কার করে বলে দেয় তার পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে হাজার হাজার টাকা খরচ করার কি দরকার? এই প্রশ্নের জবাব তো দিল্লীর দেবতাই দিতে পারে।

১০ সেপ্টেম্বর শ্রীসেনগুপ্তের জন্মদিন ছিল। বাড়ির মধ্যে একটা পার্টি হলো। আশেপাশের কয়েকজন প্রতিবেশি ভদ্রলোক ও মহিলাও যোগ দিলেন। বছরের শুরু থেকেই সেনগুপ্তজী তাঁর জ্যোতিষের জোরে ঘোষণা করছিলেন, 'এইবছর তো আমাকে মরতে হবে।' শ্রীবিদ্যানিবাসজীও ফলিত জ্যোতিষের পণ্ডিত। এটা আমি মানি যে, সেনগুপ্তও এই বিদ্যায় তাঁর থেকে কম পারঙ্গম নন। যখন বিদ্যানিবাসজী একথা শুনলেন, বলতে লাগলেন, 'ভারি বোকামি, জ্যোতিষের গ্রহগুলোকে নিজের ওপরে কি ফলানো যায়?' আমি সেনগুপ্তকে বছরের শুরুতেই বলে দিয়েছিলাম, 'এই বছর গ্রহের থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। কিন্তু, এখন তুমি আবার নিজের জ্যোতিষের জ্ঞান নিজের উপর ফলাবে না।' সেনগুপ্তজী এখন সুস্থ ও খুশি রয়েছেন। সে বছর তো খুবই নিরাশ ছিলেন, শরীরও তাঁর ভাল ছিল না। পেনিসিলিনের ঠাকুমা স্ট্রেপটোমাইসিন এখনও দুর্লভ, কিন্তু সেই ইনজেকশনও তিনি নিচ্ছিলেন। অধিকন্তু সন্দেহের শংকার ভূত মাথায় চেপেছিল।

রামেশ্বরজী খুবই কর্মঠ যুবক ছিলেন। কাজে লেগে পড়াটা তার স্বভাবে ছিল। কিন্তু তাঁর এক চোখে পক্ষাঘাতের প্রভাব ছিল, সেই কারণে বেশিক্ষণ বইয়ের দিকে তাকালে তাঁর চোখ থেকে জল পড়তে থাকত আর যন্ত্রণা শুরু হয়ে যেত। একঘণ্টাও বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকা তাঁর পক্ষে কষ্টকর ছিল। এমন অবস্থায় তাঁর কাজে মন বসছিল না। এমন একজন যুবককে হারানো আমাদের কাছে দুঃখজনক কথা। ধীরে ধীরে এও বুঝতে পারছিলাম যে, সম্ভবত পরিভাষার কাজ আমরা আর বেশিদিন করতে পারব না। যতদিন পণ্ডিত বলভদ্র মিশ্র সম্মেলনের মুখ্য সচিব ছিলেন ততদিন আমাদের সবরকমের সাহায্য

পাওয়া সম্ভব ছিল, পরিভাষা-কোষের তৈরি পাণ্ডুলিপি ছাপানোর ব্যাপারে তিনিও বিশেষ কিছু করতে পারেননি। এখন তো সম্মেলনের নিজের প্রেসে মোনোটাইপও এসে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও সীতারাম গুপ্তের মতো কোনো ব্যবস্থাপক পাওয়া যায়নি, যে কারণে সমস্ত উপকরণ থাকা সত্ত্বেও কাজ এগোন সম্ভব হয়নি। যদি প্রেস তৎপরতার সঙ্গে কাজ শুরু করত, তাহলে আমরা পরিভাষার কাজে এগোতে পারতাম। সম্মেলনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমি সব দলের সঙ্গ ধরেই চলতে পারতাম। কিন্তু পরিস্থিতি জানান দিচ্ছিল যে, এখন বেশি আশা করা উচিত নয়।

পরিভাষারই কাজের জন্য সুবিধেমত ঠাণ্ডা জায়গা খুঁজে আমরা কালিম্পঙে এসেছিলাম। এখান থেকে সরে যেতে হলে আমাকে অন্য জায়গারও খোঁজ করতে হতো। কোটগঢ় থেকে ড· ভগবান সিংহ এখনও চিঠি লিখছিলেন। তিনি একটা ভাল বাংলো ঠিকও করেছিলেন, কিন্তু সেখানে বিদ্যুৎ ও জলের প্রায় আকাল পড়ে যেত, চাকর পাওয়া আরও মুশকিল ছিল।

১৮ সেপ্টেম্বর এক চিঠিতে জানতে পারলাম যে, সংবিধানসভা হিন্দি আর দেবনাগরী লিপিকে রাষ্ট্রভাষা আর রাষ্ট্রলিপি হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। তবে হ্যাঁ, ইংরেজি অঙ্কের সঙ্গে। আজাদ খোলাখুলি আর সেইসঙ্গে নেহেরুও, প্রথমে প্রাণপণে চেষ্টা করে গেছেন যাতে হিন্দি একেবারে স্বীকৃতি না পায়। তাঁদের সঙ্গে কেউ ছিল না, তাই যেতে যেতে খ্যাপা বেড়ালের মত ইংরেজি অঙ্ককে মাথায় চাপাতে সফল হলেন। প্রত্যেক লিপি লেখার জন্য নিজস্ব বিশেষ লেখনি থাকে। তাই দিয়ে অক্ষরও লেখা হয় আর অঙ্কও লেখা হয়। কোনো সুলেখক হিন্দি লেখার লেখনি দিয়ে ইংরেজি অঙ্ক লেখায় অসামর্থ দেখাতে পারে? হিন্দি মঞ্জুর হয়ে যাওয়ায় আজাদ সেই বিলাপ শুরু করলেন, যা মন্দোদরীও রাবণের মৃত্যুতে সম্ভবত করেনি। আর লারী সাহেব তো সদস্য-পদ থেকে ইস্তফাই দিয়ে দিলেন। আর শেষে পাকিস্তান হাইকোর্টে জজিয়তি সামলাতে চলে গেলেন। সংবিধান পনেরো বছরের জন্য ইংরেজির ভিত মজবুত করে দিল। সংবিধান প্রণেতাদের তখনও বিশ্বাস ছিল, পনেরো বছর কাটার পর আমাদের জীবন বহাল তবিয়তে থাকবে, আমরা আরো পনেরো বছরের মেয়াদ বাড়িয়ে নেব।

একদিন আমরা সবাই আরো বন্ধুদের সঙ্গে দূরবীন ডাঁড়া[1]-তে পিকনিক করতে গেলাম। ডাঁড়ার সবচেয়ে উঁচু এই স্থানটি এমন জায়গায় অবস্থিত, যেখান থেকে নীচে দূরে সমতলভূমিও চোখে পড়ে, তিস্তার এবং তার সঙ্গে মিশছে এমন নদীর উপত্যকা দেখা যায়। ড· রোয়েরিক, শ্রীমতি ক্রিপ্স, শ্রীমতি আইরিন রায় আর অন্য আরো অনেক মহিলা ও পুরুষ সঙ্গে ছিলেন। যদিও আমরা কালিম্পং ছাড়ার কথা চিন্তা করছিলাম, কিন্তু একথা তো স্বীকার করতেই হবে যে, সেখানে শুধু কিছু ব্যক্তির সঙ্গে নয়, বরং শত শত পরিবারের কাছ থেকে এমন আত্মীয়তা পেয়েছিলাম, যার ফলে তার আকর্ষণ কম ছিল না।

---

[1] দূর পর্যন্ত বিস্তৃত উঁচু ও সংকীর্ণ জমি—স·ম·

কখনও কখনও মানুষ বিচ্ছিরিভাবে ফেঁসে যায়, এমন ঘটনা সেপ্টেম্বরে ঘটল। শহরে নানা রকমের লোক থাকে, যারা ভিন্ন-ভিন্নভাবে নিজেদের জীবনযাত্রা চালায়। ভালো ছাপা লেটার-পেপারে কোনো লম্বা-চওড়া নামের সংস্থার নিমন্ত্রণপত্র এলে, মানুষ তার দিকে শঙ্কার দৃষ্টিতে কেন দেখবে? কোথাও যাওয়া-আসার থেকে আমি নিজেকে বাঁচাতাম, আর নিতান্ত বাধ্য হলেই কোনো সভা অথবা অধিবেশনে যেতাম। কলকাতার এক ভদ্রলোক তাঁর নিজস্ব ছোট সংস্থার অধিবেশনের জন্য ক্রমাগত নিমন্ত্রণ করতে থাকলেন, আমিও জানি না কি মনে হলো শেষে তা গ্রহণ করে নিলাম।

কলকাতা—এবার আমি রেলেই কলকাতা যাওয়া ঠিক করলাম। পাকিস্তান হবার পর এই রাস্তা দিয়ে যাইনি। সেসময় কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি সোজা ট্রেন আসত। ২৮ সেপ্টেম্বর ছটার সময় আমি শিলিগুড়ি পৌঁছলাম। দার্জিলিঙের ট্রেন এলে পরই এই ট্রেন ছাড়ত, এইজন্য ট্রেন দুঘণ্টা লেট হলো। স্টেশনেই পাকিস্তানের কাস্টম অফিস আছে। সেখান থেকে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে নিলাম। তা পেতে কোনো অসুবিধে হলো না। এখন পাসপোর্ট ইত্যাদির ঝঞ্ঝাট ছিল না। সেকেন্ড ক্লাসে শুতে যথেষ্ট বেশি জায়গা পাওয়া গেল। আমার সঙ্গে কলকাতাযাত্রী কর্পুরিয়াজীও ছিলেন। এমনিতে তিনি লক্ষ্ণৌ-এর কাশ্মীরী পণ্ডিত, কিন্তু এখন বহুবছর ধরে কলকাতায় থাকছিলেন। বৃদ্ধ ছিলেন আর উর্দুতে শুধু নয়, হিন্দিতেও কবিতা লিখতেন। পরিচয় হওয়ামাত্র গলা খুলে গেল। আমি কিছু গদ্য পড়লাম। তিনি তিনিও তাঁর পদ্যের নমুনা শোনালেন। বহুঘণ্টা ধরে আমাদের সুসঙ্গ চলতে থাকল। তিনি দার্জিলিং থেকে আসছিলেন। হতে পারে, কিছু সস্তা চা কিছু ভাল জাতের চা জন্মানোর অনেক বাগান দার্জিলিঙে আছে। কর্পুরিয়াজী তাঁর পুরো হোল্‌ডলটা চায়ের কৌটোয় ভর্তি করে রেখেছিলেন। পাকিস্তানের রাস্তা দিয়ে যেতে হবে, কিন্তু এগুলো তো পাকিস্তানের জিনিস নয়, তবুও ভয় তো ছিলই। আমি তো কখনই এমন বিপদ ঘাড়ে নিতে রাজি হতাম না। পাকিস্তান সরকার এমন নিয়ম বানিয়ে দিয়েছিল যে, কোনো যাত্রী পঞ্চাশ টাকার বেশি নিয়ে যেতে পারত না। এ নিয়ম কতদূর পালন হতো তা আমি বলতে পারি না। সম্ভবত, আমার কাছেও পঞ্চাশ টাকা ছিল। সারারাত তো দেখিনি পাকিস্তানের স্টেশন, লোক ও মাটি কেমন। সকালে ট্রেন ছোয়াডাঙ্গা স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল। তিন ঘণ্টা লেট ছিল। স্টেশনগুলিতে বেশিরভাগ মুসলমান চোখে পড়ছিল, যদিও হিন্দুদের অভাব ছিল না। পূর্ববাংলার বড় বড় জমিদাররা সকলেই প্রায় হিন্দু ছিল, আর চাষারা ছিল মুসলমান। তাই জমিদাবির জন্য কাঁদার কেউ ছিল না। আমাদের কামরায় চারজন হিন্দু উঠল। তাদের কাছ থেকে সেখানকার কথা জানতে পারলাম। তারা বলছিল যে, হিন্দু ব্যবসাযীরা খুব জমিয়ে ব্যবসা করছে, শুধু লাভের ভাগ পাকিস্তানি অফিসারদের দিতে হয়। ঘুষখোরী আর চোরবাজারীর রমরমা অবস্থা। ভারতে তারা যা দেখে তার থেকে অনেক বেশি। হিন্দু মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতার কথাও জানানো হলো।

যে সময় পাউন্ড-স্টার্লিং-এর দাম পড়ে যাওয়ায় ভারত তার টাকার দাম কমিয়ে দিয়েছিল। পাকিস্তান তখন তার টাকার দাম আগের মতই রেখেছিল। কিন্তু সেটা করায়

পাটের দামের অর্ধেক পড়ে যাওয়া আটকানো যায়নি। পাকিস্তানে বড় বড় সামরিক অথবা অসামরিক অফিসার বেশিরভাগই পাঞ্জাবী, সেইজন্য এখন সেখানে পাঞ্জাবী আর বাঙালীর প্রশ্ন খুব জোরদার হয়ে উঠেছে। পল্টনে ৭৫ শতাংশ পাঞ্জাবী ছিল, যারা বাঙালীদের খুব নিচু দৃষ্টিতে দেখত। অবাঙালী অফিসার আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা মনে করত যে, পশ্চিম-পাকিস্তানে যেমন উর্দুর প্রাধান্য রয়েছে তেমনই বাংলাতে করে দেওয়া হোক। কিন্তু বাঙালী মুসলমানদের কখনও উর্দুর পাল্লায় পড়তে হয়নি, আর তাদের মনে এমন চিন্তাও কখনও আসেনি যে, বাংলা হিন্দুদের ভাষা। নিজেদের ভাষার প্রতি তাদের অপার প্রেম ছিল। বহু মুসলমান সাহিত্যিক তাঁদের লেখনী দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁরা কি করে বরদাস্ত করতে পারেন যে, তাঁদের ভাষাকে হটিয়ে দিয়ে উর্দু রাখা হোক? কিন্তু ওপরের অফিসাবরা তা করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল। বাঙালী মুসলমানদের নিজেদের মাতৃভাষার প্রতি প্রেম প্রমাণ করার জন্য রক্তস্নান করতে এখনও চার-পাঁচ বছর দেরি ছিল, যার পরে ব্রহ্মাও বাংলাকে হটানোর সাহস করতে পারত না। কিন্তু সেইসময় তো তখনও পূর্ববাংলায় মুসলিম লিগের বোলবোলা চলছিল। তাদের নেতা বলছিলেন, 'আমাদের প্রচেষ্টাতেই পাকিস্তান হয়েছে, তাই প্রলয়ের দিন পর্যন্ত আমাদেরই নেতৃত্ব তোমাদের মানতে হবে।' প্রলয় পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার পড়েনি, বাঙালী মুসলমানরা দেখিয়ে দিয়েছে যে, মুসলিম লিগকে তাদের কোনো প্রয়োজন নেই। নির্বাচনে সাড়ে তিনশো মেম্বারদের মধ্যে বারোজনকেও কাউন্সিলে পাঠানো মুসলিম লিগের পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়ল। কিন্তু এখন সেদিন বহুদূরে বলে মনে হতো। তবু নিজেদের ভাষার অবহেলা মুসলিম তরুণরা বরদাস্ত করতে রাজি ছিল না। আমাদের কামরাতে একটা কার্টুন সাঁটা ছিল, তাতে দেখানো হয়েছে—বাংলা বর্ণমালার কাগজ ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, আর পাগড়ি বাঁধা একজন ষণ্ডা-মার্কা পাঞ্জাবী, চেপে বাখা একজন রোগা-পাতলা মুসলমানের মুখের ভেতর ছাপা উর্দু বর্ণমালা ঠুসতে ঠুসতে বলছিল, 'তুমি গিলিবে, গিলিবে।' কিন্তু শেষে বাঙালী মুসলমানরা উর্দু গিলতে অস্বীকার করেছিল।

পাকিস্তান হয়ে সাড়ে দশটার সময় আমাদের ট্রেন শেয়ালদা পৌঁছল। সভার ব্যবস্থাপকরা গ্র্যান্ড হোটেলে ওঠালো। শ্রীমণিহর্ষজীর বাড়িতে থাকাটা বেশি সুবিধের ছিল বলে একটার সময় সভাপতির ভাষণ পড়ে আমি তাঁর বাড়ি চলে এলাম।

এখন দুর্গাপুজোর ধূম চলছিল। নববাত্রি অথবা দশহরা ভারতের সব অংশেই পুণ্য পর্ব হিসেবে পালিত হয়, কিন্তু বাংলার এটা একমাত্র জাতীয় উৎসব। উত্তর-ভারতীয়দের জন্য দশহরা, দেওয়ালি আর হোলি আছে। যাতে সবাই খুব উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। আমরাও তার আনন্দ উপভোগ করতে লাগলাম। শ্রীভঁবরলালজী নাইটার সঙ্গে দেখা হলো। বহুদিন ধরেই আমি তাঁর কাজের একজন অদৃশ্য প্রশংসাকারী। দুই কাকা-ভাইপোর (অগরচন্দ নাইটা ও ভঁবরলাল নাইটা) জৈনগ্রন্থ এবং রাজস্থানের সাহিত্যিক সম্পদগুলির ব্যাপারে অসাধারণ জ্ঞান আছে। হস্তলিখিত ও অন্যান্য সামগ্রীর সংগ্রহ তাঁদের বিশ হাজারে পৌঁছে গেছে। সাহিত্য তাঁদের কাছে কেবল সাধনার বস্তু, জীবিকার জন্য তাঁরা

ব্যবসা করেন, যার থেকেই হাজার হাজার টাকা বার করে এই সাধনাতেও লাগান। এখন সময় অনুকূল নয়, তাই তাঁদের কাজের জন্য বাইরে থেকে তাঁরা ততটা উৎসাহ পান না, যতটা পাওয়া উচিত। তাতে অবশ্য একটুও নিরুৎসাহ না হয়ে তাঁরা তাঁদের কাজ করে চলেছেন। কত বই নিজেদের খরচে প্রকাশ করেছেন। তবে সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রকাশ করতে লক্ষ লক্ষ টাকা চাই। আমি তাঁকে বললাম যে, এগুলো টাইপ করে ডুপ্লিকেটর মেশিনে একশো-দুশো কপি বের করে নিলে সেগুলো যোগ্য বিদ্বানদের কাছে পাঠানো যেতে পারে।

যে সম্মেলনের সভাপতি হয়ে আমি গিয়েছিলাম, তার সম্বন্ধে ১ অক্টোবর আমি লিখেছিলাম, '...সম্মেলন নিয়ে খেলা করল। অজ্ঞাতকুলশীলের ওপর বিশ্বাস করা উচিত নয়।' নিজের টিকিটে এসেছিলাম আর এখন নিজের টিকিটেই ফিরতে হবে। যদি আগে জানিয়ে দিত তবে টিকিট পেতে সুবিধে হতো। যাইহোক, আমি বিমানে ফেরার টিকিট আনিয়ে নিলাম। ছটা দিন ছেলেমানুষী খেলায় নষ্ট হয়েছে বলে ধরে নিলাম। যে এই কাজ করেছিল, তার কিছু লাভ অবশ্যই হয়ে থাকবে, কারণ ছল করেই সে চাঁদা তুলতে পারত। খবরের কাগজে আমার সভাপতি হবার কথা শুনে আরো অনেকেই এসে ফেঁসেছিল। ঝাঁসীর কবি ড· আনন্দজী বেচারা অতদূর থেকে এসেছিলেন। তাঁকেও এখন নিজের খরচে ফিরতে হবে। সেদিন এক কোটিপতির বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন করতে হলো। মহল তো তৈরি হলো, কিন্তু হাত ধোবার কল গায়েব। থালা এবং অন্যান্য জিনিস ময়লা।

২ অক্টোবর উচ্চতর ক্লাবের বনভোজনে গেলাম। এই ক্লাবেব যিনি প্রাণপুরুষ তিনি সাহসী ছিলেন। মারোয়াড়ী স্ত্রীদের পর্দার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। বনভোজনে মহিলারাও ছিলেন। ভোজ মারোয়াড়ী ঢঙের ছিল। চুরমা আর রায়তা ভাল বানিয়েছিল। আমাকেও সেখানে কিছু বলতে হলো।

কালিম্পং—৩ তারিখ সকাল আটটায় বিমান উড়ল আর নটা বেজে ৫০ মিনিটে বাগডোগরায় নেমে গেল। এগারোটার সময় শিলিগুড়ি পৌঁছে গেলাম। কখনও কখনও শিলিগুড়ি স্টেশনে ট্যাক্সি খুব সহজে পাওয়া যায় এবং চার-পাঁচ টাকার বেশি একটা সিটের জন্য দিতে হয় না। কিন্তু যখন মানুষের গরজ বেশি আর ট্যাক্সি কম থাকে, তখন তারা ইচ্ছেমত ভাড়া উসুল করে নেয়। একটি তিব্বতী তরুণকে সহযাত্রী পেয়ে গেলাম। আমরা দুজনে চোদ্দ টাকা করে দিয়ে ড্রাইভারকে রাজি করালাম। দুবার তো সে সামনের দিক থেকে আসা লরির সঙ্গে প্রায় লাগিয়ে দিল। বড় বেপরোয়াভাবে হাঁকাচ্ছিল। তিনটের সময় আমরা 'পার্বতী' পৌঁছে গেলাম।

৪ তারিখ থেকে শ্রীমতী আইরিন রায়ের টাইপ করা চলছিল। তিনি খুবই নির্ভুল ও দ্রুত টাইপ করতেন। ১৮০ টাকা পারিশ্রমিক দিতে আমাদের খুব দ্বিধা হচ্ছিল। যদি পরিভাষার কাজ সেখানে থেকেই করতে হতো, তবে তিনি আমাদের এই টাইপ করানোর চিন্তা থেকে মুক্ত করাতে পারতেন।

ডায়াবেটিস তো সব সময়ের সঙ্গী ছিল। কখনও মুখ শুকিয়ে যেত, পেচ্ছাপ কখনও

কম হয়ে যেত আবার কখনও বেশি। পেচ্ছাপ বেশি হলে মন সেদিকে যেত। ভাত তো সপ্তাহে শুধু দুদিন খেতাম, কারণ দুদিন আমাদের ওখানে মাংস রান্না হতো। মাংসের সঙ্গে ভাত ভালো লাগত। কলাও ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আলু এখন বিচারাধীন ছিল। ৬ অক্টোবর আমাদের প্রতিবেশী শ্রীমতি মিত্রার বাড়িতে চা-পার্টি ছিল। অনেক অতিথি এসেছিলেন, যাঁদের মধ্যে একজন ডাক্তারও ছিলেন। তিনি জানালেন, চায়ে চিনি একেবারে বাদ দেবার দরকার নেই, কিছুটা খাওয়া উচিত। আলু, ভাত, মিষ্টি, ফল ইত্যাদি খাওয়া উচিত নয়। শশা, টমেটো, পেঁয়াজ আর লেবু খুব বেশি খাওয়া উচিত। খাওয়ার মাত্রা কম রাখা উচিত। মুরগি কিংবা পাখির মাংস বেশি উপকারী। সামান্য হাঁটাও উচিত, আর পেট পরিষ্কার রাখা উচিত। কিন্তু আমার এত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে তো এই বুঝেছি যে, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে রোজ খাবার আগে ইনসুলিন নেওয়া উচিত আর মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রাতের খাওয়া ত্যাগ করা উচিত।

আইরিশ মহিলা শ্রীমতি ক্রিক্সও আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচিতদের মধ্যে একজন ছিলেন। ড· ভট্টের ব্যাপারে আমার সর্বদা 'কাবুল গএ মুগল হোই আএ, বোলে মুগলী বাণী/ আব আব কহি পুতউ মরিগৈ, খটিয়া তর ঘরা পানী।' —এই লোকোক্তিটা মনে হতো। তিনি সম্পূর্ণ ইউরোপীয় মনোবৃত্তির হয়ে গিয়েছিলেন। ভারতীয় জীবনের সঙ্গে তিনি খাপ খাওয়াতে পারতেন না। তাঁর মন খারাপ হতো। আমরা সবরকমে তাঁকে ভোলানোর চেষ্টা করতাম। যদি সুস্থ থাকতেন, সফল হতাম, কিন্তু বেচারা হৃদরোগে খুব বিশ্রীভাবে ফেঁসেছিলেন। মদ্যপান বেশি করতেন না, তবে মদিরা তাঁর অবশ্যই লাগত। আমাদের মধ্যে কেউ এখানে তা ছুঁত না, কিন্তু তাঁর পান করায় কেউ তাঁকে বাধাও দিতে চাইত না। তাঁকে দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম। তাঁর মতো ইংরেজি, জার্মান, সংস্কৃতের ওপর নিজের ভাষা কন্নড়ের মত দখল রাখা মানুষ, পরিবারের ভার থেকে মুক্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তি কেন জীবনের চিন্তা করেন? কিন্তু তাঁর চিন্তার কারণ ছিল এই যে, এত বছর পরে ভারতে ফিরে এসে তিনি নিজেকে জলের বাইরে ছুঁড়ে ফেলা মাছের মত মনে করতেন। কখনও কখনও তিনি পত্র-পত্রিকায় ইংরেজি লেখা লিখে পাঠাতেন। আমার বলাতেও তিনি কন্নড় লেখা লিখবার উৎসাহ পেতেন না। যদি তিনি তাঁর জার্মানির অভিজ্ঞতাই ধারাবাহিকভাবে কোনো কন্নড় পত্রিকায় লিখতেন, তাহলে কর্ণাটকের মানুষ সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করত। তাঁর মত এমন যোগ্য বিদ্বান সেখানে আর কে ছিল? শ্রীমতী ক্রিক্স আর তাঁর পরিবারের সঙ্গে তিনি বেশি আত্মীয়তা অনুভব করতেন, আর কখনও কখনও দু-চারদিনের জন্য সেখানে চলেও যেতেন।

কালিম্পঙে আমাদের সহৃদয় ভদ্রজনদের মধ্যে সেখানদের সাব-ডিভিসনাল অফিসার শ্রীমোতিচন্দ প্রধানও ছিলেন। যখন তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। তিনি আমাদের পরিভাষার কাজেও আগ্রহ দেখাতেন। ৯ তারিখ দর্শনের অধ্যাপক শ্রীমুখার্জির সঙ্গে 'অনামী'তে দেখা করতে গেলাম। দর্শন বিষয়ে কথাবার্তা হতে লাগল। আমি এই উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম যে, মনোবিজ্ঞানের পরিভাষা সংগ্রহের কাজটা তাকে দিয়ে করাব। তিনি রাজি ছিলেন কিন্তু অসুস্থ ছিলেন। একটা অপারেশন হয়ে গিয়েছিল, আর একটা হবার কথা,

তাই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারতেন না। সব বাঙালী পরিবার সাংস্কৃতিক পরিবার হয়। আমাদের এখানে এখনও সংস্কৃতির পোঁচ ওপর ওপর পড়েছে, আর খুব কম পরিবারেই তা ভেতরের স্তর পর্যন্ত ঢুকতে পেরেছে। তার নিদর্শন হলো মুখার্জি মহাশয়ের তিন কন্যা। তারা সঙ্গীত-শিল্পে নিপুণ ছিল। অঞ্জলি লক্ষ্ণৌ-এর মেরিজ কলেজে সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেছিল আর সেখানে কখনও কখনও রেডিওতেও গান করত।

পরিভাষা-রচনা বিভাগের জন্য কখনও আশান্বিত হতে হতো আবার কখনও হতাশ। ১০ অক্টোবর জানতে পারলাম যে, সম্মেলন মার্চ ১৯৫০-এর জন্য ১৩ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছে। ৬০ হাজার শব্দকোষ আগে তৈরি হওয়া উচিত। আমি চিন্তা করতে লাগলাম, মার্চ পর্যন্ত কাজ করে ছেড়ে দেওয়া উচিত, কিন্তু ড· ভট্টের জন্য সবচেয়ে বেশি চিন্তা ছিল।

কমলা এখন কাজে অনেক উন্নতি করেছিল। টাইপ করত, সবকিছু ব্যবস্থা করার কাজও সে-ই সামলাত, কিন্তু তার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হচ্ছিল না, যার জন্য সবসময় মাথা ধরে থাকত। আমি ১৪ অক্টোবরই স্বীকার করে নিয়েছিলাম, 'কমলা খুব বুদ্ধিমতি। সাধারণ বিষয়েই শুধু নয়, লেখাপড়ার বিষয়েও। লেখার সামগ্রীর দিকেও পুরো নজর রাখে।' এমন সম্ভাবনাময় মেয়ে দারিদ্রের জন্য আর পড়তে না পারলে, নিজের ভেতরের গুণগুলি বিকশিত করতে না পারলে, তা বড়ই দুঃখের ব্যাপার হয়। বিশেষ করে আমি যখন তার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে পরিচিত হলাম, ভেতরে ভেতরে আমি স্থির করলাম যে, ওব উন্নতি করাতে হবে। টাইপ করায় কতখানি উন্নতি করেছিল তা এব থেকে বোঝা যাবে যে, ১৮ অক্টোবর সে ফুলস্কেপএর ১৪ পাতা টাইপ করেছিল। অনেকগুলি তালিকাও টাইপ করার ছিল। নাহলে আরো বেশি করতে পারত। ১৯ তারিখ তার চোখ ব্যথা করছিল, তবুও সে টাইপ করে চলেছিল। মানা করলেও শুনত না, হয়ত ভাবত, চুপচাপ বসে থাকা ভাল নয়।

দেশবিদেশের খবর জানার জন্য সেনগুপ্তজীও ততখানি ব্যগ্র থাকতেন, যতটা থাকতাম আমি। ২৯ অক্টোবর তিনি খবর দিলেন, তুঙ্গন (চীনা মুসলমান) কমিউনিস্টরা সেনাদের চাপে পড়ে তিব্বতের সীমানায় পৌঁছে গেছে এবং তিব্বতী সেনার সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হচ্ছে। আমার কাছে এটা খুবই চিন্তার ব্যাপার ছিল, কারণ তুঙ্গনরা এদিকে অগ্রসর হলে তিব্বতের সাংস্কৃতিক সম্পদের বিনাশ নিশ্চিত। এটা খুবই ভয়ানক ঘটনা হতো। পরের দিন খবর পেলাম, ড· রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হবেন। খুবই আনন্দের কথা, বিশেষ করে এই চিন্তা করে যে, রাজেন্দ্রবাবু সর্বদা জনতার মানুষ হয়ে থেকেছেন এবং শহর অপেক্ষা চাষীদের ভিড়েই তিনি বেশি আত্মীয়তা অনুভব করেন।

কালিম্পঙের শেষ মাস

অনুবাদ-সমিতির কাজের জন্য আবার আমার দিল্লী যাবার দরকার পড়ল। ২৪ অক্টোবর আড়াইটের সময় রওনা হয়ে সাড়ে পাঁচটার সময় শিলিগুড়ি পৌঁছে গেলাম। কাটিহারে তিলক গ্রন্থাগারের বার্ষিকোৎসবেও যোগদান করার ছিল, তাই কলকাতার রাস্তা ধরতে পারছিলাম না। শিলিগুড়ি থেকে লোকভর্তি বাসে জায়গা পেলাম। নটার সময় নকসালবাড়ি পৌঁছলাম।

অনেক কষ্টে প্রথম শ্রেণীতে জায়গা পেলাম। সৈনিকদের জন্য কম্পার্টমেন্ট রিজার্ভ ছিল। আমি আর একজন সহযাত্রী তাতে ভয়ে ভয়ে বসেছিলাম, আর সত্যিসত্যিই কর্নেল আসায় আমার সঙ্গীকে জায়গা ছাড়তে হলো। রেলের পক্ষে এটা এখন কোনো অসাধারণ ঘটনা ছিল না, তাছাড়া সেটা ছিলও তো খুব ব্যস্ত লাইন। পাহাড়ের লোকেরা চাকরির খোঁজে কলকাতা যায় আবার সেখান থেকে ফেরে। ২৫ অক্টোবর পূর্বাহ্নেই কাটিহার পৌঁছে গেলাম। কাটিহার জুট-কারখানার কেন্দ্র, জনসংখ্যা ৬০ হাজার। কিন্তু এখানকার ইঁট-কাঠ থেকে গ্রাম্য দারিদ্র ঝরে পড়ছিল। মিউনিসিপ্যালিটিও দরিদ্র। যারা কর দিতে পারে তারা না দিয়ে থাকতে পারে। যারা দরিদ্র, তারা কি দেবে?

মাবন্ডিয়ার বাড়িতে উঠলাম, যিনি মূলত শেখাবাটিতে উদয়পুরের বাসিন্দা। তিলক গ্রন্থাগারের অধিবেশনে যোগ দিয়ে সব থেকে বেশি আনন্দ হলো খুবই সাদাসিধা কিন্তু মেধাবী পণ্ডিত সূর্যনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়ে। অশ্বঘোষের কাব্যগ্রন্থের সুন্দর অনুবাদ করে তিনি হিন্দির বড় সেবা করেছেন। তাঁর ‘হর্ষচরিত’-এর অনুবাদ দেখেও আমার খুব আনন্দ হলো।

এমনিতেই তো সেই সময় রেল-যাত্রার নাম শুনলেই শরীব খাবাপ হয়ে উঠত, আর এই ছোট লাইন তো কষ্ট দিতে সবার সেরা। এখন তাতেই আমাব প্রয়াগ পর্যন্ত যাবার ছিল। ২৬ অক্টোবর প্রয়াগের ট্রেনে বসলাম। এখানেই কিছুটা লেট হয়ে গেল। ২৭ তারিখ সকালে ছাপরা পৌঁছলাম। আগে থেকে খবর দিতে পারিনি। স্টেশন দু-একটি পরিচিত মুখ চোখে পড়ল। তবে পুরনো মুখ তো কমেই চলেছিল এবং নতুন মুখ আসছিল, তাই পরিচিত মুখ কোথা থেকে বেশি হবে? উকিল শ্রীনর্মদাপ্রসাদের নবযুবক ক্লার্ককে দেখা গেল। এখন সে বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। কত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হয়ে গেল। ঔড়িয়ারে পৌঁছলাম। সেখানে বাবু গয়াপ্রসাদ সিংহের ভাইপোকে পেয়ে গেলাম। ছোট লাইনে তাঁর কয়েকটি রেস্তোরা চলে। তিনি উৎসাহ করে খাওয়ালেন। বেনারস পর্যন্ত তিনি সঙ্গে গেলেন। ছোট লাইনে এই পর্যন্ত আসতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। যদিও প্রয়াগ পর্যন্ত ছোটলাইনের টিকিট ছিল, কিন্তু আমি এখান থেকেই দিল্লী যাবার বড় লাইনের ট্রেন ধরলাম। প্রয়াগ গিয়েও এই ট্রেনটাই ধরতে হতো, তাই তার জন্য নেমে পড়লাম। টিকিট নিলাম। প্রথম শ্রেণীর কামরায় গিয়ে যখন বসলাম তখন সত্যিসত্যি মনে হলো যে, আমি নরকে থেকে স্বর্গে এসে পড়েছি। কম্পার্টমেন্টের চারটি সিটের মধ্যে একটা খালি ছিল।

দুটিতে ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্য তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন, আর একটিতে আমি। ছোট লাইনে না শোবার ব্যবস্থা ছিল আর না ছিল গদি, সব জায়গায় নোংরামি ও অগোছালোভাব চোখে পড়ত, সেখানে এই কমপার্টমেন্টে সমস্ত জিনিসই পরিষ্কার ছিল।

২৮ অক্টোবর আড়াইটের সময় দিল্লী পৌঁছে টাঙ্গা নিয়ে শ্রীচন্দ্রগুপ্ত বিদ্যালঙ্কারের বাড়িতে গেলাম। দম্পতি কোনো কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। সংবিধানের অনুবাদ সম্পূর্ণ করার ছিল, আর সেই সঙ্গে সংবিধানে স্বীকৃত পরিভাষা সমস্ত প্রাদেশিক ভাষা বিশেষজ্ঞদের পরিষদের সামনে রেখে চূড়ান্ত রূপ দিতে হতো। সভাপতি শ্রীঘনশ্যাম সিংহগুপ্ত আগের থেকেই উপস্থিত ছিলেন। কাজ কিভাবে চালু করা যায়, এ নিয়ে কথাবার্তা হলো। আমি বললাম—পরিষদে প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার প্রতিনিধিদের নিজেদের মতামত জানানোর সুযোগ দেওয়া হোক, তারপরে তা সমিতির রূপ নিক এবং পরিভাষা নিয়ে চিন্তা করা হোক। আটশোর বেশি পরিভাষা ছিল, এখনও জানা ছিল না যে, তর্কে কত সময় লাগবে।

২৯ তারিখ পৌনে দশটার সময় পার্লামেন্টের রাজ্যসভা ভবনে পরিষদ জড়ো হলো। রাজেন্দ্রবাবু সভাপতিত্ব করলেন। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ৩৭ জন বিদ্বান এসেছিলেন। পাঁচ ঘণ্টা ধরে ভাষণ ও মত বিনিময় হতে থাকল। তিনটি প্রস্তাব পাস হলো, তার মধ্যে —১· পরিষদ ২ নভেম্বর পর্যন্ত একটানা বসুক, প্রয়োজন হলে পরে আরো সময় বাড়িয়ে দেওয়া হোক। ২· প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিযুক্তি প্রধান দ্বারা গঠিত সমিতি করবে। এখানেই সংস্কৃততে সংবিধানের অনুবাদ কবার জন্য একটি সমিতি বানিয়ে দেওয়া হলো, যাতে আমার নামও ছিল।

এই সময় কালিম্পঙের উপার্জন 'আজ কী রাজনীতি'র প্রথম সংস্করণ রাজকমলের পক্ষ থেকে ছাপা হচ্ছিল।

পরিভাষা নিয়ে কাজ হতে লাগল। ৩০ তারিখ সারাদিনে ৪০টি শব্দ গ্রহণ করা সম্ভব হলো। গতি ধীর ছিল, এভাবে তিন সপ্তাহ লেগে যেত। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ছিল, পরের দিকে প্রতিটি শব্দ নিয়ে এত তর্কের প্রয়োজন পড়বে না। যে সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা শব্দগুলি বানিয়েছিলাম, তাতে মতভেদের সম্ভাবনা কম ছিল। পরিষদে এমন কিছু লোক রাখা হয়েছিল যাদের না ছিল সংস্কৃতের জ্ঞান আর না ছিল পরিভাষা রচনার পরম্পরার জ্ঞান। তারা এমন পরামর্শ দিত, যার সম্বন্ধে তারা নিজেরাও যুক্তি দিতে পারত না, আবার সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলেও সেগুলো বিচারযোগ্য হতো না। প্রথম এক-দুদিন তাদেরও সুযোগ দেওয়া হলো। তারপর তারা নিজেরাই দেখল যে, পরামর্শ দিয়ে তারা সদস্যদের মনোরঞ্জনের পাত্র হচ্ছে! উর্দুর বিশেষজ্ঞ প্রথম দিনের সকালের বৈঠকে এলেন, তারপরে আর এলেন না। কৈফী সাহেবকেও সদস্য করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি কখনও আসেননি। ৩১ তারিখে বৈঠকে আমরা একশো শব্দ ঠিক করলাম। সেই শব্দগুলিই নেওয়া হচ্ছিল, যেগুলি আমরা রেখেছিলাম। এক পণ্ডিত অনেক পরিশ্রম করে সংস্কৃতর স্মৃতি ইত্যাদি থেকে শব্দ বেছে এনেছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক শব্দ তার নিজস্ব বিশেষ স্থানেই অর্থদ্যোতক হয়। স্মৃতিগুলিতে গ্রন্থকারেরা একটিই বস্তুর জন্য মনগড়া শব্দও রেখেছেন,

এমন শব্দ গ্রহণ করে আমরা ভ্রম ছড়াতে পারি না। এমন ব্যাপার ছিল না যে, পরিষদে বেশি বলার জন্য আমি উৎসুক ছিলাম, কিন্তু গুপ্তজীও অনুরোধ করতেন, আর পরিভাষার বিষয়ে যে প্রশ্নই তোলা হোক না কেন, তার জবাব আমাকেই দিতে হতো। একদিন রাগ করে বলে উঠলেন, 'আপনি নিজের শব্দগুলিকেই রেখে দেন, আমাদের শব্দগুলিকে স্বীকার করেন না।' উপযুক্ত শব্দ মেনে নিতে আমরা রাজি ছিলাম না, এমন কথা নয়। কিন্তু শব্দগুলিকে মেনে নেবার জন্য এখানে সমস্ত ভাষার যোগ্য বিদ্বানরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হয়তো এমন কেউ ছিলেন না, যাঁর সংস্কৃততে ভালরকম যোগ্যতা নেই আর পরিভাষিক শব্দের মর্ম বোঝেন না। আমাদের সংস্কৃতের সেই বিদ্বান, যাঁর সম্বন্ধ মূলত একই প্রদেশে সীমিত থাকে, তিনি ভাষার নাড়ির স্পন্দন পুরোপুরি বুঝতে পারেন না। নিজের শিক্ষার বিষয়ে আমার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সংস্কৃতজ্ঞদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার সুযোগ হয়েছিল, তাই আমি জানতাম যে, সংস্কৃতেরও বহু শব্দই আসলে একই অর্থে আমাদের সমস্ত প্রদেশে ব্যবহার করা হয় না। উত্তরে উপন্যাস বলা হয় নভেলকে, আর দক্ষিণে বলা হয় ভাষণকে।

কলকাতা—৩ নভেম্বরে রাতের গাড়ি ধরে প্রয়াগের উদ্দেশে রওনা হলাম। বার্থ আগের থেকেই রিজার্ভ করা ছিল, তাই শোবার অসুবিধে হলো না। সামনের বেঞ্চে বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ বসেছিলেন। মজঃফরপুরের এই যুবকটি খাদির কাজে নিজের সমস্ত জীবন ব্যয় করেছেন। অসহযোগের আঁধির ভেতর কলেজের পরীক্ষা শেষ করে ফেলেছিলেন, কিন্তু কোনো ব্যবসা করেননি। সেই সময় তিনি দেশের কাজে লেগে পড়েছেন আর আজ পর্যন্ত তাই করছেন। দিল্লীতে কোনো বৈঠকে এসেছিলেন, এখন বিহার ফিরছিলেন। তার সব জিনিসই ছিল সাদামাটা আর খাদির তৈরি। তাঁর অর্ধনগ্ন এবং কিছুটা মলিন বস্ত্র দেখেও ইংরেজ স্ত্রীর সঙ্গে কম্পার্টমেন্টে উপবিষ্ট ভারতীয় কি করে বুঝতে পারবে যে, এই মানুষটি সম্পূর্ণভাবে শিক্ষিত ও সুসংস্কৃত এবং সেই সঙ্গে তাঁর সমস্ত জীবনটাই অটল তপস্যার জীবন। বহু বছর পরে সুযোগ হয়েছিল— অনেকক্ষণ ধরে আমাদের কথাবার্তা হলো।

৪ তারিখ সকালে কানপুর এলাম। সদ্য বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, তাই যেখানে-সেখানে অল্পস্বল্প জল চোখে পড়ছিল। যাত্রা করার সময় আমি দেখলাম, খাপরার ছাত ভরওয়াড়ী (এলাহাবাদ জেলা) থেকে শুরু হয়েছে। তার পশ্চিমে মাটির ছাত ইউরোপের সীমায় অবস্থিত উরাল পর্বতমালা পর্যন্ত চলে গেছে। যেখানে বর্ষা বেশি হয়, সেখানের পক্ষে কাঁচামাটির ছাত ভাল হতে পারে না।

প্রয়াগে পৌঁছে শ্রীমাচবেজীর বাড়ি গেলাম। তখন ওখানকারই রেডিও স্টেশনে কাজ করছিলেন তিনি। সেই বাংলোতেই অজ্ঞেয়জীও থাকতেন। সম্মেলন কার্যালয়ে গিয়ে সেখানকার কোষের বিষয়ে কিছু দেখাশোনা ও জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। এখন সারনাথে বার্ষিকোৎসবের সময় ছিল। তাই সেখানে যাওয়া স্থির করে ফেললাম। গাড়ি ধরে মাঝরাতে সারনাথ স্টেশনে পৌঁছলাম। সারনাথে এই সময় নানান জায়গা থেকে আসা

বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবার লোভ ছিল। আনন্দজীকে সেখানে পেলাম, কাশ্যপজীকেও পেলাম। সবথেকে অপূর্ব দর্শন হলো চন্দাবাবার। মুনি কান্তি সাগরের সঙ্গেও তাঁর পুরাতাত্ত্বিক স্থানগুলির গবেষণার বিষয়ে কথাবার্তা হতে থাকলো। চোতা ফূচী (ছোট ফুচী)-র সঙ্গে দেখা হলো, আর তাঁকে দেখেই আমার বুদ্ধগয়ার চোতা ফূচী আর বড়া পূচীর মজার ঝগড়ার কথা মনে পড়ে গেল। বড়া পূচী এখন আর এই সংসারে নেই। তিনি চীনা ছিলেন, আর চোতা পূচী ছিলেন মার দিক থেকে তিব্বতী ও বাবার দিক থেকে চীনা। বুদ্ধগয়ার ধর্মশালায় তাঁরা দুজনেই বহু বছর ধরে থাকতেন। তাঁদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল। বহু বছর থাকা সত্ত্বেও বড়া পূচী হিন্দি না শেখার মতনই শিখতে পেরেছিলেন। ছোটা পূচীর নিন্দা করে তিনি বলতেন—'চোতা পূচী কানা পেসী পেসী, পূজা তোরা তোরা।' অর্থাৎ ছোট পূচী বেশি বেশি খাবার খায় আর পুজো কম করে। আর নিজের সম্বন্ধে বলতেন—'বরা পূচী কানা তোরা তোরা, পূজা পেসী পেসী।'

দুপুর পর্যন্ত সারনাথে থেকে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে নিলাম, তারপর ছোট লাইনের গাড়ি ধরে সন্ধে সওয়া আটটার সময় প্রয়াগ ফিরে গেলাম। নিজের বইগুলির প্রকাশনার বিষয়ে কিছু কথা বলার ছিল। আসলে, এখন বই এত বেশি হয়ে গিয়েছিল যে, কোনো একজন প্রকাশকের পক্ষে তা প্রকাশ করাও সম্ভব ছিল না। সেখান থেকে আটটা বেজে দশ মিনিটে দিল্লী মেল ধরলাম আর কলকাতার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। ৭ তারিখ এগারোটার সময় হাওড়া এবং পৌনে এক ঘন্টা পরে মণিহর্ষজীর বাড়িতে পৌছলাম। ট্যাক্সি পাওয়া গেল না, ঘোড়াগাড়ি নিলাম। পথে বড় বাজারের রাস্তায় এমন ভিড় ছিল যে, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। সে সময় কলকাতায় এটা সাধারণ অসুবিধে ছিল। কোনো কোনো সময় একটি রাস্তার শুধু একদিক দিয়ে যাবার নিয়ম চালু করা হতো। এবার প্রয়াগে অশ্কজী তাঁর বই 'দো ধারা' দিয়ে দিয়েছিলেন। পড়ে ফেললাম। এতে অশ্কজী আর তাঁর স্ত্রী কৌশল্যার দুজনেরই লেখনীর চমৎকারিত্ব আলাদা আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল। আমার তো মনে হলো কৌশল্যা স্বামীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন। তাঁর লেখনীতে স্বাভাবিকতা ও প্রসাদগুণ বেশি ছিল। হতে পারে, ভাষা সাজাতে অশ্কজী কিছু সাহায্য করে থাকবেন, কিন্তু দুজনের লেখনীর প্রভেদ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।

কলকাতায় এখন শেঠদের ভেতরে নতুন মনোবৃত্তিও দেখা যাচ্ছিল। অনেক কোটিপতিই কংগ্রেসের আঁচল ধরেছিল। সবাই সেখানে একইরকম সম্মান পেত না, সেজন্যও তাদের অন্য দরবারের প্রয়োজন ছিল। কেউ কেউ এও ভাবতে শুরু করেছিল যে, কংগ্রেসে যে ভ্রষ্টাচার ছড়িয়েছে তার জন্য তার কাছ থেকে বেশি দিন আশা করা যায় না। সেই জন্য তারা এখন সোস্যালিস্টদের সঙ্গী হতে শুরু করল। এই সব কোটিপতি শেঠদের সোস্যালিস্টদের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক ছিল? তাদের মধ্যে এমন কোনো আদর্শবাদী ভাবনাও ছিল না যার প্রেরণায় তারা তপস্বী জয়প্রকাশ নারায়ণের পায়ের তলায় বসার জন্য উৎসুক হবে। তারা জানত যে, সমাজবাদ দিয়েই সমাজবাদের ভারতে আসা আটকানো সম্ভব। তারা ভাল করেই জানত, সমাজবাদের আসল বাহক হবে কমিউনিস্টরাই। তাই তাদের হাত থেকে বাঁচা জরুরি মনে করত।

—১৯৪৯—

পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের বহিষ্করণ খুব চটপট এবং অত্যন্ত ক্রুরতার সঙ্গে হয়েছিল। তাদের পুনর্বাসনের কাজ যদিও এখনও সম্পূর্ণ হতে পারেনি তবে তারা অনেকটাই নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে সমস্যাকে কঠিন হতে দেয়নি। তাদের আর একটা সুবিধে হয়েছিল যে, পূর্ব-পাঞ্জাবের মুসলমানরা ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছিল, যাদের বাড়িঘর, খেত নবাগত শরণার্থীদের দিয়ে দেওয়া গিয়েছিল। পূর্ব-পাকিস্তানে এমন হয়নি। এক তো পশ্চিম বাংলা থেকে খুব কম মুসলমানই পাকিস্তানে গেছে, যে কারণে খেত আর বাড়িঘর খালি পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়ত, পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের বহিষ্করণ তাড়াতাড়ি হয়নি, সেই ক্রম এখনও চলছে। মনে হয়, সেখানে খুব কম হিন্দুই থাকতে পারবে। এদের পুনর্বাসনের সমস্যা এখনও (১৯৫৬ সালে) একইরকমভাবে বড়ই চিন্তাজনক। ১৯৪৯ সালে কলকাতায় আর একটি দৃশ্য দেখা দিল। শরণার্থীদের সরকার নিজের ঢঙে পুনর্বাসন দিতে চাইত, কিন্তু এটা ভেবে দেখত না যে, জঙ্গল-মহল নিয়ে শরণার্থীরা কি করবে? তাদের এমন জায়গা দরকার যেখানে তারা হাত-পা নেড়ে অথবা বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু রোজগার করতে পারে। এই সম্ভাবনা শহরের কাছাকাছিই থাকে, তাই যদি বহুসংখ্যক শরণার্থী কলকাতার আশেপাশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাইত, তবে সেটা স্বাভাবিকই ছিল। কলকাতার আশেপাশে যত জায়গা ছিল, দ্রুত ক্রমবর্ধমান মহানগরী খুব শিগ্‌গিরই সেখানে পৌঁছে যেত। এই সব জমি শেঠরা কিনে নিয়েছিল। মারোয়াড়ী শেঠদের কাছেই টাকা ছিল, তাই এই সব জমিও ছিল তাদের হাতে। টালীগঞ্জের রিজেন্ট পার্কের কাছে একটা খালি জায়গা দেখতে গেলাম, যেখানে পূর্ববাংলা থেকে আসা শরণার্থীরা তাদের আড্ডা গেড়ে নিয়েছিল। জমিটা কোনো শেঠ কিনে রেখেছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি আমাদের সরকারের কাছে পরম পবিত্র বস্তু, তাই অনুকূল স্থানে শরণার্থীদের বসবাস করতে দেওয়ার থেকেও বেশি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও তার ওপর আইনানুগ অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বার্থরক্ষাই তার কাছে অধিক জরুরি ছিল। শরণার্থী খোলা জায়গা দেখে সেখানে তাদের ঝুপড়ি বানিয়ে নিয়েছিল। শ্রীশরৎ বোসের মত গণনেতারাও তাদের সমর্থন করে ছিলেন। শেঠদের এতো ক্ষমতা ছিল না যে তারা শরণার্থী এবং তাদের পিছনে বিশাল জনতার মোকাবিলা করে নিজেদের জমিকে দখল করে। সরকার ঝট্ করে সেখানে পল্টন পাঠিয়ে দিল, যাতে সেখানে ঘর না তোলা হয়। শরণার্থীরা দরমার দেয়াল দাঁড় করিয়ে তার ওপর খড়ের ছাত করেছিল। সৈন্যরা বলছিল, 'আমাদের হুকুম আছে, যেন নতুন ঝুপড়ি বানাতে না দেওয়া হয়।' শরণার্থীরা তাদের জমির জন্য ভাড়া দিতে, কিস্তিতে দামও চুকিতে দিতে রাজি ছিল। এর থেকে বেশি আর কি উচিত হতে পারত? কিন্তু সরকার গোপন স্বার্থের এতটুকু ক্ষতি হতে দিতে চাইত না। তার সমর্থকরা বলে বেড়াত, 'শরত বোস তার নেতৃত্ব কায়েকম রাখার জন্য প্রাদেশিকতার লড়াইকে উত্তেজিত করতে চান।' দুর্ভাগ্যক্রমে কলকাতার ধনকুবেররা অবাঙালী, কিন্তু প্রাদেশিকতার ভয়ে কি বাঙালী তার উচিত দাবি ছেড়ে দেবে?

কালিম্পং—১০ নভেম্বর আটটার সময় বিমানে উড়ে দু ঘণ্টায় আমি বাগডোগরায় পৌঁছে

গেলাম। আকাশ পরিষ্কার ছিল, ঠাণ্ডাবোধ হচ্ছিল না, যদিও এটা নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ ছিল। বিমানবন্দর থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছে ১৬ টাকা দিয়ে ট্যাক্সিতে জায়গা পাওয়া গেল। আড়াইটের সময় 'পার্বতী' পৌঁছলাম। ভট্ট, সেনগুপ্ত আর কমলা সকলেই ভালভাবে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমাদের পরিভাষার কাজ চলতে লাগল। এই সময়েই ড· রোয়েরিকের সঙ্গে 'প্রমাণবার্তিক'-এর ইংরেজি অনুবাদের কাজও শুরু হলো। এবার কলকাতায় শ্রীপরমানন্দ পোদ্দারের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল। তিনি ২৫ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে আমার অনেকগুলি বই ছাপার কথা ঠিক করলেন। কালিম্পং থাকতেই তার লেখাপড়াও হয়ে গেল।

দার্জিলিং—কালিম্পঙে থাকার সময় শেষ হয়ে আসছিল। দার্জিলিংও দেখে আসা স্থির করে ১৯ নভেম্বর সকালে আটটার পরে আমরা মণিহর্ষজীর বেবি অস্টিনে রওনা হলাম। আমি ড্রাইভারের সঙ্গে বসেছিলাম আর পিছনের সিটে সেনগুপ্ত, কমলা আর কমলার খুড়তুতো বোন তথা বাবু রাধামোহনের স্ত্রী যুমনাদেবী বসেছিলেন। পথ তিস্তা উপত্যকা থেকে চড়াইতে উঠে যায়, যার রাস্তা তত ভাল নয় আর ভারি গাড়ির পক্ষে সুবিধেজনক বলে মনে করা হয় না। তিস্তা পুল থেকে দার্জিলিং ২৮ মাইল দূরে আর পুল কালিম্পং থেকে ১০ মাইল দূরে। ৩৮ মাইলের যাত্রা আমরা দেড় ঘণ্টায় পুরো করলাম। উপত্যকা ছাড়ার পর কঠিন চড়াই চড়ে আমরা পেশোক চা বাগানের কাছে পৌঁছলাম। এরপরে অনেক দূর পর্যন্ত বেশ কিছুটা চড়াই ছিল, চড়াই তো ঘুম পর্যন্তই ছিল বলা উচিত। পথে লেপচু, ছমীল, জোড়বাংলা, ধূয়, কাকঝোড়া পড়ল। শিলিগুড়ি দার্জিলিং যাওয়ার পথ ঘুম-এ এসে মিশেছে। সমস্ত পথটা চা-বাগান অথবা সবুজ জঙ্গলে ভরা। মনোহারী শ্যামলিমা। বাইরের লক্ষ্মী আবাহনের জন্য চা-বাগান সব থেকে বড় উপায়। যদিও মাত্র একশো বছর আগে চা এই ভূখণ্ডে এসেছিল, কিন্তু আজ দার্জিলিংঙের চাকে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। চার-পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতার ঠাণ্ডা জায়গার পাতায় বিশেষ গুণ আছে। যদিও শিলিগুড়িতে এখান থেকে দ্বিগুণেরও বেশি পরিমাণ চা জন্মায়, তবু দাম বেশি বলে এখানকার বাগানগুলো লাভ বেশি করে। আগে বলেছি, দার্জিলিং এখন নেপালীভাষীদের জায়গা। তবে তারা শুধু বাগানের কুলিই হতে পারে। প্রথমে সমস্ত বাগানই ইংরেজদের হাতে ছিল, এখন তার মধ্যে অনেকগুলোই আমাদের শেঠদের হাতে চলে এসেছে, যেগুলো অবশিষ্ট আছে সেগুলোও পাকা আমের মত তাদের কোলে পড়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে।

রাস্তায় জায়গায় জায়গায় দোকান আর ছোট ছোট বাজার ছিল। চা আর সিগারেট তো প্রায় দু-মাইল পরে পরে বিক্রি হচ্ছিল। বিড়ি-সিগারেট আজকাল অন্যান্য জায়গাতেও খুবই খাওয়া হয়, এই পাহাড়ে তো মেয়েদেরও তা না খেলে হয় না। ঘুম-এর পরে প্রায় বস্তির পর বস্তিই চলছিল। দূর থেকেই আমরা পর্বতপৃষ্ঠে অবস্থিত দার্জিলিং নগরকে দেখছিলম। নীল গম্বুজওলা রাজ্যপাল-ভবন আর বর্ধমান রাজবাড়ি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে থাকতে পারে না। এখন নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ চলছিল। এটা ভ্রমণবিলাসীদের

আসার সময় ছিল না, তবুও দার্জিলিং তো শুধু ভ্রমণবিলাসীদের নগর নয়, বরং সেখানে স্থায়ী বাসিন্দাও অনেক আছে, জেলার বাণিজ্যকেন্দ্র তা। তাই শীতের সময় তা অত খালি হয়ে যায় না, যেমন নৈনীতাল অথবা মুসৌরীতে হয়। সেন্ট্রাল হোটেলে আমরা উঠলাম। ঘরভাড়া প্রতিদিন দশ টাকা। খাবার এখানকার ভাল ছিল না, কিন্তু সে সময় কোনো একটির বিষয়ে এমন অভিযোগ করা উচিত হতো না।

সেদিনই আমরা মহাকাল দেখতে গেলাম। বৌদ্ধরা তাদের বিহার অথবা মন্দিরের স্থান নির্বাচনে সমস্ত দেশ এবং কালে পরাকাষ্ঠা দেখায়। এখানে সব থেকে উঁচু জায়গায় তারা তাদের মন্দির স্থাপন করেছিল, যেখানে বুদ্ধের মূর্তি হয়তো ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ধর্মপালক মহাকালও ছিল। হিন্দুদের কাছেও এই নাম পরিচিত, তাই হিন্দু আর বৌদ্ধ মহাকালে এক হয়ে গেছে। যখন ইংরেজ এখানে পৌছল, তখন তাদের এটা দেখে খারাপ লাগল যে, সব থেকে উঁচু জায়গায় কাফেরদের মন্দির রয়েছে এবং তাদের গীর্জার মাথা তার সামনে হেঁট হয়ে আছে। তারা মহাকালকে সেখান থেকে সরিয়ে দিল আর পাশে নিজেদের গীর্জা দাঁড় করিয়ে দিল।

দার্জিলিংঙে হিন্দিভাষীও অনেক আছে। শেঠ আর ছোট দোকানদাররা তো মারোয়াড়ী। তাদের থেকেও বেশি সংখ্যা বিহার ও উত্তরপ্রদেশের ভোজপুরীদের, যারা বেশির ভাগ ছোটখাটো দোকান চালায়। পণ্ডিত লালজী সহায় স্থানীয় হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। শ্রী জংবাহাদুর প্রধানও হিন্দির উৎসাহী কর্মী ছিলেন। এঁদের চেষ্টায় কয়েক বছর আগে এখানে হিমাচল হিন্দিভবন স্থাপিত হয়েছে। ছোটাছুটি করার পর ভাল জমিও পাওয়া গেল, আর তার ওপর কাঠের বাড়ি খাড়া করে দেওয়া হলো। সেখানে এখন মিড্ল স্কুল চলছিল। বাড়ি আরো বাড়ানোর জন্য ৩০ হাজার টাকাও জমা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্রয়োজন ছিল ৫০ হাজারের। দার্জিলিঙে হিন্দি ভাষাভাষীদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্র এই হিন্দিভবন।

২০ নভেম্বরও দার্জিলিঙেই কাটানোর ছিল। জলখাবার খেয়ে আটটার সময় বেরোলাম। খাবার জন্য দুটোর সময়েই ফিরে এলাম। এখানকার তরুপ্রদর্শ বাটিকা দর্শনীয় জিনিস, পরিভাষার কারণেও তা আমার কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। এই বাটিকায় ঠাণ্ডা দেশের নানারকমের গাছ লাগানো হয়েছে। গাছগুলির গায়ে ইংরেজিতে তাদের নামও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভারতীয় নাম সম্ভবত কোনটারই পাওয়া যায় না। যদিও বাটিকার কর্মচারীরা, বিশেষ করে মালী প্রায় সব গাছেরই দেশী নাম জানে। খুব সহজেই সে এই নামগুলো দিতে পারে, কিন্তু তার কাছে দু-চারদিন থাকার জন্য কারো আসার দরকার ছিল। সেখানকার আধিকারিকের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা বললাম। তিনি সাহায্য করতে রাজি ছিলেন।

শহরের হিন্দু মন্দিরে গেলাম। আমাদের জীবন-যাপন যেমন নোংরা দেবতাদেরও তেমনি নোংরামির মধ্যে রাখলে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু হিমালয়ের তামাংরাও খুব পরিচ্ছন্নতা-প্রিয় নয়, তাদের বিহার কি করে এত পরিষ্কার? জামা মসজিদও এখানকার একটি বিশেষ ধর্মীয় ইমারত। সেখানেও হিন্দু মন্দিরের থেকে বেশি পরিচ্ছন্নতা দেখলাম।

মসজিদের সঙ্গে ধর্মশালা আছে। ব্যবস্থাপক দেখা গেল আমাদের ছাপরার মৌলভী সাহেব। তিনি খুব আদর করে আমাদের সবকিছু দেখালেন, আর জানালেন যে, তাঁদের ধর্মশালায় হিন্দু-মুসলমান যে কেউ এসে থাকতে পারে। দার্জিলিংঙে কার্টহিলও একটি দর্শনীয় স্থান। এখান থেকে কালিম্পং দেখা যায়। ভূর্জবৃক্ষকে বার্চ বলা হয়, আর তা এই জায়গা থেকে আরো সাত হাজার ফুট উঁচু জায়গায় হয়, যেখানে বছরে ন মাস মাটি বরফে ঢাকা থাকে। এখানে বার্চের কোনো গাছ ছিল না, তবু এর নাম ভূর্জপর্বত কেন রাখা হলো? জঙ্গলে ঢাকা এই পাহাড় পিকনিক আর মনোরঞ্জনের জন্য ভাল।

দার্জিলিঙে এসে আমাদের পথ-প্রদর্শকদের মধ্যে একজন, কুরোসী জোমা সন্দোর (আলেকজাণ্ডার জোমা দে কোরো)-এর সমাধি না দেখে যাত্রা কি করে সম্পূর্ণ হতো? আমরা নেমে ইউরোপীয় কবরখানায় গেলাম। অনেক কবরের ভেতর সেখানে ইঁট-চুনের আটকোণা থামের সঙ্গে জোমার সমাধি দেখলাম। জোমা ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে হাঙ্গেরিতে জন্মেছিলেন। তিনি জানতেন যে আমাদের মগয়ারদের পূর্বপুরুষরা এশিয়া থেকে এসেছিল। তাঁর মনে হলো, নিজের পূর্বপুরুষের দেশ আর স্বজাতিদের দেখা যাক। ভীষণ কষ্ট সহ্য করে করে এই অদম্য ভবঘুরে ভারতে পৌঁছোন, তারপর লোকমুখে শুনে শুনে তিব্বতকে নিজের লোকেদের মূল জায়গা মনে করে লাদাখ পৌঁছোন। মগয়াররা ছিল হুণদের সন্তান, আর যাদের মূলস্থান ছিল মঙ্গোলিয়া—জোমার যাওয়া উচিত ছিল সেখানে। কিন্তু তিনি কলম্বাসের মত খুঁজে খুঁজে ভারতে চলে এলেন—কলম্বাস ভারত খুঁজতে খুঁজতে আমেরিকা চলে গিয়েছিলেন। এর আগেই রুশরা তিব্বতী ভাষা আব সেখানকার বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে গিয়েছিল, কারণ তাদের সম্পর্ক অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতেই মঙ্গোলদের সঙ্গে স্থাপিত হয়েছিল, যাদের ধর্ম ছিল বৌদ্ধ আর ধর্মভাষা ছিল তিব্বতী। রুশ বিদ্বানরা ভাষা ও ধর্মের বিষয়ে অনেক লিখেও ছিলেন, তাই জোমাকে প্রথম তিব্বতী ভাষাবিদ বলা চলে না। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, পশ্চিম-ইউরোপের বিদ্বানদের জন্য তিব্বতের দরজা তিনিই খুলেছিলেন। তিনি লাদাখ আব জাস্করে এমন লোকেদের মধ্যে ছিলেন, যারা তিব্বতি ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানত না। ভাষা শেখার ভাল সুযোগ আর কি হতে পারত? তিনি তিব্বতী ভাষা পড়েন। ইংরেজিতে তার প্রথম ব্যাকরণ ও প্রথম শব্দকোষ রচনা করেন। সাড়ে পাঁচ হাজার ভারতীয় পুস্তক তিব্বতী ভাষায় অনুদিত হয়ে কঞ্জুর-তঞ্জুরের ৩৩৮টি খণ্ডে সুরক্ষিত আছে, তাদের জোমা ইংরেজিতে বিশ্লেষণ করেছেন, আর তিব্বতের বিষয়ে অনেক লিখেছেন। বিদ্যার জন্য তিনি ফকির হয়েছিলেন। ইংরেজরা তাঁর যোগ্যতার কদর করতে শুরু করেছিল। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁর থাকার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সেইভাবেই এবং একইরকম সাদামাটা পোশাকে সেখানে থাকতেন, যেমনভাবে তিনি তাঁর হিমালয় প্রবাসে থাকতেন। একদিকে তিনি তিব্বতী ভাষার প্রকাণ্ড বিদ্বান ছিলেন, আবার অন্যদিকে তাঁর অনাড়ম্বর জীবন ছিল এক মধুর কাব্য। কলকাতা থেকে দার্জিলিঙে তিনি এই জন্য এসেছিলেন যে, তিব্বতের দিকে প্রস্থান করবেন। এই সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, আর নিজের শেষ ইচ্ছে অসম্পূর্ণ রেখে ১৮৪২-এর ১১ এপ্রিল

এখানে—দার্জিলিঙেই দেহত্যাগ করেন। আজ তিনি এই সমাধিতে ১০৭ বছর ধরে শুয়ে আছেন। সমাধির ওপরে ইঁট-চুনের থাম পরে তৈরি করা হয়েছে। এর ওপর হাঙ্গেরিয়ান মগয়ার ভাষার দুটি ও ইংরেজিতে একটি অভিলেখ আছে, যাতে জানানো হয়েছে যে, এখানে জোমার কবর আছে।

ধীরধাম দেখতে গেলাম। এটি নেপালীদের মন্দির, পরিষ্কার আর খুবই অনুকূল জায়গায় অবস্থিত। দার্জিলিং ইংরেজদের কেন্দ্র ছিল। চা বাগানের মালিকরা তো বারোমাস এখানেই থাকত। গরমে এবং বর্ষায় বহুসংখ্যক ইংরেজ ব্যবসায়ী ও অফিসার তাদের পরিবারসহ এখানে আসত। পুরুষরা নিজেদের কাজে ফিরে গেলেও বৌ-বাচ্চাদের এখানে রেখে যেত। যখন ইংল্যান্ড যাওয়া কয়েক মাসের কাজ ছিল, যাত্রাও নিরাপদ ছিল না, সেই সময় নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য হিমালয়ের শহরগুলির গুরুত্ব ইংরেজরা বুঝতে পারল, আর তারা এখানে অনেক কনভেন্ট আর স্কুল স্থাপন করল। এখানে তাদের সন্তানরা ইংরেজি পরিবেশে এবং সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুসারে শিক্ষালাভ করত। ইংরেজরা যাবার পর যদিও তার মধ্যে কিছু স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু বাকিগুলো এখনও যথেষ্ট উন্নতি করছে। যতদিন পর্যন্ত অভিভাবকদের এই বিশ্বাস থাকবে যে, ইংরেজির সাহায্যেই বড় বড় চাকরির দরজা খোলে, ততদিন এই স্কুলগুলির ক্ষতি হতে পারে না।

আমার পুরনো পরিচিত সচ্চিদানন্দজীকে পেয়ে গেলাম। নিজের মনে দিন কাটাচ্ছিলেন। কৃষক-মজুরদের জন্য কাজ করতেন।

ডা· এস· কে· মজুমদার আর তাঁর জার্মান স্ত্রী বড়ই সহৃদয় বিদ্বান দম্পতী। গোর্খা-হলে আমাকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হলো, যার প্রধান ছিলেন ডা· মজুমদার। এখানে শ্রীসূর্যবিক্রম জ্ঞবালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, যদিও চিঠিতে তাঁর সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল। তিনি নেপালী ইতিহাস ও ভাষার একজন বড় পণ্ডিত এবং তার ওপর তিনি অনেকগুলি বই লিখেছেন।

কালিম্পং—২১ তারিখ সকালে পৌনে নটার সময় দার্জিলিং ছেড়ে দুঘণ্টায় কালিম্পং পৌঁছে গেলাম। যাবার সময় কমলার বমি হয়েছিল। পাহাড়ী পথে মোটর যাত্রায় সে খুব অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু আজ সাহস করল তাই বমি করার উপক্রম হলো না। সেদিনের চড়াই এখন খাড়া উতরাই ছিল, যেখানে গাড়ি খুব সাবধানে চালাতে হতো।

ফিরে এসে অনেকগুলো চিঠি পেলাম। ডা· ব্রজকিশোর মালব্য জৈব-রসায়নের পরিভাষাগুলির প্রতিশব্দের সঙ্গে তাঁর অভিভাব দিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বিশেষজ্ঞদের দেওয়া প্রতিশব্দের অনেক দাম আছে, তা আমরা জানি, কিন্তু সেইসঙ্গেই একই ধরনের পারিভাষিক শব্দ বিজ্ঞানের অনেক শাখায় পাওয়া যায়। ইংরেজিতে যেভাবে তাদের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখা হয়, আমাদেরও তেমনই করতে হবে, তাই আমি পরে মালব্যজীকে বুঝিয়ে লিখি আর তিনি আমার কথা মানতে রাজি হন। মালব্যজী হিন্দির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, আর তার জন্য কাজ করতেও প্রস্তুত। চিকিৎসাবিজ্ঞানের

অন্যান্য শাখাতেও তিনি কাজ করতে সক্ষম। শ্রীগোবিন্দ মালব্য সেইসময় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনি আমাকে প্রাচ্য-বিদ্যার একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে লিখেছিলেন, আমি পরিকল্পনা তৈরি করে পাঠিয়েও দিই। আমার ইচ্ছে ছিল, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও বৌদ্ধ সাহিত্য' ও তার ভাষাগুলির অধ্যয়ন-অধ্যাপন আর গবেষণার ব্যবস্থা হোক। তাঁকে আমি এই বিষয়ে জানিয়েছিলাম এবং মালব্যজী ইচ্ছাপ্রকাশ করায় তিব্বত থেকে কন্‌-জুর আর তন্‌-জুরের পুস্তক আনিয়ে দিই।

দিল্লী—২৩ নভেম্বর সংবিধানের অনুবাদ-কার্যের জন্য দিল্লী প্রস্থান করতে হলো। সাড়ে এগারোটার সময় শিলিগুড়িতে বিমান কোম্পানির কার্যালয়ে পৌছে আড়াইটে পর্যন্ত সেখানেই বসে থাকতে হলো। তারপর বাগডোগরা গিয়ে চারটের সময় বিমানের মাটি ছাড়ার সময় হলো। আজ পুরো বিমান ভর্তি ছিল—১৬ জন যাত্রী ছিল। কিছু লোক ঠাণ্ডার জন্য বাড়ির দিকে ফিরছিল। অন্ধকার হবার আগেই কলকাতা পৌছনো জরুরি ছিল। বিমানবন্দর থেকে পৌনে সাতটার সময় আমি মণিহর্ষজীর বাড়িতে পৌছলাম। ২৪ তারিখ সকালে দমদম বিমানবন্দরে পৌছে আই· এন· এ-র ভাইকিং বিমানের যাত্রী হলাম। ছয় হাজার ফুট উচ্চতায় সে উড়ে চলল, আর সাড়ে তিন ঘণ্টায় দিল্লী পৌছে গেল। আকাশ-পথে মেঘ দু-একটাই চোখে পড়ল। হ্যাঁ, কুয়াশা ছিল বেশি। সহযাত্রী অধিকাংশ বিদেশী ছিল। সন্ধে সাড়ে ছটার সময় ওয়েলিংটন বিমানবন্দর থেকে বিমান-কার্যালয়ে পৌছে চন্দ্রগুপ্তজীর বাড়ি চলে গেলাম।

২৫ তারিখ তিনটের সময় ভাষা-বিশেষজ্ঞদের পরিষদ আরম্ভ হলো। এবার আসাম আর কাশ্মীরের প্রতিনিধিরাও এসেছিলেন। পরিভাষাগুলি স্থির করার জন্য কাজ হতে থাকল। খবর পেলাম, এবছর চন্দ্রবলি পাণ্ডে সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। চন্দ্রবলি পাণ্ডে হিন্দির পূজারী। তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা হিন্দিকে উৎসর্গ করেছেন, সমস্ত সময় তাকেই সমৃদ্ধ করার কাজে লাগিয়েছেন। এইরকম তপস্বী পণ্ডিত হিন্দিতে আর দ্বিতীয় নেই। তাঁর সভাপতি নির্বাচিত হওয়াটা আমার কাছে বড়ই আনন্দের ব্যাপার ছিল। এটা ভেবে আরোই আনন্দ হতো যে, তিনি শুধু আমার জেলা (আজমগড়)-রই নন, আমার পিতৃগ্রাম থেকে চার-পাঁচ ক্রোশ দূরে ছটিয়াব-এ জন্মগ্রহণ করেছেন। পরিষদের বৈঠক রবিবার (২৭ তারিখ) হলো না, কিন্তু আমাদের অনুবাদ-সমিতির লোকদের সেদিনও কাজ করতে হলো। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত, হিন্দি অনুবাদ আর পরিভাষার, কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। শেষ দিন পরিষদে এই প্রস্তাব স্বীকৃত হলো যে, ভারতের সমস্ত ভাষার পরিভাষাবলী এক রাখা হোক, অন্য শব্দ অধিক অনুকূল মনে হলে, সেখানেও বন্ধনীর মধ্যে সার্বত্রিক পরিভাষাগুলিকে রাখা হোক। পরিষদে শ্রীবালসুব্রহ্মণ্য আয়ার, লক্ষ্মীনারায়ণ রাও-এর মত বিদ্বানদের পরামর্শ ভাল হতো, সেগুলো মেনেও নেওয়া হতো, তাই অনুবাদ-সমিতির যে নিজের পরিভাষার ব্যাপারে আগ্রহ ছিল এমন অভিযোগ করা সম্ভব নয়। যদি অনুবাদ-সমিতির প্রায় সব শব্দই মেনে নেওয়া হয়ে থাকে, তবে তার কারণ তাদের আগ্রহ নয় বরং সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার

বিশেষজ্ঞরা তাদেরই ঠিক মনে করেছিলেন তাই। শ্রীকিকুমাই দেশাই (গুজরাটী), শ্রীজনুনন্দন ভরদ্বাজ (গোয়ালিয়র) আর শ্রীরামচন্দ্র বর্মা (বেনারস)-র পরামর্শ যদি লোকের পছন্দ না হয়ে থাকে তবে তার কারণ হলো এই যে, তাঁরা এই কথাটা মনে রাখতেন না যে, আমাদের ভাষা-ভাণ্ডারের বহু সম্পদ সমস্ত প্রাদেশিক ভাষ্যর সম্মিলিত সম্পত্তি, তাই শুধু হিন্দি বা গুজরাটীর দৃষ্টিতে আমরা পরিভাষা রচনা করতে পারি না। শ্রীতীর্থনাথ শর্মা (আসাম), সুনীতিবাবু (বাঙলা), মুনি দিগ্বিজয়জী (গুজরাটী), শ্রীঘনশ্যাম গুপ্ত (হিন্দি), শ্রীটি· এন· শ্রীকণ্ঠৈয়া (কর্ণাটক), শ্রীজিয়ালাল কৌল (কাশ্মীরী), শ্রীকুন্হন রাজা (মালয়ালম), শ্রীচেতু পিল্লাই (তামিল), শ্রীসত্যনারায়ণ (তেলুগু), শ্রীওয়াই· আর· দাতে (মারাঠী), শ্রীআর্তবল্লভ মহান্তি (উড়িয়া), জ্ঞানী গুরুমুখসিংহ মুসাফির (পাঞ্জাবী), কাজী অব্দুলগফার (উর্দু) পরিষদের সদস্য ছিলেন। বালসুব্রহ্মণ্য আয়ার (সংস্কৃত) পরিষদের সিদ্ধান্তের বিষয়ে ভাল সাহায্য করেছেন।

সংবিধানের সংস্কৃত অনুবাদ-সমিতিও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ১ ডিসেম্বর দুটোর থেকে তার বৈঠক হলো। সংবিধানের সামান্য কিছু অনুবাদ শ্রীকুন্হন রাজা, শ্রীবালসুব্রহ্মণ্য আয়ার, ড· মঙ্গলদেব এবং ড· রঘুবীরও করে এনেছিলেন। কিন্তু এই বৈঠকটা শুধু সবাই একসঙ্গে বসার জন্যই হয়েছিল। সমিতির প্রধান ড· কানে এখানে আসতে পারেনি, তাই কাজ ভবিষ্যতের জন্য ছেড়ে দিয়ে বৈঠক ভেঙে গেল। সংস্কৃত সমিতির সব সদস্যরাই আমার পরিচিত ছিলেন। শুধু ডা· কানের দর্শন হলো না।

সেইদিনই শ্রীপণ্ডিত সত্যদেবজী (রামপুর)-র সঙ্গে দেখা হলো। তিনি জানালেন, এক বছরেরও বেশি হয়ে গেছে কিন্তু হিমাচল প্রদেশে জনতার কল্যাণে কোনো কাজ হচ্ছে না। যা কিছু আয় হয় তা আমলাতন্ত্রের খরচে চলে যায়। সত্যিসত্যিই আমাদের শাসন-ব্যবস্থা প্রজাদের কল্যাণের জন্য নয়, বরং শাসকদের কল্যাণের জন্য। এ খুবই দুঃখের কথা।

৩ ডিসেম্বর মনোনীত রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রবাবুর জন্মদিন ছিল। ভারতীয় পঞ্জিকা অনুসারে পৌষের কৃষ্ণপক্ষ ১ তারিখ হয়। সেইদিন অনুবাদ-সমিতির লোকেরাও তাঁর বাড়ি গিয়েছিল। হোম-পূজার আগুন আর সামগ্রী সামনে ছড়ানো ছিল, রাজেন্দ্রবাবু নেপালী ফতুয়া পরে আসনে বসেছিলেন। সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছিল। আমারও বলার দরকার পড়ল। আমি বললাম, 'গণতন্ত্র ঘোষণার সময় এও ঘোষণা করা হোক যে, আজ থেকে রাস্তার ডানদিক দিয়ে চলতে হবে। ইংরেজদের দেশ আর তাদের শাসিত দেশগুলি ছাড়া দুনিয়ার সব জায়গায় 'দক্ষিণ চলো' নিয়ম। ইউরোপ আমেরিকাই শুধু নয়, এশিয়াতেও এই একই ব্যাপার। তবে আমরাই কেন ইংরেজরা চলে যাবার পরেও দুনিয়ার থেকে আলাদা তাদের নিয়ম চালু রাখব?' রাজেন্দ্রবাবু বললেন, 'জওহরলালকে বলে দেখি।' সত্যিসত্যিই কি ইংরেজদের সমস্ত রকম বোকামি আর জিদগুলি কায়েম রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন নেহরুজী? এ তো জানাই ছিল যে, রাষ্ট্রপতি পদের জন্য রাজগোপালাচারীও লালায়িত ছিলেন। আর তাঁর সমর্থকদের মধ্যে সম্ভবত নেহরুজীও ছিলেন, কিন্তু প্যাটেল রাজেন্দ্রবাবুর পক্ষে ছিলেন। তিনি জনসাধারণের লোক ছিলেন। আমি তো মনে করতাম যে, রাষ্ট্রপতি হবার পরেও রাজেন্দ্রবাবু সেইরকমই জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা

করবেন, অন্তত তাঁর মনোভাব তেমনি আছেও। কিন্তু নেহরু আর অন্যান্য প্রদর্শনকারীরা তাঁর মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে যে রাষ্ট্রপতি পদের মর্যাদা রক্ষাব জন্য জাঁকজমক করে থাকাটা জরুরি। ধুতি, কুর্তা পরে নয়, আচকান আর চুড়িদার পায়জামা পরে থাকলে এই পদের গৌরব রক্ষা হয়। যদিও রাজেন্দ্রবাবু ধুতি কুর্তা ত্যাগ করেননি, তবু বিশেষ বিশেষ সময়ে নেহরুতন্ত্রী জাতীয় পোশাক ধারণ করাটা অবশ্য স্বীকার করেছেন। আমি সেদিন বলেছিলাম, 'আচকান আর পায়জামা নয়, বরং ধুতির সঙ্গে ফতুয়াটাই বেশি জাতীয় পোশাক। ভাগলপুর জেলে কোনো নেপালী দর্জি তার জন্য উলের ফতুয়া বানিয়ে দিয়েছিল, যেটা তিনি তখন পরেছিলেন। বলতে লাগলেন, 'দেখুন, আমি এটা পরে আছি।' ফতুয়া একসময় প্রায় সমস্ত ভারতেরই জাতীয় পোশাক ছিল। আজও তা মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, হরিয়ানা, পার্বত্য প্রদেশ, নেপাল পর্যন্ত পরা হয়ে থাকে। আগে আসাম, বাংলা, উড়িষ্যা অন্ধ্রতেও পরা হতো। যদি নিজেদেব একটি বিশেষ পোশাক বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য প্রয়োজন হয়, তবে ফতুয়া, ধুতি অথবা ফতুয়া আর সাধারণ পায়জামা পরা উচিত। নেহরুতন্ত্রী পোশাক তো রোগা-পাতলা মানুষকে কার্টুন বানিয়ে ছাড়ে এবং অনেকে বলতে শুরু করে—'এখন শুধু একটা সারেঙ্গী হলেই হয়।'

অনুবাদ শেববারের মত দেখে নেওয়া হচ্ছিল। তাতে কত সময় লাগছিল তা এর থেকে বোঝা যাবে যে, ৫ ডিসেম্বর আটটার সময় আমরা সেখানে গেলাম আর সন্ধে সাতটায় ছুটি পেলাম। অনুবাদের কাজে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম শ্রীঘনশ্যাম সিংহ গুপ্ত আর বালকৃষ্ণজীকে করতে হলো। যুবক বালকৃষ্ণজী দেখা গেল তার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত মানুষ। তাঁর স্মৃতি খুব তীব্র ছিল। ইংরেজি আব তার ভারতীয় প্রতিশব্দের সূক্ষ্ম ভেদ যাচাই করার ক্ষমতা তাঁর ছিল আর পরিশ্রম করাতে তো তিনি ক্লান্ত হতেন না।

৭ ডিসেম্বর সকালে দিল্লী থেকে কলকাতার গাড়ি ধরলাম। রেস্তোরাঁ-গাড়ির খাবার একদম বাজে ছিল। এখন পুরনো দিনের ফেরার কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছিল না। রাতের খাবারের জন্য সাড়ে তিন টাকা দিতে হলো, তবে তা সকালের আড়াই টাকার খাবারের মত খারাপ ছিল না। দিল্লী মেল গয়া ছাড়িযে গিয়ে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। আমি তো স্বপ্ন দেখলাম—ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে, আর দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনকে রশি বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রশি টানার লোকেদের সামনে সামনে আমি আছি। চড়াই আর সমতলভূমিতে সেইভাবেই টানতে থাকলাম কিন্তু উতরাই এলে থেমে গেলাম। সঙ্গীদের বলতে লাগলাম যে, ট্রেন পিছন থেকে আটকাও, বিনা লাইনেই ট্রেন চলছে। কিছু বুদ্ধিমান লোক বলছিল, 'পৃথিবীর লাইন স্বভাবত বেশি কঠিন হয়, তাই এমন চলায় কোনো আপত্তি নেই।' স্বপ্নও জাগ্‌তিরই বেশিরভাগ প্রতিনিধিত্ব করে। ট্রেনের গতিতে বিরক্ত মন এই দৃশ্য তার সামনে রেখেছিল।

৮ ডিসেম্বর সকালে ট্রেন গোমো স্টেশনে একঘণ্টা লেটে পৌছল। সামনে আসানসোল পর্যন্ত পাথুরে জমি। বলা নিষ্প্রয়জন যে, মোগলসরাই থেকে আমাদের ট্রেন গয়া, হাজারীবাগের রাস্তা ধরল। এটা সেই রাস্তা যার ওপর আমাদের কয়লা আর ধাতুর খনিগুলো পড়ে, আর ভবিষ্যতে এর গুরুত্ব পাটনা অথবা ভাগলপুর দিয়ে যাওয়া

লাইনগুলোর থেকে বেশি হবে।ইঞ্জিন চেষ্টা করল তবুও আমরা ৪৫ মিনিট লেটে হাওড়া পৌঁছলাম মণিবাবুর কার হাজির ছিল, সোজা তাঁর বাড়ি পৌঁছলাম। শ্রীপোদ্দারজীর সঙ্গে পুস্তক-প্রকাশনার বিষয়ে কথা সম্পূর্ণ হলো, আর তিনি মার্চে ২৫ হাজার অগ্রিম দিতে রাজি হলেন। এই অগ্রিম পরে অনেক সমস্যার কারণ হয়েছিল, যার ওপর প্রথমেই ইনকাম ট্যাক্স অফিসার তাকে আমদানি ধরে নিয়ে সুপারট্যাক্স লাগিয়ে দিল এবং অনেক ঝঞ্ঝাট করার পর এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। আবার সেই টাকা ব্যাঙ্কে রাখলে একদিকে টাকার মূল্য পড়ে গেলে তার কমে যাওয়ার ভয় ছিল, অন্যদিকে নিজের বাড়ি কেনার জন্যও আগ্রহ হচ্ছিল আর সেই বাড়ি কিনলামও যেখানে বসে এই পংক্তিগুলো লিখছি এবং যে বাড়ি আমি ছেড়ে দিতে চাই কিন্তু নেওয়ার লোক কেউ নেই।

নিজের পুরনো পরিচিত জায়গাগুলি দেখার শখ মানুষের হয়েই থাকে। বেনাবস গেলে আমি মোতিরামের বাগানে যাবার লোভ সম্বরণ করতে পারি না আর কলকাতা এলে ১৯০৭ আর ১৯০৯-এর পরিচিত রাজাবাজারের সেই কুঠরিটা দেখার জন্য উৎসুক হয়ে পড়ি, যেখানে আমি পাঠকজীর আশ্রিত হয়ে থাকতাম। আমি জানতাম, তার নম্বর ৬৪, সেটি তিনতলার ৮০ নম্বর কুঠরি। এখনও কয়েকটা কুঠবি পরে সেই নত্‌খাসিংহ সুরমাওলার সাইনবোর্ড লাগানো ছিল।

কালিম্পং—১০ তারিখ আটটার সময় আমাকে নিয়ে বিমান উড়ল। ২১টি সিটের মধ্যে শুধু ৪টিতে যাত্রী বসা ছিল, বাকি জায়গায় কিছু মাল ভরা ছিল। এমন পরিস্থিতিতে বিমান-যাত্রার ভাল ব্যবস্থা কি করে আশা করা যায়? এখন বিমান কোম্পানিগুলো সব শেঠদের হাতে, যাদের সবার আগে দৃষ্টি থাকে 'লাভ-শুভ'র দিকে। দেড়টার মধ্যে আমি কালিম্পং পৌঁছে গেলাম। এখন ঠাণ্ডা বেড়ে গিয়েছিল, আমাদেব সবাই ছোট ছোট উনুন জ্বালাতে শুরু করেছিল। শ্রীসেনগুপ্ত স্বদেশীর খুব পক্ষপাতী ছিলেন। আমবা খাবার সময় কাঁটা চামচ ব্যবহার করলে নাক সিঁটকিয়ে নিজের হাতে খেতেন। এবার দেখলাম, তিনিও কাঁটাচামচ ব্যবহার করছেন। জিজ্ঞেস করায় বললেন, 'জল ঠাণ্ডা, গরম করলেও কিছুক্ষণ পরে হাত তো ঠাণ্ডা হয়ে যায়।' আমি সেনগুপ্তজীকে তাঁর এই বুদ্ধির জন্য সাধুবাদ দিলাম। সত্যিসত্যিই আমাদের বহু আচার-বিচারের ক্ষেত্রে দেশ আর কালের প্রভাব নির্ণায়ক হয়ে থাকে। সেনগুপ্তজী কাঁটাচামচের নামে বলতেন, 'আমার হাত নেই নাকি?' আর এখন কেউ না বলাতেই এই পরিবর্তন মেনে নিতে রাজি হয়ে গেলেন। যদিও কালিম্পঙের ঠাণ্ডা খুব তীব্র হয় না, তাই এখানে বরফ পড়ে না। কিন্তু ঠাণ্ডা তো ছিল, আর সেনগুপ্তজীরই তার জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্ট হচ্ছিল।

১১ ডিসেম্বর ড· রোয়েরিকের সঙ্গে দেখা কবতে গেলাম। আজকাল তাঁর অনুজ স্বেতস্লাব আর তাঁর স্ত্রী দেবিকারানীও এসেছিলেন। স্বেতস্লাবকে বারো বছর পরে দেখলাম। তখনও তিনি দাড়ি রেখেছিলেন কিন্তু এখন তা অধিকাংশই সাদা হয়ে গিয়েছিল। দেবিকারানী হিন্দি তথা লোককথার বিষয়ে কথা বলতে থাকলেন। ৪০ বছর বয়স হবে হয়তো কিন্তু প্রসাধন করেন কি চমৎকার। দেখে ষোড়শী বলে মনে হচ্ছিল,

ঠোঁটে অধর-রাগ, মুখে হালকা ক্রিম, মাথায় অনেকগুলো কোঁকড়ানো কেশগুচ্ছ, মার্জিত পোশাক, চোখে চমক, মুখে প্রসন্নতার স্বাভাবিক মুদ্রা—এই ছিলেন দেবিকারানী, যাকে দেখার জন্য কালিম্পঙে ভিড় লেগে যেত। তিনি যে একজন সুশিক্ষিত ও সুসংস্কৃত মহিলা তা তাঁর বার্তালাপ থেকে বোঝা যাচ্ছিল।

১৫ ডিসেম্বর সেনগুপ্তজী দশ-বারোদিনের জন্য কলকাতা গেলেন। এবার আমরা কালিম্পং থেকে ডেরা-ডাণ্ডা তুলতে যাচ্ছিলাম। চারমাস পরেই আবার ঠাণ্ডা জায়গার খোঁজ করার ছিল তাই কয়েকজন বন্ধুকে লিখে রেখেছিলাম। ১৭ ডিসেম্বর পণ্ডিত গয়াপ্রসাদ শুক্লর চিঠি দেরাদুন থেকে এলো। তিনি লিখেছিলেন, চকরৌতাতে একটা ভালো বাংলো আছে, যা ভাড়াতেও পাওয়া যেতে পারে আর কিনেও নেওয়া যায়। তখন এটা জানা ছিল না যে, বহু বছরের জন্য আমরা শুক্লজীর প্রতিবেশি হতে চলেছি। কমলার পত্র দিল্লীতেই পেয়েছিলাম, তাতে সে লিখেছিল, 'এখানে থাকতে আমার মানসিক পীড়া হয়।' তার অবস্থা আমি কিছু কিছু অনুভব করতাম আর স্থির করেছিলাম যে, এবার তাঁকে তাঁর ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে না।

বিদায় জানাতে লোক আসতে শুরু করেছিল। ১৮ তারিখ মিসেস ক্রিল্স ও আরো কয়েকজন বন্ধু এলেন। কমলার পরিবারও দেখা করতে এলো। এই বছর সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন হায়দ্রাবাদে হবে। আমার যাওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু, শ্রীবলভদ্র মিশ্র অনুরোধ করায় আমি তা অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। এবছর আমি 'সাহিত্য-বাচস্পতি' উপাধি পেয়েছিলাম। তার কৃতজ্ঞতা জানাতেও সম্মেলনের এই অধিবেশনে আসা জরুরি ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বেশি যে ব্যাপারটা আমাকে যেতে বাধ্য করল তা হলো, পরিভাষার কাজ আর তার জন্য পণ্ডিত বলভদ্র মিশ্রের হাত শক্ত করা। যদি ভবিষ্যতেও মিশ্রজী সম্মেলনের কর্ণধার হয়ে থাকতেন তবে তাঁর কাছে অনেক আশা ছিল। তিনিও স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন আর উচিত কথার জন্য আপন পর কারোরই সৌজন্য মানতে রাজি হতেন না।

দার্জিলিং জেলার অন্নজল এতদিন খাবার পর তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার কাছে জরুরি ছিল। আর শুধু তার কেন সমস্ত হিমালয়ের কাছেই আমি ঋণী। বহুবছর ধরে আমি হিমালয়ের শীতলছায়া ও শীতল জলের আনন্দ উপভোগ করে এসেছি। তার পর্বত, উপত্যকা, হিমানী আর সহজ সরল মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা করেছি, তাদের পরিচয় নিয়েছি। যাত্রা করার সময় সর্বদা আমার এদিকে মনোযোগ থেকেছে যে, তা যেন শুধুমাত্র নিজের আনন্দের জন্য না হয়, বরং সেই আনন্দে অপরকেও অংশীদার করা উচিত। তাই আমি আমার প্রত্যেক যাত্রার বিবরণ লিখেছি। এখন হিমালয় বলছিল—'আমার ঋণ থেকেও তোমার মুক্ত হওয়া উচিত।' তাই আমি স্থির করলাম, দার্জিলিং সম্বন্ধে লেখা উচিত। কালিম্পঙেই আমি 'দার্জিলিং পরিচয়' লেখা শুরু করে দিলাম এবং সেইসময় সামগ্রী সংগ্রহ করলাম। 'দার্জিলিং পরিচয়'-এর পর আবার নৈনীতালে থাকার সময় 'কুমায়ুন'-এ হাত দিলাম। মুসৌরীতে আসার পর গড়ভূমির (গড়ওয়াল) প্রতি আগ্রহ হলো, আর তাও লিখে ফেললাম। এবার নেপাল বলতে লাগল—'আমাকে কেন

মাঝখানে ছেড়ে দিচ্ছ?' সেটাও লিখে ফেললাম এবং শেষে 'দেরাদুন-জৌনসার' ও 'হিমালয় প্রদেশ' লিখে ভুটানের পশ্চিম সীমা থেকে জম্মু-কাশ্মীরের পূর্বসীমা পর্যন্ত ছড়ানো হিমালয়ের বিষয়ে লিখে আমি নিজেকে ঋণমুক্ত করতে চেয়েছিলাম। বইগুলো তো আমি লিখে ফেললাম, কয়েকটি বইয়ের প্রকাশক এখনও পাওয়া যায়নি, আর কয়েকটির প্রকাশক ফুটবল বানাবে না কয়েক বছর ফেলে রেখে ছাতা পড়াবে সেই চিন্তায় ব্যস্ত।

হায়দ্রাবাদ-সম্মেলন

সবাইকেই কালিম্পং থেকে চলে যেতে হতো না। ভট্ট আর সেনগুপ্তজীকে এখানেই থেকে কাজ করতে হতো। কমলাকে হায়দ্রাবাদ সম্মেলনও দেখাতে হতো। এইভাবেই অর্ধেক ভারতকে সে দেখতে পেত, তাই তাকেও সঙ্গে নিয়ে ২১ ডিসেম্বর ট্যাক্সি করে দুটোর সময় আমরা শিলিগুড়ি পৌঁছে গেলাম। রাস্তায় কমলার দুবার বমি হলো, যদিও সে এর হাত থেকে বাঁচার জন্য পেট খালি রেখেছিল।

বাগডোগরা পৌঁছলাম। বিমানের বেশির ভাগটাই খালি ছিল। মাত্র দুজন যাত্রী ছিলেন। আমি কমলাকে অনেক বোঝালাম যে, পাহাড়ে চলন্ত মোটরের মত বিমান ঘুরে ঘুরে যায় না, তাই এর ভিতরে একদম বমি পায় না। যদি কেউ বমি করে, তবে তা শুধু মানসিক কারণে। কমলা নিরাহার ব্রত রেখেছিল এবং মনকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেছিল। বিমানে তো বমি হয়নি, কিন্তু কলকাতা শহরে গাড়িতে চলার সময় নিজেকে সামলাতে পারেনি। আমরা মণিহর্ষজীর বাড়ি পৌঁছলাম। সেইরাতেই নাগপুরের দিকে রওনা হতে চাইছিলাম। মেলট্রেনে কোনো জায়গা ছিল না। প্যাসেঞ্জারে জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল। প্রত্যেক স্টেশনে সেটা থেমে থেমে যেত। সময়কে হত্যা করার ব্যাপার তো বটেই কিন্তু আমরা চব্বিশ ঘন্টা অপেক্ষা করতে রাজি ছিলাম না। দুটো সিট রিজার্ভ করালাম। হাওড়া থেকে নাগপুর প্যাসেঞ্জার রাত দশটায় রওনা হলো। আমাদের কম্পার্টমেন্টে সাতটা সিট ছিল, যার মধ্যে দুটো খালি থাকল।

সারাজীবনে কমলা শুধু কলকাতা যেতে পেরেছিল। এবার সে বাংলা থেকে মধ্যপ্রদেশের মাটিতে ঘোরার সুযোগ পেয়েছিল। বাংলাকে দেখে সে বোধহয় ভেবেছিল, সব জায়গাতে সমতল ভূমি আছে, আর সবুজ পাহাড় শুধু হিমালয়েই দেখতে পাওয়া যায়। এখন তাঁর সামনে ছিল ছত্তিশগড়ের সবুজ পাহাড়। বর্ষাকাল হলে তা আরো সবুজ হতো। খেতে ধান কাটা হচ্ছিল। বাংলা, উড়িষ্যার মাটি পার করে এখন সে মধ্যপ্রদেশের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। হায়দ্রাবাদ গিয়ে তাঁর তেলেঙ্গানা দেখার সুযোগও হলো। তারপর বিন্ধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাব, বিহার শুধু নয় নেপালও সে দেখে ফেলল।

পাহাড়ে জন্ম নেওয়া মানুষের কাছে এটা একটা মামুলি অভিযান ছিল না।

২৩ ডিসেম্বর সকাল ছটায় আমরা নাগপুর পৌঁছলাম। নিজেদের জিনিসপত্র ওয়ার্ধার গাড়িতে তুলে দিয়ে ভাবছিলাম কয়েক ঘণ্টা গাড়ির ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম করি। কিন্তু প্লাটফর্মে পণ্ডিত বলভদ্র মিশ্রর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি জানালেন, 'প্রয়াগ থেকেই রিজার্ভ কামরা আসছে, তাতে অনেক সাহিত্যিক বন্ধু যাচ্ছেন।' এরপর সন্ত-সমাগম থেকে বঞ্চিত হতে কে রাজি হতো? পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র, রায় রামচরণ, অশোক গুপ্ত, শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন ইত্যাদি পরিচিত বন্ধুরা সেখানে জমিয়ে বসেছিলেন। আমরাও সেখানে পৌঁছে গেলাম। কমলার মহিলাদের সুসঙ্গ লাভ হলো।

ওয়ার্ধাতে গাড়ি ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে রইল। এখানেই জলখাবার খাওয়া হলো। ফিরে আবার রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতিতে আসতে হতো তাই আমাদের অর্ধেক জিনিস সেখানে পাঠিয়ে দিলাম। আনন্দজীও ওই ট্রেনেই যাচ্ছিলেন। গাড়ি আবার রওনা হলো।

এবার আমরা হায়দ্রাবাদের দিকে চললাম। রাতে চাঁদ দেখার পর জঙ্গলে দীপাবলী দেখলাম। লক্ষ্মী যেখানে অধিষ্ঠান করে, সেখানে দীপাবলী হয়, আর তার ইশারায় একদিনের জন্য নয়, বারোমাসই দীপাবলী হতে পারে। এখানে কোনো কারখানা ছিল।

রাত সাড়ে নটার সময় কাজীমব্রপেট পৌঁছে আমাদের কামরা কেটে দেওয়া হলো। সকাল সওয়া ছটার সময় তা হায়দ্রাবাদের উদ্দেশে রওনা হবে। আমরা রেস্তোরাঁতে চলে গেলাম। সেখানে মুর্গমুসল্লম বানানো হয় শুনলাম। আমরা আনিয়ে নিলাম। যে অভ্যস্ত তার কাছেও ছুরি-কাঁটা দিয়ে মুর্গমুসল্লম খাওয়াটা কষ্টকর। কমলার তা বশে ছিল না। সে এদিক-ওদিক ছুরি-কাঁটা চালালো, কিন্তু মুর্গি না কেটে গিয়ে জ্যান্ত হয়ে প্লেটের বাইরে লাফিয়ে পড়তে উদ্যত হলো। সে স্বীকার করতো যে মুর্গমুসল্লম ছেড়ে দেবার জিনিস নয়, কিন্তু সে অপারগ ছিল।

আমাদের গাড়ি ডাকগাড়ি হয়ে গিয়েছিল। সকালে ২ ঘণ্টা দিনের আলোয় হায়দ্রবাদের মাটি দেখার সুযোগ পাওয়া গেল এবং সেকেন্দ্রাবাদ হয়ে আটটার সময় আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম। স্টেশনে স্বাগত জানানোর জন্য অনেক প্রস্তুতি ছিল। শোভাযাত্রা বেরোত আর কয়েক ঘণ্টা হয়রান হতে হতো। খোঁজ নিয়ে যখন জানতে পারলাম যে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গুপ্তর বাড়িতে থাকতে হবে, তখন শহরের বাইরে তাঁর বাড়িতে আমরা পৌঁছে গেলাম। প্রথম কাজ ছিল স্নান। রেলযাত্রায় মানুষ ম্লেচ্ছ হয়ে যায়। স্নানের পরে চা-পান। তারপর আমরা সম্মেলনের জায়গা হিন্দিনগরে গেলাম। হিন্দি একবছর আগে হায়দ্রাবাদের কাছে তুচ্ছ ও অজানা ভাষা ছিল। নিজাম সরকার এখানকার দেশী ভাষা—মারাঠী কন্নড় আর তেলুগুকে মেনে নিতে রাজি ছিল না। উর্দুর জন্য সে কোটি কোটি টাকা জলের মত ঢালছিল। সে সময় হিন্দির নাম মুখে আনলেও ধর্ম চলে যেত। কিন্তু এখন নিজামতন্ত্র শেষ হয়ে গিয়েছিল। নিজামকে শুধু রাজ্যের প্রধান করে দেওয়া হয়েছিল এবং রাজকার্য তাদের ইচ্ছানুসারে হতো, যাদের নিজাম কোনোরকম সম্মান দিতে রাজি ছিল না। 'কখনও নৌকো গাড়ির ওপর আবার কখনও গাড়ি নৌকোর ওপর' হয়েই থাকে। হায়দ্রাবাদ তেলুগুভাষীর জায়গা। তেলুগু, মারাঠী আর কন্নড় তিন ভাষাভাষীই

জানে না পর্দা কি বস্তু। বাহ্মনী আর নিজামতন্ত্রের ছশো বছরের ভয়ঙ্কর প্রচারের পরেও পর্দা এখানে জনপ্রিয় হতে পারেনি। তাই হিন্দিনগরে যদি মহিলাদের অধিক সংখ্যায় চোখে পড়ে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তরুণ স্বয়ংসেবিকারা তাঁদের কাজ খুব ভালভাবে করেছিলেন। খাবার ব্যবস্থাও খুব সুন্দর ছিল। রুটিও ছিল, কিন্তু যে দেশে যাওয়া হয়, সেখানকার খাদ্য গ্রহণ করা আমার বেশি প্রিয়। দুপুরে সেই ভাত, স্বাদহীন অথবা টক আলুর তরকারি ও অন্যান্য ব্যঞ্জন খেলাম। ঝালের কষ্ট হতে পারত, কিন্তু এখানে রাঁধুনিরা সেদিকে বিশেষ জোর দেয়নি। রসম্ (তেতুলের সুস্বাদু জল) দক্ষিণী খাবারের মধ্যে আমার খুব প্রিয়, কিন্তু আমার মত অন্যান্য অতিথিরা তার গুণগ্রাহী ছিল না।

দুটোর থেকে স্থায়ী সমিতি বসল। কয়েক বছর ধরে সম্মেলনের নিয়মাবলী সংশোধনের কথা চলছিল। এই সময়েও তার সম্বন্ধে কিছু কথা হলো, কিন্তু সম্মেলনের নিয়মাবলীর সংশোধন এত তাড়াতাড়ি হয়ে যদি পাস হয়ে যেত, তাহলে সম্মেলন আজকের দিন কি করে দেখতে পেতো?

সম্মেলন—সাড়ে পাঁচটার সময় অধিবেশন শুরু হলো। স্বাগতাধ্যক্ষ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গুপ্ত তাঁর স্বাগত ভাষণ পড়লেন। তারপর মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত রবিশংকর শুক্ল উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন। মনোনীত সভাপতি পণ্ডিত চন্দ্রবলি পাণ্ডের নাম প্রস্তাব করলেন শেঠ গোবিন্দ দাস। আমি এবং পণ্ডিত অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী সমর্থন করলাম। পুরো ভাষণ পড়লে অনেক দেরি হতো এবং সেখানে সময়ের প্রশ্ন ছিল। সাতটার সময় অধিবেশন-স্থান থেকে গুপ্তজীর বাড়িতে চলে এলাম। কমলা সম্মেলনের বিশাল সভাও দেখল। আমাকে মঞ্চে বসতে হয়েছিল। সে রানী ট্যান্ডনকে পেয়ে গেল, রোগা-পাতলা মেয়েটির প্রতি স্নেহ দেখানো তিনি জরুরি মনে করলেন। যদিও কালিম্পঙের মানুষের কাছে হায়দ্রাবাদের ডিসেম্বর মাসও ঠাণ্ডা হতে পারে না, তবু রায় রামচরণ তাঁর গরম চাদর এনে দিলেন।

২৫ ডিসেম্বরের সকালে সাহিত্য-পরিষদে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্রর খুবই সুন্দর সারগর্ভ ভাষণ হলো। সম্মেলন আর সাহিত্য-পরিষদ দুইয়েরই সভাপতি আজমগড়ের মানুষ ছিলেন। দুজনের যোগ্যতাই মানুষ স্বীকার করছিলেন। এটা আমার কাছে ব্যক্তিগত গর্বের কথা। পরিষদ থেকে উঠে মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। দিল্লীতে মুঘল-শাসন যখন শেষ হতে চলেছিল, সেই সময় একজন মুঘল সামন্ত নিজামুলমুল্ক হায়দ্রাবাদে তার ঝাণ্ডা উড়িয়েছিল। শেষ মুঘল আমলে দিল্লীতে চারটি রাজনৈতিক দল ছিল—১· মুঘল অথবা মধ্য-এশিয়াবাসী তুর্কিদের দল, যার নেতা ছিল নিজামুলমুল্ক, ২· ইরানী দল, যার নেতা ছিল অযোধ্যা আর মুর্শিদাবাদের নবাব, ৩· পাঠানদের দল, যাদের সবচেয়ে বড় নেতা ছিল নজিবুদ্দৌলা এবং যে নিজামাবাদ স্থাপন করেছিল, ৪· মুলকি দল অর্থাৎ দেশের মুসলমানদের পার্টি, যাদের নেতা ছিল মুজঃফরনগর জেলার সৈয়দবন্ধু। নিজামুলমুল্ক মধ্য-এশিয়ার তুর্কমান উপজাতির ছিল, তাই সে বাদশাহের নিজের দলের লোক ছিল।

সেখান থেকে বহু জিনিস সে নিয়ে আসাতে, যার মধ্যে থেকে কিছু জিনিস এই মিউজিয়ামে রাখা ছিল। মুঘল আমলের ক্ষুদ্র চিত্রের সুন্দর সংগ্রহ ছিল এখানে। বহু হস্তলিখিত গ্রন্থ ছিল, যার মধ্যে একটি 'নৌরস' গ্রন্থও ছিল। হায়দ্রাবাদের জায়গায় জায়গায় বহু সুন্দর মূর্তি ছড়িয়ে পড়েছিল, যেগুলির খুব ভাল সংগ্রহ হতে পারত। কিন্তু সেগুলি তো নাস্তিকতার চিহ্ন তাই তাদের প্রতি অবহেলা করাটা স্বাভাবিক। এক জায়গায় বারান্দায় অনেকগুলি গান্ধার-কলার মূর্তি সাধারণ মূর্তির স্তূপের মধ্যে পড়েছিল। এটাই বলে দিচ্ছিল যে, এই অরাজক নগরীতে 'চৌপট রাজা'[১]ই থাকতে পারে। যে দুরবস্থা গান্ধার মূর্তিগুলোর ছিল, তা অমরাবতীর মূর্তিগুলোরও ছিল। কোনো মূর্তির ওপরেই কোনো পরিচিতি লেখা ছিল না।

খাওয়ার পরে আমরা সরকারি গ্রন্থাগার দেখতে গেলাম। আমার ফারসী-আরবী জ্ঞান আমাকে সাহায্য করল। আধিকারিক প্রতিটি জিনিস দেখাল। গ্রন্থগুলির সূচি তৈরি হচ্ছিল, তাই 'দক্ষিণী' ভাষার কবিতার এবং অন্যান্য গ্রন্থ আমরা ভাল করে দেখতে পেলাম না। আমার হায়দ্রাবাদে আসার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল সেগুলি দেখা।

হাইকোর্ট দেখলাম। হাসপাতালের সুন্দর অট্টালিকাও দেখলাম। তারপরে চারমিনার গেলাম। উর্দু বুক-সেলারদের সঙ্গে আমার কাজ ছিল, কিন্তু চালু বই ছাড়া অন্যান্য বই দুর্লভ হয়ে উঠছিল। প্রোফেসর জোর দক্ষিণীর গ্রন্থগুলির সম্পাদনা করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হলো, কিন্তু সেদিন তাঁর প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো। এই বইগুলি বাসস্থানে রেখে আবার আমি হিন্দিনগরে চলে এলাম। মহিলা সম্মেলনেও কিছু বলতে হলো। মহিলাদের এত বিপুল সংখ্যা দেখে বোঝা গেল, এখানকার মহিলারা উত্তর-ভারতের মহিলাদের এখনই অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। মুক্ত অধিবেশনেও একটি প্রস্তাবের ওপর বলতে হলো। রাতের খাওয়ার পরে বিষয়নির্ধারণী সমিতিতে পৌনে এগারোটা পর্যন্ত থাকতে হলো।

২৬ ডিসেম্বরের সকাল হলো। জল খাবারের পর নটার সময় হিন্দিনগর পৌঁছলাম। বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ড· টোপা ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দেখাতে নিয়ে গেলেন। টোপা সাহেব প্রথম থেকেই এখানে নিজামের চাকরিতে ছিলেন। কাশ্মীরের বাইরের কাশ্মীরী হওয়ায় উর্দুকে তিনি নিজের মাতৃভাষা মনে করতেন, আর এও স্বীকার করতেন যে, ইংরেজিই এমন একটা ভাষা যাকে গ্রহণ করা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু তিনি দেখছিলেন যে, স্থানীয় ভাষাগুলি একথা মানতে রাজি নয়। উর্দুর পৃষ্ঠপোষক হায়দ্রাবাদ এখন আর নিজামের নেই, বরং এখন তা সেখানকার লক্ষ লক্ষ জনতার। তেলুগু, কন্নড়, মারাঠী জবরদস্তি নিজেদের স্থান অধিকার করতে যাচ্ছে। তাদের সহানুভূতি পেয়ে হিন্দিও তার জায়গা করে নিচ্ছে। টোপা সাহেব আমাদের এটা বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন যে,

[১] লেখক এখানে প্রচলিত একটি লোকোক্তির আংশিক ব্যবহার করেছেন। সম্পূর্ণ লোকোক্তিটি হলো, *অন্ধের নগরী চৌপট রাজা/টকে সের ভাজী টকে সের খাজা।* অর্থাৎ যে দেশ অরাজক, রাজা একেবারেই অযোগ্য, সেখানে ভালমন্দের কোনো কদর নেই।—স·ম

জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষাও জনতার ভাষা থেকে দূরে হওয়া উচিত নয়। জনতার ভাষা বলতে তিনি বুঝতেন শিক্ষিত কলমের ভাষা, যা মুষ্টিমেয় কাশ্মীরী পণ্ডিতরা বলে থাকেন। জওহরলালের মতই তিনিও মনে করতেন, মায়ের দুধের সঙ্গে যতটা ভাষা শিখেছি, তার বেশি জানার দরকার নেই। যদিও ইংরেজির জন্য বহু বছর ব্যয় করে তিনি নিজেই একথার খণ্ডনও করেছেন। টোপা সাহেব সংস্কৃততেও অনভিজ্ঞ ছিলেন তাই একথা বলা ও বোঝা তার বুদ্ধি-বহির্ভূত ছিল যে, আমাদের ভাষাগুলি চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই সংস্কৃতের তৎসম শব্দ গ্রহণ করতে শুরু করেছে, আর তৎসম শব্দ গ্রহণ করায় তেলুগু, কন্নড়, মারাঠী ও মালয়ালম থেকে হিন্দি অনেক পিছিয়ে আছে। জনগণের কবি তুলসীদাসও বহু তৎসম শব্দ গ্রহণ করেছেন। তুলসীদাসের প্রয়োগ করা সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করার অধিকার আমাদের আছে, অথবা সেগুলিও আমাদের ছাড়তে হবে। টোপা সাহেব বলতে লাগলেন, জনতার ভাষা থেকে দূরে যাওয়ার জন্য নিজাম সরকারকে কোটি কোটি টাকা খরচ করেও বিফল হতে হয়েছে। বহু বছর ধরে নিজাম সরকার বিদ্বানদের নিজের কাছে রেখে উর্দুর পারিভাষিক শব্দ তৈরি করাতে থাকে, যেগুলি প্রায় সবই আরবী ছিল। টোপা সাহেব তার স্তূপ দেখিয়ে বললেন, 'হিন্দিও যদি ভুল করে তবে তারও এই অবস্থা হবে।' আমি বললাম যে, এই স্তূপও কাজে লাগতে পারে, কারণ পাকিস্তানের লোকেরা উর্দুরই উন্নতি করতে চায়। বাকি রইল হিন্দির কথা। হিন্দি তো একাই এই নৌকোয় বসছে না, বরং তার সঙ্গে অসমিয়া, বাংলা, উড়িয়া, তেলুগু, তামিল, মালয়ালম, কন্নড়, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, নেপালীই শুধু নয়, সিংহলী, বর্মী, সিয়ামী, কম্বোজীও বসে আছে। আমরা চেষ্টা করছি ভাষার বিকাশের এই কাজে সবাই যাতে একে অপরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে থাকে। সাইন্স-কলেজ, আর্ট-কলেজের সুন্দর বাড়ি বানাতে নিজাম মুক্তহস্তে খরচ করেছে। সেইসময় ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটির উপাচার্য কোনো মুসলমান ভদ্রলোক ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতা এবং উর্দুর আঁচল ধরে সামনে এগোনর কোনো উপায় ছিল না, তাই তিনি ডামাডোল অবস্থায় পড়েছিলেন। টোপাসাহেব কাশ্মীরী ছিলেন, অর্থাৎ নেহেরু আর কাট্‌জুর স্বজাতি, তাই তাঁর কদর সবচেয়ে বেশি ছিল, কারণ তিনিই তাঁদের বিপদের সময় কাজে আসতে পারতেন।

দাই-উল-ইসলাম সাহেবের সঙ্গে দেশে নয়, কিন্তু তেহেরান নিবাসের সময় আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি অত্যন্ত বড় মাপের ইরানী পণ্ডিত ছিলেন। ফারসী তাঁর মাতৃভাষা ছিল। যদিও তিনি শিয়া ছিলেন, কিন্তু ফারসী সংস্কৃতি ভারতীয় মুসলমানদের কাছে সর্বদা মান্য ছিল। তাই নিজামের দরবারে তাঁর কদর হয়, আর তিনি কয়েকটি খণ্ডে ফারসীর একটি বড় অভিধান তৈরি করেন। তিনি জানতেন যে, ফারসী ও সংস্কৃত দুটোই এক পরিবারের ভাষা। তাই সংস্কৃতের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল এবং এখানে থাকতে তিনি তা পড়েছিলেন। নিজের অভিধানের জায়গায় জায়গায় তিনি সংস্কৃত শব্দও দিয়েছেন। হায়দ্রাবাদে তাঁর নিজের বাড়ি ছিল। অনেক বছর এখানে থেকেছেন। আমার আশা ছিল, তিনি হয়তো এদিকে এসে থাকতে পারেন। অনেক জিজ্ঞেস করার পর কয়েক ঘণ্টা বাদে বাড়ি পাওয়া গেল। জানতে পারলাম, তিনি বোম্বাই চলে গেছেন।

২৭ ডিসেম্বর সকালে জোর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দেখা হলো না। কিছুক্ষণ ড· হুসেন-এর সঙ্গে কথাবার্তা হলো। তাঁর ভাই সজ্জাদ জহীর-এর মত ইনিও চিন্তাধারায় প্রগতিশীল। তাঁর বিষয় ছিল সাইন্স (রসায়ন), কিন্তু সাহিত্যেও তাঁর রুচি ছিল, আর তাই হিন্দি-উর্দু সমস্যা বিষয়েও তাঁর আগ্রহ ছিল। উর্দুর রক্ষা আর প্রচারের কাজে আমি নিজেকে অন্য কারো থেকে কম বলে মনে করি না। আমার বিশ্বাস উর্দুর ক্ষতি হবে না। হ্যাঁ, এখন উর্দুর জন্য দেবনাগরী লিপিকে বয়কট করা সম্ভব নয়।

সেদিন সাড়ে বারোটার সময় বেশ কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে গোলকুণ্ডা যেতে হলো। প্রথমে ওসমান সাগরে চলে গেলাম। সপ্তম নিজামের সময় এই বিশাল সরোবরটি সিঞ্চন ও শহরের জলের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। পাশে পিকনিকেরও জায়গা আছে। সেখানে অনেক মুসলমান মহিলাও পুরুষদের সঙ্গে পিকনিক করতে এসেছিলেন। তাঁদের মুখচোখ উত্তর-ভারতের হিন্দু মহিলাদের মতই ছিল, যদিও শিক্ষিত পরিবারের মহিলারা কেতাবী উর্দু বলাটা সম্মানজনক মনে করতেন। 'দক্ষিণী' শুনতে খুব মিষ্টি লাগে। লোকভাষায় বিশেষ রকমের মাধুর্য থাকেই। ওসমান সাগর থেকে তারপর আমরা গোলকুণ্ডার কেল্লায় গেলাম। চারদিকে বিশাল নগর-প্রাকার ছিল, এখন যা অনেক জায়গায় পড়ে গেছে। নিজাম গোলকুণ্ডাকে রাজধানী না করে, গোলকুণ্ডার বাদশাহ কুল্লী কুতুব-এর বেগম হৈদরমহল-এর নামে স্থাপিত নগরকে তার রাজধানী বানায়। গোলকুণ্ডার ভাগ্য কেন লুণ্ঠিত হবে না? ভাঙা ছাত আর দেয়ালগুলো কাঁদছিল। একটি পাহাড়কে অজেয় দুর্গ মনে করে এই কেল্লা বানানো হয়েছিল—কুণ্ডা (কোণ্ডা)-র অর্থ হলো পর্বত। এটি মূলত দ্রাবিড় ভাষার শব্দ। পাহাড়টি কিছুটা গোল, তাই গোলকুণ্ডা নাম হয়েছিল। এই পাহাড়ের চারদিকে নগর অবস্থিত ছিল। আমরা কেল্লার ভেতরে গেলাম। ফটকের পাশে পেটানো ছাদওলা গম্বুজ পেলাম, যেটা শব্দ করলে কিছুটা নড়ে বলে মনে হচ্ছিল। প্রতিধ্বনিও বেশি হচ্ছিল। এটিকে একটি বিস্ময় বলে জানানো হলো। আমাদের প্রাচীন দক্ষ স্থপতিরা এমন বিস্ময় সর্বদাই দেখাত। পাহাড়ের মাথায় সুলতানের মহল এখনও অনেকটাই সুরক্ষিত আছে। রমণীয় প্রাসাদের ভেতর বিশাল বিশাল ঘর ছিল, ফোয়ারাও লাগানো ছিল। সুলতান কুল্লী কুতুব-এর আমলের কথা মনে পড়ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে হয়তো এখানে বহু ভোগবিলাস হয়েছে, কিন্তু এখন তা বসতিহীন ধ্বংসপ্রায়।

আজও দুপুরের পর হিন্দিনগরে গেলাম। একটি বৈঠকে আচার্য নরেন দেবও এসেছিলেন। এখানেই তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকার হয়েছিল। নরেন্দ্রদেবজীর সঙ্গে বহুবছর ধরে আমার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে। মাসের পর মাস তাঁর পরিবারের লোক হিসেবে আমি কাশী বিদ্যাপীঠে থেকেছি। আমি কমিউনিস্ট, আর তিনি ছিলেন এমন সোস্যালিস্ট পার্টির নেতা, যারা কমিউনিস্টদের অন্ধের মতো বিরোধিতা করা অবশ্যকর্তব্য মনে করে। তবুও আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কে তার কোনো প্রভাব পড়েনি। কোনো এক সময় আমরা দুজনে মিলে কার্ল মার্কসের 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' অনুবাদ করেছিলাম। তিনিও বৌদ্ধদর্শন ও সংস্কৃতির প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। এইরকমই আমরা ছিলাম সমধর্মী। পরে আমাদের সাহিত্যিক সহযোগিতা আর ছিল না কিন্তু আমাদের সাহিত্যিক মনোভাব পরস্পরকে

অবশ্যই আনন্দিত করত। মানুষ হিসেবে নরেন্দ্রদেবজী অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। খুবই প্রসন্নচিত্ত ছিলেন। যখন তিনি এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে পড়েন, সেই সময়কার কথা। দেশের ভেতর নানারকম ধর্ম দেখতে দেখতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর জন্মভূমি ফৈজাবাদের পাশেই অযোধ্যা, যেখানে সখীমত-এর ভীষণ প্রচার ছিল। পুরুষ মনে করত সে স্ত্রী না হলে ভগবান তাকে স্বীকার করবে না। রামজীর রানীমহলে এইসব গুঁফো স্ত্রীদের কাজ কি ছিল? আর তাছাড়া রামজী তো একপত্নী-ব্রত ছিলেন। রাধাশ্যামী আর আর্যসমাজী, ব্রহ্মসমাজী ইত্যাদি ইত্যাদি পঞ্চাশরকম ধর্ম চলছিল। তাঁর মনে হলো এইসব পন্থার ক্যারিকেচার হিসেবে আমাদেরও একটা পন্থা শুরু করা উচিত। তিনি আর তাঁর বন্ধুরা মিলে 'চঞ্চু-পন্থা' কায়েম করলেন। যখন তাঁদের পরস্পরের দেখা হতো, ডানহাতটা চঞ্চুর মত বানিয়ে অভিবাদন করতেন। বাইরের জিজ্ঞাসুদের খুব গাম্ভীর্যের সঙ্গে বোঝাতেন যে 'চঞ্চু-পন্থা'ই সত্য ও মূল ধর্ম। তার জন্য তিনি বিষ্ণুবাহন গরুড়জী, ত্রেতার ভক্ত জটায়ু আর সম্পাতির কথা বলে চুপ করিয়ে দিতেন। বহুদিন পর্যন্ত 'চঞ্চু-পন্থা' ছাত্রদের মনোরঞ্জনের জিনিস ছিল।

আমাকে যেখানে সেখানে যেতে হতো। কমলাকে সব জায়গা দেখাতে সাহায্য করতে পারতাম না। তবে স্বয়ংসেবিকাদের ক্যাম্পে সে সুন্দরবাঈকে পেয়ে গেল, যার সঙ্গে তাঁর সখীত্ব স্থাপিত হলো আর আজও দুইসখীর মধ্যে চিঠি চালাচালি হয়ে থাকে। সেইসময় একটি পাহাড়ের মেয়ের কাছে সমতলের এই বিশাল শহর বিচিত্র ও ভয়োৎপাদনকারী মনে হয়েছিল, যদিও সে কলকাতা দেখেছিল তবু তা অপরের আঙুল ধরে দেখার মতই ছিল। পুরনো রীতি অনুযায়ী সখী হবার এক বিশেষ কর্ম-কাণ্ড হয়ে থাকে, পাহাড়েও যা মানা হয়। আমাদের ভোজপুরী ক্ষেত্রে তো কোনো স্ত্রী তার সখীর নাম ধরে ডাকতে পারত না। সখী হবার সময় তারা এক থালা অথবা পাতা থেকে খায়। সুন্দরবাঈ আর কমলা এভাবে তো সখী হয়নি, তবে সে-সময় সুন্দরবাঈ-এর জন্যই হায়দ্রাবাদ কমলার কাছে ভীতিপ্রদ মনে হয়নি। সে তাঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। শ্রীসুমিত্রাকুমারী সিনহা আর শ্রীকোকিল—হিন্দির এই দুই মহিলা কবিও সেখানে এসেছিলেন। তাঁদের জন্যও তার মন বসে যেত। কোকিলজী বেচারির তো টাকা কেউ চুরি করে নিয়েছিল এবং তাঁকে খুব কষ্টে পড়তে হয়েছিল।

২৮ তারিখ কমলা একা হয়ে গেল। তার কাঁদো-কাঁদো মুখ দেখে শ্রীসত্যেন্দ্রজী (বদরীপুর) তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইলেন। তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে প্রদর্শনীতে নিয়ে গেলেন। খাবার জন্য মিষ্টি দিলেন, কিন্তু মিষ্টি তাঁর চোখের জল বন্ধ করতে সমর্থ হলো না। সত্যেন্দ্রজীর সঙ্গে তার পরিচয়ও ছিল না। সে কি করে বুঝবে যে তাকে কেন এত খাতির করা হচ্ছে? বড় শহরে মেয়ে চুরির কথা সে শুনেছিল, তাই প্রাণটা গলায় এসে আটকেছিল। যাইহোক, আমি এসে পড়লাম, তখন সে ঠাণ্ডা হলো।

খুব উৎসাহের সঙ্গে সম্মেলনের প্রস্তুতি করা হয়েছিল। নিজাম-শাসনে দমবন্ধ হওয়া মানুষ টাটকা বাতাসের ছোঁয়া পেয়েছিল। এই অখিল ভারতীয় মিলনের মাধ্যমে হায়দ্রবাবাদের হিন্দিভাষী ও হিন্দি অনুরাগীরা তাঁদের মনের উল্লাস দেখাতে চাইছিলেন।

হিন্দি নগরে রাতে দীপাবলীর দৃশ্য দেখা যেত। সমস্ত ব্যবস্থাই ভাল ছিল।

আমি পুরনো উর্দু, বিশেষ করে দক্ষিণীপুস্তক সংগ্রহ করার তালে ছিলাম। ইচ্ছে ছিল, হিন্দির এই গুরুত্বপূর্ণ এবং অতিপ্রাচীন সাহিত্যর 'দক্ষিণী হিন্দি কাব্যধারা'রূপে একটি সংগ্রহ প্রকাশ করি। সেদিন আবিদ রোডে গেলাম। মক্তবে ইব্রাহিমিয়া-এর নাম শুনে সেখানে পৌঁছে গেলাম। তিনি জানালেন যে কাল অনেকগুলো বই দিতে পারবেন কিন্তু পরের দিন গিয়ে কারোকে পেলাম না। অনেক প্রতিনিধির খাওয়া-দাওয়া শ্রীজেতলীর বাড়িতে হলো। শ্রীরামনারায়ণ মিশ্রের জামাই হওয়ায় জেতলীসাহেব ও তাঁর স্ত্রীর হিন্দি সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। হায়দ্রাবাদের নতুন প্রশাসনকে ঠিকমত চালানোর জন্য বাইরে থেকে যেসব অফিসার এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যেই জেতলীসাহেব একজন বড় অফিসার। সেইদিনই (২৮ তারিখ) ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর চা-পার্টি দিলেন। সেদিন তিনি হিন্দির প্রতি খুব প্রেম দেখাচ্ছিলেন কিন্তু 'গঙ্গা গয়ে গঙ্গাদাস, যমুনা গয়ে যমুনাদাস'[১]-এর ভরসাই বা কি? কাশিম রিজবীর সময়ে এঁরাই হয়তো তার জয়জয়কার করেছেন। সন্ধেবেলা আচার্য নরেন্দ্রদেবের সভাপতিত্বে দক্ষিণী ভারতীয় সাহিত্য সংসদ-এর অধিবেশন হলো, যেখানে হিন্দি ও দক্ষিণী ভাষার উন্নতি ও বিকাশ নিয়ে ভাবনার আদান-প্রদান হলো। রাতে রাজা পিত্তীর বাড়িতে খাওয়া হলো। ইনি এখানকার শেঠ হুকুমচন্দ। খাবারের সমস্ত পাত্র রুপোর ছিল। হায়দ্রাবাদে খুবই ব্যস্ত প্রোগ্রাম ছিল। এরই মধ্যে দক্ষিণীর অনেক বই আমি কিনে অথবা উপহার হিসেবে পেয়ে সংগ্রহ করেছিলাম।

বেরুড় (ইলোরা)—২৯ তারিখ রাতে আমার বেশ একটা বড় দল করে হায়দ্রাবাদের প্রাচীন স্থানগুলি দেখতে বেরোলাম। শ্রীবাচস্পতি পাঠক, অশোকজী ইত্যাদি এবং কিছু মহিলাও সঙ্গে ছিলেন। বার্থ রিজার্ভ ছিল, তিনটের সময় গাড়ি ধরলাম। রাস্তায় জালনা স্টেশন পড়ল। আমার দাদুর পুরনো কথা মনে পড়তে লাগল। তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে এখানে পল্টনে ভর্তি হয়েছিলেন, আর এখানেই প্রায় দশবছর ধরে ইংরেজদের ফৌজে সেপাই হয়ে ছিলেন। তাঁর সাহস আর শিকার যাত্রার এখানকার বহু গল্প তিনি দিদিমাকে শোনাতেন, যেগুলি শৈশব থেকেই আমি শুনে এসেছি। এই গল্পগুলোই আমার মনে ভবঘুরেমির বীজ রোপণ করেছিল। কিন্তু এখন এখানে নেমে কিই বা দেখতাম? জালনার কিছু হিন্দি অনুরাগীর সঙ্গে হায়দ্রাবাদে দেখা হয়েছিল। তাদের কাছে জানতে পারলাম যে, সেখানে দেশোয়ালি পল্টনের সন্তানরা আছে। কি করে জানা যাবে যে তাদের মধ্যে রামশরণ পাঠকের সন্তান কে? যদি থাকতও, তাহলেও এখন দাদুর ছেলের বয়স ৮৪ হতো। নানারকম কথা ভাবতে ভাবতে আমি এগোতে লাগলাম। ৩০ ডিসেম্বর পাঁচটার সময় ঔরঙ্গাবাদ পৌঁছলাম। এখান থেকেই বেরুড় আর অজিণ্ঠা (অজন্তা)-র যাত্রা করার ছিল। স্টেশনের পাশেই ছিল একটি বড় ধর্মশালা। এখন আমরা ফেরৎ-যাত্রী,

[১] 'গঙ্গায় গিয়ে গঙ্গাদাস, যমুনায় গিয়ে যমুনা দাস' অর্থাৎ সুবিধেবাদী। —স·ম·

হয়তো সেইজন্যে, অথবা ভোর পাঁচটার অসময়ের জন্য সেখানে কোনো পথ-প্রদর্শক পাওয়া গেল না। আমরা ধর্মশালায় দু-তিনটে ঘর নিয়ে নিজেদের হোল্ডল আর সুটকেশ ফেলে পরের যাত্রা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম।

দৌড়োদৌড়ি করে বেরুড়ের জন্য নিজাম বাস-সার্ভিসের একটি বাস ঠিক করলাম। তাতে ২৭ জন লোক ওঠার ব্যবস্থা হলো। মুখ-হাত ধুলাম, চা-জল খেলাম, কিছু খাবার জিনিস সঙ্গে নিলাম। আমি আগে অনেকবার এসেছি তাই অসুবিধেগুলো জানতাম। আটটার সময় আমাদের বাস রওনা হলো। প্রথমে বেরুড় যাওয়া ঠিক হলো, দেবগিরি (দৌলতাবাদ) ফিরে এসে দেখার জন্য ছাড়া হলো। লেণ্যা (গুহা)-তে নটার সময় পৌঁছলাম। বাস খুব কাছ পর্যন্ত চলে গেল। সিংহলেও গুহা-বিহারগুলিকে 'লেনা' বলা হয়, আর মহারাষ্ট্রে 'লেণ্যা'। ভারতের অন্যান্য জায়গায় এই শব্দটি ব্যবহার করা হয় না।

আমরা সে দিক দিয়ে শুরু করলাম যেদিকে বৌদ্ধ গুহাগুলি আছে, আর যেগুলো সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর। অজন্তায় প্রথম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত গুহাগুলি অজন্তার উত্তরাধিকারী। এইগুলি দেবগিরির যাদবদের সময়ে তৈরি, তাই তাদের রাজধানীর কাছে রয়েছে। গুহায় পৌঁছনোর পর অন্ধকারে দেখার জন্য টর্চের দরকার ছিল। আমি টর্চ ঠিকঠিক নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু কমলা সেটা বাসে ফেলে এসেছিল। তাড়াতাড়িতে মানুষ অস্থির হয়ে পড়ে আর উত্তেজনা প্রকাশ করতে গিয়ে শব্দের খেয়াল করে না। আমি কিছুটা কঠোর স্বরে বললাম। কমলা কাঁদতে কাঁদতে লেণ্যার দিকে চলে গেল আর সঙ্গীদের মধ্যে কেউ একজন টর্চ আনতে গেল। এর ফলে পণ্ডিত বাচস্পতির কোমল মনে আঘাত লাগল। আমাকে তিনি কিছু বললেন না, কিন্তু কমলাকে অনেক বোঝালেন। সত্যিসত্যিই অত লোকজনের মধ্যে কোনো আত্মসম্মানসম্পন্ন ব্যক্তিকে ধমকানো খারাপ কাজ। সেই সময় কমলা বাচস্পতি পাঠকের সহৃদয়তার মূল্য বুঝেছিল। যদিও পার্বতীবালা'র চোখের জল থামল, তবে এইসব পুরনো গুহা দেখতে নিশ্চয়ই তার তত ভাল লাগেনি। কমলার ইতিহাস জ্ঞান তখন সেইটুকুই ছিল যতটা ম্যাট্রিকের সময় থাকে। আমাদের পুরো দলটার অনারারী পথ-প্রদর্শক আমাকে হতে হলো। আমি ছোটখাটো লেকচার দিতে দিতে প্রতিটি গুহা দেখাতে লাগলাম। এইরকমভাবে যে মানুষ তার কর্তব্যে রত, সে কমলার দিকে কি করে নজর দিতে পারত? কমলার এই অভিযোগ হওয়াটা খুবই ন্যায্য যে, যাব সঙ্গে আমি এতদূরে এলাম, সে আমার খোঁজও রাখে না।

বৌদ্ধ গুহাগুলি দেখার পর আমরা ব্রাহ্মণিক গুহাগুলি দেখতে গেলাম। পাহাড় কেটে তৈরি করা বিশাল কৈলাশ মন্দিরগুলি অবাক হয়ে গর্বের সঙ্গে দেখলাম। এরপর এলো জৈন গুহাগুলির পালা। ড· উদয়নারায়ণ, পণ্ডিত বলভদ্র মিশ্র, বাচস্পতি পাঠক, আনন্দজী, ভগবতীপ্রসাদ বাজপেয়ী, ড· কেশরীনারায়ণ শুক্ল এমন সব ব্যক্তি দলে ছিলেন যাঁদের সঙ্গে এই জায়গাগুলি দেখায় আনন্দ ছিল। ফেরার সময় আমরা খুলদাবাদ (স্বর্গপুরী) এলাম। সম্ভবত ঔরঙ্গজেবই এই নাম দিয়েছিলেন। যেসময় দক্ষিণের দেশীয়

---

[1] কমলা পাহাড়ী মেয়ে বলে লেখক তাঁকে *পার্বতীবালা* বলে রঙ্গপূর্ণ সম্বোধন করেছেন।—স·ম·

রাজ্যগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে মুঘল সাম্রাজ্যের অগ্রগতির জন্য ঔরঙ্গজেব তাঁর শাসনের অর্ধেক বছর এখানে ব্যয় করতেন, হতে পারে তখন এই জায়গা স্বর্গপুরী ছিল। কিন্তু এখন তো বেশির ভাগই ভেঙে পড়া আর শ্রীহীন বাড়িঘর চোখে পড়ছিল। ঔরঙ্গজেব এখানেই মারা যান আর খুলদাবাদে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। সেখান থেকে আমরা দেবগিরি (দৌলতাবাদ) গেলাম। দক্ষিণের দুর্গগুলির মধ্যে এটিকে অজেয় মনে করা হতো। গোলকুণ্ডার মত এখানেও একটি আলাদা পাহাড়ের চারদিকে বিশাল নগরী স্থাপিত হয়েছে। সেই নগরীর ধ্বংসাবশেষ দূর দূর পর্যন্ত পাওয়া যায়। কিন্তু দেখার মত অট্টালিকা পাহাড়ের ওপরে অথবা তার পাশে আছে। ফটকের ভেতর দিয়ে আমাদের দল মিনারের কাছে পৌঁছল, তারপর পাহাড়ে চড়তে লাগল। সেখানকার অট্টালিকাগুলি দেখে ফেরার পর পুরনো শুকিয়ে যাওয়া জলকুণ্ডের পাশে হাজার থামের মসজিদ দেখলাম। ছশো বছর আগে মন্দির থেকে একে মসজিদে পরিবর্তিত করা হয়েছিল, আর এখন আটমাস হলো এখানে ভগবতী বিরাজ করছিলেন। পূজারীও কাজে লেগে গিয়েছিলেন। আমাদের সঙ্গীরা খুবই ঔৎসুক্যের সঙ্গে ভগবতীদর্শন করলেন। ঔপন্যাসিক ও কবি পণ্ডিত ভগবতীপ্রসাদ বাজপেয়ী তো কিছুক্ষণের জন্য দ্বারপাল হতেও রাজি হলেন, যখন আমি ফটো নিলাম। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মন্দির আর তারপর মসজিদ আর আবার ১৯৪৯-এ মন্দির—পরিবর্তন তো শেষমেশ সংসারের নিয়ম। দেবগিরির এই পাহাড় আরো কত পরিবর্তন দেখে থাকবে। মুহম্মদ তুঘলক একে দৌলতাবাদ বানিয়ে তার ভাগ্য খুলে দিতে চেয়েছিল। দিল্লীকে ধ্বংস করে সে এখানে নতুন দিল্লী স্থাপন করতে চেয়েছিল। লোক তাকে খ্যাপা -পাগল বলত কিন্তু এতে পাগলামির কোনো ব্যাপার ছিল না। সে জানত আর দেখেও ছিল যে, রাজধানীকে যদি রাজ্যের এক প্রান্তে রাখা হয়, তাহলে দক্ষিণে আমি আমার অধিকার কায়েম রাখতে পারব না। এই দূরত্বের জন্য এখানে বাহমনী রাজ্য তৈরি হয়েছিল। তারপর তার জায়গায় পাঁচটি রাজ্য এসে জড়ো হয়েছিল যারা শাহজাহান আর ঔরঙ্গজেবকে নাজেহাল করেছিল।

বড় রাস্তার ধারে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজন হলো। সন্ধে পর্যন্ত আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরতে লাগলাম। ঔরঙ্গাবাদ ফিরতে রাত হয়ে গেল। ধর্মশালায় কোনোরকমে কেটে গেল। বাইরে দোকান অনেক ছিল, খাবার কোনো অসুবিধে ছিল না, কিন্তু আমাদের দেশে এখনও পায়খানার দিকে দৃষ্টি দেবার কোনো দরকার আছে বলে মনে করা হয় না। যতদিন না আমাদের পায়খানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের সভ্য ও সংস্কৃতও বলা যাবে না, এটাও নিশ্চিত।

অজিণ্ঠা (অজন্তা)—১৯৪৯-এর আজ ছিল শেষ তিথি আর দিনটা ছিল শনিবার। অজিণ্ঠা যাওয়া-আসা করতে নিজেদের লোকেদের জন্য আমি একটা বাস ঠিক করে নিয়েছিলাম। পুরো বাসটা যদি নিজেদের হাতে থাকে আর সঙ্গীরা সবাই সহৃদয় ও সমধর্মী হয়, তবে দশ-বিশ কেন শত শত মাইলের যাত্রাও আনন্দ-উপভোগ করে করা যায়। আমাদের বাসটা ছিল ডিজেল ইঞ্জিনের। ইঞ্জিন অথবা মোটর যত্নে রাখা হলে তাকে বহুদিন পর্যন্ত

ভাল অবস্থায় রাখা সম্ভব, বেকার ফেলে রাখলে তা খারাপ হতে দেরি লাগে না। এই গাফিলতির জন্যই আমাদের বাসের গতি মন্দ ছিল। সওয়া আটটার সময় আমরা অজন্তা রওনা হলাম। ৫৮ মাইল দূরত্বে অজিণ্ঠা গ্রাম অবস্থিত, যেখান থেকে সাত মাইল দূরে অজিণ্ঠা লেণ্যা—বেরুঢ় ছিল ১৮ মাইল দূরে। গতি মন্দ হওয়ায় বিরক্ত লাগছিল। পথে রাস্তার ধারে অনেক গুলি গ্রাম পড়ল। হায়দ্রাবাদ রাজ্যে ৯০ শতাংশেরও বেশি হিন্দু থাকে, কিন্তু মুঘল আমল থেকেই এখানকার প্রতিটি মুসলমান হিন্দুদের অর্ধদাস মনে করে এসেছে। সেই যুগে আমি কয়েকবারই এখানে এসে দেখেছি। এখন দেখছিলাম, কাশিম রিজবীর সময় যেসব মুসলমান সিংহের মত গর্জন করছিল, এখন তারা ভেজা বেড়াল হয়ে গিয়েছিল। এটা সদ্য সদ্য ঘটেছিল, তাই আগের অবস্থা থেকে নতুন অবস্থায় আসতে গিয়ে তারা নিজেদের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। কিছু সময় লাগবে তারপর তারা বুঝতে শুরু করবে, এই মাটির আমরাও একইরকম অধিকারী, যেমন এখানকার হিন্দু। এখানের প্রতিটি জিনিসকে তাদের মত আমাদেরও নিজের মনে করা উচিত এবং এখানের প্রতিটি কীর্তির জন্য আমাদের গর্ব হওয়া উচিত। এগুলি কাফেরদের স্মৃতিসৌধ আর এগুলি ম্লেচ্ছদের এই মনোভাব থেকে মুক্ত হয়ে সকলের হৃদয়ে একতা অবশ্যই আসবে, কিছুদিন সময় তাতে লাগলেও।

অজিণ্ঠা গ্রামটি একটা বেশ বড় বসতি। এর কিনারায় প্রাচীর আছে। বাজারও আছে। পাশের নদীটিতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে যাতে গরমেও জল পাওয়া যায়। একসঙ্গে বাজরা আর গমের ফসল হয়েছিল। বস্তুত হায়দ্রাবাদ যথেষ্ট দক্ষিণে অবস্থিত এবং উত্তরের ঋতুর তারতম্য এখানে কম পাওয়া যায়।

গ্রাম থেকে এগিয়ে গিয়ে আমাদের বাস লেণ্যার কাছে এগারোটার সময় পৌঁছল। অজন্তা পর্যন্ত নতুন রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। গুহাগুলি দেখতে আমাদের আড়াই ঘণ্টা লাগল। চিত্রগুলি বিশেষভাবে দেখা হলো। উত্তরে জেলগাঁও স্টেশনে নেমেও অজন্তা যাওয়া যায়, তবে হায়দ্রাবাদ থেকে যারা আসে তাদের জন্য এই রাস্তাই ঠিক। জেলগাঁও এখান থেকে মাত্র ২৫ মাইল। গুহাগুলি দর্শন করার পর আমরা রাস্তার পাশে বসেই মধ্যাহ্নভোজন করলাম। সব জিনিস আমাদের সঙ্গে ছিল। আগে এমন ছিল না। এবার তো মনে হচ্ছিল, অজন্তায় রোজই দর্শকদের একটা ছোটখাট মেলা লেগে থাকে। প্রথমবার আমি ১৯২৯ সালে এসেছিলাম। সেইসময় তখনও এই জায়গা নির্জন জঙ্গলের মত দেখাত। ১৯৩৩ সালেও তার থেকে ভাল অবস্থা দেখিনি, কিন্তু ১৬ বছর পর এবার চেহারাই পাল্টে গেছে মনে হচ্ছিল। অজন্তা আমাদের দেশের গর্ব। কিন্তু এই গর্বকে আমরা শুধু নিজেদের মধ্যে সীমিত রাখতে পারি না। সেটা এর থেকে জানা যায় যে, ১৯৫৫ সালে চীন অজন্তার পঞ্চদশ শতাব্দী পালন করেছে। চীনা গণরাজ্য তাদের চিত্রকলায় অজন্তার ঋণ স্বীকার করে। তার প্রতি নিজেদের সম্মান জ্ঞাপনের জন্য এই উৎসব করেছিল। সেদিকে ভারতের এখনও দৃষ্টিই যায়নি। সত্যিই এই খবর শুনে আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম যে, আমরা ঘুমিয়ে থাকলাম আর অজন্তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে চীন এগিয়ে গেল। ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত সমস্ত দেশকে অজন্তা

একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। জাপানের প্রাচীনতম মন্দির হোরিওজীর বোধিসত্ত্বর ছবি দেখে সবাই অজন্তার কথা মনে করে।

খাওয়ার পর আমরা বাসে বসলাম। বেনারসের বাসিন্দা অথচ তার পানের প্রতি প্রেম থাকবে না এ অসম্ভব। বাচস্পতিজী একজন পাক্কা বেনারসী। তাঁর বড়মতন পানের ডিবা সবসময় পানের খিলিতে ভরা থাকে। এখানে তার ভেতরে বেনারসী পান কি করে থাকবে? যাকে বেনারসী পান বলা হয় তা আসলে মগহী পান। কিন্তু অপরের জিনিসে নিজের ছাপ লাগাতে বেনারস খুব ভাল জানে। রেশম কোথা থেকে এলো, আর তার নাম হয়ে গেল বেনারসী রেশম (কাশী সিল্ক)। পালি গ্রন্থে যখন আমি কাশী চন্দন-এর উল্লেখ দেখলাম, তখন আমার মনে হলো, সুদূর দক্ষিণ থেকে চন্দন নিয়ে এসে বেনারস তার ছাপ লাগিয়ে থাকবে। আমার এই ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত হলো, যখন ছাপরা জেলার মাঝি গ্রামে জংলী চন্দনের কিছু চারা দেখি আর একথা মানতে বাধ্য হতে হয় যে, কাশীর মাটিতেও চন্দন জন্মাত। বেনারসের না হলেও আমি কাশী জনপদেরই সন্তান। আর এই জনপদের গ্রামগুলিতে ভালজাতের পান খেয়ে আমার এও বিশ্বাস হয়ে গেল যে, কাশীই তাম্বুল-বিলাসের আদিভূমি। পানের সঙ্গে তো আমার শত্রুতা থাকতে পারে না, তবে খাবার সুযোগ নমাসে-ছমাসে হতো। ভাল পান পেলে খেয়ে নিতাম, বাজে পান খাওয়ার ইচ্ছে হতো না। নমাসে-ছমাসে পান খেতাম বলে প্রায়ই খিলিতে কখনও বেশি চুন থাকত আর মুখ পুড়ে যেত। তারপর নিষ্ফল অপরাধ স্বীকার করে পস্তাতে থাকতাম। ভাবতাম, কেন আমি এটা খাই? সেদিন অজন্তায় খাওয়ার পর আরাম করে বাসে বসে আমি বললাম, 'পাঠকজী, পান।' পাঠকজী আমার হাতের দিকে তাঁর ডাব্বা বাড়িয়ে ধরলেন। আমি ওপরের খিলিটা মুখে পুরলাম। মুখের ভেতর চিড়চিড়ানি মনে হলো। আমি পাঠকজীকে বললাম, 'চুন কি বেশি লাগিয়ে দিয়েছেন? পাঠকজী ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'ওপরের পানটা নেননি তো?' সত্যিই আমি ওপরের পানটাই নিয়েছিলাম, আর নিয়মানুসারে আমার তাই করা উচিত ছিল। কিন্তু যতক্ষণে পাঠকজী 'হাঁ হাঁ' করে উঠেছেন, ততক্ষণে শুধু চুন দেওয়া সেই পান আমার দাঁতের নীচে পড়ে চর্বিত হয়ে গেছে, আমার সমস্ত মুখ চুনে ভরে গেছে। থুথু ফেললে আর কি হবে? চুন তো তার নিজের কাজ করে ফেলেছে। অল্পবিস্তর পুড়লে নারকেল খেলে বা অন্য কোনো উপায়ে কিছু ত্রাণ পাওয়া যেত। এখন এক সপ্তাহের জন্য নোনতা, মশলা-মরিচ দেওয়া খাবার নিষিদ্ধ হয়ে গেল। ভাল মাংস রান্না হতে দেখে একদৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকতে হতো। মশলাদার আলু দেখলে নিজের সেদিনের মূর্খামির জন্য রাগ হতো। আমি ঠিক করে ফেললাম এবার আর পান খাব না। এই নিয়ম ছবছর ধরে পালন করে আসছি। কোনো ধর্মীয় পালন তো ছিল না যে মানতে আমি বাধ্য, কিন্তু কোনো কিছু ঠিক করে নিলে আমার কাছে তা সেরকমই হয়ে যায়। তার থেকেও বেশি এও মনে হয় যে, নমাসে-ছমাসে খেলে আবারও মুখ পুড়বে।

রাত হয়ে গিয়েছিল। সাড়ে আটটার সময় আমরা ঔরঙ্গাবাদ পৌঁছলাম। আধঘন্টার মধ্যে আমাদের মনমাড়-এর গাড়ি ধরার ছিল। খুব ভিড় ছিল। ১৯৪৯ সাল শেষ হবার

আধঘণ্টা পরে আমরা মনমাড় পৌঁছলাম। তিনটের সময় নাগপুর এক্সপ্রেস পেলাম। আমাদের লোকবলের জন্য তাতে আমরা চড়তে পারলাম। চড়ার সময় কুলি এসে একটা বিছানা রেখে বলে গেল, 'এটা আপনাদের সঙ্গীর।'

এই বছরের কাজের মধ্যে 'ঘুমক্কড় শাস্ত্র', 'আজ কী রাজনীতি' আর পরিভাষা রচনা মুখ্য ছিল। প্রথম দুটি বই লেখার পর প্রকাশিতও হয়ে গিয়েছিল। 'মধুর স্বপ্ন' ২৬ অধ্যায় পর্যন্ত লেখা হয়েছিল, আর 'দার্জিলিং পরিচয়'-এরও কিছু অধ্যায় তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সংবিধানের অনুবাদে অনেক সময় লেগেছিল। সব মিলিয়ে বছরটা ব্যস্ততার জীবন নিয়ে কাটল

নীড়ের খোঁজে

১৯৫০ সালের প্রথম দিনের সকাল বোম্বাই-এর সীমার ভেতরে হলো। আনন্দজী ড· কেসরীনারায়ণ, আমি আর কমলা দ্বিতীয় শ্রেণীর একই কামরায় ছিলাম। সওয়া দুটোর সময় দিনের বেলায় আমরা ওয়ার্ধা পৌঁছলাম। হিন্দি নগরে দু-আড়াইদিন থাকার ছিল। মনমাড়ে যে হোল্ডলটা কুলি রেখে গিয়েছিল আর শীলভদ্রজী যেটা খুব যত্ন করে উঠিয়ে এনেছিলেন, এখানে এসে সেটার খোঁজ করার কেউ ছিল না। খুলে দেখায় তার ভেতর স্লিপার, গাউন, একটা লাল শাড়ি আর কিছু কাপড় পাওয়া গেল। তার ওপর জি· এস· লেখা ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের ৪০ কোটি লোকের মধ্যে 'জি· এস·'-এর খোঁজ কি করে পাওয়া যেত? খোঁজ করার মত কোনো সংকেত সেখানে ছিল না। আন্দাজে এটুকু বলা যেত যে, এই হোল্ডলটা কোনো গুজরাটী মহিলার। এটা কার হাতে সঁপে দেওয়া যায় তার চিন্তা শীলভদ্রজীর করার কথা।

ওয়ার্ধা—যদিও আগে অনেকবারই সেবাগ্রাম দেখেছি, কিন্তু সঙ্গে যদি নতুন বন্ধু থাকে, তবে তার সঙ্গে গান্ধীজীর আশ্রম দেখতে যাওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। ২ জানুয়ারি পণ্ডিত চন্দ্রশেখর বাজপেয়ী, হর্ষবর্ধনজী (এলাহাবাদ) আর কমলাকে নিয়ে আমি সেবাগ্রাম পৌঁছলাম। চারমাইলের যাত্রা টাঙ্গায় পৌনে ঘণ্টায় পুরো করলাম। টাঙ্গাওলা একটা বড় গূঢ়তত্ত্ব জানাল। পথে মহিলা আশ্রম পড়ল। আমাদের মত ভদ্রলোকদের মুখ থেকে অশুদ্ধ নাম শুনে সে কি করে চুপ করে থাকে? মহিলা আশ্রমের নির্বাচন করতে গিয়ে সে জানাল, 'বাবুজী, এখানে স্ত্রীলোকরা থাকে, নিজের হাতেই ময়লা (পায়খানা) পরিষ্কার করে নেয়, তাই এর নাম 'ময়লা আশ্রম'। সত্যিসত্যি স্বপ্নেও আমাদের আসল কথাটা জানা সম্ভব ছিল না। যাদের আমরা অশিক্ষিত, অসভ্য মনে করি, তারাও কখনও কখনও লাখটাকার কথা বলে ফেলে। আমি তো বাইরের লোক ছিলাম, মহিলা আশ্রমের কর্ত্রী

শান্তাবেনেরও আসল রহস্য জানা ছিল না। গান্ধীজীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত লোকেরা আশ্রমে ময়লা পরিষ্কার করার কাজ করেই থাকে, তাই তাদের জন্য এর থেকে উপযুক্ত নাম আর কিছু হতে পারত না। এইসময় সেবাগ্রামে আন্তর্জাতিক শান্তিপরিষদ চলছিল যে, কারণে ব্যস্ততা ছিল। গান্ধীজীর থাকার ঘরগুলোতে সাইন বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একজন আশ্রমবাসী দর্শকদের পথ-প্রদর্শন করতে করতে তাঁর সম্বন্ধে জানাচ্ছিল। এখন তাঁর পরিচয় সাদা-সিধে কথায় হচ্ছিল, কীর্তিকাহিনী তৈরি হতে এখনও কিছু দেরি ছিল। একশো বছর পরে তাঁর পরিচয় সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত রূপে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, তবে তা তখনই হবে, যদি ভারত সাম্যবাদী না হয়। সাম্যবাদী হবার অর্থ এই নয় যে, গান্ধীজীর আশ্রমকে ভুলে যাওয়া হবে। রাশিয়ায় তলস্তয়ের ইয়াস্নইয়া পোত্যার বিষয়ে আমরা জানি, যেখানে মহান লেখক ও মহান শান্তিপ্রচারক তথা গান্ধীজীরও গুরুদের মধ্যে একজন তলস্তয়ের প্রতিটি জিনিস সুব্যবস্থিত রীতিতে রাখা হয়েছে। লোক তীর্থ মনে করে তা দেখতে আসে।

বাইরে ঝুপড়ির বাইরে এক জায়গায় ছাঁচে ঢালা একই রকম পাঁচটি মূর্তি চোখে পড়ল। প্রত্যেকের পেশীগুলো গোনা যেত, আর সকলের পেট আর পিঠ সেঁটে গিয়ে এক হয়ে গিয়েছিল। এঁরা গান্ধীজীর পার্শ্বচর ছিলেন। জাপানী জোদো সম্প্রদায়ের একজন ভিক্ষুকে পেলাম। তিনি বুদ্ধ ও গান্ধীর সমন্বিত শিক্ষার প্রচার করতে চাইতেন। ফেরার সময়ে আমরা মহিলা আশ্রমে গেলাম আর শান্তাবেনকে টাঙ্গাওলার ব্যাখ্যা শোনালাম। পরের দিন নটার সময় আবার মহিলা আশ্রমে ভাষণ দেবার জন্য যেতে হলো।

আনন্দজী আগেও কখনো কখনো এক জায়গায় খুঁটিতে বাঁধা থাকার অভিযোগ করতেন, কিন্তু এখন তিনি বেশি উদাসীন ছিলেন। প্রয়াগের সম্মেলনের কর্ণধার কখনো কখনো দলাদলির জন্যে তাঁর প্রতি কিছু ব্যাঙ্গোক্তি করে বসতেন। আনন্দজী ভাবতেন—যদি স্বাধীন থাকতাম তাহলে চারটে খুঁটিই জমিদারিতে থাকত, দেশবিদেশে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম। এখানে কাজের দায়িত্ব পালন করার পরেও এই সব শুনতে হচ্ছে। তিনি ইস্তফা-পত্র দেবার কথা ভাবছিলেন। ভাড়ার একটি দরিদ্র কুঠরি থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি আজ এক বিশাল সংস্থা হয়ে গিয়েছিল। হিন্দিনগরকে সত্যি সত্যি একটা শহরের মত মনে হতো। তার কর্মীদের জাল সমস্ত ভারতে ছড়ানো ছিল। এতটা সফলতা কোনো একজন ব্যক্তির কারণে হওয়া সম্ভব নয়, এ কথা ঠিক, সবচেয়ে বড় কারণ ছিল সময়ের দাবি। হিন্দির এখন সময় এসে গিয়েছিল তাই তার কাজ হাতে নিয়ে যে সংস্থা এগোচ্ছিল, তাদের জন্য খুব সুবিধে হয়েছিল, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে সংস্থাকে রোপন করা এবং তাতে জলসিঞ্চন করে বড় করা, ক্রমবর্ধমান কর্মীসংখ্যাকে একত্র করে চলা, নতুন নতুন সহায়ক ও বন্ধু লাভ করা, এই সমস্ত কাজ যোগ্য ব্যক্তিই করতে পারে। তাই রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির এতখানি উন্নতিতে আনন্দজীর সবচেয়ে বেশি ভূমিকা ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আরো বেশি একথা চিন্তা করে এর কৃতিত্ব আনন্দজীকে দেওয়া উচিত যে, গান্ধীজী এই চারাগাছ লাগিয়েছিলেন আর অল্পদিন পরে হিন্দি-হিন্দুস্তানীর বিবাদ নিয়ে তার বিরোধী হয়ে যান। তিনি তাঁর উদারতা দিয়ে

সমিতির ক্ষতি করতে চাননি, কিন্তু চেলা তা করতে কখনো দ্বিধা করেননি। এই সমস্ত বিরোধ সত্ত্বেও আনন্দজী গান্ধীজীর চেলাদের দুর্গে থেকেছেন—জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে শত্রুতা করেছেন, এবং অনায়াসে এগিয়ে গেছেন। আমি তাঁকে একথা বললাম, যতক্ষণ না তেমন পরিস্থিতি উৎপন্ন হয় ততক্ষণ ইস্তফা-পত্র দেওয়া উচিত নয়। আর তেমন পরিস্থিতি যখন উৎপন্ন হবে তখন এক মিনিটের জন্যও থাকা ঠিক হবে না।' সমিতির কাজকর্ম অনেক বেড়েছিল, কিন্তু দুটি অভাব আমার খারাপ লাগছিল। প্রথমত, সমিতির একটা ভাল প্রেস হওয়া উচিত। যতক্ষণ মোনোটাইপ না হয় ততক্ষণ ভাল প্রেস হতে পারে না। আর দ্বিতীয়ত যেটা, জরুরি তা হলো, সমিতি আন্তঃপ্রাদেশিক শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির আদান-প্রদানের মাধ্যম হোক। হিন্দির মাধ্যমে সে ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক আর বিদেশি ভাষাগুলিকেও আমাদের দেশের মানুষের সামনে আনুক। এই দুটি জিনিসেরই একে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, কারণ এইসব রচনার সুন্দর প্রকাশ ততদিন হওয়া সম্ভব নয় যতদিন না কাজ মোনোটাইপে হয়। সমিতির পরীক্ষাগুলিতে লক্ষ লক্ষ ছাত্র পরীক্ষায় বসে। তাদের জন্য পাঠ্যপুস্তক সমিতিই ছাপে। এক-একটি বইয়ের কুড়ি-ত্রিশ হাজার করে মুদ্রিত হয়। কম্পোজ করা হয় কম আর ছাপা হয় বেশি আর দুটো শিফ্‌টেও কাজ শেষ করা মুশকিল হয়। আমাকে আনন্দজী প্রকাশনার জন্য যোজনা তৈরি করে দিতে বললেন। আমি আগেই ভেবে রেখেছিলাম, তাই সেদিন কাগজে লিখে দিতে কোনো অসুবিধে হলো না। ১· হিন্দি-হিন্দি, হিন্দি-বিদেশী ভাষা, হিন্দির শব্দকোষ ছাপা হোক, ২· দেশী-বিদেশী ভাষাগুলির হিন্দি-মাধ্যমে 'স্বয়ং শিক্ষক' তৈরি করা হোক, তার সঙ্গে ব্যাকরণও থাকুক। ৩· হিন্দি ও অন্য ভাষাগুলির সাহিত্য-ইতিহাস প্রকাশিত করা হোক, ৪· হিন্দি, প্রাদেশিক ভাষা ও বিদেশী ভাষাগুলির হিন্দি অনুবাদের সঙ্গে কবিতা-সংগ্রহ, ৫· দেশী-বিদেশী গ্রন্থ-সম্পদগুলির থেকে প্রত্যেক ভাষায় তিনটি করে বইয়ের অনুবাদ হিন্দিতে করা হোক। এই কাজ শুরু করার জন্য ৫০ হাজার টাকার পুঁজিই পর্যাপ্ত, যা সমিতির সামর্থের বাইরে নয়।

দুপুরের পরে আমরা ওয়ার্ধা থেকে রওনা হলাম। নাগপুরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ছটার সময় ইটারসীর দিকে যাবার প্যাসেঞ্জার পেলাম। ৪ জানুয়ারি পাঁচটার সময় এখন রাত থাকতেই আমরা ইটারসীতে পৌঁছে গেলাম। এখান থেকে প্রায় ছঘণ্টা পরে কলকাতা মেল পাওয়ার কথা। প্রাতরাশ করে আমরা কলকাতা মেলে বসলাম। আমাদের কামরায় গুজরাঁবালার এক জৈন ভদ্রলোক আর তিনজন ইংরেজ মিশনারি যাচ্ছিলেন। জৈন ভদ্রলোকটি পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে এসেছিলেন। তিনি রসায়নের এম· এস· সি· ছিলেন এবং সিন্ত্রীর সার কারখানায় কাজ করার জন্য বিশেষ পড়াশোনা করে বছরখানেক ইংল্যান্ড, আমেরিকায় থেকে ফিরছিলেন। তিনি সিন্ত্রীর পরিস্থিতিতে অসন্তুষ্ট ছিলেন, কারণ সেখানে যোগ্যতার কদর ছিল না, সব জায়গাতে সুপারিশ চলত। মিশনারিদের এক দম্পতি আসামের খাসিয়াদের মধ্যে কাজ করতে যাচ্ছিলেন। ভাষা জানতেন না, তাই দার্জিলিঙে কিছুদিন থেকে প্রস্তুতি নিতে চাইছিলেন। অপর মিশনারি মহিলা নার্সের কাজ করতে আসাম যাচ্ছিলেন। সেইসময় আমাদের দেশে আমেরিকান

গুপ্তচরদের জাল ছড়ানো ছিল এবং এখনও তা আছে। মিশনারিরা ডাক্তার নার্স আর শিক্ষক রূপে নিজেদের খুব ভালভাবে লুকিয়ে রাখতে পারে। তাই আমেরিকান মিশনারিরা যীশুর প্রেমের বার্তা দেশের প্রতিটি জায়গায় ছড়াতে চলেছে, এমনটা ভাবা উচিত নয়। তবে আমরা একথাও বলতে পারি না যে, এই প্রচারের উদ্দেশ্যে আগত প্রত্যেক আমেরিকান মিশনারি অবশ্যই জেনেশুনে গুপ্তচরের কাজ করছে। যাকে একটুও উদার দৃষ্টি-সম্পন্ন বলে মনে করে, তাকে আমেরিকান সরকার এদেশে পাঠাতে রাজি হয় না। যখন তারা জানতে পারল যে আমি রুশদেশে থাকার পর এসেছি, তখন তারা রুশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করল।

এখন ফসল কাটা হয়ে গিয়েছিল। শ্যামলিমা কম চোখে পড়ছিল। ট্রেন লেট হবার জন্য দোষ দেওয়া যেত না—সময়ের আগে পৌছে যাওয়ায় দুজায়গায় ট্রেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। এক জায়গায় ট্রেনে একজন যাত্রী মরে গেল, সে কারণেও কটনীর কাছাকাছি তা দাঁড়িয়ে রইল। কোথাও যাবার পথে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ইটারসীতে এলেন। তাঁর সঙ্গে অপ্রত্যক্ষ পরিচয় তো আমার অনেক দিনের ছিল। জাপানে একবার সাক্ষাৎ হতে হতে হয়নি। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টির সঙ্গে একমত হওয়া আমার পক্ষে কঠিন ছিল। তিনি জানতেন যে, আজ তাঁর কথা শুনতে কেউ রাজি নয়, তবুও নিজের খেয়ালে কাজ করে চলেছেন। আজকাল সামন্তদের মৃতদেহগুলো উঠিয়ে তাদের আবার ধড়া-চূড়া পরিয়ে দাঁড় করানোর যে কাজ তিনি করছেন, তা দেখে তো আরো করুণা হয়। এইসব হওয়া সত্ত্বেও রাজা মহেন্দ্র আগুনে পোড়া সোনা। আজীবন তিনি দেশের পরতন্ত্রকর্তা ইংরেজদের সামনে নত হননি। আর দেশ যদি স্বাধীন না হতো তবে আজও তাকে আমরা নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল থেকে দুনিয়া চষে বেড়াতে দেখতাম। দেশের স্বাধীনতার জন্য অদম্য বিশ্বাস, নিজের দৃষ্টি অনুযায়ী প্রচেষ্টা, ইংরেজদের প্রতি অপার ঘৃণা, আর কোনো জিনিসপত্র থাকা সত্ত্বেও বহুবার দুনিয়া পরিক্রমা করে প্রথম শ্রেণীর ভবঘুরে হওয়া—এই তিনটি গুণ তাঁর ভেতরে এত বড় ও এত বেশি মাত্রায় আছে, যে কারণে তাঁর সাতখুনও মাপা হয়।

রাত সাড়ে দশটায় আমরা এলাহাবাদ পৌঁছলাম। সেখান থেকে টাঙ্গা নিয়ে মাচবেজীর বাড়িতে গেলাম।

প্রয়াগ—৫ জানুয়ারিতে এবার প্রয়াগের কাজ দেখার ছিল। হিন্দুস্তানি অকাদেমি 'বৌদ্ধ সংস্কৃতি' ছাপবে, যদি তার থেকে কিছু অংশ কেটে-ছেঁটে দেওয়া হয়। আমি তো লিখিত বইটিকেও অপর্যাপ্ত মনে করতাম, তাই অকাদেমি না ছাপাতে আমি সেটা প্রকাশক ঠিক না করেই লা-জার্নাল প্রেসে দিয়ে দিয়েছিলাম। এখন শ্রীপরমানন্দ পোদ্দার সেটা নিয়ে নিয়েছিলেন। লা-জার্নাল প্রেস বইটি কম্পোজ করতে শুরু করেছিল। এটা ৫ জানুয়ারি ১৯৫০-এর কথা। আজ থেকে তিন বছর আগেই বই ছেপে তৈরি হয়ে গিয়েছিল, ব্লকও বানানো হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫-তেও বই অন্ধকার কুঠরি থেকে বেরিয়ে আলো দেখেনি।

পাঁচ-ছদিন প্রয়াগে থাকার ছিল, এই সময়ের মধ্যে আমি 'দার্জিলিং পরিচয়' কমলাকে দিয়ে লেখাতে শুরু করেছিলাম। এখন 'মধুর স্বপ্ন'ও লেখা শেষ হয়নি। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হতে থাকল। ড· কপিল দ্বিবেদী রামগড়ের প্রশংসা করলেন, আর মন তাতে অল্প অল্প আকৃষ্ট হতে লাগল।

৬ তারিখ রেডিওর কর্মী-বন্ধু স্টেশনে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর গান শুনতে নিয়ে গেলেন। তাঁর হাত আর গলা সেখানকার বহু গুণগ্রাহী শ্রোতাদের মত নড়ছিল না। আমার তো মনে হচ্ছিল, কোথা থেকে এই পাগলের দলে এসে ফাঁসলাম। ওস্তাদি গান আমার একদম পছন্দ হয় না। এর মানে এই নয় যে, আমি ওস্তাদদের কদর করি না, অথবা তাঁদের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। সঙ্গীতের তত্ত্বদর্শী, পারদর্শী তাঁরা। তাঁরা সঙ্গীতের গুরু। এইভাবে তাঁদের গুণের উপযোগ করা উচিত, কিন্তু গানের জন্য প্রথম শর্ত হলো মধুর কণ্ঠ, যা তাদের অধিকাংশেরই নেই। আশ্চর্য লাগে তারা নিজেদের দোষ বুঝতে পারেন না। সর্বোচ্চ সম্মান তাদের পাওয়া উচিত। জীবনের প্রয়োজনগুলি থেকে তাঁদের নিশ্চিন্ত রাখা দেশের কর্তব্য। কেন্দ্রের সঙ্গীত অকাদেমির সদস্য বানিয়ে তাঁদের আজীবন ভাল মাসিক পেনশন পাওয়া উচিত, আর সঙ্গীতের উচ্চ-বিদ্যালয়ে শিক্ষক করে দিয়ে তাঁদের কাজে লাগানো উচিত। শুধু দিল্লী নয়, প্রত্যেক রাজধানী ও বড় বড় শহরে সঙ্গীত শিক্ষণালয়গুলিকে উৎসাহ দিয়ে এইসব গুণীদের জায়গা দেওয়া উচিত। তাদের কৃতি ও কীর্তিকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এসবই ঠিক আছে, কিন্তু তাদের গাওয়া অথবা অপরকে তা শোনার জন্য বাধ্য করা হলে আমাদের গৌরবময় সঙ্গীতশিল্পের অপমান করা হয়, তার প্রতি মানুষের বিরক্তি উৎপন্ন করা হয়। সেইদিনের মত নির্লজ্জরা যদি বাহ্ বাহ্-র বন্যা বইয়ে দেয়, মাথায় ভূত চাপার মত মাথা নাড়ায়, তো তা দিয়ে ওস্তাদি গানের অপ্রিয়তা ঢাকা দেওয়া সম্ভব হবে না। সমস্ত অলংকার আর ধ্বনিকেই জড়ো করে পদ্য রচনা করলে তা ভাল কবিতা হতে পারে না। শুধু মশলা, ঝাল, টককে রান্না করে খাবার থালায় সাজিয়ে দিলে তা সুস্বাদু ভোজন হতে পারে না। সেই রকমই সঙ্গীতের নানা প্রকারের স্বর, মূর্ছনা আর গমক একত্র করে তা বৃদ্ধ গলা দিয়ে হাউমাউ করে বার করলেই তা সঙ্গীত হয়ে যায় না। এই কথাগুলি বলে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর প্রতি অসম্মান প্রকাশ করতে চাই না। তাঁর সারা জীবনের তপস্যার সম্পূর্ণ কদর হওয়া উচিত।

প্রয়াগে আমি 'দার্জিলিং পরিচয়' লেখাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম যে মাঝে আমাকে যখন অনুপস্থিত থাকতে হবে, সেই সময় কমলা সেটা টাইপ করে ফেলবে।

৭ জানুয়ারি ক্যাপ্টেন শিবপ্রসাদ সিংহ এলেন। লড়াইয়ের সময় তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে ফৌজে চলে গিয়েছিলেন। এখন তিনি কাশ্মীরে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, কাশ্মীরের সাধারণ জনতা যতই ভারতের পক্ষে থাকুক না কেন, শিক্ষিতদের মধ্যে তেমন কমই আছে। বালতিস্থানে যার এলাকা যেদিকে, সে সেখানে তার জয়োৎসব করছে। তাঁর মুখ থেকে অবাক হয়ে শুনলাম যে, শ্রীনগর থেকে কারগিল পর্যন্ত জিপ যাচ্ছে। মাঝে জোজিলা-তে বছরের মধ্যে নমাস ডাঁড়া হিমাচ্ছাদিত থাকত। এই পথে জিপ চলার কোনো সম্ভাবনাই আগে ছিল না। কিন্তু লড়াই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেয়। আমাদের

সেনার দরকার ছিল তাদের ট্যাঙ্কগুলিকে জোজিলা পার করানোর, নয়তো পাকিস্তানী সেনা আর তাদের সমর্থকের দল আমাদের সফল হতে দিত না। ট্যাঙ্ক পার হয়ে যাবার পর জিপই বা কি করে পিছনে পড়ে থাকে? এখন শীতের সময় বাদ দিয়ে সবসময় তারা কারগিলের দিকে দৌড়োয়। সমস্ত অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় সেনা কাশ্মীরে যে সাফল্য অর্জন করে তার থেকে তাদের বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যদি আমাদের আটকানো না হতো, তবে আমরা পুরো কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানীদের তাড়িয়ে দিতাম।

৮ জানুয়ারি মাচবে দম্পতীর সঙ্গে কমলাকে নিয়ে সাহিত্য-সংসদে নিরালাজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আগের থেকে একটু রোগা হয়েছিলেন, তাছাড়া তেমনিই প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। সেই কথা বলতে লাগলেন, কখনও আমাদের সঙ্গে আর কখনও নিজের মনে। সিদ্ধপুরুষ ছিলেন যে! দুটো জগতে একই সময়ে বিচরণ করাতে সমর্থ ছিলেন তিনি—কখনও জাগৃত জগতে আর কখনও স্বপ্ন জগতে। চা না খাইয়ে কি করে আমাদের ছাড়তে পারতেন? যখন আমরা চলে আসি, টাঙ্গা পর্যন্ত পৌঁছতেও এলেন। নিরালাজীকে কে পাগল বলতে পারে? যে ব্যক্তির জাগরণ আর স্বপ্নের সীমা ভেঙে গেছে, তার পক্ষে সংযম রাখা শুধু মুশকিল নয়, অসম্ভব। এ আমরা নিজেদের জাগরণ আর স্বপ্নাবস্থা দেখে বুঝতে পারি। এই সীমার উচ্ছেদের পরেও নিরালাজী কঠিন সংযম ও শিষ্টাচার পালন করেন, এটা অসাধারণ ব্যাপার। যে কোনো অপরিচিত সহৃদয় ব্যক্তি তাঁর কাছে গিয়ে কখনও নিরাশ বা অপমানিত হয়ে ফেরে না। কেউই তাঁর মানবতার প্রশংসা করে ক্লান্ত হয় না। প্রয়াগে এলে অল্প সময়ের জন্যও নিরালাজীর সঙ্গে দেখা করাটা আমি খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করি।

কপিলজী জানালেন যে রামগড়ে বার্ষিক সাত-আটশো টাকায় বাংলো পাওয়া যাবে। তাতে হয়তো ফ্লাশ অথবা পায়খানার ব্যবস্থাও থাকবে।

৯ জানুয়ারি আমার অনুজ রামধারী তার ভাইপো রামবিলাসের সঙ্গে এলো। সাড়ে তিন মাস ধরে চাকরির খোঁজে দিল্লীতে পড়ে ছিল। বাড়ির চাষের কাজে চাকরির থেকে কম লাভ ছিল না, কিন্তু সেখানে রোদ জল খেতে হয়, আর চাকরির ছায়ায় কাজ করে পয়সা পাওয়া যায়। কিন্তু এখন সে চাকরির বয়স পার করে ফেলেছিল।

১১ জানুয়ারি কিতাবমহলের হিসেব থেকে জানতে পারলাম যে, ১৯৪৯-এর মার্চে শেষ হওয়া বছরে রয়াল্টির ৫২০৬ টাকা ৯ আনা আমার পাওনা হয়েছে। এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি যে, মাসিক পাঁচশো টাকা অথবা বার্ষিক দু হাজার টাকার কমে খরচ চালানো আমার পক্ষে মুশকিল। যখন শুধু ভবঘুরেমি করতাম, তখন অকিঞ্চন থেকেও জীবন-যাত্রা চালাতে অসুবিধে হয়নি; কিন্তু এখন তো স্থায়ী নীড় খোঁজায় অসফল হলেও অস্থায়ী ঘর তো বাঁধতেই যাচ্ছি। তাই এখন খরচ স্থায়ী ছিল।

দিল্লী—১১ জানুয়ারি অনুবাদ-সমিতির কাজের জন্য দিল্লীর উদ্দেশে রওনা হলাম। সমিতির অপর সদস্য ড· বাবুরাম সাকসেনাও সঙ্গে যাচ্ছিলেন। তিনিও রামগড় পছন্দ করলেন। পরের দিন সকাল ছটার কাছাকাছি আমাদের গাড়ি দিল্লী স্টেশনে পৌঁছল। টাঙ্গা

নিয়ে আমরা ফিরোজশাহ্ রোডের উদ্দেশে রওনা হলাম। টাঙ্গাওলা ভাবছিল, আমরা পুশা রোড যাচ্ছি। তারপর কোথায় কোথায় ঘুরিয়ে সে আমাদের চন্দ্রগুপ্তজীর বাড়িতে নিয়ে গেল। দিল্লীতে এখন প্যারাটাইফয়েড রোগের প্রকোপ ছিল। চন্দ্রগুপ্তজী আর তাঁর ছোট মেয়ে অসুখ থেকে উঠেছিলেন এবং এখন বড় মেয়ে অসুখে পড়েছিল।

তিনটের সময় আমি সংস্কৃত অনুবাদ-সমিতিতে পৌছলাম। সব সদস্য মিলে একসঙ্গে অনুবাদ করা সম্ভব ছিল না। অনেকেই অল্প অল্প অংশের অনুবাদ করে এনেছিলেন, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমি প্রস্তাব দিলাম যে, পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী আর ড· মঙ্গলদেবকে অনুবাদ করার কাজের দায়িত্ব দেওয়া হোক এবং এক-চতুর্থাংশ অনুবাদ হয়ে যাবার পর তা দেখার জন্য সমিতির পরবর্তী বৈঠক ডাকা হোক। প্রস্তাব মঞ্জুর হলো।

এই যাত্রায় কমলা সঙ্গে যায়নি। সংস্কৃত সমিতির কাজ এইভাবে একদিনেই শেষ হয়ে গেল, আমাদের কিছু সঙ্গী এত তাড়াতাড়ি তা শেষ করে দিতে চাননি। ১৩ তাবিখ রাতেই রওনা হয়ে পরের দিন সকাল সাড়ে নটায আমি প্রয়াগে পৌছে গেলাম। মেলার দিন ছিল। আমরাও দুপুবের পর ত্রিবেণী গেলাম। উত্তরপ্রদেশ প্রচার শিবিরে দেখলাম, পন্তজী আর সম্পূর্ণানন্দজীর বড় বড় ফটোর সঙ্গে ইংরেজিতে তাঁদের বক্তব্য লাগানো রয়েছে। সম্ভবত সরকার মনে করছে যে মেলার সব লোকই ইংরেজি জানে, তাদের হিন্দির প্রয়োজন নেই। আমি ইনচার্জকে এর জন্য সাধুবাদ দিলাম। তিনি বললেন, ‘কি করব, ওপর থেকে ইংরেজিতে ছেপে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।’

আজ ‘লোহড়ী’ ছিল। পাঞ্জাবের এটা জাতীয় উৎসব—রাতে আগুন জ্বালিয়ে পবিবার ও বন্ধুবান্ধবদের বসা, বার্তালাপ অথবা গান গেয়ে মনোরঞ্জন করতে করতে রেউড়ী খাওয়া। অজ্ঞেয়জী সেই বাংলোতে থাকতেন, তিনি কি করে লোহড়ীকে ভুলে যেতে পারেন? এর জন্য তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কত রাত পর্যন্ত আমরা মজার মজার চুটকি বলে ও শুনে কাটিয়েছি।

সংস্কৃত প্রবাদ আছে ‘ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলী ভবন্তি’। সেই অনুসারে ডায়াবেটিসের ছিদ্র ‘দোষ’ তো আমার ছিলই, যার মধ্যে ঘা অথবা ফুসকুড়ি—ফোঁড়া খুব খারাপ জিনিস। শরীর ছড়ে-টড়ে না যায় সেদিকে আগাগোড়া নজর দিলেও চলতে-ফিরতে কোথাও না কোথাও কিছু লেগেই যায়। জানিনা, চামড়া পাতলা হয়ে গিয়েছিল কিনা, ঝট করে রক্তও বেরিয়ে আসত। ঘা লেগেই ছিল। সেই বাংলোতে একজন বাঙালী ডাক্তারও থাকতেন। তিনি পেনিসিলিনের প্রথম ইনজেকসনটা দিয়ে দিলেন, বাকি তিনটে ইনজেকসন কমলারানী দিল। লেখার সময় লেখাতে সাহায্য করে আর এমন অবস্থায় চিকিৎসক হয়ে সে আমার অনেক কাজ করতে পারে—এই ভাবনা আমাকে বাধ্য করল তাকে আমার সঙ্গে রাখতে। সেই সঙ্গে আমি এও চাইতাম যে, তাব প্রতিভা বিকশিত হবাব সুযোগ পাক, যা কালিম্পঙে হওয়া সম্ভব ছিল না। ডায়াবেটিস তো এখন আর থামার নামই করছিল না। দুঘণ্টার আগেই যখন পেচ্ছাপ শুরু হতো, তখন চিন্তা বেড়ে যেত। কিন্তু এখনও নিয়মপূর্বক ইনুসলিন নেওয়া শুরু করিনি।

২১ তারিখ হিন্দি অনুবাদ-সমিতির জন্য দিল্লী রওনা হলাম। কমলাকেও দিল্লী দেখিয়ে

দেবার ইচ্ছে ছিল। সেই ট্রেনেই শ্রীঘনশ্যামসিংহ গুপ্তও যাচ্ছিলেন। আমাদের কনস্টিটিউশন হাউস-এ ওঠার কথা ছিল কিন্তু বাচ্চাদের জন্য কিছু খেলনা ছিল, সেগুলো দেবার জন্য পথে চন্দ্রগুপ্তজীর বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। তারপর সেখানেই থেকে যেতে হলো। এখন তাঁর বাড়িতে কয়েকজন অতিথি ছিলেন, তাই খুব সংকোচ হচ্ছিল।

পরদিন (২২ জানুয়ারি) কমলাকে কুতুব দেখাতে নিয়ে গেলাম। হাওয়া চলছিল—প্রবাদ আছে 'পৌষে শীত না মাঘে শীত, যখনই হাওয়া তখনই শীত।' মাঘের শুক্লাচতুর্থীর দিন ছিল, হাওয়া চলার জন্য ঠাণ্ডা খুব বেড়ে গিয়েছিল। ঠাণ্ডা দেশের বাসিন্দা কমলাকেও দিল্লী ঠাণ্ডায় কাঁপতে বাধ্য করছিল। কুতুব মিনার, লোহার স্তম্ভ, আর পুরনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখালাম। সেখান থেকে বৌদ্ধবিহার দেখিয়ে কমলাকে আস্তানায় রাখলাম, আর চারটের সময় অনুবাদ-সমিতির বৈঠকে গেলাম। সংবিধানের হিন্দি অনুবাদ তৈরি ছিল। সমিতির সদস্যরা তার ওপরে হস্তাক্ষর করলেন। তারপর আমরা সেটা নিয়ে রাজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, যিনি ২৬ জানুয়ারি গণরাজ্য ঘোষিত করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হতে যাচ্ছেন।

২৩ তারিখ টাঙ্গা নিয়ে পুরনো কেল্লা, হুমায়ুনের কবরস্থান, নিজামুদ্দিন ইত্যাদি দেখাতে নিয়ে গেলাম। পুরনো কেল্লা শেরশাহ ও হুমায়ুনের রাজধানী ছিল। হুমায়ুনের কবরস্থান, মুঘলদের সবথেকে পুরনো কবরস্থান। এটা আকবর বানিয়েছিলেন। এই ইমারতটি খুবই সুন্দর। পাশেই শেরশাহের আমীর ইসাখাঁর কবর আছে। এর সঙ্গে সাসারামে অবস্থিত শেরশাহের কবরের খুব মিল আছে। তবে এটা তার থেকে ছোট। হুমায়ুনের কবরস্থানে এখন শরণার্থী ভর্তি ছিল। ঐতিহাসিক ইমারতটি সেই সময় পেচ্ছাপ-পায়খানায় নোংরা হয়েছিল। কিন্তু, এখন তো লাখ লাখ সংখ্যায় আগত শরণার্থীদের মাথার ওপর ছাদের দরকার ছিল। সাংস্কৃতিক রুচি আর ঐতিহাসিক সম্মানের কথা চিন্তা করার সময় পার হয়ে যাচ্ছিল না। তার ভেতরেই রান্না করার জন্য ছাত কালো হয়ে যাচ্ছিল। মৃতদের কুঠরিতে জীবিতরা থেকে অল্প সময়ের জন্য যদি আরাম করে,তো মন্দ কি?

সেখান থেকে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধিতে গেলাম। আউলিয়ার প্রতি আমার কোনো দায় ছিল না কিন্তু সেখানেই পাশে ফারসীর মহান কবি খুসরু শায়িত ছিলেন। কবির সমাধিতে ফুল দেওয়া আমার কাছে জরুরি ছিল। দিল্লী থেকে কয়েক লক্ষ লোক চলে গেছে, কিন্তু এখনও এক লক্ষেরও বেশি মুসলমান রয়েছে। নিজামুদ্দিন মহল্লা থেকেও বহু মানুষ পাকিস্তান চলে গেছে। সে সময়ও খুব চালচুলোহীন অবস্থা ছিল। খুসরু-সম্বন্ধী ফারসী বই-এর খোঁজে ছিলাম কিন্তু দু একটাই পাওয়া গেল। লোকেদের ঘর থেকে খুঁজে এনে দেবার কথা দোকানদার বলল কিন্তু এত অপেক্ষা আমি করতে পারতাম?

রাজঘাটে গান্ধীজীর সমাধিতে গেলাম। তাঁর চিতার জায়গা সেটা। তার থেকেও বেশি স্মরণীয়, যদিও শোকের সঙ্গে, এই জায়গাতেই নৃশংস হত্যাকারী অজাতশত্রুর ওপর গুলি চালিয়েছিল। এখন সেই ভবনটি প্রাইভেট সম্পত্তি, কিন্তু যে মাটিতে গান্ধীজীর রক্ত

পড়েছে, সেই মাটি বেশিদিন প্রাইভেট সম্পত্তি থাকতে পারে না। চিতা-স্থান ততটা স্মরণীয় নয়, যতটা স্মরণীয় সেই জায়গা, যেখানে বাপুর তপ্ত রক্ত ঝরেছিল, আর যেখানে তিনি অন্তিম শ্বাস নিয়েছিলেন। গান্ধীজীর স্মারক সেখানেই বানানো উচিত ছিল। আজ ইতিহাসের দাবি তাই, কিন্তু সেই জায়গাটা একজনের নিজস্ব সম্পত্তি, আর সেখানে এখন জাতীয় স্মারক বানানোর কথা ভাবা হচ্ছে না।

রাজঘাট থেকে আমরা জামা মসজিদে গেলাম, তারপর লাকেল্লাতেও পৌছলাম। কিন্তু সেখানে ভেতরে যাবার জন্য লোকেদের লম্বা কিউ লেগেছিল, একঘণ্টা কে অপেক্ষা করবে? আমি তো ইংরেজ আমলেই একবার লালকেল্লাতে গিয়েছিলাম, তারপরে কিউ-এর জন্য আর কখনও যেতে পারিনি।

মথুরা—তিনদিন পরেই দিল্লীতে ভারতের গণরাজ্য হবার কথা ঘোষিত হওয়ার ছিল। সেই সময়ের জন্য এখানে খুব প্রস্তুতি হচ্ছিল। কিন্তু আমার দিল্লীর কাজ শেষ হয়েছিল, এই হইচই আর ভিড়ে চাপা পড়তে আমি রাজি ছিলাম না। ২৩ তারিখ রাত একটার সময় আমরা মথুরা পৌছে গেলাম। টাঙ্গাওলাকে বললাম আমাদের কোনো হোটেলে নিয়ে যেতে, সে আমাদের গ্রিন হোটেলে নিয়ে গেল। আমাদের মত মামুলি লোকের জন্য এই হোটেল খুলেছিল। মথুরাতে পরিচিতও ছিল, কিন্তু সেই রাতে কাউকে কষ্ট দিতে চাইনি।

২৪ সকালে প্রাতরাশের পরে বৃন্দাবনে গেলাম। কমলা সেখানকার মন্দিরগুলি দেখল আর একটা কৃষ্ণও কিনল। সাধুরা হরিদ্বার-কুম্ভের জন্য তৈরি হচ্ছিল, যা শুরু হবে ১ ফেব্রুয়ারি। পাণ্ডা দেখানোর জন্য খুব পীড়াপীড়ি করছিল। আমি বললাম, 'মিথ্যে বৃন্দাবন কেন দেখাচ্ছো? বৃন্দাবন-মথুরার মাঝখানে তো যমুনা পড়ত। এটা তো কোনো গৌড়ীয় সাধুর ফাঁদ।' গোবিন্দরাজ আর রঙ্গজীর মন্দির দেখার পর আমরা ফিরে এলাম। পথে কিড়লার গীতা-মন্দির ও রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের কীর্তি প্রেম মহাবিদ্যালয়ও পড়ল। শ্রীপ্রভুদয়াল মিত্তলকেও খুঁজে বার করলাম। তিনি তাঁর কাছে চলে আসার জন্য খুব অনুরোধ করলেন, কিন্তু একটা রাতের ব্যাপার তাই সেখানেই রইলাম আর সন্ধেবেলা খাওয়াটা মিওলজীর বাড়িতে করলাম। আর একটি দর্শনীয় স্থান ছিল মিউজিয়াম, কমলাকে সেটা দেখালাম।

আগরা—তাড়াতাড়িতে ঠিক করার জন্য বন্ধুদের কোনো চিঠি দেওয়া সম্ভব হয়নি। খাওয়ার পর বোম্বাই মেল ধরলাম এবং একটার কাছাকাছি রাজামণ্ডী স্টেশনে নেমে গেলাম। প্রথমে খোঁজ করে শংকর হোটেলে চলে গেলাম, সেখানে দৈনিক ৬ টাকায় ভাল ঘর পাওয়া গেল। সবার আগে এখানের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখা এবং দেখানো দরকার। টাঙ্গা নিয়ে আমরা তাজমহল গেলাম। এই সময় মেরামত হচ্ছিল। তাজের পরিবেশ সৌন্দর্যময়, ইতিহাস যদি নাও জানা থাকে তবুও তা দেখার আনন্দ কম হয় না। ফিরে এসে কেল্লাও দেখলাম। জাহাঙ্গীর-এর মহল থেকে অনেক বেশি আড়ম্বর তার পুত্রের মহলের। সম্পূর্ণ শ্বেতপাথরের মোতি মসজিদও দেখলাম। দীবান-খাস-এর সামনে এক

ইংরেজের কবর শোভা নষ্ট করার জন্যই যেন রাখা হয়েছিল। দুপুরের পরে শ্রীপদ্মসিংহ কমলেশ, ডা· সত্যেন্দ্র আর শ্রীমহেন্দ্রজীর সঙ্গে দেখা হলো। আমরা পরের দিনই রওনা হতে চেয়েছিলাম কিন্তু আগ্রার বন্ধুদের অনুরোধ ২৭ জানুয়ারির রাতের গাড়ি ধরা স্থির করলাম।

২৬ জানুয়ারি ছিল স্বাধীনতা দিবস। আজ ১৫ শতাব্দী পরে আমাদের দেশে আবার গণরাজ্য স্থাপিত হতে চলেছিল। প্রাচীন গণরাজ্য দু-একটি জেলায় ছিল, আর এখন সারা দেশ গণরাজ্যে পরিবর্তিত হচ্ছে। একটা ব্যাপার অবশ্য খারাপ লাগছিল যে, আমাদের দেশে তো গণরাজ্য আছে কিন্তু আমাদের দেশ এমন রাজ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যার প্রধান হলো রাজা-রানী। সকালে মুরারিলাল খত্রী বালিকা কলেজে ড· কিরণকুমারী গুপ্তার অনুরোধে পতাকা উত্তোলন করতে হলো আর একটা ছোটমতন ভাষণ দিতে হলো। এখন সেটা এফ· এ· পর্যন্ত ছিল, কিন্তু কিছুদিন পরেই ডিগ্রি কলেজ হবে। ড· কিরণকুমারীর কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, অনেক মহিলাই বিবাহপ্রথার বিষয়ে বই লেখার দায়িত্ব নিয়েছিল কিন্তু তা ভালভাবে সম্পূর্ণ করে প্রকাশিত করার কৃতিত্ব কেবল কিরণজীর। ছাত্রীদের সংখ্যা সাড়ে সাতশো। বোঝা যাচ্ছিল যে, নারী শিক্ষার ওপর এখন কত বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে। মধ্যাহ্নভোজন কমলেশজীর বাড়িতে হলো, তারপর কারে ফতেপুর-সিক্রির উদ্দেশে রওনা হলাম। সিক্রি আগেই দেখেছি এবং তার সম্বন্ধে লিখেছিও। এবার তো বিশেষ করে কমলাকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। দীবানখাস, যোধবাই-মহল দেখলাম। তুর্কি বেগমের শুকনো ঘাসের ঝুপড়ির নমুনায় বানানো ছোট্টমতন সুন্দর কামরাটি দর্শনীয় ছিল। বুলন্দ দরওয়াজার মসজিদ সংলগ্ন কুয়োয় স্নান করার কথা শুনে আমাকে সন্দেহ প্রকাশ করতে দেখে এক বুড়ো তাতে লাফ দিয়ে দেখাল। সিক্রি গ্রামের রাস্তার ওপর লাল পাথরের দরজা বানিয়ে সেখানকারএক ডাক্তার ১৯৪৭ সালে নিজের মূর্তি স্থাপন করিয়েছিল। নিঃসন্তান পুরুষের এইভাবে অমর হবার আকাঙ্ক্ষা নিন্দনীয় নয়। সিক্রির বাজার আজকের জন্য খুব সাজানো হয়েছিল। খুব ধুমধামের সঙ্গে শোভাযাত্রাও বেরোল। সাড়ে পাঁচটার সময় আমরা আগ্রার প্রস্তুতি দেখার জন্য ফিরে এলাম। লোকেদের মধ্যে কোনো উৎসাহ টের পাওয়া যাচ্ছিল না। উৎসাহ হবেই বা কি করে? ইংরেজদের আস্তে করে সরিয়ে দিয়ে কালো সাহেব তাদেরই আসনে বসে পড়েছে। তাদের প্রতিদিনের অযোগ্যতা আর ভ্রষ্টাচারে মানুষের ঘৃণা বেড়েই চলেছে। প্রতিটি জিনিস দুর্লভ আর দামী, আর সর্বত্র চোরাবাজারী। চব্বিশ ঘণ্টা মানুষ যেখানে এইসব ব্যাপারই দেখছে, সেখানে মানুষের মনে উৎসাহ কি করে আসবে? খুব কম জায়গায় রাতে দীপমালা সাজানো হয়েছে। বাজনা অবশ্য সমানে বাজছিল। দোকান সব খোলা ছিল।

২৭ জানুয়ারি কানপুরের উদ্দেশে রওনা হবার ছিল, তাই সকালে হোটেল ছেড়ে দিয়ে কমলেশজীর বাড়িতে জিনিস রেখে দিলাম, তারপর সেকেন্দ্রাতে আকবরের কবর দেখতে গেলাম। ১২৩-এর মধ্যে ২৩ একরে ইমারত আছে, বাকিটা বাগান আর ঘাসের ময়দান। এখানে হরিণও পোষা হয়েছে, যেগুলো বেড়ে অনেক বেশি হয়ে গেছে। পোষার জন্য

পোষা হয়েছে, তাদের খাবার-দাবারের চিন্তা করা হয়নি। খাবারের অভাবে কখনও কখনও কেউ মরে গিয়ে তার সঙ্গীদের শান্তি দেবার চেষ্টা করে। বানরও অনেক ছিল। আকবরের এই কবরস্থানে পরবর্তী সমস্ত মুঘল বাদশাহদের জন্য জায়গা রাখা হয়েছিল, কিন্তু হুমায়ুন মরে দিল্লীতে, জাহাঙ্গীর লাহোরে, শাহজাহান আগ্রাতে মরে তাজমহলে সমাধিস্থ করা হয়, ঔরঙ্গজেব শুয়ে আছে খুল্‌দাবাদে। এইভাবেই অন্যরাও অন্যত্র মরে সেকেন্দ্রায় আসতে পারেনি। তাজমহলের চারটি বিশাল মিনার বানানোর প্রেরণা শাহজাহান মনে হয় এখান থেকেই পেয়েছিল, আর জাহাঙ্গীর এই বিশাল ইমারত বানিয়ে এই বিষয়ে নিজের ছেলেকে পথ-প্রদর্শন করে। আরম্ভ আকবর করেছিল, কিন্তু নিজে গদিতে বসার ৬ বছর পরে—১৬১১ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীর তা সম্পূর্ণ করে। ফেরার সময় পুরনো পাঠশালা নামনের-এর আর্যসমাজে গেলাম। আমার মুসাফির বিদ্যালয় একটা ভাঙা-চোরা বাড়ি ছিল, কিন্তু এখন সেখানে আর্যসমাজের নতুন তকতকে মন্দির দেখলাম।

আগ্রা কলেজের প্রতিষ্ঠায় সবথেকে বড় ভূমিকা ছিল গঙ্গাধর শাস্ত্রীর। কিন্তু সে সময় ইংরেজদেরই নাম রাখা যেত। এই কলেজটি বহু পুরনো, আর বিশাল হল 'মেস্টন হল' নামে প্রসিদ্ধ, যাকে এখন 'গঙ্গাধর শাস্ত্রী ভবন' বলা হয়। সেখানেই তিনঘণ্টা কবি সম্মেলন হলো। তার সভাপতি করা হয়েছিল আমাকে। মধ্যাহ্নোত্তর জলপান ড· সত্যেন্দ্রর বাড়িতে হলো, তারপর আগ্রা স্টেশনে ট্রেন ধরলাম। এখান থেকে একটা কামরা কানপুরে যেত তাই আমাদের রাস্তায় ট্রেন বদলানোর কষ্ট হলো না।

কানপুর—২৮ তারিখ সকাল ছটায় কাপুর পৌছে প্রথমে স্টেশন ভিউ হোটেলে জিনিসপত্র রাখলাম, আর একদিনের জন্য দশটাকা দিয়েও দিলাম। তারপর বেড়াতে বেরোলাম। শ্রীসতীশচন্দ্র কৌশলের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি কি করে হোটেল থাকতে দেন? জিনিসপত্র উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। স্নান-খাওয়া করার পর কৈলাশ-মন্দিরের আঙিনায় শ্রীকৈলাশচন্দ্র কাপুরের বাড়ি পৌঁছলাম। ড· কৃষ্ণকুমার শর্মার সঙ্গে দেখা করে খুব আনন্দ হলো। তিনি গুরুকুলের আয়ুর্বেদিক স্নাতক হবার পর অ্যালোপ্যাথির ডাক্তার হন। তেরো বছর ধরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষা নির্মাণের কাজে লেগে ছিলেন। সে সময় লোক নিশ্চয়ই এটাকে পাগলামি ভাবত। এখন সময় তাঁর অনুকূলে ছিল। আমাদেব যোজনায় তাঁর থেকে বেশি আনন্দ কার হতো? মেটিরিয়া-মেডিকা (ভেষজ-বিদ্যা) আর প্যাথলজি (রোগবিদ্যা)-র শব্দাবলীর দায়িত্ব নেবার জন্য আমি বললাম। তাঁর কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যেত, কিন্তু পরে তো সেই কাজ ছেড়ে দিতে হলো।

প্রয়াগ—২৯ জানুয়ারি সকালের জলখাবার পুরুষোত্তম কাপুরের বাড়িতে মণিরামের বাগানে হলো। সেখানেই কানপুরের আরো অনেক সাহিত্যিক বন্ধু এলেন। শিক্ষিত বন্ধু ও মহিলাদের বিবাহ-প্রথার গীত ও রীতি লেখার কথা বলতে আমি ছাড়তাম না। কাপুরজীর স্ত্রী বিমলাজীকেও বললাম, কৌশলজীর ধর্মপত্নী তথা অনুজবধূকেও প্রেরণা দিলাম। কৌশলজীর পত্নীরই পিতৃকুল আগ্রার খত্রী বালিকা কলেজ বানিয়েছিল। বিকেল পাঁচটা

বেজে দশ মিনিটে ডাক ধরলাম আর আটটার সময় এলাহাবাদ পৌঁছে মাচবেজীর কাছে চলে গেলাম। আর দুমাস পরে গরম পড়েই যাবে, তাই সে নিয়ে চিন্তা করাটা জরুরি ছিল। কমলারও মত জানার ছিল। তাঁর অনুরোধ ছিল, জায়গা এমন হোক যেখানে বিদ্যুৎ অবশ্যই থাকবে। কোনো জায়গা নেওয়া হলো আর সে ব্যাপারে এমন মানুষের পরামর্শ নেওয়া হলো না—শেষপর্যন্ত যাকে তা সামলাতে হবে, এটা ঠিক না। কমলার অনুরোধ আমি সম্পূর্ণ মানতে পারিনি, হয়তো মানলে পরে অনেক ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে বেঁচে যেতাম।

সম্মেলনে যাওয়াতে পণ্ডিত বলভদ্র মিশ্রর সঙ্গে দেখা হলো। দিল্লীতে কার্যালয় বানানো আর সেখানে জমি পাওয়া প্রধানমন্ত্রী সব থেকে দরকার মনে করতেন। কাজে দীর্ঘসূত্রতা তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাঁর মূর্তি করার জন্য ট্যান্ডনজী তৈরি ছিলেন। সেখানে শহরের ভেতরে খুব সুবিধেয় জমি পাওয়া যাচ্ছিল, কত বাড়ি আর ভাড়ায় দেওয়া দোকান ছিল। বাবার এই স্মারকের জন্য ছেলে কিছু টাকা দিতেও তৈরি ছিল। শুধু নেবার জন্য স্বীকৃতি দিতে হতো, কিন্তু ট্যান্ডনজী শেষপর্যন্ত সে ব্যাপারে কিছু স্থির করতে পারলেন না।

মিশ্রজীর কাছে জানলাম, আনন্দজী ইস্তফা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছেন। রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি তিনি ছেড়ে দিতে চান। শব্দকোষ ছাপার কাজে যে ঢিলেমি হচ্ছিল। তা আমার কাছে অসহ্য ছিল। আমি বিদ্বানদের কথা দিয়ে তাঁদের পরিশ্রমে সংগ্রহ করা শব্দকোষ তৈরি করলাম আর তা এখানে ঝুলে রইল।

শীত শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছিল। ফেব্রুয়ারির শুরুতেও ঠাণ্ডার নাম নেই। ডায়াবেটিস তেমনই চলছিল। তবে বিশেষ দুর্বলতা ছিল না, আর ওজনও কম হয়নি। ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 'দার্জিলিং পরিচয়' লিখিয়ে শেষ করে দিলাম। এখন সেটা আবার দেখছিলাম। 'বিজ্ঞান' লেখার জন্য বলা হয়েছিল। আমি আমার প্রবন্ধে পরিভাষা সম্বন্ধে নীচের কথাগুলি জানাই—(১) সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে সুগম ও আগামীদিনের বিদ্যার্থীদের ইংরেজির যোগ্যতার অভাবের জন্য হিন্দির মাধ্যমে বিজ্ঞান পড়ানো জরুরি। আজকের শিক্ষকদের সরানোর প্রশ্ন নেই, যুগ-পরিবর্তনের কালে দুরকম পরিভাষাই চলতে পারে। বিদেশী ভাষাগুলি বয়কট করার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে ভাষা-কূপমণ্ডুক হওয়া অহিতকর। (২) পরিভাষা নির্মাণে আমাদের রঘুবীরের রাস্তা নিয়ে সংস্কৃতের অজ্ঞাত ও অপ্রচলিত শব্দ দিয়ে তা নির্মাণ করলে হবে না, আবার জহরলালজীর ভাবনা অনুসারে খুব সাধারণ শব্দ দিয়েও আমরা কাজ চালাতে পারব না, কারণ পরিভাষাগুলি সারা ভারত নয়, বৃহত্তর ভারতেরও এক হবার দৃষ্টিতে বানাতে হবে। সমস্ত ভাষার প্রতিনিধিদের এইজন্য মাঝে মাঝে সম্মেলন অথবা সমিতি ডাকা উচিত। পরিভাষাগুলি সংস্কৃততে হোক, কিন্তু সরল ও সুপরিচিত শব্দ দিয়েই। সাইন্সের যে সব পরিভাষার সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের নাম যুক্ত আছে, তাদের সেইরকম ভাবেই রক্ষা করা উচিত ইত্যাদি।

কালিম্পঙের আমাদের বাড়িউলি শ্রীমতি জ্যোৎস্না চ্যাটার্জি এখানে তাঁর ভাইয়ের কাছে এসেছিলেন। তাঁর কাছে চা খেতে গেলাম। জ্যোৎস্নাজী একজন মহাতপস্বিনী।

অনেক বছর ধরে তাঁর স্বামীর মাথা খারাপ। পাগলের সঙ্গে জীবন কাটানো সহজ কাজ নয়, কিন্তু তিনি তাঁর সমস্ত জীবন তাঁর সঙ্গে কাটিয়ে দিয়েছেন।

কপিলজী রামগড়ের বাড়িটি সম্বন্ধে আরো কিছু কথা বললেন—দুটি বড় দুটি ছোট ঘর আছে, আলাদা একটা স্নানঘর আছে, রান্নার ঘর আলাদা আছে। মালিক সেপটিক ট্যাঙ্কের পায়খানা বানিয়ে দিতে রাজি। জলের কলও আছে, কিন্তু বিদ্যুৎ নেই। কেরোসিন তেল সেই সময় সহজে পাওয়া যেত না। যদিও কমলার মতে বিদ্যুৎ নেই এমন জায়গায় বাড়ি নেওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু এটা তো ভাড়াবাড়ি, তাই আমি মনে করলাম নিলে আপত্তি নেই। 'যাইহোক, একবার সেখানে গিয়ে স্থির করতে হবে'—এটা তো ঠিক করে ফেললাম। সন্ধেবেলা প্রয়াগের বাঙালী বন্ধুদের সংস্থা 'বিচিত্রা'-তে গেলাম। অনেক পুরুষ আর মহিলা এসেছিলেন। সঙ্গীতেরও আয়োজন ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষরা তো সেই কবেই বলে দিয়েছিল—'ছাজা-বাজা-কেস। য়হী বংগালা দেশ'। আর এখন তো দু শতাব্দী ধরে বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য সংস্কৃতি ও সুরুচিতে বাঙালী আমাদের দেশের অগ্রদূত। আমাকেও সেখানে কিছু বলতে হলো। সেইদিন 'হুমায়ুন' ফিল্ম দেখতে গেলাম। ফিল্ম দেখলে কমলার চোখ অবশ্যই ব্যথা করত, কিন্তু না দেখেও থাকতে পারত না। যদিও তার মানে এই নয় যে, কমলা রোজ রোজ সিনেমা দেখতে যেত। এই ফিল্মটা তো এক বছর পর দেখতে গিয়েছিল। কালিম্পং থেকে ডেরা-ভাণ্ডা তুলে আনতে হবে, তাই কমলাকে কালিম্পঙে নিয়ে যাবার দরকার ছিল না।

কলকাতা—৬ ফেব্রুয়ারি রাত আটটায় দিল্লী মেল ধরে কলকাতা রওনা হয়ে গেলাম। মোগলসরাই থেকে গয়ার লাইন ধরে আমাদের ট্রেন চলল। ধানবাদে সকাল হলো। পৌনে এগারোটার সময় গাড়ি হাওড়া পৌঁছল। মণিহর্ষজী একটু দেরিতে পৌঁছছিলেন, ততক্ষণে আমি ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হয়ে গেছি। ভিড়ের ঠেলায় রাস্তা সব একমুখো ছিল, তাই অনেক ঘুরতে হলো। নাখোদা মসজিদের কাছে ট্যাক্সি ছেড়ে দিতে হলো, কুলিকে দিয়ে মাল উঠিয়ে রামজীদাস জেটিয়া লেনের বাড়িতে পৌঁছলাম। কলকাতায় অল্পবিস্তর কেনাকাটা করার ছিল। 'মধুর স্বপ্ন'-র অনেকগুলো প্রুফ নিয়ে শ্রীপরমানন্দজী দেখা করলেন। এরপরে তিনি 'আজ কী রাজনীতি' ও 'দার্জিলিং পরিচয়'-তে হাত দেবেন। রাজকমল 'আজ কী রাজনীতি' অর্ধেকই ছেপেছিল, তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিশিষ্ট বাদ দিয়েছিল আর পরমানন্দজী আধুনিক পুস্তক ভবন থেকে এখন সেটা বার করছেন।

৯ ফেব্রুয়ারির জন্য বাগডোগরার বিমানে টিকিট পাওয়া গেল। হিসেবে বেপরোয়াভাব প্রকাশ করায় আমি মণিহর্ষজীকে বললাম 'ভাই, কারোর টাকার ঋণ থেকে যাওয়াটা ভাল নয়। যদি পুনর্জন্ম হতো, তাহলে ষাঁড়, মোষ হয়ে তার থেকে ঋণমুক্ত হবার আশা থাকত। নির্বাণগামী কি করে ঋণ শোধ করতে আসবে?'

৮ তারিখ সন্ধেবেলা মারোয়াড়ী ছাত্রদের সামনে গণরাজ্য বিষয়ে কিছু বললাম। হলে দ্বিগুণ শ্রোতা ছিল। আজকাল অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হিন্দুদের নেতা করপাত্রীজী আর শংকরাচার্য কলকাতায় পড়েছিলেন। হিন্দু আইন নিয়ে ধর্মযুদ্ধ শুরু করে রেখেছিলেন।

তারই প্রতিবাদ করার জন্য শ্রীভঁবরমল সিন্ধী এই ভাষণের আয়োজন করেছিলেন।

কালিম্পং—৯ ফেব্রুয়ারি দমদমের বিমান বন্দর থেকে আমাদের বিমান উড়ল। বিমানে অকস্মাৎ আমার নামের সেই তরুণের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল, যার সম্বন্ধে আমি আগে অনেকবার শুনেছি। আমার নাম কেউ রাখুক, তা অনুচিতও নয়, অসম্ভব ব্যাপার নয়। আমার আগেও এ নামে অনেক লোক ছিল। কিন্তু মানুষের মধ্যে ভ্রমসৃষ্টি করা অন্য কথা। আমি তার লেখা পড়েছিলাম, তার থেকে তার প্রতিভা আর বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যেত। আমি কোনো ভূমিকা ছাড়াই সংক্ষেপে তাকে বললাম 'আপনার শিক্ষা আর প্রতিভা, সাহস আর তারুণ্য আছে, যার দ্বারা যে কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা পুরণ করা সহজ কাজ। তাড়াতাড়ির রাস্তা ধরবেন না। নিজের যোগ্যতার থেকেও অন্তত ২৫ শতাংশ রচনা প্রকাশ করার ইচ্ছে পোষণ করুন।' এর ফলে আমার কোনো ক্ষতি হতো না, যদি না সে 'তিব্বতে গেছেন?' প্রশ্ন করলে আমার তিব্বত-যাত্রা পড়ার জোরেই 'হ্যাঁ' বলত, যেন যাত্রা সে-ই করেছে। পরে নেপালে গিয়ে জানতে পারি সেখানে লোকে রাহুলজীকে স্বাগত জানিয়ে চা পার্টি দেয়। আমাকে যাঁরা দেখেছেন সেইসব লোকেরা মুখ আর বয়সের প্রভেদ দেখে অবশ্যই কিছুটা শঙ্কিত হয়েছিলেন, আমাদের তরুণটি কিন্তু মুখে একটুও বিকার না এনে নিজের পার্ট করে যায়।

পৌনে দশটায় বিমান বাগডোগরায় নামল। দুজন ইংরেজ দম্পতি কালিম্পং যাচ্ছিলেন। তাই এখানেই ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম এবং দুটোর সময় 'পার্বতী' পৌছে গেলাম। ভট্ট আর সেনগুপ্ত সুস্থ ও প্রসন্ন ছিলেন। ভট্টকে কিছু ইনজেকসন নিতে হয়েছিল। ঠাণ্ডা এখন কম ছিল। কালিম্পং ছাড়ার আগে এই অঞ্চলের কিছু জায়গা দেখে নেবার ছিল। আমার হাতে তেরটি দিন ছিল—২২ ফেব্রুয়ারি আমার এখান থেকে প্রস্থান।

নিজের বই ও জিনিসপত্র আবার প্যাক করার কাজে লাগতে হলো। রাঁধুনি ভাল পেয়েছিলাম, ইচ্ছে ছিল যদি সে যায় তো সঙ্গে নিয়ে যাব। শ্রীসেনগুপ্ত জানালেন যে, এ সব ব্যাপারে পুলিশকে খবর দিতে যেত। শেষমেশ 'তিন তারকা'-র সন্দিগ্ধ ব্যক্তি হবার ফলে ইংরেজদের মত ভারতীয় সরকার তো আমার পিছনে লেগে ছিল। চিঠিপত্র সেন্সার করার, আমার আসা-যাওয়া বা আমার কাছে যারা আসে তাদের খোঁজখবর করার দায়িত্ব গোয়েন্দা পুলিশ পেয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আমার কাছে আসার সাহস হতো না, তাই তারা রাঁধুনিকে কিছু দিয়ে নিজেদের কাজ গুছিয়েছিল। এখানেই নয় অন্যান্য জায়গাতেও তাই করা হতো। এতে আমার শঙ্কিত হবার প্রয়োজন ছিল না, কারণ আমার যা কিছু কাজ বা চিন্তাধারা, তা প্রকাশ্য ছিল।

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি যখন তখন হওয়ার জোর বাড়ত যার ফলে ঠাণ্ডা বেড়ে যেত। যদি এই ঠাণ্ডা সেনগুপ্তজীকে তাঁর ধর্মত্যাগ করিয়ে আর চামচ ব্যবহার করতে বাধ্য করে,তবে তাকে কি করে দোষ দেওয়া যায়? রাতে তিনি গরম জলের বোতল নিয়ে শুতেন কিন্তু এখনও পুরোপুরি গরম স্যুট ব্যবহার করতেন না। আমি বললাম যে, এখনও সম্পূর্ণ শীতের পাল্লায় পড়েননি, না হলে স্যুট-বুট না বলতেই পরতে শুরু করবেন। তিনি

গরম কাপড় সেলাই করিয়ে এনেছিলেন, কিন্তু ধুতি ছাড়তে লজ্জা অনুভব করতেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় যখন রুশভাষার অধ্যাপক হয়ে গেলেন, তখন তাঁর সহকারীদের দেখাদেখি ধুতির বদলে প্যান্ট করতে কোনো ছলছুতো করেননি।

পাশের বাংলোতে এক আমেরিকান মেডিকেল মিশনারি ডা· ডাংগ এসে পড়েছিলেন। মাসিক ১১০ টাকায় তিনি 'পার্বতী'র থেকে অনেক ভাল ও সুন্দর বাংলো পেয়ে গিয়েছিলেন। ডা· ডাংগ ও তাঁর স্ত্রী সেভেন্থ্ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট মিশনের তরফ থেকে পশ্চিম চীনে তিব্বত সীমান্তে বহু বছর ধরে কাজ করছিলেন। কমিউনিস্টরা শাসনভার নেবার পর সেখানে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, কিন্তু মিশন চাইছিল যে তাঁরা তিব্বতের সীমার কাছে থাকুন, তাই তাঁরা এখানে চলে এসেছেন। তাঁর স্ত্রী খুব পরিশ্রমী ছিলেন. নিজের হাতে ঘর পরিষ্কার রাখা, খাবার তৈরি করা, খাওয়ানো, বাচ্চাদের সামলানো সমস্ত কাজ করতেন। ১৩ তারিখ আমরা তাঁদের বাড়িতে খেতে গেলাম। আফশোশ হচ্ছিল যে, এমন প্রতিবেশীর সুসঙ্গ অল্প দিনের জন্য পেলাম। পরে ডা· ডাংগের সঙ্গে মুসৌরীতে একবার দেখা হয়েছিল, তখন বোম্বাই প্রদেশের কোনো জায়গায় তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল। সেইদিনই প্রয়াগ থেকে কমলার চিঠি এলো। সে লিখেছিল—'আমি পড়াশোনা করছি। ফিল্ম দেখতে গিয়েছিলাম, মাথাব্যথা নিয়ে ফিরেছি। আমাদের বাংলোতে বুবী (কুকুর) নিজেই এসে নিজেকে সমর্পণ করেছে, সে খুব হাঁকডাক করে পাহারা দেয়। আঙিনার ভেতর অন্য লোকের আসা সে পছন্দ করে না. আর একাধিক লোককে কামড়েছেও। আজও একজনের পায়ে দাঁত বসিয়েছে।'

গ্রাহাম হোম্‌স কালিম্পঙে একটি খুবই সুন্দর বিদ্যালয়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে পাদরী গ্রাহাম মুখ্যত অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বাচ্চাদের জন্য ছাত্রাবাস সহ এই বিদ্যালয়টি শুরু করেন। ভারতের হাওয়া লাগার ফলে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বাচ্চারা নিজের হাতে কাজ করাটাকে ঘৃণার চোখে দেখে, ঠিক যেমন ভারতীয় মধ্য ও উচ্চবর্গের ছেলেরা দেখে। এখানে পাঁচ থেকে পনেরো বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা থাকে। এক হাজার ছেলেমেয়ের জন্য জায়গা ছিল কিন্তু তাদের সংখ্যা সাতশোর উপরে কখনও ওঠেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে সংস্থাকে ছোট করতে হয়। সংস্থার দেনা হয়ে গিয়েছিল, তা শোধ করার জন্য ভারত সরকার এক লাখ টাকা দেয়। সেই সময় ৪৮০ জন ছেলেমেয়ে পড়ছিল। হেডমাস্টার মি· লয়েড আমাকে নিয়ে গিয়ে খুব ভালভাবে সমস্ত ক্লাশ দেখালেন। সুপারিনটেন্ডেন্ট ডংকন-এর স্ত্রী চার্চ ও ছাত্রাবাস দেখালেন। হোম্‌স-এ ৬০০ একরের বেশি জমি আছে। একটি ছোট মাঠ আছে, যেখানে একবার ছোট উড়োজাহাজ নেমেছিল। এখন ভারতীয় ছেলেদেরও নেওয়া হয়। ইংরেজি মাধ্যম, কিন্তু দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা আর হিন্দিও পড়ানো হয়।

পথে পন্ত্রা ছাঙ্-এর উলের গুদাম দেখলাম। এখানে উলকে নিম্ন, মধ্যম, উত্তম শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, তারপর বাইরে পাঠানোর জন্য গাঁঠরি বাঁধা হয়। হিন্দু ইউনিভার্সিটির জন্য চেয়ে পাঠানো তঞ্জুরের ১৮টি গাঁঠরি এসে গিয়েছিল। মণিহর্ষজীর অনুজ রত্নজ্যোতিজী তাঁর গুদামে নিয়ে এসে আমাকে সেগুলো দেখালেন। আমি

গাঁঠরিগুলো না খুলেই বেনারস পাঠিয়ে দিলাম। রত্নজ্যোতি এখন পুরোপুরি যুবক ছিলেন। সেই সময় কে ভেবেছিল যে তিনি এতে তাড়াতাড়ি তাঁর স্বজনদের কাঁদিয়ে চলে যাবেন? তবে মৃত্যুর কাছে যুবকই কি আর বৃদ্ধই কি।

মংপু—ভারতে কুইনিনের খরচ পূরণ করার জন্য মংপুতে সিনকোনার বাগান এবং কারখানা আছে। ১৬ ফেব্রুয়ারি সওয়া নটার সময় সেনগুপ্ত আর রত্নজ্যোতির সঙ্গে সেখানে গেলাম। ভট্টজীর বেশি বেশি চড়াই-উতরাই করা উচিত নয়, তাই তিনি গেলেন না। দশমাইল যাবার পর তিস্তাপুল আর আট মাইল যাবার পর রম্বী পুল পার হলাম, যেখান থেকে অন্য একটা রাস্তায় দু মাইল যাবার পর মংপু পড়ল। মোটর সেই পর্যন্ত যায় আর এই ছ মাইল রাস্তাটাও ভাল। প্রায় এক মাইল যাবার পরে সিনকোনার বাগান শুরু হয়ে যায়। সম্ভবত কাজের সুবিধের জন্য সিনকোনা গাছকে বেশি বাড়তে দেওয়া হয় না। কারণ সব দিকেই তা কম চোখে পড়ল। শীতের শেষে তাদের অনেক পাতাই লাল হয়ে আসছিল। পাতা চাখলে পর তেতো কম লাগে, পুরো তেতোটা ছালে থাকে, সিনকোনার ছাল থেকেই কুইনিন তৈরি হয়। প্রথমে বাগানের পরিচালক ড· সেনের বাংলোতে গেলাম। তিনি এই সময় কলকাতা গিয়েছিলেন। কুইনিন বিশেষজ্ঞ স· সো· ব্যানার্জির কাছে গেলাম। তিনি ফ্যাকট্রিতে নিয়ে গিয়ে কুইনন বানানোর প্রক্রিয়া দেখালেন। গাছের ছাল প্রচুর পরিমাণে এক জায়গায় শুকোচ্ছিল। মেশিনে ঢেলে তা কি করে পেষা হয়, তারপর প্রথম চালা হয় কি করে, তারপর চুন আর খনিজ তেল কি করে মেশানো হয়,তারপর সোডা বাইকার্ব মিশিয়ে আবার কি করে ঢালা হয়, আর সবশেষে স্ফটিক কি করে তৈরি হয় আর তারপর চূর্ণ করে অথবা গুলি তৈরি করে কিভাবে টিনে বন্ধ করা হয়, সব কিছুই আমরা দেখলাম। এক প্রক্রিয়া শেষ করে অন্যত্র যেতে কনভেয়র (বাহক) ব্যবহার করা হয়। ফ্যাকট্রি সম্ভবত খুব পুরনো, তাই তত আকর্ষণী ও পরিচ্ছন্ন ছিল না। কিছুটা পরিচ্ছন্ন ডায়রেক্টরের বাংলো ছিল। আমাদের সেনগুপ্তজী রসায়নেরই ছাত্র ছিলেন, তাই তিনি আমাদের থেকে বেশি এই কাজের সূক্ষ্মতা বুঝতে পারতেন। তাঁর মন্তব্য হলো—কত বাইপ্রোডাক্ট উপজাত ফেলে দেওয়া হয়, যা ব্যবহার করা যায়। কুইনিনের কিছু জিনিস সস্তায় বানানো সম্ভব, যা এখানে বানানো হয় না। শ্রীব্যানার্জি খুব যত্ন করে সবকিছু দেখালেন। শালীনতা ও সহৃদয়তা তো বাঙালীদের স্বাভাবিক গুণ, যেমন পাঞ্জাবীদের গুণ অতিথি-সৎকার। পাশেই সেই বাংলোটিও আমাদের দেখানো হলো যেখানে কবিবর রবীন্দ্র ১৯৩৮, ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে এসে ছিলেন। তাকে রবীন্দ্রস্মারকের রূপ দেওয়া হবে, এই আনন্দের খবরটা শুনলাম। দুপুরের খাওয়া এখানেই সারলাম। পথে এক জায়গায় টায়ার পাংচার হওয়ায় একটু দেরিতে পৌনে চারটের সময় বাড়ি ফিরলাম।

১৭ ফেব্রুয়ারিতে বাক্সে বই অনেকটাই ভরা হয়ে গিয়েছিল। দুপুরের পরে আমরা শ্রীমতী ক্রিক্স-এর বাড়ি গেলাম। রোববারে যাব বলে রেখেছিলাম, কিন্তু দুদিন আগেই চলে গেলাম। সেখান থেকে বিদায় নিয়ে ড· রোয়েরিকের বাড়িতে পৌঁছলাম। আজ

তিব্বতী নববর্ষ ছিল। তিনি রানী দোর্জের ভোজে গিয়েছিলেন। তিনি এলেন, 'প্রমাণবার্তিক'-এর ইংরেজি অনুবাদের যথেষ্ট কাজ হলো।

মাথার মধ্যে দর্শন আবার একটা চক্কর দিল—পূর্ণ শান্তি অথবা আপাতত পূর্ণ শান্তি কি? তা কেমন করে পাওয়া যায়?' প্রথমের উত্তর হলো—হৃদয়ের কোনো অংশে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা অথবা ব্যথা না লাগা। দ্বিতীয়টির জন্য এটুকুই বলছি যে, হৃদয়ের দিকে হাওয়ার ঝাপটা পৌছে দেবার ছিদ্রের যতটা সম্ভব বেশি অভাব হোক, অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ খুব কম হোক, আকাঙ্ক্ষাও কম হোক। সর্বজনীন সম্বন্ধ তো রাখতেই হয়। সেখানে খুব হাল্কা একটা ঝাপটাও অপ্রিয় হয়, অন্তরে দুঃখ ছড়িয়ে পড়ে, ব্যথা যদি নাও ওঠে।'

১৮ ফেব্রুয়ারি হিল ভিউ হোটেলে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সামনে 'তিব্বতে ভারতীয় সংস্কৃতি'-র ওপরে ভাষণ দিলাম। কুড়িজনের মত শ্রোতা ছিলেন। তাঁরা সকলেই শিক্ষিত শ্রোতা—নেপালী, বাঙালী, হিন্দিভাষী ছিলেন।

গ্যাংটক—১৯ তারিখ সাড়ে আটটার সময় সেনগুপ্ত ও রত্নজ্যোতির সঙ্গে আমি মোটরে গ্যাংটকের উদ্দেশে রওনা হলাম। নীচে তিস্তা, আর তিস্তা থেকে রোংফু এবং আরো আগে পর্যন্ত রাস্তা খুব ভাল ছিল। কিন্তু যেখান থেকে গ্যাংটকের ডানদিকে ঘুরল, সেখান থেকেই রাস্তা খারাপ পেলাম। রোংফুর পুলে পুলিশ ইংরেজের নাম লিখতে চাইল, কিন্তু আমাদের গাড়িতে কেউ ইংরেজ ছিল না। কয়েক মাস হলো মরশুম পার হয়ে গেছে তবু রোংফুতে এখনও কমলা ভর্তি। বোধহয় ভারতের অন্য জায়গার লোকেরা জানে না যে সিলেট (আসাম) আর নাগপুরের চেয়ে এখানকার কমলা কম ভাল হয় না। নেপালের কমলা তো সর্বশ্রেষ্ঠ। থোক ব্যবসায়ীরা এখন থেকে তা কেনে। কালিম্পঙে পাঁচ টাকায় যে টুকরি পাওয়া যায় তা এখানে তিন টাকা শ'য়ে পাওয়া যাচ্ছিল। সিগ্‌তম পুল পার হয়ে বাজারের কাছ থেকে তিস্তা উপত্যকা ছাড়তে হলো। একটি শাখা নদীর ধার দিয়ে অন্যদিকে গেছে। মরতম গ্রামের ডাকবাংলো ছাড়িয়ে যাবার সময় রাস্তায় একটা জিপ পড়ে থাকতে দেখে থেমে গেলাম। জানতে পারলাম, সিকিমের দেওয়ান মিস্টার লাল রাস্তায় পড়ে থাকা এক গরিব তিব্বতীকে চলতে অসমর্থ দেখে তার খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। তারপর তাকে লরিতে তুলে দিয়ে নিজের জিপে এলেন। আর রাস্তা আটকে দেবার জন্য আমাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন। লাল মহাশয় এই জায়গার উপযুক্ত মানুষ ছিলেন। তাঁর নম্রতায় আমি খুব প্রভাবিত হলাম। তাঁর পোশাকও ছিল খুব সাধারণ ও চোস্ত। কোমর পর্যন্ত ফৌজী গরম পুরোহাতা জামা। সিটের ওপর তাঁর ফৌজী ঝোলা পড়ে ছিল। আমি বললাম—এই হল মানুষ।

গ্যাংটক থেকে আট মাইল আগেই পুলের কাছে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। এখানে বসেই সঙ্গে আনা খাবার খেয়ে নিলোম, আবার রওনা হয়ে দেড়টার কাছাকাছি গ্যাংটক পৌছলাম। পুলের পরে চড়াইয়ের পর চড়াই ছিল।

আজ হাট ছিল, তাই খুব ভিড়। হেড়-মাস্টার ব্রজনন্দ বাবু ছুটিতে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হলো না। যখন এখানে পলিটিক্যাল অফিসার ইংরেজরা হতো, তখন

অনুমতি-পত্রের জন্য তাদের কাছে আমাকে অনেকবার যেতে হয়েছিল। ভাবলাম এবারও হয়ে আসি। সেখানে কোন এক মিস্টার দয়াল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সময় না নিয়েই আমরা গিয়েছিলাম। তাই এটিকেটের বিরুদ্ধে তিনি কি করে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারতেন? তাঁর এখানে আসার কি যোগ্যতা ছিল? না তিব্বতী ভাষা, আর না তিব্বতী চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর কোনো পরিচয় ছিল। আমার মত তিব্বতে বহুবার যাওয়া অভিজ্ঞ মানুষের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করে তিনি এও জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর আর কিছু জানার ইচ্ছেও নেই। হ্যাঁ, তাঁর ভেতরে এই গুণ অবশ্যই ছিল যে, তাঁর স্ত্রী একজন টেনিস স্টার, তাঁর শাশুড়ি শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের ননদ আর মিস্টার দয়াল আই· সি· এস· ছিলেন। তিনি ছেলেবেলা ইউরোপিয়ান স্কুলে কাটিয়েছেন, তারপর বিলেত গেছেন, আই· সি· এস· হয়েছেন এবং আজ শুধু চামড়াতেই তিনি ভারতীয়। এখানেই আমি অপর আই· সি· এস· মিস্টার লালকে রাস্তায় দেখেছিলাম। তিনি আমাদের কি দিলেন আর ইনি আমাদের কাছ থেকে কি নিলেন? তবে মানুষে মানুষে প্রভেদ হয়ে থাকে। মিস্টার দয়াল শেষ পর্যন্ত অল্প সময়ের জন্য এলেন, কিন্তু বুঝতে পারলাম যে তা শুধু জবরদস্তি কর.র জন্যই। আমার দু হাত জোড় করার উত্তরে তিনি একহাতে সেলাম করে দিলেন। কথার মধ্যে তিনি ইংরেজির সমর্থন, সংস্কৃতের বিরোধ, উর্দুর জন্য দরদ প্রকাশ করলেন। বুঝতে পারলাম তাঁর পূর্বপুরুষরা আগ্রার ছিলেন কিন্তু তাঁর বাল্যকাল নৈনীতালের ইউরোপিয়ান স্কুলে কেটেছে। তাঁকে নেহেরুর ছোট সংস্করণ বলে মনে হলো। সেনগুপ্তজীও সঙ্গে ছিলেন। তিনি সোজা বললেন, 'নেহেরুর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলেই তাঁকে এখানে বসানো হয়েছে। যে জায়গায় উইলিয়াম গোল্ডের মতো রাজনীতিতে অভিজ্ঞ, কিন্তু সংস্কৃতির জিজ্ঞাসু বসতেন, সেখানে এই কালোসাহেব বসেছিলেন, যিনি তিব্বতের এক সময়কার ট্রেড এজেন্ট ক্যাপ্টেন হ্যালির তুলনায় তাঁর দাঁড়িপাল্লার পাষাণটুকুও ছিলেন না। পুলিস খাতাতে লিখতে বলল, আমি লিখে দিলাম 'অন্ধং তমঃ' (ভয়ঙ্কর অরাজক নগর)।

সেইদিনই সন্ধে সাতটায় আমরা কালিম্পং ফিরে এলাম। ২০ তারিখ দশটার সময় ড· রোয়েরিক এলেন। 'প্রমাণবার্তিক'-এর প্রথম পরিচ্ছেদের অনুবাদ শেষ হয়ে গেল, এতে আমার আনন্দ হলো কিন্তু তিনটি পরিচ্ছেদ আরো বাকি ছিল। দুপুরের পর ছেলেকে নিয়ে শ্রীমতী ক্রিপ্সও এলেন। এই মাঝবয়সী আইরিশ মহিলা, খুবই প্রসন্নচিত্ত ছিলেন। কতো ঘটনার কথা শুনিয়ে আমাদের মুগ্ধ করে দিতেন। মানুষও গাছপালার মতো সামান্য স্নেহ পেলেই শিকড় ছড়াতে শুরু করে। বিগত দশ মাসে এখানে ছড়ানো শিকড় আমাদের উঠতে দেখে নিজের দিকে টানছিল। মিলন ও বিরহ এই দুই একই বস্তুর দুটি দিক। আর এই মানব জগৎ? পাঁচ লক্ষ বছর আগে যার কোনো পাত্তাই ছিল না, আর হয়তো পাঁচ লক্ষ বছর পরেও সেই ব্যাপারই হবে, যদি তাকে সাবধানে চালনা করা না হয়। কিন্তু, 'আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেপি তত্তথা' (আদি অন্তে যা নেই, তা বর্তমানেও একইরকম)—এ কথা বলা যায় না। বস্তুসকল অ-চিরস্থায়ী, সেইজন্য তাদের মূল্যহীন বলা যায় না। একবার খেলেই চিরকালের জন্য বুভুক্ষা শান্ত না হলে তার অর্থ এই

নয় যে, খাদ্যের কোনো মূল্যই নেই। সব বস্তু অ-চিরস্থায়ী, বস্তুর মূল্য তাদের গতিশীলতার মধ্যে খুঁজতে হবে। অতীতের চিন্তা থেকে সারহীনতা স্বীকার করাটা একতরফা বিচার কারণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মও তো আছে। অর্ধেক বয়সের পর কি মৃত্যুর সান্নিধ্য পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায়? পঞ্চাশের আগেও তো লোকের মৃত্যু হয়। তবে তাদের বাঁচার সম্ভাবনা বেশি, বুড়ো মানুষদের পক্ষে যা সম্ভব নয়।

২০ তারিখ সন্ধেবেলা শ্রী কে· দেশরাজের বাড়িতে চা-পান ছিল। তিনি পাঞ্জাবী ও এখানকার একজন সফল ঠিকেদার। তাঁর স্ত্রী আমাদের এস· ডি· ও· শ্রীমোতিচন্দ প্রধানের বোন, অর্থাৎ তিনি হিন্দু পরিবারের। দেশরাজও আগে হিন্দু ছিলেন, আর এখন খ্রিস্টান। হিন্দু-খ্রিস্টান দু ধর্মের সম্মিলন হচ্ছিল তাদের পরিবারে।

২১ তারিখ ছিল শেষ দিন। উকিল বাবু রাধামোহন এলেন। তারপরে শ্রীমোতিচন্দ প্রধান। অন্য বন্ধুরাও দেখা করে গেলেন। আমাদের ১টা বাক্স আর ৮টা ট্রাঙ্কের ওজন ছিল সাড়ে ১৭ মণ। ৩ মনের বেশি আমরা নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলাম। এতো মাল নিয়ে এখন আমরা অনিশ্চিত জায়গাতেই যাচ্ছিলাম। কমলার নাক দিয়ে রক্ত পড়েছিল, প্রয়াগে ইনজেকসন আর ওষুধ চলছিল। ২২ তারিখ লরিতে মাল চাপালাম। সাড়ে এগারোটার সময় ট্যাক্সি এলো, তাতে আমরা তিনজন চড়ে রওনা হলাম। এখন শিলিগুড়িতে রেল পৌঁছে গিয়েছিল। আর তার স্টেশনকে শিলিগুড়ি-উত্তর বলা হতো। রাস্তা পুরোপুরি তৈরি হয়নি, তবে যাত্রীরা চলতে শুরু করেছিল। অত্যধিক ভিড় ছিল। এখান থেকে সিট রিজার্ভ হলো না, ২২৬ টাকা ৮ আনা দিয়ে আমরা প্রথম শ্রেণীর তিনটে টিকিট নিলাম। প্রথম শ্রেণীর টিকিট না নিলে জায়গা পাওয়া মুশকিল হতো। রোজই এখানে বহু যাত্রী ট্রেনে উঠতে পারত না। গাড়িতে মানুষ ঝুলে ঝুলে যাচ্ছিল। যাইহোক, আমরা পৌনে ১৫ মণ মাল লাগেজ ভ্যানে রাখলাম এবং নিজেদের কামরায় বসলাম।

কাটিহার—রাত চারটের সময় ট্রেন কাটিহার পৌঁছল। প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয়ও ভর্তি ছিল, তাই সেই প্লাটফর্মে পড়ে রইলাম। কিন্তু মেঘ-দেবতা শান্তিতে থাকতে ছিল না। কোনো রকমে ২৩ তারিখ সকাল হলো আর আমরা শ্রীমহাবীর প্রসাদ ভাবগুিয়ার বাড়িতে পৌঁছলাম। স্নান-খাওয়া করলাম। আজই রওনা দেব স্থির করেছিলাম, কিন্তু আমরা কি জানতাম, পরে কি হতে যাচ্ছে? খাওয়ার পরে আমরা গাড়ির জন্য তাড়াহুড়ো করছিলাম। ড· ভট্ট রান্নার প্রশংসা করে বলছিলেন, 'আজ আমি ব্রাহ্মণের মতো ভোজন করেছি।' ভাবগুিয়াজী ৫৫৫ সিগারেট সামনে রেখে দিলেন। বললেন 'আমি পাথেয়ও নিয়ে নিয়েছি।' ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল। ভাবগুিয়াজী তাঁর গাড়ি ড্রাইভ করে আমাকে নিয়ে চললেন। রেলওয়ে লাইন পার হবার সময় সেনগুপ্তজী ভট্টজীকে দেখে বললেন, 'ঘুম পাচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়ুন।' স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াল। দেখলাম ভট্টজী অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তাঁকে তুলে ট্রেনে নিয়ে গেলাম। ভাবগুিয়াজী দৌড়ে গিয়ে ডা· রামপ্রসাদ সূদকে নিয়ে এলেন। সূদ সাহেব বললেন, 'এখন এই ট্রেনে ওঁকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।' গাড়ি থেকে

মাল নামালাম। ভট্টজীকে রেলওয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। এখনই আমরা কেমন আনন্দ করছিলাম, আর এখন ভট্টজীর অবস্থা দেখে বুক কাঁপছিল। কয়েকবার বমি হলো। ডাক্তার সূদ কয়েকটা ইনজেকসন দিলেন। তিনি খুবই তৎপরতার সঙ্গে পরীক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু হাসপাতালে ওষুধ ছিল না। এই অবস্থাতে আমরা সেখানে পড়ে রইলাম। আস্তে আস্তে বোঝা গেল্ যে, ভট্টজীর এক অঙ্গে পক্ষাঘাত হয়ে গেছে। হার্টের রোগ তো ছিলই, তবে পাহাড়ের ওপর এমনটা হওয়া উচিত ছিল। চার হাজার ফুট উচ্চতা এর জন্য কোনো প্রতিবন্ধক হতো না। আমরা ভট্টজীকে হাসপাতালে রেখে ভাবগুিয়াজীর বাড়িতে চলে এলাম। জিনিসপত্র রেখে সেখানে আসা-যাওয়া করতে লাগলাম। পরের দিনও ভট্টজীর অবস্থা তেমনই রইল। চোখ খুব কম খুলতেন। কখনো জ্ঞান আসত, কখনো অজ্ঞান থাকতেন। হাসপাতালে জিনিসপত্রের অভাবের জন্য প্রয়াগে চলে যাওয়া ভাল ছিল, কিন্তু এই অবস্থায় ডাক্তার যাবার পরামর্শ দিচ্ছিলেন না। তারপর সব দেখে ডা· সূদ বললেন, 'সঙ্গে একজন ডাক্তার নিয়ে যেতে পারেন।' ভাবগুিয়াজী তরুণ ডাক্তার কালীপ্রসাদ দাসকে রাজি করলেন। দেখলাম তিনি খুবই সহৃদয় মানুষ। চলে যাওয়ায় ভয় তো আমাদের ছিলই, কিন্তু এখানে থাকলেও তা তেমনই ছিল। আমরা লক্ষ্ণৌ গেলে বেশি ভাল হতো, কারণ সেখানে মেডিকেল কলেজ ছিল। কিন্তু সমস্ত মাল এলাহাবাদের দিকে রওনা হয়েছিল, তাই আগে প্রয়াগ যাওয়াই ঠিক করলাম। সব থেকে বড় চিন্তার ব্যাপার ছিল যে, ভট্টজীর কোনো কিছুই হজম হচ্ছিল না। সব বমি করে দিচ্ছিলেন।

২৫ তারিখ ডা· সূদ আর ডা· কুণ্ডু দেখলেন, ওষুধও লিখে দিলেন। দুপুরের পরে ড· ভট্টকে নিয়ে গাড়িতে বসলাম। ২টো বেজে ৪০ মিনিট আমাদের গাড়ি রওনা হলো। ডা· কালীপ্রসাদ দাস একজন এম· বি·, তাঁর স্ত্রীও ডাক্তার। ভট্টজীকে তিনবার কমলার রস দেওয়া হলো, কিন্তু তিনবারই তিনি বমি করে দিলেন। এখন গ্লুকোজ ইনজেকসনই শুধু ভরসা ছিল। এমনিতে আজ তাঁর অবস্থার একটু উন্নতি হয়েছিল। আমার শুধু মনে হচ্ছিল, এই ছোটলাইনের গাড়ির কোনোদিন কি উন্নতি হবে?। গদি ছেঁড়া, পায়খানা, তার দরজা খোলা, জানলাগুলো ভাঙা-চোরা। মিস্ত্রি ডাকিয়ে পাখা ঠিক করা হয়েছিল, নয়তো কষ্ট হতো। এত ভিড় ছিল যে মানুষ ছাতের ওপর বসেছিল। এক জায়গায় তো বরযাত্রীর একটা পুরো দল মেয়েদের প্রথম শ্রেণীতে বসে পড়ল। টিকিট কালেক্টর টিকিট চাইতে গেলে তার পিটুনি খাবার অবস্থা হলো। এদিকে আজকাল বন্দোবস্ত করার জন্য ট্রেনের সঙ্গে রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেট যায় না।

২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে আমরা ছাপরা পৌঁছলাম। এখানেই চা খেলাম। আমাদের কামরায় রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেট দলন ছাপরার অবধেশবাবু বালিয়া পর্যন্ত আমাদের সঙ্গী হলেন। বালিয়াতে ভট্টকে আরো গ্লুকোজ ইনজেকসন দেওয়া হলো। কথা বলতে চাইতেন না, অথবা হয়তো বলতে পারতেন না। একবার পিত্তি বমি হলো। তবু অল্প অল্প গ্লুকোজ আর একটা কমলার রস দিলাম। এখন তাঁর নাড়ি খুব মন্দ গতি ছিল। যাওয়ার সময় ঔড়িহার পৌঁছলাম। দারাগঞ্জ পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গেল। তার করে দিয়েছিলাম। ড· উদয়নারায়ণ তিওয়ারীকে পেলাম। রামবাগ স্টেশনে অ্যাম্বুলেন্স তৈরি ছিল আর রায়

রামচরণ লালও তাঁর গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। ভট্টজীকে অ্যাম্বুলেন্স কারে বসিয়ে মোতিলাল মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। আগে কালবিন হাসপাতাল নামে প্রসিদ্ধ এটি প্রদেশের ভাল হাসপাতাল। প্রয়াগে আমাদের কখনো হাসপাতালের প্রয়োজন পড়েনি, তাই আমরা তা জানতাম না। ড· পাটনকর ভট্টজীর খুব ভাল ব্যবস্থা করলেন। তাঁর নাড়ির গতি ছিল ৪২ থেকে ৫২ পর্যন্ত। একটা ভাল হাসপাতালে আমাদের বন্ধুকে পৌঁছতে পেরে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। এখানে নার্সরা ছিলেন, সব রকমের ওষুধও ছিল, দেখার জন্য সহৃদয় ডাক্তারও ছিলেন, আর ছিল নিজেদের লোকের প্রভাব। যদিও ভট্টজী কিছুদিন পরে মৃত্যুর হাত থেকে বেরিয়ে এলেন, তবে তাঁর পক্ষাঘাত সাধারণ ছিল না। বছরখানেকের বেশি তিনি এই হাসপাতালেই ছিলেন, পরে অন্য কোনো জায়গায় চলে যান। আমার খুব ইচ্ছে ছিল তাঁকে সাহায্য করি। কিন্তু তারপরে নৈনীতাল আর মুসৌরীতে চলে গেলাম, যেখানকার উচ্চতা তাঁকে আমার কাছে নিয়ে যাওয়ার বড় বাধা ছিল। বন্ধুদের কাছে চিঠি দিয়ে জানানো ছাড়া আর কিছু করতে আমি অসমর্থ ছিলাম। এই অসহায়তার জন্য আমার চিরকাল আফশোশ থাকবে।

সেই রাতেই আমরা হাসপাতাল থেকে রায় রামচরণের বাসায় চলে এলাম। পরের দিন ২৭ ফেব্রুয়ারি ভট্টজীর অবস্থা একই ছিল, ডাক্তার পাহাড়ে নিয়ে যেতে মানা করলেন, তবে জানালেন—দেরি হবে, কিন্তু এখন চিন্তার কিছু নেই।

কমলার অবস্থা এখন ভাল, বিশারদের পরীক্ষা দিতে পারেনি, কিন্তু পরের বছর তা অবশ্য দিতে হবে। কমলার রাস্তা পরিষ্কার ছিল। এফ· এ·-র পরীক্ষা সে দিতে পারত। সব বিষয়েই তার রুচি ছিল, কিন্তু আমি ভাবলাম 'বিশারদ' আর 'সাহিত্যরত্ন' পড়লে হিন্দির যোগ্যতা বাড়বে, এবং সেইসঙ্গে সুবিধেমত অন্য পরীক্ষাও দিতে পারবে। সাহিত্যরত্ন সে করে নিয়েছিল আর এই বছর ১৯৫৬-তে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম· এ·ও পাশ করে গিয়েছিল।

২৮ তারিখ ডক্টর উদয়নারায়ণ তিওয়ারীর সঙ্গে সকালবেলা গঙ্গার ধারে হাঁটতে গেলাম। সকালের জলপান শ্রী গণেশ পাণ্ডের বাড়িতে হলো আর দুপুরের খাওয়া হলো শ্রীকমলাশংকর সিংহের বাড়িতে। নিরালজীও সেখানে উঠেছিলেন, তাঁরও দর্শন হলো। জানতে পারলাম, এখন তিনি 'গীতি শতক' শেষ করেছেন,যা ছাপা হচ্ছে।

১ মার্চ সম্মেলনে সাহিত্য-সমিতির বৈঠক হলো, অনেকগুলো বইয়ের সম্পাদনা ও প্রকাশনার বিষয়ে চিন্তা করা হলো। রুশ থেকে ফেরার পর স্বামী সহজানন্দজীর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। তিনি এখানে এলেন। আমার উপস্থিতি জানতে পেরে কার নিয়ে সমস্ত এলাহাবাদ চক্কর লাগাতে থাকেন। শেষে সম্মেলনে এসে আমাকে ধরেন। তারপর তাঁর সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে প্রাণ খুলে কথাবার্তা হতে লাগল। অনেক যোজনা তৈরি হলো। আমি এখন কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বর ছিলাম না, আর উনিও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কাজ করছিলেন না, কিন্তু আমরা দুজনেই পার্টির জবরদস্ত সমর্থক ছিলাম। সেদিন কথাবার্তা বলার সময় কি আমি জানতাম যে এটাই আমার তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা। তাঁর বয়স খুব বেশি ছিল না, স্বাস্থ্যও খারাপ বলে মনে হতো না, মোটা ছিলেন না, আবার খুব রোগাও

ছিলেন না। সেই কর্মঠ পুরুষের প্রতিটি অঙ্গ উৎসাহে নাচছিল, চোখ জ্বলজ্বল করছিল। গরিব ও উৎপীড়িতদের জন্য তিনি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে দিয়েছেন। বড় বড় রাজা-রানী তাঁকে পূজা করত, কিন্তু এই সম্মানের মালিক কখনো তা পরোয়া করেননি। তাঁর ঝড়ের গতিতে কাজ আর সফরের মাধ্যমে লাখ-লাখ কোটি-কোটি মানুষের মধ্যে তিনি আন্তরিক ইচ্ছার সঞ্চার করেছিলেন। স্বামী সহজানন্দের ভৌতিক শরীর না থাকলে তাঁর কার্যচক্র কি শেষ হয়ে যেতে পারে? কার্যচক্র যদি সামনের দিকে এগিয়ে চলে, তবে থাকা না থাকার চিন্তা কিসের জন্য? স্বামী সহজানন্দের মৃত্যু আমার কাছে একটি ব্যক্তিগত বড় ক্ষতি। আমি সর্বদা এই পুরুষের প্রশংসাকারী ছিলাম।

মাচবেজী এখন প্রথম বাংলোটা ছেড়ে দিয়ে একটি অন্য বাড়িতে চলে এসেছিলেন। ঘর অবশ্য একটাই পেয়েছিলেন কিন্তু আস্তে আস্তে তিনি তিন-চারটে ঘর বানিয়ে নিয়েছিলেন। ওয়ার্ধা মহিলা আশ্রমের স্নাতক শরদজী বাড়িটা ভালই সামলাতে জানতেন। কমলাও এতদিন তাঁর কাছেই ছিলেন। 'মধুর স্বপ্ন'র কিছু অংশ এখন বাকি ছিল, যা আমি এখানে লিখতে শুরু করি। মোটামুটি করে বোঝা গেল যে, এই বছর আমি প্রায় হাজার টাকা মাসে খরচ করেছি। এটা খুব বেশি। কোনোরকমেই আমার বছরে পাঁচ হাজারের বেশি খরচ করা উচিত নয়।

এদিকে কয়েক বছর ধরেই দোলের দিনটা প্রয়াগে থাকা হচ্ছিল। এই বছরও ৩ মার্চ দোল পালন করার জন্য এখানেই থাকলাম। সিভিল লাইন্স-এর এই পাড়ায় দোলের বেশি হৈ চৈ ছিল না, কারণ মধ্য ও উচ্চবর্গের শিক্ষিত লোকরাই এখানে থাকতেন। গরম পড়তে শুরু করেছিল। দুপুরের তিনঘণ্টা তো ঘামে জবজবে হয়ে থাকতাম। সেদিনই ফিরাক সাহেব এলেন। উর্দুর তিনি প্রতিষ্ঠিত কবি এবং হিন্দিতেও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান। নিজের কলেজ জীবনে তিনি একজন অসম্ভব প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন। অসহযোগের সময় ফকিরের বেশ ধারণ করেন। এখন অনেক বছর ধরে এলাহাবাদ ইউনিভার্সিতে ইংরেজির অধ্যাপক। আমার এই মতের সঙ্গে তিনি একমত ছিলেন যে, উর্দুর জায়গা চিরদিন থাকবে। হ্যাঁ, তিনি যেরূপে মনে করছিলেন, সেইরূপে নয়। হিন্দি-উর্দু দুই এক ভাষার দুই শৈলীরূপে থাকবে, আর সেই সময়ও আসন্ন যখন উর্দুর জন্য দেবনাগরী ওদের নিজস্ব লিপি হয়ে যাবে, এইজনা উর্দু অনেকের কাছে সুপরিচিতও হয়ে উঠবে। ফিরাক সাহেব তাঁর সমস্ত সাহিত্য জীবন উর্দুর জন্য ব্যয় করেছেন। আমিও যদি তাই করতাম—আর ছোটবেলা থেকে আমি উর্দুই তো পড়েছি—তাহলে আমিও হয়তো তাঁর মতই ভাবতাম।

দোলের দিন বেনারসে আমি সুব্যবস্থা দেখেছিলাম। ৩৬-৩৭ বছর পরে আজও সেই ব্যবস্থা আছে কিনা আমি বলতে পারি না। সেখানে দুপুর পর্যন্ত যা কিছুই ছোঁড়াছুঁড়ি হোক না কেন, দুপুরের পর লোকেরা শুধু শুকনো আবির ব্যবহার করত, কিন্তু এখানে তো সকাল-সন্ধের কোনো প্রভেদ নেই।

৫ তারিখে হাসপাতালে গিয়ে নিশ্চিত জানা গেল যে, ভট্টজীর বাম অঙ্গে পক্ষাঘাত হয়েছে। ডাক্তার জানালেন, এ ঠিক হতে বহুদিন লাগবে। এখনও তাঁর মস্তিষ্ক কাজ করছে না। ড· ভট্টের জন্য এখন আমার সবথেকে বেশি চিন্তা ছিল। যদি তিনি সুস্থ হয়ে না

ওঠেন, তাহলে কে তাঁর বোঝা বইবে? সম্মেলন কিছুদিন পর্যন্ত অবশ্য সাহায্য করবে। হতে পারে রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি কিছু করল, কিন্তু তা কতদিন পর্যন্ত? ভট্টজীর পরিবারের লোকেরা এখনও দক্ষিণ কানাড়া জেলায় থাকত। তিনি সনাতনী মাধব ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিলেত গিয়ে ভট্টজী তাঁর ধর্ম হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি শুনেছিলেন বাড়ির লোকেরা তাঁকে মৃত মনে করে শ্রাদ্ধও করে ফেলেছে। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন এবং স্বামী থাকতেই তিনি বিধবা ছিলেন। তিনি না নিজের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন আর না কর্ণাটকের সঙ্গে—এখন তিনি এই অবস্থায় ছিলেন।

৬ মার্চ ড· বদরীনাথ প্রসাদের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বছরখানেকের জন্য পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। অসন্তুষ্ট ছিলেন। বলছিলেন যে, সেখানে তো আরোই নিচুমানের বেইমানী চলছে। সেখানে দরবারে হাজিরা দেওয়াটা জরুরি।

রামগড়—শেষপর্যন্ত রামগড়ের ব্যাপারে আমি একমত হলাম। কিন্তু কমলা তা একদম পছন্দ করল না। আমি বললাম, 'না দেখে, সম্মতি দেওয়া ঠিক নয়। সেখানে দেখব, যদি ঠিক হয় তাহলে থাকব, নয়তো অন্য জায়গায় চলে যাবে।'

মার্চের ৮ তারিখ সে উদ্দেশ্যে রওনা হবার আগে ভট্টজীর কাছে গেলাম। অবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। গাড়ি চারটের সময় ছেড়ে দেয়—হঠাৎই এ খবর পেলাম, আর সত্যি সত্যিই তা ঠিক সময়ে রওনা হলো। এখান থেকে দেরাদুনের কামরা লাগিয়ে দেওয়া হয়, যেটা বেরিলি পর্যন্ত যাবে। যদিও এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাটা খুব সংকীর্ণ, চটের গদিওয়ালা ছিল, তবুও ছোট লাইনের থেকে অনেক ভাল ছিল। লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত তিনজন লোক ছিল। পরে একজন লোক নামল আর দুজন আরো চড়ল। প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছিল তাই সব স্টেশনে থেমে থেমে চলছিল। ৯ তারিখ সকাল সওয়া আটটায় বেরিলি পৌঁছলাম। এখন ছোট লাইন (ও· টি· আর·) গাড়ি বদলাতে হতো। প্রথম শ্রেণীর টিকিট আর ছ মণ মালের লাগেজ করলাম। গাড়ি আটটায় ছাড়ল। সহযাত্রী জানালো দোলের রঙ ছোঁড়া নিয়ে বেরিলিতে ঝগড়া হয়ে গেছে। মুসলমানদের দুটি ছেলে মারা গেছে এবং বহু ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে কিছুটা ছোটাছুটি লেগে গিয়েছিল। এখন দুদিকের আসল অবস্থা বুঝতে কিছু দেরি লাগবে। তবে এটা তো নিশ্চিত যে সাম্প্রদায়িকতার আগুন আমাদের এখানে সর্বদা উসকানো যাবে না।

উত্তর পাঞ্চাল-এর সবুজে ভরা মাটি দেখতে দেখতে আমরা সওয়া বারোটার সময় কাঠগোদাম পৌঁছলাম। রামগড়ের জন্য মোটর রাস্তা সম্প্রতি চালু হয়েছিল। রাস্তা সংকীর্ণ ছিল, আর কাজও কাঁচা হয়েছিল, তাই রাস্তা একদিকে চালু ছিল। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর আবার চারটের সময় রওনা হলাম। রাস্তা খারাপ ছিল না। ৭০০০ ফুটেরও বেশি উঁচু ডাঁড়া পার করে পাঁচটার সময় আমরা রামগড় পৌঁছলাম। বাবু বচ্চীসিংহ প্রধানের বাংলো রাস্তার থেকে এক মাইল নীচে প্রায় সোজা উতরাইতে ছিল। কুলি দিয়ে মাল তোলালাম আর বাংলোতে পৌঁছলাম। বাংলো খারাপ ছিল না, কিন্তু সেখানে পায়খানার পর্যন্ত ব্যবস্থা ছিল না। দুটো শোবার ঘর, দুটো বড় ঘর, দুটো স্নানঘর—যথেষ্ট

জায়গা ছিল। এক ঝলক দেখেই বুঝতে পারলাম যে, এখানে আমাদের থাকা সম্ভব নয়। এই কথা চিন্তা করেই আমি কুলিদের পয়সা দিইনি, আর তাদের কাল আবার মালগুলো নিয়ে মোটর স্টেশনে পৌঁছে দিতে বললাম। কমলার খুব আনন্দ হলো যখন আমি বললাম, 'কাল আমরা নৈনিতালে চলে যাব।' রামগড় ৬০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। এখানে ফলের অনেক বাগান আছে। তার দুর্ভাগ্য মনে করুন বা আমাদের যে, আমরা শীতের শেষ সেখানে পৌঁছেছিলাম। এই সময় চোখ সুবজ দেখার জন্য ছটফট করত। ফলবতী গাছের পাতা শুকিয়ে গিয়েছিল, শুকনো কাঁটার মত মনে হচ্ছিল তাদের। এই দৃশ্য কি করে আকর্ষণ করতে পারত আমাদের? বাংলোর কাছেই দু-একটা দোকান ছিল, কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যেত না। অন্য জিনিস তো দূরে থাক, আলো জ্বালাতে কেরাসিন তেলেরও অভাব ছিল। কোনো রকমে আমরা রামগড়ে এক রাত কাটালাম, আর সেজন্য আমাদের আফশোশ ছিল না। না এলে অনুশোচনা হতো যে আমরা একটা ভাল জাযগা দেখা থেকে বঞ্চিত থেকে গেলাম। বসন্ত আর বর্ষার দিনে জায়গাটা যে এমন শ্রীহীন থাকে না। ফলের জায়গা বলে এর বর্তমান আর ভবিষ্যৎও ভাল। এখন তো সেখানে ভাল রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে আর গড়মুক্তেশ্বর পর্যন্ত মোটর আসা-যাওয়া করে।

নৈনীতাল

বাংলোতে আমরা জিনিসপত্রও খুলিনি। ১০ মের সকাল হলো। কুলিরা এসে গেল, আর তারপর আমাদের জিনিসপত্র বাসের ঠিকানায় পৌঁছে গেল। দুদিকের মাল বওয়ার জন্য ১৭ টাকা লাগল এবং ১৫ টাকায় নৈনীতালের জন্য বাসের ব্যবস্থা করলাম। তাতে বেশিরভাগ আমাদেরই জিনিসপত্রে ভর্তি ছিল। আমাদের সঙ্গে পণ্ডিত রঘুবরদত্ত পন্ত যাচ্ছিলেন। তিনি কাপড়ের কলের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আর বিশেষ শিক্ষালাভের জন্য ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারি নীতি ও পুঁজিপতিদের অতি চালাকিতে তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন। বস্তুত যে লুঠে যোগ দিতে রাজি নয়, এবং দেশকে কিছুটা সামনে এগিয়ে নেওয়ার কল্পনা করে, তার পক্ষে আজকের ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা কঠিন। দশ মাইল যাবাব পর ভওয়ালী এলো। তারপর সাত মাইল দূরে নৈনীতালে নটার সময় পৌঁছে গেলাম। নেপালী কুলির পল্টন এমন আর কোথাও দেখিনি। একই ব্যাপার পরে মুসৌরীতেও দেখতে পেলাম। পশ্চিম নেপালের লোকেরা শত শত সংখ্যা নৈনীতাল, বদ্রীনাথ, মুসৌরী ইত্যাদি জায়গায় রোজগারের খোঁজে চলে আসে, কেউ কেউ তো দুই-তিন বছর পর্যন্ত ঘরের মুখ দেখে না। নেপালীরা সব থেকে বেশি পরিশ্রমী। তিন মণ বোঝা পিঠে চাপিয়ে

নেওয়া এদের কাছে কোনো ব্যাপার নয়। রক্ত জল করে চার পয়সা রোজগার করে নিজেদের ছেলে-পুলের কাছে যায়। কিন্তু সেই সব নেপালীদের থেকে তো এরা ভাল যারা মালয়কে পরাধীন রাখতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের কাছে বলি হবার জন্য দু পয়সার বিনিময়ে নিজেদের বিক্রি করছে।

হোটেল মেট্রোপল—ড· সত্যকেতু বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে আগেই চিঠির যোগাযোগ হয়েছিল। তিনিও আমাদের এখন আসার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন, অর্থাৎ রামগড়ের ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম না। নৈনীতালের শোভা হলো সেখানের সরোবর, যা অন্য কোনো পাহাড়ী বিলাসপুরীতে নেই। বাসের স্টেশন হলো মল্লী (নীচের) তাল-এ। এখানেও বাজার আছে আর বড় ডাকঘরও এখানেই আছে। কুলিদের মাথায় মাল চাপিয়ে সরোবরকে বাঁদিকে ছেড়ে আমরা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলাম। সামনে অল্প দূরেই পাহাড়ের দিকে দোকান আর হোটেল শুরু হয়ে গেল। এখানেই সিনেমা হলও আছে। সরোবরের অপর প্রান্তকে তল্লী (উপরি) তাল বলে। হোটেলে পৌঁছনোর আগে ডাক্তার সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবিশ্বরঞ্জনজীকে পেলাম। তারপর ডাক্তার সাহেবও এলেন। জিনিসপত্র গুদামে রেখে আমরা থাকার ঘরে চলে গেলাম। বাংলো ভাড়া নিতে হবে। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'পাওয়া মুশকিল হবে না, দেখে-শুনে নিয়ে নেব।' আমরা ওখানে থেকে গেলাম। প্রথম দেখাতেই আমি লিখে ফেললাম—'অবশ্যই নৈনীতালের কাছে শিমলা আর দার্জিলিং কিছুই নয়।' কিন্তু সেই সঙ্গে এও লিখলাম—'হিমালয়ের বহিঃক্ষেত্রে অবস্থিত।' কিন্তু নৈনীতালের এর থেকেও বড় অভাব বুঝতে পারলাম—এখানের মানুষদের মনে হয় যেন কুঁয়োর মধ্যে আছে, যার ধারে পাহাড়ের বিশাল দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। এই দেওয়ালগুলিই দেখা সম্ভব। হিমাচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণী দেখতে হলে এই সমস্ত দেয়াল পার হতে হবে। বর্ষা আর জল ভাল নয় বলে অভিযোগও করা হয়, তবে আমি তা মানি না।'

সন্ধেবেলা হাঁটতে তল্লীতাল পর্যন্ত গেলাম। পথেই সরোবর সংলগ্ন মিউনিসিপ্যালিটি লাইব্রেরি ছিল যার গ্রন্থাগারিক হীরালালজী চিরপরিচিতের মত আলাপ করলেন নৈনীতাল নিবাসকালে তিনি সবরকমে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকলেন।

১১ মার্চ ভাড়ার বাড়ি দেখতে গেলাম। ইংরেজরা যাবার পর এই বিলাসপুরীগুলোর ওপর শনির কোপ পড়েছে। নৈনীতালে ইংরেজরা ভাড়া বাংলোতেই থাকত, যেগুলো ভারতীয়রা ইংরেজদের আরামের কথা চিন্তা করেই বানিয়েছিল। যে বাংলোগুলোর ভাড়া দেওয়া অবস্থায় বহুবছর কেটে গেছে, যেগুলো জীর্ণ, নোংরা, পুরনো অথবা ভাঙা ফার্নিচারওলা হতেই পারে। অল্মা কটেজ আর গ্লেনমোর এই দুটি বাংলো কিছুটা ভাল অবস্থায় ছিল, কিন্তু তাতে আটটা-নটা করে ঘর ছিল, যেগুলো পরিষ্কার রাখতে আলাদা একজন লোকের প্রয়োজন। গ্লেনমোর বাজার থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত। কমলার সেটা পছন্দ হলো। সাড়ে ছ হাজার ফুট উচ্চতায় সরোবর রয়েছে, আর এটা তার থেকেও এক হাজার ফুট ওপরে। ভাড়া বছরে প্রায় হাজার টাকা ছিল। কাউন্সিল বুক ডিপোর

মালিক শ্রী বাঁকেলালজীও আমাদের সাহায্য করতে সবসময় তৈরি থাকতেন। তিনি শ্রীরামলাল শাহ-এর বাড়িগুলি দেখালেন।

পূর্বাহ্ণে আমরা উত্তরদিকের বাড়িগুলো দেখলাম। বিকেল সাড়ে চারটের সময় দক্ষিণের কুঠিগুলির দিকে গেলাম। ফার্ন কটেজ, হটন কটেজ, ডালহৌসি কটেজ আর স্নাউডন কটেজ ইত্যাদি অনেকগুলি বাংলো দেখলাম। স্নাউডন সব থেকে বেশি পছন্দ হলো। জানতে পারলাম, এটি বিক্রিও হবে। কিন্তু ২০-২২ হাজার পর্যন্ত দাম হলে তবেই তো? এক হাজারের মধ্যে ভাড়া ঠিক হয়ে যাবার আশা ছিল। দক্ষিণগিরির বাড়িগুলো অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় ছিল, এর ফার্নিচারগুলোও খারাপ ছিল না। সিজিন এসে পড়েছিল, তাই ডাক্তার সাহেব তার হোটেল সাজাতে খুব ব্যস্ত ছিলেন। তবে দেখানোর জন্য লোক দিয়ে দিলেন।

১২ মার্চ তার মালিকের সঙ্গে গ্রেনমোর বাংলো দেখতে গেলাম। কুমায়ূনের শাহরাই অধিকাংশ বাংলোর মালিক। এই ব্যবসায়ীরা অনেকটাই সমতলের অগ্রবাল বেনেদের মত। গ্রেনমোর খুব বড় বাংলো ছিল, তাতে দুটো বড বড় কামরা ছিল। ফার্নিচারও ছিল। আমি শুধু তার গুণ দেখলাম, আর তাতেই মুগ্ধ হয়ে বলে দিলাম যে, কাল দুটো কামরা ঠিকঠাক করে দেওয়া হোক। ভাড়া হাজার টাকা ঠিক হলো, কিন্তু শাহজী বললেন, 'মানুষ বেশি থাকলে, ভাড়া বাড়িয়ে দেব।' বেশ কয়েক বছর বাংলো ভাড়া দেওয়া হয়নি তাই অনেক মেরামত করতে হতো। আমি বলে দিলাম, 'মেরামত না করলে, আমি মেরামত করিয়ে সেই পয়সা ভাড়া থেকে কেটে নেব।' জানতে পারলাম স্নাউডনের ভাড়া দুবছর আগে এগারোশোতে উঠেছিল, এখন তা আট-নশোতে নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। আজকাল সাধারণভাবে ভাড়া কম যাচ্ছিল, কিন্তু আমার অস্থিরতাকে কি বলবেন? গ্রেনমোর থেকে আবার একটু উঠে পর্বত-প্রাকারের ওপর পৌঁছলাম, যেখান থেকে হিমালয় শ্রেণী দেখা যেত। এদিকে দিয়ে পাঁচ মাইল পাকদণ্ডী দিয়ে নেমে ভওয়ালী থেকে রানীখেত যাবার রাস্তা পাওয়া যায়।

৩ মার্চ আবার বাংলোর খোঁজে বেরোলাম। সকালে স্নাউডন গেলাম। স্নাউডনের দোতলা বাড়ি আর তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কামরাগুলো আমার খুব পছন্দ হলো। চৌকিদারকে বলে দিলাম, 'মালিককে জিজ্ঞেস করো, যদি বার্ষিক নশো টাকায় দিতে চায়, তাহলে নিয়ে নেব।' ওদিকে হীরালালজী শাহকেও গ্রেনমোরের মালিকের কাছে ওই ভাড়াতেই দেবার জন্য টেলিফোন করতে বললাম। দুপুরের পরে চন্দুলাল শাহর বাংলোগুলো, ডালহৌসী ভিলা, ডালহৌসী কটেজ, হটন হলো, হটন কটেজ দেখতে গেলাম। হটন হল খুব বড় ছিল, আর হাজার টাকায় পাওয়া গেলেও আমাদের কাজের ছিল না। গ্রেনমোর যত বড় ছিল, ডালহৌসী ভিলাও ততটাই বড় ছিল। হ্যাঁ,তার থেকে কিছুটা বেশি পরিষ্কার ছিল। ডালহৌসী কটেজ আর হটন কটেজ আমাদের যোগ্য ছিল। আমার মন বেশি করে স্নাউডন চাইছিল, আর কমলা গ্রেনমোরের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। আমার মাথায় বাংলো কেনার চিন্তাও ঘুরছিল, ভাবছিলাম যদি স্নাউডনের দাম ন্যায্য হয়,

তাহলে সেটা নিয়ে নেব। ডাক্তার সাহেবও বললেন, ২০-২৫ হাজারে তা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

গ্রেনমোর—১৪ মার্চ তিনটি বাংলোর অফার এলো, কিন্তু সবার আগে এলো গ্রেনমোর থেকে। ১৩ জন কুলি নিয়ে দুটোর সময় গ্রেনমোর পৌঁছলাম। ছটা বড় বড় ঘর নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সবগুলোর কাঁচ ভাঙা ছিল। রাতে যখন শোবার জন্য দরজা বন্ধ করতে গেলাম তখন বুঝলাম যে, এখানে তো সবকিছুই খোলা এবং ভেতরে ঢোকার সমস্ত বাধা দূর করে রাখা হয়েছে। আর এটা বাজার থেকে অনেক দূরে প্রায় গিরিপ্রাকারের মাথার ওপর ঝুলছে। এখান থেকে নামা-ওঠা সহজ ছিল না। এবং ছিলও একেবারে নিরাপত্তাহীন জায়গায়। এখান থেকে আমরা সরতে না সরতেই সমস্ত জিনিস সহজে হাওয়া করে দেওয়া যেত। সারারাত এই চিন্তায় নিজের তাড়াহুড়োতে আফশোশ করতে থাকলাম।

ওক লজ—রাতেই বাংলো ছেড়ে দেওয়া ঠিক করে ফেললাম। এখন একটা রাতই শুধু থেকেছি, আর বাংলোর ব্যাপাবে লেখাপড়া হয়নি। খুব তাড়াতাড়ি অন্যত্র যাবার ব্যবস্থা করতে হলো। চা খেয়ে বাড়ি অপছন্দ হবার ব্যাপারে শ্রীহীরালাল শাহকে এক চিঠি লিখলাম এবং আমি শ্রীবাঁকেলাল কোন্সেলের কাছে ওক লজে গেলাম। তিনি এই সমস্ত বাংলো ভাড়া দিতেন, নীচে তাঁর পরিবার থাকত, ওপরে এক অংশে ওভারসিয়ার গুপ্তজী ছিলেন, আর অন্য অংশে দুটি ঘর ও বারান্দা খালি ছিল। একটা স্নানের ঘর রান্নাঘর হিসাবে ব্যবহার করা যেত। যদিও সেখানে স্থানাভাব ছিল, আর ফার্নিচারও খুব কম ছিল, কিন্তু আগে তো আমাদের গ্রেনমোরের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। আর এও ভাবলাম যে কোন্সলজীর পরিবারও থাকেন, যা কমলার পক্ষে অনুকূল হবে। চড়াইও এখান থেকে অর্ধেক। যে করেই হোক চালাতে হবে, তাই ভাবছিলাম।

ফিরে যখন মালপত্র ওঠাতে এলাম, তখন শ্রীহীরালালজী বললেন, 'আপনি বাড়িটা ভাড়া নিয়ে নিয়েছেন,তাই ভাড়াটা অনিবার্যভাবে দিতে হবে।' আমি বললাম, 'যতক্ষণ পর্যন্ত লেখাপড়া হয়নি, ততক্ষণ কোনো আইনত বাধ্যতা নেই।' যাইহোক, সেখান থেকে মালপত্র উঠিয়ে ওক লজে চলে এলাম।

বইগুলো খুললে রাখবো কোথায়, প্রথমে এই সমস্যা হলো। ঘরে কোনো আলমারি ছিল না। রাত এগারোটা পর্যন্ত কমলা বাড়ি সাজাতে ব্যস্ত রইল। শিবলালকে রাঁধুনি রাখলাম, যে রান্না করতে জানত না।

নতুন বাড়িতে এমনিতেও মানুষের কিছু অসুবিধে বোধ হয়। এই বাড়িটার গুণ হিসেবে এইটুকুই বলতে পারি যে, গ্রেনমোর থেকে বেরোনোর পরে সেই আমাদের আশ্রয় দিয়েছে। এবার বই লেখার কাজে লাগতে হবে, আর কমলাকে এই বছর সাহিত্য সম্মেলনের বিশারদ পরীক্ষা অবশ্যই দিতে হবে।

পরের দিন আমি ছটি বক্সের বই বার করে যেখানে-সেখানে রেখে দিলাম। নিজেদের তো যেমন করে হোক চলে যেত, কিন্তু চিন্তা ছিল অতিথিরা এলে কি করা যাবে।

যাইহোক, এখন নৈনীতালে ১৬ জুন পর্যন্ত আমরা ওক লজের হয়ে গেলাম।

১৭ তারিখ থেকে আমরা আমাদের কাজও শুরু করে দিলাম। কমলা ঘণ্টায় দেড় পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ টাইপ করতে পারত, একটু অভ্যেসেই তা দুই হতে পারে। চা খেয়ে নটা থেকে একটা পর্যন্ত আমরা টাইপ করার কাজ রাখলাম। ভাড়া জিজ্ঞেস করায় জানলাম তা এক বছরে ছশো টাকা,যার অর্ধেক এখন দিতে হতো। বাংলোর কোনো জিনিস মেরামত করতে বাড়িওলা অসমর্থ ছিল, কারণ তার জন্য সে কিছু খরচ করতে চাইত না। নতুন বাড়িতে অনেক অসুবিধে ছিল, যা ছিল আমার অস্থিরতার দণ্ড। যদি ডাক্তার সাহেবের কথা মেনে নিয়ে কিছুদিন আরো হোটেলে থেকে বাড়িগুলো ভাল করে দেখেশুনে পছন্দ করতাম, তাহলে এর থেকে কমে ভাল বাংলো পাওয়া যেত।

ডা· কেসরওয়ানী সেই সময় ভবানী টি· বি· সেনেটোরিয়ামের অধ্যক্ষ ছিলেন। করাচী-কংগ্রেসের সময় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। গুরুকুল কাংড়ীর আয়ুর্বেদের স্নাতক ছিলেন। পরে ইটালিতে অ্যালোপ্যাথির এম· ডি· হন, আর জার্মানিতেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষালাভ করেন। লড়ায়ের দিনগুলিতে জার্মানিতে ছিলেন এবং জার্মান সেনার সঙ্গে রাশিয়ার ভেতর পর্যন্ত পৌছন। তিনি রোববার (১৯ মার্চ) তাঁর বাড়িতে ডেকেছিলেন।

এই সময় খাবার জিনিসের অভাব ছিল। নৈনীতালে সুবিধে ছিল যে, এখানে অর্ধেক র‍্যাশনিং ছিল, তাই কিছু রেশন কার্ডে আর কিছু বিনা রেশনের জিনিস পাওয়া যেত। রেশনকার্ড সহজেই হয়ে গেল যার সাহায্যে তিন টাকায় তিন সের আটা আর দু সের চিনি আনলাম।

ড· সত্যকেতুর কাছে গেলাম। ভারতীয় ইতিহাসের গভীর বিদ্বান, গুরুকুল কাংড়ীর স্নাতক আর প্যারিস ইউনিভার্সিটির ডি· লিট, তিনি ভেবেছিলেন, কোথাও পড়া এবং পড়ানোর কাজ করবেন। কিন্তু লড়াই অবশিষ্ট প্রচেষ্টাকেও বিফল করে দিল। তিনি ও তাঁর বিদুষী স্ত্রী সুশীলা দেবী শাস্ত্রী দিল্লীতে বাচ্চাদের স্কুল খুলেছিলেন, সেটা বন্ধ করে দিতে হয়। এরপর জীবন-যাত্রার জন্য কোনো উপায় তো খুঁজতেই হতো। প্রফেসর ডাক্তার আর হোটেল-কিপারে অনেক প্রভেদ। কিন্তু, এই প্রভেদকে যে দেখতে চায়, সে জগতে কখনও সফল হতে পারে না। তিনি মুসৌরীর লক্সমৌট-এ একটি হোটেল খোলেন। লড়াই-এর দিনে হোটেলের জন্য পরিস্থিতি খুবই অনুকূল ছিল। কিছু রোজগার করলেন,তারপর বড় স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। নৈনীতালের সব থেকে বড় এই হোটেল ভাড়া দেওয়া হচ্ছিল। আগে কোনো ইংরেজের ছিল, যার কাছ থেকে অযোধ্যার তালুকদার রাজা মহমুদাবাদ কিনে নিয়েছিলেন। ডাক্তার সাহেব সেই হোটেলটা নিয়ে চালাবেন ঠিক করলেন। খুব বড় কারবার ছিল, কিন্তু এখন যুদ্ধ শেষ হয়ে পাঁচ বছর হয়ে গেছে, আর হোটেলগুলির অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেছে। তিনি এখন এটা ঘাড় থেকে নামিয়ে মুসৌরীর লক্সমৌটেই গিয়ে থাকতে চাইতেন,যেটা এখনও তার হাতে ছিল। এইসব বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করে, আমারও মনে হতে লাগল, আমিও মুসৌরী চলে যাই না কেন। ডাক্তার সাহেব বললেন যে, সেখানে কেনার জন্য অথবা ভাড়ায় ভাল বাড়ি পেতে

অসুবিধে হবে না। মহারাজ যুদ্ধ শমশেরের ৫০ হাজারের বাড়ি বিক্রি হবে, যেটা হয়তো অর্ধেক দামে পাওয়া যেতে পারে। ডাক্তার সাহেব ২৪ মার্চ নাগাদ এখান থেকে মুসৌরী চলে যেতেন। অব্যবহারিকতা তো আমার মধ্যে থাকারই কথা, কারণ সারা জীবন ব্যবহারের পথ অনুসরণ করিনি। ভাবতে লাগলাম দু-তিন মাসে টাকার ব্যবস্থা করে ওটা নিয়ে নেব—'মুসৌরীও খারাপ নয় ... সেখানে গেলে কিন্নর-এর কাছেও পৌঁছে যাব।'

আজকের ডাকে শ্রীপ্রেমরাজ-এর চিঠি পেলাম। আমি আমার 'কিন্নর দেশ মেঁ'-তে সরাহনের বাংলোয় তাঁর আমার নমস্কারের জবাব দেবারও ফুরসত না হবার অভিযোগ লিখে ছিলাম। তিনি খুবই ক্ষোভের সঙ্গে আমাকে ভর্ৎসনা করে লিখেছিলেন যে সেদিন সরাহনের বাংলোতে যে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি কোনো ইঞ্জিনিয়ার ঘোষ ছিলেন। সেই দম্পত্তি মোটেই বাঙালী ছিলেন না,তাই একথা আমি কি করে মেনে নিতে পারতাম? তবুও আমার লেখাতে ওনার যখন কষ্ট হয়েছে, তখন তাঁর এই চিঠিটা প্রকাশ করে দেওয়াটা আমি দরকার বলে মনে করি। ওই বইয়ের নতুন সংস্করণ বেরোতে কে জানে কত দেরি হবে, তাই আমি এখন ছাপা হচ্ছে 'দার্জিলিং-পরিচয়', তাতে সেটা দিয়ে দিলাম।

মুসৌরী মাঝখানে এসে পড়ে আবার আমার মাথায় অনিশ্চিন্ততার জন্ম দিল। নৈনীতালের জন্য আকর্ষণ থাকল না। তবুও বাড়ি তো ভাড়া নিয়ে নিয়েছিলাম, তাই তার সদ্গতি করা প্রয়োজন এবং বর্ষার পরেই এখান থেকে যাওয়া সম্ভব। আর্থিক অবস্থাটা এখন আমি টের পেতে শুরু করেছিলাম, কারণ 'অজগর করে না চাকরি, পাখি করে না কাজ'-এর বৃত্তিতে জীবন কাটানো যায় না। এক জায়গায় ঘর বানিয়ে থাকতে হয়। যার জন্য খরচ নিশ্চিত, তাই রোজগারও নিশ্চিত হওয়া উচিত। সেই সময় আমার হাতে ছিল চারশো টাকা আর ব্যাঙ্কে ছিল তেইশ শো। আড়াইশো টাকা মাসিকে আমার কাজ চালাতে হবে, কিন্তু পরবর্তী চেষ্টা জানিয়ে দিল যে, তা সম্ভব নয়। শ্রীপরমানন্দজী পোদ্দাবের কাছ থেকে ২৫ হাজার অগ্রিম পাবার কথা কিন্তু সেটা তো বাড়ির জন্য তাই দৈনন্দিন খরচের সমস্যার সমধান তা দিয়ে হতো না।

প্রয়াগ থেকে মাচবেজীর চিঠিতে একথা পড়ে ভাল লাগল যে, তিনি মে-তে নৈনীতাল আসবেন। সেনগুপ্ত লিখলেন, ভট্টজীর অবস্থা আস্তে আস্তে ঠিক হচ্ছে। একদিকে আর্থিক অবস্থা এইরকম ছিল, অন্যদিকে যখন ২১ তারিখ শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দর-এর চিঠি পেলাম যে, এগারোশো টাকার রোলেফ্লেকস সাড়ে আটশোতে পাইয়ে দেবেন, তখন বললাম 'টাকার অভাব তো আছে, কিন্তু নিতেই হবে।' নিজের ওপর, কিছু দিন পরে অন্য লোকেরাও হয়তো রাগ করে, তাই আমারও তেমন করাটা কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। ২২ মার্চ পর্যন্ত 'মধুর স্বপ্ন' লিখে শেষ করে দিলাম। কমলা তার অবশিষ্ট ভাগ টাইপ করতেও শুরু করে দিল। আনন্দজীর চিঠি থেকে জানতে পারলাম যে, রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি আমার সাহিত্যিক যোজনা সম্পূর্ণ করতে রাজি। কিন্তু তার সম্পাদনা আমাকে করতে হবে।

মার্চের শেষটা শীতের সময় নয়, কিন্তু সাড়ে ৬০০০ ফুট ওপরে অবস্থিত নৈনীতাল (ওক সাজ ৭০০০ ফুট)-এ এখনও ঠাণ্ডা ছিল। ২[illegible] তারিখ বৃষ্টি আর শিল পড়ল। পিচ,

খুবানি, নাশপাতির ফুল করে গেল, এখন সেগুলোতে ফল আসার সম্ভাবনা নেই। ২৩ মার্চ সকালে উঠলাম। দেখলাম সমস্ত উঁচু জায়গা বরফে ঢাকা। আমাদের বাংলোর আশেপাশেও বরফ ছিল, দুপুর পর্যন্ত যা গলে গিয়েছিল। শীত খুব বেড়ে গিয়েছিল। শিবলালের জায়গায় হরিরামকে রান্নার জন্য রাখতে হলো, কিন্তু সেও এই শিল্প আমাদেরই সঙ্গে থেকে শিখতে চায়। যদি তার মধ্যে অতিরিক্ত কোনো গুণ আছে, তবে তা হলো—ভাল জিনিসগুলোকেও বিস্বাদ খাদ্যে পরিণত করে দেওয়া। নৈনীতালকে এখন গ্রীষ্ম-রাজধানী বলতে আমাদের প্রভুদের সংকোচ হচ্ছে, কারণ ইংরেজদের অনেক দপ্তরকে লক্ষ্ণৌ থেকে এখানে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু, এখন তো সবে শুরু, কংগ্রেসী নেতারা আদর্শবাদ-এর জন্য লজ্জিতও হতে পারছেন না। এখনও সেই সময় আসতে কিছুটা দেরি ছিল, যখন আবার মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্য মন্ত্রীদের নৈনীতালকে নতুন করে গড়তে হতো, আর তখন নৈনীতালের ভাগ্যে কিছু পরিবর্তন হওয়াটাও অবশ্যম্ভাবী ছিল। ইংরেজ চলে যাওয়ায় এখানকার বাংলোগুলোর কি দুর্গতি হয়েছে, সে ব্যাপারে আমি আগেই কিছু বলেছি। দূরে-দূরের বাংলোগুলোর দিন ফিরবে এমন আশা ছিল না। নৈনীতালে অনেক ইউরোপিয়ান স্কুল ছিল, যেগুলো অল্প সংখ্যক ভারতীয় ছেলেকেও নিয়ে নিত। এখন তাদের মধ্যে অনেকগুলিই বন্ধ হয়ে গেছে আর কিছু অন্যরা নিয়ে নিজেদের সংস্থা খুলেছে। বিড়লা বিদ্যামন্দির তাদের মধ্যে একটি।

এখানে এমন কোনো খবরের কাগজ ছিল না যা স্থানীয় খবর দেবে, কিন্তু কোনোরকমে শিক্ষিতদের মধ্যে আমার আসার খবর পৌঁছে গেল। মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ যখন জেনে গেলেন, তখন এই খবর অন্য জায়গায় পৌঁছনোতে অসুবিধে থাকল না।

২৫ মার্চ বিড়লা বিদ্যামন্দিরের অধ্যাপক শ্রীজগদীশনারায়ণজী এলেন। তিনি হলেন বালিয়া জেলার নিরহী গ্রামের বাসিন্দা অর্থাৎ ভোজপুরী ভাই। জানতে পারলাম, মন্দিরে আজকাল দুশো ছাত্র পড়ে। বার্ষিক শুল্ক বাচ্চাদের কাছ থেকে এক হাজার থেকে পনেরো শো টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়। একশো ছাত্র আরো যদি হয় তবে মন্দির স্বাবলম্বী হতে পারে। কিন্তু তখন এখনকার বাড়ি যথেষ্ট হবে না।

আমাদের বাসস্থানে মালিককে দিয়ে মেরামত করানোর আশা ছিল না। ভাঙা কাঁচ দিয়ে ঠাণ্ডা আর হাওয়া ভেতরে আসছিল, তাই নিজেরাই সেগুলো লাগালাম। ২৬ মার্চ কয়েক ঘণ্টা ধরে 'বজরী' পড়তে থাকল। শিল বরফের মত শক্ত হয়, আর নরম তুলতুলে শিলকে বজরী বলে, যা পড়লে টিনের ছাত শব্দ করে না, মানুষের মাথায় চোট লাগে না। ঠাণ্ডা জায়গায় টেম্পারেচার কমে যাবার সঙ্গে পতনশীল বৃষ্টি বজরীতে পরিণত হয়, আরো ঠাণ্ডা বাড়লে তা তুষার হয়ে যায়, বেশি ঠাণ্ডা হলে কণার মত নয়—তুলোর বড় বড় ভেজা পট্টির মতো তুষার হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে পড়তে থাকে।

কমলা অসাধারণ দুর্বল ছিল। ৯২ পাউন্ড শুধু ওজন ছিল, তাহলে মাথাব্যথা পেট ব্যথা আর অন্য রকমের পীড়া থাকবে না কেন? এখানকার সরকারি হাসপাতালের ডা· মালহোত্রা 'রোন্তগেন' করাতে বললেন। অন্যান্য দেশ এক্সরে-কে তার আবিষ্কারক জার্মান বিদ্বান রোন্তগেন-এর নামে ডাকা হয়, কিন্তু ইংরেজ কেন জার্মান নাম পছন্দ

করবে? তাদেরই দেওয়া নাম 'এক্সরে' আমাদের এখানে চলে

রোন্তগেন করালাম। ডাক্তার আরো পরীক্ষা করলেন আর জানালেন, 'কমলার রক্তচাপ কম আছে, ভিটামিনের প্রয়োজন। তার জন্য স্যালাড, টমেটো আর মেটে খাওয়া উচিত।' কিন্তু কমলা স্যালাড আর টমেটোর বিপক্ষে। আমি রেগে গিয়ে বললাম, 'কমলার নির্বোধ মস্তিষ্ক এ কথা মানলে তবে তো? তার জিভ ওষুধ গ্রহণ করতে বাধা দিচ্ছে।' কমলার ওজন ঠিক হতে অনেক সময় লাগল। ওজন ঠিক হওয়ায় পীড়া কমে গেল, এটাই স্বাভাবিক। ২৪ এপ্রিল আবার ডা· মালহোত্রা আর সিভিল সার্জেন কমলাকে দেখলেন। সিবাজলের গুলি আর একটা টনিক খেতে বললেন। সন্ধেবেলা খাবার পর টনিক খাওয়ায় বমি হয়ে গেল। এদিকে ওজন একশো পাউণ্ড পর্যন্ত পৌঁছেছিল, তা কমে ৯৭ থেকে গেল। আধকপালীর জন্য খুবই কষ্ট পেত, যে কারণে লেখাপড়ার অসুবিধে হতো। খুব কষ্ট করে একটু স্যালাড খেয়ে নিত, কিন্তু টমেটোর দিকে তো তাঁর তাকাতেও ইচ্ছে করত না। খাওয়া নিয়ে জবরদস্তি করাটাও ভাল নয়, কারণ তাতে বমি হয়ে যাবার ভয় ছিল। আধকপালীর জন্য চশমার দরকারও হতে পারত। ডা· মায়াদাস দেখে পরীক্ষা করে চশমা দিলেন। ডা· মায়াদাস নৈনীতালের বিভূতি ছিলেন। তিনি দার্শনিক ডাক্তার। রোগীর চিকিৎসা করা, সবরকমে তাকে সন্তুষ্ট করা তিনি তাঁর পরম কর্তব্য মনে করতেন। এমনই ভ্রূক্ষেপহীন আলাভোলা ছিলেন যে, পিঠে ঝোলা নিয়ে মাইলের পর মাইল ঘুরতে চলে যেতেন। রাস্তায় দেখলে কেউ বলতে পারত না যে উনি একজন সিদ্ধহস্ত ডাক্তার।

দিল্লী থেকে খবর পাওয়া গেল যে, সেখানে শিক্ষা-মন্ত্রী ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্বন্ধী পরিষদ স্থাপন করেছেন, যার ২৬ জন সদস্যের মধ্যে আমারও নাম আছে। সেখানে আমি ড· কাণে, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার, তারাপুরওয়ালা, আর· সি· মজুমদার-এর মত নামের অভাব দেখলাম, আর এক-তৃতীয়াংশের বেশি ইসলামিক সংস্কৃতির প্রতিনিধিদের পেলাম। এটা খারাপ নয়, তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে এর থেকে আর বেশি কি আশা করা যায়?

পশ্চিম-পাকিস্তানে একবার খুব জোর তুফান এলো, আর তারপর হিন্দু-মুসলমানের রক্তে মাখামাখি হয়ে এদিক থেকে ওদিক আসা-যাওয়ার কাজ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের ওপর থেকে থেকেই বিপদ আসছিল। হিন্দুদের পক্ষে সেখানে নিশ্চিন্ত ও সসম্মানে থাকা প্রায় মুশকিল হয়ে উঠছিল, সেইজন্য তারা প্রচুর সংখ্যায় নিজেদের ঘর ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছিল—এই ক্রম আজ (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬)-ও অক্ষুণ্ণ আছে।

ড· ভট্টের জন্য এখন আরেক চিন্তা হতে শুরু করেছিল। হাসপাতালের লোকেরা তাঁকে আর রাখতে পারবে না বলে জানাচ্ছিল। তাঁর ব্যবস্থা কোথায় করা যায়, এটা একটা বড় সমস্যা ছিল। শ্রদ্ধেয় ট্যান্ডনজীও সেজন্য চেষ্টা করেছিলেন, আর তারই পরিণামস্বরূপ ভট্টজীকে বের করে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়নি।

এখনও আমি নৈনীতালেই ছিলাম, কিন্তু লক্ষ্ণৌর 'পায়োনিয়র'-এ ছাপা হয়েছিল যে, আমি মুসৌরীতে বসবাস করতে যাচ্ছি। সেই সময় তখন এটা ভবিষ্যদ্বাণীর মত ছিল।

রাঁধুনির বড় অসুবিধে ছিল। ৪ এপ্রিল একজন নতুন রাঁধুনি বিসুনসিংহকে রাখলাম। আসলে মে-জুনে যখন সিজন শুরু হয়,তখন পাহাড়ের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কর্মরত মানুষ বিলাসপুরীগুলিতে পৌছয়। আমরা সময়ের আগে চলে এসেছিলাম, তাই এখন না পাওয়া যাচ্ছিল ভাল রাঁধুনি, আর না বাড়ির ব্যবস্থাপক, এজেন্ট অথবা মালিক সেখানে উপস্থিত ছিল।

হিন্দি কৌরবী ভাষার সাহিত্যিক রূপ। কুরুক্ষেত্র প্রধানত গঙ্গা আর যমুনার মাঝখানে উত্তরে হিমালয়ের তরাই থেকে দক্ষিণে অর্ধেক বুলন্দশহর জেলা পর্যন্ত ছড়ানো ছিল। যমুনার পশ্চিমে আজকালের হরিয়ানাকে সেই সময় কুরুজাংগল নামে ডাকা হতো। এখানে অনাবাদী জঙ্গল বেশি ছিল, যেখানে মূলত কুরুদের পশু চরতো। কুরু আর কুরুজাংগল অথবা মীরাট কমিশনারির খড়ী ভাষাভাষী অংশের এবং হরিয়ানার ভাষা একই। এমনিতে তো চার ক্রোশ দূরে দূরেই ভাষায় কিছুটা পার্থক্য হয়ে যায়। পশ্চিম-হরিয়ানায় আর একটা তফাৎ হালো—যেখানে অন্যান্য জায়গার কৌরবরা 'হ্যায়' বলে, সেখানে পশ্চিম-হরিয়ানার লোক 'সে' বলে। এইভাবে 'হুঁ'ও 'সুঁ' হয়ে যায়। কিন্তু, এই হ-স-এর তফাৎ থেকে ভাষাকে ভিন্ন বলা যায় না। গুজরাটীতেও হ এবং স-এর প্রভেদ তার পশ্চিমের আর পুবের রূপের মধ্যে পাওয়া যায়। গুজরাটী সাহিত্যের ভাষা, হ-কে নয়, স-কে স্বীকার করে—হারো-সারো, হীরো-সীরো। যে কোনো সাহিত্যের ভাষার পক্ষে তার লোকভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করাটা অত্যন্ত জরুরি। এর অভাবে তা প্রবাহহীন নদীর মত হয়ে যায়। আমি বহুবছর ধরে আমার কৌরব বন্ধুদের প্রেরণা দিয়ে আসছি যে কৌরবীর লোক-গীত, লোক-কথা আর অন্যান্য নমুনা সংগ্রহ করা উচিত। এদিকে অনেক তরুণ-তরুণী এই কাজ করতে শুরু করেছে, কিন্তু নৈনীতালে আমার বসবাসকালে এখন সেটা করার লোক পাওয়া যায়নি। ওক লেজের এক অংশে ওভারসিয়ার শ্রীশীতলপ্রসাদ গুপ্ত থাকতেন। তাঁর সৎমা রামন মাই ৮০ বছরের বুড়ি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। রামন মাই জন্মান মজঃফরনগর জেলায়। মীরাট জেলার মওয়ানা তহসিলের এক গ্রামে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়। সারা জীবন অশিক্ষিত আর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন, খুব চুপ করে থাকার মানুষ ছিলেন না। পুরনো কথা সংগ্রহের কাজে সাহায্য করার জন্য তিনি আদর্শ ছিলেন। আমার মাথায় চিন্তা এলো যে, রামন মাইকে দিয়ে গীত আর কাহিনী সংগ্রহ করি না কেন। এখন তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় হয়ে গিয়েছিল, আর কমলার প্রতি তো তার খুব বাৎসল্য ছিল। এসেই জিজ্ঞেস করতেন,'কমলারানী, রোটী-রাটী কর লী?' কৌরবীর এই মধুর শব্দগুলো শুনে ভারি আকর্ষণ হলো। তিন সপ্তাহ হয়ে গেছে তাঁর প্রতিবেশি হয়ে আছি,তাই সংকোচের ব্যাপার ছিল না। রামন মাইয়ের স্মৃতির কাহিনী আর গীতগুলি আমি লিখে নেব বলাতে তিনি রাজি হয়ে গেলেন।

দুপুরের খাওয়ার পরে আমি একটা গল্প লিখব ঠিক করলাম। প্রথম গল্পটা ৪ এপ্রিল লেখা হলো। কিছুদিন পরে তো আমারই মতন রামন মাইয়েরও নিজের গল্পগুলো লিখিয়ে দেবার নেশা হয়ে গেল। পৌছতে একটুও দেরি হলে এসে জিজ্ঞেস করতেন, 'কি, আজ গল্প লিখতে হবে না?' আগে তো আমি একেক দিনে তিনটে করে গল্প লিখেছি। যদিও

রামন মাইয়ের বার্দ্ধক্যের স্মৃতির জন্য অনেক গল্প আর গীত সম্পূর্ণ ছিল না, আর সব গল্পগুলিও সাহিত্যের দৃষ্টিতে খুব উঁচু ছিল না, তবুও বিশেষত্ব এই যে, এই সব গল্পগুলিই একজন ব্যক্তির মুখ থেকে বেরিয়েছিল, একই ভাষায় ছিল— যা আজ থেকে ৭০ বছর আগে যেভাবে বলা হতো, সেই রূপে ছিল। রামন মাইয়ের ছেলে তো কিছুটা এই ব্যাপারটা পছন্দও করতেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী হেমলতাজী গ্রাম্য ছিলেন না, শিক্ষিত তরুণী ছিলেন। তিনি শব্দের গ্রাম্য অমার্জিত উচ্চারণ পছন্দ করতেন না। হয়তো ভাবতেন, এটা তো আমাদের পরিবারের সংস্কৃতিহীন হবার চিহ্ন। কিন্তু রামন মাইয়ের তাঁর বউ-এর এই চেহারার কোনো পরোয় ছিল না। এই কাহিনী আর গীতগুলি সেই বছরই 'আদি হিন্দি কী কহানিয়াঁ ঔর গীত' নামে প্রকাশিত হলো। প্রকাশক প্রুফগুলো পাঠাব বলেও আমার কাছে পাঠাল না, যে কারণে তার অনেক মূল্যবান উচ্চারণ বিকৃত হয়ে গেল।

সন্ধের সময় আমরা হাঁটতে চলে যেতাম। ৯ এপ্রিল শ্রীশীতলপ্রসাদজী, বাঁকেলালজী, তাঁর মেজভাই ও আরো দু-একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমরা লাঠিয়া কন্টা গেলাম। 'কন্টা' এখানে চূড়াকে বলা হয়, যাকে কখনও কখনও কণ্ডাও বলা হয়ে থাকে। লাঠিয়া কন্টার থেকে বেশ কিছুটা উঁচু চূড়া হলো চীনা পিক, তবে লাঠিয়া কন্টার অবস্থান গিরিমেখলা থেকে দূরে সরে, সেটাই তার বিশেষ গুরুত্ব। জায়গাটা তিন মাইল দূরে হবে। আমরা চুড়োয় পৌছলাম। শেষের ১৫-২০ গজ রাস্তা খুব খারাপ ছিল। দেখার জন্য কাঠের দর্শন-বৈঠক বানানো ছিল। বাঁকেলালজীর মেজভাই এখন আর সমতলের লোক ছিলেন না। যে কোনো কঠিন থেকে কঠিনতর চড়াই অথবা দুরারোহ স্থানে তিনি ছাগলের মত খটখট করে চলে যেতেন। সেখানকার গাছপালার সঙ্গেও তাঁর ভাল পরিচয় ছিল। তিনি গুহিয়া গাছের খুব নিন্দা করলেন, বলতেন, 'এর গন্ধ একদম গু-এর মত হয়।' দৈবাৎ রাস্তায় সেই গাছ পাওয়া গেল। আমি ভেঙে শুঁকে দেখলাম, তেমন কোনো গন্ধ ছিল না। তখন বলতে লাগলেন, 'বর্ষার সময় ভিজলে দুর্গন্ধ বেরোয়।' আমার তো মনে হলো, বেচারি গুহিয়াকে এমনিই বদনাম করে দেওয়া হয়েছে। এই সময় এপ্রিল মাসে বুরান্স (রডোডেনড্রন)-এর গন্ধহীন কিন্তু অত্যন্ত রক্তবর্ণ সুন্দর ফুল অনেক ফুটে ছিল। অনেক জায়গাতেই পাহাড়ী মেয়েরা এই ফুল দিয়ে তাদের চুল সাজায়। কিন্তু কুমায়ুন অথবা গাড়োয়ালে সমতলের খুব প্রভাব পড়েছে। তাই সেখানকার তরুণীদের মধ্যে এই শখ দেখা যায় না। আমি তো আগে অনেকবার এই ফুল দেখেছি, আর তার প্রশংসা করে অনেক লিখেছি। আমি তাকে নয়নাভিরাম মনে করতাম। কিন্তু কৌশলজী জানালেন যে, তা দিয়ে খুব ভালো পকৌড়া হয়। সেইদিন রাত্রে দেখলাম তার পকৌড়া সত্যি সত্যিই ভাল ছিল।

৯ এপ্রিল আমার ৫৭ বছর পূর্ণ হলো, এবার ৫৮ বছরে পা দিলাম। বাবা-দাদু কেউ ৫০-এর ওপর পৌছয়নি। এই ব্যাপারে আমি তাঁদের থেকে বেশি ভাগ্যবান। নৈনীতালে কখনও কখনও আমি গোল-সড়কেও হাঁটতে চলে যেতাম। এই পথ গিরিমেখলার অর্ধেক উচ্চতায় সমস্ত উপত্যকা পরিক্রমা করে, আর এতে বেশি চড়াই-উতরাই ছিল না। সওয়া ঘণ্টা এই সড়ক ধরে চীনা পিকের নীচের দিকে গিয়ে আমি ফিরে আসতাম। চীনা পিকের

নীচের পাহাড়কে দেওপাটা বলা হয়। এখানে ঘুগ্নী গাছ ইংরেজরা লাগায়নি—নিজের থেকেই হয়েছে। দেবদারুর সৌন্দর্যের প্রতি আমার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে।

১৭ এপ্রিল প্রথমবার আমরা নৌকোয় সরোবর পেরোলাম। ওপারে যাওয়ার জন্যে একেকজনের চার আনা খুব সস্তা ছিল। কুড়ি মিনিটে মল্লীতাল থেকে তল্লীতালে পৌঁছে যায়। সরোবরে নৌকা-বিহার নৈনীতালের সবথেকে বেশি লোভনীয় জিনিস, বরং বলা উচিত সেটাই সেখানকার সব থেকে বড় আকর্ষণ।

পরিভাষার কাজ এখনও বন্ধ হয়নি। শ্রীসেনগুপ্ত প্রয়াগে থেকে তা করছিলেন, কিন্তু শ্রীবিদ্যানিবাসজীর সঙ্গে তাঁর বনিবনা হচ্ছিল না। আমি থাকলে সামলে নিতাম, কিন্তু এখান থেকে কি করতে পারতাম? অন্যান্য ব্যাপারেও অসুবিধে হচ্ছিল, যে কারণে পরিভাষার কাজ পরে চালু রাখার সম্ভাবনা কম ছিল। লেখার জন্য এখন 'কুমায়ুঁ'-এর চিন্তা মাথায় ঘুরছিল। 'দার্জিলিং পরিচয়' লিখে হিমালয়ের পরিচয় দেবার কাজ শুরু করলাম। এখন আমি কুমায়ুনে ছিলাম, তাই তাতে হাত দেবার সুবিধে ছিল। এখানে তার সম্বন্ধে বই জোগাড় করলাম আর পড়তে পড়তে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে কিছু লিখতেও শুরু করলাম। বহুদিন ধরে 'মধ্য-এশিয়া কা ইতিহাস'-এর সামগ্রী সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল, এবার তাতেও হাত দেবার কথা মনে হতে লাগল।

চীন শিখর—নৈনীতালের নীচের ভাগ থেকে সামনে পশ্চিমের দিকে তাকালে সবথেকে উঁচু যে শিখর দেখা যায়, তা হলো চীনা পিক। এটা ইংরেজদের দেওয়া নাম। আগে এটা প্রায় নির্জন জায়গা ছিল, আর শুধু পশুপালকরা এখানে আসত। বছরে একদিন কেবল নৈনা দেবীর মেলার জন্য ঝিলের ধারে আনন্দ উৎসব হতো। ইংরেজরা এই সরোবরের খোঁজ নেপালের কাছ থেকে কুমায়ুন কেড়ে নেবার (১৮১৪)-র পরে পায়। তারপর এখানে বাংলো তৈরি হতে শুরু করে, এবং ধীরে ধীরে নৈনীতাল প্রদেশের গ্রীষ্ম-রাজধানী হয়ে যায়। ২৩ এপ্রিলে সর্বোচ্চ শিখরে যাবার পরামর্শ হলো আমাদের। নৈনীতাল যারা যান তাঁরা পিকনিকের জন্য এক-আধবার সেখানে অবশ্যই আসেন। রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে গিরিমেখলার চূড়া পার হয়ে পাকদণ্ডী ধরে ওপরে শিখর পর্যন্ত পৌঁছলাম। একটি পাথরের ওপরে সামনে দৃশ্যমান হিমাচ্ছাদিত শিখরগুলির নাম লেখা ছিল,যা রেখা বরাবর দেখলে সামনে দেখা যেত। আমাদের দুর্ভাগ্য, বেশিরভাগ শিখর আজ মেঘে ঢাকা ছিল। বদ্রীনাথ থেকে যমুনোত্রী (বন্দর পুঁছ) পর্যন্ত শিখরই শুধু দেখা যায় না, পূর্বে নেপালের শিখরও সামনে পড়ে। আমরা ৬ জন ছিলাম। সমস্ত রাস্তাটা হাসি-ঠাট্টা আর মজা হতে থাকল। এখানে বসে বনভোজন হলো। সামনে নীচের দিকে ঝিলে ছুটন্ত নৌকো আর তারপরে সমতল ভূমি দেখতে থাকলাম। সওয়া ছটার সময় ওখান থেকে ফিরলাম। অন্য রাস্তা দিয়ে, যেটা ক্যামেল পিক (উট-শিখর)-এর দিক হয়ে আসে। চীনা চুঙ্গী পর্যন্ত আমরা রাস্তা পেলাম। এখন সূর্যও ডুবে গেল, আর আমাদের সঙ্গীরা পাকদণ্ডী ধরল, যেখানে অনেক জায়গায় খাড়া উতরাই নামতে হতো। এমন জায়গায় যদি পা কাঁপতে শুরু করে, তাহলে দোষ কি? রাস্তায় পৌঁছলে পর ধড়ে প্রাণ এলো। অন্ধকার হয়ে

যাবার পর আটটার সময় বাড়ি ফিরলাম।

১ মে শ্রীপরমানন্দজী ১০ হাজার টাকার চেক পাঠিয়ে দিলেন, অর্থাৎ এবার বাড়ি কেনার দিকে গড়িয়ে যাবার অর্ধেক জিনিস প্রস্তুত। ভীমতালও নৈনীতাল জেলার মধ্যে একটি সুন্দর জায়গা। সেখানে একটি বাংলোর বিক্রি হবার কথা শুনলাম। একটু বেশি খোঁজ-খবর করায় জানলাম যে, কোনো সাহেব আট হাজারে কিনে তা ১৫ হাজারে বিক্রি করতে চাইছেন। রামগড় আমাদের দেখা ছিল, তাই এমন জায়গায় যেতে রাজি ছিলাম না যেখানে বিদ্যুৎ-জলের ব্যবস্থা নেই। কুলু থেকে চন্দ্রকান্তজী লিখছিলেন যে, মানালীতে আপেলের বাগানসহ একটা খুব ভাল 'বাংলো' বিক্রি হচ্ছে। মানালীর সুষমা আমার কাছে আকর্ষণীয় হতে পারত, কিন্তু কমলা তাতে রাজি ছিল না। নৈনীতাল থেকে এখন মন উঠে গিয়েছিল। ড· সত্যকেতু মুসৌরী চলে যাওয়ায় আমাদেরও সেদিকে আকর্ষণ ছিল।

মাচবেজী এই সময় এলাহাবাদ রেডিও স্টেশনে কাজ করছিলেন। তিনি ৪ মে তাঁর পত্নী শরদজী আর ছেলে অসংগ-এর সঙ্গে এলেন। ছুটি পাননি, তাই এখন শরদ আর অসংগকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন। রোলেফ্লেক্স ক্যামেরাও এসে গিয়েছিল। আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল সাড়ে দশশো টাকার ক্যামেরা সাড়ে আটশোতে পাওয়া গেছে। দর সাহেব কমিশন বাদ করিয়ে দিয়েছিলেন। বারান্দার ঘরটা নিয়ে আমাদের শুধু তিনটে ঘর ছিল। বাইরের ঘরে কতগুলো ভাঙা চেয়ার, ভাঙা সোফা ছিল, যেটাকে আমরা বৈঠকখানা বানিয়ে ছিলাম আর বাকি ঘরগুলোকে শোবার ঘরে পরিণত করেছিলাম। দু বছরের অসংগ আমাদের মনোরঞ্জনের বড় উপকরণ ছিল। এখন খুব কম শব্দই তার জানা ছিল। নিজের নাম সে 'অচিংগা' বলত। প্রথমে আমার ক্যামেরাটা আমি অসংগর ওপর খুব ব্যবহার করলাম, তার অনেক ছবি তুলতে লাগলাম। ১০ মে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত তার ১০১ ডিগ্রি জ্বর ছিল। বুঝতে পারলাম, শিশু শুধু মনোরঞ্জনের উপকরণই নয়। আধমাইল নীচে নেমে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম, বোধহয় ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিল। পরের দিন এবং তার পরের দিনও ১০২ আর ১০১ পর্যন্ত টেম্পারেচার থাকল। ডা· পুরুষোত্তম পাণ্ডে এসে দেখলেন। তিনি ফী নিতে অস্বীকার করলেন। তিনি জানালেন, আজকাল নৈনীতালে বাচ্চাদের খুব বেশি বসন্ত হচ্ছে। সম্ভবত তাই বেরোবে। মাচবেজীকে তার দিলাম। মাসখানেকের ছুটি নিয়ে ১৪ মে তিনি চলে এলেন। এখন অসংগর শরীর ঠিক ছিল।

১৩ মে সেনগুপ্তজীর চিঠিতে জানতে পারলাম, পণ্ডিত বলভদ্র মিশ্র সম্মেলনের মুখ্য সচিবের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। আমি মিশ্রজীকে এটা না করার জন্য লিখলাম, কিন্তু যে দল তাকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল সেই তাকে এমন করতে বাধ্য করল। মিশ্রজী থাকলে আমার কিছু আশা করার থাকতে পারত, তাই আমি পরিভাষা রচনার কাজে এখনও লেগে ছিলাম, কিন্তু এখন সে-আশা শেষ হয়ে গেল। মের মাঝামাঝি পৌঁছতে পৌঁছতে নৈনীতালের সিজন পুরোপুরি শুরু হয়ে গেল। চারদিকে ভ্রমণবিলাসীদের চোখে পড়তে লাগল। সমস্ত দোকান খুলে গিয়েছিল। সন্ধেবেলা ঝিলের ধারের রাজপথে ভ্রমণবিলাসীদের ভিড় থাকত। পাঞ্জাবী মেয়েরা ফ্যাসনে সবার কান কাটছিল। নৈনীতাল

তাদের শৃঙ্গারের জন্য কয়েক মণ অধর-রাগ আর কাজল খরচ করছিল। লোকেরা দিনেরবেলা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পিকনিক করতে যেত।

২১ মে রোববার ছিল। আমরাও পিকনিকের জন্য ডরোথি সিটের দিকে প্রস্থান করলাম। সপরিবার বাঁকেলালজী, সপরিবার গুপ্তজী, আমরা দুজন আর মাচবেজী সবাই গেলাম। খাবার বাড়ি থেকে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। চা খেয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু কলকাতার বন্ধু শ্রীমদনলাল টাটিয়ার সঙ্গে দেখা হলো, তিনিও চা খাওয়ালেন। দশটার সময় চড়াই চড়ে ডরোথি সিটে পৌঁছলাম। এখান থেকে নৈনীতাল আর আশেপাশের পর্বতের সুন্দর দৃশ্য সামনে দেখা যায়। কোনো ইংরেজ তার স্ত্রী 'ডরোথি'র নামে এখানে একটা সিমেন্টের চাতাল বানিয়ে দিয়েছিল, যার ওপর দাঁড়িয়ে লোকে পরিদর্শন করে। সবুজ গাছের ছায়ায় আমাদের বারো জনেরও বেশি পুরুষ আর মহিলার দল খেতে বসল। সকলে কিছু কিছু জিনিস আর কিছু বিশেষ খাবার তৈরি করেছিলেন। ভাগ করে খেতে খুব আনন্দ হচ্ছিল। আমাদের চেষ্টা ছিল যাতে এই আনন্দ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে না যায়। যথেষ্ট চড়াই চড়ে এসেছিলাম, তাই বিশ্রাম নিতে খুব ভাল লাগছিল। বহুক্ষণ পরে আমরা সেখান থেকে রওনা হয়ে দেবদারু দিয়ে ঘেরা অল্প একটু খোলা জায়গায় পৌঁছলাম। এখানেও কিছু ফলাহার হলো। তারপর সবুজ গাছের ভেতর দিয়ে হেঁটে আমরা বাড়ি ফিরলাম। বড় দুঃখ হলো যে, রামন মাইকে টাটিয়ার বাংলোতেই ছেড়ে যেতে হলো। অতটা চড়াইয়ে ওঠা হয়তো মুশকিল হতো, আর ডাঁড়ী[১]-তে যেতে তিনি রাজি হলেন না, তাই আর কোনো উপায় ছিল না। বিহারীলালজী কোন্‌সল পাহাডী। তিনি আয়রপাটা (দক্ষিণী গিরিমেখলা)-র এক দুর্গম চূড়া টিফিন টপ-এ আমাদের নিয়ে গেলেন, যেখান থেকে আমাদের মধ্যে অনেকেরই নামতে খুব অসুবিধে হলো। কমলার এক জায়গায় পা কেটে গেল, সেইজন্য তাকে ডাঁড়ীতে করে পাঠাতে হলো। বাজারে এসে শরদজীরও পা চালাতে কষ্ট হচ্ছিল, তাঁকেও ডাঁড়ীর সাহায্য নিতে হলো। ফিরে এসে সকলেই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু দিনটা খুব ভাল কেটেছে, এটা সকলেই মানল।

২৩ মে সেনগুপ্তজীর চিঠিতে জানতে পারলাম, ভট্টজী হাসপাতাল ছেড়ে না জানিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছেন, যেখানে প্রতিদিন দশ টাকা খরচ লাগছে। টাকা তাঁর কাছে ছিল, কিন্তু তা কতদিন চলবে? সেদিনই আমি সম্মেলনের হিসেব করে বাকি টাকা পাঠিয়ে দিলাম এবং কাজের থেকে হাত একরকম গুটিয়ে নিলাম।

ভওয়ালী—'কুমায়ুন' লেখার জন্য একাগ্র হয়েছিলাম। কিন্তু হিমালয়ের কোনো ভূ-ভাগের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকে, যদি তাতে নিজের করা যাত্রারও কিছু বর্ণনা না থাকে। মাচবেজীও তৈরি হযে গেলেন। আমরা ঠিক করলাম—কুমায়ুনের কিছু স্থান দেখা যাক। ডা· কেসরবানী কতবার দেখা করে আর চিঠিতেও ভওয়ালী যাবার জন্য লিখেছিলেন।

---

[১]পাহাড়ে ব্যবহৃত এক ধবনের চেয়ার, যাব ওপবে অসুস্থ বা হাঁটতে অক্ষম মানুষদেব বসিযে স্থানান্তবে নিযে যাওয়া হয়।—স·ম·

—১৯৫০—

২৪ মে খাওয়া সেরে দশটার সময় আমরা তল্লীতালের বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছলাম। সাড়ে এগারোটার সময় ভওয়ালীর বাস পেলাম আর বারোটার সময় সেনেটোরিয়াম পৌঁছে গেলাম। ডা· ধর্মানন্দ কেসরবানী তাঁর অফিসে ছিলেন। নিজের বাংলোতে নিয়ে গেলেন, যেটা ৬৩০০ ফুট উঁচুতে ছিল। আগে এটা রামপুর নবাবের সম্পত্তি ছিল। এখানে জলেশ্বরবাবু (ছাপরা)-কে দেখে আরোই আনন্দ হলো। ওকালতি ছেড়ে বহুদিন ধরে তিনি ভারত সরকারের শ্রম-পরামর্শদাতা (লেবর অ্যাডভাইজার) হয়ে আছেন। ছাপরাতে আমরা রাজনৈতিক সহকর্মী ছিলাম। দিল্লীতেও একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি তাঁর কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর থেকে কম যোগ্যতাসম্পন্ন লোক হাইকোর্টের জজ হয়ে গিয়েছিলেন, সেইজন্যও তাঁর মন বসত না। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হবার ফলে তিনি আমারও পরামর্শ চান, আর আমিও এই পদ ছেড়ে দেবার মত জানাই। গুরুকুলের স্নাতক হওয়ায় ডা· কেসরবানী হিন্দি ও সংস্কৃতে বিদ্বান ও অনুরাগী ছিলেন, তাই পরিভাষার কাজে তাঁর বেশি রুচি ছিল। তাঁর স্ত্রীও, যিনি একজন মারাঠী তরুণী, সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লিখতে তো চাইতেন, কিন্তু সময়ের অসুবিধে বলে জানালেন। আমি বললাম, 'কাউকে রেখে ডিক্টেট করান।'

ভওয়ালীর পাহাড়গুলি পাইনের জঙ্গল দিয়ে ঢাকা। টি· বি·-র জন্য পাইনের হাওয়াকে ভাল মনে করা হয়, তাই সে জঙ্গল করতে আরো বেশি উৎসাহিত হয়েছে। সন্ধেবেলা হাঁটার জন্য ডাক্তারসাহেব আমাদের বাংলোর সেই দিকটায় নিয়ে গেলেন, যেখানে থেকে কলের জল আসে। জলেশ্বরবাবুও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। রাস্তা কি, তাকে পাকদণ্ডীও খুব কষ্টে বলা যায়। এমন রাস্তায় চলা আমার পক্ষেও কষ্টকর ছিল, কিন্তু জলেশ্বরবাবু তো পস্তাতে শুরু করলেন। ডা· কেসরবানীর স্ত্রীর সখী কুমারী স্মৃতি সান্যালও এই সময় তাঁর রুগ্ন মাকে দেখতে এখানে এসেছিলেন, তিনিও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সেই কঠিন অবস্থায় তিনি তাঁর মধুর কণ্ঠে কিছু গান শুনিয়ে আমাদের আনন্দ দান করলেন। ভওয়ালীতে সেনেটোরিয়ামের ২০০ একরের বেশি জমি আছে, আর ২৪০ জন রুগ্ন থাকে। এর আরম্ভ হয়েছিল ১৯১২ সালে। বাড়ির অভাব, তাই আর রোগ রুগী নেওয়া সম্ভব নয়। ডাক্তার কেসরবানী জামরানীর বড় বড় হাসপাতাল আর বড় বড় ডাক্তারদের সংস্পর্শে থেকেছেন। তিনি চাইতেন, কাজ কিছুটা এগিয়ে দিতে। কিন্তু তাঁর পা ধরে টানার লোক বেশি ছিল। তাঁর খাঁটি স্বভাবও প্রতিবন্ধক ছিল। পরে যারা তাঁর জন্য এই উঁচু পদ পেতে অসফল হয়েছে, তারা সুযোগের সন্ধানে ছিল। পাহাড়ী-অপাহাড়ী, জাত-পাত, মিথ্যে-সত্যি সব উপায়েই তারা তাঁকে নীচে নামাতে চাইত। আমি নৈনীতালে আসার পরে তারা তাদের উদ্দেশ্যে সফল হয়, আর ডা· কেসরবানীকে ভওয়ালী থেকে অন্য জায়গায় বদলি করে অধীনস্থ পদে রেখে দেওয়া হয়। এতেও সন্তুষ্ট হলো না, প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্ররোচনায় ডাক্তারদের সভা তাঁর নাম এই বলে সদস্য-পদ থেকে খারিজ করে দিল যে, তিনি গুরুকুলের আয়ুর্বেদ স্নাতক, অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার নন। ডা· কেসরবানী এর জন্য মোকদ্দমা করেন এবং জিতে যান। রোম ইউনিভার্সিটির তিনি এম· ডি· ছিলেন, জার্মানিতে অনেক উঁচু পদে থেকে ডাক্তারের কাজ করেছিলেন। তবে হ্যাঁ, তিনি যতটা

কাজ করতে পারতেন, তার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল।

২৫ মে ডা· কেসরবানী তাঁর শল্যগৃহ ও শল্যচিকিৎসার জিনিসপত্র দেখালেন। কিছু রুগীদের ঘরেও আমরা গেলাম। স্ত্রী রুগীদেরও ঘরগুলো দেখলাম। উনি হার্টের অপারেশন করেছিলেন, তাও দেখলাম। হার্টের অপারেশন সোজা কাজ নয়।

আলমোড়া—সেদিনই দশটার সময় আমরা বাজারে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে গেলাম। আট টাকা দিয়ে আলমোড়ার দুটো টিকিট নিলাম। খুব গরম বোধ হচ্ছিল। বড় বড় খুবানি দেখে জিভে জল আসতে লাগল। আমরা খেলাম, মাচবেজীও খেলেন। বাস এগিয়ে চলল। ড্রাইভারের পাশের সারির থেকে লোকেরা বমি করতে শুরু করল। একের পর এক পুরো সারি কাত হয়ে পড়ল। তারপর পরের সারিরও একই অবস্থা হলো। আমাদের আড়াআড়ি দুটো সারি ছিল। মাচবেজী সামনের সিটে ছিলেন, সেখানেও মহামারী পৌঁছল। একের পর এক বীর গড়িয়ে পড়তে লাগল। মাচবেজী খুবই সাহস করেছিলেন, কিন্তু শেষে বাঁচতে পারলেন না। সেইদিন তো এই পর্যন্তই হলো। তারপর খুবানির ওপরেই তাঁর রাগ হয়ে গেল। নৈনীতালে শরদজী যদি দুটো খুবানি সামনে রেখে দিতেন, তবে তা মাচবেজীর পারদ গরম করে দেবার জন্য যথেষ্ট হতো, তিনি মনে করতেন, আমাকে রাগানোর জন্য করছেন।

রানীখেত রাস্তায় পড়ল, কিন্তু আমরা তা ফেরার সময়ের জন্য ছেড়ে গেলাম। সামনে এক জায়গায় রাস্তার মোড় ছিল। একে অপরকে না দেখে সামনা-সামনি দুটো বাস এলো, আর ড্রাইভারদের যেমন স্বভাব, হর্ণ দেবার দরকার মনে করেনি। সেদিন দুটো বাসে ধাক্কা প্রায় লেগে গিয়েছিল, কিন্তু শেষে মাডগার্ড পাহাড়ে ঢুকে গেল। ড্রাইভার যা হোক কোনোরকমে থামালো, আর আমরা একটুর জন্য রক্ষা পেয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। পাঁচটার সময় আলমোড়া পৌঁছে, রয়াল হোটেলে উঠলাম। নাম শুনে চমকাবেন না, এটা একদম মামুলি ধরনের বিনা সাজ-সরঞ্জামের মজদুরদের হোটেল ছিল। আজকাল যশপালজীও এখানে উঠেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। হরিশ্চন্দ্র জোশী, প্রফেসর পাণ্ডে ও আরো কয়েকজন বন্ধুদের নিয়ে আমরা বেড়াতে বেরোলাম। সুন্দরী মন্দিরে বিষ্ণুর সুন্দর মূর্তি ছিল, যা গুর্জর-প্রতিহার অথবা কলচুরী যুগের হতে পারে, অর্থাৎ আলমোড়া নতুন জায়গা নয়।

পরের দিন (২৬ মে) সারাদিন বেড়িয়েই কাটালাম। সকালে নৈনাদেবী গেলাম, যা রাজা দীপচন্দ বানিয়েছিল। ত্রিপুর সুন্দরী মন্দিরে কতগুলি খণ্ডিত কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর মূর্তি ছিল। পূজারীর অনুমতি নিয়ে মূর্তিগুলো বাইরে বার করে ফটো তোলার চেষ্টা করাটা পুরোপুরি বোকামি। এমন জায়গায় গুলি ভর্তি করে বন্দুক তৈরি রাখো, আর এত ঝটপট দাগো যে কেউ টের পাবার আগেই কাজ হয়ে যায়। আমি এই নীতিতেই বিশ্বাসী। ফটো তোলার জন্য সেই খণ্ডিত মূর্তিগুলো বাইরে বার করলাম। বুড়ো পূজারীকে ভয় করছিল। কিন্তু যখন সে বুঝল ফটো তুলছি, তখন সেও জামা গায়ে দিয়ে পাশে বসে পড়ল। সেখান থেকে আমরা লক্ষ্মীদত্ত জোশী (শেঠজী)-র কাছে গেলাম। তিনি সাংস্কৃতিক জিনিসের

খুবই অনুরাগী ছিলেন। হস্তলিখিত পুস্তক ও আরো অনেক জিনিস তিনি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। দুপুরের খাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার জন্য শুলাম। তিনটের সময় আবার বেরোলাম। হরিশ জোশী উকিলের বাড়িতে একটা ছোটমতন সাংস্কৃতিক বৈঠক ছিল। প্রফেসর প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত, যশপাল, আমি ও আর কিছু স্থানীয় সাহিত্যিক সেখানে এসেছিলেন। ভাষার বিষয়ে আমি আমার অভিমত জানিয়ে বললাম যে, প্রাদেশিক ভাষাকে নিজেদের প্রদেশে সর্বেসর্বা করেও সমস্ত দেশের এক সম্মিলিত ভাষার আমাদের অনিবার্য প্রয়োজন আছে, হিন্দিকে যদি আমরা সেই জায়গা না দিই, তবে ইংরেজির হাত থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

কটারমল—কুমায়ুনের সবথেকে পুরনো মন্দিরগুলোর মধ্যে কটারমল অন্যতম। এই নাম কেন হয়েছিল, তা বলা যায় না। তবে এটা সূর্যের মন্দির ছিল। যা বলে দিচ্ছিল, এটা গুর্জর-প্রতিহার কালেরও আগের হতে পারে। সূর্যের বুটপরা প্রতিমা শকদের সঙ্গে এসে ভারতে স্থাপিত হয়েছে। সাড়ে সাতটার বাসে রওনা হয়ে নীচে কোসীনদীর ধারের এক দোকানে আমরা আমাদের জিনিস রেখে ছিলাম, আর তারপর মন্দিরের দিকে রওনা হলাম। প্রথম গ্রাম পেলাম, যেখানে ৮০-৯০টি পরিবার থাকে। নায়ক, খশ (রাজপুত), ব্রাহ্মণ আর শিল্পকার (হরিজন) সবাই ছিল। মন্দিরের পূজারী ছিলেন খশ, যিনি দেখতে সাহায্য করলেন। মন্দির ভগ্নদশায় ছিল। অনেক মূর্তি ছিল, যেগুলো হয়তো বেশি সুন্দর, সেগুলো ইংরেজ পর্যটকরা অথবা কিউরিও ব্যবসায়ীরা লোপাট করে দিয়ে থাকবে। তার তিন-চারশো বছরের পুরনো খোদাইয়ের কাজ করা কাঠের দরজা মিউজিয়মে রাখার মত ছিল। সূর্যের বুটপরা তিনটি মূর্তি ছিল। শিব আর বিষ্ণুরও মূর্তি ছিল। মন্দিরের জগমোহনের সামনের থামে বাঁকা অক্ষরে তিন পংক্তির লেখা ছিল, যাতে ‘মলদেব’ পরিষ্কার পড়া যাচ্ছিল। মল অথবা মল্ল পিছনের কত্যুরিয়দেরও উপাধি হয়ে থাকে। চন্দ্রবংশের আগে কোনো রাজা হয়তো এই মন্দির বানিয়েছে। শিখরের এক তৃতীয়াংশ ভেঙে পড়েছিল। এই প্রাচীন মন্দির নষ্ট-ভ্রষ্ট করার অপরাধ ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রুহেলরা করেছিল। তারা ধাতুর মূর্তি গলিয়ে ধন তৈরি করার জন্য কাঁসারি সঙ্গে নিয়ে চলত, তাই মন্দিরে ধাতুর মূর্তি পাওয়া যেত না। পাথরের মূর্তি কোনো কাজের ছিল না তাই সেগুলোর অঙ্গ ভেঙে ছেড়ে দিত। একটি ঘরেব সামনে পৌঁছে আমি পূজারীকে জিজ্ঞেস করছিলাম, ‘নায়কদের ঘর কোথায়?’ পূজারী আমাকে চুপ করে থাকতে বলল আর পরে জানালো যে, এই ঘরগুলো নায়কদেরই। পূর্ব-উত্তরপ্রদেশের গন্ধর্বদের মত এখানকার নায়করা খানদানী বেশ্যাবৃত্তির পেশা করে এসেছে, অথবা করার জন্য বাধ্য হয়েছে। তাদের মেয়েরা এখানে অথবা সমতলের দেশে এই জন্য চলে যেত। বর্তমান শতাব্দীতে তাদের মধ্যে এর জন্য কড়া আন্দোলন হয়, যা এই প্রথাকে শেষ করে দিয়েছে। এখন তো তারা নায়ক নামও শুনতে চায় না।

মুখ্য মন্দিরের পিছনের মন্দিরে এক জায়গায় পাথরের ওপর খোদিত ছিল ‘জঙ্গম রাউল জোগী, ভোত রাউল জোগী।’ জঙ্গম পাশুপতদের (শৈব) বলা হতো, যা এখন

উত্তর-ভারতে নষ্ট হয়ে গেছে, আর কেবল দক্ষিণে কর্ণাটকে, তামিলনাড়ুতে বীর-শৈব নামে রয়েছে। দক্ষিণের শৈবরাই বেনারসে 'জঙ্গমবাড়ি' নামে তাদের প্রাচীনমঠ কায়েম করে রেখেছে। পাহাড়ে পাশুপত ধর্ম সবার শেষ পর্যন্ত ছিল, তা এই অভিলেখ থেকেও বোঝা যাচ্ছিল।

কিন্নর দেশে আমি প্রাচীনকালের কবর ও জিনিসপত্র দেখেছিলাম। আর জানতাম যে, সেই সময়ের লোকেরা মৃতদের পানপাত্র ও খাদ্যসহ বাসনের সঙ্গে কবরে গোর দিত। আমি ভাবতাম, এই প্রথা সমস্ত হিমালয়ে হওয়া উচিত। আলমোড়া থেকে বাসে আসার সময় এক ভদ্রলোক জানালেন যে রানীখেতের কাছে তাঁদের গ্রামগুলিতেও এইরকম কবর বেরোয়, যেগুলিকে লোক মুসলমানের বলে। যেহেতু সেগুলোর ভেতর থেকে খাওয়া-দাওয়ার বাসন বেরোয়, তাই এগুলি মুসলমানদের কবর নয়, এটা নিশ্চিত। কটারমল দেখে মোটরে বৈজনাথ-এর দিকে যাবার উদ্দেশে নিজের জিনিস নিয়ে কোসীর তীরে এলাম। দুপুর হয়ে গিয়েছিল। খেলাম আর বাসে রওনা হলাম। শ্রীহরিশ জোশী আমাদের জন্য আলমোড়া থেকেই দুটো সিট রিজার্ভ করিয়ে এনেছিলেন, না হলে এখান থেকে বাসে জায়গা পাওয়া মুশকিল ছিল। দুই দিকের পাহাড পাইন গাছে ঢাকা ছিল। কোথাও কোথাও খালি জায়গা অথবা খেতও পাওয়া যেত। সামেশ্বর যথেষ্ট বড় বাজার, এখানে একটা পুরনো মন্দিরও আছে। সেখান থেকে সামনে এগিয়ে গিয়ে কৌসানী পৌঁছলাম। কবিবর পন্ত যে বাড়িতে জন্মেছেন, সেই বাড়িটা দেখলাম। কৌসানী ঠাণ্ডা সুন্দর জায়গা। জঙ্গলে বেশিরভাগ পাইনের গাছ। কৌসানীর ডাঁড়ায় পৌঁছে সামনে হিমালয় শ্রেণী দেখা গেল, তারপর বাস নীচে নামতে লাগল। ঘুরপাক খাওয়া রাস্তা দিয়ে ছটার সময় আমরা গরুড় পৌঁছলাম। এখন মোটর রাস্তা এই পর্যন্ত এসেছিল,সামনে বাগেশ্বর পর্যন্ত তার যেতে এখনও কযেক বছর দেবি ছিল। জিনিসপত্র নামিয়ে আমরা বৈজনাথ মন্দিরের দিকে চললাম, যা সেখান থেকে আধমাইলের বেশি দূরে এবং নদীর পারে ছিল।

বৈজনাথ—কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বৈজনাথ কুমায়ুনের রাজধানী ছিল। কেদার-কুমায়ুনের সম্মিলিত রাজা কত্যুরী রাজাদের রাজ্য যখন ছিন্ন-ভিন্ন হলো, তখন একটি শাখা তার পুরনো রাজধানী ছেড়ে বৈজনাথ (বৈদ্যনাথ)-এ চলে আসে। রাজধানীর জন্য পাহাড়েও যথেষ্ট সমতল ও সুরক্ষিত স্থানের খোঁজ করা হয়। বৈজনাথে এই দুটি গুণ ছিল। একদিকে কোসীনর উঁচু গিরিপ্রাকার, আর অপরদিকে গোমতীর নির্গমন দ্বার। এখান থেকে দ্বারাহাট আর জোশীমঞ্চেও যাবার রাস্তা ছিল। এখনও বদরীনাথের বহু মাল গরুড়-এ মোটর থেকে নেমে এই রাস্তা দিয়ে জোশীমঠ যায়। গরুড়েই জমি সমতল মত হয়ে গেছে। যেখানে বড় বড় সমতল খেত চলে গেছে, পাহাড়ের জন্য যা অসাধারণ। বৈজনাথে সম্ভবত আমাদের বিষয়ে চিঠি পৌঁছে গিয়েছিল, তাই কিছু পরিচিত মানুষ এসে পড়লেন। হরিশজী সঙ্গে থাকাতে আরো সুবিধে হলো। মোটর থেকে নেমে আমরা বাজার হয়ে সামনে এগোলাম। বাসের এটা শেষ স্ট্যান্ড হওয়ায় এখানকার বাজার যথেষ্ট বড়,

যেখানে আমাদের সীমান্তের নাগরিক মোটাস্তিকরাও অনেক ছিল। জোহার ও গরব্যাঙ নিবাসী এই ভাইয়েরা পশ্চিম-তিব্বতের সবথেকে বড় ব্যবসায়ী, যারা মাল কেনার জন্য বোম্বাই-কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাদের দোকান এখানে থাকবে না কেন? এই সময় সন্ধে ছটা বেজে গিয়েছিল, তাই আগে আমাদের ওঠার জায়গায় যাওয়া দরকার ছিল। মন্দিরের গুচ্ছ, সব মিলিয়ে যাকে বৈজনাথ বলে, এখান থেকে প্রায় এক মাইল। গোমতীর পুল পার করে ডানদিকে ঘুরে গোমতী যেখানে একটা পাক খেয়েছে সেখানে বৈজনাথ অবস্থিত। একটা ভাল পরিষ্কার ঘরে আমাদের থাকতে দেওয়া হলো। সমস্ত ভারতেই এখন খাদ্যশস্যের সমস্যা কঠিন, আর কুমায়ুন-গাড়োয়াল তো শস্যের বিষয়ে স্বালম্বীও নয়। কিন্তু এখানেও দু-চারটে দোকান ছিল, সেখানে খাবার জিনিস পাওয়া গেল। শ্রীজয়বল্লভ মমগাই আমাকে সাহায্য করায় কোনো ত্রুটি রাখেন নি।

পরের দিন (২৮ মে) বৈজনাথের ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরগুলি আর তাদের মূর্তিগুলি দেখলাম। অষ্টভূজা ভগবতীর যথেষ্ট বড় মূর্তিটি খুব সুন্দর। অধিকাংশ মূর্তিই রুহেলেরা ভেঙে দিয়েছে, আর মন্দিরগুলিও ভেঙে পড়ার জন্য রেখে দিয়েছে। প্রধান মন্দিরের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে। রাজমহল এখান থেকে কিছু দূরে তেলীহাটে ছিল। কুমায়ুন-গাড়োয়ালে প্রাচীনকালে হাট বলতে বাজার বোঝাত না, রাজধানী বোঝাত। যে নামের সঙ্গে হাট থাকে, সেখানে অবশ্যই পুরনো মন্দির বা ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাবে, তা দ্বারহাট আর অন্য হাট থেকে প্রমাণিত হয়। তেলীহাট নাম কেন হলো? তেলী হয়তো কোনো শব্দের বিকৃত রূপ। যেমন গোয়ালিয়রের কেল্লায় তৈলপের মন্দিরকে তেলী মন্দির নাম থেকে করা হয়েছে। গ্রামে চৌপড়-চাতাল দেখিয়ে জানানো হলো যে, এখানেই রাজা-রানী চৌপড়[1] খেলতেন। খুব সম্ভব, এখানেই রাজার অন্তঃপুর ছিল। নারায়ণ মন্দিরের মূল মূর্তি এখন গণনাথগ-এ রাখা আছে। মন্দিরটি শূন্য। রাকেশ মন্দিরও গ্রামের ভেতরে আছে। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির গ্রামের বাইরে আছে, যার ওপর শকাব্দে ১২২৪ (সন ১৩০২ খ্রি·)-র লিপি আছে। এও জানা যায় যে, রাজা হামীরদেব এটা বানিয়েছিলেন কিংবা মেরামত করিয়েছিলেন, তাঁর গুরু বা মোহান্ত ছিলেন লিঙ্গরাও দে। রানী ধারাদেই মন্দিরের ওপর সুবর্ণকলস বসিয়েছিলেন। অপর একটি লেখ-এ 'কিংকরা লাকা রাওল পাল্হ ১৪২১' লেখা ছিল। ১৪২১ ও শকাব্দতেই হবে, যার অর্থ হলো যে, রাওল পাল্হ ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মে ছিলেন। রাকেশ মন্দিরও শূন্য মন্দিরগুলির একটি। গ্রামের একদম বাইরে খেতগুলিতে সত্যনারায়ণের অত্যন্ত বিধ্বস্ত মন্দির আছে, যার মূর্তি পুরনো নয়, অর্থাৎ ১৭৪২-এরও পরের হবে। পুরনো হলে রুহেলদের হাতে খণ্ড-মুণ্ড না হয়ে থাকত কি করে? পূজারী বৈষ্ণব ছিলেন। পাহাড়ে সাধু থাকাটা খুবই কঠিন, যেমন কঠিন স্বর্গে অপ্সরাদের মধ্যে থাকা। বৈজনাথের মোহান্তও কখনও দশনামী[2] সাধু ছিলেন, আর এখন তাঁদের বংশধরদের একটা গ্রাম তৈরি হয়ে গেছে। একই ব্যাপার এখানকার সাধুদের

[1]এক ধরনের পাশা খেলা, যা তিনটে ফুটকি-চিহ্নিত ঘুঁটি নিয়ে খেলতে হয়।—স·ম·

[2]শঙ্করাচার্যের মতাবলম্বী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় বিশেষ।—স·ম·

হয়েছে। বৈজনাথ, তেলীহাট আর অন্যান্য প্রাচীন স্থানগুলিতে যত মূর্তি আজ দেখা যায়, আগে তার থেকে অনেক বেশি ছিল। লোকেরা জানালো যে, গোমতীর পুল তৈরি যখন শুরু হয়, তখন গাড়িভর্তি মূর্তি বয়ে এনে ভিতের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়। সারনাথের রেলওয়ে পুলের সম্বন্ধেও আমি আগে একথা শুনেছি, তাই অবিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল না।

ফিরে গিয়ে বৈজনাথের প্রধান মন্দিরের বাইরের সুন্দর দেবীমূর্তি দেখলাম। পাশের এক মন্দিরে খোদাই করা আছে 'ভয়ঙ্করনাথ জোগী।' নাথ থেকে গোরখনাথপন্থীও হওয়া সম্ভব, দশনামীদের মধ্যেও নাথের উপাসনার প্রচার আছে। হতে পারে এই নাথ জঙ্গম (বীরশৈব অথবা পাশুপত) ছিল। আমরা জানি, উত্তর-ভারতে সবার শেষেও পাশুপতধর্মী লোকেরা হিমালয় প্রদেশে থাকত। পুরাতত্ত্ব-বিভাগের দৃষ্টি এখানকার বহুমূল্য মূর্তিগুলির ওপর পড়েছিল এবং সেই বিভাগ একটি মূর্তি-গুদাম বানিয়ে তাতে ২৮টি মূর্তি সুরক্ষিতভাবে রেখে দিয়েছে। একটি মূর্তির ওপর লেখা ছিল 'মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক শ্রীলখনপালদেবস ভূমিদা: রাজা ত্রিভুবনপালদেব দান।' 'লখনপাল··· বৈদ্যনাথ কার্তিকেয়পুর 'লেখা থেকে এটা পরিষ্কার যে, রাজা লখনপাল বৈদ্যনাথ (কার্তিকেয়পুর)-এর শাসক ছিলেন। কার্তিকেয়পুর রাজধানীর নাম ছিল, যা সম্ভবত কত্যূরীপুরের সংস্কৃত রূপান্তর। কত্যূরীবংশ চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত কুমায়ুনের শাসক ছিল। তারপরেও তার ভিন্ন-ভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় শাসন করে গেছে। সে সম্বন্ধে এবং আমার এই যাত্রা সম্বন্ধেও আমি 'কুমায়ুন'-এ লিখেছি। লেখগুলি থেকে এও জানা যায় যে, লখনপালের পর ইন্দ্রপাল আর তাঁর পরে ত্রিভুবনপাল এসেছিলেন। ত্রিভুবনপাল 'শ্রীবৈদ্যনাথদেয়-ভূমিদান··· সুরুজরাউল ভূমি লীয়মানা সুবর্ণতোল···' লেখ লিখিয়েছিলেন এবং ভূমি ও সোনা দান দিয়েছিলেন। বৈদ্যনাথে সূর্যের বুটপরা মূর্তিও পাওয়া গেল। খুব সম্ভব শককালে হিমালয়ের খসদের ওপর শকদের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। তারা কি করে জানবে যে মধ্য-এশিয়াতে দুইয়েরই উৎপত্তি এক ছিল? আমাদের আজই এখান থেকে বাগেশ্বর (ব্যাঘ্রেশ্বর) যাবার ছিল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমরা বহুক্ষণ ঘোড়ার আশায় অপেক্ষা করতে থাকলাম। যখন আর তাদের সম্ভাবনা থাকল না, তখন সাড়ে চারটের সময় নামমাত্র জিনিস ঘাড়ে চাপিয়ে আমরা দুজন রওনা হলাম। কিছুদূর যাবার পর শ্রীমমগাইজী দৌড়ে এলেন আর বললেন যে, ঘোড়া এসে গেছে। আমরা ঘোড়ায় চেপে যাব আর তিনি পায়ে হেঁটে, তা হতে পারে না। আমরা তাই ঘোড়াগুলো নিয়ে রওনা হলাম। সামনে চায়ের দোকান পর্যন্ত পৌঁছতে-পৌঁছতেই জোর বৃষ্টি নামল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো, তারপর রওনা হয়ে রাত নটায় কমেডী গ্রামে পৌঁছলাম। এই রাস্তা যথেষ্ট চালু বলে মনে হয়। আশেপাশের পাহাড়ে অনেক গ্রামও আছে, তাই রাস্তায় জায়গায় জায়গায় বেনেরা দোকান খুলে রেখেছে। থাকার জন্য আমরা মাথার ওপর ছাত পেয়ে গেলাম। ঘোড়াওলারা খাবার বানাল। রাস্তায় এক জায়গায় মাচবেজী ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন। যার পূর্বপুরুষরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে সমস্ত ভারত বিজয় করতে একবার প্রায় সফল হয়েছিলেন, তাঁদের ছেলে মাধ্যাকর্ষণের

জোরে ঘোড়সওয়ারী করবে, এটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল।

বাগেশ্বর—পরের দিন (২৯ মে) অন্ধকার থাকতে পাঁচটার সময়ই আমরা রওনা দিলাম। রাস্তা ভাল ছিল। মোটর রাস্তার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছিল। উচিত ছিল, মাইল-মাইল রাস্তা তৈরি করতে করতে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু রাস্তা সব জায়গায় তৈরি করা হয়েছিল, আর পুলের কাজ পরের জন্য ছেড়ে দেওয়া হলো। যখন বাজেটে টাকা দেখতে পাওয়া গেলনা, তখন যেখানে সেখানে তৈরি রাস্তা নষ্ট হয়ে যাবার জন্য ফেলে রাখা হলো। সাড়ে ছটা নাগাদ আমরা সাড়ে চার মাইলের যাত্রা সম্পূর্ণ করে বাগেশ্বর পৌছে গেলাম। যথেষ্ট বড় বাজার। এখানে বছরে একবার ভোট আর পাহাড়ের ব্যবসায়ীদের কয়েক দিনের একটা মেলা বসে। বৈজনাথ থেকে আসা গোমতী আর অন্যদিক থেকে আসা সরযূর এখানে সঙ্গম (ত্রিবেণী) আছে। খুবই মনোরম স্থান। অধিকাংশ দোকান আর বাজার নদীর ধারে অবস্থিত। কিন্তু সরযূর পারেও গ্রাম এবং আর অনেক সাধুদের স্থান আছে। ব্যাঘ্রেশ্বরে কত্যূরী রাজাদের একটি শিলালেখ ছিল, সেটা দেখার জন্য বিশেষ আকর্ষণ ছিল,কিন্তু জানতে পারলাম তা চুরি হয়ে গেছে। মন্দিরের গঙ্গার দিকের যাবার দরজায় পাথরের দুটি অপেক্ষাকৃত বড় মূর্তি পড়ে ছিল। এগুলোকে মূর্তি বলা উচিত নয়, কারণ খুব ভাল করে দেখলে পরেই তাতে মূর্তির আকার-প্রকার পাওয়া যায়। এগুলো গম্ভীর মুদ্রায় বুদ্ধের মূর্তি ছিল। এমন অবস্থায় কেন? সম্ভবত যে মন্দিরের এই মূর্তিগুলো ছিল, তাতে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, উত্তাপে সামনের দিকের পাথরের অংশ ফেটে বেরিয়ে গেছে। ১৭৪২ সালে রুহেলরা সমস্ত কুমায়ুন গাড়োয়ালে লুটপাট করার জন্য ছুটে বেড়িয়েছিল। তারা মন্দিরে আগুন লাগিয়ে মূর্তি ভেঙে প্রতিশোধ নিয়েছিল। চাকরি থেকে বিতাড়িত আকবরের এক জেনারেল মুহম্মদ হুসেন টুকড়িয়াও পাহাড়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। যাইহোক, ষোড়শ শতাব্দীর উত্তরার্ধ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য সময়ে এইরকম দুবার মূর্তিভগ্নকারী এবং মন্দির দহনকারী বিদ্রোহীরা এখানে পৌছেছিল। বাগেশ্বরের মন্দিরেরও হয়তো সেই সময় ক্ষতি হয়েছে দেয়াল বেশিরভাগ পাথরের ছিল, বিশাল শিবলিঙ্গে পাশুপতের চিহ্ন পাওয়া যায় না, কিন্তু পাশে দু-তিনটে ছোট ছোট মন্দির আছে, যার খণ্ডিত মূর্তিগুলির মধ্যে মুখযুক্ত লিঙ্গও আছে,যা জানিয়ে দেয় যে, এটা একসময় পাশুপত (লকুলীশ)-দের গড় ছিল। কত্যূরী শিলালেখে ব্যাঘ্রেশ্বর মহাদেবকে ভূমি-দান দেবার উল্লেখ আছে, আর এও আছে যে, রাজার বন্ধু কোনো এক কিরাত-পুত্রও তার জমি দান করেছিল। হিমালয়ে কাশ্মীরের সীমা থেকে শুরু করে নেপালের উত্তর হয়ে কম্বোজ (কম্বোডিয়া) পর্যন্ত কিরাত অথবা মৌনখ্মের জাতির খোঁজ পাওয়া যায়। আজ তিব্বত সীমান্তে মঙ্গোলীয় মুখাকৃতিবিশিষ্ট যে সব জাতি পাওয়া যায়,তাদের মধ্যে অধিকাংশ কিরাত, যাদের তিব্বতীরা 'লোন মোন্' বলে। জোহার, গরব্যাংগ, নীতি-মানা আর স্বয়ং ব্যাঘ্রেশ্বর থেকে সামান্য দূরেই আস্কোট-এ খুবই অনুন্নত জাতি রাজকিরাতী (রাজী) সেই বংশেরই।

সমতলের মত পাহাড়ে সাধুরা এসে অপ্সরাদের পাল্লায় পড়ে, তারপর তাদের বংশ

শুরু হয়। তা তাদের এখনকার বংশধরদের গিরিপুরী, আচারী, দাস, নাথ ইত্যাদি নাম থেকে বোঝা যায়। পাহাড়ে তাদের মধ্যে অনেকেরই বিয়ে-শাদি করে সাধারণ লোকেদের মধ্যে মিশে যাবার সুযোগ ছিল, কারণ এখানে জাতিবন্ধন তত কঠিন ছিল না। সমতলে তার সুযোগ কম ছিল। আমরা যাঁর অতিথি হব সেই মোতিগিরির জন্য মমগাঈজী চিঠি দিয়েছিলেন। ওখানে পৌঁছেই আমরা তাঁর বাড়ি খুঁজে বার করলাম। গোমতী আর সরযূর মত পবিত্র নদীর মাছ পাওয়া যাবে আর আমরা ঘাস-পাতা খাব, এ কেমন করে হয়? আমার আর মাচবেজীর দুজনেরই এক পথ ছিল। ওপার থেকে ঘুরে এসে মাছ-ভাত তৈরি পাওয়া গেল, আমরা তৃপ্তি নিয়ে খেলাম। দু-একটা বাড়িতে আঙুর লতা দেখলাম, তার ফল পেতে গেলে চারমাস এখানে থাকা প্রয়োজন। তা সম্ভব নয় দেখে আমরা দুজন বললাম, 'এই আঙুর নিশ্চয়ই টক হবে।' কাল পেশোয়াদের সেনানীর বংশধর আড়াই হাতের টাট্টু থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন, তাতে হাতে কিছু চোট লেগেছিল। হাসপাতাল দেখে চিকিৎসার জন্য আমরা সেখানে হাজির হলাম। ডাক্তার সাহিত্যানুরাগী হয়, এ খুব কম দেখা যায়, কিন্তু ইনি তা ছিলেন। সাত সপ্তাহেই তিনি দিল্লীর 'সাপ্তাহিক-হিন্দুস্তান'-এ ছাপা আমার একটি লেখা পড়েছিলেন, আর আমার নামের সঙ্গে আগের থেকেই পরিচিত ছিলেন। যদি আমরা আগে এমন বুঝতাম, তবে এখানেই জিনিস রেখে যেতাম। যাইহোক, কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। গান্ধী আশ্রমে তাঁদের সুতো কাটার আর বয়নের কেন্দ্রও দেখলাম। বারোটার সময় আমরা রওনা হয়ে গেলাম। আড়াই মাইল যাবার পর খুব জোর ঝড় উঠল। দেড় ঘণ্টার জন্য এক দোকানে আমাদের আশ্রয় নিতে হলো। আজই বাসের টিকিটের ব্যবস্থা করতে হতো, যা পাওয়া সহজ ছিল না, তাই আমরা ঘোড়ার গতি বাড়ালাম আর ছটার সময় বৈজনাথ পৌঁছে গেলাম। এমন সময়ে বিশ্বাস করে কাজ চলে না তাই নিজেই টিকিট নেবার জন্য গরুড় পৌঁছলাম। জবাব পেলাম, 'কাল দেব।' কি জানি, কাল পাওয়া যাবেই কি না।—'যত্নে কৃতেৎপি যদি ন সিদ্ধয়তি কোৎত্র দোষঃ।' যাইহোক, গরুড় বাজার দেখলাম, আর দেখলাম সামনে বৈজনাথের দিকের পাহাড়গুলির ওপর দিয়ে উঁকি দেওয়া হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরগুলি—ত্রিশূল ইত্যাদির শ্রেণীগুলিও। বৈজনাথে দুই ভবঘুরের আসার খবর পৌঁছে গিয়েছিল। রাতে ডাক্তার, স্কুলের শিক্ষক এবং অন্যান্য সাহিত্যানুরাগীরাও এসে পড়লেন। তাঁদের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে সভা হলো। আমরা দুজন পালা করে বলতে থাকলাম।

দ্বারাহাট—বৈজনাথ থেকে পাহাড়ী ডাঁড়া পার করে একটা সোজা রাস্তাও দ্বারাহাটে যেত, যা আট-দশ মাইলের থেকে বেশি লম্বা ছিল না। কিন্তু আমরা দু মাসের নয়, বছর দিনের রাস্তা পছন্দ করতাম, তাই ফিরে এসে রানীখেত থেকেই দ্বারাহাট যাওয়া স্থির করলাম। মোটরে জায়গা পাওয়া গেল। সাড়ে সাতটার সময় আমরা রওনা হয়ে গেলাম। কৌসানীতে দু মিনিটের জন্য নামলাম, তারপর সোমেশ্বর পৌঁছলাম। এখান থেকে অপেক্ষাকৃত কিছু সরল রাস্তা দ্বারাহাটে যেত। ঘোড়া যদি পাওয়া যেত তাহলে হয়তো আমরা এই রাস্তাতেই রওনা হতাম, কিন্তু তার সম্ভাবনা ছিল না। বস্তুত বাহন অথবা

ভারবাহকদের ভাল এবং সব সময়ের ব্যবস্থা তখনই হওয়া সম্ভব, যখন এখানে নিয়মিত ভ্রমণবিলাসীরা আসতে থাকবে। নমাসে ছমাসে আসা পর্যটকের জন্য কে নিজের ঘর থেকে খেয়ে-দেয়ে এখানে অপেক্ষা করে থাকবে? কোসীপুলের ওপর অল্প থেমে সেই বাসেই আমরা রানীখেত পৌঁছলাম। ডি· সিংহ হোটেল দেখে সেখানেই খেতে চলে গেলাম। তারপর হিন্দি সাহিত্যিক অশোকজী (শ্রীযমুনাদত্ত পাণ্ডে বৈষ্ণব)-কে পেলাম। জাতভাইকে পেয়ে গেলে কোনো জায়গা কি অপরিচিত থাকতে পারে? কিন্তু, আজই আমরা দ্বারাহাট যেতে চাইছিলাম। মনে হলো এত হুড়োহুড়ি করার কি দরকার? কিন্তু অতীত আর বর্তমানকালের মুহূর্তগুলির ভেতর প্রভেদ আছে, অতীতের মুহূর্তগুলিকে ভীষণই সস্তা মনে হয়। আমরা আমাদের মালপত্র অশোকজীর কাছে 'জীবন-বিলাস'-এ রাখলাম, আর পায়ে হেঁটে রওনা হলাম। ঘোড়া পাবার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না এবং আমরা আশা করে বসে থাকতেও চাইছিলাম না। আশা দেবার জন্য কেউ বলে দিয়েছিল যে গগাসের পুলে ঘোড়া পাওয়া যাবে, যা এখান থেকে সাড়ে পাঁচ মাইল নামার পর পড়ত। বদ্রীনাথ যাত্রীদের কিছুটা রাস্তা একই, কিন্তু ফেরৎ যাত্রী গঙ্গাসাগরের গঙ্গার মত সহস্রধারে প্রবাহিত হয়। এর মধ্যে একটা রাস্তা চৌখুটিয়া থেকে দ্বারাহাট হয়ে রানীখেতে মোটর ধরে কাঠগোদাম রেলওয়ে স্টেশনে যাবার জন্য আছে। মোটর চলতে দেখে আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে এখন কেউ কেন পায়ে হেঁটে যাবে কিন্তু এখনও এমন অনেক বদ্রীনাথ যাত্রী আছেন, যারা অনেক কষ্টে শুধু রেলের জন্যই কিছু টাকা জমাতে পারেন, আর আটা-ছাতু বেঁধে পাহাড়ের সমস্ত যাত্রা হেঁটে নিখরচায় করেন। রাস্তা চলতে গিয়ে আমরা বদ্রীনাথ ফেরৎ কিছু যাত্রী পেলাম যাঁরা বলছিলেন যে, সেখানে দু-টাকা সের চাল পাওয়া যাচ্ছিল। গগাসের পুলে কোনো ঘোড়া পাওয়া গেল না, আর সামনে দড়মাড়েও পেলাম না। কফড়াতেও সেই একই অবস্থা থাকল। তার কিছু আগে রাস্তার একটি ঝুপড়িতে চারটি ছোট ছোট বাচ্চা আর বউ-এর সঙ্গে একটি লোককে দেখলাম, যাঁর একটা পা শুকিয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করে জানলাম, দেশের জন্য তিনি অনেকবার জেল খেটেছেন। তিনি কিছু ছিলিম রেখে দিয়েছিলেন, যেগুলো পাহাড়ী মানুষরা কিনছিল। সেটাই ছিল তাঁর বেঁচে থাকার উপায়। তিনি বলছিলেন, 'বাচ্চাগুলোর একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাক, ব্যস আমার শুধু এই চিন্তা।' কারোর বাচ্চা অনাথ হোক, এটা অসহ্য আর অক্ষম্য কথা। পৃথিবীর অর্ধেক বাচ্চাদের এখন অনাথ হবার প্রয়োজন পড়ে না। তাদের মা-বাবা সরকার, কিন্তু আমাদের এখানে এখন গণতান্ত্রিক অহিংসাময় সমাজবাদের প্রতীক্ষা করা হচ্ছে।

কফড়া থেকে চড়াইয়ে উঠতে হলো, তল্লামিরে পৌঁছলাম। নতুন ঘর তৈরি হচ্ছিল, তাতে ধোঁয়ার জন্য চিমনিও লাগানো হচ্ছিল। তার সুদিন এসেছিল। কফড়া থেকে এদিকের পাহাড়গুলি গাছপালাহীন। মনে হচ্ছিল আমরা তিব্বতে এসে পড়েছি। মানুষের হাত এই গাছগুলির সংহার করেছে। আমার সবুজ অথবা নগ্ন পাহাড়গুলির কথা মনে পড়ছিল। মাঝে মাঝে হাসি-ঠাট্টা করারও ইচ্ছে হতো, কিন্তু মাচবেজীর অবস্থা খারাপ ছিল। উতরাইয়ে তো কোনো ব্যাপার ছিল না, কিন্তু চড়াই ভারি মানুষের পক্ষে ভাল মনে

হয় না। পা ফুলে গিয়েছিল। তিনি মনের জোরে হাঁটছিলেন। ভয় হচ্ছিল, আমরা মল্লী-মরে পর্যন্ত পৌঁছতে পারব কিনা। এই সময়েই হিমালয়ের দেবতাদের হলো, একজন খালি ঘোড়াওলা পেয়ে গেলাম। যাইহোক, তাতে চড়ে আমরা সেখানে পৌঁছলাম। চড়াই পার হয়ে গেলাম। এরপর ছিল উতরাই। পথেই চণ্ডেসর (চন্দ্রেশ্বর)-এর পুরনো মন্দির পেলাম, যেখানে কত্যুরী অথবা গুর্জর-প্রতিহার কালের অনেক খণ্ডিত মূর্তি ছিল। সেই সময়ের মূর্তি যে সময়ের মূর্তি বুন্দেলখণ্ডের খাজুরাহোতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বরাহরও একটি সুন্দর ছোটমত মূর্তি ছিল। এখনও দ্বারাহাট দূরে ছিল, কিন্তু উতরাই সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিল, সেইসঙ্গে সাহায্য করার জন্য দুধের মত ছড়িয়ে পড়া চাঁদের আলো এসে পড়েছিল। মোটরের রাস্তা না হয় নাই হলো, তবুও এটা তো রাস্তা, তাই পথ ভুল করার ভয় ছিল না। এখানকার খেতগুলোকে ছোটনাগপুরের খেতের মত মনে হচ্ছিল। শেষমেশ দ্বারাহাটে পৌঁছে গেলাম। একদা এটা হাট (রাজধানী) ছিল, এখন হাজার-বারোশো লোকের একটা বড় গ্রাম, যাতে বাজারের মত সারিবদ্ধভাবে অনেক দোকান আছে। রানীখেত থেকে কেউ শ্রীঅমরনাথলাল শর্মাকে চিঠি দিয়েছিল। তাঁর বাড়িতে পৌঁছলাম। তাঁর ভাই হরিশ্চন্দ্র পন্তকে অত্যন্ত উৎসাহী সাহায্যকারী হিসেবে পেলাম। নেপালের মত কয়েকতলাবিশিষ্ট এবং বেশিরভাগই কাঠের তৈরি বাড়ি ছিল। সবথেকে ওপরের অংশে শোবার জন্য জায়গা পেলাম। ডায়াবেটিসের পক্ষে শোবার জন্য সেই জায়গা সুখদ হয় না, পাশে পেচ্ছাপের ব্যবস্থা না থাকলে সে-জায়গা ডায়াবেটিসের লোকের পক্ষে সুখের হয় না। পন্তজী কি করে আমাদের রাতে না খেয়ে শুতে দিতে পারেন, যদিও আমাদের কাছে সেই ক্লান্তির মধ্যে ক্ষুধাই ছিল সবথেকে প্রিয়। একদিন আগেই তো আমরা বাগেশ্বরে ছিলাম, আর তার পরের দিনই দ্বারাহাট পৌঁছে গেলাম।

সকালে বেরিয়ে পড়লাম। চা খাওয়ার জন্য বাড়িতে অপেক্ষা করার চেয়ে কোনো দোকানে গিয়ে চা খাওয়াই ভাল, তাই গৃহকর্তা আগ্রহ করা সত্ত্বেও আমরা উঠে পড়লাম। হরিশ্চন্দ্রজী পথপ্রদর্শক ছিলেন। দ্বারাহাটে বহু দূর পর্যন্ত পুরনো নগরের চিহ্ন পাওয়া যায়, আর মন্দিরের সংখ্যা বারোটার মত। কয়েকটি মন্দিরকে সুরক্ষিত ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। এই মন্দিরগুলি একেবারে শূন্য ছিল। কিছু ভাঙ্গা-চোরা মূর্তিও তো কোথাও থাকা উচিত? তবে বিগত একশো বছরের মূর্তিচোর আর মূর্তিভক্তদের দিকে যদি মনোযোগ দিই, তাহলে কারণ বোঝা কঠিন হবে না। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে মূর্তিগুলি হয়তো ছড়িয়ে যাবে। বহু মূর্তি ইংল্যান্ডে, কিছু ইউরোপে আর অনেকগুলিই আমেরিকাতেও পৌঁছে যেতে পারে। মৃত্যুঞ্জয় মন্দিরে গিয়ে দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ের কিছু ভাঙ্গা-চোরা মূর্তি পেলাম। দ্বারাহাটেও খসদের কবরের কথা কানে এলো, আর জানানো হলো, এগুলিতে মাটির বাসন পাওয়া যায়। ঘুরতে ঘুরতে নদীপারে কেদার মন্দিরে গেলাম। এখানে পিতলের পার্শ্বনাথ ও পাথরের তীর্থঙ্কর মহাবীরের মূর্তি দেখলাম। পিতলের মূর্তিকে বালগোপাল বলে পূজা করা হতো। দ্বারাহাট যখন রাজধানী ছিল, সেই সময় সেখানকার সম্পন্ন শেঠদের মধ্যে কেউ হয়তো জৈনধর্মকে মানত। পাঁচ প্রজন্ম আগে ফক্কড় সাধু ভৈরবগিরি এখানে এসেছিলেন, যাঁর সন্তানরা এখানে থাকে। নদী পার

করে আমরা বাজারে ফিরে এলাম। নদী তো নয়, একটা নালা। কিন্তু যেখানে বছরে ৩০-৪০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, সেখানে জলকষ্ট কেন? ওপরে বাঁধ বেঁধে মস্ত জলাধার তৈরি করা যেতে পারে, কিন্তু এই কাজ এখানকার বারোশো প্রাণী তো করতে পারে না। যদি জলাধার তৈরি হয়ে যায়, তাহলে এখানে বেশ কয়েক হাজার উৎকৃষ্ট জমি মুক্তোর দানার মত চাল উগলে দিতে প্রস্তুত। রতনদেবের মন্দিরে গেলাম। সাতটি মন্দিরের একত্রিত রূপ এই মন্দিরটি, যেগুলির মধ্যে একটিতেও মূর্তি নেই। মন্যা মন্দিরেও সেইরকমই সাতটি মন্দির আছে। সম্ভবত কোনসময়ে এখানে সপ্তাহমাতৃকার পূজা হতো। মন্দিরের চত্বরে একটি জৈনমূর্তি দেখলাম। আরো মন্দিরের খোঁজ করতে করতে পণ্ডিত জহরলালজীর সবথেকে পুরনো প্রাইভেট সেক্রেটারি শ্রীশিবদত্ত উপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে পৌঁছলাম। উপাধ্যায়জী বাড়িতে ছিলেন না। পাশেই কালিকার স্থান আছে, যেখানেও তিনটি খণ্ডিত জৈনমূর্তি (পার্শ্বনাথ, মহাবীরের) দেখলাম। তারপর দ্বারাহাটের সবথেকে পুরনো দোতলা বাড়ি দেখতে গেলাম, যেটি গোর্খাদের শাসন দেখেছে, কিন্তু এখন ভেঙে পড়ার জন্য অপেক্ষা করছে। এটিকে তো ঐতিহাসিক স্মারক হিসেবে সুরক্ষিত রাখা উচিত। কচেড়ী সম্ভবত রাজার কাছারি ছিল, এখানে দশটি শিখর-যুক্ত মন্দির আছে। মূর্তিগুলি তৈলাক্ত (কালো) পাথর দিয়ে তৈরি। গুরদেব-এর মন্দির হয়তো কোনো সময় এখানকার সবথেকে সুন্দর মন্দির ছিল। গুরদেব থেকে হয়তো গুর্জর-প্রতিহার রাজা বোঝানো হয়েছে। এই মন্দিরের সমস্ত দেয়াল সুন্দর সুন্দর মূর্তি আর নক্সাতে ভর্তি ছিল। এখন মন্দিরের নীচের অংশটুকুই শুধু রয়েছে। নবম থেকে একাদশ শতাব্দীতে নিঃসন্দেহে এই দেশ গুর্জর-প্রতিহারদের দখলে ছিল। কনৌজে প্রতিহার বংশ সিংহাসন-চ্যুত হওয়ার পরও সেই বংশের ছোটখাটো কোনো রাজা গহড়বারের অধীনে থেকে যদি এখানে শাসন করে, তাহলেও আশ্চর্যের কিছু নয়। মন্দিরের ভেতরে একটা সুন্দর খণ্ডিত মূর্তি আছে। বাজার পেরিয়ে শিয়ালদার পুকুরের পাশে নির্মিত মন্দিরের বহু ভাঙা মূর্তি দেখলাম। শিয়ালদার পুকুর শুকিয়ে গেছে। বদ্রীনাথের মন্দিরের বুট পরিহিত সূর্যের একটি দণ্ডায়মান মূর্তিও আছে।

ভোজনোপরান্ত আমরা রানীখেতের দিকে মুখ ফেরালাম। পথেই হাইস্কুল ছিল, সেখানে গেলাম। শিক্ষকদের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আলোচনা হতে থাকল। খোঁজ পেলাম দ্বারাহাট থেকে বদ্রীনাথের দিকে অল্প এগোলে পাথরে খোদিত মূর্তি আছে। এও জানালেন যে, এখানকার চাষ ভগবানের ভরসায় হয়, অর্থাৎ বর্ষার সমস্ত জলটাই বয়ে যেতে দেওয়া হয়। দ্বারাহাটে ১৪-১৫ ঘণ্টাতেই যথেষ্ট পরিচিতি হয়ে গিয়েছিল, তাই ভাড়ায় দুটো ঘোড়া পেতে অসুবিধে হলো না। সাড়ে বারোটায় আমরা রওনা হয়ে সাড়ে ছটার সময় অশোকজীর জায়গায় পৌঁছে গেলাম।

রানীখেত—রানীখেত আধুনিক অর্থে হিমালয়ের সপ্তপুরীর একটি পুরী। ইংরেজরা গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য এর স্থাপনা করেছিল। রানীখেত মুখ্যত সৈনিক ছাউনির কাজ দিত। তারপর ভারতীয় নবশিক্ষিত লক্ষ্মীপাত্ররাও এই পুরীগুলিকে কাজে লাগাতে শুরু

করল। অশোকজী একজন তরুণ স্বনির্মিত ও কুশল শিল্পীর কাছে নিয়ে গেলেন। যদি প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ না পেয়ে থাকেন, তাহলে সেটা রাষ্ট্রের দোষ। কিন্তু, চিত্রকলার ভরসায় জীবনধারণ করা আজকাল কঠিন। বহু প্রতিভাবান শিল্পী ফোটোগ্রাফির সাহায্যে পেট চালাতে বাধ্য হয়। এনার ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। সবথেকে বেশি আকর্ষণীয় জিনিস ছিল তাঁর থাপের সংগ্রহ। বিবাহ বা উৎসব ইত্যাদির সময় দেয়ালে থাপে অথবা রঙ্গবল্লী (রঙ্গৌলী) বানানোর রেওয়াজ আছে, ঠিক যেমন মধুর লোকগীত গাওয়ারও রেওয়াজ আছে। গীতের জন্য এখনও মধুর ও অভ্যস্ত কণ্ঠ পাওয়া যায়, কিন্তু থাপের ভাগ্যে এমনটা খুব কম দেখা যায়। উত্তর-ভারতে সব জায়গায় থাপের নামে চিন্‌হারী আঁকা হয়। যদি মেয়েরা বয়স্কাদের কাছ থেকে কিছুটা সময় লাগিয়ে মন দিয়ে শিখে যেত, তাহলে এই সব চিন্‌হারীর দিন আসত না। চিন্‌হারীরও নিজস্ব মূল্য আছে, এতে সন্দেহ নেই। আমি মনে করি শিল্পের দৃষ্টিতে কুমায়ুনের থাপেই উত্তর-ভারতে সবথেকে সমৃদ্ধ। এগুলোকে কাগজে আঁকারও প্রথা আছে। তরুণ শিল্পী কয়েক শত থাপে খুব পরিশ্রম করে সংগ্রহ করেছেন। এই বছর (১৯৫৬ খ্রি·) শ্রীঅশোকজীর কাছে জানলাম যে তাঁর সংগ্রহ আরো বেড়েছে। এই জিনিস জাতীয় সম্পদ হবার যোগ্য এবং দিল্লীর জাতীয় চিত্রশালায় তাকে সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজন আছে। ব্যক্তিগত সংগ্রহ নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, কারণ উত্তরাধিকারীও সেসব জিনিসের প্রতি সম মনোভাবাপন্ন এমন কম দেখা যায়।

রানীখেত পাহাড়ের মেরুদণ্ডের ওপর দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। যেদিকে চোখ যায় শুধু পাইনের গাছ, যা হিমালয়ের কুৎসিত বৃক্ষগুলির মধ্যে একটি।

দুপুর দুটোর সময় রানীখেত থেকে রওনা হলাম, আর সাড়ে চারটের সময় ভওয়ালী পৌঁছে গেলাম। সেইদিনই পাঁচটার পরে তল্লীতালে নেমে নৌকাযোগে মল্লীতাল, তারপর ছটার সময় ওক লজে পৌঁছে গেলাম।

নৈনীতাল—নৈনীতালের জীবন শুরু হয়ে গিয়েছিল। ড· গোরখপ্রসাদ আর ড· অমরনাথ ঝা-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। আঠার বছর পরে পণ্ডিত রুদ্রদেব শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে খুব আনন্দ হলো। ছোটখাট চেহারা, যাতে প্রতাপ আনার জন্য দাড়ি রাখার রহস্য কোনো এক সময় পণ্ডিতজী আমাকে বলেছিলেন, এখন তা একদম সাদা হয়ে গিয়েছিল।

৪ জুন একটু জ্বর মনে হলো। দশটায় ৯৭ ডিগ্রি, বারোটায় ৯৮·৫ ডিগ্রি, তিনটেয় ১০০ ডিগ্রি আর ছটার সময় ১০০ ডিগ্রি তাপমাত্রা ছিল। সেদিন খেলাম না। পরের দিনও উপবাস করলাম, আর সাবুদানার পথ্যের উপবাস দিয়ে ৪৮ ঘণ্টা পরে জ্বর বিদায় নিল। পাহাড়ে মাংসভক্ষণ সর্বদাই বিহিত, কিন্তু শিকারের মাংস পাবার সৌভাগ্য খুব কম লোকের হয়। ৭ জুন সাধারণ শিকার নয়—গোরাল মৃগের মাংস কোনো বন্ধু পাঠাল। গোরালের শিকার ইংরেজদের কাছে খুব প্রশংসার ব্যাপার। মাংস খুব সুস্বাদু লাগল।

ভওয়ালী—ভওয়ালীতে কোনো উৎসব ছিল, যাতে ডা· কেসরওয়ানী আমাকেও নিমন্ত্রণ করলেন। ১০ তারিখ সাড়ে এগারোটার সময় আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম।

সেনেটোরিয়ামের একটি শাখা ড· অমরনাথ ঝাকে দিয়ে উদ্বোধন করানো হলো। সেইখানেই এক ইংরেজদের বিক্রির জন্য বাংলো ডেভিনশায়ার দেখতে গেলাম। কুড়ি হাজার দাম চাইছিলেন। দেয়ালগুলো ভাঙা, ছাত বেঁকা। ফার্নিচার কাজ চালানোর মত বলা যেতে পারে। সাত হাজারে পাওয়া গেলেও আমি তা নিতে রাজি ছিলাম না। পাশেই ওক্ লজের দাম ৩৮ হাজার বলা হচ্ছিল। এটা সেনেটোরিয়ামের কাজে আসতে পারে, কিন্তু সেনেটোরিয়ামের নিজস্ব জায়গা এখান থেকে কিছুটা দূরে। পরের দিন (১১ জুনে) নৈনীতাল ফিরে এলাম।

শ্রীধূপনাথ সিংহ ও বীরেন্দ্রকুমার কালই এসে গিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা হতে থাকল। ধূপনাথজীর নিজের বিশাল পরিবারের অবস্থা দুঃখজনক মনে হতো, কিন্তু একের থেকে চার আর চারের থেকে ষোলঘর তো চিরকালই হয়ে আসছে। ঘর ভরা থাকলে খুব ভাল লাগে। চারজন অতিথির সঙ্গে কথা বলে, চা খাওয়া বা খাবার খাওয়ার স্বাদ দ্বিগুণ হয়ে যায়। আমাদের বাড়িতে খুব হৈ হৈ হতো। কিছু ফুর্তিবাজ বন্ধুও এসে পড়ত। ১৫ জুন পণ্ডিত বাচস্পতি পাঠক এলেন। পাঠকজী 'মনে রহু চোলা'র খুব ভাল উদাহরণ। তিনি বাড়িতে পা দিলেই দীর্ঘদিনের বিষণ্ণতা বাড়ি ছেড়ে পালায়। তাঁর সঙ্গে গঙ্গাপ্রসাদ পাণ্ডেও ছিলেন,তারপর চন্দ্রগুপ্ত বিদ্যালঙ্কার এসে পড়লেন। বিদ্যালঙ্কারজী এক প্রকাশকের জন্য কোনো উপন্যাস লিখতে বলছিলেন, কিন্তু এখন তো লেখার কোনো চিন্তা করিনি।

মুসৌরী—ডা· সত্যকেতুর সঙ্গে পরামর্শ হয়ে গিয়েছিল যে তিনি মুসৌরীতে বাড়ি দেখে রাখুন, আর লিখলে পরে আমি চলে আসব। কমলাকেও নিয়ে যেতে চাইতাম, কিন্তু পাহাড়ে মোটর-যাত্রা তাঁর পক্ষে সুখকর হয় না, তাই সঙ্গে নিয়ে যাবার চিন্তা ছাড়তে হলো। কাঠগোদামে ট্রেন ধরার ছিল। ১৭ তারিখ আমার সঙ্গী ধূপনাথজী, বীরেন্দ্রজী, আর শরদ এবং অসংগর সঙ্গে মাচবেজীও নৈনীতাল থেকে বেরোলেন। বাবা (অসংগ) এখন মাত্র ২২ মাসের ছিল, কিন্তু খুব হাসাত, কখনও ভালুক নাচ দেখাত, কখনও অন্য কিছুর নকলও করত। বীরেন্দ্রজী বললেন, 'আমি আমার প্রকাশন-সংস্থার নাম 'রাহুল পুস্তক-প্রতিষ্ঠান' রাখতে চাই।' ধূপনাথের পরিবারকে আমি আপত্তি কি করে করতে পারতাম? বেরিলি পৌঁছে আমাকে ট্রেন ধরতে হতো, আর অন্যদের ট্রেন ধরার ছিল কাঠগোদামে, তাই তল্লীতাল থেকেই আমরা আলাদা আলাদা হয়ে গেলাম। সাত টাকা দিয়ে আমি বেরিলির বাস ধরলাম। দুটোর সময় রওনা হয়ে সাড়ে ছটায় বেরিলি পৌঁছে গেলাম। রাস্তায় ছোট শহর হল্দওয়ানী দেখলাম। তরাই-এ মুসলমানদের গ্রামের পর গ্রাম রয়েছে, এও খোঁজ পেলাম। সম্ভবত ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এরা এখানে এসেছিল। কিছুদিন আগে এখান দিয়ে ভয়ঙ্কর আঁধি গেছে। রাস্তার ধারে কত গাছ মূলশুদ্ধ উপড়ে পড়ে ছিল। বেরিলিতে খোঁজ পেলাম রাত সাড়ে এগারোটায় গাড়ি পাওয়া যাবে। গাড়িতে চড়লাম। আমাদের কামরায় প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়র রাজা জ্বালাপ্রসাদের পুত্র শ্রীক্রান্তিবীর গুপ্ত ছিলেন। তিনি শ্রীমতী সুশীলা দেবী শাস্ত্রীর পিতৃকুলের লোক। আমার

বিষয়ে তিনি কিছু জানতেন। তিনি বিজনৌর থেকে চার মাইল দূরে তাঁর ফার্ম খুলে রেখেছেন। শীতে আসার জন্য নিমন্ত্রণ পেলাম।

ভোর হবার মুখে আমাদের গাড়ি হরিদ্বার পৌঁছল। এরপর গাড়ি দুনে ঢুকল, আর সাতটার সময় আমরা দেরাদুন পৌঁছে গেলাম। বাইরে বাস আর ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। স্টেশন থেকে পৌনে দু টাকার টিকিট নিয়ে রোডওয়েজ-এর বাসে আটটার সময় বসলাম। ২২ মাইল গিয়ে নটার সময় কিংক্রেগ পৌঁছে গেলাম। আজ থেকে সাত বছর আগে একবার মুসৌরী দেখেছিলাম, কিন্তু তুলনা করার জন্য সেই সময়ের কোনো ছবি ঠিকমত মনে ছিল না। কিংক্রেগ অবশ্য কিছু কিছু মনে পড়ত। আগে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ডা· সত্যকেতুকে স্টেশনেই পেলাম। তারপর তাঁর সঙ্গে লাক্সমাউন্ট গেলাম। চা-খাওয়া ও স্নান হলো। কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়লাম। সন্ধের চা পান করে পাঁচটার সময় দেখার জন্য বেরোলাম। ক্যামেলস্ ব্যাক (উট-পিঠ) রাস্তা দিয়ে গিয়ে এক চক্কর লাগালাম। সিংঘানিয়ার প্রাসাদ দেখলাম। তার পরে আধ ফার্লং নীচে বিক্রির জন্য ছিল 'রুক্মিনী ভিলা'। তার সঙ্গে একটা কটেজও ছিল। ভিলায় ৬টি ঘর আর একটা স্নানের ঘর, অপরটিতে ৩টি ঘর আর একটি স্নানের ঘর, সঙ্গে সাড়ে তিন একর জমি ছিল। কিন্তু বাড়িটা এক্ষুণি থাকার যোগ্য ছিল না। থাকার যোগ্য বানাতে দশ হাজারের দরকার ছিল। পছন্দ হলো না। কুলহড়ী থেকে নীচেও ১৬-১৭ হাজারে পাবার মত বাড়ি দেখলাম। তাতে জমি কিছু ছিল না, আর ঘরগুলিও ব্যারাকের মত ছিল। ডাক্তার সাহেব লনঢৌর ডিপোতেও বাংলোর কথা জানালেন। নিজের অব্যবহারিকতায় এখন হাসি পায়। কিন্তু তখন যদি কেউ বলত, তাহলে শুনতেও চাইতাম না। সত্যি কথা, 'একবার জংহড়াবে, তো বাওন বীর কহাবে।' একবার ঠকলে তবেই আমাদের বুদ্ধি হবে। কিন্তু এই একবারটা তো শেষবার হবার ছিল না। এই বোকামির নমুনা এই মেজাজ খারাপ করানো পঙ্ক্তিগুলি থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায়—'লনঢৌর-ডিপোতে ভাল বাংলো যদি পাওয়া যায়, ওখানেই চেষ্টা করতে হবে। বাড়ি নিয়েই ফিরব, এটা নিশ্চিত (১৮ জুন)।' এমন অস্থিরতায় ভালর আশা করা সম্ভব ছিল না। ডা· সত্যকেতুর কথায় চললে, আমরা এখানে ভাড়ায় কিছুদিন কাটাতাম তারপর মেরামত করে কোনো বাড়ি নিয়ে নিতাম। ভবঘুরে শাস্ত্রী থেকে তখন আমি নির্জনবাসী হতে চাইছিলাম। যদি লনঢৌর-এ বাড়ি নিয়েই ফেলতাম, তাহলে কি জানি কেমন কাটত। ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় প্রফেসর ধর্মেন্দ্র শাস্ত্রী তর্কশিরোমণিকে পেয়ে গেলাম। ন্যায়কন্দলী পড়তে পড়তে দুধ দোয়াচ্ছিলেন। পাঞ্জাবের ছাপ পড়েছিল, তাই দুধের জন্য ফকির হবেন না কেন? আর শুদ্ধ দুধ তখনই পাওয়া সম্ভব, যখন মোষ সামনে দোয়ানো হয়। আজকাল এখানে ইয়ং উইমেন ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর বাড়িতে ড· পা-চাউ (এলাহাবাদ) উঠেছিলেন। পরের দিন (১৯ জুন) তিনি দেখা করতে এলেন। কমিউনিস্ট-বিপ্লবের আগে থেকেই তিনি ভারতে এসে থাকছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন না। কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে সত্যি-মিথ্যে কত কি শুনে রেখেছিলেন, তাদেরই পাল্লায় পড়েছিলেন। ড· পা-চাউ চীনা বৌদ্ধ সাহিত্যের ভাল পণ্ডিত। এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে পড়াতে এখন ডি· লিট-এর

জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। আমি বললাম, 'নতুন চীনে বিদ্বানদের জন্য বিস্তৃত কার্যক্ষেত্র প্রতীক্ষা করছে। থিসিস-এর কাজ শেষ করেই আপনি চীনে যান।'

খাবার পরে তিনটের সময় ড· সত্যকেতু আমাকে নিয়ে লনটৌর ডিপোর দিকে রওনা হলেন। লনটৌর-এ শ্রীজানকীনাথ ইঞ্জিনিয়ারকে পাওয়া গেল। তাঁর নিজেরও বাড়ি বিক্রির ছিল, যে বাড়িটা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তার এজেন্ট ছিলেন তিনি। ডিপো ও মুসৌরীর সবচেয়ে উঁচু টিলা হলো লাল টিব্বা। সেইসময় লাল নাম এত ভয়ংকর ছিল না, না হলে অন্য কোনো নামই রাখা হতো। সেখান থেকে দূর দূর পর্যন্ত উত্তরে হিমালয় শ্রেণী আর দক্ষিণে সমতল দেখা যায়। হ্যাঁ, যদি মেঘ বাধা না হয়। টিব্বার পরে একটা বিশাল বাংলোতে নিয়ে গেলেন, যাতে তখন পাঁচটি ইউরোপীয় পরিবার থাকত। এত বড় বাংলো নিয়ে আমরা কি করতাম? তারপর 'সি ফোর্ম' বাংলোটি দেখালেন। ডিপো পর্বতের পরিক্রমা-সড়ক, যার ধারে পরস্পর থেকে দূরে সরে বহু বাংলো তৈরি হয়েছে। ডিপোতে সবার আগে ইংরেজরা বসতি স্থাপন করেছিল। কোম্পানির আমলে ডিপোর অর্থ ছিল সৈনিক ছাউনি। অসুস্থ গোরাদের জন্যই এই জায়গাটা পছন্দ করা হয়েছিল। মুসৌরীর অন্যান্য সব পাহাড়ের থেকে এটা বেশি সবুজ আর দেবদারুর জন্য সুন্দর। সাড়ে সাত হাজার ফুট উচ্চ হবার ফলে এই জায়গাটা ঠাণ্ডাও বেশি, আর শীতে এখানে বরফ পড়ে আগে। 'সি-ফার্ম'এর সঙ্গে সাড়ে পাঁচ একর জমিও ছিল। এর থেকে বেশ দূরে আর একটি বাংলো আর একটি কুটির পেলাম। বাংলোটা সাড়ে ১২ হাজার টাকায় পাওযা যাবে জেনে আনন্দ হলো। ছোট মতন, কিন্তু সুন্দর। সামনে ছোট মতন ফুলবাগান ছিল, আর শাক-সবজির জন্যও যথেষ্ট খেত ছিল। খেতে আলু লাগানো হয়েছিল। সেই সময় সেখানে ডেনমার্কের রাজদূত উঠেছিলেন। ছোট ছোট কতগুলি ঘর ছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সেইসময় একটুও খেয়াল হলো না যে এটা মুসৌরীব কালাপানি, যেখানে সিজিনেও খুব কম মানুষের মুখ দেখা যায়। আমি প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলাম। তারপর তার সংলগ্ন কুটির দেখতে গেলাম। কুটিরে দু-তিনটি ঘর ছিল। সস্তা বলে এক ইউরোপীয় পাদরি তাঁর পত্নীর সঙ্গে সেখানে উঠেছিলেন। কুটির থেকে সামনে এগিয়ে গিয়ে রাস্তায় তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। শ্রীজানকীনাথজী তাঁর কুশল সংবাদ জানতে চাইলেন, তাতে তিনি মুখ নিচু করে বললেন, 'একটু এদিক-ওদিক গিয়েছিলাম, অমনি কেউ আমার কম্বলটা হাওয়া করে দিয়েছে।' এই জায়গার বাংলোর এই আরেকটা দিকও জানা হয়ে গেল। এই বিপদ ঘাড়ে নিতে আমি রাজি ছিলাম না। তাই সেই বাংলো আর ডিপো কোথাওই বাড়ি নেবার চিন্তা ত্যাগ করতে হলো।

২০ জুন সকাল আটটায় সুশীলাজী আর ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে হ্যাপিভ্যালির দিকে বেরোলাম, যা দেখামাত্র আমি তার নাম 'সুভূমি' রেখে দিলাম। মুসৌরীর এক প্রান্তে এটি সুন্দর জায়গা। এখানে বহু বাংলো তৈরি হয়ে আছে। চার্লভিল-এর ফটক এলো, তারপর নীচে যাবার রাস্তা ধরলাম। হ্যাপিভ্যালি ক্লাবের সামনে যথেষ্ট লম্বা-চওড়া ময়দান দেখলাম। একটি ফটকে বিড়লা ভবনের নাম উৎকীর্ণ দেখলাম। সামনে চুঙ্গির চৌকি পড়ল। বাঁদিকে দুটো বাংলো ছেড়ে আমরা হর্ন-ক্লিফ পৌঁছলাম। কি জানি কি ভেবে

সেদিনের ডায়েরিতে ব্র্যাকেটে এর নাম 'মার্কস ভবন'ও রেখে দিলাম। হয়তো বিড়লা ভবনের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ছিলাম। সেই চৌকিদার উপস্থিত ছিল না, তাই বাড়ির বাইরে থেকে ঘুরে দেখলাম। প্রায় সাড়ে ১৬ হাজারে বাড়িটা ঠিক হয়ে যাবে, একথা ভেবে মনে আরো বেশি উৎসাহ হলো—অগ্রিম ২৫ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে তো এসেই গিয়েছিল।

সন্ধেবেলা আবার এসে ভেতরে ঢুকে দেখলাম। মাঝখানে একটা বড় হল আর তার আশেপাশে হলের মত দুটি শোবার ঘর, যাদের দু প্রান্তে দুটি স্নানের ঘর ছিল। সামনে কাঁচ বসানো বারান্দা দুটি ঘরের মতই ছিল। চিন্তা ডানা মেলল—শোবার ঘরে বৈঠকও হতে পারে আবার অতিথিও বসতে পারে। আসলে ছটি ঘরের জায়গা ছিল, কিন্তু বড় করে বানিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছিল। ভাগ করে হলকে দুটো করে করা যেতে পারে অথবা খাবার ঘর হিসাবে একদিকের বারান্দাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। শোবার ঘরকে ভাগ করে দুটো করা যায়, আর বারান্দা নিয়ে কোনো সময়ে তিন জন অতিথির ক্লাজ চলতে পারে। আউট হাউস (বাইরের বাড়ি)-এ দোতলা নিয়ে আটটি ঘর ছিল, যাদের মধ্যে একটিকে অতিথিভবনেও পরিণত করা যেতে পারে, যদি তার পাশের ঘরটিকে স্নানঘর বানানো সম্ভব হয়। বাংলোর আশেপাশে শাক-সবজির জন্য খেতও ছিল। সামনে বেশি জায়গা ছিল না, কিন্তু যে পাশে ফটক আছে সেখানে বসার জন্য একটা ভাল জায়গা বানানো যেতে পারে। দু একব জমি আর সাড়ে ১৬ হাজার দাম খুব বেশি মনে হলো না। খোঁজ পেলাম, সেটা টেহরী রানীর সম্পত্তি। বাড়ির ব্যাপারে মনস্থির হয়ে গিয়েছিল, তবুও ফেরার সময য অন্য রাস্তা দিয়ে গেলাম। সেখানে পাটিয়ালার রাজকুমার আর তাঁর শালা দলীপপুরের বাজার বাড়িগুলি দেখলাম। বাজাসাহেবেব বাড়িতে অনেকগুলি ঘর ছিল, দাম ৪০ হাজার চাইছিলেন। বাজকুমার তো লাখের কথা বলছিলেন। কিছুদিন পরে এই বাড়িগুলি জলের দামে বিকিয়েছে। কিন্তু সেইসময় লোক লাখের কথা চিন্তা করত। আমি হর্ন-ক্লিফ পছন্দ করে ফেলেছিলাম। আর তেমন কোনো বাড়ি দেখার মত ছিল না অথবা বলতে পারেন অস্থির মানুষের তার জন্য সময় ছিল না। হর্ন-ক্লিফ ভাগ্যেব সঙ্গে বাঁধা হয়ে গেল। আর সেই রাতে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোলাম।

মুসৌরীর দিকে

২১ জুন এজেন্টের সঙ্গে কথাবার্তা হলো। দাম বেশি বলছিলেন, কিন্তু সাড়ে ১৬ হাজারের ওপরে উঠতে আমি রাজি ছিলাম না। সেইসময় এমন বাড়ির ওর থেকে বেশি দাম হতে পারত না, আর আজ তো ২০ হাজার খরচ করে যদি অর্ধেক পাওয়া যায় তো সেটাই অনেক মনে করুন। প্রতিবেশি 'কিলডর'-এর ওঁরা যাঁরা ৬০ হাজারের কমে কথা শুনতে রাজি ছিল না, পরে ২২ হাজার পেয়ে বাড়িউলিরা তাই ঢের মনে করল। সন্ধে পর্যন্ত সেই

রাহুল-৪/ফর্মা-২১

দামেই বাড়ি ঠিক হয়ে গেল। বাড়ি পুরনো ছিল, তবে আমরা ভাবলাম, দশ-বিশ বছর তো চলে যাবেই। লাইব্রেরির দিকে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় সস্ত্রীক শ্রীজগদীশচন্দ্র মাথুরের সঙ্গে দেখা। এখন তিনি বিহার সরকারের শিক্ষাসচিব ছিলেন। খুবই উদ্যমী পুরুষ। বিহার সরকার ড· জয়সওয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন করতে মনস্থ করেছিল। মাথুর সাহেব জানালেন যে, এর খরচের জন্য এই বছর ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। জয়সওয়ালজীর কাছ থেকে আমার সম্বন্ধে আর আমার কাজের সম্বন্ধে তাঁর জানা ছিল। হিন্দির একজন ভাল লেখক হিসেবে তিনি আমার কাছে পরিচিত ছিলেন। সবচেয়ে আগে আমাদের পরিচয় সেইসময় হয়েছিল, যখন লড়াইয়ের দিনে কমিউনিস্ট হবার জন্য হাজারীবাগ জেলে আটক ছিলাম, আর মাথুরসাহেব আই· সি· এস· করে কাজ শেখার জন্য জেলে আসেন। আমার মত বিপজ্জনক রাজবন্দীর সঙ্গে সেই সময় দেখা করাটা নতুন অফিসারের পক্ষে বিপদের কথা ছিল, কিন্তু মাথুর সাহেবের নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল। জয়সওয়ালজীর নামের সংস্থায় কাজ করার ইচ্ছে হবে না কেন, কিন্তু আমার পক্ষে না চাকরি করা সম্ভব ছিল, আর না বিহারের গরম-বর্ষা সহ্য করা সম্ভব ছিল। আমি এটাই বললাম যে আমি সাহায্য করতে রাজি, কিন্তু বৈতনিক কাজ করতে পারব না। একশো বছর আগে ইংরেজরা নিজেদের জন্য লাইব্রেরি স্থাপন করেছিল। আগে এখানে ইংরেজ ছাড়া আর কেউ মেম্বার হতে পারত না। এখন সে নিয়ম তুলে নেওয়া হয়েছে, যদিও ব্যবস্থাপনা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পুরুষ ও মহিলাদের হাতে ছিল। এর নিজস্ব বাড়ির নীচে কয়েকটা দোকান আছে, সদস্য-চাঁদাও পাওয়া যায়, তাই একে গরিব বলা চলে না। একশো বছরে বহু কাজের বই সংগ্রহ হতে পারত, কিন্তু এখানে হাল্কা ধরনের বইই বেশি দেখলাম। হিমালয় সম্বন্ধী অ্যাটকিন্সন-এর মত গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের অভাব ছিল।

২২ তারিখ এজেন্টসাহেব আবার বাড়ির দাম বাড়ানোর কথা শুরু করল। প্রথমে মনে হলো, এবার অন্য বাড়ি খুঁজতে হবে। আমি তার থেকে এক পয়সাও বাড়াতে রাজি ছিলাম না। শেষে সেই দামে দাঁড়াল। আমি দুহাজার বায়না দিয়ে দিলাম। ড· সত্যকেতুকে পাঁচশো টাকা দিয়ে বাড়িটাকে মেরামত আর চুনকাম ইত্যাদি করার জন্য বলে দিলাম। ড· কেসকর ড· সত্যকেতুর প্যারিসের পরিচিত ছিলেন, আর আমার সঙ্গেও মুখচেনা ছিল। সেদিন সন্ধেবেলা তিনি লাক্সমাউন্ট-এ চা খেতে এলেন। আমার সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ হলো। সেই সন্ধেয় আবার হর্ন-ক্লিফে গেলাম। হর্ন-ক্লিফের সমস্ত গুণ দেখার মত আমার না তখন চোখ ছিল আর না শুধু তার দোষগুলো দেখা সম্ভব ছিল। আমাকে বারো মাস মুসৌরীতে থাকতে হতো, যেখানে শীতের সময় দিনেও বহুবার তাপমাত্রা হিমবিন্দুর নীচে থাকে। এমন সময়ের পক্ষে এর কাঁচওলা বারান্দা খুব অনুকূল প্রমাণিত হলো, কারণ সূর্যোদয় হওয়া মাত্র তা দিয়ে সূর্যের কিরণ এসে পড়ত, আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবার নাম করত না। বারান্দার ভেতর অথবা বাইরে থেকে প্রায়ই বরফাচ্ছাদিত গিরিরাজ-এর শিখরগুলি কেদারনাথের কাছে প্রায় যমুনোত্রী পর্যন্ত দেখা যেত। শিখরগুলিই শুধু নয়, তার নীচে বহুদূর পর্যন্ত বহু পর্বত-শ্রেণী পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রমশ ওপরে উঠে গেছে। বর্ষাকালে যখন নীচের সমস্ত পর্বতস্থলী সবুজে সবুজ এবং

ওপরে রজত শিখরশৃঙ্খলাগুলি নিরভ্র দিনে সামনে এসে দাঁড়াত তখন সেই দৃশ্য বড়ই মনমুগ্ধকর হতো। মেঘ থাকার জন্য উপত্যকার একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়ানো সাতরঙা ইন্দ্রধনু এখানে দুর্লভ বস্তু ছিল না। এই গুণগুলি তখন আমি বুঝিনি, আর বুঝিনি এই বড় দোষটা যে, এই তিনটে হলকে যা শুধু লম্বা-চওড়াতেই বেশি নয়—দোতলা প্রাসাদের সমান উঁচুও, আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কখনও গরম করা সম্ভব নয়, আগুনের কাছ ঘেঁষে বসলে পরেই অল্প গরম পাওয়া যেতে পারে। বাংলোতে ফ্লাড আর ওয়াশ বেসিনের ব্যবস্থা ছিল না। তবে এরকম বাংলোই তো এখানে বেশি পাওয়া যায়।

নৈনীতাল—বাড়ি ঠিকঠাক হয়ে গেলে পরে এবার নৈনীতাল গিয়ে জিনিসপত্র সহ কমলাকে নিয়ে আসার ছিল। ২৩ জুন প্রফেসর শ্রীগয়াপ্রসাদ শুক্লর বাড়ি (সেবক আশ্রম রোডে) সওয়া এগারোটার সময় পৌঁছলাম। জুনের শেষ। বৃষ্টি হলেও ঘাম হওয়াটা সাধারণ ব্যাপার, আর শুক্লজীর বাড়িতে পাখার সাহায্য নিতে হলো। মাছিও খুব ছিল। মুসৌরী অথবা নৈনীতালে এই দুটোরই অভাব ছিল। দেরাদুন তার লিচুর জন্য খুব খ্যাতিলাভ করেছে। এখানকার ভালো লিচু তার স্বাদ আর আকারে মজঃফরপুরের লিচুর থেকে কোনো অংশে কম নয়। এক টুকরি লিচু উপঢৌকন হিসেবে আমিও নিয়ে নিলাম। রাত সাড়ে সাতটায় দিল্লীগামী এক্সপ্রেস ধরলাম, যাতে প্রয়াগের কামরা থাকে। আমার কামরায় জব্বলপুরের যাত্রী এক শিখ কর্নেল, দুজন ১০-১২ বছরের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছেলে ছিল। কর্নেল সাহেবের দুই ছেলেও যাচ্ছিল তাঁর সঙ্গে, আর বাবা-ছেলে কেবল ইংরেজিতে কথা বলছিল। এই মন কি আর সিপাইদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেবে? কিন্তু, এখন তো সমস্ত কুয়োতেই সিদ্ধি মিশেছে বলে মনে হয়। লাক্সৌর-এ কামরা সকাল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর পশ্চিম থেকে অন্য ট্রেনে জুড়ে গিয়ে নটার সময় বেরিলি পৌঁছলাম। প্রফেসর ভোলানাথ শর্মার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কাঠগোদামের ট্রেন ছাড়তে দেরি ছিল না। সেটা ধরে সন্ধে পাঁচটায় আমি কাঠগোদাম পৌঁছলাম। তারপর বাস ধরে পৌনে সাতটার সময় নৈনীতাল। বৃষ্টি হচ্ছিল। এই বৃষ্টির মধ্যে আমাদের মুসৌরীতে স্থান পরিবর্তন করতে হতো। এখন খুব ভিড় ছিল। নৌকোতে লোকেরা 'ঝিঝরী' খেলছিল, যার জন্য তা পাওয়া গেল না। কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে রাতে ওক লজে পৌঁছলাম।

২৫ জুন রোববার ছিল। আজ সাহিত্যিক গোবিন্দবল্লভ পন্ত এলেন। খুবই সাদাসিধা, কিন্তু তত্ত্ববিদ হিসেবে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি উপন্যাস লিখেছেন, নাটক লিখেছেন। সবই অত্যন্ত পরিশ্রম করে এবং ভালভাবে লিখে গেছেন। আমার অবাক লাগে এবং দুঃখও হয় যে, কেন এমন সাদাসিধা মানুষকে হিন্দিওলারা বুঝতে পারছে না। শান্তিপ্রিয় দ্বিবেদী এবং গোবিন্দবল্লভ পন্তের মধ্যে বহু ব্যাপারই একরকম। শান্তিপ্রিয় দ্বিবেদীকেও বহুদিন উপেক্ষা করা হয়েছে কিন্তু এখন হিন্দিওলারা শব্দ ও অর্থের এই সজাগ শিল্পীকে চিনতে শুরু করেছে। এই অষ্টাবক্র মুনির ওপর শুধু তাঁর দেহটুকুরই বোঝা

আছে, যা মণখানেকের থেকে বেশি নয়। শান্তিপ্রিয়কে ফুঁ দিলে উড়ে যাবেন। তাঁর রচনাগুলি যদি আজ থেকে ৫০ বছর পরে অস্তিত্ব লাভ করত তাহলে তাঁর নিজস্ব বাংলো হতো, নিজস্ব গাড়ি হতো, একাধিক মহিলা প্রাইভেট-সেক্রেটারি, সাহিত্য-সেক্রেটারি এবং টাইপিস্টের কাজ করত। 'খাও, দাও, ফুর্তি করো'র ধ্বনি বাড়ির দরজা-দেওয়াল দিয়েও বেরোত। কিন্তু আজ কোনো কাজ নেই। মাথা গোঁজার জন্য ঠিকমত ঘর নেই। নিজের ঘর হবেই বা কি করে? কোনো সাহিত্য-রসিক মহিলার কৃপাদৃষ্টি তাঁর কখনও জোটেনি। শান্তিপ্রিয়জীর পরজন্মে বিশ্বাস আছে, তাই হয়তো তিনি এই জন্মের লোকসান পরের জন্মে সুদসহ পুষিয়ে নেবেন। এতটা হওয়া সত্ত্বেও যখন পন্তজীর তুলনা শান্তিপ্রিয়ার সঙ্গে করি, তখন বলতে হয় যে, পন্তজীকে আরো ভীষণ কষ্ট ও চিন্তার মধ্যে দিন কাটাতে হয়। নৈনীতালে সস্তা বলে উনি এমন বাড়িতে থাকেন, যেটা যে কোনো সময়ে ভেঙে পড়ে তাঁকে নিশ্চিন্ত করতে পারে। এই কথা চিন্তা করেই তিনি সে-ঘরে থাকেন না তো? তাঁর রচনাগুলিও মুক্তোর অক্ষরে লেখা হয়েছে। 'নূরজহাঁ' হাতে নেবার সময় আমার মনে হলো, এটা ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে লেখা বই, যা 'দুর্গম্ পথঃ তত্ কবয়ো বদন্তি।' এই দুর্গম পথে পদে পদে স্খলিত হবার ভয় আছে, কিন্তু বই শেষ করার পর বাহ্ বাহ্ করতে গিয়ে আমি অনুতপ্ত হলাম যে, কেন আমি এতদিন এই বইটা দেখিনি। আমাদের প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরও পদবী পন্ত। সাহিত্যিক তাঁর নামের সঙ্গে কোনো পদবীও যোগ করেননি, এর পরিণাম প্রায়ই এই হয় যে, সাহিত্যিক পন্তের চিঠিগুলি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চলে যায়, এবং তাঁর চিঠির জঙ্গলে হারিয়ে গিয়ে অনেকগুলিই আবার ফিরে স্বস্থানে পৌঁছতে পারে না। এমন সুন্দর সাহিত্যিকের এই দীন-হীন অবস্থা দেখে হৃদয় বিদ্রোহী হয়ে বলে, 'উঠে গিয়ে সমস্ত অট্টালিকায় আগুন ধরিয়ে দাও।' কিন্তু তা তো পাগলামি। অট্টালিকাগুলি কি অপরাধ করেছে? অট্টালিকাগুলিও মালিক পরিবর্তন করতে পারে এবং তাদের মধ্যে একটা অট্টালিকা ঔপন্যাসিক-নাট্যকার গোবিন্দবল্লভ পন্ত এবং একটা 'মুক্তো গাঁথার মানুষ' শান্তিপ্রিয় পেতে পারেন। এই অট্টালিকাগুলিতে আজ অযোগ্যদের অধিকার রয়েছে, যেহেতু এটা 'অন্ধের নগরী।' যতদিন অন্ধের নগরী দূর হবে না, ততদিন সমস্ত জায়গা অন্ধকার হয়ে থাকবে।

শ্রীপ্রভুদয়াল মিত্তল (মথুরা)-এর বই 'ঋতু সৌন্দর্য' ভূমিকা লিখে দেবার জন্য এলো। ব্রজভাষার কত সম্পদ যে মিত্তলজী নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রহ আর সম্পাদনা করেছেন, তা দেখে তাঁর আগ্রহকে অবহেলা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে কাব্য-কৃতির বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করতে আমার অসীম সংকোচ হয়। তার জন্য আমি নিজেকে অযোগ্য মনে করি। অযোগ্য মনে করব না কেন? যে সব পঙ্ক্তি শুনে লোকেরা আনন্দে মাথা দোলাতে থাকে, তা শুনে অথবা পড়ে আমার মন গলেও না, উত্তপ্ত হয় না, যেন মোষের সামনে বীণা বাজছে। সত্যিসত্যিই আমি নিজেকে কাব্য-নেত্রের অন্ধ বলে মনে করতাম, যদি না অশ্বঘোষ, কালিদাস, বাণ, তুলসী, জয়শংকর প্রসাদ আমার এই পাথরের হৃদয়কে নড়াতে ও গলাতে সক্ষম না হতো। মিত্তলজীর বইয়ের প্রতি অন্যায় করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তবে অন্যান্য অনেক তরুণ ও প্রৌঢ় কবিরা যখন এই ধরনের আগ্রহ

করেন, তখন মুশকিল হয়ে যায়। অনেককে সম্পত্তি লেখার কথা বলে ঠেকিয়ে রাখতে হয়, আবার অনেককে দেখতে কতগুলো বাক্যে কিছু লিখে দিতে হয়।

২৬ জুন শ্রীপুরুষোত্তম কাপুরের লক্ষ্ণৌ থেকে পাঠান দসেরি আম এলো। পাহাড়ের ঠাণ্ডার লোভে পড়ার এটাই সবথেকে বড় লোকসান যে আমের মরশুমে আমের কাছে থাকার সুযোগ হয় না। আমের প্রতি আমার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে, একথা বলা আত্মশ্লাঘা হবে, কারণ আম অজাতশত্রুই নয়, বরং সর্বমিত্র। হিমালয়ের বিলাসপুরীগুলিতে এমনিতে আম দুর্লভ নয়, শুধু দাম তার দ্বিগুণ হয়। কিন্তু সবথেকে বেশি লোকসানের ব্যাপার হলো, গাছের নীচে তাজা পাকা আম বালতির জলে রেখে খাওয়ায় যে আনন্দ. সে-আনন্দ এখানে কোথায়? কোনো কোনো সময়ে তো মনে হয়, আমরা আম নয় শক্ত পয়সা খাচ্ছি।

এই সময় খবর পড়লাম, আমেরিকা অর্ধেক দক্ষিণ কোরিয়া নিয়ে খুশি না থেকে সমস্তটা নিজের মুঠোয় করতে চাইছে। সে তার কাঠের পুতুল সিগ্‌মনরিকে উসকানি দিয়ে উত্তর-কোরিয়ার উপর আক্রমণ করিয়ে দিয়েছে। আসল কথা ছিল এই। কিন্তু আমাদের এখানে তো সারা দুনিয়ার খবর রয়টার মারফৎ আসে, যা কিনা আমেরিকার খেলনা ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রচারক এজেন্সি মাত্র। খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছিল, আক্রমণ উত্তর-কোরিয়া করেছে। উত্তর-কোরিয়ার কমিউনিস্ট শাসন আমেরিকার চোখের কাঁটা ছিল, যা মেনে নিতে সর্বদাই তার অনুশোচনা হচ্ছিল।

২৭ জুন পরমানন্দজী বাকি ১৫ হাজারের চেকও পাঠিয়ে দিলেন। ১০ হাজার আগে এসেছিল, যার থেকে খরচ হয়ে এখন তিন হাজার ছিল। এখন বাড়ির জন্য ১৪ হাজার দিতে হতো। আমি খুব মেজাজে খরচ করছিলাম। যদিও সারা বছরের খরচের জন্য চিন্তাও হচ্ছিল।

২৮ জুন হঠাৎ এই খবর পেয়ে হতবাক হয়ে গেলাম যে, ২৬ জুন স্বামী সহজানন্দের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর শরীর আর প্রতিটি রোমকূপের কর্মঠতা দেখে আমার পক্ষে কখনও চিন্তা করাও সম্ভব ছিল না যে এত তাড়াতাড়ি তা জবাব দিয়ে দেবে। খবর পেলাম তাঁর রক্তচাপের অসুখ ছিল। মজঃফরপুর জেলায় মোটরে কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তায় চাপ অত্যধিক বেড়ে যায় এবং তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কোনো লাভ হয়নি। শ্রমিক-কৃষক-রাজ্য গড়ার নির্ভীক স্বপ্নদ্রষ্টা, শোষিত-পীড়িতদের অদম্য নেতা চলে গেলেন। এই তো মার্চে তাঁর সঙ্গে প্রয়াগে দেখা হলো ভবিষ্যতের কত পরিকল্পনা করছিলেন। আমার প্রতি তাঁর স্নেহের জন্যই তো সেদিন প্রয়াগে কত জায়গায় খুঁজতে খুঁজতে শেষে তিনি আমাকে ধরেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নীতির সঙ্গে তাঁর মতভেদ ছিল, কিন্তু পার্টির তিনি শুধু অনন্য কল্যাণকামীই নন, ভক্তও ছিলেন। তিনি বলতেন, 'এরাই হলেন পোড় খাওয়া সৎ কর্মী। এরাই সেই সব তরুণ আর প্রৌঢ়, যাঁরা নিজেদের কাজ শেখার জন্য সম্পূর্ণ পরিশ্রম করেন, প্রচুর পড়াশোনা করেন, ভীষণ চিন্তা করেন। এরা ভ্রষ্টাচারে পড়তে পারেন না। পার্টিই আমাদের দেশের ভবিষ্যতের একমাত্র আশা।' সেই সময় পার্টির কিছু নেতা খুব তাড়াতাড়ি বিপ্লবের জন্য কাজ করতে চাইতেন।

স্বামীজী সেই সময়কে অনুকূল বলে মনে করতেন না। বলতেন, 'আমাদেরও বোঝানো হোক, ঝাঁপ দেওয়া থেকে আমরাও বঞ্চিত হব না। কিন্তু এমন তো তখনই হওয়া উচিত, যখন দেশের প্রবুদ্ধ-তরুণ-মানবতার একটা খুব বড় অংশ এই ঝাঁপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে, তখনই কিছু পাওয়া সম্ভব। স্বামীজী আমার জেলা (আজমগড়)-র প্রতিবেশী গাজীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন—এইটুকু বললে যথেষ্ট হয় না। আমার পিতৃগ্রাম থেকে তাঁর জন্মগ্রাম মাত্র কয়েক ক্রোশ দূরে ছিল। অসহযোগের দিনগুলিতে তাঁর নাম সর্বপ্রথম শুনি, কিন্তু সেই সময় আমি বিহারে কাজ করতাম, আর তিনি যুক্তপ্রদেশে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ছাপরায় প্রথম দেখা হয়েছিল। সেখানে ভূমিহার ব্রাহ্মণ সম্মেলন হচ্ছিল। প্রারম্ভিক সর্বজনীন জীবনে স্বামীজী ভূমিহারদের উত্থাপনের জন্য পণ করেছিলেন। এই জাতি পতিত ছিল না। পূর্ব-যুক্তপ্রদেশ ও বিহারেই ভূমিহাররা থাকে। সেখানকার বড় বড় জমিদারদের বেশিরভাগই ভূমিহার ছিল। কৃষক হওয়া সত্ত্বেও তারা ভাল অবস্থায় ছিল, তার মানে এই নয় যে, ভূমিহারদের বেশির ভাগকেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা স্পর্শ করতে পারে না। এই কথাটা কিছুদিন পরে স্বামীজী বুঝতে পারেন। সেই সময় তাঁর পা ধোওয়ার জন্য সত্যিসত্যিই বড় বড় ভূমিহার মহারাজা আর মহারাজা বাহাদুর প্রস্তুত ছিলেন। সম্মানের সুবর্ণ শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসা মানুষের পক্ষে খুব কঠিন। কিন্তু সেই সৎ ও নির্ভীক-হৃদয় পুরুষকে তাঁর ধ্যেয় থেকে কোনো শক্তিই সরিয়ে রাখতে পারতনা। ছাপরায় ভূমিহার সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে খুব আনন্দ হলো। কিন্তু দুঃখও হলো যে, তিনি জাত-পাতের কল্যাণের সমর্থক হচ্ছেন।

১৯২৬ সালে কংগ্রেস কাউন্সিল-এর নির্বাচনে সরাসরি যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিল। বাবু জলেশ্বরপ্রসাদ কংগ্রেসের তরফে প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন, আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কংগ্রেসেরই অপর কর্মী বাবু শ্রীনন্দন প্রসাদ নারায়ণ সিংহ। শ্রীনন্দন বাবু কংগ্রেস কর্মীদের খুব বেশি সাহায্য পেয়েছিলেন, জেলার কংগ্রেস কর্মীরা তাঁকেই দাঁড় করাতে চাইতেন। কিন্তু যখন জলেশ্বরবাবুকে কংগ্রেস দাঁড় করিয়ে দিল, তখন আমার তাঁকে সমর্থন করা ছাড়া অন্য রাস্তা ছিল না। জলেশ্বরবাবু আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, সেটা কারণ ছিল না, বরং শ্রীনন্দন বাবুর স্নেহ ও সম্মানও আমার প্রতি কম ছিল না। এই সময় নির্বাচনক্ষেত্রে আমি আর স্বামীজী সামনাসামনি ছিলাম। জলেশ্বরবাবুর সারথী ছিলাম আমি, আর শ্রীনন্দনবাবুর স্বামীজী। আমি শুধু ছাপরা জেলাতেই সবথেকে বেশি নির্বাচন প্রচারের কাজ করতাম। আর স্বামীজী বেশ কতগুলি জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। হ্যাঁ, নির্বাচনের দিন অবশ্যই আমরা দুজন সেই থানাগুলিতে চেপে বসেছিলাম, যেখানের ভোট ছিল নির্ণয়াক। দুটি দলের প্রধান হয়ে ব্যক্তিগত স্নেহ ও সম্মান কি ভাবে অটুট রাখা যায় তার সন্ধান আমি এখানেই পাই। স্বামীজীকে নিয়ে ব্যক্তিগত অভিযোগ শুনতে আমি রাজি ছিলাম না, আর একই কথা সম্বন্ধেও বলা চলে। ১৯৩১-এ আমাদের দুজনের উদ্দেশ্য এক হয়ে গেল। তখন থেকে ১৯ বছর কেটে গেছে, আমরা পরস্পরের অত্যন্ত কাছে থেকেছি—আধ্যাত্মিক শরীরে আমরা অভিন্ন হয়ে গিয়েছি। তাঁর কত আশা ছিল। তিনমাস আগেও তাঁর শরীরকে কর্মক্ষম দেখেছিলাম। এমন মানুষের সঙ্গে হঠাৎ করে চিরকালের

জন্য বিচ্ছেদ কেন অসহ্য হবে না?

মুসৌরী থেকে ড· সত্যকেতুর চিঠি আসতে দেরি ছিল, আর আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হতো। মাসের শেষ তারিখে তাঁর চিঠি এলো যে, ৭ জুলাই নাগাদ বাংলো থাকার মত হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা ১১ জুলাই নৈনীতাল ছাড়তে পারলাম।

এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি মন্ত্রণালয় হিন্দি পারিভাষিক শব্দ তৈরি করার কাজ নিজেদের হাতে নিয়েছিল। মৌলানা আজাদের উদাসীনতা অথবা কাজ বন্ধের নীতি এর কারণ। শিক্ষা-মন্ত্রকের এর জন্য এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু মৌলানা মনে খুব আঘাত পেলেন, যখন উর্দুর বিষয়ে তাঁর কথা মানা হলো না। এখন তিনি নিজের নাক কাটিয়েও অনিষ্ট করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কৃষিমন্ত্রীও তাঁর বিভাগ সম্বন্ধীয় এমন পরিভাষাবলী একত্রিত করার জন্য একটি সমিতি বানালেন, যাতে আমার নামও ছিল। এমনি আরো কিছু বিভাগও সমিতিতে আমাকে রেখেছিল কিন্তু মুসৌরী পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার হাতের কাজগুলোই পুরো দমে করতে চাইছিলাম, এই সমিতিগুলির সদস্যপদ তাতে প্রতিবন্ধক হতো, তাই আমি সবগুলিতে ইস্তফা দিয়ে দিলাম।

৫ জুলাই থেকে আমার ছড়িয়ে থাকা বইপত্র আবার বাক্সে ভরে সেগুলো বর্ষা থেকে বাঁচানোর জন্য তেরপল দিয়ে জড়াতে শুরু করলাম। বাড়িব বাকি তিনশো টাকা ভাড়াও চুকিয়ে দিলাম। ৯ জুলাই আমাদের প্রতিবেশী শ্রী শীতল প্রসাদ গুপ্তজী একটি ছোট মত ভোজ দিলেন, যাতে নীচেব-ওপরের সমস্ত লোক যোগ দিয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল, গত তিন-চার মাসে এখানে আমাদের শিকড় গভীরে চলে গিয়েছিল। গুপ্তজীর পবিবার, বাঁকেলালজীর পরিবার দুইই আমাদেব পরিবারের মত হয়ে গিয়েছিল। একদিনও মনোমালিন্য হবার সুযোগ হয়নি। রাঁধুনির অসুবিধে আমাদের সবসময় থাকত, কিন্তু সেই সময় বাঁকেলালজীর ওখানে আমাদের খাবার উৎসাহের সঙ্গে তৈরি হতো। বাঁকেলালজীর সমস্ত পরিবারই আর্যসমাজী ছিল। নৈনীতাল আর্যসমাজের তিনি প্রধান ছিলেন এবং এই সময় আর্যসমাজ মন্দির বানানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কে জানে কত মাস বা বছর ধরে তাঁর স্ত্রী শনিবার মৌন থাকতেন। আমি কখনও বলিনি যে, মৌন থাকা বেকার, বরং অতিশয়োক্তিপূর্বক তার প্রশংসা করতাম, যে কারণে একদিন তিনি নিজেই এই ব্রত ছেড়ে দেন। বিহারললালজী যেমন অদম্য পর্বতারোহী ছিলেন, তেমনই হাসিমুখ ছিলেন তিনি। বাড়ির শিশুরাও বেশ ভাল ছিল। রামনমাই তো কৌরবীর সুন্দর গল্প এবং গীত বলে বলে আমাদের খুব সাহায্য করেছিল। তাঁর কথা ভোলার নয়, রোজ খাবার খেয়ে ১০-১১টাব সময় এসে বলতেন—‘কমলা রানী. রোটী-রাটী কর লী?’ গুপ্তজী ও তাঁর স্ত্রী হেমলতা রামনমাই-এর তৃতীয় প্রজন্মের উপযুক্ত ছিলেন। তাঁরা ওপরের তলায় আমাদের পাশেই থাকতেন, তাই তাঁদের সঙ্গে রাত-দিনের সম্পর্ক ছিল।

১০ জুলাই জিনিসপত্র বুক করে পাঠাতে গুপ্তজী এবং শ্রীবিদ্যাপ্রকাশ শুক্ল খুব সাহায্য করলেন। পাঁচটা বাক্সই শুধু আমরা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠাতে পারলাম, বাকি তেরোটা জিনিস নিজেদের সঙ্গে রেখেছিলাম। গুপ্তজী এবং বিদ্যাপ্রকাশজীর সাহায্যে বাসে জায়গা পাওয়া গেল। কমলা পাহাড়ের মোটর যাত্রার জন্য সকাল থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছিল।

আমার পক্ষে সম্ভব হলে ওকে এক পেয়ালা চাও খেতে দিতাম না। রাস্তায় তাঁর পাঁচবার বমি হলো। এর জন্য সে পেট্রলের গন্ধকে দোষ দিত। চোখ বন্ধ করে চলাটাকেও বেকার বলে মনে করতেন। সত্যিসত্যিই বেকার ছিল, কারণ মনই যদি তৈরি না হয়, তাহলে চোখ বন্ধ করলে কি হবে?

ট্রেনে আমরা বেরিলি হয়ে মুসৌরী যাচ্ছি, এই খবর শ্রীভোলানাথ শর্মা পেয়ে গিয়েছিলেন। কাঠগোদামে এসে তিনি বেরিলি পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যাবেন। তাঁর কাছ থেকে খুব সাহায্য পাওয়া গেল। এই কামরাতেই রাজস্থানের ঠাকুর কর্নেল শার্দুলসিংহও যাচ্ছিলেন। নৈনীতালে তাঁর চা-সৎকার পাবার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল। এখনও এই প্রজন্ম হিন্দির দিকে ঝোঁকেনি, কিন্তু তার প্রতি এক রকমের স্নেহ অবশ্যই জন্মাচ্ছিল।

আমাদের ট্রেন লেট হয়ে রাত দশটায় বেরিলি পৌঁছল। দুন এক্সপ্রেসও এক ঘণ্টা লেট ছিল। কাঠগোদাম থেকেই আমি পণ্ডিত ভোলানাথজীর অ্যারিস্টটল-এর 'রাজনীতিশাস্ত্র'-র অনুবাদ দেখছিলাম। তিনি নিজের কাজের প্রতি খুব সজাগ থাকেন। যদি গ্রিক দার্শনিকদের বইয়ের কোনো নতুন সংস্করণ ইউরোপ বা আমেরিকায় কোথাও বেরিয়েছে বলে শোনেন,তাহলে তার সাহায্য না নেওয়া পর্যন্ত নিজের কাজ অপূর্ণ বলে মনে করেন। অ্যারিস্টটলের লেখা 'এথেন্সের সংবিধান' নতুন ভাবে সম্পাদিত হয়েছিল। অনুবাদ করে ফেলার পর একথা উনি জানতে পারেন। সেই বইটিও আনান। এইভাবে ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি 'রাজনীতিশাস্ত্র' হিন্দিতে অনূদিত হয়ে তৈরি হয়ে গেল, কিন্তু তার প্রকাশিত হবার সুযোগ এলো সেই ১৯৫৬-তে। যদি আগে প্রকাশিত হয়ে যেত, তাহলে অ্যারিস্টটলের কম করে আরো তিনটি গ্রন্থ তিনি মূল গ্রিক থেকে হিন্দিতে হয়তো করে ফেলতেন। হিন্দির এটা কত বড় ক্ষতি?

এক্সপ্রেসে প্রথম শ্রেণীতে শুধু একটা জায়গা খালি ছিল আর আমারা ছিলাম দুজন। কিন্তু কোনোরকমে যেতে তো হবেই। বর্ষাও সেই সময় ভিজিয়ে দেবার জন্য তৈরি ছিল। কোথাও কোথাও গাড়ির ছাত থেকেও জলের ফোঁটা টপটপ করে পড়ছিল। জিনিসপত্র রেখে দুজনে একটা সিটে বসে পড়লাম। পণ্ডিত ভোলানাথজী না থাকলে খুব মুশকিল হতো। বেশি জিনিসপত্র নিয়ে চলাটা বেশ ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার, কিন্তু যখন কাঁধের ওপর ঘর-দোর চলে? তখন তার জন্য কষ্ট কিসের? সকাল (১১ জুলাই) আটটার পরে আমরা দেরাদুন পৌঁছলাম। পণ্ডিত গয়াপ্রসাদ শুক্লজী স্টেশনে এসেছিলেন। জল খাবার খেয়ে যাবার জন্য তাঁর অনুরোধ ছিল, কিন্তু মুসৌরীর বাস স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে অথবা ছেড়ে জল খাবার খেতে গিয়ে আবার এখানেই ফিরতে হতো। কমলা তো জলখাবারও খেতে পারত না, কেননা এখন পাহাড়ের মোটর-যাত্রা ছিল সামনে। একটা স্টেশন-ভ্যানে সব জিনিস রাখলাম এবং রওনা হয়ে গেলাম। বাসে গেলে কিংক্রেগ-এই নামতে হতো। ভ্যান অথবা ট্যাক্সিতে সোজা গ্রন্থাগারে পৌঁছনো যেত। সেখান থেকে হ্যাপিভ্যালি কাছেই।

নজন কুলির মাথায় জিনিস চাপিয়ে আমরা হর্নক্লিফ পৌঁছলাম। বাড়ির এজেন্ট বলে রেখেছিল যে, বিক্রির লেখাপড়া হয়ে গেলে পরেই বাংলোতে থাকা যাবে। লেখাপড়া

এখনও হয়নি। কিন্তু তা আমার জানা ছিল না। বাংলোর চৌকিদারেরও একথা জানা ছিল, কিন্তু সে বাধা দিল না। সে বাংলো খুলে দিল। ভালভাবে পরিষ্কার হয়নি। তবে ড· সত্যকেতুর হাঁটুতে চোট লেগেছিল,তাই দেখাশোনা করতে পারেননি। ফার্নিচারগুলোর মধ্যেও কত যে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আর আমরা হঠাৎ এসে না উঠলে আরো কত তুলে নিয়ে যেত। বাড়ি বিক্রির সময় প্রায়ই এমন হয়। চারটে ভালো খাটিয়ার জায়গায় চারটে বাজে খাটিয়া ছিল। জিনিসের তালিকায় তো শুধু সংখ্যাই লেখা হয়, আর তা এখানে ঠিক ছিল। একটা ঘরের শতরঞ্চির অর্ধেক উধাও হয়ে গিয়েছিল। কমলা বাংলো পছন্দ করেছিল। হ্যাঁ সে অবশ্য নিরিবিলিতে থাকার কথা বলছিল। কিন্তু হর্নক্লিফ সাধারণ নিরিবিলি জায়গা ছিল না। এটা এমনই বাংলো ছিল, যার জন্য মুনি-ঋষিদেরও লোভ হবে। মুসৌরী মিউনিসিপ্যালিটির সীমা আর বাংলোর সীমা এক ছিল; অর্থাৎ পশ্চিমে এর পরে আর কোনো বাংলো ছিল না। ওপরে হর্নহিলের বিশাল বাংলো ছিল, হর্নক্লিফ ছিল তারই অতিথিশালা, আর বিক্রির সময় দুইয়ের জমির ভাগ হয়েছিল। হর্নহিলও বহুবছর ধরে কোনো বাসিন্দার মুখ দেখেনি। তার পাশের হর্নলী বাংলোরও একই অবস্থা। হর্নলীর নীচে কিন্ডের-এর দোতলা সুন্দর বাংলো ছিল, পুসাংগ বোনেরা আর তাঁদের ভাই যার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। কয়েক বছর ধরে আমরা তাঁদের প্রতিবেশি হবার আনন্দ লাভ করেছিলাম।

যোগীরাজ বিট্‌ঠলদাস (গুজরাটী) এই সময়েই মুসৌরীতে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, কিন্তু দেখা হয়নি। দেখলাম তিনি একজন পাকা ভবঘুরে। তিনি যদি তৎপরতা না দেখাতেন, তাহলে সেদিন আমাদের বিদ্যুৎ-জল জুটত না। এটাও জানতে পারলাম যে, রেলওয়ে পার্সেলে পাঠানো আমাদের বই আউট এজেন্সিতে এসে গেছে। বই রাখার জন্য শুধু দুটো র‍্যাক ছিল। তিনটি আলমারি কাপড়ের জন্য ছিল, তিন চারটে কাপবোর্ড বই রাখার জন্য উপযুক্ত হতে পারে না। দু-তিনটি আলমারির প্রয়োজনীয়তা তক্ষুণি অনুভব করলাম।

১১ জুলাই ছিল নিজেদের বাড়িতে প্রথম রাত। এখন কয়েক বছর আমার এই বাড়ির প্রতি অসন্তুষ্ট হবার প্রয়োজন ছিল না। সেই সময় তো খুব আনন্দ হচ্ছিল।

১২ জুলাই বাড়ি ঠিকঠাক করতে দুপুর পর্যন্ত ব্যস্ত থাকলাম। তারপর কমলার সঙ্গে লাক্সমাউন্ট গেলাম। যোগীরাজ কিছু গুজরাটী মিষ্টি তৈরি করেছিলেন। তিনি যৌগিক আসন এবং আরো কতরকম ক্রিয়া জানতেন, আর তাদের প্রয়োগ রহস্যময় ঢঙে নয়, বরং স্বাস্থ্যের উপযোগিতার জন্য করতেন। অন্যদেরও শেখাতেন। নিজের এই বিদ্যা নিয়েই তিনি ইউরোপ ঘুরে এসেছিলেন। কিছুদিন পরে আবার বিশ্ব-পরিক্রমার জন্য বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন। শেঠ গোবিন্দদাসের পৃথিবী পরিক্রমা'-তে যোগীরাজের সঙ্গে নিউইয়র্কে দেখা হয়েছিল। কতবছর দেখা না হওয়ায় মন লালায়িত তো হয়, কিন্তু ভবঘুরেরা তো বাতাসের পাখি—'যে হারিয়ে গেছে সে হারিয়ে গেছে।'

নতুন বাড়িটা কেউ নিয়েছে, একথা শুনে এক মিস্ত্রি এলো আর বলল, 'বাংলোর গাঁথনি দুর্বল। তাকে মজবুত করা দরকার, নইলে ভেঙে পড়ার ভয় আছে।' কোনো দুর্বলতা

আমরা বুঝতে পারলাম না। আর গাঁথনি মজবুত করার মানে ছিল হাজার দেড়-হাজার টাকা ধ্বংস করা। ভাবছিলাম একজন রাঁধুনি তো রাখতেই হবে,যার জন্য খাওয়া আর ৩৫ টাকা মাইনে দিতে হবে। আশেপাশে যে জমি আছে, তার বাগান সাজানো উচিত, যার জন্য মালীকে কম করে ৪০ টাকা মাসিক দিতে হবে। সবকছুিই দরকার, কিন্তু কাছে টাকা কত আছে তাও দেখতে হবে, তাই সেই সময় একটা রাঁধুনিকে রাখাই ঠিক করলাম। বাজার থেকে কিছু প্রয়োনীয় জিনিস কিনলাম, তাতে ৯০ টাকা লেগে গেল। রেডিওও এবার অনিবার্য মনে হতে লাগল, বিশেষ করে এই নির্জন বাংলোয় খবর এবং মনোরঞ্জনের জন্যও তার প্রয়োজন ছিল। ১৪ তারিখ ৩০৪ টাকায় মারফি রেডিও চলে এলো। ফ্লাশের কথা বলায় ১৬-১৭ শো টাকার আন্দাজ করা হলো। যদি বুঝতে পারতাম যে তা আড়াই হাজারের বেশি হবে তাহলে হয়তো আমরা তার সংকল্প ত্যাগ করতাম। লেখা-পড়া করার সময় আমরা খেয়াল করিনি, কিন্তু এখন নক্সা দেখায় বুঝতে পারলাম, হর্ণহিল থেকে হর্ণক্লিফকে আলাদা করার সময় আমাদের যথাসম্ভব কম জমি দেবার চেষ্টা করা হয়েছে, আর আমাদের বাংলোর দেয়ালের পাশেই সীমা রাখা হয়েছে। শুধু মুখের কথাতে এতে প্রায় আড়াই একর জমি ছিল, কিন্তু বাড়িটাকে বাদ দিয়ে আধ একরও এমন ছিল না যাতে শাক-সবজি অথবা ফুলগাছ লাগানো যেতে পারে। নীচের দিকে খুব উঁচু সোজা পাহাড় দাঁড়িয়ে। এই পাথর দিয়ে আমাদের কি হবে? যেখানে সেখানে কিছু গাছও ছিল, কিন্তু প্রথম তো তাদের কাটা সোজা ছিল না আর দ্বিতীয়ত, পুরসভা জঙ্গল নষ্ট হতে দিতে চায় না, তাই কাটার জন্য অনুমতি দেয় না।

১৬ জুলাই যোগীরাজ আরো দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে এলেন। তাদের মধ্যে একজন বললেন যে, আর কিছুদিন পরে এখানে চিতা আর হায়েনা আসতে শুরু করবে। এর অর্থ হলো, আমাদের হাতিয়ারের লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করতে হবে, একটা বন্দুক আর একটা পিস্তল অবশ্যই সঙ্গে রাখা উচিত। নির্জন বাংলোয় কুকুর থাকাটাও প্রয়োজন। এই সবকিছুর থেকেও বেশি চিন্তা ছিল এই যে, নৈনীতালে আংশিক কন্ট্রোল ছিল, আর এখানে সমস্ত খাবার জিনিসের ওপর পূর্ণ কন্ট্রোল। ১৭ জুলাই পর্যন্ত জানতে পারলাম, এখন এক-চতুর্থাংশ পর্যটকই এখানে থেকে গেছে। মুসৌরীতে বর্ষার আগে অন্য পর্যটকরা জায়গা খালি করে দিয়ে চলে যায়, তাদের মধ্যে কারো কারো বৌ-বাচ্চাই শুধু থেকে যায়। বর্ষা শুরু হলেই আবার পাঞ্জাবের পর্যটকদের সিজিন শুরু হয়। এখন তাদেরই বেশি চোখে পড়ছিল। বইয়ের বাক্স অথবা অন্য কোনো জিনিস চাপিয়ে আমরা কুলির সঙ্গে আসছিলাম। কুলি ছিল টেহরী খস (রাজপুত), একেবারে অশিক্ষিত। তার মুখে ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে প্রচণ্ড বিরোধিতা শুনে কিছুটা আশ্চর্য লাগল। উত্তর-ভারতে ব্রাহ্মণ আর রাজপুতদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ—'মনতুরা হাজী বগোয়ম্, তু মরা হাজী বগো।' দুইই একে অপরের অন্ধ সমর্থনের জন্য তৈরি থাকত। এ কেমন অসময়ের রাগিণী? তবে এর কারণ ছিল। টেহরী রাজা ছিল অবাধ স্বৈরাচারী। প্রজারা একটুও মাথা তুলুক তা সে দেখতে চাইত না। সুমনের তরুণ জীবন এই স্বৈরাচারের বলি হয়েছিল। ভবিতব্যের সামনেও সে সানন্দে মাথা নত করেনি, বরং সেইজন্যে সকলানী ও তার সঙ্গীকে ধর্মযুদ্ধে

শহীদ হতে হয়। কিন্তু ইংরেজরা বেরিয়ে যাবার পর তার দত্তকপুত্র কি করে টিকে থাকতে পারত? টেহরী রাজ্যকে বিলীন হতেই হলো। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রজা আন্দোলনের প্রধানদের মধ্যে রাজপুতও ছিল, কিন্তু শিক্ষায় বড় হওয়ার জন্য ব্রাহ্মণদের এগিয়ে থাকাটা ছিল স্বাভাবিক। রাজার পা ধুয়ে চুমু খেয়ে বেড়ানো লোকেদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের অভাব ছিল না। রাজা প্রচার করতে শুরু করল যে, ব্রাহ্মণরা আমাদের হাজার বছরের পুরনো রাজবংশকে উচ্ছেদ করিয়েছে। সামনেই কাউন্সিল আর পার্লামেন্টের নির্বাচন ছিল, তার কথা চিন্তা করে এই প্রচার আরো তোড়জোড়ের সঙ্গে হচ্ছিল। তার প্রভাব কতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছিল, সে-প্রমাণ আমরা সেদিন সেই কুলির মুখ থেকে শুনছিলাম।

এখানে এক সপ্তাহ ধরে কখনও কখনও ছিটে-ফোঁটা বৃষ্টি হচ্ছিল, নয়তো বর্ষার নাম গন্ধ ছিল না। ১৮ জুলাই মুষলধারে নয়—সূপাধার বৃষ্টি হতে লাগল, যেন আকাশ থেকে কোটি কোটি সূপে ভরে জল নীচে ফেলা হচ্ছে। বারান্দার কয়েক জায়গার ছাদে চুন ধরল। সেখান থেকে জিনিসপত্র এদিকে-ওদিক সরালাম। একদিন শতরঞ্চিটা নোংরা দেখে বাইরে শুকোতে দিলাম। সেই রাতে না সরানোর ফলে বৃষ্টিতে পুরো ভিজে গেল। এখন শুকোতে কে জানে কতদিন লাগবে, আর বাইরে রাখতেও পারতাম না। একটা শোবার ঘরের পুরোটা ঢাকার জন্য ছিল সেই শতরঞ্চিটা। সেখানেই তাকে পেতে দিলাম। ভয় তো হচ্ছিল, যে ভেজা আছে। পচে যাবে, কিন্তু রামবাস-এর দড়ির শতরঞ্চি তাড়াতাড়ি পচতে জানে না। যেখানে শাদা ছাতলা ধরেছিল, সেখানেও পচলো না এবং পাতা অবস্থাতেই শুকিয়ে গেল।

১৮ জুলাই মহারানী কমলেন্দুমতী হর্ণক্লিফ আমার নামে বিক্রির রেজিস্ট্রি করে দিলেন। আমি যাই নি, ড· সত্যকেতু সব কাজ করিয়ে নিলেন। কোনো বিবাদ হলে সমস্ত দায়িত্ব আমার-এই শর্ত রাখা হয়েছিল, যেটা আমি বাদ দেওয়ালাম। সেইদিন থেকেই ড· সত্যকেতু তাঁর পুরনো চাকর মাতবরসিংহকে রান্না করার জন্য আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এখানে যে সব চাকর পেয়েছিলাম তাদের মধ্যে সে সবথেকে ভাল ছিল। বিশ্বাসী ছিল, কাজে অলস ছিল না, আর না বলতেই কাজ করে যেত। হ্যাঁ, রান্না তত ভাল করতে পারত না, আর বেতনও বেশি ছিল।

আমিও একসময় শীর্ষাসন করতাম। যোগীরাজ শীর্ষাসন ও হলাসন-এর প্রশংসা করলেন, তাই আমি ১৯ জুলাই আবার শুরু করে দিলাম। কিন্তু বেশিদিন তা চলেনি। আসলে বাইরে হাঁটার থেকে বাঁচাতে আমার মন এই ছুতো বার করেছিল, আর পরে মন এও বলে দিল, 'এখন তো ডায়বেটিস সারাজীবনের সঙ্গী হয়েছে, কাজেই এতে লাভ কী?'

আস্তে-আস্তে আমরা হর্ণক্লিফের বাসিন্দা ও মুসৌরী-নিবাসী হয়ে গেলাম। সেখানকার সব জিনিস কিছুদিন পর্যন্ত নতুনের মত দেখাতে থাকল, পরে তাদের নতুনত্বও চলে যেতে লাগল। এই জায়গার প্রতি কমলার ভালবাসা খুব সূক্ষ্মগতিতে কম হতে লাগল। তপস্বিনী হবার জন্য সে জন্মায়নি, আর স্বভাব-ভবঘুরেও সে ছিল না।

মুসৌরীর প্রথম নিবাস

১৯৪৩ সালে আমি প্রথম মুসৌরীতে এসেছিলাম আর মানসরোবর যাবার পথে তিব্বত সীমার পাশের নেলং গ্রাম থেকে তাড়াতাড়ি রাস্তা পার করে এখানে পৌঁছেছিলাম। আমার সঙ্গে নেলং গ্রামের এক তরুণ ছিল, তার পরিচিত কিসনসিংহ লনটৌর বাজারে থাকতেন। তিনি তাঁর ছোটমতন দোকান আর থাকার কুটির দেখিয়ে বলেছিলেন 'কষ্ট তো হবে, তবে এই কুটিরটা আছে।' তিনি এমন স্বরে কথাগুলো বলেছিলেন যে আমি তাঁর কাছেই থেকে গেলাম। কুটির হোক অথবা মহল, সব জায়গায় সানন্দে থাকাটা ভবঘুরেদের জন্য আবশ্যক, আমি তাতে অভ্যস্ত ছিলাম। কিসনসিংহের কথা আবার মনে পড়ল, আর ২৪ জুলাই কমলার সঙ্গে আমরা বেড়াতে বেড়াতে তাঁর কাছে গেলাম। মুসৌরীতে সর্বদাই তাঁকে আমি আমার স্বজন বন্ধু হিসেবে পেয়েছি। কিসনসিংহ ছিলেন কনৌর-এর কনম গ্রামের বাসিন্দা। নিজের ভাই-বন্ধুদের মত ব্যবসার কারণে কয়েকবারই তিব্বতে যান, আর সেখানকার ভাষাকে নিজের মাতৃভাষার মত বলতে শুরু করেন। ভবঘুরেমিতে এগোতে এগোতে পা তাকে এখানে নিয়ে আসে, দ্বিপদ থেকে চতুষ্পদ হন, পরে ষট্‌পদ ও অষ্টপদ হন।[১] জীবিকার জন্য অন্যান্য খাম্বা ভুটিয়াদের মত তিনিও ছুঁচ-সুতো, ছুরি-কাঁচি, সাবান আর এইরকমই সস্তা জিনিসের ছোটমতন দোকান খোলেন। সিজিনের সময় তাঁর স্ত্রী কিউরিওর জিনিস নিয়ে হোটেগুলিতে সাহেবদের কাছেও যান, কিন্তু ইংরেজরা চলে যাওয়ায় এখন এইসব জিনিসের খদ্দের খুব কম। শীতের সময় তিনি দিল্লীতে থাকতেন। সেখানে ইউরোপিয়ান বেশি ছিল, যারা তিব্বত ও চীনের এই শিল্পমণ্ডিত জিনিসগুলি পছন্দ করতেন। মুসৌরীতে ১০-১৫টি খাম্বা তিব্বতী পরিবার ছিল, যারা প্রথম থেকেই এখানে কাজ করে এসেছে। কিসনসিংহও সেই জীবন গ্রহণ করেছিলেন। কোনোরকমে দিন কাটাতেন। কিসনসিংহের সঙ্গে দেখা করে আবার লনটৌর বাজারের শেষ মাথা পর্যন্ত গেলাম। বাড়িতে ছুতোরমিস্তিকে দিয়ে কিছু কাজ করানোর ছিল, পুরনসিংহ হোশিয়ারপুরী তার ছেলের সঙ্গে আসতে রাজি হলো। কতকগুলো কাঁচ ভেঙে গিয়েছিল, কাঠের জিনিসগুলিও মেরামত করানোর দরকার ছিল, ছাতে কোথাও কোথাও জল চুঁইতো, আউট হাউসের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। আসলে এই বাড়ির নামমাত্র মেরামত হয়েছিল। সেদিন লনটৌর থেকে আমরা অনেক জিনিস কিনে আনলাম। মুসৌরীতে লনটৌর, কুলহরী আর কিতাবঘর এই তিনটি বাজার আছে, যার মধ্যে শুধু লনটৌরই বারোমাসের বাজার, কারণ তা শুধু ভ্রমণবিলাসীদের ওপরই নির্ভর করে না, আশেপাশের পাহাড়ী গ্রামগুলির মানুষও এখানে জিনিস কিনতে আসে। পাহাড়ের দিকেও এখন মোটর রাস্তা

---

[১] পদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি করে, লেখক এখানে, অবিবাহিত ভবঘুরে জীবন থেকে সন্তানসহ সাংসারিক জীবনের ইঙ্গিত দিয়েছেন।—স.ম.

তৈরি হচ্ছে, এখন অনেক খদ্দেরই লনঢৌরবাসীদের হাত থেকে চলে যাবে। সেই সময় ইংরেজরা চলে গেলেও তাদের প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস বিক্রি হচ্ছিল। ফৌজের অকেজো জিনিসপত্র আর ওষুধের স্তূপ রাখা ছিল। ইংরেজি বই ও ইংরেজদের অন্য জিনিসও বিক্রি হচ্ছিল। আমি পিঠের একটা সৈনিক ঝোলাও নিয়ে নিলাম, যাতে ১৫ সের জিনিস সহজেই ধরে যায়। ভাবছিলাম, আগামী বছর 'গঢ়ওয়াল'-এর ব্যাপারে বদ্রীনাথ যেতে হবে, সেই সময় এটা কাজে লাগবে। ভবঘুরেমি তো আমি করেছি, কিন্তু আমার এই সাধ অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল যে সব জিনিস পিঠে নিয়ে চলি। জীবনে শুধু একবার অল্পদিনের জন্য প্রথম তিব্বত যাত্রায় এমন সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু জিনিস প্রয়োজনের থেকে কিছু বেশি ছিল, আর আমার বোঝা বওয়ার অভ্যাস ছিল না। মনে করতাম, এখন অভ্যাস করে হয়তো তা পূরণ করা যেতে পারে। বহু আগে ভবঘুরেমির শুরুতে বড় সাধে এই শ্লোকটি পড়েছিলাম 'একাকী নিস্পৃহঃ শান্তঃ পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ। কদা ভবিষ্যামি।' পাণিপাত্র ও দিগম্বর হয়ে প্রার্থনা করার সাধ তো এখন আর ছিল না, তবে সব জিনিস পিঠে বয়ে ঘোরার দাবিটা জরুরি ছিল। কিন্তু এটা কি তখন ভাবার কথা যখন কিনা আমি ঘর বেঁধে ফেলেছি, আর কেউ বলেছে, 'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।' তো, গৃহের সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীও এসে পড়েছিল। কমলার সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠাতা অন্য পরিস্থিতিতে এবং অন্য উদ্দেশে হয়েছিল। কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠতা তখন অন্য চেহারায় পরিণত হতে যাচ্ছিল। দুজনের বয়সের কথা যখন আমি চিন্তা করতাম, তখন দ্বিধা হতো, ভাবতাম কমলাকে সুশিক্ষিত করে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়াটাই ঠিক হবে। কিন্তু যখন নিজের দেশের সমাজের দিকে তাকাতাম, তখন তা নিচু জাতের স্বার্থ বলে মনে হতো। কমলা আর আমার একসঙ্গে থাকাকে সমাজ কোন অর্থে নিচ্ছে, আমি যদি এর পরোয়া নাও করতাম, তবুও এটা তো দেখতেই হতো যে, অন্যের টীকা-টিপ্পনীর কমলার ওপরে কি প্রভাব পড়বে। এই সব চিন্তা করে ভবঘুরেমিব স্বপ্ন এখন একেবারে অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠছিল।

২৪ তারিখেই সর্দার পুরনসিংহ তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে চলে এলেন, আর কয়েকদিন ধরে কাজ করতে লাগলেন। বাংলোর কিছু জিনিস হাওয়া হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তবুও অনেক জিনিস ছিল। গদিওয়ালা কতগুলো চেয়ার মেরামতির অভাবে অকাজের হয়ে পড়েছিল, দু-তিনটে ছোট ছোট টেবিলও গুদাম থেকে বেরোল। ফার্নিচার মেরামতের পর ছাত রঙ করাটাও দরকার বলে মনে হলো। আমাদের বাংলোর ছাত রঙ করা ছিল না। অভিজ্ঞ লোকেরা জানালেন যে, রঙ করলে লোহার পাত মরচে লাগা থেকে বেঁচে যায়,তার আয়ু বেড়ে যায়। যাইহোক দু বছর তো হলো এখনও এই পাতগুলো বদলানোর দরকার পড়েনি, কে জানে তা রঙ করার প্রতাপেই হয়েছে কিনা।

শ্রীসেনগুপ্ত এখনও এলাহাবাদে পরিভাষার কাজ করছিলেন। আমি তার দেখাশোনা করতে পারতাম, কিন্তু পণ্ডিত বলভদ্র মিশ্র সরে যাবার পর আমার আর কোনো আশা ছিল না। সেনগুপ্ত ওখানে ইউনিভার্সিটিতে রুশ পড়ানোর কাজ পাচ্ছিলেন, আমারও এতে সম্মতি ও সহায়তা ছিল। এখন তিনি ইউনিভার্সিটিতে চলে গেলেন। কিন্তু, তার পরেও

তিনি কাজ ছেড়ে দেননি। কালিম্পঙে তৈরি করা আমাদের শব্দকোষগুলির মধ্যে অনেকগুলি তাঁরই সতর্কতার জন্য ভালভাবে ছাপা সম্ভব হয়েছিল।

আমার দু-তিনটি বই গুজরাটীতে অনূদিত হয়ে গিয়েছিল। আহমদাবাদের শ্রীনবনীতলাল মাদ্রাজী গুজরাটী প্রকাশনার কাজ করতেন এবং আমার বন্ধু পণ্ডিত ভাগবতাচার্যর স্নেহপাত্র ছিলেন। তিনি আরো কিছু বই গুজরাটীতে অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাইলেন। আমি অনুমতি দিয়ে দিলাম। 'জয় যৌধেয়', 'সিংহ সেনাপতি', 'মধুরস্বপ্ন', 'জাদু কা মুল্ক' ইত্যাদি কয়েকটি বই তিনি প্রকাশ করেন। তাঁর চিঠিতে জানলাম যে, পণ্ডিত ভাগবতাচার্য এখন আফ্রিকায় গেছেন। স্বামী সহজানন্দ আর স্বামী ভাগবতাচার্যর মধ্যে অনেক ব্যাপারই একরকম ছিল। দুজনেই আমার একইরকম ভালবাসা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। দুজনেই সংস্কৃতের বিরাট পণ্ডিত ছিলেন। রাজনীতিতেও দুজনেই এগিয়ে গিয়েছিলেন,তবে স্বামী সহজানন্দ যেখানে শ্রমিক-কৃষকদের একেবারে আপন হয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে ভাগবতাচার্যজী গান্ধীজীর মানবতাবাদ পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। তিনি সংস্কৃততে গান্ধীজীর পদ্যবদ্ধ জীবনী 'ভারতপারিজাতম্' তিন খণ্ডে লিখেছিলেন।

এই সময় ওয়াই· ডব্লিউ· সি· এ· (তরুণ মহিলা খ্রিস্টান সমিতি)-তে কয়েকটি দেশের মহিলাদের ক্লাস চলছিল। ড· পা-চাউ-এর কাছ থেকে তাঁরা আমার কথা জানতে পারেন এবং আমাকে তাঁরা বক্তৃতা দেবার জন্য বলেন। এতে কোনো ওজর চলত না, বিশেষ করে যখন এর ফলে এশিয়ার বহু অংশের মহিলাদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল। তবে ভারতে ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়াটা আমি পছন্দ করতাম না। এতে ধরে নিন একরকমের হীনতার ভাব জাগে বা ইংরেজদের ভাষা বলে নিজের দেশের গোলামির চিহ্ন মনে করে তা ব্যবহার করতে আত্মগ্লানি হয়। হিন্দি জানা লোক যদি ইংরেজিতে চিঠি লেখে, তবে আমি তার জবাব দিতে আপত্তি জানাই। কিন্তু যদি কেউ শুধু ইংরেজিই জানে,তবে তা বলতে চিঠি চালাচালি করতে ইংরেজির ব্যবহারে আমার কোনো আপত্তি নেই। এখানেও জাপান, ইন্দো-চায়না, ফিলিপিন, সিলোন ইত্যাদি জায়গার মহিলারাই ছিলেন, যাঁরা ইংরেজিই বুঝতে পারতেন, তাই আমি তাঁদের ওখানে ভাষণ দিতে রাজি হলাম এবং ভাষণ দিলামও।

আমাদের নিচের 'হর্ণ লজ' বাংলো জন লেডলীর বাবার সম্পত্তি ছিল। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন বুড়ো লেডলী। অবকাশ গ্রহণ করার পর মুসৌরীতে 'হর্ণ লজ', ও 'আর্টেন' দুটি বাংলো নিয়ে এখানেই থাকতে শুরু করেন। 'আর্টেন'-এ লেডলী পিতাপুত্র থাকতেন, আর 'হর্নলজ'-এ এক শরণার্থী সর্দার দু-তিন বছর ধরে বাস করছিলেন। তিনি কূকা শিখ ছিলেন। কূকা গুরু রামসিংহ আর তাঁর শিষ্যরা দেশের জন্য কত আত্মবলিদান দিয়েছে, এ কথা সবাই জানে। তাঁর শত শত শিষ্যদের গুলিতে উড়িয়ে দিয়ে অথবা ফাঁসি দিয়ে গুরু রামসিংহকে ইংরেজরা বার্মা পাঠিয়ে দিল। শিষ্যরা প্রতিজ্ঞা করল যে আমরা ইংরেজদের কাছারিতে যাব না, আমরা ইংরেজদের রেলে চড়ব না ইত্যাদি। আর ভারত স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত তারা তা পালন করেছে। সর্দারের সঙ্গে যখন-তখন কথাবার্তা হতো,

তবে তাঁর জ্ঞান ও রুচি সীমিত ছিল, তাই আমরা মামুলি কথাবার্তাতেই সীমিত থাকতাম। তিনি জানালেন, এখানে নেকড়ে তো আছে, আর শুধু শীতেই নয়, গরমে-বর্ষাতেও তারা রাতে এসে পড়ে কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারা কোনো মানবপুত্রকে কষ্ট দেয়নি। তাদের ওপর হামলাও করেনি। তবে হ্যাঁ, কুকুরদের তারা একদম ছাড়ে না। তাঁর একটা কুকুরের সম্বন্ধে বলছিলেন, 'তখনও সূর্য সম্পূর্ণ ডোবেনি। ছেলে শিকলে বাঁধা কুকুরকে খাবার খাওয়াচ্ছিল। এমন সময় কে জানে কোথা থেকে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর তাকে নিয়ে চম্পট ছিল।' আমাদের ওপরের বাড়ি হর্নহিল অনেক বছর ধরে খালি ছিল। একটা আউটহাউস দোতলা ছিল, আর একটা ছিল অনেকগুলি ঘরের একতলা। চাকরদের জন্য। এই ঘরগুলিতে চৌকিদার ছাড়াও ধোপা, নাপিত আর সিজিনের সময় অন্য কাজ করার লোকও থাকত। ধোপানীর কয়েকটা কুকুর নেকড়ে নিয়ে গিয়েছিল। কুকুর আর নেকড়ের এই সম্বন্ধের কথা শুনে আমি ভাবলাম, তাহলে কোনো দামী কুকর নেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু কুকুরের কাছে নিজেদের প্রাণ তো দামীই হয়। যাইহোক, এখন কুকুর কিনতে দেরি ছিল।

কিসনসিংহকে বলে রেখেছিলাম আমাদের জন্যও যেন একটা গালিচা খুঁজে রাখে। তাঁর কাছে একটা সুন্দর তিব্বতী গালিচা পড়ে ছিল। কমলা বলছিল তার দরকার নেই, কিন্তু কিসনসিংহকে আমরা কিছু সাহায্য করতে চাইছিলাম তাই একশো টাকা দিয়ে গল্পটা নিয়ে এলাম।

গতবছরটা নষ্ট হবার জন্য আফশোশ ছিল। এই বছর কমলাকে বিশারদ পরীক্ষা অবশ্য দেওয়াতে হবে। তার জন্য যদি এলাহাবাদেও যেতে হয়, হোক। জানতে পারলাম, দেরাদুনেও পরীক্ষা-কেন্দ্র আছে। আমি দু জায়গাতেই ফর্ম ভর্তি করালাম। কমলা আগের থেকেই কিছুটা তৈরি হচ্ছিল। এক বছর ধরে দিন-রাত সে হিন্দিই বলছিল, হিন্দি বইও পড়ছিল। আমার নতুন বইগুলো সে টাইপও করত,তাই ভাষাজ্ঞান তাঁর যথেষ্ট ছিল। এবার বইগুলো তৈরি করা বাকি।

হর্নক্লিফ-এ থাকার জন্য হাতিয়ারের দরকার ছিল। আমি একটা রিভলবার আর একটা বন্দুকের লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করে দিলাম। পুলিস এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করছিল। পুলিস ছাই কি অনুসন্ধান করবে? রাজনৈতিক দৃষ্টিতে আমি সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী ছিলাম। বিশ্বাসী হলেও পয়সাওয়ালাদেরই ইংরেজরা হাতিয়ার দিত। যদি পয়সা না থাকে, তাহলে এই যুক্তি দেখাত যে, তার কোন জিনিস রক্ষা করা প্রয়োজন। দেশকে পরাধীন রাখার জন্য মানুষকে নিরস্ত্র রাখাটাও তাদের কাছে প্রয়োজনীয় ছিল। স্বাধীন ভারতের শাসন-সূত্রধার ইংরেজদের কাটা গণ্ডী থেকে একটুও নড়াচড়া করতে রাজি না। মনে হয়, তাঁরাও আমাদের জনতাকে ততটাই ভয় পান, যতটা ইংরেজরা ভয় পেত। ভয় পাওয়াও উচিত, কারণ তাঁর শাসন জনতার কল্যাণের জন্য নয়, বরং কিছু মুষ্টিমেয় চোরাবাজারী শেঠ আর ঘুসখোর মন্ত্রী-আমলাদের জন্য। ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতার দাবি করতে গিয়ে, কংগ্রেসে তাঁরা প্রস্তাব রাখতেন যে, প্রত্যেক স্বাধীন দেশের নাগরিকের হাতিয়ার রাখার অধিকার আছে, তাই হাতিয়ারের আইন রদ করা উচিত। কিন্তু এখন সেই

প্রস্তাবকর্তারা যদি জীবিতও থাকেন, তাহলে এটা তাঁরা মানতে রাজি নয় যে কখনও তাঁরা এমন দাবি করতেন। যদি স্বাধীন নাগরিকের নিজেকে রক্ষার জন্য বন্দুক আর পিস্তল রাখা নাগরিক-আধিকার হিসেবে উচিত,আর অন্যান্য দেশে এমন দেখাও যায়, তবে হাতিয়ারের আইনকে কেন তাকের ওপরে তুলে রাখা হয় না? কেন বন্দুক-পিস্তলকেও লাঠি-ছুরির মত মনে করা হয় না? এই হাতিয়ারগুলির দাম এত বেশি যে গরিব লোকেরা নিজেরা তা কিনতে পারে না। আর মন্ত্রীদের ও প্রভুদের যেমন-তেমন লোকেদের হাতে এগুলো চলে গেলে তার জন্য ভয় পাওয়াও উচিত নয়, কারণ যেমন-তেমন মানুষ যদি কারো প্রাণ নিতে উদ্যত হয়,তাহলে হাতিয়ারের আইন তাকে আটকাতে পারে না। গডসেকে কি তা আটকাতে পেরেছে? আমাদের দেশের ভিন্ন-ভিন্ন অংশে যে সব শত শত ডাকাত লুটপাট করে বেড়াচ্ছে, তাদের আধুনিকতম পিস্তল-বন্দুকই নয়, এমন কি লুইস গান পাওয়া থেকেও কি বঞ্চিত করেছে? জনতাকে নিরস্ত্র রেখে বরং তাদের এই সব হাতিয়ার নিয়ে ঘুরে বেড়ানো লুটেরাদের করুণার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। যে কোনো দৃষ্টিতেই এখন হাতিয়ার-আইনের প্রয়োজন নেই, কিন্তু যে কোনো ভাবেও চিন্তা করলে এই আশা করা যায় না যে, আজকের সরকার এতে একটুও আলগা দেবে।

যাইহোক, এখন তো দেশের জন্য নয়, বরং নিজের জন্য হাতিয়ারের প্রয়োজন। পুলিসের রিপোর্ট অনুসারে তা পাওয়া সম্ভব নয়। যদিও আমি ছ-সাত হাজার টাকার রোজগারের ওপর ট্যাক্স দিচ্ছিলাম, আর এইভাবে রক্ষা পাবার অধিকার আমার ছিল। সেই সময় শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী যুক্তপ্রদেশে গৃহ-বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর কাছে আমি চিঠি লিখলাম—'আমি এমন জায়গায় থাকি, যেখানে হাতিয়ারের প্রয়োজন আছে। পুলিস আমার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে কি জানবে? আপনি আমাকে এবং আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারাকেও অনেক বেশি জানেন। এটা জানান যে লাইসেন্স দেবার ইচ্ছে আছে কি নেই।' এমনিতে তো লালবাহাদুর শাস্ত্রী খুব হালকা-পলকা এক মুঠো মানুষ। শিক্ষার জন্যও অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ তো দূরের কথা এখানকার কেনো বিশ্ববিদ্যালয়েরও মুখ দেখতে হয়নি, তিনি কাশী বিদ্যাপীঠে পড়েছেন। কিন্তু না কাবুলে গাধার অভাব হয় আর না অন্য জায়গাতে। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর চিন্তাধারার সঙ্গে একমত হওয়া আমার যেমন জরুরি ছিল না, তেমনি আমার চিন্তাধারার সঙ্গেও একমত হওয়াটা তাঁর জরুরি ছিল না; তবে তাঁর মূল্য খুব ভালভাবে জানতাম, আর বস্তুত সেই কারণেই আমি তাঁকে সরাসরি লিখেছিলাম। আমলাতন্ত্রের গড়িমসির হাত থেকে বাঁচা তো কঠিন ছিল, কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তির ভেতর তাকে তুচ্ছ করার শক্তি ছিল, তবে তিনি ছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। তিনি ওপর থেকে হুকুম দিলেন। আমি বন্দুকের লাইসেন্স পেয়ে গেলাম। কিছুদিন পরে পিস্তলের লাইসেন্সও চলে এলো।

৬ আগস্ট শ্রীআনন্দজীর শহর আম্বালার লালা সূর্যভানুজী এলেন। তিনি গান্ধীবাদী ছিলেন এবং আনন্দজীর পুরনো নাম হরনামদাসের সঙ্গে কিছুটা পরিচিতও ছিলেন। আদর্শবাদের ছিটে তো জীবনে ছিল। আম্বালার বাইরে বহু একর জমি ছিল, যেখানে সাম্যবাদী পরিবার স্থাপন করার স্বপ্ন দেখতেন। সেই সময় চিন্তা করছিলেন, এখানেই

পাশের হর্নহিল বাংলোটা নিয়ে তার পর্যাপ্ত জমিতে চাষবাস করে থাকবেন। কিন্তু কথায় আছে 'আল্লা মিয়া টেঁকো মানুষকে নখ দেয় না, দিলে সে তার টাক খুঁচিয়ে ফেলে'। আমার মনেও নানা রকমের স্বপ্ন জাগত, যাদের মধ্যে একটা স্বপ্নকে সবেমাত্র বাড়ির খুঁটিতে বেঁধে সফল করেছি। যদি লাখ টাকা আরো পাওয়া যেত, তাহলে নিঃসন্দেহে 'হর্নহিল', 'কিলডের' আর 'হর্নলী'ও কিনে ফেলতাম। ভাবতাম সাহিত্যিক বন্ধুরা এসে এখানে থাকুক। এমন করলে আমার অভিজ্ঞতা হয়তো মহাদেবজীর থেকে একেবারেই আলাদা হতো না। কিন্তু আল্লা মিয়া নখ না দিয়ে ভালই করেছে।

৭ আগস্ট ১৯৫০ আমার কাছে খুবই স্মরণীয় দিন ছিল। সেইদিনই জন্ম-জন্মের হারানো বন্ধুর মত এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হলো। স্বামী হরিশরণানন্দজী স্বভাব-ভবঘুরে দিলেন। এই একই গুণ আমাদের দুজনের মধ্যেই একই রকম ছিল। যোগীরাজ বিট্‌ঠল দাসজীর সঙ্গে তিনি আগেও একদিন এসেছিলেন, কিন্তু সেদিন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হয়নি! আজ তিনি তাঁর স্ত্রী জানকীদেবীর সঙ্গে এলেন। এরপর তাঁর সঙ্গে কথা বলার, তাঁর সম্বন্ধে জানার সুযোগ পাওয়া গেল। যদিও আমাকে তিনি দেখেননি, তবে আমার বইগুলি পড়ার দরুন আমার যথেষ্ট পরিচয় জানতেন। আগে আমি ভেবেছিলাম যে তিনি দুর্গম পাহাড়গুলির একজন দারুণ পর্যটক, একজন সফল বৈদ্য, পরে কয়েকদিনের মধ্যেই যখন তাঁর আয়ুর্বেদ সম্বন্ধী বইগুলো পড়লাম, তখন এও জানতে পারলাম যে, তিনি কূপমণ্ডুকতার থেকে অনেক দূরে থাকেন, তাঁর খুবই উন্নত রাজনৈতিক-সামাজিক ভাবনা পোষণ করেন। এরপর তো আমাদের ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বেড়ে চলল। আমি তাঁকে 'ভাইয়া' বলতে লাগলাম। আমার বাড়িতে আমি সবথেকে বড় ছেলে ছিলাম, আর আশেপাশের পরিবারগুলিতে আমার থেকে বড় কেউ ছিল না। আমি যেন কোনো একজন বড় ভাইকে খুঁজেই বেড়াচ্ছিলাম এবং স্বামী হরিশরণানন্দর মধ্যে তাঁকে পেয়ে গেলাম। প্রত্যেক বছর তিনি মুসৌরীতে আসতেন আর কয়েকমাস থাকতেন। সেই সময়টা খুব ভাল লাগত, বইয়ের কাজ ছাড়তেও দুঃখ হতো না। সপ্তাহে একদিন আমি অবশ্য তাঁর বাড়ি যেতাম আর তিনিও আমার বাড়িতে আসতেন। তিনি আমার থেকে অনেক বেশি ব্যবহারিক ছিলেন, এটা বললে তাঁর গুণকে খাটো করা হবে। আদর্শবাদী হওয়া সত্ত্বেও যতটা ব্যবহারকারিতা থাকা সম্ভব, তা পুরোপুরিই তাঁর ভেতরে ছিল। আমি তো এ ব্যাপারে নিজেকে মূর্খ মনে করি,যদিও অবুদ্ধিবাদী নই বলে আমাকে তত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি।

স্বামী হরিশরণানন্দের জীবনী আলাদাভাবে লিখেছি। তাই তাঁর বিষয়ে এখানে বিস্তারিত বলার দরকার নেই। তিনি আমার থেকে দু-তিনবছর আগে কানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মা আগে মারা যান, বাবারও শৈশবেই মৃত্যু হয়। সাধুদের সংস্পর্শে আসেন। অযোধ্যা মেলায় যান আর সাধু হরিদাস হন। অষ্টম-নবম ক্লাস পর্যন্ত স্কুলে পড়েছিলেন, তাই তাঁর বেশি দরকার ছিল সংস্কৃত গুরু ও সাধু-সমাজের। দেশ দেখার জন্য ভবঘুরেমি আর শোনা কথার থেকে যোগের প্রতি অনুরাগ তাঁকে যোগী হবার জন্য প্রেরণা দিচ্ছিল। পর্যটন করতে করতে হরিদ্বারে এক যোগীরাজের সঙ্গে পরিচয় হয়। যোগীরাজ বৈষ্ণব,

সখী মতাবলম্বী ছিলেন, তবে গোঁড়া ছিলেন না। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ দেখানোর জন্য দাস সরিয়ে দিয়ে আমাদের বন্ধুকে শরণ বানিয়ে দেন। অনেক পরে যখন পাঞ্জাবে বসবাস শুরু করেন এবং দেখেন যে গেরুয়া আর আনন্দের সম্মান বেশি, তখন ভাইসাহেব হরিশরণানন্দ হয়ে গেলেন। কিন্তু এ অনেক পরের কথা। তিনি মানসরোবর আর হিমালয়ের অন্যান্য কঠিন জায়গাগুলি ভ্রমণ করেন। যোগসিদ্ধির জন্য এমনই জঙ্গলের এক গাছের ওপর গিয়ে মাসের পর মাস বসে রইলেন। রাতে হাতির দল সেখান দিয়ে চরতে বেরোত। গন্ধ যখন পেল, গাছটাকে নাড়াতে শুরু করল। কিন্তু গাছটা নাড়ানো একটা হাতির কাজ ছিল না। একবার নাড়ানোতে মাটির ঘড়া পড়ল ওপর থেকে। দাঁতাল হাতির মনে হলো, কেউ বোম ফেলছে। সে প্রাণ নিয়ে পালাল। তাঁর গাছের পাশ দিয়েই গঙ্গা বয়ে যেত। যেখানে অনেক বড় বড় পাথর পড়েছিল। একদিন হাতির একটি ছোট বাচ্চা তার মধ্যে আটকে গেল। হাতিরা তাকে বার করার অনেক চেষ্টা করল। ভোর হতে দেখে তারা তাকে ছেড়ে চলে গেল। দুধ দিতে আসত যে গোয়ালা, ভাইসাহেব তাকে বাচ্চা হাতিটা পোষার জন্য বলে দেন। সে পুষতে থাকে কিন্তু পরে ঠিকমত তার দেখাশোনা না হওয়ায় হাতিটা মরে যায়। গঙ্গার ধারের এই জঙ্গলে যোগীরাজ এই জন্য এসেছিলেন যে, ভক্তরা তাঁকে বিরক্ত করবে না, কিন্তু দিল্লী, কলকাতা আর বম্বে থেকে যোগীদের খোঁজে আসা ভক্তরা কেনই বা বৃক্ষবাসী যোগীরাজের খবর পাবে না? মনের একাগ্রতা করতে তরুণ যোগীরাজ যথেষ্ট সফল হয়েছিলেন, কিন্তু এখন আর সেই স্থান একান্ত ছিল না। তিনি যমুনার ধারে পৌঁটার কাছে কুটিরে অভ্যাস করতে লাগলেন। কুটির কি, সাপেদের আস্তানা ছিল। বিশ্বাস ছিল, অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হলে কোনো প্রাণীর প্রতি রাগ বা ভয় থাকে না, যা একেবারেই মিথ্যে কথা। ভেড়া বেচারা হিংসা করে? ছাগলরা কার অনিষ্ট চায়? কিন্তু এরা জঙ্গলে থাকলে হিংস্র পশুদের স্বাভাবিক ভক্ষ্য হয়, আর গ্রামে থাকলে মানুষের। বাঁচোয়া যে, ভাইসাহেবকে কোনো বিষধর সাপ ছোবল দেয়নি। ধ্যানাবস্থায় একবার তার গায়ে সাপ পড়েছিল। তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া এমন হলো যে পুনরায় তিনি অভ্যাসে স্থিত হতে পারলেন না। চেষ্টা করলে, মনে এমন বিহ্বলতা জন্মাত যে, মনে হতো এবার এসব ছাড়তে হবে। যোগের রাস্তা তিনি ছেড়ে দেন।

এখন শুধু ভবঘুরেমি ছিল তাঁর সমানে, কিন্তু সেই সঙ্গেই তাঁর মন ভিক্ষাবৃত্তিতে বিদ্রোহ করে বলত—'তুলসী কর পর কর ধরো, কর তর কর ন ধরো।' তাঁর মনে হলো, আয়ুর্বেদ স্বাবলম্বী হবার সবথেকে বড় উপায়। নাহন-এ থাকার সময় আয়ুর্বেদের পরীক্ষাতে পাস করেন। এরপর ভবঘুরেমি আর চিকিৎসা করার থেকেও আয়ুর্বেদের বইগুলির খোঁজ করাটা তাঁর লক্ষ্য হয়ে উঠল। কথা সংক্ষেপ করে বলি—'পর্যটন বিবিধান্ লোকান্।' তিনি একসময় অমৃতসর পৌঁছলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগে সভা হচ্ছিল। তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে সেখানে পৌঁছলেন। বন্ধু (বৈষ্ণবদাস) সেখানেই শহীদ হলেন। স্বামী হরিশরণানন্দকে তাঁর বন্ধুর স্মৃতি কিছুটা কষ্ট দিতে থাকল, আর তার থেকেও বেশি নতুন রাজনৈতিক চেতনা ও দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ঢেউ তুলতে লাগল। এখন তিনি পাঞ্জাবের হয়ে গিয়ে অমৃতসরে থাকতে লাগলেন। কংগ্রেসে কাজ করলেন,

একাধিকবার জেল গেলেন। চিকিৎসা করতে আয়ুর্বেদিক ওষুধ বানানোর দিকে নজর গেল, তিনি পাঞ্জাব আয়ুর্বেদিক ফার্মেসির নামে নিজস্ব ধরনের প্রথম ফার্মেসি খুললেন। সময় তার অনুকুল ছিল। ফার্মেসির কাজ বাড়ল। আয়ুর্বেদের পরীক্ষা দেবার সময় তিনি ভেবেছিলেন, আমি লাখপতি যদি হয়ে যাই, তাহলে আর্থিক চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যাব। লাখপতি হতে তাঁর দেরি লাগেনি এবং তিনি আরো উন্নতি করতে পারতেন, কিন্তু পয়সা রোজগার করাটা তাঁর মুখ্য ধ্যেয় ছিল না। এটাও বলা যেতে পারে যে, বিজ্ঞাপনের আধুনিক মাধ্যম পুরোপুরি গ্রহণ না করে তিনি নিজেকে অব্যবহারিক না হলেও কিছুটা পুরনোপন্থী অবশ্যই প্রমাণিত করেছেন।

অমৃতসরে থাকতে তিনি স্বামী হরিশরণানন্দ হয়ে গেলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও অনেক দিন পার হয়ে গিয়েছিল। কখনও কখনও নিজের শরীর অসুস্থ হতে দেখে তাঁর সহধর্মিণীর প্রয়োজন বোধ হলো। ধর্ম বলাটা ভুল হবে, কারণ ভাইসাহেবের না ধর্মে বিশ্বাস ছিল আর না ভগবানে। দেখে-শুনে বৌদি জানকীদেবীকে বিয়ে করলেন। দুজনের অচল-জোড় না এগোল সামনে, না হটলো পিছনে। সকলের স্বভাব এক হয় না, কিন্তু স্বভাবে প্রভেদ থাকলে এটা জরুরি নয় যে, দু চাকার গাড়ি চলতে পারবে না। দুজনে সময়ে সময়ে রেগেও যেতেন, আবার মিলও হয়ে যেত।

কালিম্পং থেকে ঘুরে আসা ডাকে শাসন-বিভাগ সম্বন্ধী পরিভাষাগুলির দুটি সূচিও ছিল, কিন্তু এতে বালকৃষ্ণজীর নাম ছিল না, যেটা খটকা লাগার মত কথা। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ বালকৃষ্ণজীর থেকে যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া শুধু কঠিনই নয়, বরং তাঁর অভিজ্ঞতা দেখলে বলতে হবে তা অসম্ভব। কিন্তু ভাল সরকারি মেশিনেও ভুল হয়ে যেতে পারে, আর এখানে তো নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত অযোগ্যদের ভিড়। মন্ত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই চাটুকারিতা ও চালাকির সাহায্যে ওপরে উঠেছে। নিজেদের বিভাগ সামলানোর তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। যদি আই· সি· এস· সেক্রেটারিদের ভরসায় কাজ সামলাতে হয়, তাহলে যে কোনো মাটির তালকে যেখানে বসানো যেতে পারে। বাকি জায়গাগুলোতে ভাই-ভাইপো-ভাগ্নেদের অথবা আর অন্য কোনোরকমে ঘনিষ্ঠতা প্রাপ্ত আত্মীয়দের অথবা তাদের সন্তানদের আশা আছে। এমন অবস্থায় কে যোগ্যতা দেখে? কোন যোগ্য ব্যক্তি এই দম বন্ধ করা পরিবেশে ভাল ভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারে? এর পরিণাম হলো তিন বছরের ভেতরেই সমস্ত মেশিন অকর্মণ্য হয়ে যাওয়া। রাজ্যগুলি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত দপ্তরগুলিতে ইংরেজ আমলের থেকে এখন চারগুণেরও বেশি কর্মচারী হয়ে গেছে,যেখানে দেশের ক্ষেত্রফল পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাওয়ায় কম হয়ে গেছে। এই কর্মচারীদের চারগুণ পল্টন ততটুকুও কাজ করতে পারে না, যতটা ইংরেজ আমলে এদের এক চতুর্থাংশ লোক করত। দশটা যদি অফিসের সময় হয়, তাহলে এগারোটার সময় কর্মচারী আর বারোটার সময় যদি বড় সাহেব পৌছে যান, তাহলে তো খুব দয়া করা হলো। কখনও কখনও বড় সাহেবের ফোন এসে যায় যে, আজ বাংলোতেই কাছরি বসবে। দূর দূর থেকে তারিখ অনুযায়ী কাছারিতে জমা হওয়া লোকেদের এবার সাহেবের বাংলোয় ছুটতে হবে। সেখানে পৌছতে পৌছতে এও শুনতে হয় যে, ডেপুটি কমিশনার

সাহেব আজ গ্রামের সফরে চলে গেছেন। কে পাত্তা দেবে, যেখানে একই হাড়ির কালিমাখা সকলেই, আর সকলেই কোনো না কোনো ভাই, কাকা, অথবা মামার সুপারিশের জোর রাখে। পরে জানতে পারলাম, সত্যি সত্যিই প্রফেসর বালকৃষ্ণকে সেই জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'অন্ধের নগরী,' তোর ভেলা ডুবুক!

১৮ আগস্টের খবর অনুসারে এগারোটার সময় আমি স্থানীয় কাছরিতে গেলাম। হাতিয়ারের লাইসেন্সের ব্যাপারে খোঁজ করার ছিল। নায়েব তহসিলদার সাহেব সাড়ে এগারোটার কাছাকাছি এলেন। যাইহোক, আশীর্বাদ ছিল। ইনকাম ট্যাক্সের রসিদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। সরকারের কাছে ইনকাম-ট্যাক্সই প্রামাণ্য জিনিস। লেখনীর সম্পত্তির কোনো মূল্য নেই।

বর্ষার সময় পাহাড়ী জায়গায় কোথাও ধস নামা আর কোথাও পুল ভেঙে যাওয়াটা সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু মুসৌরীর মত যার সওয়া শো বছরের অভিজ্ঞতা আছে, সে এই সব কষ্ট জানে, আর তার জন্য মানুষ প্রস্তুত থাকে। ২১ তারিখের ডাক এলো না। বুঝতে পারছিলাম, কোথাও গণ্ডগোল আছে। পরের দিন জানা গেল যে, দেরাদুন থেকে আসা রাস্তার ওপর কোথাও কোথাও পাহাড় ভেঙে পড়েছে। পাহাড় ভাঙলেও ডাকের থলিকে সেই সময় পাঠিয়ে দেওয়া কঠিন ছিল না। কিন্তু যখন ছুতো পাওয়া গেছে, তখন কেন ঝামেলায় যাবে?

আমি তো জঙ্গলে চলে এসেছিলাম। এখন আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না যে, আমি ভুল করেছি। তবে হ্যাঁ, এটা অবশ্য চাইতাম যে পাশের হর্নহিল আর হর্নলী দুটি বাংলোতে যদি কোনো হিতৈষী বন্ধু আসেন, তাহলে খুব ভাল হয়। সূর্যভানুজী প্রথমে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তারপর ভাইয়াকেও আমি আকৃষ্ট করতে চাইলাম, কিন্তু তিনি আমার থেকে অনেক বেশি ব্যবহারিক ছিলেন। তিনি কেন জঙ্গলের ভাঙ্গা বাড়িতে ২৫-৩০ হাজার টাকা ফাঁসাতে যাবেন, যখন জানতেন যে বছরে তিনমাসের জন্য তিন-চারশো টাকায় কেন্দ্রীয় কুল্‌হড়ী বাজারের আশেপাশে ভালো বাড়ি পাওয়া যেতে পারে?

এইসময় চিনির খুব অসুবিধে ছিল। অতিথি-সংকারের জন্য সবথেকে ভাল জিনিস হলো চা। কালোবাজারের চিনি খুব দামী ছিল। যতটা সম্ভব তার থেকে বাঁচতে চাইতাম। একবার রেশন-আধিকারিক আলাদাভাবে কিছু চিনি জোগাড় করে দিয়েছিলেন। আমি ভাবলাম গুড়ের ভাল সিরা বানিয়ে নেওয়া যাক। গুড় অপেক্ষাকৃত সস্তা ছিল আর তাতে কন্ট্রোলও ছিল না। গুড় দিয়ে কফি খাওয়া আমি কফির জন্মভূমি কুর্গে শিখেছিলাম। সেখানে থাকতে থাকতে আমার বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল যে, কফিতে চিনির ব্যবহার করলে তার স্বাদ কমে যায়, সেইজন্যও গুড়ের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব ছিল, আর কফি খাবার সময় তো আমি সবসময় গুড়ের সিরাই ব্যবহার করতে চাইতাম।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জানতে পারলাম শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এও বলা হচ্ছিল যে, নেহেরুজী তাঁর নির্বাচনে সবথেকে বেশি বিরোধিতা করেছিলেন এবং এরকম ভয়ও দেখিয়েছিলেন যে, উনি নির্বাচিত হলে তিনি ইস্তফা দেবেন। একবার এরকম পরিস্থিতিতেই গান্ধীজীর বিশেষ বিরোধিতা সত্ত্বেও

সুভাষবাবু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই সময় কংগ্রেসের শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল। তবে এখন কারোরই কংগ্রেসকে সেই পাঁক থেকে বার করে আনা সম্ভব। এই পাঁকের মধ্যে সে নিজের সঙ্গে দেশকেও নিয়ে চলেছে। কেউ ইস্তফা-পত্রই বা দেবে কেন, কারণ সরকার থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে তাদের জন্য করার কি আছে? লোকে যদি নেহেরুর কথা অমান্য করে ট্যান্ডনজীকে সভাপতি করে থাকে, তবে তার অর্থ হলো এই যে, তাদের মস্তিষ্ক এখনও অপরিপক্ক, আর নিজেদের লাভ-ক্ষতি তারা বোঝে না। নতুন সাধারণ নির্বাচনের পর যে সব মানুষ ওপরে উঠলেন তাঁরা এই তথ্য বুঝলেন যে, নেহেরুজীকে ছাড়া আমাদের কাজ চলতে পারে না, সেই সঙ্গে তাঁরও আমাদের বাদ দিয়ে কাজ চলবে না।

হর্নক্লিফ-এ শাক-সবজির জন্য জমি প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট ছিল। নতুন মানুষ তা দেখে মনে করবে যে, একটু হাত-পা চালানো উচিত, তাহলে শাক-সবজি কেনার দরকার হবে না। মুসৌরীতে শাক-সবজি চড়া দামে পাওয়া যায়। নীচে দেরাদুনে যে জিনিস দু আনা সের পাওয়া যায়, সেটা এখানে ছ আনা সের। শাক-সবজির জন্য আশেপাশের গ্রামগুলিকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করা হয়নি। নতুন পুরসভা নির্বাচন হবার পর আশা করা গিয়েছিল যে, সে কিছু করবে, কিন্তু মনে হচ্ছে, রাজা ভোজের সিংহাসনে বসলেই মানুষের মস্তিষ্ক বিগড়ে যায়। প্রথম দু-তিন বছর আমার শাক-সবজির খেত করার পাগলামি চেপে ছিল। নিজেও কাজ করতাম। জানতাম না যে, কপি কিভাবে আর কখন লাগানো হয়, টমেটোর জন্য কি করা উচিত। আমি, মাতবর সিংহ আর কখনও কোনো মজুরকে লাগিয়ে বছরের পর বছর ধরে ঘাসের ময়দান হয়ে থাকা কেয়ারীগুলোকে খোঁড়ালাম। সার দেওয়ালাম, বাজার থেকে বীজ আনালাম। ভাবলাম, যদি মাটি ভেজা থাকে আর সার পড়ে তাহলে বীজ লেগে যাবে। যখন কয়েক সপ্তাহ ধরে বীজ লাগার নাম করল না, তখন বুঝতে পারলাম যে, তা লাগার জন্য তাপমাত্রার প্রয়োজন আছে। শীতে তা লাগে না। তাপমাত্রা ছাড়াও প্রতিটি জিনিসের নিজস্ব সময় আছে। আমি ভাবলাম, সব জিনিস মাটিতে পুঁতে দাও, এই অভিজ্ঞতা পরে কাজে দেবে। কপি, টমেটো, পালং, মুলো সবকিছুর বীজ পুঁতে দিলাম।

খেত তো আছেই, দুনিয়ায় যখন এইসব খেতেই শাক-সবজি ফলানো হয়, তখন আমিও ফলাব, হ্যাঁ কিছু ভুল করে, অভিজ্ঞতা লাভ করে, কিন্তু এটা জানতাম না যে, এখানে কখনও কখনও হনুমান আর লালমুখো বাঁদরের পল্টন আসে। এই ভ্রাম্যমানেরা যারা ঘর বেঁধে থাকে তাদের সমস্ত শ্রমকে নিজের বলে মনে করে আর কয়েক সপ্তাহ নয়—কয়েক মাস ধরে জড়ো করে রাখা ফসল চোখের পলকে পরিষ্কার করে দিয়ে চলে যায়। এই বছর আমি যখন খেত তৈরি করলাম, তখন আসলে ফসলের সময় পার হয়ে গিয়েছিল, তাই হনুমানজীর কালো-ফর্সা পল্টনরা নতুন প্রজার থেকে লাভ করার কোনো সুযোগ পেল না।

বই রাখার জন্য আলমারির দরকার ছিল। পুরনো জিনিস বিক্রেতার কাছে ভাইয়া কয়েকবার ঘোরাঘুরি করলেন। ৭৫ টাকায় দুটি কাঁচ লাগানো আলমারি আমার কাছে

গেছে। প্রেসের এ জঞ্জাল থেকে নিজের মাথাটা বাঁচান।' এক এক করে সব বেচে দিলেন। এখনও একটা দুটো মেশিন বিক্রি হতে বাকি আছে। যে হলে প্রেস বানানো হয়েছিল, তার জন্য ভাল ভাড়া পাওয়া গেছে। ওপরের তলার একদিকের ঘর নিজের জন্য রেখে আরেকদিকের ঘর মাসিক দেড়শো টাকায় ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন। তিনতলা তৈরি হতে বাকি, যার জন্য মাসিক তিনশো টাকা হিসাবে সারা বছরের ভাড়া আগাম দেবার জন্য লোক তৈরি। কত দূরের ভাবনা! যদি প্রেস প্রকাশনা নাও চলে, তা হলেও সম্পত্তি বেকার নয়। হাজার-বারশো টাকা মাসিক ভাড়া পাওয়াই যাবে।

এক জায়গায় ঘর বেঁধে থাকলে বইয়ের সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল। এতদিন পর্যন্ত তো আমার কাজ না করে বসে থাকা বৃত্তি ছিল, বই পেতাম, সেগুলো বিলিয়ে দিতাম। পালি, সংস্কৃতের নিজস্ব সংগ্রহ বিহার রিসার্চ সোসাইটির গ্রন্থাগারে ফেলে রেখেছিলাম। প্রকাশক বন্ধুরাও তাঁদের প্রকাশনার কপি পাঠালেন। প্রয়াগ থেকে পণ্ডিত গণেশ পাণ্ডে প্রথম আরম্ভ করলেন, তারপর যশপালজীর বই এলো। তারপর দেবরাজজী রাজকমল প্রকাশনার বই পাঠালেন। আস্তে আস্তে হিন্দি বই যথেষ্ট জমা হয়ে গেল। বইয়ের বিষয়ে বুদ্ধিমানেরা আগেই বলে গেছেন 'লেখনী পুস্তিকা নারী, পরহস্তগতা গতা।'[১] আর এখানে তো এটা লেখকের গ্রন্থাগার। নিজের লেখার কাজে তার কখন কোন বইয়ের দরকার পড়ে কে জানে। কিন্তু যতই সংকোচ কর না কেন, চলে যাবার জন্য কখনও না কখনও 'পরহস্তগতা' হয়েই যায়।

২১ সেপ্টেম্বর ওয়াই· ডবলিউ· সি· এ·-তে আমি এশীয় মহিলাদের সামনে ভাষণ দিলাম। তাতে লেবনেন, ফিলিস্তিন, জাপান, বর্মা, লঙ্কা, জাভা, শ্যাম, ইন্দোচীন, এবং চীনের ৫০ জন মহিলা ছিলেন। তাঁদের কোনো ক্লাশ অথবা সেমিনার চলছিল। ৩০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে বয়স ছিল তাঁদের। ভাষণের পর আধঘণ্টা ধরে প্রশ্নোত্তর চলতে লাগল। আর্মেনিয়ান মহিলা মার্কসবাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগলেন। মার্কসবাদ অথবা বৌদ্ধদর্শন তো মাছের জল পাওয়ার মত ব্যাপার। তবে ক্রিশ্চান মিশনারিরা সাধারণভাবে কমিউনিজমের নামে খেপে ওঠে, বিশেষ করে এশিয়াতে।

২২ সেপ্টেম্বরে দিল্লীর সাপ্তাহিক 'নবযুগ'-এ আমার দ্বারাহাটের ভ্রমণ বিষয়ক লেখা ছাপা হলো। সেটাতেই আমার বিরুদ্ধে ড· রামবিলাস শর্মার লেখা বেরোল, যাতে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, রাহুলজী মার্কসবাদী নন, কেবল বৌদ্ধ তিনি। তাতে কিছু সত্যের অংশও ছিল, কিন্তু মিথ্যার অংশ বেশি। রামবিলাসজী সেই সব মানুষদের একজন, যাঁরা কোনো কথা ধরে বসলে তার সপক্ষে যে কোনো হাতিয়ার ব্যবহার করতে দ্বিধা করে না। এরপরে ওইরকম আরো লেখা লেখেন। সম্পাদক ও আমার অন্য বন্ধুরাও আমাকে জবাব দেবার জন্য বলেন, কিন্তু আমি তা পণ্ডশ্রম মনে করলাম। হাজার হাজার পাতা আমি এইসব বিষয়ে লিখেছি, যদি সেই লেখাগুলো আমার সাফাই না দিতে পারে, তবে শুধু শুধু ঝগড়া করে কতগুলো পাতা কালো করে কি হবে? যদিও তরুণ বয়সে কথার

[১]'কলম, বই ও স্ত্রীলোক অন্যের হাতে গেলে তা চলেই যায়।'—স·ম

মল্লযুদ্ধ আমি পছন্দ করতাম, কলম দিয়ে এবং কথা বলেও তা করতে আনন্দ পেতাম। এমন সব ঘটনা 'মেরী জীবন-যাত্রা'র প্রথম খণ্ডে পাওয়া যাবে। এখন আর তেমন মল্লযুদ্ধের কোনো ইচ্ছে নেই। আমার বুদ্ধের প্রবচন মনে পড়ল, 'সত্তাহং সদ্দো ভবিষ্যতি' (মিথ্যে প্রচারের শোরগোল সপ্তাহখানেক থাকে), তারপর নিজে নিজেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। প্রাচীন দর্শনগুলির মধ্যে বৌদ্ধদর্শন মার্কসীয় দর্শনের খুব কাছাকাছি। ধর্মকীর্তি হেগল-এর থেকেও মার্কসের বেশি কাছাকাছি, তাই যদি আমি ধর্মকীতির দর্শনের গুরুত্বের কথা জানাই, তাতে বিস্মিত হবার কি আছে?

সিংহলদ্বীপে পালি ত্রিপিটক পড়ার সময় আমি 'বুদ্ধচর্যা' লিখেছিলাম, ১৯৩১-৩২-সালে তা ছাপা হয়। বহুদিন হলো তা শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি তো ভাবতাম, এত বড় বইয়ের হিন্দিতে নতুন সংস্করণ হওয়া আমার জীবনের পরের কথা। কিন্তু দেবপ্রিয়জীর কৃপায় এখন তার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা শুরু হয়েছিল। চোখের সামনে নিজের সন্তান না মরলে, তাতে আনন্দ হয়েই থাকে। ২৫ সেপ্টেম্বর ব্যারিস্টার শ্রীমুকুন্দলালজী এলেন। নিজের জায়গায় মুকুন্দলালজী সেই স্থান অর্জন করেছেন যা বিহারে জয়সওয়ালজী করেছেন, দুজনে অক্সফোর্ড-এর স্নাতক ও ব্যারিস্টার। জয়সওয়ালজী ব্যারিস্টারি ছাড়েননি, ক্রমবর্ধমান খরচের কারণে পর্যাপ্ত না হলেও তিনি মাসে চার-পাঁচ হাজার রোজগার করেন। মুকুন্দলালজী জমাতে পারেননি। রাজ্যের মুখ্য জজিয়তি করতে চলে গেলেন। একবার কয়েক বছরের জন্য যদি আপনি স্থানভ্রষ্ট হয়ে যান, তাহলে আবার প্র্যাটিস জমানো মুশকিল হয়ে পড়ে। জয়সওয়ালজীর মত মুকুন্দলালজী হিন্দিকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন, মাঝে-সাঝে হিন্দিতে লেখেনও। কিন্তু নিজের সমস্ত ভাল ডিমগুলিকে তিনি একটা (ইংরেজির) ঝুড়িতে রেখেছিলেন। এটা তাঁর ভুল। তাঁর গভীর এবং সুন্দর রচনা ইংরেজির বড় বড় পত্র-পত্রিকায় বেরোত। চিত্রকলা, বিশেষ করে 'পাহাড়ী কলম' তাঁর নিজস্ব প্রিয় বিষয়। এই বিষয়ে তাঁর সচিত্র রচনা দামী পত্রিকাগুলিতে ছেপেছে। ইংরেজ রাজত্বের সময় যদি অবসর বার করে নিজের বিষয়ে বড় বই লিখতেন, তাহলে ছাপতে কোনো অসুবিধে হতো না। কিন্তু আজকাল ইংরেজির সমর্থ প্রকাশকরাও ইংরেজি বইয়ের প্রকাশনায় টাকা ঢালতে দ্বিধা করছে। শিল্পের বই তো বিশ বছরেও তার খরচ তুলে দিতে পারে না। তাঁকে দেখে আমি নিজের ভাগ্যকে প্রশংসা করতাম। তিনি যদি একটা ঝুড়ি (ইংরেজি)-তে নিজের সব ডিম রেখে থাকেন, তবে আমিও এক ঝুড়িতে অর্থাৎ হিন্দিতে সবকিছু লিখেছি। দু-চারটে বই তিব্বতীতে অথবা দু-চারটে সংস্কৃততে এমনি এমনিই লিখেছি। হিন্দির পক্ষে দিন দিন অনুকুল সময় আসতে লাগল, আর এখন কয়েকশো ফর্মার বই লিখলেও এটা ভেবে মন খারাপ করার দরকার নেই যে, প্রকাশ করার লোক কোথায়? মুকুন্দলালজী প্রকৃত অর্থেই একজন সুশিক্ষিত ও সুসংস্কৃত মানুষ। যখনই তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ হয়, মনে হয়, আমাদের দুজনের পাশে জয়সওয়ালজীও বসে আছেন—মুকুন্দলালজীর জয়সওয়ালজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এই সময় আমি 'গঢ়ওয়াল' লেখা শুরু করতে যাচ্ছিলাম। মুকুন্দলালজী 'গঢ়মাতার যোগ্যপুত্র'। তিনি তার ইতিহাস ও সংস্কৃতির গভীর পরিচয়

রাখেন। তাঁর কাছ থেকে জানতে পালাম যে, পরসা-টেহরীর মহারাজা নরেন্দরশাহ স্বেচ্ছাচারিতা পছন্দ করতেন, কিন্তু শিক্ষিত ও যোগ্য ছিলেন, এতে সন্দেহ নেই। আমি তাঁরই বাড়ি গিয়েছিলাম। আমার অনুপস্থিতির সময় একবার তিনি এই বাংলোর আঙিনায় এসেওছিলেন। যাইহোক, মুকুন্দলালজী বহু বছর ধরে বেরিলিতে সরকারি টারপেন্টাইন ফ্যাক্টরিতে মুখ্য ব্যবস্থাপকের পদে আছেন।

সেদিনই (২৫তারিখে) বৌদিকে নিয়ে ভাইয়াজী এলেন। পণ্ডিত গয়াপ্রসাদ শুক্লও সকালে এসেছিলেন। খাবার পরে শুক্লজী দেরাদুন ফিরে এলেন। পাহাড়ে মোটরে চড়ে গেলে বমির চোটে তার প্রাণ বেরিয়ে যায়, তাই পায়ের ভরসাতেই তিনি পর্বত লঙ্ঘন করেন। আমরা কোম্পানি বাগানে গেলাম। যতদিন পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব ছিল, ততদিন পর্যন্ত সর্বজনীন উদ্যান অথবা অন্যান্য সর্বজনীন স্মাবকের সঙ্গে কোম্পানির নাম যুক্ত করা হতো। কোম্পানি বাগান নাম শুনলেই বোঝা যায় তার স্থাপনা ১৮৫৭-র আগে হয়ে থাকবে। মুসৌরীর মুখ্য কেন্দ্র থেকে আমার জায়গাটা যতদূরে, প্রায় ততটাই দূরে এই বাগানটাও। চার্ল হুইল হোটেল থেকেই তারও আলাদা রাস্তা আছে। কোম্পানি বাগান ছোট কিন্তু ভালো বাগান। সেপ্টেম্ববের শেষে ফুলের সাজ আর কি থাকবে, এমনিতেও সেই সময় তার অবস্থা ভালো ছিল না। কোম্পানি বাগের সংলগ্ন পাহাড়ে ইংরেজরা দূব-দূর পর্যন্ত দেবদারু লাগিয়ে দিয়েছিল। ডিপোকে বাদ দিয়ে মুসৌরীর সব থেকে বড় দেবদারু জঙ্গল এটাই। যারা দেখবে তারা মনে কববে যে, এটা প্রাকৃতিক দেবদারু বন। কিন্তু প্রাকৃতিক দেবদারু ন-দশ হাজার ফুটের নীচে হয় না। হিমালয়ে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি উপত্যকাই আছে, যেখানে প্রাকৃতিক দেবদারু পাওয়া যায়। ইংরেজি শাসনকালে জঙ্গল রক্ষার দিকে দৃষ্টি যাওয়ায় বন-বিভাগ সংগঠিত হয়। তারাও অনেক জায়গায় নতুন দেবদারু বন লাগিয়েছে। কোম্পানি বাগানে বাচ্চাদের জন্য দোলনাও আছে, রেস্তোরাঁর জন্য ঘর আর বাড়িও আছে, কিন্তু এগুলো কখনও চালু হবার সম্ভাবনা নেই। বেশির ভাগ লোকই নিজেদের সঙ্গে খাবার-দাবার নিয়ে আসে, তাহলে কে এখানে তার রেস্তোরাঁ বা দোকান খুলে মাছি মারতে রাজি হবে? কোম্পানি বাগের রাস্তায় ড· অমরনাথ ঝার বাংলো আর প্রফেসর রঞ্জনের ব্যারাক পড়ল। প্রফেসর রঞ্জন সাইন্সের বিদ্বান, তাই শিল্পের প্রতি তাঁর উদাসীনতা দেখা যায়।

ড· ঝার বাংলোটা কোনো এক সাহেবের পুরনো বাংলো। প্রথমবাব যে এর ভেতরে ঢুকবে সে নিশ্চয়ই মনে করবে যে, সে ইন্দ্রের অমরাবতীর কোনো এক কোণায় আছে। সেখানে চারদিকে সবুজ সবুজ বৃক্ষ-বনস্পতির ছায়া। ঝা সাহেবের মৃত্যুতে এই বাংলো মাটির দরে বিক্রি হয়ে গেছে।

সেপ্টেম্বর শেষ হতে হতেই মনে হচ্ছিল বর্ষা শেষ হয়ে গেল। খেত শুকিয়ে গেল। তখন বোঝা গেল যে, জল ছাড়া এখানে কিছু হওয়া সম্ভব নয়। পানীয় জল খেতে দেওয়াটা প্রথমত, নাগরিক আইনের অবহেলা করা আর দ্বিতীয়ত, তাতে অনেক খরচ পড়ত। হর্নক্লিফ আর হর্নহিল আমরা আসার আগে একই ছিল। ওপরে জলঘর বানানো হয়েছিল, তাতে বর্ষার অধিকাংশ জলই জমা হয়ে যেত যা খেতের জন্য সারা বছর পর্যাপ্ত

হতো। এখন কয়েক বছর ধরে সেই জলঘরের খোঁজ-খবর নেবার কেউ ছিল না। ছাত ভেঙে গিয়েছিল, সিমেন্টও উঠে গিয়েছিল, যার জন্য সমস্ত জল সুরক্ষিত রাখা যেত না। তবুও মোটা পাইপ দিয়ে ছাতের জল চৌবাচ্চায় এসে জমা হতো। এখন চাষের জন্য জলের কোনো ব্যবহার ছিল না। তবে হ্যাঁ, ধোপানীদের তার জন্য দু-তিন মাইল দূরের ধোপাপট্টীতে যাবার দরকার হতো না। হর্নহিল-এর আউট হাউসে স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে ধোপানী, তার অন্ধ-কালা স্বামী আর নন্দু চাকরও থাকত। কালা হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যদি অন্ধও হয়ে যায়, তাহলে সত্যিসত্যিই সে মানুষ কেন—প্রাণীও থাকেন না। দুনিয়ার কোনো জিনিস হাত দিয়ে ছোঁবার অধিকারটুকুই তার ছিল। যদি সে ডাকত তাহলে মনেই হতো না তার আওয়াজ কারো কানে যাচ্ছে। সে আসছে না তাই তার ওপর রাগ করা উচিত, অথবা আশেপাশে কোনো মানুষ নেই, তাই রাগ করে লাভ কি? বার্দ্ধক্যের সীমায় এসে সে তরুণী বরেঠিনকে বিয়ে করেছিল। অনেক বছরই তারা হাসিখুশিতে কাটিয়েছে। সেই সময় এক পাহাড়ী ছোকরাকে কাপড় ধেবার জন্য চাকর রাখল। নন্দুর জাতের লোকেরা নাপিতের কাজ করত, কিন্তু নন্দু কাপড় ধোওয়াই শিখেছিল। তারপর সময় এলো যখন ধোপানী চোখ আর কানও হারিয়ে লাশের মত নিজের ঘরে পড়ে থাকত। কি ভাবত আর বিড় বিড় করত, তা শোনার অবসর কারো ছিল না। তবুও বরেঠিন তাকে খাইয়ে-টাইয়ে দিত। পায়খানা-পেচ্ছাপ করতে সাহায্য করত। একদিন নয়, একমাস নয়, বছরের পর বছর এমন করাটা সাধারণ ব্যাপার ছিল না। সমস্ত সময় সে তার সামনে উপস্থিত থাকতে পারত না,কারণ তাকে রোজগার করে তার স্বামীকেও খাওয়াতে হতো। আশেপাশের বাড়িগুলোতে এখন কম লোকেই থাকত আর বরেঠিন কাপড়ও ভাল ধুত না, তবুও তার খাওয়া পরার কোনো কষ্ট ছিল না,তার কাজ জুটে যেত। নন্দু তার কাজের অংশীদার ছিল, কিন্তু বরেঠিন তাকে চাকর বলেই মনে করত।

শাক-সবজি ফলানোর জন্য জল এখন আমাদের কাছে সমস্যা ছিল। যদি ওপরের বাড়িটা কেউ কিনে নিত আর জলঘরটা ঠিক করাত, তাহলে হয়তো বা আমাদেরও কাজ হতো। কপি অথবা টমেটো গাছগুলোতে প্রতি সপ্তাহে জল দেবার প্রয়োজন ছিল।

আমাদের দেশও কি বিচিত্র। জগতে জ্যোতিষ, হস্তরেখা ইত্যাদি জিনিস বিশ্বাস করার লোকের অভাব নেই, কিন্তু এখানকার জগতটাই আলাদা। কোনো জ্যোতিষী খবর ছড়িয়ে দিল যে, ২৪-২৫ সেপ্টেম্বর ভূমিকম্প হবে। তারপর আর কি! লোকে শহরের পর শহর খালি করতে লাগল। অমৃতসর থেকে হাজার হাজার লোক পালিয়ে মুসৌরীতে এসে পৌঁছল। দেরাদুনে হাজার হাজার লোক ঘর ছেড়ে মাঠে পড়ে রইল। এমন জ্যোতিষীদের ফাঁসিতে চড়িয়ে দেওয়া হয় না কেন? এদের গুজবে চোরদের সুবিধা হয়ে যায়।

কোরিয়াতে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল। আমেরিকা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং উত্তর-কোরিয়ার সৈন্যদের ধাক্কা দিয়ে ৩৮ অক্ষাংশের ওপরে নিয়ে যাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল, অর্থাৎ উত্তর-কোরিয়াকেও সে নিজের মুঠোয় রাখতে চাইছিল। আমাদের সরকার আমেরিকাকে সাবধান করল— যদি সামনে এগোয়, তাহলে চীন চুপ করে থাকবে না। কিন্তু মদমত্ত আমেরিকান পুঁজিপতিদের কানে ভারতের কথা কেন ঢুকতে যাবে? যুদ্ধ

আরো উগ্ররূপ ধারণ করল। চীনকে তাতে ঝাঁপ দিতে হলো, কারণ সে নিজের সীমান্তকে বিপদে ফেলতে চাইছিল না। নতুন চীনের সৈন্যদের বিক্রম আমেরিকা আগেই দেখেছিল। চিয়াং-কাই-শেককে শিখণ্ডী করে সে লড়েছিল তবে, নিজের সৈন্যদের দিয়ে নয়, সেনাপতিদের দিয়ে। সব করা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট সৈন্যরা চিয়াং-কাই-শেককে প্রশান্ত মহাসাগরে ফেলে দিল। আমেরিকা হয়তো ভাবত, চীন বাঁদর-হুমকি দিচ্ছে। প্রায় সমস্ত উত্তর-কোরিয়া হাতে করার পর চীনা স্বয়ংসেবকদের পাল্লায় পড়ল আমেরিকা। এখন তাড়াতাড়ি সন্ধি করার কথা বলাটা কাপুরুষতা হতো। ১০ অক্টোবর কোরিয়ায় আমেরিকান প্রগতি দেখে বুক কাঁপছিল। নিজের ব্যক্তিত্বকে নিজের কাছ থেকে বেশি দূরে যেতে দেওয়ার এই ফল। কিন্তু মানুষ যদি এমন না হয়, তাহলে মানুষ কি? মনে হচ্ছিল কোরিয়াতে উত্তর-কোরিয়ানদের হার নয়, আমাদেরই হার হচ্ছিল।

বহু বছর ধরে আমাদের বাড়িটা বেওয়ারিস পড়ে ছিল। পাড়ার মহল্লার লোকেরা তাকে পশুচারণ ক্ষেত্র বানিয়ে রেখেছিল। কত পরিশ্রম করে আর দামী জল ঢেলে ঢেলে কপি চাষ করেছিলাম! ১১ অক্টোবর ধোপানীর ছাগল এসে সব পরিষ্কার করে দিল। দরজার ফটক লাগিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু ছাগল ওপরের দিক দিয়ে এসেছিল। কাব ওপরে রাগ হবে?

১৫ অক্টোবরে এগারোটার সময় কেম্পটি-ফল (জলপ্রপাত) দেখতে বেরোলাম। পিঠের ফৌজী ঝোলাটা শেষমেশ কিনেছিলাম কি জন্য? আজ সেটা পিঠে নিলাম। খালি না, কিছু জিনিস ভরে। ১৪-১৫ জন মানুষের দল ছিল। ড· সত্যকেতুর পরিবার, তার সঙ্গে আর কিছু পরিবার, ভাইয়া, বৌদি, কমলা আর আমি। সেখানে গিয়ে আরো অনেক দল পেলাম। কেম্পটি ফল-এর রাস্তা চার্লহুইল-এ ফটকের বাইরে দিয়ে পাহাড়ে চক্কর কেটে চলে গেছে। আমরা সোজা পাকদণ্ডী ধরলাম। ভাইয়াজীই শুধু এই রাস্তার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত ছিলেন, আমরা পথ হারিয়ে এগিয়ে গেলাম। তারপর চতুষ্পদ হয়ে পাকদণ্ডী শুঁকে শুঁকে আসল রাস্তায় যাবার চেষ্টা করলাম। অন্য একটা রাস্তা পেলাম, কিন্তু যাব কোনটা দিয়ে—এটা দিয়েই চল। যাইহোক, কোনোরকমে প্রপাতের দিকে যাবার রাস্তায় আমরা পৌঁছলাম। প্রপাত দূর থেকেই চোখে পড়ে। পঞ্চাশ-ফিট ওপরে থেকে আট-দশ হাত চওড়া ধারা নীচে পড়ছে। দেখতে ভারী সুন্দর। কিন্তু বর্ষার সময় ছাড়া প্রতিদিন একে দেখা যায় না, কারণ ওপরের গ্রামের মানুষ এর জল তাদের খেতের জন্য ব্যবহার করে। 'অনাদিকাল' থেকে রোববার দিন তাদের কাজ বন্ধ রাখতে হয়, তবেই খেতে যাবার এই জল জমা হয়ে পাথরের ওপর থেকে নীচে পড়ে আমাদের নয়ন তৃপ্ত করে। আমরা প্রপাতের কাছে পৌঁছলাম। অন্য লোকেরা তার থেকে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় প্রচণ্ড স্রোত ছিল, কিন্তু সবাই যখন যাচ্ছে, আমাদের ভয় পাবার কি আছে? কমলার সাহস হলো না। আমিও যেতে পারলাম না। আমরা চার-পাঁচজন ফিরে গিয়ে একটা খেতে গেলাম, আর অন্য সকলে এলে পর পিকনিকের বাক্স খোলা হলো। অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া হলো, গপ্পো-গাছা চলতে লাগল। তিনটে-চারটে নাগাদ সেখান থেকে দল ফিরে এলো। প্রপাতের বিশেষ রাস্তা ফেরার সময় উতরাইয়ের ছিল, কিন্তু

এখন তা খাড়া চড়াই হয়ে গিয়েছিল, যার ওপর অপরাহ্নের সূর্য একেবারে মুখে পড়ছিল। চড়াই, রোদ, পিঠের ওপর চাপানো হ্যাবরস্যাক সবাই মিলে একসঙ্গে প্রহার করল। আমার অবস্থা তো খারাপ হয়ে গেল। ভাবছিলাম, নকল বীর হবার দরকারটা কি ছিল? অন্তত এই পিঠের ঝোলাটা না আনলে তো শরীর কিছুটা হাল্কা হতো। যাইহোক, মাঝখানে শুয়ে পড়লে চলতো না, তাতে সম্মান হানি হতো। কোনোরকমে সেই এক মাইল রাস্তা শেষ করে চকরাতার রাস্তায় এসে পড়লাম আর অল্প দূরেই চায়ের দোকান পেলাম। 'প্রাণ বাঁচল, লাখ পেলাম' অথবা 'বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল'— চা খাওয়ার বাহানায় আমরা সেখানে জমিয়ে বসলাম।

এখন সূর্যও অস্তাচলের কাছে চলে গিয়েছিল, রাস্তাও চড়াই ছিল না, তাই আমাদের ভয়ের কারণ ছিল না। কিন্তু বৌদিকে সাড়ে-সাতী সনীচর এখনও ছাড়তে রাজি নয়। সারা রাস্তাটুকু বিনা জলে কে জানে কাকে কাকে শাপান্ত দিতে দিতে এলেন। এখন আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিলাম। এগোতে এগোতে ভাবছিলাম যে, বারোমাসের রাস্তা ছেড়ে সোজা 'হর্নক্লিফ' যাবার পাকদণ্ডী ধরা উচিত। এদিক দিয়ে সিজিনের সময় হাজার হাজার লোক যাতায়াত করে, কিন্তু সেটা কোন রাস্তা তা আমার জানা ছিল না। সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছিল, এখনও অন্ধকার হয়নি। এমন সময় কমলা আর একজন তরুণী সহায়িকা পেয়ে গেল। দুজনে ভাবল, এই পিঁপড়ের চালে চলা লোকেদের সঙ্গে আমরা কেন আমাদের যৌবনকে হাস্যাস্পদ করি? দুজনে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। কে জানে কতক্ষণ ধরে তাঁরা হেঁটেছে। আমরা ভাবছিলাম, তারা এতক্ষণে হর্নক্লিফ পৌছে চা-এর প্রস্তুতি করছে। গাছের নীচে অল্প অল্প অন্ধকার সাঁতরে বেড়াচ্ছিল। আমরা একটা মোড়ে পৌছলাম। মনে হলো, মুসৌরীতে দৌড় প্রতিযোগিতা হচ্ছে। দু-জন দৌড়বাজ প্রাণপণে আগে পৌছনোর জন্য আমাদের দিকে আসছিল। আমরা চিন্তা করার সুযোগ পাবারও আগে তারা কাছে এসে গেল। পড়ে যাবার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য দুই দৌড়বাজকে বোধ হয় লোকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেল। কিছুক্ষণ তো তারা কথাই বলতে পারছিল না। হ্যাঁ, আমরা চিনতে পারলাম যে, এদের মধ্যে একজন কমলাজী আর অন্যজন অধ্যাপিকা সুদর্শনজীর বোন। এবার দ্রুত ওঠা-পড়া নিঃশ্বাস কিছুটা মন্দ হলো, আর সেই সঙ্গে আমাদের জিজ্ঞাসা তীব্রতর হলো। দুজনের মুখ থেকে কথা শুনে সমস্ত খবর পাওয়া গেল।

দুই সঙ্গী খুব উৎসাহে হেঁটে যাচ্ছিল। শীলাজী, সত্যকেতুজী আরেকট্র দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলেন। দুই তরুণী পিছনে থেকে গেল। জঙ্গলের নির্জন রাস্তা। চারদিকে ঘন বৃক্ষ, যার ভেতরে ছায়া অন্ধকারের রূপ ধারণ করেছিল। মানুষের কোনো চিহ্ন ছিল না। এ এমন জঙ্গল, যেখানে ভালুক আর নেকড়ে থাকাটা একদম নিশ্চিত বলা যেতে পারে। কিন্তু পরে আমাদের বন্ধু কুঞ্জজী এবং অন্যরা জানালেন যে, যে জায়গায় দুই তরুণী পৌছেছিল, সেখানে এক প্রকাণ্ড ভূত থাকে। এরা কি জানত? হঠাৎই ভূতের জায়গায় পৌছে গেছে। পাতা খড় খড় করে উঠল। মনে হলো, কোনো গাছের ওপর মহামারী এসে পড়েছে। এখন তাঁদের সামনে প্রাণ-সংকট। এমন সময় বড় বড় বীরপুরুষও এই জায়গায় দাঁড়াতে পারে না, সেখানে বেচারি দুই অবলা তরুণীকে কি বলা যায়? তারা এটাই ভাবলো, আর

কোনো ক্ষতি হবার আগেই এখান থেকে পালানো উচিত। পিছন ফেরা মাত্র পায়ে গতি এলো। যদি কিছু ত্রুটি ছিল তো কমলার সঙ্গিনী তা বলে দিল। 'হুঁ হুঁ আমি তো আমার মায়ের সব থেকে ছোট মেয়ে, কি বলবেন তিনি! কি করে ধৈর্য ধরবেন?' দুই দৌড়বাজ ছুটতে ছুটতে···

এতে অবশ্য লাভ হলো,বৌদি এখন বকাঝকা একদম ভুলে গিয়েছিলেন, আর আমরা দুই শহীদকে সঙ্গে নিয়ে তাদের বোঝাতে বোঝাতে হর্নক্লিফ-এর দিকে চললাম। চড়াইও এলো, কিন্তু বোঝা গেল না। রাস্তা ভুলে চক্কর কেটে এক বছরের রাস্তা ধরেই আমরা ফিরে এলাম। পৌনে আটটায় যখন হর্নক্লিফ পৌঁছলাম তখন সমস্ত শরীর ভেঙে চুর-চুর হয়ে গিয়েছিল।

এই বছর শ্রীপরমানন্দজী পোদ্দারও মুসৌরীতে এলেন। দু-তিনবার দেখা হলো। রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি আমাদের যোজনা মঞ্জুর করেছিল। ড· সত্যকেতু হিন্দিতে 'ফ্রেঞ্চ স্বয়ং শিক্ষক' লেখা শুরু করলেন। পরমানন্দজী তার জন্য প্রয়োজনীয় চার-ছ রকমের টাইপের ব্যবস্থা করে নিজের প্রেসে ছাপার জন্য তৈরি ছিলেন। তিনি একটি ৪০-৫০ হাজার শব্দের ছোট হিন্দি অভিধানের কল্পনাও করেছিলেন। বড় টাইপে অভিধানের এক-দু কপি ছেপে সুইডেনে সেটা পাঠিয়ে ব্লক বানিয়ে ৫০-৬০ হাজারের সংস্করণ ছাপানো যাক। কাগজের দেশে কাগজ সস্তা হবে, আর প্রায় কাগজের দামেই অভিধান এখানে পৌঁছে যাবে,যার দাম সহজেই দু টাকা রাখা যেতে পারে। তারপর হাতে হাতে বিক্রি হতে অসুবিধেটা কি? কিন্তু এতে বিনিয়োগের জন্য মোটা টাকার দরকার। তাই এই যোজনা জন্মাতেই মৃত্যুবরণ করল।

১৯ অক্টোবর শ্রীরামচন্দ্র সিংহ এলেন। ফিজিক্সের প্রতিভাশালী ছাত্র আর আইনস্টাইনের শিষ্য ছিলেন। গুরু জার্মানি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় সাইন্স থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে যান। বেশ কিছুদিন সেখানে কাটানোর পর ভারতে তিনি জার্মান বিদ্যুৎ কোম্পানিতে কাজ করতে থাকেন। এই অবস্থায় আমি তাঁকে কলকাতায় দেখেছিলাম। এবার বেশ কয়েক বছর পরে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। কলকাতাতেই সম্ভবত ওকালতি পাস করে ছিলেন, আর এখন এলাহাবাদে ওকালতি করছিলেন। মুসৌরীতেও বহুকাল ধরে ওকালতি করতে থাকেন। ড· সত্যকেতু নিজের মোকদ্দমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলছিলেন, তাঁর মধ্যে সফল উকিল হবার প্রতিভা আছে। কিন্তু প্রতিভা আবার ভারসাম্যহীনও হয়ে থাকে। মুসৌরীতে ওকালতির ফী নেবার জায়গায় তিনি একটা বাক্স রেখে দিয়েছিলেন। মক্কেল যা দিতে চায়, সেই পারিশ্রমিক তাতে ফেলে দিক। ওকালতির থেকেও অন্যান্য জিনিস তাঁর কাছে বেশি আকর্ষণীয় ছিল।

আইনস্টাইনের চলে যাবার পরে অন্য প্রোফেসরের অধীনে তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই ডি· এস· সি· করতে পারতেন। কিন্তু সেই পথ ছেড়ে দিতে তাঁর অনুশোচনা হয়নি। আগে যখন থেকে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, তখন থেকে তিনি সংস্কৃতর দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন আর দর্শন ও মহাভাষ্য সম্পর্কেও খবর নিয়েছিলেন। ঋষিকেশের এক বিদ্বান ও ত্যাগী সাধুর তিনি নিরলস প্রশংসা করতেন। পরে অন্যদের

কাছেও জানতে পেরেছিলাম, তিনি প্রশংসার যোগ্য ছিলেন। তাঁর কাছে তিনি সংস্কৃত ও দর্শন পড়েন। রামচন্দ্র ব্রহ্মবাদীও ছিলেন না, রহস্যবাদের ওপরও আস্থা রাখতে পারতেন না, কারণ সাইন্স তাঁকে বুদ্ধিবাদী করে ছেড়েছিল। অধ্যাত্মের নাম করা বড় বড় দোকান ভারতে চলছিল, কোনো দোকানে নিজের বুদ্ধিকে বন্ধক রেখে মানসিক শান্তি পেতে পারতেন। তিনি বুদ্ধিবাদী ও বিজ্ঞান অনুরাগীও থাকতে চাইতেন, আবার সেই সঙ্গে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতর গুরুত্ব স্থাপন করতে চাইতেন। কোনো মার্গ চালাতে চাইতেন না, কিন্তু চাইতেন তাঁরই মত দর্শনের জন্য কিছু ফকির একত্রিত হোক। সোস্যালিজমের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারতেন,কিন্তু চাইতেন যে অন্য লম্ফ-ঝম্ফও চলতে থাকুক। এর জন্য কিছু সময় তিনি নিজের জমিদারির গ্রামের কৃষকদের মধ্যেও কাটিয়েছিলেন এবং গ্রামোন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন। প্রথমে গ্রামবাসীদের ওপর তাঁর বিদ্যার প্রভাব পড়ল, কিন্তু খুব বেশি মিশে যাবার পর তিনি দেখলেন, এরা অব্যবহারিক। রামচন্দ্রজীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আগের মতই ছিল। তাঁকে দেখে দুঃখই হতো যে, দেশ এক প্রতিভা থেকে বঞ্চিত হলো।

২০ অক্টোবর বিজয়াদশমী ছিল। এটি উত্তর-ভারতের সমতলেব উৎসব। হিমালয়ে নবরাত্রির মর্যাদা আছে, বিজয়াদশমীর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে এর মধ্যে যদি কিছু লীলা-খেলা হয়, নাচ-গান হয়, তাহলে হয়তো পাহাড়ের নর-নারীদের আকৃষ্ট করতে পারত। মুসৌরী তো ইংরেজদের ছিল, তাদের এইসব জিনিস পছন্দ ছিল না। এখন এরকম পরম্পরা কায়েম করতে গেলে অনেক শ্রম, ধন ও ধৈর্যের প্রয়োজন।

বর্ষার পরে মুসৌরীর দ্বিতীয় পর্যটন-মরশুম শুরু হয়, যা মে-জুন মাসের থেকে ছোট হয়, তবে দুটো মরশুমের পর্যটক ভাগ করা থাকে। সবার আগে এপ্রিলে বোম্বাইয়ের দিক থেকে সামান্য কিছু লোক এসে পৌঁছয়। তারপর উত্তরপ্রদেশ আর দিল্লীর সিজিন শুরু হয়। বর্ষায় পাঞ্জাবীরা থাকে, আর বর্ষার পর দুর্গাপুজোর ছুটির সুযোগে বহু বাঙালী ভদ্র পরিবার এসে পড়ে, কিন্তু তাঁরা শুধু মুসৌরীর নিষ্ঠা নিয়ে আসেন না, বরং এই যাত্রায় তাঁরা হরিদ্বার, ঋষিকেশ, দিল্লী, মথুরা, বেনারস সব যুক্ত করে নেন। বাংলা-বিহারের সম্বন্ধ পুরনো, দুইই এক দেশ ছিল এবং অনেক আন্দোলনের পর বিহার নিজেকে আলাদা করতে পেরেছিল। এখন আবার 'পুনর্মুষিকো ভব'র ন্যায় চরিতার্থ করার উপক্রম হচ্ছে। এই ছোট সিজিনে বিহারেরও কিছু লোক এসে পড়ে। সেদিন পণ্ডিত গোবিন্দ মালবীয়র সঙ্গে দেখা হলো। কিছুটা রোগা মনে হচ্ছিল। সেইদিন সন্ধেবেলা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে সদলবলে সামনের রাস্তায় আসতে দেখা গেল। মনে হয়, বিহার নিজস্ব বাতাবরণকে সঙ্গে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। দলে কুড়ি জনের কম কি আর ছিল? অন্য মন্ত্রীরা এবং মোসাহেবরাও ছিলেন, দেহরক্ষীও ছিল, আর ছিল কৃপাদৃষ্টি পেতে ইচ্ছুক ভক্তরাও। মুসৌরীতে হইচই পড়ে গিয়েছিল।

২১ অক্টোবর শ্রীমুকুন্দলালজী ভোলারামের বিষয়ে জানালেন। 'গঢ়ওয়াল'-এর বিষয়ে কথা হচ্ছিল। ভোলারাম শুধু ভারতের মহান এবং গাড়োয়ালের পরম যশস্বী শিল্পীই ছিলেন না, গাড়োয়ালের পদ্যবদ্ধ ইতিহাসও তিনি লিখেছিলেন। তাঁর ওপর মুকুন্দলালজী

একটি রচনা লিখেছিলেন যা তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে এও জানতে পারলাম যে, ভোলারামের বংশধর এখন শ্রীনগরে স্বর্ণকারের কাজ করেন। সামনের বছর গরমে বদ্রী-কেদার যাত্রা করতে হবে, কারণ তাছাড়া 'গঢ়ওয়াল' সম্পূর্ণ মনে করা যায় না। ভাবলাম, সেই সময় তাঁর সম্বন্ধেও অনেক খোঁজ খবর নেব।

২২ তারিখের অভিজ্ঞতা লিখিয়ে নিল—'এখানে শাক ফলানো খুব পরিশ্রমের কাজ। সমানে বাঁদর আর মুখপোড়ারা আসে।' পরের দিন মালবীয়জীর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি এই সময় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন। বলছিলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডোলজির মহাবিদ্যালয় স্থাপনা করছি, আপনার সেখানে এসে কাজ করা উচিত। সবসময়ের জন্য না হলেও, কয়েক মাসের জন্য। আর যখন চাইবেন তখনই এসে থাকুন।' আমিও মনে করতাম, কাশী এই বিষয়ের বিশাল কেন্দ্র হতে পারে। সংস্কৃতর কেন্দ্র তো প্রথম থেকেই আছে, সেখানে সহজেই বৃহত্তর ভারতের জ্ঞানলাভের জন্য ভাষা ও সাহিত্য পড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু এখন তো মুসৌরী থেকে যাওয়া অসম্ভব ছিল। নির্জন এই বাংলো কার ভরসায় ছেড়ে যেতাম?

সেইদিন আমি যখন ফিরছিলাম, একজন পরিচিত পুরুষ খুব রহস্য করে বললেন, 'পুলিস আপনার দেখাশোনা করে।' তিনি ভাবতেন, আমি তা জানি না। দেখাশোনা করতে থাকুক, আমার কিসের পরোয়া? আমার চিন্তাধারা তো 'আজ কী রাজনীতি'-তে বেরিয়ে গেছে এবং সময় সময় আমার রচনাগুলিতেও আমি তা ব্যক্ত করে থাকি। আমি কমিউনিস্ট, যদিও এখন পার্টির মেম্বার নই। তবে পার্টির প্রতিটি সিদ্ধান্তের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করি। আর সেই কারণেই, কোরিয়ায় উত্তর-কোরিয়ার মানুষের হার হচ্ছিল, আর এখানে আমার ঘুম নষ্ট হচ্ছিল। মনে হতো বুকের ভেতর শত শত সুঁচ ফুটছে।

বাংলোয় ফ্লাশের অভাব পীড়া দিত। যুগ যুগ ধরে হাত দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার হয়ে আসছে। মুসৌরীতেও অধিকাংশ বাংলো বিনা ফ্লাশের। দেরাদুনের গুপ্তা সেনেটেরি স্টোর্স-এর লোকেরা তাদের যোজনা দিল। আমি তা মঞ্জুর করলাম। কিন্তু ফ্লাশ তৈরি হতে আগামী বছরের আরম্ভ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

শরৎ পূর্ণিমা ভারী সুন্দর হয়। মুসৌরীতে প্রায়শই সেইদিন আকাশ নিরভ্র থাকে। ওপরে নীল আকাশে ষোলকলায় উদিত চন্দ্রদেব, নীচে দেবদারুর ছুঁচোল উচ্চ বৃক্ষ, বান (বজ্রাঙ্গ)-এর ঘন পাতা আর খোলা ও ঢাকা জমির ওপর ছড়িয়ে থাকা চাঁদনি। এই নির্জন স্থানে রাতে নীরবতা তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে, আর কখনও কখনও কোনো পাখি নির্দিষ্ট মুহূর্ত পরে পরে তার আওয়াজ দিয়ে সারারাত ডাকতে থাকে। সামনের হিম-শিখর পঙ্‌ক্তির ওপর চাঁদনি আরো তীক্ষ্ণভাবে পড়ে আর তাকে গন্ধর্বনগরের মত দেখতে লাগে। রাত দশটার সময় চাঁদ আরো ওপরে উঠে গেল। তার ঔজ্জ্বল্য আরো দীপ্ত হয়ে উঠল। এখন হিমশ্রেণীর মাথায় মেঘ ছিল না। রজতনগরীর উত্তুঙ্গ বিশাল সৌধের মত হিমালয় চোখে পড়ছিল,যদিও সুস্পষ্ট ছিল না। হিমালয় লাখ লাখ নয়, বরং কোটি কোটি বছর ধরেই হয়তো এমনি ভাবেই আছে। শরৎ-পূর্ণিমার এই ছটাও হয়তো এমনই আছে, কিন্তু সমস্ত সৌন্দর্য মিথ্যে, যদি তা দেখে তারিফ করার লোক না থাকে। মানুষই পৃথিবীতে

এসে এই সৌন্দর্যের মূল্য বাড়িয়েছে।

২৬ অক্টোবর সারনাথ থেকে ভিক্ষু ধর্মালোক এলেন। আমার জ্ঞাতিগুষ্টি বেশ বড়। ভবঘুরে তো আছেনই, তিব্বত ও তিব্বতীদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বন্ধুও আছেন, আর বৌদ্ধ ভিক্ষু তো ভবঘুরে ও বৌদ্ধ এই দুই হিসেবেই আমার জ্ঞাতিগুষ্টি। সাহিত্যিকরাও সহোদর, কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে তো বলারই কিছু নেই। বহুবছর হয়ে গেছে এক ইংরেজ যোগ-রহস্যবাদী বিদ্বান ড· ইংবেজবঞ্জ যোগাশ্রম খোলার জন্য ঋষিকেশে ৩৫ একর জমি নিয়েছিলেন। এখন আশ্রম খোলার আর সম্ভাবনা নেই,তাই তিনি এটা মহাবোধি সভাকে আরো কিছু টাকার সঙ্গে দিয়ে দিতে চাইছিলেন। সভা ধর্মালোকজীকে জমি দেখার জন্য পাঠিয়েছিল। সেটা দেখে উনি এখানে এসেছিলেন। বলছিলেন, 'ওখানে মশা খুব বেশি।' ঋষিকেশ থেকে একটু দূরে জমিটা। পাশে মীরা বোন 'পশুলোক' খুলে রেখেছিল। আমি বললাম, 'দুটো এক জায়গায় থাক, ভাল হবে। কিন্তু জায়গাটা ঠিকঠাক করার সময় মুসৌরীতেও একটা জায়গা নেবার দরকার হবে।' উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?' আমি বললাম, 'ম্যালেরিয়ায় লোকেরা যখন মাসের পর মাস অসুস্থ হয়ে থাকবে তখন তাদের জন্য একটা স্বাস্থ্যকর জায়গাও দরকার।'

পরের দিন ধর্মালোকজী গেলেন, আর সেদিনই ভাইয়া এবং বৌদিও গেলেন। ওনার সঙ্গেই তাঁরা ঋষিকেশ গেলেন। ভাইয়াজী তাঁর স্মৃতিগুলিকে সজীব করার জন্য লছমনঝুলার মোহান্ত রামোদার দাসের কাছেও গেলেন। নিজের ভবঘুরেমির সময়ে তিনি তরুণ রামোদার দাসকে সেখানকার আগের মোহান্তর কাছে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমিও বৈরাগী থাকার সময় তাঁর নাম শুনেছিলাম, কারণ আমার নামও সেই সময় তাই ছিল। ১৯৪৩-এ আমি লছমনঝুলায় যাই আর তাঁর মঠের বিস্তৃতিও দেখি। কি জানি কোথা থেকে খবর পেলাম যে, তিনি আর এই জগতে নেই। একথা আমার জীবন-যাত্রাতে লিখেও ফেলি। ভাইয়াজী সেটা পড়েছিলেন।

অক্টোবরের শেষ দিকে শীত পড়ে গিয়েছিল। ফুল সব শুকিয়ে গিয়েছিল। যে সব পাতা ঝরার ছিল ঝরে গিয়ে গাছগুলিকে নগ্ন করে দিয়েছিল। সফেদা, বিরি, পাঙ্গর (চেস্টনাট), নাশপাতি সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের জন্য মুসৌরীতে এই প্রথম শীত আসছে, সেই বিষয়ে আমরা অভিজ্ঞ লোকেদের কাছ থেকে জ্ঞানলাভ করার চেষ্টা করতাম। মিস পুসাঙ্গ ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে ভাল পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলছিলেন, ১৯৪৫ সালে এত বেশি বরফ পড়েছিল যে আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ৬০ টাকা খরচ করে আমরা রাস্তা তৈরি করলাম। ছাতের ওপর এত বরফ পড়ল যে অনেকগুলো ছাত ভেঙে গেল আর অনেকের দেওয়াল ধসে পড়ল।' দেখা যাক, এই বছর কেমন শীত পড়ে।

২৯ তারিখে কানপুরনিবাসী শ্রীবলদেবজী এলেন। তাঁর সঙ্গে মীরাট-এর শ্রীমতী শকুন্তলাদেবীও ছিলেন। বলদেবজী প্রায় প্রতি বছরই মুসৌরী আসা-যাওয়া করতেন, আর সেই সময় তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ হতো। শকুন্তলাজীর তো এখানে নিজস্ব বাড়ি আছে এবং কিছুদিনের জন্য তিনি এখানে অবশ্যই আসতেন। এদিকে সর্বজনীন

কাজে হাত দিয়েছিলেন, তাই সময়ের অভাব থাকত। বহু বছর পরে আবার পরিশ্রম করে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন তিনি যে উদ্যোগী, তা তো এর থেকেই বোঝা যায়। চাইলে আরো এগোতে পারতেন, কিন্তু এখন তাঁকে মীরাটের মহিলাদের নেতৃত্ব দিতে হতো। যাঁর জীবন এখন অর্ধেকও কাটেনি আর বৈধব্যের বোঝা মাথার ওপর পড়েছে, তার পক্ষে নিজের জীবনের এর থেকে ভাল উপযোগিতা আর কি হতে পারে?

ভাইয়া আর বৌদি চলে যাবার পর কেমন যেন অভাব বোধ হতে লাগল। যখন থেকে মুসৌরীতে এসেছিলেন তখন থেকে প্রতি সপ্তাহে দু-তিন বার আমরা কয়েক ঘণ্টা করে একসঙ্গে থাকতাম। স্বামী হরিশরণানন্দর মধ্যে যদি আমি এক প্রাণের বন্ধু পেয়েছিলাম, তবে কমলাও জানকীদেবীর স্নেহ পেয়েছিল। তাঁরা থাকতে কমলার এখানকার নির্জনতা খারাপ লাগত না। আমি বইয়ের মধ্যে ডুবে গেলে সমস্ত দুঃখ মিথ্যে হয়ে যায়। ৬০ বছর বয়স হতে আমার তিন বছর বাকি ছিল। অপরের সামনে তো নয়ই, নিজের মনেও আমি এ কথা মানতে রাজি ছিলাম না যে, আমি জরার সীমানার ভেতর পৌঁছে গেছি। তবে ৬০ বছরের পর জরা জবরদস্তী আমাকে তা মানতে বাধ্য করল। সেই সময় সপ্তাহে অথবা দশ দিনে আমি অবশ্যই শহরে চলে যেতাম। শহরের অর্থ কিতাবঘরও হতে পারত, কারণ সেখানেও অনেক দোকান আছে, কিন্তু আমি কুল্‌হড়ীকেই শহর বলি। যেটা কেন্দ্রে অবস্থিত এবং যেখানে বহুসংখ্যক ভাল ভাল দোকান আছে। সেখানেই বড় ডাকঘর আর রেলওয়ের অফিস আছে, ব্যাঙ্কও আছে সেখানে। এমনিতে অবশ্য সব থেকে বেশি দোকান লনটৌরে আছে। লন্‌টৌরে কখনও নমাস-ছমাসে যেতে পারতাম, কিন্তু তখন শহর যেতে হলে লনটৌরে যেতাম।

৪ নভেম্বর পুরোপুরি ঠাণ্ডা পড়ে গিয়েছিল। লনটৌর যখন গেলাম তখন রাস্তা ঠাণ্ডার জন্য কিছুটা বেশি কঠিন বা পিছল ছিল। এক জায়গায় আমার বুট পিছলে গেল আর আমি জোরে পড়লাম। যাইহোক, কোথাও ছড়ে-টড়ে যায়নি। হাতের পাতার ওপর ভার পড়ায় সেখানেই কিছুটা ব্যথা পেলাম।

তিব্বতী—লনটৌরে ১৫-১৬টি তিব্বতীভাষী পরিবার আছে, যাদের স্থানীয় লোক ভুটিয়া বলে। কিষাণ সিংহ ভুটিয়া নয়, কনৌরে ছিলেন, কিন্তু তাঁকেও লোক সেই নামেই জানত। কিষাণসিংহের সঙ্গে দেখা হওয়াটাও লন্‌টৌর যাবার একটা লোভ ছিল। মুসৌরীর তিব্বতীরা বস্তুত গ্যগর খম্পা ছিল। ভারত ও খম্‌ চীনের ভেতর পূর্ব-তিব্বতের এগিয়ে থাকা অংশটিকে গ্যগর বলা হয়। এরা যে মূলত খম্‌-এর বাসিন্দা ছিল তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বস্তুত অজ্ঞাত-কালে কোনো একসময় এরা ভ্রাম্যমান-জীবন যাপন করে, আর প্রতি বছর ভারত ও তিব্বতে চক্কর কাটতে থাকে। শীতে দিল্লী, কলকাতা, বোম্বাই পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া আর গরমে মানসরোবর প্রদেশে চলে যাওয়া। এদেরই মধ্যে কয়েকজন কিউরিওর জিনিস বিক্রি করতে মুসৌরীতে এসে এখানেই বসবাস করছে। বহুদিন পর্যন্ত নতুন মাল আনতে তিব্বতও যেত, তারপর অমৃতসর আর দিল্লীতেই তিব্বত এবং চীনের নামে বিক্রয়যোগ্য জিনিস তৈরি হতে লাগল, যা সস্তাও ছিল, তাই আর সেখানে যাবার

দরকার থাকল না। এদের সঙ্গে দেখা হলে তিব্বতী ভাষা বলার আর তিব্বতের বিষয়ে জানার সুযোগ পাওয়া যেত। ওখানে ওরা জানাল, চীনা কমিউনিস্ট সেনা সিংক্যাঙ্গ থেকে চাংথাং-এর রাস্তায় গরতোক পৌঁছে গেছে। সিংক্যাঙ্গ হলো চীনা তুর্কিস্তান, চাংথা হলো সেই বিশাল নির্জন সমতল, যা জনবসতিপূর্ণ তিব্বতের উত্তর আর সিংক্যাঙ্গ-এর দক্ষিণে পড়ে। এও জানতে পারলাম যে, গরতোকে আগত সৈন্যরা জিপ ব্যবহার করেছে। সংবাদপত্র থেকে জানা গেল, লাসার সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ নেই। তিব্বত ও চীনের সম্বন্ধের ব্যাপারে ভারত সরকার এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। সরদার রাজগোপালাচারী আর অপর নেতারা চীনা কমিউনিস্টদের ঘোর বিরোধী ছিলেন, আর তাঁদের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী নেহেরুর মত লোকেদের জোর ছিল না। তিব্বতে কমিউনিস্টর আসায় নেপালেও উত্তেজনা ছড়াবে।

৯ নভেম্বরের রেডিও থেকে জানা গেল, নেপালের মহারাজাধিরাজ কাল কাঠমাণ্ডুর ভারতীয় দূতাবাসে শরণ নিয়েছেন। রানারা অনেক বুঝিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মহারাজ ত্রিভুবন ফিরতে রাজি হলেন না। তাই রানারা তাঁর তিন বছরের পৌত্র ও নিজেদের দৌহিত্র জ্ঞানেন্দ্র বিক্রম শাহকে গদিতে বসিয়ে দিল। ইংরেজ ও আমেরিকান সাম্রাজবাদীরা রানা রাহুদের পক্ষপাতী ছিল। তারা নবীন নেপালকে নিজেদের অনুকূল বলে মনে করত না। দুজনেই জ্ঞানেন্দ্রকে মেনে নিতে রাজি ছিল। কিন্তু ভারত সরকার এখনও স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারে চিন্তা করছিল। এটাও সম্ভবত নেহেরুর কৃপাদৃষ্টির জন্য হয়েছিল। ওদিকে নেপালী জনতা রানা-শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল।

আমাদের প্রতিবেশি লেডলী সাহেবের একমাত্র পুত্র জন লেডলী এখন সেই অবস্থায় পৌঁছেছিলেন, যখন তাঁর নিজের জীবিকার কোনো ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের জন্য রেলওয়ের চাকরি ভালো আর খুব সহজেই তা পাওয়া যেত। এ বছর তিনি কয়েক মাস ধরে বাইরে ধাক্কা খেয়ে ফিরেছিলেন,কোনো চাকরি পাননি। বাপের দুটো বাংলো আর কিছু নগদ টাকাও ছিল, তাই এখানে থেকেই কাজ করা ঠিক করলেন। বাংলোর পাশের খেত চাষ করলেন। গরু-মোষ কিনে ডেয়াবি চালানোর প্রস্তুতি নিলেন। মুর্গি পালার কথাও ভাবছিলেন। মৌমাছির দু-একটা চাকও বসিয়েছিলেন। এখন তিনি 'অর্টেন'-এই থাকতেন, কিন্তু সরদার হর্নলজ ছেড়ে দিলে তিনি এখানে এসেই থাকতে চাইতেন। আমাদের তিনি স্থায়ী প্রতিবেশি এবং মনের মত মানুষ ছিলেন,তাই তাঁর অভ্যুদয়ে আমাদেরও আগ্রহ ছিল। হর্নলজ ডেয়ারি পরের বছর ঠিক-ঠিকভাবে খুলে এখনও তা চলছে। মুসৌরীতে সব থেকে বেশি খাঁটি দুধ এখানেই পাওয়া যেত। দুধের ক্রিম বার করে নিয়ে শীতে তিনি ঘি বানানোর কাজ শুরু করলেন, যেটা চললও ভালো কিন্তু এক বছর বেশি ঘি তৈরি করে ফেললেন, আর সিজিনের সময় এক চতুর্থাংশও খরচ হলো না, যার জন্য তাঁকে লোকসান দিতে হলো। দেখাদেখি অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও মেশিন আনিয়ে নিল আর গ্রামে নিয়ে গিয়ে তারা দুধ থেকে ঘি বার করতে লাগলো। প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

১৩ নভেম্বর ঠাণ্ডা যথেষ্ট ছিল। এবার আমরা আমাদের বারান্দার সেই অংশের গুরুত্ব বুঝতে পারলাম, যেখানে দিন-ভর রোদ থাকে। আমরা সেখানেই আমাদের আড্ডা জমালাম। কমলাকে গরম কাপড় পরার জন্য খুব তাগিদ দিতাম, কিন্তু তার পরোয়া ছিল না। শীতে কাঁপতো, তবুও গরম কোটে শরীর ঢাকতে তার ভারি লাগত। সেই দিন তার বুকে ভীষণ ব্যথা শুরু হলো।

১৪ নভেম্বর খবর পাওয়া গেল, চীনা কমিউনিস্ট সেনা লাসায় এসে গেছে। ভারত সরকার চীনকে পরামর্শ দিয়েছিল যে, সেখানে যেন বলপ্রয়োগ না করা হয় আর শেষ পর্যন্ত বলপ্রয়োগের প্রয়োজনও পড়েনি। চীন ও তিব্বতের প্রতিনিধিরা মিলে বোঝাপড়া করে নিল।

দিল্লী—পরিভাষার বিষয়ে ১৭ নভেম্বর দিল্লী যাবার সুযোগ এলো। এখন মুসৌরীতে পর্যটক ছিল না, তাই রিক্সা আর কুলি দুর্লভ। চার্ল হুইলের ফটক নির্জন ছিল। পুলিস-চৌকির হেড কনস্টেবল শ্রী টীকারাম 'কুঞ্জ' গাড়োয়ালি ভাষার কবি ও হিন্দি সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি প্রায়ই দেখা করতে আসতেন। সঙ্গের জিনিসপত্র নিয়ে চার্ল হুইল গিয়ে এক বাংলোর চৌকিদারকে নিয়ে কিতাবঘর পৌছলাম। কিতাবঘরের চককে গান্ধীচক নাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখন লোক সেই নামের সঙ্গে তেমন পরিচিত নয়। শীতে ট্যাক্সি কখনও সস্তাতেও পাওয়া যায়। সাড়ে তিন টাকায় ট্যাক্সি পাওয়া গেল। দশটার সময় কিংক্রেগ ছাড়িয়ে গেলাম। সামনেব দিক থেকে একটা বাস যেন ধাক্কা দেবার জন্য দৌড়তে দৌড়তে এলো। দুজন ড্রাইভারই শিখ ছিল, হাসতে লাগল। এদিকে রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির যোজনা অনুসারে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য মুসৌরীতে কাজ করা স্থিব হয়েছিল। আমি আমার বন্ধু ড· মহাদেব সাহাকে তার জন্য আসতে লিখেছিলাম, কতদিন ধরে তাঁর প্রতীক্ষা চলছিল। আজ দেখলাম,ধাক্কা লাগাচ্ছিল যে বাসটা তাতে তিনি বসে আছেন। ড্রাইভারকে থামতে বললাম। আমার শান্তি হলো যে, কমলা এখন একা থাকবে না।

দেরাদুনে পণ্ডিত গয়াপ্রসাদ শুক্লজীব ওখানে গেলাম। আজই তিনি আগ্রা থেকে ফিরেছিলেন। ডি· এ· বি· কলেজের ছাত্রদের সামনে আমি ভাষণ দিলাম। কলেজে তিন হাজারের বেশি ছাত্র আছে, কিন্তু বই মাত্র ১০ হাজাব, এই ব্যাপাবটা খারাপ লাগল। হিন্দির সমস্যার বিষয়ে ভাষণ আর কিছু প্রশ্নোত্তর হলো। রাতের দিল্লীর গাড়িতে সিট রিজার্ভ ছিল। ট্রেনে কিছুক্ষণ শুক্লজীর সঙ্গে কথাবার্তা হলো। তারপর সেখান থেকে রওনা হয়ে ১৮ তারিখ সকাল সাড়ে ছটার সময় দিল্লী পৌছে গেলাম।

কি ব্যাপার হলো, এখানকার তাপমাত্রাও দেখলাম মুসৌরীর মত। এবার বৌদ্ধ বিহারে উঠলাম। সেখানে সিংহলের ভিক্ষুদের পেলাম, যাঁরা জানালেন যে, এখন বিদ্যালংকার পরিবেনে (বিহার) ত্রিপিটকের সংগায়ন চলছে, আর বহু বিক্ষু মিলে তার সংশোধন করছে। যে সময় বুদ্ধের উপদেশ কাগজে লেখা হয়নি এবং লোকে তা কণ্ঠস্থ করে রাখত, সেই সময় বিশেষ স্বরে সম্মিলিত পাঠকে 'সংগায়ন' বলা হতো। এখন তো সংগায়নের

গ্রন্থ ছিল না, কারণ সমস্ত বিনয়, সুত্ত আর অভিধম্মপিটক মুদ্রিত আছে। কণ্ঠস্থ করে রেখেছে এমন মানুষও পাওয়া যাবে না। ধম্মপদের মত ছোটখাট রচনা মনে রাখা কাউকে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। পালি ত্রিপিটক এখন সিংহলী, বর্মী, থাই (শ্যামী) কম্বোজী আর রোমান লিপিতে ছাপা পাওয়া যেত, যাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ও অধিক সুলভ বর্মী আর শ্যামী লিপিরই ছিল। ভারতে সংস্কৃত বইগুলি আগে দেবনাগরী, বাংলা, উড়িয়া, তেলুগু, গ্রন্থ-তামিল, মলয়ালম, কন্নড় লিপিতে ছাপা হতো। দেবনাগরী সবার ওপরে আধিপত্য করে নিল আর বিশ শতাব্দীর আরম্ভে সে সংস্কতের ওপরে যে একাধিপত্য কায়েম করা শুরু করল, তাতে আজ এমনই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, খুব কম সংস্কৃত বই-ই সেই সব লিপিতে ছাপা হয়। পালি সাহিত্যেও দেবনাগরীর অনেক সুযোগ আছে। দেবনাগরীই একমাত্র লিপি, যাকে পালির জায়গায় বর্তমানের চারটি বৌদ্ধ দেশ গ্রহণ করতে পারে। বস্তুত কতকটা গ্রহণ করেছেও। সিংহলে প্রায় সমস্ত পালি পণ্ডিত ভিক্ষু সংস্কৃতের সঙ্গে পরিচিত হন, কারণ চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতিষ-এর বই সেখানে সংস্কৃত ভাষায় পড়ানো হয়। আর বৌদ্ধদেশগুলিতেও অল্পবিস্তর সংস্কৃত পড়ার মানুষ থাকায় দেবনাগরী অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত পণ্ডিত পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত দেবনাগরীতে ত্রিপিটককে প্রকাশ করায় সাফল্য আসেনি। এই দিকে যে চেষ্টা করা হয়েছে, তা বেশিদূর এগোয়নি। ভিক্ষু উত্তমের সাহায্যে আমরা দেবনাগরীতে পালি ত্রিপিটকের সম্পাদনার কাজ শুরু করেছিলাম, কিন্তু তা খুদ্দকনিকায়-এর কিছু গ্রন্থ পর্যন্তই সীমিত থেকে গেল। জাতকেরও একটাই অংশ দেবনাগরীতে বেরিয়েছে। দীঘনিকায় আর বিনয়-পিটকের দুটি-একটি যেখান সেখান থেকে ছাপা হয়েছে। এটা আনন্দের কথা যে, ভারত সরকার নালন্দা থেকে সমস্ত ত্রিপিটক দেবনাগরী অক্ষরে ছাপতে যাচ্ছে। দীঘনিকায় প্রেসে চলে গেছে, এবং সম্পাদনার কাজ দ্রুতগতিতে হচ্ছে, কিন্তু মুদ্রণ পিপড়ের গতিতে চলার জন্য এই গতিতে সম্ভবত এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ ত্রিপিটককে দেবনাগরী অক্ষরে দেখা যাবে। যাই হোক, এটা শুভারম্ভ, আশা করা যায় পালির ব্যাপারে দেবনাগরী সেই কাজ করতে সক্ষম হবে, যা সংস্কৃতের ব্যাপারে সে করেছে।

পরিভাষাগুলির জন্য বিশেষজ্ঞ-সমিতি বানানো হয়েছিল, এরই জন্য দিল্লী এসেছিলাম। আমার পরিচিত শ্রীবালসুব্রহ্মণ্য আয়ার এবং ড· কুন্‌হন রাজাও এতে যোগ দিয়েছিলেন। আইন এবং অন্যান্য বিষয়ের পরিভাষার জন্য আলাদা আলাদা সমিতির শাখা বানানো স্থির হলো। ঠিক করা হলো, প্রথমে সংসদ (পার্লিয়ামেন্ট) সম্বন্ধী পরিভাষা, তারপর ভূ-কর আইন সম্বন্ধী পরিভাষা হাতে নেওয়া হোক। বালকৃষ্ণজীর অভাব খারাপ লাগছিল। এটা বলে দিচ্ছিল যে, পরিভাষার বিষয়ে সবকার বেশি উৎসুক নয়, সে তাকে এড়াতে চায়।

সামনের বছর রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি আমার দেওয়া যোজনা অনুসারে সাহিত্যের কাজ করাতে যাচ্ছে। তাতে বিদ্বানদের প্রয়োজন ছিল। নাগার্জুন তার জন্য খুব যোগ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। ড· ভারদ্বাজ জানালেন, যদি তিনি ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারেন, তাহলে কোনো অসুবিধে নেই। আমি নাগার্জুনজীকে আসার জন্য লিখে দিলাম।

১৯ তারিখ আবার বিশেষজ্ঞদের সমিতির সভা হলো। আমরা আগেই ভেবে দেখেছিলাম যে, স্টাফ বাড়ানো ছাড়া তাড়াতাড়ি কাজ হওয়া সম্ভব নয়। এই সভায় রাষ্ট্রপতি এবং অধ্যক্ষ মাবলংকরজী এসেছিলেন। গুপ্তজী স্টাফ বাড়ানোর প্রস্তাব রাখলেন, দুজনে তা মেনে নিলেন। যতদিন পর্যন্ত সংবিধান সভা ছিল, ততদিন রাজেন্দ্রবাবু তার অধ্যক্ষ ছিলেন। সংবিধান তৈরি হয়ে যাবার পর তিনি ভারতীয় গণরাজ্যের প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন। তিনি জানতেন, পরিভাষার কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাকে বাদ দিয়ে ইংরেজি আমাদের ঘাড় থেকে নামবে না কারণ পরিভাষা ছাড়া হিন্দি তার স্থান নেবার যোগ্য হবে না। তিনি এটাও বুঝতেন যে, মৌলানা এবং তাঁর শিক্ষা-বিভাগ উর্দুকে সম্মিলিত ভাষা করার চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ায় জ্বলে উঠেছে, তারা হিন্দির রাস্তায় পদে পদে বাধা দেবে। তাই বিশেষজ্ঞ-সমিতির ভার মাবলংকরকে দিয়েছেন। এদিকে যখন দেখা গেল অন্য কোনওরকমে কাজ হলো না এবং পরিভাষার কাজ নিজের বিভাগে এলো না, তখন আজাদা এক অন্য চাল চালালেন, আর দিবাকর, সত্যনারায়ণ ও মাবলংকরের সঙ্গে দেখা করে চাইলেন যে, পরিভাষা তৈরি করার কাজ হিন্দুস্তানি অকাদেমিকে দিয়ে দেওয়া হোক, যেখানে কাকা কালেলকার সর্বেসর্বা হয়ে সমস্ত গুড়কে গোবর করবেন। আমার অবাক লাগে, এঁরা একটু দূরের কথা কেন চিন্তা করতে পারেন না? কোন একজন অথবা দশ-পাঁচ জন মানুষের চেষ্টায় কোনও ভাষা ভারতের সর্বদেশীয় ভাষা হতে পারে না। যার মধ্যে সেটা হবার ক্ষমতা আছে, সে-ই হতে পারে। হিন্দি কয়েক শতাব্দী ধরে আন্তঃপ্রাদেশিক ক্ষেত্রে সম্মিলিত ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, কারণ দেশের বহু বড় ক্ষেত্রে তা বলা হয়। উর্দু নয়, হিন্দি শৈলীই সর্বদেশীয় ভাষা হবার ক্ষমতা রাখে। এটা আমাদের অথবা অন্য কারো চেষ্টার জন্য না, বরং হিন্দি ও ভারতের অন্য প্রাদেশিক ভাষাগুলির শব্দকোষ এক হবার জন্য, যার ফলে তার এই অংশ প্রথম থেকেই হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বোঝা যায়। উর্দুর ফারসী-আরবী শব্দ, অসমীয়া, বাংলা, উড়িয়া, তেলুগু, তামিল, মালয়ালম, কন্নড়, মারাঠী, গুজরাটীর কাছে অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দিকে সরিয়ে দিযে উর্দু-হিন্দুস্তানী নামে ধোকাবাজীর সাহায্যে সর্বদেশীয় ভাষা হতে পারে না, এটা সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও বুঝতে পারে, কিন্তু পক্ষপাতে অন্ধ মস্তিষ্কগুলিকে কি বলা যায়? কাকা কালেলকর নিজের কর্তাগিরি চাইতেন, সত্যনারায়ণ আগাগোড়া তাঁর মত ছিলেন। দিবাকর আর সাবলংকর তো বড়দের অন্ধ সমর্থক। হিন্দির বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র দেখে সত্যিসত্যি খারাপ লাগত।

কোনো কাজ ছাড়া বড় মানুষদের সঙ্গে আমার দেখা করতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু শ্রীমোহনলাল শাস্ত্রী এবং শংকরানন্দজী খুব জোর করলেন, তাই শংকরানন্দজীর সঙ্গে ১৯ নভেম্বরে আমি ড· আম্বেদকরের বাড়িতে গেলাম। আম্বেদকরের যোগ্যতা ও কাজকে অস্বীকার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাঁর বহু বিরোধী ব্যাপার জানা সত্ত্বেও দলিত জাতির মধ্যে চেতনা ও আত্মসম্মান জাগিয়ে তোলার যে বড় কাজ তিনি করেছিলেন, তার জন্য আমি তাঁর অত্যন্ত প্রশংসা করি। সত্যিসত্যিই আমার পক্ষে এটা বোঝা খুব কঠিন ছিল যে, তাঁর মত বুদ্ধিমান মানুষ কি করে আমেরিকান ও ইংরেজ ধনতন্ত্রের

সমর্থক হতে পারেন এবং রাশিয়ার মত শোষণের কট্টর শত্রু ও নিজেদের কার্যের দ্বারা সমস্ত বৈষম্য দূর করে দেওয়া দেশের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে পারেন? আম্বেদকরের সঙ্গে আধঘণ্টা পৌনে একঘণ্টা কথা হলো। তিনি এই সময় বুদ্ধের একটি ভাষণ প্রস্তুত করছিলেন, সে বিষয়েও বললেন। এই পুরুষকে জীবনে খুব ধাক্কা খেতে হয়েছে। উঁচু জাতের লোকেরা আগাগোড়া তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, তুমি নিজের অবস্থাটা বোঝো। কিন্তু তিনি কর্ণের ভাষায় বলেছেন—

'সূতো বা সূতপুত্রো বা য়ো কো বা ভবাম্যহম।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্।।'

আম্বেদকর নিজের পৌরুষ দিয়ে অপরকে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করেছেন। তাঁর এই রূপ আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও আদরণীয় ছিল। কিন্তু এই অল্প সময়ের কথায় ও ব্যবহারে তাঁকে আমার নীরস মনে হলো। আমি তো আগে থেকেই খেপে ছিলাম, তাই সামান্য অন্যরকম চেহারা দেখে একটা ধারণা তৈরি করে নেওয়া সহজ ছিল। এই ধরনের সাক্ষাতে চা-জল এর কথা বলা উচিত কিন্তু মনে হচ্ছিল, আমি আইন-মন্ত্রীর অফিসে কোনো কাজ খুঁজতে গেছি, তাঁর সঙ্গে মাপা-জোকা কথাই বলা উচিত। যাইহোক, এর কোনো মানে হয় না। এরপর আমার এই ধারণা হলো—'সাত খুন মাপ করে দেবাব মত মানুষ, কিন্তু আমার তো এই প্রথম আর এই শেষ সাক্ষাৎ বলে মনে হচ্ছে।' মৃত্যুর কয়েকদিন আগে নেপালে আম্বেদকরকে দেখলাম। এখনও যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু স্বাস্থ্য জবাব দিয়েছিল। মৃত্যুর আগে আম্বেদকর বৌদ্ধধর্মের জয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বৌদ্ধ বিহারে অনেক জায়গার মানুষের সঙ্গে দেখা হলো, যে কারণেই এবার আমি সেখানে উঠেছিলাম পাকিস্তানের হস্তগত হওয়া মীরপুর (জম্মু)-এর শরণার্থী শ্রী ওমপ্রকাশজীকে পেলাম। মীরপুরেও যখন আগুন লেগে গিয়েছিল, তখন তিনি নিজের বাড়ি থেকে পালান, তাঁর পিতা উকিল ছিলেন। নিজেদের ঘর বাড়ি আর সম্পত্তি ছিল। নিজের আর আপনজনের প্রাণ সম্পত্তি থেকে অধিক মূল্যবান। যখন জ্ঞান হলো, দেখলেন তাঁদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। পিতা এবং পরিবারের অনেকে নিহত হয়। দুই বোন পাকিস্তানে কয়েক বছর ছিলেন। সেখানে তাঁদের বিয়েও হয় কিন্তু জবরদস্তি করে। তাই সুযোগ পেতেই তাঁরা নিজেদের ভাইয়ের কাছে ভারতে চলে আসেন। কিভাবে হিন্দু স্ত্রীরা আততায়ীদের হাতে ধরা না পড়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়েছে, কিরকম শাস্তিভোগ করেছে, তার বড়ই মর্মস্পর্শী বর্ণনা করছিলেন। আমি ওমপ্রকাশজীকে বললাম, 'এটা লিখে ফেলুন।' হ্যাঁ, এটা অবশ্য ঠিক যে শত্রুতা এক তরফে হয়নি। যেখানে যে পেরেছে, সে সেখানে নিজেকে মানবতা থেকে পতিত অমানবিক বলে প্রমাণ করেছে।

অমৃতসর—ভাইয়াজীর খুব আগ্রহ ছিল যে, দিল্লী এলে যেন অবশ্যই অমৃতসর যাই। এখন শীতকাল, তাই কষ্টের কোনো প্রশ্নই ছিল না। রাত নটায় অমৃতসরের গাড়ি ধরলাম, আর সাহারানপুরের রাস্তা দিয়ে ২১ নভেম্বরের সকালে অমৃতসর পৌঁছে গেলাম। ভাইয়াজী ও

বৌদি স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, তাই বাড়ি খোঁজার কষ্ট করতে হলো না। তিন বছর আগে অমৃতসরে আগুন জ্বলেছিল। বাস্তবে এবং মনেও। ভেবেছিলাম, শহরের বেশিরভাগটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় থাকবে এবং লোকও থাকবে কম। মানুষের সংখ্যা কম মনে হচ্ছিল না। প্রথমে কূচা কুত্তিয়াঁ-তে ভাইয়ার তিনতলা বাড়ির ওপরের ছাতে গেলাম। নানারকম কথা হলো, খেলাম, তারপর বাইরে বেরোলাম। অকালী মার্কেটে ভাইয়ার প্রেস, পাঞ্জাব আয়ুর্বেদিক ফার্মেসি আর ওষুধের দোকান আছে। ভাইসাহেব মানসিকভাবে পুরোপুরি আধুনিক, আর বুদ্ধিবাদের তো তিনি সাকার মূর্তি। যখন আয়ুর্বেদিক ওষুধ বানাতে শুরু করলেন, তখন ভাবলেন, ওষুধ তৈরি করার জন্য আধুনিক যন্ত্রেরও সাহায্য নেওয়া সম্ভব। গুলি বানানোর জন্য আগেও অনেক লোকই মেশিন ব্যবহার করত। ভাইয়া খল আর ঢেঁকি ও উদূখলের কাজও বিদ্যুৎচালিত মেশিনের সাহায্যে করলেন, আর এরজন্য মেশিনগুলো এখানকাব মিস্ত্রিদের দিয়ে তৈরি করালেন। ভস্ম তৈরি করার জন্যও তিনি আধুনিক উপকরণকে কাজে লাগালেন আর ওষুধে অত্যন্ত শুদ্ধ কাঁচামাল ব্যবহার করলেন। এই জন্যই তাঁর ফার্মেসি খুব ভাল চলল। ফার্মেসির কারখানা দেখলে বোঝা যেত তাতে যন্ত্রযুগের ছাপ পড়েছে। তবে ঘর তত পরিষ্কার ছিল না। এটা নিজের ঘরও ছিল না। যেমন তেমন ঘরে কাজ শুরু করেছিলেন যা ঠিক করার সাধ্য তাঁর ছিল না। তেলের ওপর ভায়োলেট রশ্মির কি প্রভাব হয়, এখন সেই পরীক্ষার কাজে লেগেছিলেন ভাইসাহেব।

অযোধ্যা প্রদেশেও দুধকে কেউ বর্জন করে না, কিন্তু দুধভ্রমে চুনের জলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া দুধভক্ত সেখানে কাউকে পাওয়া যাবে না। তিরিশ বছরেরও বেশি হয়ে গেছে ভাইসাহেব পাঞ্জাবে আছেন, তাই পাঞ্জাবের বহু জিনিস তিনি গ্রহণ করে থাকতেই পারেন। বৌদির এখানে আসার এখনও দশ বছর হয়নি কিন্তু তাঁর কথাতে পাঞ্জাবীর প্রভাব বেশি ছিল। ঘড়া ঘড়া দুধ দেয় এমন দুটি মোষ ছিল বাড়িতে। এই সময় একটা মোষই দুধ দিচ্ছিল। দুধ, মাখন, ঘি, দইয়ের কথা আর কি বলব? দেশে না হলেও সেই বাড়িতে তো দুধের নদী বয়ে যাচ্ছিল। এত ঘোল হতো যে সারা মহল্লায় সদাব্রত চলত। আমাদের রামও খুব ঘোল ভালবাসতেন। দুধের ব্যাপারে আমি যেমন অপরকে দোষারোপ করতাম, ঠিক তেমনি ঘোলের ব্যাপারে অপরে আমাকে দোষারোপ করতে পারত। বাড়িতে টাঙ্গা আর ভাল ঘোড়াই শুধু নয়, ঘোড়ার বাচ্চাও ছিল। বলা বাহুল্য, এই ভবঘুরেরাজ সংসারটি ভালই পেতেছিলেন।

কয়েকটি বাজার ঘুরে দরবার সাহেবের দিকে গেলাম। দরবার তো পুষ্করিণীর মাঝখানে,কিন্তু পুষ্করিণীর চৌহদ্দির ভেতর ঢুকতেই হুকুম হলো, 'মাথা ঢেকে নিন।' সম্মান প্রদর্শন করার জন্য সকলের নিজস্ব প্রথা থাকে। যখন কেশ রাখাটাই পরম ধর্ম মনে করা হয়েছে তখন কেশ খোলা রাখা শোভনীয় নয়, তাই পাগড়ি বাঁধা অনিবার্য হয়ে পড়ল। সবাই যখন পাগড়ি বেঁধে মন্দিরে যাচ্ছে, তখন অন্যদের কি করে খালি মাথায় যেতে দেওয়া যায়? তাই মাথা ঢাকার নিয়ম সবাইকে মানতে বাধ্য করা হচ্ছে। বৌদ্ধদের মধ্যে মাথা ঢেকে মন্দিরে যাবার অর্থ হলো অসম্মান প্রদর্শন করা, ক্রিস্টানদেরও একই

ব্যাপার। কিন্তু মুসলমানদের মাথা ঢাকা জরুরি। হয়তো অনেক ব্যাপারের মত এটাও মুসলমানরা শিখদের থেকে নিয়েছে। অ-মূর্তিপূজারী শিখরা মন্দিরের ভেতর কোনো মূর্তি রাখতে পারে না. আর যে মূর্তিকে তীব্রভাবে বর্জন করবে সে শিল্প থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু লোকেরা কি জানে, আসলে ভগবানই মিথ্যে আর মূর্তিরাই সত্যি। ভগবান মানুষের মনে ততটা উঁচু ভাবনা ভরে দিতে পারে না যতটা সুন্দর শিল্পমণ্ডিত মূর্তি পারে। দুজন অন্ধ রাগী সেখানে গ্রন্থসাহিব গেয়ে যাচ্ছিল—পড়ছিল না। যাইহোক, এতে সঙ্গীতের কদর অবশ্যই আছে। পুষ্করিণীর পাড় শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো হয়েছে। মনে হচ্ছে, ধীরে ধীরে আশেপাশে সবটাই শ্বেতপাথরের হয়ে যাবে। অনেকগুলো বাড়ি ভেঙে ফেলে সেখানে একরকমের বাড়ি বানানো হয়েছিল। সরোবরের ভেতর মন্দির দেখে তিব্বতের বৌদ্ধরা একে গুরু পদ্মসম্ভবের স্থান বলে মনে করে, আর শীতের সময় বহু তিব্বতী তীর্থযাত্রীকে দণ্ডবৎ করতে, পরিক্রমা করতেও দেখা যায়। মন্দিরের দর্শন করে দেশের জন্য শিখদের বলিদানের কথা স্মরণ না করে থাকা যায় না। এই বীরদের ভবিষ্যতের সেবার কথা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গেই কোমাগাতামারুর অমর কাহিনী চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ৭০ জন বীরের হাসতে হাসতে দেশের জন্য শূলে-ফাঁসিতে প্রাণ দেবার দৃশ্য সামনে এসে দাঁড়ায়। করতারসিংহ বেঁচে থাকলে আজ বুড়ো হতো, কিন্তু কুড়ি বছর বয়সেই সে অসাধারণ নির্ভীকতার পরিচয় দিয়ে যৌবন বলিদান দিয়েছিল, তার সেই যৌবন অমর।

দিল্লীতে বর্মনের বই 'মিস্ট্রি অফ বিড়লা হাউস' পেলাম। ঘরে বসে তা পড়তে থাকলাম। চোখের সামনে এইসব হচ্ছিল, তবু কেউ কর্ণপাত করে না কেন?

অমৃতসরে মাত্র দুদিনের জন্য এসেছিলাম। প্রথম দিন রাত্রে ওপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম, পরিষ্কার আলো ছিল না—এক জায়গায় দুটো পা একসঙ্গে সিঁড়ি পার করতে চাইল। হয়তো সেটা শেষ সিঁড়ি ছিল, তাই ধড়াম করে পড়লেও খুব বেশি আঘাত লাগল না। হাঁটু ছিঁড়ে গিয়েছিল। 'কোনো ব্যাপার নয়'—তখন আমি এই কথাই বললাম।

২২ তারিখ চা খেয়ে কোম্পানি বাগেব দিকে বেড়াতে গেলাম। এখন সামরিক উৎসবের প্রস্তুতি চলছিল। রাস্তায় গোবিন্দগড় পেলাম। এক জায়গায় ঘোড়াও পড়ে গেল আর টাঙ্গা উঠে গেল তার ওপরে। তবে ঘোড়ারা তাতে অভ্যস্ত থাকে। ড· পেডামলের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ৮০ বছর বয়স হয়ে গেছে। বুদ্ধের ব্যক্তিত্ব যাঁদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, ইনি পুরনো প্রজন্মের সেই সব মানুষদের একজন। বৌদ্ধ এবং অন্যান্য গ্রন্থের খুব ভাল সংগ্রহ তাঁর কাছে ছিল। পুরনো মূর্তিপ্রেমীও ছিলেন তিনি। ছিলেন বুদ্ধভক্ত ও বুদ্ধিবাদী কিন্তু ভক্ত ছিলেন স্ত্রীবাধাস্বামীর। বিরোধীদের সমাগম হয়েছিল, কিন্তু বিরুদ্ধ প্রকৃতির মানুষের মধ্যে যখন ভালবাসা হয়, তখন তা খুব ঘন হয়।

সন্ধেবেলা জালিয়ানওয়ালাবাগ বেড়াতে গেলাম। ৩১ বছর পরে এখনও দেয়ালে গুলির বহু চিহ্ন রয়েছে। ভাইসাহেব সেই মন্দিরও দেখালেন, যার পিছনে লুকিয়ে তিনি এবং অন্যরা নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন।

মুসৌরী—২২ তারিখ সন্ধেবেলা দেরাদুনের গাড়ি ধরলাম শুয়ে শুয়ে রাত পৌনে একটায় সাহারানপুর পৌছে গেলাম। দিল্লীর পত্রিকা এই সময় এখানে আসত এবং বিশেষ গাড়িতে করে মুসৌরীতে পৌছনো হতো, এটা আমি জানতাম। স্টেশন থেকে বাইরে বেরোতেই ডাকাডাকি শুনলাম আর সাত টাকা দিয়ে 'স্টেটস্‌ম্যান'-এর গাড়িতে গিয়ে বসলাম, যেটা পৌনে চারটের সময় রওনা হলো। অন্ধকার থাকতেই সমতল ছেড়ে শিবালিকে ঢুকে ঘাটি কখন পার হয়ে গেছি তা টের পাইনি। তবে হ্যাঁ, 'রাজাজী স্যাংচুয়ারী' ইংরেজিতে লেখা আছে দেখলাম। জানা গেল, ইংরেজদের সময়ের 'অভয়ারণ্য'কে এখন রাজাজীর নামে প্রসিদ্ধ করা হয়েছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা দেরাদুনে পৌছে গেলাম। গাড়ির লোক এজেন্টদের পত্রিকা দিল, তারপর পাহাড়ে চড়ে ছটার সময় আমাদের কিতাবঘরে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিল।

এখনও আলো জ্বলছিল। দেরাদুন থেকে মুসৌরীর দীপমালা দেখা যেত, আর এখান থেকে তো দেরাদুন হাজার হাজার বৈদ্যুতিক বাতিতে ঝলমল করছিল। এত ভোরে কুলি আর কোথায় পাওয়া যাবে? আলো না নেভা পর্যন্ত জিনিসপত্র নিয়ে অজ্ঞাতেই বসে রইলাম। অন্ধকার দূর হলো। কুলি এলো। একজনের পিঠে মাল তুলে দিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। পথে কিছু এমন জায়গা আছে যেখানে সূর্যের আলো পড়ে না। সেখানের শিশির জমে সাদা বরফ হয়ে গিয়েছিল।

মহাদেবজীকে ঠাণ্ডায় কাতর দেখলাম, কিন্তু বললেন, 'কোনো ব্যাপার নয়, সহ্য করে নেব।' রাত্রে আগুন জ্বালাতাম। বাড়ি কেনার সময় উঁচু ছাতকে ভূষণ মনে করেছিলাম, কিন্তু এখন সেটাই দূষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিচু ছাত হলে কাঠ জ্বালিয়ে সমস্ত বাড়িটা গরম করে দেওয়া যেত আর তখন ঠাণ্ডাকে বাইরে থেকে কাকুতি-মিনতি করতে হতো। ফ্লাশ লাগানোর কাজে ঢিলেমি হচ্ছিল। আমি ভেবেছিলাম, ফিরে আসা পর্যন্ত সেটা তৈরি হয়ে থাকবে।

মহাদেবজীর ঠাণ্ডার প্রতিকার সবার আগে করা দরকার ছিল, তাই পরের দিন (২৪ নভেম্বরে) তাঁকে নিয়ে লনঢৌর বাজার গেলাম আব দর্জিকে কোট-পায়জামা বানাতে গরম কাপড় দিয়ে এলাম। বাজারে গেলে ড· সত্যকেতুর বাড়িতে চা খাওয়াটা অনিবার্য ছিল।

ফেরার সময় দেখলাম হ্যাপি ভ্যালি ক্লাবের বাড়ি রঙ করানো হচ্ছে। কোনো এক সময় এই ক্লাব মুসৌরীর গর্ব ছিল। সেই সময় মনে করা হতো, এই ক্লাবকে ছাড়া মুসৌরী শ্রীহীন হয়ে যাবে। এত লম্বা-চওড়া সমতল জায়গা মুসৌরীতে আর কোনো বাড়িতে নেই। সেখানে সাত-আটটা টেনিস কোর্ট ছিল। গান্ধীজী এখানে কতবার সন্ধ্যার প্রার্থনা করিয়েছেন। পাশেই বিড়লা নিবাসে উঠেছিলেন। আমি আমার প্রথম বছরের অবস্থানকালে খুব চেয়েছিলাম যে, ইংরেজি নাম বদলে এব ভারতীয় নাম হোক এবং 'গান্ধীভূমি'র মত নামের পরামর্শও দিয়েছিলাম। সেইসময় কয়েকবছর ধরে পুরসভার বোর্ড ভেঙে দিয়ে সরকার দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়েছিল। আশা ছিল, জন-নির্বাচিত পুরসভা কিছু করবে, কিন্তু সে আগের থেকেও দীর্ঘসূত্রী প্রমাণিত হল। শুধু এ ব্যাপারে

নয়, আরো অন্য ব্যাপারেও। হ্যাপি ভ্যালি ক্লাব বছরের পর বছর খালি পড়ে ছিল, বর্ষায় ছাত চুঁয়ে জল পড়ত, যার ফলে অনেক ফার্নিচার, কার্পেট-শতরঞ্চি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ক্লাবে বইয়েরও ভাল একটা সংগ্রহ ছিল, যার কদর করার কেউ ছিল না। আজ বাড়িটা রঙ হতে দেখে আশা হল, হয়তো হ্যাপি ভ্যালি আবার জেগে উঠবে। কিন্তু যখন সমস্ত মুসৌরীর ভাগ্য শুয়ে আছে, তখন এই ক্লাবের আর আশা কি?

নেপালে এইসময় স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছিল। নেপালী কংগ্রেসের বীররা বীরগঞ্জকে রানার শাসন থেকে মুক্ত করে নিয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসী স্বয়ংসেবকরা সুশিক্ষিত শাসকও ছিল না এবং তাদের কাছে হাতিয়ারও ছিল না। কোনোরকমের সাহায্য যাতে পাওয়া না যায়, তার জন্য ভারত সরকার বাধা দিতে উদ্যত হয়েছিল। স্বাধীনতাপ্রেমীদের জাঁতার দুই পাটার মধ্যে পড়ে পিষ্ট হওয়া ভাগ্যে ছিল। ২৪ নভেম্বর খবর পেলাম, নেপালী কংগ্রেসের স্বয়ংসেবকদের বীরগঞ্জ ছেড়ে পিছনে সরে যেতে হয়েছে। তাদের বলিদান কি ব্যর্থ হবে? সেইসময় তো একটাই আশা ছিল যে, নেপালী সেনা রানাদের হাত থেকে বেহাত হয়ে যাবে। সমস্ত পরিস্থিতি প্রতিকূল মনে হচ্ছিল, কিন্তু সময় ছিল স্বাধীনতাপ্রেমীদের অনুকূলে। পরের দিনের খবর থেকে জানা গেল, নেপালের সশস্ত্র বিদ্রোহ সফল হয়নি। কংগ্রেসের লোকেরা সেনাদের প্রভাবিত করতে পারেনি, ভারত সরকার বড়রকমের বাধা সৃষ্টি করেছে। বলির পাঁঠা বানানোর জন্য ইংরেজ নেপালীদের নিজেদের সৈন্যদলে ভর্তি করছিল, যে কাজে রানা পরম সহায়ক ছিলেন, তাই তিনি কি করে তাঁর পোষ্যপুত্রদের অপদস্থ হতে দেবেন? এরই মধ্যে ত্রিভুবন কাঠমাণ্ডুর ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় নিয়ে আর আমাদের দৃঢ়তার জন্য ভারতীয় বিমানে চড়ে দিল্লী পৌঁছে গেল। সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে খুব স্বাগত জানানো হয়েছিল। কিন্তু, যদি রানাদের নিজের পদে অধিষ্ঠিত থাকার জন্য অপ্রত্যক্ষভাবে কাজ করতে দিতে হয়, তাহলে এই প্রদর্শনের অর্থ কি?

ভারতে বিগত কয়েকবছর ধরে যে শাসনসূত্র কংগ্রেসীদের হাতে এসেছিল, তখন থেকে ভ্রষ্টাচার আর অযোগ্যতা এত বেড়ে গেছে যে অনেকেই ভাবতে শুরু করেছে, কংগ্রেস এখন ফুটো নৌকো, এতে থাকার দরকার নেই। ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট এই ভেবেই কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে গেছে। কিন্তু কংগ্রেসের দুর্বলতাকে তখনই কাজে লাগান সম্ভব, যখন তার মোকাবিলা করার মত ঠিক তেমনি একটি সম্মিলিত সংগঠিত মোর্চা তৈরি হবে।

বোম্বাই—সংবিধানের সংস্কৃত অনুবাদ-সমিতির ড· কাণে তাঁর বৃদ্ধাবস্থার কারণে বোম্বাই থেকে এদিক-ওদিক যাওয়ায় অসমর্থ ছিলেন, তাই সমিতির বৈঠক বোম্বাইতে ডাকা হয়েছিল, আমারও সেখানে যাবার ছিল। ২৭ নভেম্বর বাড়ি থেকে প্রস্থান করে তিনটাকায় ট্যাক্সি নিয়ে সওয়া দশটার সময় শুক্লজীর বাড়িতে পৌঁছলাম। ফ্লাশ লাগানোর লোকেরা খুব আলস্য দেখাচ্ছিল। গুপ্তা স্টোরে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, এখনও কলকাতা থেকে জিনিস আসেনি। ছাপরার দুই তরুণ বহুবছর ধরে দেহরাতে আছেন, একজন নামকরা বৈদ্য আর অপরজন হিন্দি বিদ্যালয় চালান। দেহরা তাঁদের ঘরবাড়ি হতে

চলেছিল, পরের প্রজন্ম তো সম্ভবত ছাপরার বুলিও ভুলে যাবে।

আজকাল ইউনিভার্সিটিগুলিতে ডক্টর হওয়ার জন্য ছাত্রদের বন্যা এসেছিল। পি· এইচ· ডি· এবং ডি· লিট· সস্তা হয়ে যাওয়ায় কিছু মানুষের খারাপ লাগছিল। কিন্তু এই দোষ তো ডিগ্রির নয়। ডিগ্রির জন্য গবেষণাকারীদের মধ্যে কেউ কেউ ভালও বেরোতে পারে। শুক্লজী সংস্কৃত ও হিন্দিতে পণ্ডিত এবং একজন কৃতি অধ্যাপক। তাঁর একটু ইচ্ছা দেখে আমিও খুব বেশি উৎসাহ দিলাম। বিষয় 'কৃষ্ণ কাব্যের ধারা' রাখতে হতো। কয়েক বছর পর্যন্ত শুক্লজীর এদিকে মনোযোগ ছিল, আর আমিও তাঁর অগ্রগতির জন্য চেষ্টা করে গেছি। কিন্তু এই ভার বহন করা তাঁর পক্ষে মুশকিল এবং ব্যর্থও ছিল। হিন্দি বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন, দেরাদুন ছেড়ে আর কোথাও কাজ করতে যাওয়ার দরকার ছিল না, তাই ডক্টর হয়ে কিছু লাভ ছিল না। তাছাড়া শুক্লজী ছিলেন বহুকাজের মানুষ। সকলের সেবা করার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতেন তিনি। কলেজের পড়ানোর ঘণ্টাগুলো বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত সময় তার পরোপকারে লেগে যায়। সকালে চা আর মধ্যাহ্নভোজন তো বাড়িতে হওয়াটা নিশ্চিত। তারপর রাত বারোটা পর্যন্ত আর তাঁর খোঁজ পাওয়া যেত না। সাইকেল চালাতেও জানতেন না, সমস্ত যাত্রা পায়ে হেঁটেই করতেন। এর ফলে একটা লাভ তো তাঁর অবশ্যই হয়ে থাকবে যে, তিনি তাঁর স্ত্রীর মত কখনও ডায়াবেটিসের শিকার হননি। পুরসভার নতুন নির্বাচনে তাঁকে শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ করে দেওয়া হয়—'বোঝার ওপর শাকের আঁটি।' এখন আর তাঁর পক্ষে কি করে নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় বের করা সম্ভব ছিল? তবে আমি আসাতে কিছু না কিছু সময় তাঁকে বার করতেই হতো।

দেরাদুন থেকে বোম্বাইর উদ্দেশে রওনা হলাম। ২৮ নভেম্বর খুব ভোরে আমাদের ট্রেন দিল্লী পৌছল। এখানে আমাদের ট্রেন বদলাতে হতো। অন্য ট্রেনে বার্থ রিজার্ভ ছিল না কিন্তু ফ্রন্টিয়ার মেল থেকে অনেক লোক দিল্লীতে নামল। আমি যে কামরায় বসলাম, তাতে দুটি তরুণও ছিল যারা অমৃতসর থেকে আসছিল। এখান থেকেই ট্রেন লেট হতে শুরু করল। মথুরা, ভরতপুর, কোটা, রতলাম, বরোদা, সুরাট হয়ে যেতে হতো। পথে করৌলী আর জয়পুরের এলাকাও পড়ল। এক জায়গায় জয়পুরের গুপ্তজী গাড়িতে উঠলেন। আমাদের কম্পার্টমেন্ট পুরোপুরি ভরে গেল। মালব-ভূমি পার করে গুজরাটে প্রবেশ করার কিছুক্ষণ পরেই রাত হয়ে গেল। সকালে বলসার এলো। জানতে পারলাম ট্রেন দুঘণ্টা লেট যাচ্ছে। দুঘণ্টা লেটেই আমরা বোম্বাই সেন্ট্রাল স্টেশনে পৌছলাম। শ্রীঘনশ্যামদাস পোদ্দারকে আগেই চিঠি লিখে দিয়েছিলাম, তাঁর লোক উপস্থিত ছিল। তাই মালাবার হিলে শেঠজীর বাড়িতে পৌছতে কোনো অসুবিধে হলো না। আজকাল স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে পোদ্দারজী সমুদ্রের ধারে জুহুতে থাকতেন। আমাকে তাঁর বাড়িতেই থাকতে হতো। দুদিন আগে এসে পড়েছিলাম, ভেবেছিলাম, এরমধ্যে বোম্বাইয়ের বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়ে যাবে। সেইদিন স্নান-খাওয়া সারার পর একটু বিশ্রাম নিলাম। বড় শহরে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা যেতে খুব অসুবিধে হয়, কিন্তু গাড়ি ছিল। পরাধীন বাহনে উঠতে আমার ভয় হতো, পাছে কোথাও চোট লেগে

যায়! আগেই তো এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য হয়ে গিয়েছিল যে, ডায়াবেটিসে কোথাও ঘা ফোঁড়া-ফুসকুঁড়ি হওয়ার মানেই হলো তাকে রোগে পরিণত করা।

অমৃতসরে হাঁটু সামান্য ছড়ে গিয়েছিল। জীবন কোনোদিন এইরকম ছড়ে যাওয়াটা কোনো ব্যাপার বলে মনে করতাম না। মুসৌরীতে থাকতে মনে হয়েছিল সেটা শুকিয়ে গেছে। এখানে এসে স্নান করার সময় তা না ভিজিয়ে রাখতে পারিনি। এবার ডায়াবেটিস ভবানী আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করল। প্রথম দিন অতটা বিপদ বোঝা যায়নি। সেদিন তিনটের সময় বেরোলাম। 'গঢ়ওয়াল' লেখায় হাত লাগিয়েছিলাম তাই 'কেদারখণ্ড' এবং আরো কিছু বইয়ের প্রয়োজন ছিল। বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে গেলাম। 'বেঙ্কটেশ্বর সমাচার'-এর সম্পাদক শাস্ত্রীজী এবং আরো কত না-দেখা কিন্তু পরিচিত লোকজন বেরিয়ে পড়ল। বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সংস্কৃতের অনেক সেবা করেছে। আমার ছোটবেলায় সংস্কৃতের সঙ্গে অপরিচিত থাকাকালীন পন্দহাতে আমি এই প্রেসের নাম শুনেছিলাম, যখন আমার দাদুর পুরোহিত উধৌবাবার নাতি এখান থেকে কয়েকটা বই ভি· পি·-যোগে আনিয়েছিল। সেই সময়ের কাছাকাছি কনৈলাতে এসে এই প্রেসের ছাপা কিছু চৌতাল ও অন্যান্য বই আমাদের বাড়িতে পাই, সেগুলো আমার মেজ পিসেমশাই বোম্বাই থেকে পাঠিয়েছিলেন। এখন সে-ব্যবস্থা রিসিভারের হাতে ছিল, যে কারণে উন্নতি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত প্রেস দেখানো হলো, 'কেদারখণ্ড'ও পাওয়া গেল। প্রেসমালিক তরুণ শেঠের সঙ্গেও দেখা হলো।

সেখান থেকে পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসে গেলাম, কয়েকজন পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলো।

পরের দিন ৩০ নভেম্বর ড· হেমচন্দ্র যোশীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বর্তমানে তিনি এখানে 'ধর্মযুগ' সাপ্তাহিকের সম্পাদনার কাজ করছিলেন। ইলাচন্দ্রজীও এখানেই ছিলেন। 'ধর্মযুগ'কে চালু করতে তাঁর যোগ্যতাকে কাজে লাগানো দরকার ছিল, কিন্তু যখন তাঁর লেখা এবং 'শব্দ-সন্ধান'-এর জন্য 'ধর্মযুগ' ৫০ হাজারেরও বেশি ছাপা হতে লাগল, তখন আর তাঁর প্রয়োজন রইল না। শেঠজী তাঁকে সরিয়ে দিলেন।

ডাঙ্গের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তখন তিনি বাড়িতেই ছিলেন। ডাঙ্গে সবচেয়ে পুরনো পোড়খাওয়া মজদুর নেতা আর মার্কসবাদেরই কেবল বিদ্বান নন, ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিরও তিনি বড় পণ্ডিত। তাঁর সঙ্গে কথা বলে মানুষের আনন্দ হয়। বলছিলেন, 'আমাদের পার্টির নীতি বদলাতে হবে, খুব ভুল করা হয়েছে, যার ফলে পার্টির খুব ক্ষতি হয়েছে।'

সেইসময় সেন্ট্রাল স্টুডিও (তারদেব)-তে একটা চীনা ফিল্মের নিজস্ব প্রদর্শনী হচ্ছিল। মাথা ধরিয়ে দেয় না এমন ফিল্ম দেখার সুযোগ খুব কম হয়। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে থাকা কি সম্ভব? পাসও পেয়ে গিয়েছিলাম। এক চীনা বীর তরুণীর জীবন এতে চিত্রিত করা হয়েছিল। কিভাবে সে হাসতে হাসতে জাপানী আক্রমণকারীদের হাতে তার প্রাণ হারায় আর তার আগে, কত সাহসের সঙ্গে বড় বড় কাজ করে, তা এতে দেখানো হয়েছিল।

—১৯৫০—

১ ডিসেম্বর দেখলাম, বাঁ হাঁটুর ছড়ে যাওয়া অংশ সবুজ হয়ে গেছে। ওষুধ লাগালাম, জল লাগার থেকে বাঁচালামও, কিন্তু তা ঠিক হলো না। আজ অনুবাদ-সমিতির বৈঠক ছিল, তাই আগে সেখানে যাওয়া দরকার ছিল। সময় ছিল তাই আগে মিউজিয়ামে ড· মোতিচন্দের কাছে গেলাম। শুধু তাঁর সঙ্গেই কথ'বার্তা হতে থাকল, মিউজিয়াম দেখলাম না। সমিতির বৈঠক দুঘণ্টা ধরে চলল। পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী ও ড· মঙ্গলদেব শাস্ত্রী, ড· বাবুরাম সাক্সেনা, সুনীতিবাবু এবং ড· কানে উপস্থিত ছিলেন। ড· কুন্‌হ্‌রাজা সংস্কৃত পড়াতে ইরান চলে গিয়েছিলেন, তাই তাঁর আসার সম্ভাবনা ছিল না। এখন রোজ অপরাহ্নে সমিতির বৈঠক হতে লাগল। সোমবার শ্রীবালসুব্রহ্মণ্য আইয়ার আর মহামহোপাধ্যায় গিরধর শর্মাও এলেন, কিন্তু সুনীতিবাবু আর ড· বাবুরাম চলে গেলেন। এদিকে অনুবাদের কাজ চলতে লাগল আর এদিক আমার ঘা তার রূপ দেখাতে শুরু করল। তবুও দু-একটা দিন অপেক্ষা করলাম। 'রিপু রুজ পাবক পাব, ইনহি ন গনিয়ে ছোট কহি'-এই সুন্দর উক্তিটি মাথায় ঘুরতে লাগল, তখন ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া অনিবার্য মনে হলো। শেঠজীর বাড়ির পাশেই তাঁর ডাক্তার ছিলেন। তিনি পেচ্ছাপ পরীক্ষা করে জানালেন যে, চিনি দুশো আছে, রক্তচাপ ১৭০-১৯০ আছে, যা সামান্য বেশি। পায়ে অল্প ফোলাও আছে। আজ উনি ইনসুলিন দিয়ে দিলেন। এখনও আমি ইনসুলিনের একান্ত ভক্ত হইনি, বরং তার থেকে বাঁচতে চাইতাম, এমনিতে সুঁচ ফোটানোতে কোনো ভয় ছিল না। ডাক্তার বললেন, 'প্রয়োজন পড়লে কাল পেনিসিলিন দেব।' ততক্ষণের জন্য পেনিসিলিনের দশটি গুলি খেতেও দিলেন। ভাবছিলাম. 'পড়ে থাকা-ভার আমি। জীবনে যা করণীয় ছিল তার থেকে বেশি করেছি, তাই মৃত্যুর একটুও ভয় নেই, দুঃখ নেই। তবুও বাজেভাবে মরার দরকারটা কি?' এখন পায়ের ওপর দখল ছিল না, কিন্তু অবলম্বনেরও ততটা দরকারও ছিল না। সমিতির অধিবেশনের জায়গায় গাড়িতে পৌঁছে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসতাম।

কোরিয়ার পরিস্থিতি এখন গুরুতর রূপ ধারণ করেছিল। আমেরিকা ৩৫ অক্ষাংশ পার করে এগিয়ে গিয়ে নিজেকে খুব বাহাদুর মনে করছিল, কিন্তু যখন চীনা সৈন্যের পাল্লায় পড়তে হলো তখন তার সৈন্যদলে ছুটোছুটি পড়ে গেল। মনে হতে লাগল, চীনা বাহাদুররা চিয়াং-কাই-শেকের মত আমেরিকানদেরও প্রশান্ত মহাসাগরে ফেলে দিয়ে তবেই দম ফেলবে। আমেরিকা পরমাণু বোমা ব্যবহার করার হুমকি দিল, শুধু হুমকিই নয়, মনে হলো সে তা ব্যবহার করবেই। তার পশ্চিম-ইউরোপীয় সমর্থকরা ঘাবড়ে গেল। রাশিয়ার কাছেও পরমাণু বোমা ছিল, সে আমেরিকাকে ছেড়ে দিত না। রাশিয়ার পরমাণু বোমার শিকার সবার আগে ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স তার শিকার হতো। আর সেখানে বংশে বাতি দিতে কেউ থাকত না—এমন অবস্থা হতো, তাই ইটালি ছুটতে ছুটতে আমেরিকা গেল এটা বোঝানোর জন্য যে, পরমাণু বোমা ব্যবহার কোরো না এবং চীনের সঙ্গে সন্ধি করা হোক।

পেনিসিলিন আর ইনসুলিন দুটো ইনজেকশনই চলতে লাগল। এখান থেকে যাবার আগে ঘা শুকিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ডায়াবেটিস এমন কথা শুনতে রাজি নয়।

বোম্বাইয়ের কাউন্সিল-ভবনেই আমাদের বৈঠক হতো, মিউজিয়ামও সেখান থেকে খুব দূরে ছিল না। ৫ ডিসেম্বর সংগ্রহালয়ে ড· মোতিচন্দজীর সঙ্গে একঘণ্টা ধরে কথা হলো। সেখানেই পাটনার এক কিউরিও বিক্রেতাকে পেয়ে গেলাম। বলছিলেন, 'আমার কাছে ৪০ হাজার হস্তলিখিত গ্রন্থ আছে।' আমি এবং জালানজী রাজগুরু পণ্ডিত হেমরাজ-এর অনেক বই কিনে নিয়েছি। রাজগুরু সারাজীবন অনেক পরিশ্রম করে বহু তালপত্র ও অন্যান্য দুর্লভ পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। কোনো জাতীয় সংগ্রহালয় অথবা গ্রন্থাগারের এই ধরনের সংগ্রহ পাওয়া উচিত ছিল। এখন তা বিলি হচ্ছিল। নিজস্ব সংগ্রহে অমূল্য বস্তুগুলি সুরক্ষিত রাখা সম্ভব নয়, এই কথা চিন্তা করেই আমি আমার সংগ্রহ পাটনা মিউজিয়াম এবং বিহার রিসার্চ সোসাইটিকে দিয়ে দিয়েছিলাম।

আজই ৭৯ বছর বয়সে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের মৃত্যুর খবর পেলাম। মহর্ষি রমণ এবং অরবিন্দ আধ্যাত্মিকতার মহান আলোক-স্তম্ভ ছিলেন। আমার দৃষ্টিতে যদিও তাঁরা মহান অন্ধকার-স্তম্ভ ছিলেন, কিন্তু লাখ লাখ মানুষ ভক্ত ছিলেন। শেঠ-শেঠানী ও রাজা-রানীরা তো তাঁদের শেষ অবতার মনে করে পুজো করতেন। দুঃখ হয়, দুজনেই চলে গেলেন। তবে সম্পূর্ণ বয়সেই, তাই কারো নালিশ জানানোর সুযোগ নেই। বিগত শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ থেকে দুজনের দিব্যশক্তির প্রচার খুব ধুমধামের সঙ্গে হয়েছে। অরবিন্দর চেলারা বলত যে, তাঁর শরীর কখনও বিকৃত হবে না, কিন্তু দুদিনেই যখন গন্ধ বেরিয়ে গেল, তখন তাড়াতাড়ি তাঁকে বাক্সে ভরে গোর দেওয়া হলো। হিন্দুরা বহু আগেই গোর দেওয়ার প্রথা ছেড়ে দিয়েছিল আর সে জায়গায় পুড়িয়ে দেওয়ার স্বাস্থ্যকর প্রথা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু চেলারা তো অরবিন্দের সমাধি পুজো করাতে চায়, তাই কেন তাঁকে পোড়াতে যাবে? দুই আধ্যাত্মিক আলোক-স্তম্ভের নিজেদের মধ্যে কোনো বনিবনা ছিল না। কখনও এক জায়গায় বসার সুযোগ তো তাঁরা পাননি, কিন্তু মনে মনে ভাবতেন, এক জঙ্গলে দুই সিংহ থাকতে পারে না। বিশ্বাসীদের ভয়ের কিছু নেই, যদি তাদের কাছে মূঢ় শ্রদ্ধা মজুত থাকে তাহলে অন্ধকারপুঞ্জে অপর এক মহাস্তম্ভ স্থাপিত হতে কোনো অসুবিধে হবে না। সময় লাগবে, তবু কল্কি অবতার অবশ্যই আসবেন। অরবিন্দর মৃত্যুতে সমস্ত বোম্বাইয়ের ওপর শোক ছড়িয়ে পড়ল—একথা বললে ভুল হবে, কারণ তিনি শুধু সেই শ্রেণীর পূজ্য এবং পরিচিত ছিলেন, যাদের সংখ্যা আঙুলে গুনে বলা যায়। তাদের ভেতর অবশ্যই শোক নেমে এসেছিল।

৬ ডিসেম্বর ড· জগদীশচন্দ্র জৈনের সঙ্গে দেখা করলাম। তারপর আন্ধেরীতে সর্দার পৃথ্বীসিংহের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সর্দার এখন এখানে ছিলেন না, আর প্রভা ভাবীজী পুত্র বিজয়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তাই দুজনের সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব হলো না।

৭ ডিসেম্বর ড· মোতিচন্দ এবং তাঁর এক পারসী বন্ধুর সঙ্গে তাজ হোটেলে চা খেতে গেলাম। পারসী ভদ্রলোক পিতল ও পিতলের মূর্তির সংগ্রাহক এবং উৎসাহী জিজ্ঞাসু ছিলেন। সেখান থেকে ড· মোতিচন্দ অন্য হোটেলে নিয়ে গেলেন, যেখানে মুর্গমুসল্লমের ভোজ হলো। তাঁর কাকা ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র নিজের সময়ের সমাজ থেকে অনেক এগিয়ে

ছিলেন, কিন্তু মুর্গমুসল্লমের সাহস বোধহয় তিনিও কখনও করেননি। যদি জীবিত অবস্থায় এই সৌভাগ্যলাভ না হয়, তাহলে শ্রাদ্ধের মুর্গমুসল্লম তো মজুত ছিল। এসো পরমবৈষ্ণব, আর নাহলে 'ঘ্রাণম্ অর্ধভোজনম'ই সই।

৮ ডিসেম্বর আবার আন্ধেরী গেলাম। এবার প্রভা বোনকে পেলাম। বিজয়ের বোন প্রজ্ঞাও এই সংসারে এসেছিল। ওখানেই খাওয়া হলো। তারপর গত কয়েক বছরের ঘটনার কথা শুনলাম। সর্দারেব এক পা বোম্বাইতে আর এক পা ভাবনগরে থাকে। প্রভা বোন বাচ্চাদের লেখাপড়ার কথা চিন্তা করে বোম্বাই ছাড়তে রাজি নয়।

৯ ডিসেম্বর শেষবার সমিতিতে তিন-চার ঘণ্টা থাকলাম। ভারতীয় বিদ্যাভবনে আজই ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর ভাষণ দেবার ছিল। মুনি জিনবিজয়জী সমিতির সদস্য বলে ওখানেই তাঁকে পেলাম. তিনিই এই সভার সভাপতি ছিলেন। বহুবছর ধরে মুনিজী ভারতীয় বিদ্যাভবনের পরিচালক ছিলেন, তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীকানহাইয়ালাল মানিকলাল মুন্সীজী। ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিদ্যার প্রগাঢ় সাধক মুনিজী ছিলেন বিদ্বান। আমাদের দুজনের পরিচয়ও সাধারণ ছিল না। তিনি 'প্রমাণবার্তিক-ভাষ্য' এখান থেকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, যে কাজে তিনি সফল হননি। তিব্বত থেকে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তালপুঁথি হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের গুরু গুণপ্রভের মহান রচনা 'বিনয় সূত্র'-কে আমি নকল করে এনে ছিলাম,যা ছিল সমস্ত বিনয়পিটকের সার। সূত্তপিটকের ব্যাপারে যে কাজ বসুবন্ধু তাঁর 'অভিধর্মকোষ'এর রূপে করেছিলেন, সেই কাজই বিনযপিটক সম্বন্ধে গুণপ্রভ কবেছিলেন। তিব্বতের পাঁচটি মূল পাঠ্যগ্রন্থের মধ্যে এটিও একটি। এর তিব্বতী অনুবাদের খবর তো লোকে জানত, কিন্তু মূল পাবার আশা ছিল না। আমি খুব সাধ করে তাকে সেখান থেকে নকল করে এনেছিলাম। রাশিয়া যাবার আগে বিদ্যাভবন সেটা ছাপাতে শুরু করেছিল। সমস্ত বইটা ১৯৪৭ সালেই ছাপা হযে গিয়েছিল, শুধু ভূমিকা লেখার প্রয়োজন ছিল, যার জন্য আমি ব্যাগ্র ছিলাম। কিন্তু ৪৭ সালে ছেপে যাওয়া বই ১৯৫৬-তেও প্রকাশিত হয়নি। হয়তো আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এটা দেখার সুযোগ পাবে। এই দীর্ঘসূত্রতা আমার কাছে ক্ষমার অযোগ্য, কিন্তু বললে হবে কি? মুনিজী এখন বোম্বাইতে থাকতেনও কম। চিতোর থেকে চার মাইল দূরে কৃষি-আশ্রম বানানোর কাজে তিনি লেগে ছিলেন, আর সেই সঙ্গে রাজস্থান সরকারও তার গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের কার্যভার তাঁকে সমর্পণ করেছে, তাই তাকেই বা দোষ দেওয়া কেন?

আজই সন্ধেবেলা জুহুতে পোদ্দারজীর বাড়ি গেলাম। পাঁচ বছরের জন্য জমি পাওয়া গিয়েছিল, যার ওপর ৫০ হাজার টাকা খরচ করে বাংলো দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বছরে দশ হাজার টাকাই তো হলো। একথা বলার দরকার পড়ে না যে, জায়গাটা খোলামেলা এবং স্বাস্থ্যকর। শেঠ ঘনশ্যামদাস সরল প্রকৃতির মিতভাষী এবং মারোয়াড়ী শেঠদের বহু দুর্গুণ থেকে তিনি মুক্ত পুরুষ। এই সময়ে লক্ষ্ণৌ-এর এক তরুণ শিল্পী তাঁর বাড়িতে উঠেছিলেন। তিনি নাক দিয়ে সেতার, শানাই, বীণা এমন সুন্দর বাজাতেন যে আসল আর নকলে প্রভেদ করা মুশকিল হতো। কয়েকটি ভাষায় কথা বলাতে তিনি অসাধারণ অনুকরণ করতেন। এইদিকে তাঁর প্রতিভা গভীর শিল্পের রূপ নিতে পারত,

কিন্তু এখন এইসব জিনিসকে মামুলি কৌতূহলের জিনিস হিসেবেই সীমিত রাখা হয়। রাত্রে আমিও জুহুতে থাকলাম। পরের দিন সকালে উঠে সমুদ্রতটে গেলাম যা কয়েক হাত নীচেই তরঙ্গিত হচ্ছিল। পায়ের অবস্থা এখনও এমন ছিল না যে, বহুদূর পর্যন্ত পায়চারি করতে পারি। কাছাকাছিতে বিড়লা, শেঠ আনন্দীলাল পোদ্দার ইত্যাদির বাংলো ছিল। যমুনালাল বাজাজ এখানে বহু জমি মাটির দরে কিনে নিয়েছিল, যার এখন সোনার দাম হয়েছে। চারদিকে বাংলো, ছোটবাংলো, সৌধ তৈরি হয়ে চলেছে। এই পর্যন্ত বাস এসে যাওয়ায় লোকেদের কম খরচে আসা-যাওয়ারও সুবিধে ছিল। মালাবার হিল থেকে এই জায়গাটা বেশি ঠাণ্ডা, কিন্তু বোম্বাইতে শীতের কথা বলার দরকারই পড়ে না, ওখানে তো মাঘে-পৌষেও সিনেমাহলে পাখা চালাতে হয়।

আজ পূর্বাহ্নে মাতুঙ্গার মাদ্রাজী বন্ধুদের হিন্দি ক্লাশে ভাষণ দিতে যেতে হলো। সেখানে তরুণ-তরুণীরা শতাধিক সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন এবং বলছিলেন, তামিলভাষী লোকেরাও হিন্দির গুরুত্ব বোঝেন। আমি আমার ভাষণে পল্লব-সংস্কৃতির সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জানিয়েছিলাম যে, তামিলভূমির সংস্কৃতি জাভা ও কম্বোজের ওপর কতখানি প্রভাব ফেলেছিল।

আজও খাবার পরে একটা থেকে চারটে পর্যন্ত অনুবাদ-সমিতিতে থাকলাম।

ওয়ার্ধা—গাড়িতে এখনও খুব ভিড় থাকত, কিন্তু আমি প্রথম শ্রেণীর একটা বার্থ আগের থেকেই রিজার্ভ করিয়ে নিয়েছিলাম। আমাদের কামরায় এক মারোয়াড়ী, দুই কচ্ছী পিতাপুত্রী আর আমি—এই চারজনই লোক ছিলাম। তাঁরা তিনজন উড়ীসা (অংগোল)-র নেপালবাবার কাছে যাচ্ছিলেন। ছেলেটি নেপাল উড়িসাতে যিশু খ্রিস্টের অবতার হয়ে জন্ম নিয়েছিল। অন্ধরা যায় আর তিনি একবার তাকালেই চোখ ফিরে পায়। খোঁড়া-ল্যাঙড়ারা যায়, দর্শনমাত্র তারা দুপায়ে ছুটতে শুরু করে। কুষ্ঠরোগীর কাঞ্চনকায়া হয়ে যায়, নির্ধন ধনবান হয়ে যায়। এমন কোনো কষ্ট বা বিপদ আছে যা নেপাল বাবার দর্শন মাত্র দূর হয়ে যায় না? কচ্ছী বৃদ্ধের মেয়ের চোখের মণির ওপর বেশ অনেকখানি শাদা হয়ে গিয়েছিল, এমনিতে সেই তরুণী আর সবদিক থেকে সর্বাঙ্গসুন্দরী ছিল। নেপালবাবা যদি তার চোখের শাদাটা ঠিক করে দেন তাহলে সে কোনো মেনকার থেকে কম হবে না। এই লোভে সে বাবার সঙ্গে যাচ্ছিল। মারোয়াড়ী ভদ্রলোকও তার নিজের গরজে যাচ্ছিলেন। সারা ট্রেনই মনে হচ্ছিল নেপালবাবার ভক্তরা দখল করেছে। খুব ভিড় ছিল। লোকেরা নিজেদের মধ্যে কথা বললেও নেপালবাবার কথাই বলছিল। আমি আগ্রহ নিয়ে তাদের কথা শুনছিলাম কিন্তু নিজের তরফে কোনো শ্রদ্ধা প্রকাশ করছিলাম না। ট্রেন দিনেই রওনা হয়েছিল। এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত আমার দিক থেকে নেপালবাবার ভক্তি বিষয়ে কিছুই বেরোতে না দেখে একজন বলল, 'এমন মহাত্মার দর্শনমাত্রই ভাগ্যলাভ হয়।' আমি বললাম, 'এতে আর সন্দেহ কি? ট্রেনে তিলধারণের জায়গা নেই এটাই তার প্রমাণ।' তিনি বললেন, 'আপনিও চলুন।' আমি বললাম, 'আমার অত ভাগ্য কোথায়, যে সেই দিব্যপুরুষের দর্শন করতে পারি।' সেইসব অন্ধদের সামনে আমি আর

কেন নেপালবাবার দিক থেকে মন সরানোর চেষ্টা করতে যাই।

১১ ডিসেম্বর সকাল আটটায় আমি ওয়ার্ধা স্টেশনে পৌঁছলাম। আনন্দজী ও অন্য বন্ধুরা স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। হিন্দিনগরে যখনই আসি, কিছু বৃদ্ধি অবশ্য চোখে পড়ে। এবার অতিথিভবন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। একটা কুয়োয় বিদ্যুৎচালিত পাম্পও বসানো হয়েছিল। সাহিত্যিক যোজনা বিষয়ে কিছু কথাবার্তা হলো আর কর্মকর্তাদের বেতন ও অন্যান্য খরচের হিসেব করা হলো। সন্ধেবেলা টাউন হলে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বক্তৃতা দিলাম। পরিচয় দেবার কাজটা বিনোদজী পেলেন, আর অতিশয়োক্তির জন্য তাঁর জিহ্বায় সরস্বতী ভর করল।

১২ ডিসেম্বর দুটোর সময় আনন্দজী ও বিনোদজীর সঙ্গে নাগপুর গেলাম। সেখানে প্রথমে মেয়েদের পাঠশালায় ভাষণ দিতে হলো, তারপর নাগপুর মহাবিদ্যালয় (মেরিস কলেজ)-এ ছাত্র ও অধ্যাপকদের সামনে হিন্দি সাহিত্য ও পরিভাষা বিষয়ে বললাম। রাতে দেড়ঘণ্টা সাহিত্য-সভা হলো, তাতে এখানকার সর্বোচ্চ অধিকারী এবং নাগরিকরা সম্মিলিত হলেন। নানারকমের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলো। হিন্দিতে তাঁদের রুচি দেখে আমার আনন্দ হলো।

১৩ ডিসেম্বর আমাকে এখান থেকে মুসৌরী প্রস্থান করতে হতো। ঘা পরিষ্কার করা, ব্যান্ডেজ করা এখনও একইভাবে চলছিল এবং তা শুকোনোর নামই করছিল না। দুপুরের গাড়ি ধরার আগে রাজ্যপাল শ্রীমঙ্গলদাস পকবাসার সঙ্গে দেখা করা ঠিক হয়েছিল। পণ্ডিত হৃষিকেশ শর্মা পকবাসাজীর সুযোগ্য পুত্রবধূর হিন্দি অধ্যাপক ছিলেন। তাঁরই আগ্রহে এটা স্বীকার করেছিলাম। পৌনে নটায় রাজভবনে পৌঁছলাম। প্রাতরাশের সঙ্গেই কথাবার্তাও বলতে হতো। একজন সুশিক্ষিত সংস্কৃত শিষ্ট দেশপ্রেমীর মতই সেখানে প্রশ্ন-উত্তর হলো। পকবাসজী নিজেও ডায়াবেটিসের রুগী ছিলেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বললেন, এবং রাশিয়া দেখার বিশেষ ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। সেইসময়ও আমাদের কংগ্রেসী নেতারা রাশিয়ার নামে খাপ্পা ছিলেন এবং এখানকার মত আসা-যাওয়ার কল্পনাও করতে পারতেন না।

মুসৌরী—রাজভবন থেকে স্টেশনে এসে গাড়ি ধরলাম। তারপর বহুবার যাওয়া সেই রাস্তা ধরে ইটারসীর দিকে এগোলাম। রাস্তায় ভূপাল পড়ল। পরের দিনের (১৪ ডিসেম্বর) সকাল হলো আগ্রাতে, এগারোটার সময় দিল্লী এলাম। দিল্লীতে নামতে হতো। ঘায়েরও পরিচর্যা করার দরকার ছিল। ভাইয়ার স্থানীয় ম্যানেজার শ্রীগৌরীলাল চাঁননা স্টেশনে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে গলিতে তাঁর বাড়িতে গেলাম, যেটা পুরনো দিল্লীর পাড়াতে ছিল। এখানে অর্ধেক হিন্দু আর অর্ধেক মুসলমান থাকত। দেশভাগের পরে সব মুসলমান পাকিস্তানে চলে গেছে আর তাদের বাড়িতে পাঞ্জাবের শরণার্থীরা থাকতে শুরু করেছে। শ্রীগৌরীলালজীও সেইভাবেই এখন একটি কুঠরিতে থাকেন। দুপুরের খাওয়ার পর তিনঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকলাম। পরে দেরাদুন পর্যন্ত কে জানে ঘুমোতে পারব কি না, তাই সেই অভাবটা আগেই পুষিয়ে নিতে চাইছিলাম। রাতের খাবার খেয়ে আটটার সময়

—১৯৫০—

ফ্রন্টিয়ার মেলে চড়লাম। প্রথমে জায়গা ওপরে পেলাম। একে তো ডায়াবেটিসের রুগীকে পেচ্ছাপ করার জন্য উঠতে হয়, সেইজন্যও ওপরের সিট সুবিধের হয় না, উপরন্তু এখন তো ল্যাংড়াও হয়ে গিয়েছিলাম। অপর এক ভদ্রলোক তাঁর সিট আমাকে দিয়ে দিলেন। ঘায়ে মলম-পটি লাগানো হলো, কিন্তু তাতে কোনো উন্নতি বোধ হচ্ছিল না।

সাহারানপুর পর্যন্তই এই ট্রেনে যাবার ছিল, রাত দুটোর আগেই যেখানে পৌছে গেলাম। খবরের কাগজের গাড়িতে বসে সাড়ে পাঁচটার সময় কিতাবঘর পৌছলাম সেখান থেকে জিনিসপত্র তুলিয়ে ঊষাকালেই হর্নক্লিফ পৌছে গেলাম। দেখলাম ফ্লাশ-এর লোকেরা পাইপ বসানোর জন্য মাটি খুঁড়ে ফেলেছে। মহাদেবজীর ডানহাতে এদিকে বেশ কিছুদিন ধরে ব্যথা ছিল, তিনি লিখতে পারছিলেন না। এবার তিনি যাবার কথা ভাবছিলেন। আমি বললাম, ‘কোনো একজন লিপিকার অবশ্যই আসবে, তাই সেজন্য চিন্তা করবেন না।’ নিজের পটি খুলে ঘায়ের চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম—হাসপাতাল যেতে হবে। কিন্তু কমলাকে এই মাসেই বিশারদ পরীক্ষা দিতে হবে। হাসপাতাল ছিল এখান থেকে অনেক দূরে, লনঢৌর-এর কাছে। সেখানে যেতে কে জানে কত সময় লাগে, তাই ততদিন পর্যন্ত এখানেই মলম-পট্টি করা ঠিক করলাম।

আজ বোম্বাইতে সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যু হয়ে গেল। কংগ্রেসে এই একজনই মানুষ ছিলেন, যিনি কিছু করার ক্ষমতা রাখতেন। দূরদৃষ্টি না হয় নাই থাকল। রাজ্যগুলির একীকরণ ছিল সর্দারের সবচেয়ে বড়কাজ, আর হায়দ্রাবাদকে ঠিক করাটা ছিল তার থেকেও বড় কাজ। বারদোলির নেতার এই কাজগুলি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এমনিতে তিনি শেঠদের সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন আর নিজের পথে কোনো বাধা দুচক্ষে দেখতে পারতেন না।

এখন দেড় বছরের ওপর হয়ে গিয়েছিল কমলা আমার সঙ্গে আছে। তার উন্নতি করানোর প্রথম পদক্ষেপ হলো যে, এই বছর সে বিশারদে বসতে যাচ্ছে। তাকে আমার সঙ্গে আর আমাকে তার সঙ্গে থাকতে হতো। এতদিনে আমরা পরস্পরের স্বভাবের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত হয়ে উঠেছিলাম। স্ত্রী-পুরুষের এইরকম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধকে অনির্দিষ্ট অবস্থায় রাখা উচিত নয়। পুরুষদের রাজ্যে স্ত্রীলোকদের পক্ষে এই স্থিতি আরোই অসহ্য ছিল। তাই ১৮ ডিসেম্বর আমি ঠিক করলাম দুজনে স্বামী-স্ত্রী হয়ে যাব। বয়সের জন্য আমার বেশ দ্বিধা ছিল। একটা তরুণ জীবনকে আমি বন্ধনে বাঁধতে চাইনি।

২৩ ডিসেম্বর সকালে বাবার সঙ্গে ড· সত্যকেতু ও শীলাজী এগারোটার সময় এলেন। নাগার্জুন আসবেন আশা করেছিলাম, কিন্তু তিনি এখন আসতে পারেননি। মহাদেব ভাই সঙ্গেই ছিলেন। বারোটার কাছাকাছি সময় ড· সত্যকেতু পুরোহিত হলেন এবং আমাদের দুজনের বিয়ে হয়ে গেল। সাহিত্য সম্পর্কিত কাজ এবং আমার স্বাস্থ্যের বিষয়ে দেড় বছর ধরে যে দেখাশোনা কমলা করেছিল, তা খুবই শ্লাঘনীয় ছিল। শরীর তো ডায়াবেটিসের শিকার হয়েই গিয়েছিল, তাই তাকে ঠিকমত চালাতে কমলার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। এটা যদি আমি না করতাম, তাহলে সেটা চূড়ান্ত স্বার্থপরতা হতো, আর কমলার প্রতি অত্যন্ত অন্যায়ও করা হতো।

পরেরদিন (২৪ ডিসেম্বর) পরীক্ষা দিতে কমলাকে দেরাদুন যেতে হতো, তার আগে এই কাজটা করে নেওয়া দরকার ছিল।

১৯ ডিসেম্বরও ঘায়ের অবস্থা একই থাকল। এবার খাবার আগে রোজ ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে শুরু করলাম, সিবাজলের গুলিও খেলাম। এখন পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, ঘায়ের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে আর আগাগোড়া ইনসুলিন নিয়ে যেতে হবে। যতক্ষণ ঘা আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তো ইনসুলিনের হাত থেকে মুক্তি নেই। পরে ভাবতাম, একটানা তো নেব না, খাওয়ায় সংযম রাখব। কিন্তু সেটা এত সোজা কাজ ছিল না। বছরের শেষে ৩১ ডিসেম্বর ডায়েরিতে লিখলাম—'এখনও ঘা ভাল হচ্ছে না। পেনিসিলিন নেওয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে। দু-আড়াই মাসের কাছাকাছি হলো এই ঘা আমার সঙ্গে রয়েছে। তার থেকে শিক্ষা হয়েছে যে, এবার রোজ ইনসুলিন নেওয়া উচিত, আর যথাসম্ভব নিজেকে ঘায়ের হাত থেকে বাঁচানো উচিত। মুসৌরীতে থাকতে তার সম্ভাবনা কম, কিন্তু বাইরের যাত্রায় তা রেলের হোক, মোটরের অথবা পায়ে হেঁটে হোক—ঘায়ের ভয় সবসময় থাকে। তাই আমি বাইরে যাবার চিন্তা ছেড়ে দিলাম। প্রথমে সকাল-সন্ধে দুবেলা ইনসুলিন নিতে থাকলাম। তারপর ভাবলাম, যদি সন্ধের খাওয়া বাদ দি, তাহলে দুবার সুঁচ ফোটানোর দরকার পড়ে না। তখন থেকে সন্ধের খাওয়া বাদ দিলাম। পরে ডাক্তার জানালেন, একবার বেশি খেলে হার্টকে অনেক কাজ করতে হয়, বুকে ব্যথা সেইজন্য হয়। তখন ২৪ ঘণ্টার ইনসুলিন নিয়ে দুবার খেতে লাগলাম। রেচক কাজ করতে অস্বীকার করে দিল এবং টক ঢেকুর উঠতে লাগল। তাই দুবেলা চায়ের সময় একটু খাওয়া বাড়িয়ে মধ্যাহ্নভোজনকেই মুখ্য করা স্থির করলাম। ঘা না থাকার সময় ইনসুলিন না নিলে বারবার পেচ্ছাপ হওয়া, মুখ শুকিয়ে যাওয়া আর সেইসঙ্গে মস্তিষ্কে একধরনের আচ্ছন্নতা থাকাটা খারাপ ছিল, যার জন্যই ইনসুলিন-ব্রতী হতে হলো।

২৪ ডিসেম্বর কমলা পরীক্ষা দিতে দেরাদুন গেল। শুধু পরীক্ষা দিতেই সে যায়নি, তাকে এবার কালিম্পংও যেতে হবে, অর্থাৎ মাসখানেক পরে সে ফিরতে পারবে। সেইদিন খুব মেঘ করেছিল, ঠাণ্ডা খুব বেড়ে গিয়েছিল। আগুন জ্বালালাম, কিন্তু চিমনির ধোঁয়া বেরনোর রাস্তা বন্ধ ছিল বলে পুরো ঘর ধোঁয়ায় ভরে গেল। রাতে বৃষ্টি হলো। ২৫ তারিখ বড়দিনের সকাল হলো। বৃষ্টি তুষারপাতে পরিণত হলো। দুপুর পর্যন্ত আমাদের কেয়ারী আর রাস্তা বরফের শাদা চাদরে ঢেকে গেল। হাওয়া একদম বন্ধ ছিল। বরফ গাছের শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায় পড়ে জমে গেল। সামনের বিলেতি খেজুর গাছটি প্রথমে হাতির কানের মত তার পাতাগুলো নাড়িয়ে বরফের আস্তরণকে সরিয়ে ফেলতে চাইছিল, কিন্তু যখন হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, তখন পাতাগুলোর ওপরেও বরফ জমতে লাগল। আশপাশ এবং আমাদের বাড়ির গোটা ছাদ শাদা হয়ে গেল। কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী কোথাও কারো কোনো শব্দ শোনা যায় না। চারদিকে নীরবতার অখণ্ড রাজত্ব ছিল। বারান্দায় দিনেও তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি ছিল, বাইরে আরো কম, তাই বরফ গলার প্রশ্ন ছিল না। আমি বেশির ভাগ খাটে বসে বসে 'গঢ়ওয়াল' লেখায় আমার সময় কাটালাম।

পরের দিন 'প্রথম হিমপাত' নামে একটি ছোট লেখা 'নবযুগ'কে পাঠালাম। আজ বরফ

গলতে শুরু করল, কিন্তু আকাশ থেকে মেঘ সম্পূর্ণ সরে গেল না, তবুও মাঝে মাঝে সূর্য উঁকি মেরে দেখছিল। ২৬ তারিখ মহাদেবীজী দেরাদুন থেকে এসে পড়লেন।

আমাদের প্রতিবেশি লেডলী-পরিবার ও পুসঙ্গ-পরিবার খ্রিস্টান অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছিলেন। দুজনের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক খুব ভাল ছিল। বড়দিন তাঁদের কাছে তেমনই গুরুত্বপূর্ণ যেমন আমাদের কাছে হোলি, দেওয়ালি। তাঁদের ধর্মীয় অংশের ওপর আমাদের বিশ্বাস না থাকলে কি হবে, ছোটবেলা থেকে এর জন্য যে মিষ্টি খাবার খেয়েছি! পরিবার ও সমাজে যে আনন্দ দেখেছি, তা এখনও আকৃষ্ট না করে পারে না।

২৯ তারিখ মহাদেবজী আবার দেরাদুন গেলেন। তাঁকে বলে দিলাম, যদি কমলা কালিম্পং যেতে চায়, তবে যেন এখনই কালিম্পং হয়ে আসে। কমলা পরীক্ষা দিয়ে সেখানে গিয়েছিল।

৩০ ডিসেম্বর ঠাণ্ডা বেড়ে গিয়েছিল। পণ্ডিত সুখলালজী তাঁর সম্পাদিত 'হেতুবিন্দু'-র এক কপি পাঠালেন। ধর্মকীর্তির এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির মূল সংস্কৃত পাওয়া যায়নি। কোনো জৈনভাণ্ডারে অর্চট লিখিত এইগুলির টীকা পাওয়া গিয়েছিল, আর তার ওপর দুর্বেক মিশ্রর অনুটীকা তিব্বতে আমি লিখেছিলাম। পণ্ডিত সুখলালজী এগুলোর সম্পাদনার ভার নেন। আমি তিব্বতীর ওপর নির্ভর করে তার মূল্যও সংস্কৃততে করে দিই। তিনটি জিনিস একসঙ্গে ছাপা হয়েছে। আমার আনন্দ হলো—ধর্মকীর্তির আর একটি রচনা মূলভাষায় তাঁর দেশভাইদের কাছে পৌঁছল।

১৯৫০ সালের শেষ দিন (৩১ ডিসেম্বর) রোববার পড়ল। সারা বছরের হিসেব-নিকেশ করে দেখা গেল যে, এই বছর 'মধুর স্বপ্ন' আর 'দার্জিলিং পরিচয়' প্রকাশিত হয়েছে। 'কুমায়ুঁ' লিখে প্রেসে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ১৯৫৬-র শেষে তা ছাপার অবসর হলো। 'আদি হিন্দি'র ছাপার কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল আর 'গড়ওয়াল'এর দুশো পৃষ্ঠা লেখা হয়ে গিয়েছিল। নিজের কাজে সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু এখনও সামনে পর্যাপ্ত কাজ পড়েছিল। সবচেয়ে বড় কাজ ছিল 'মধ্য এশিয়া কা ইতিহাস'। কে জানে তাতে কত সময় লাগবে। এই বছর বাইরে না যাবার সংকল্প থাকা সত্ত্বেও কালিম্পং, কলকাতা, দিল্লী, প্রয়াগ, অমৃতসর, বোম্বাই, ওয়ার্ধা, নাগপুর, হায়দ্রাবাদ যেতে হলো। শরীরে শক্তির অভাব বোধ করতাম না, তবুও ঘা বিকট চেহারা ধারণ করছিল, তার জন্য অবশ্যই চিন্তা ছিল।

মুসৌরীতে থাকা প্রায় ৬ মাস হয়ে গিয়েছিল। এখানকার প্রথম আকর্ষণ কেটে গেলেও ভালই লাগত। আবহাওয়া একদম অনুকূল ছিল। ঠাণ্ডা আমার কাছে কষ্টের ব্যাপার ছিল না, আর শাদা-শাদা বরফ দেখে তেমনই আনন্দ পেতাম, যেমন সবুজ-সবুজ দেবদারু বন দেখে পেতাম। বেশি পরিচিতি বাড়ানো পছন্দ ছিল না, কারণ তাতে সময়ের অপব্যবহারের প্রশ্ন ছিল, তবুও সহৃদয় হিতৈষীবন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হবার যে আনন্দ তার থেকে বঞ্চিত থাকাটাও আমি পছন্দ করতাম না। 'হর্নক্লিফ' থেকে বাজারের দিকে যেতে একটু চড়াই পড়ত, যেটা একেবারেই বোঝা যেত না, আর বুকেও কোনোরকম চাপ লাগত না। এইসময় যদিও ডায়াবেটিস নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম কিন্তু চিনি এত বেশি বেরোচ্ছিল না যার প্রভাব শরীরের ওজনের ওপর পড়ে।

—১৯৫০—

চাষবাস করার অভিজ্ঞতা এখন নতুন নতুন ছিল, আর সেটাও এখন চাষের মরশুম যখন পার হয়ে গেছে, তখন। ঘণ্টা-দেড়ঘণ্টা সময় বার করে খেতে কাজ করতে চাইতাম এবং করতামও। অনেকরকম শাক-সবজি লাগিয়ে নিরাশ হয়েও আমি মনোবল ছাড়ার পাত্র ছিলাম না। বরফের দিনে সর্ষে আর কপি দিব্যি বেঁচে থাকল। বরফ গলে যেতেই তার সবুজ-সবুজ পাতা আবার ঝকঝক করতে লাগল। টমেটো শুকিয়ে গিয়ে আর মাথা তোলার নাম করল না। লাল লঙ্কার অবস্থাও একই। অভিজ্ঞতা থেকে দেখলাম, যদি মাটির নীচে এদের শিকড় মরতে না দেওয়া হয়, তাহলে বসন্তে সেই গাছেই আবার পাতা আর অঙ্কুর বেরোতে শুরু করে, আর সবার আগে তাতেই ফল ধরে। প্রতিবছর তাদের রক্ষা করতে যথোচিত দৃষ্টি দিতে পারিনি, কিন্তু তবুও তারা, বিশেষ করে লঙ্কা, নিরাশ করল না। ১৯৫০ সালে লাগানো একটা লাল লঙ্কার গাছ তো আজও একইরকম আছে, আর প্রতি বছর শ'য়ে শ'য়ে ফল দেয়। এত ঝাল যে বড় বড় বীরদেরও কাবু করে দেয়। প্রোফেসর বিশ্বনাথ শুক্ল খুব বড়াই করতেন। যখন বাড়ির একটা ছোট্টমত লঙ্কা তাঁর সামনে রাখা হলো, তখন তিনি হার মানলেন। লঙ্কা তো একদম বয়কট করতাম না, তবে আমাদের বাড়িতে লঙ্কা-প্রেমীর অভাব ছিল না। কমলার তো লঙ্কা ছাড়া খাওয়াই হতো না।